মহাযাত্রা

দিবাকর দাস



খোঁজা থামিয়ে দিলেই পাবার আশা নিঃশেষ হয়ে যায়। নর্মদার সামনে বসে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য হয় রুদ্রদেব আর অসিত। সমুদ্র সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। এখানে গুরু-শিষ্যের বিষয় খাটবে না, দুজনেই নবিশ। তবু অসিতকে এগিয়ে যেতেই হবে। অঙ্গদকে উদ্ধার না করে সে ফিরে যাবে না। রুদ্রদেবও শিষ্যকে ত্যাগ করতে পারে না। শিক্ষা শেষ হবার আগে কোন গুরুই শিষ্যকে ত্যাগ করে না।

ওদিকে রাহু অঙ্গদকে নিয়ে জাহাজে চেপে বসেছে। পশ্চিমে নিজের পরিচিত বন্দরের অভাব নেই। সেগুলোর একটাতে থিতু হয়ে বসেই অঙ্গদকে নিয়ে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের পরিকল্পনা করে চলেছে সে। কিন্তু বিধির চিন্তা হয়তো অন্যরকম। রাহুর মতো লোকের তো আর পৃথিবীতে অভাব নেই। চলার পথে রাহু বুঝতে পারে, অঙ্গদের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে লোকে। কেউ কেউ তো অঙ্গদকে পাবার জন্য তার প্রাণ নিতেও পেছপা হবে না।

রোমান সাম্রাজ্যের দখলে আছে পুরো গ্রীস আর ভূমধ্যসাগরের চারিদিকের অঞ্চল। রোমান সম্রাট ট্রাজানের শাসনে সাম্রাজ্যের কোথাও কোন সমস্যা মাথাচাড়া দিতে পারছে না। তবে পরাধীন গ্রীসের বাতাসে মাঝে মাঝে শোনা যায় স্বাধীনতার কানাকানি। আলেকজান্ডারের উত্তরসূরিরা নিজেদের এই অবস্থা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। নিজেদের সিংহসম সাহস মাঝে মাঝে জেগে উঠতে চায়। বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দেয় স্পার্টার আকাশে-বাতাসে।

ইভানের স্বাধীনতা নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই। গ্রীসের অভিজাত সেনাদলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে অভিজাত সুবিধা নিয়ে জীবন কাটাতে পারলেই হলো। সেই লক্ষ্যেই স্পার্টার সেরা যোদ্ধা হবার পথে এগিয়ে চলেছে সে। কিন্তু হঠাৎ করে বদলে যায় তার জীবন। প্রেম জোয়ার বইয়ে দেয় তার জীবন নদীতে। আর, প্রেম কখনোই কাউকে অবিকৃত রাখে না।

স্পার্টার দুর্গম পাহাড়ে জেগে ওঠার অপেক্ষায় আছে এক অমোঘ শক্তি। টিয়ার অব এপোলোর অপেক্ষায় কাল কেটে যাচ্ছে তার। সে কি জেগে উঠবে গ্রীসের স্বাধীনতার ভাগ্যবিধাতা হয়ে?

আপাত সম্পর্কহীন ঘটনাগুলো শেষে মিলে গেলো একই বিন্দুতে। মহাকালের পথে শুরু হলো এক রোমাঞ্চকর মহাযাত্রা।





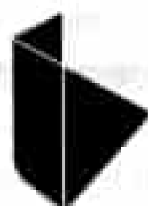


মৃদু শিস দিয়ে উঠলো ওরিয়ন। ইভান তাকালো তার দিকে। চোখের ইশারায় তাকে নড়তে নিষেধ করলো ওরিয়ন। ইভান বুঝতে পারলো, এবার আর ওরিয়ন দুষ্টুমি করছে না। সে জায়গায় জমে গেলো। ওরিয়ন কোমরের খাপ থেকে ছোট একটা ছুরি খুলে নিলো। ইভান শরীর স্থির করে ফেলেছে। পলকও ফেলছে না। এক ঝটকায় শরীর ধনুকের মতো বাঁকিয়ে ফেললো ওরিয়ন। নিখুঁত কৌশল। শরীরের বাঁকানো স্থিতি শক্তির পুরোটা গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ছুটে গেলো ছোট ছুরিটা। যাবার সময় ইভানের সোনালী চুলের জুলপির কাছে ঝুলে পড়া অংশ থেকে একটু কেটে দিতে ভুল করলো না।



মহাযাত্রা

দিবাকর দাস



মহাযাত্রা
দিবাকর দাস

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৪

প্রকাশক
এ. কে. এম. মাফিউল কাদির আদন
চিরকুট প্রকাশনী
২/৩ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
সজল চৌধুরী

মূল্য
এক হাজার টাকা মাত্র

Mohajatra by Dibakor Das
Published by Chirkut Prokashoni
Price TK. 1000.00 only

কালের বুকের দূর্বাঘাসে,
এঁকে সেই শিশিরের মাত্রা।
এই মহাকালের দোলাচলে,
এগিয়ে যায় অনন্ত মহাযাত্রা।

মহাকাল আমাকে নতুন পথের দিশা দেখিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হতাশার অতলে ডুবতে থাকা একজনকে মহাকাল শুধু খড়খুঁটোই জোগায়নি, বরং সেই হতাশার দরিয়ায় নিয়ে এসেছিল সোনার তরী। সেই তরীতে ভেসে সাহিত্যের নতুন সাগরে ভাসতে গিয়ে নতুন যে কাব্য মাথায় এসেছে তাই মহাযাত্রা।

মহাযাত্রায় নতুনত্বের অনেক কিছুই খুঁজে পাবেন পাঠককুল। তবে আমার ভাবনা সেসব নিয়ে নয়। যোগ্য তবলচির সাথে হারমোনিয়ম যোগ্য সঙ্গত না করলে সংগীতের বারোটা বেজে যাবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। মহাকাল আর মহাযাত্রাকে সবাই প্রথম এবং দ্বিতীয় বলে জানলেও আমি তো জানি, এই গল্প অভিন্ন। যেখানে মহাকালের পাতা শেষ হয়ে গিয়েছিল সেখানেই মহাযাত্রার ভূমিকাটা লিখছি। আসলে মহাকাল কখনও শেষই হয়নি। এখন তবলার সাথে হারমোনিয়মের যোগ্য সঙ্গত হয়েছে কি না সেটা পাঠক নামক সাহিত্য সংগীতের বিচারকেরাই ঠিক করবেন।

মহাকালে একটা জিনিসের ব্যবহার করেছি, সেটা পাঠক বইয়ের ভেতরে বুঝতে পারলেও বলার লোভ সামলাতে পারছি না। দুটো প্রধান মিথলজির মিশ্রণ এখানে ঘটিয়ে দিয়েছি। মিশ্রণ কেমন হয়েছে সেটাও পাঠককেই বিচার করতে হবে। তবে এটুকু বলতে পারি এই সাহিত্যিক ভাবনাটা এই অঞ্চলে দুর্লভ।

মহাযাত্রা এপার এবং ওপার দুই বাংলাতেই একসাথে প্রকাশিত হচ্ছে। উভয় প্রকাশককে আমাকে সুযোগ দেবার জন্য আরেকবার ধন্যবাদ।

পাঠক মহাকালের মতো মহাযাত্রাকেও আপন করে নেবেন বলেই আমার বিশ্বাস। মহাকালের মহাযাত্রায় তো কোনো বিভেদ থাকতে পারে না। ভুলত্রুটি হয়তো থাকবে, তবে সবশেষে পাঠকের কাছে একটাই প্রশ্ন থাকবে,

'গল্পটা আপনার ভালো লেগেছে তো?'

সিসলিক পাহাড় তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নয়। স্পার্টায় এর চেয়েও ঢের দর্শনীয় আর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা আছে। এই শহরের অভিজাতদের গ্রীষ্মকালীন বেড়াবার স্থান হিসেবে তেমন জনপ্রিয় নয় এই জায়গা। তবে মাঝে মাঝে যে দুই একটা অভিজাত দল তাদের নারী সঙ্গিনীদের নিয়ে এখানে যে আসে না, তা নয়। তবে তার অধিকাংশই ক্ষুদ্র সময়ের জন্য। এখানে একমাত্র আকর্ষণ বলতে নীরবতা। প্রকৃতির প্রতি যাদের প্রেম মাঝে মাঝে জেগে ওঠে তারাই এখানে বেড়াতে আসে।

সিসলিক পর্বত পার হয়ে এলে একটা জংলা মতো জায়গা আছে। বেশ বড়ো বড়ো গাছ আর কাঁটা ঝোপে পূর্ণ জঙ্গল। এখানে কেউ আসে না। তবে এখানে কেউ বলতে সাধারণ মানুষ বোঝানো হয়েছে। অসাধারণ কিছু মানুষের জন্য এই জায়গা অতো দুর্গম নয়। তাদের জন্য এই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা বিষধর সাপ আর নেকড়ের দলও তেমন বিপদের সৃষ্টি করতে পারে না।

এই জঙ্গল পেরিয়ে গেলে একটা খোলা জায়গা আছে। চারিপাশে পাথরের উঁচু দেওয়ালে ঘেরা। বেশ কিছু তাবু খাটানো আছে সেখানে। প্রত্যেক তাবুতে মানুষের থাকার জন্য বরাদ্দ জায়গা কম, ভেতরের বেশির ভাগ জায়গাই বরাদ্দ অস্ত্র শস্ত্র আর যুদ্ধ সরঞ্জাম রাখার জন্য। সেসবের ভিড়ে এক কোণায় বরাদ্দ ক্ষুদ্র জায়গায় লোকজন ঘুমায়।

স্পার্টার এই জায়গা তখনো গোপন ছিল। যখন সেই বিখ্যাত ট্রয়ের যুদ্ধ হয়েছিল, তখনো সিসলিকের আড়ালে এই জায়গা ছিল। গ্রীকদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য স্পার্টান বাহিনীর অনেক সদস্যই গিয়েছিল এই জায়গা থেকেই। স্পার্টার বিখ্যাত রাজা লিওনাইডাস যে তিনশো সেনা নিয়ে জারাক্সিসের লক্ষ সেনার বাহিনীকে বাঁধা দিতে গিয়েছিলেন, তার গল্পও এই জায়গার সাথে জড়িত। রাজার সাথে সেনা পাঠাতে অস্বীকার করেছিলেন নগরের অভিজাতরা। এত বড়ো বাহিনীর সাথে লড়াই কীভাবে করবে স্পার্টার এই কয়েকজন সৈন্য। তাদের তো আর সিসলিকের এই উপত্যকায় ছোটোবেলা থেকে বাস করার অভিজ্ঞতা ছিল না। তারা জানেও না, এই উপত্যকার সেনাদের প্রিয় খাবার সিংহের পাঁজর থেকে বের করে আনা রক্তমাখা কলিজা।

কিন্তু সেই বিখ্যাত রাজা লিওনাইডাস জানতেন। তিনি নিজেও এই জায়গা থেকেই শস্ত্রের শিক্ষা পেয়েছিলেন। এই জায়গা থেকেই তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন তিনশো সেনা। তার দেহরক্ষী হিসেবে। তারপর স্পার্টার সেনারা কী করতে পারে সেই ধারণা পেয়েছিল এই পৃথিবী। জারাক্সিস ভয় পেয়েছিলেন তার সেই বিশাল সেনা নিয়ে গ্রিসের ভেতরে ঢুকে আক্রমণ শানাতে।

ইতিহাস ছেড়ে এবার বর্তমানে ফেরা যাক। এখন আর সেই রাজা লিওনাইডাস নেই। গ্রীকদের মধ্যে বীর প্রসবিনী মায়েরা এখনো আছেন, তবে প্রকৃতির নিয়মে কোনো সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হয় না। গ্রীক সাম্রাজ্যও হতে পারেনি। সেই যে ছোটো মেসিডনের এক রাজা আলেকজান্ডার ভারত পর্যন্ত জয় করেছিলেন, যেখানে রচিত হয়েছিল এক সুবিশাল গ্রীক সাম্রাজ্যের (অবশ্য গ্রীক না বলে আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য বললেই বেশি মানায়), তা এখন আর গ্রীকদের কবলে নেই। এই সসাগরা পৃথিবীর জানা অংশের অধিকাংশ এখন রোমানদের দখলে। এথেন্স, স্পার্টা, মেসিডন, থিবস এখন রোমানদের দ্বারা শাসিত হয়।

যখনই কোনো ভূখণ্ড অন্য কোনো ভূখণ্ডের মানে বহিরাগতদের দ্বারা শাসিত হয়, ঠিক তখনই নিজের মাটির প্রতি সেই ভূখণ্ডের কিছু মানুষের মায়া জন্মে ওঠে। মাঝে মাঝে তা শাসক হয়ে ওঠার জন্য, মাঝে মাঝে তা অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য। আবার কিছু কিছু সময়ে কেবল অহংকার থেকেও এই অনুভূতির জন্ম হয়। এই স্পার্টার অনেকের ভেতরেই সেই অহংকার আছে। পরের দ্বারা শাসিত হতে গিয়ে বারবার তাদের রক্ত উথরে উঠতে চায়। কিন্তু, শুধু ক্রোধ থাকলেই তো আর হবে না। রাজা লিওনাইডাসের মতো সামর্থ্য আর সাহসও থাকতে হবে।

সামর্থ্য আর সাহসের প্রশ্ন যখন আসে তখনই চলে আসে আবার গ্রিসের সেই বীরপ্রসবিনী মায়েদের কথা। তারা কি গর্ভে সিংহ শাবক ধারণ করতে ভুলে গেছেন? না। তবে পৃথিবীতে কিছুই ধ্রুব নয়। পরিবর্তন না করে কেউ যদি পুরানোকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় তাহলে একসময় সেই পুরানো আরও পুরানো হয়ে মরচে ধরে যায়, একসময় ভেঙ্গে যায় প্রকৃতির নিয়মে।

এই ভুলটাই করেছিল গ্রীকরা। তাদের বড়ো বড়ো রাজ্যের অদম্য সব যোদ্ধারা আলাদা আলাদা নিয়মে যুদ্ধ করতো। স্পার্টান দের ছিল অদম্য বড়ো ঢাল আর বড়ো বর্শার ফ্ল্যান্ক, এথেন্সের সেনাদের নৌবহর আর কচ্ছপ ব্যূহ সব ভালোই চলছিল। তবে, ঐ যে বললাম, অনেকদিন ধরে তারা এই নিয়মে কোনো পরিবর্তন আনেনি। আঁকড়ে ধরে ছিল, ঠিক মন্দিরে থাকা ধর্মগ্রন্থের মতো।

রোমানরা যখন রাজ্য বিস্তারে মন দিলো, তখন শুরুতেই তারা গ্রিসকে ঘাঁটল না। তারা ভালো করেই জানতো, শুরুতেই গ্রীকদের পায়ে পা দিলে এমন ল্যাং খেতে হবে, তাতে কোমরের দফারফা হয়ে যাবে। তারা আস্তে আস্তে মিশর আর পারস্যের ছোটো কিছু জায়গা আক্রমণ করতে শুরু করলো। গ্রীকরা তাতে তেমন কিছু মনে করলো না। তবে গুল্ম আস্তে আস্তে হয়ে উঠছিল মহীরুহ।

রোমানরা গ্রীকদের না ঘাঁটালেও একটা কথা তারা জানতো, গ্রীকদের পাশে রেখে তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হবে না, রাজা হয়েই থাকতে হবে। তখন তারা দুটো কৌশলে আত্মনিবেশ করলো। প্রথমে গ্রিসের রাজ্যগুলোর মধ্যে শত্রুতার রাজনৈতিক সুযোগ নিলো, সেই সাথে গ্রীকদের বহু পুরানো যুদ্ধ কৌশলের

বিপরীতে আবিষ্কার করলো নিজেদের কালজয়ী কৌশল। দ্য রোমান লিজিয়ন। ঘোড়া ব্যবহার করে, নানা অস্ত্র নানা স্তরে রেখে যুদ্ধের এক অপূর্ব কৌশল উদ্ভাবন করলো তারা। গ্রীকরা যতই সাহসী হোক না কেন, ততদিনে রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে তাদের সম্মিলিত শক্তি কমে গেছে, যুদ্ধ কৌশলেও তারা পিছিয়ে পড়েছে। সুযোগ বুঝে রোমানরা আক্রমণ করলো সম্পূর্ণ গ্রিস আর আস্তে আস্তে গিলে নিলো গ্রিসের সবগুলো রাজ্য। গ্রিসে শুরু হলো রোমানদের রাজত্ব।

বিশাল সাম্রাজ্য চালাতে গেলে অনেক হিসেব করে চলতে হয়। রোমানরা সেসব হিসেবে পাকা হয়ে উঠলো। তারা বুঝতে পারলো, মিশর আর পারস্যের দিকের রাজ্যগুলো যেহেতু তাদের মূল ভূখণ্ড রোম থেকে অনেক দূরে, তাই সেখানে সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে হলে, কর আদায় করতে হলে, বেশ ভালোভাবেই শক্তি মোতায়েন করতে হবে। শক্তি মানেই হচ্ছে সেনা। সেই হিসেবে গ্রিস তাদের রোম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। গ্রিসে মোতায়েন করার মতো যথেষ্ট সেনা তাদের ছিল না। অতো সেনা পালন করতে গেলে খাজনার চেয়ে খাজনা বেশি হয়ে যেত। তখন তারা ব্যবহার করলো সম্পূর্ণ নতুন এক কৌশল। নাগরিকদের চোখে সুখের চশমা পরিয়ে দেওয়া শুরু করলো তারা।

সুখের চশমায় গ্রিসের বড়ো বড়ো শহরের অভিজাত নাগরিকেরা বুঝতেই পারলো না, তাদেরকে পরাধীন করে রাখা হয়েছে। সেসব বড়ো শহরকে ঘোষণা করা হলো ফ্রি টাউন হিসেবে। সেসব ফ্রি টাউনে দাস ব্যবস্থা, বিনোদন ব্যবস্থার প্রাচুর্য রাখা হলো, কিছু কিছু জায়গায় গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো স্থানীয় লোকেদের। অভিজাতরা বুঝতেই পারলো না, আসলে তারা আরামের পরাধীনতায় বন্দি হয়ে গেছে। তাদের মনে হতে লাগলো, সব তো সুন্দর ভাবেই চলছে। সুকৌশলে সেনা মোতায়েন বিশদভাবে না করেই গ্রিস শাসন করতে লাগলো রোমানরা।

স্পার্টা এখন তেমন একটা ফ্রি টাউন। গভর্নর হিসেবে এক স্পার্টানই শাসন করছে এখানে। কলোসিয়াম, কুস্তি, আখড়া সবই চলছে। আমোদ চলছে, দাসদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার চলছে, দাসীদের ওপর চলছে যথেচ্ছ যৌন নির্যাতন। এসবের মধ্যে পরাধীনতার কোনো অনুভূতি আসছে না।

তবে স্পার্টায় অনেক আগে থেকে চলে আসা এই সিসলিক পর্বতের গোপন বাহিনী প্রতিপালন এবং প্রশিক্ষণ এখনো চলছে। এখন আর এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সেনা জন্ম দেয় না, বরং অভিজাতদের নিরাপত্তা এবং সুবিধা নিশ্চিত করাই এই সেনাদের লক্ষ্য। তবে তাই বলে এই সেনা নির্বাচন অথবা প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া দুর্বল হয়নি। সেসব আগের কালের মতো দুর্ধর্ষই আছে।

সিসলিক পর্বতের পেছনের জঙ্গলের ঠিক লাগোয়া একটা মাঠে এখন রোদ পড়েছে বেশ কড়া। তবে তাতে গোপন সেনাদল ক্রিস্ট এয়ারের দুই

প্রশিক্ষণার্থী সেনার তেমন কষ্ট হচ্ছে না। প্রকৃতির নানা শক্তিকে বশ মানানোর কৌশল বেশ ছোটো থেকেই আয়ত্ত করেছে তারা। গরম, শীত, বর্ষা তাদের শরীরে তেমন কোনো আন্দোলন ঘটাতে পারে না। এই দুজন এখন অলস সময় কাটাচ্ছে। বিকালে কঠিন প্রশিক্ষণ শুরুর আগে ঘাসের ওপর একটু গড়িয়ে নেয়া।

আচমকা ওরিয়ন শোয়া থেকে উঠে নিজের তলোয়ার দিয়ে বেশ জোরালো আঘাত হানল সঙ্গীর শুয়ে থাকা শরীর উদ্দেশ্য করে। আঘাতটা বেশ জোরালো হলেও শুয়ে থাকা অবস্থাতেই নিজের তলোয়ারে সেই আঘাত প্রতিহত করতে তেমন কষ্ট হলো না ইভানের। এমনকি তার হাত থেকে তলোয়ার খসেও পড়লো না। ওরিয়ন হেসে উঠলো, 'তোমার প্রতি হিংসা দিন দিন বেড়েই চলেছে আমার। এই আঘাত ফিরিয়ে দিলে কেমন করে? এবার তো কোনো রকম আভাস দেইনি আমি। আর তুমি তো ঘুমিয়েই ছিলে দেখলাম।'

ইভান তলোয়ার কোলের ওপর রেখে আবার চোখ বুজে ফেলল, 'না, ঘুমাইনি। চোখ বুজে থাকা আর ঘুমানোর মাঝে অনেক পার্থক্য বন্ধু। আর তোমার মতো একজন সাথি আশে পাশে থাকলে একজন নিশ্চিন্তে ঘুমাবে কী করে।'

'আমার ভুল হয়নি। তুমি ঘুমিয়েই ছিলে। তবে তোমার ক্ষমতা আরেক বার দেখা হয়ে গেল। সাধে তো আর তোমাকে আমাদের এই প্রজন্মের সবচেয়ে তুখোড় যোদ্ধা বলা হয় না।'

ইভান এসব কথা অনেক শুনেছে। তাদের শিক্ষকরা এমন প্রশংসা কখনই করে না। তাদের মুখ পাথরের মতো কঠিন থাকে সবসময়। কেউ কি ঠিক করছে না-কি প্রশিক্ষণে ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছে সেটা তাদের মুখ দেখে আঁচ পাওয়া কখনই সম্ভব নয়। তবে মিলিত দ্বন্দ্বে ইভানের সাথে কেউ এঁটে উঠতে পারে না। সেটা অস্ত্র দিয়েই হোক, অথবা অস্ত্র ছাড়া দ্বন্দ্বেই হোক। সেটা নিয়েও ইভানের মাথা ব্যথা নেই। এই যুদ্ধ আর প্রতিদিনের শক্ত প্রশিক্ষণের জীবনে সে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। শুধু সে নয়, বাকি সব প্রশিক্ষণ পাওয়া যোদ্ধারও একই অবস্থা। সবাই আস্তে আস্তে পরিণত হয়ে উঠছে। বাইশ বছরের রক্ত এখন সঙ্গ চায়, সমাজ চায়, চায় প্রেয়সীর স্পর্শ। একটা ঘর চায়, নিরুদ্বিগ্ন জীবন চায়। ইভানও অপেক্ষা করে, এই প্রশিক্ষণ কবে শেষ হবে? কবে নগরের সমাজে মাথা উঁচু করে আরামের জীবন বাঁচতে শুরু করবে সে?

এসব চিন্তা মাথায় আসতে আর নির্বিঘ্নে শুয়ে থাকতে পারলো না ইভান। উঠে বসলো। ওরিয়ন যোদ্ধাদের মধ্যে তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। এমনিতে ক্রিন্ট এয়ারের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্ব তেমন গড়ে ওঠে না, তবে তাদের দুজনের মধ্যে এই অসম্ভব কীভাবে যেন সম্ভব হয়ে গেছে।

ইভানকে উঠে বসতে দেখল ওরিয়ন, সে আগে থেকেই বসা, 'কী হলো, উঠে বসলে কেন? শিবিরে যাবার তো এখনো অনেক দেরি আছে।'

'হ্যাঁ, তা আছে। কিন্তু তোমার মতো এক বাচাল পাখি যদি ক্রমাগত কানের কাছে কিচিরমিচির করতে থাকে তাহলে চোখ বুজেও মানুষ শান্তি পাবে না, এমনকি একবারে চোখ বুজেও না।'

'এই বয়সে একবারে চোখ বুজার কথা বলছ কেন? আমার তো মনে হয় তোমার এক হালি নাতি নাতনী হবে। তারা তোমাকে জ্বালিয়ে তোমার মাথার সব পাকা চুল উঠিয়ে টাক ফেলে দেবার পর তুমি মারা যাবে।'

'হাসতে হাসতে এমন অভিশাপ দেওয়া কেবল তোমার পক্ষেই সম্ভব।'

একটু দূরেই জলের পাত্রটা পড়ে আছে। হেঁটে গিয়ে তুলে নিলো ইভান। এক চুমুকে অনেকটা সাবাড় করে দিলো। রোদ পড়ে তার সোনালী চুল যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ অনাবৃত উর্ধ্বাঙ্গের দিকে ওরিয়নের দৃষ্টি চলে গেল। তাদের সবারই ব্যায়াম পুষ্ট দেহ। তবে ইভানের দেহের সুষমা সম্পূর্ণ অন্যরকম। সুঠাম দেহের ভাজে ভাজে পেশী যেন পসরা সাজিয়ে বসেছে। তবে সেই পেশীতে শক্তি পূর্ণ থাকলেও সেসব পেশী আর দেহের গঠন বীভৎস নয়। বরং রমণীর আরাধ্য এই দেহ। আগের যুগ হলে ইভানকে অবশ্যই দেবতার সন্তান বলে স্বীকার করে নিত লোকে।

জল খেয়ে আবার বসতে উদ্যত হলো ইভান। তখনই ইভানের পেছন দিকে একটা নড়াচড়া লক্ষ্য করলো ওরিয়ন। তার আবার এই এক ব্যাপারে হাত বেশ পাকা। তা হচ্ছে শিকার। নিষেধ থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই সে এই জঙ্গলে শিকার করে আর মাংসের ভোজ দেয় সাথিদের নিয়ে।

মৃদু শিস দিয়ে উঠলো ওরিয়ন। ইভান তাকালও তার দিকে। চোখের ইশারায় তাকে নড়তে নিষেধ করলো ওরিয়ন। ইভান বুঝতে পারলো, এবার আর ওরিয়ন দুষ্টুমি করছে না। সে জায়গায় জমে গেল। ওরিয়ন কোমরের খাপ থেকে ছোটো একটা ছুরি খুলে নিলো। ইভান চোখ স্থির করে ফেলেছে। পলকও ফেলছে না।

এক ঝটকায় শরীর ধনুকের মতো বাঁকিয়ে ফেললো ওরিয়ন। নিখুঁত কৌশল। শরীরের বাঁকানো স্থিতি শক্তির পুরোটা গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ছুটে গেল ছোটো ছুরিটা। যাবার সময় ইভানের সোনালী চুলের জুলপির কাছে ঝুলে পড়া অংশ থেকে একটু কেটে দিতে ভুল করলো না।

লক্ষ্যে বিদ্ধ হলো ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা। শিকারের বেলায় ওরিয়নের হাত অব্যর্থ। একটা ঝোপের ভেতর থেকে কিচমিচ আওয়াজ ভেসে এলো। নিশ্চয়ই শিকার কুপোকাত হয়েছে।

সেদিকে ছুটল দুজনে। ইভান জিজ্ঞেস করলো, 'কী দেখে ছুরি ছুঁড়ে মারলে?'

'সেটা জানি না। খরগোশ হতে পারে, কাঠবেড়ালিও হতে পারে।'

নিশ্চিন্ত হলো ইভান। দুটোর যে-কোনো একটা হলেই হলো। খেতে দুটোই বেশ ভালো। এখন বিকালের প্রশিক্ষণের আগে একটু মাংস কপালে জুটলে মন্দ হবে না।

ঝোপের মাঝ থেকে ছুরি বিদ্ধ দেহটা তুলে নিলো ওরিয়ন। একটা খরগোশ। বেশ স্বাস্থ্যবান। নিজের ছুরিটা থেকে রক্ত ঘাসে মুছে নিয়ে আবার কোমরের খাপে চালান করে দিলো সে। এবার একটা আগুনের ব্যবস্থা করতে হবে। আগুনে ঝলসে নিলেই এই মাংসের যা স্বাদ হবে না। ভাবতেই জিভে জল এসে যাচ্ছে। শিবিরে তাদের বেশ নিয়ম মেনে খাওয়া দাওয়া করতে হয়। সেসবে করেই দুজনের রুচি উঠে গেছে।

অভ্যস্ত হাতে খরগোশের চামড়া ছাড়িয়ে ফেললো ওরিয়ন। ইভান ওদিকে আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠ সাজাচ্ছে। তবে সেদিক থেকে তার চোখ বারবার চলে যাচ্ছে খরগোশের ছাড়ানো চামড়ার দিকে, 'আচ্ছা, তোমার মনে হচ্ছে না খরগোশটা একটু অস্বাভাবিক?'

অবাক হলো ওরিয়ন, 'অস্বাভাবিকতার কী দেখলে তুমি? জঙ্গলের খরগোশ, দলছুট হয়ে এদিকে এসেছে আর আমার হাতে মারা পড়েছে।'

'না, সেটা নয়। জঙ্গলের দলছুট খরগোশ বলে তো এটাকে মনে হচ্ছে না। গায়ের চামড়া দেখেছ? একটু বেশিই পরিষ্কার। শরীরে মাংসের পরিমাণও একটু বেশিই মনে হচ্ছে? আমরা তো অনেক জঙ্গলের খরগোশ খেয়েছি। এমন মোটা তাজা আর একটাকেও দেখিনি।'

'আরে চিন্তা কোরো না', নির্মল হাসি ওরিয়নের মুখে, 'এটা বোধহয় একটু অলস খরগোশ। সারাদিন শুয়ে শুয়ে ঘাস চিবিয়েছে। সেজন্যই মুটিয়ে গেছে।'

ব্যাখ্যাটা পছন্দ হলো না ইভানের। তবে এই নিয়ে আর বেশি তর্ক করার সুযোগও পেল না। ওদের ঠিক পেছনে অস্ফুট আওয়াজ এলো। একটা কণ্ঠ। আরেকটু বিশদ ভাবে বললে বলতে হয় নারী কণ্ঠ!

ওদের দুজনকে দেখে ঘাবড়ে গেছে দুটো মেয়ে। ওরিয়ন আর ইভান দুজনেই পেছন ফিরে তাকিয়েছে। ইভান যেন এক নজরেই একেবারে স্থির হয়ে গেছে। গোলাপি গাউনের মতো পোশাক পরে আছে একটা মেয়ে। দেহ যেন ঠিক জলপাই লতার মতো সুগঠিত। যেখানে যেটুকু বেড়ে ওঠা দরকার সেটুকুই বেড়েছে। দেহের প্রত্যেকটা বাঁক যেন তাদের শিবিরের তাবুতে থাকা সবচেয়ে ধারালো তলোয়ারের চেয়েও তীক্ষ্ণ। ঐ দূরত্বে থেকেও ক্রমাগত বিঁধিয়ে যাচ্ছে ইভানের শরীর। এই খোঁচা তার শরীরের ওপরে লাগছে না, একেবারে ভেতরে বিঁধছে। বুকের কাছটায় ভোঁতা যন্ত্রণা হচ্ছে তার।

এই জায়গায় ওরা দুজন এই দুই তরুণীকে দেখার আশা করেনি, এই দুই তরুণীও ওদের দেখা পাবার কথা কল্পনা করেনি। দুই পক্ষেরই সম্বিত ফিরতে একটু সময় লাগলো। ইভান যার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেই তরুণীর পাশে

দাঁড়ানো তরুণী চিৎকার করে উঠলো, 'এই তো পিটার। কী অবস্থা করেছো তোমরা ওর।' শুধু চিৎকার নয়। পিটারের কথা মনে করে কেঁদে উঠলো তরুণী। অন্য তরুণীর নজরও এতক্ষণে পিটারের ওপর পড়েছে, সেও ঢুকরে কেঁদে উঠলো। ওরিয়ন আর ইভান হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। পিটার আবার কে?

একটু পরেই অবশ্য সেই সন্দেহের নিরসন হয়ে গেল। ওরা যে পিটারের কথা বলছে সে একটু আগে জীবিত ছিল। এখন ছাল ছাড়ানো অবস্থায় আগুনের ওপর উঠে পড়ার অপেক্ষা করছে। ইভান বুঝতে পারলো তার সন্দেহই ঠিক। এই খরগোশ জংলি নয়। ওরা একজনের পোষা খরগোশ মেরে ফেলেছে। সেটাই অবশ্য ঘটনার সবচেয়ে খারাপ অংশ নয়। সবচেয়ে খারাপ দিকটা হলো, তারা ধরাও পড়ে গেছে।

ওরিয়ন এখনো বুঝতে পারেনি, 'পিটার কে? আপনারা কার কথা বলছেন?'

তরুণী এবার এগিয়ে এসে পিটারের চামড়া হাতে তুলে নিলো, ' এই যে পিটার। আমাদের পোষা খরগোশ। একটু ছুটে খেলা করে বেড়াচ্ছিল। খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তোমরা আমাদের খরগোশ মেলে ফেলেছ।'

ওরিয়ন এবার ধীর স্বরে বলল, 'আমরা কী করে বুঝবো এটা পোষা খরগোশ। আমরা তো ভেবেছি জঙ্গলের খরগোশ।'

'তার মানে!' তরুণী এবার রেগে গেল, 'আমাদের খরগোশ মেরে ফেলবে আবার অজুহাত দেবে। জানো আমার সাথে ইনি কে? জানলে তো এখানেই আমার পা ধরে কেঁদে ফেলবে তুমি। তোমরা কারা? এখানে কী করছ? সেই কথা আগে বলো।'

ওরিয়ন নিজেও রেগে যাচ্ছে। কাহাতক এই মেয়ের বোলচাল তার মতো একটা সৈন্য সহ্য করবে! তবে ইভান পরিস্থিতি বুঝে মাথা ঠান্ডা রেখেছে। তাদের পরিচয় এখানে কোনোভাবেই প্রকাশিত হওয়া চলবে না। যদি বাইরের কেউ তাদের পরিচয় জানতে পারে তবে শাস্তি দুটো। ভালো হলে শিবির থেকে এবং স্পার্টা নগর থেকে নির্বাসন, আর খারাপ হলে মৃত্যু। এই বিপদ সাবধানে সামলাতে হবে।

ইভান এবার অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো, 'আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। না জেনে আমরা এমন কাজ করেছি। এখানে তো আসলে বাইরের কেউ আসে না। তাই আমরা বুঝতে পারিনি এটা কারো পোষা খরগোশ।'

নিজের কথা শেষ করেই কান পাতলো ইভান। এই অনিন্দ্য সুন্দরীর গলার স্বরও অপূর্ব হবার কথা। তাই হলো, 'আপনি বললেন এখানে বাইরের কেউ আসে না, তাহলে আপনারা কেন এখানে এসেছেন? আপনারা কি এখানেই থাকেন?'

ইভান বুঝল, এই মেয়ে শুধু অনিন্দ্য সুন্দরীই নয়, সেই সাথে মাথায় বুদ্ধিও কম নেই। সাবধান হতে হবে, 'না, আমরাও বেড়াতে এসেছি। আমাদের ভুলের জন্য ক্ষমা করে দিন। আপনার এই খরগোশের বদলে আমরা আপনাকে একটা

নয়, দুটো বাদামি খরগোশ দেবো। আমি শুনেছি বাদামি খরগোশ খুব ভালো পো মানে। আর আমি নিশ্চিত আপনার কোলে সেই বাদামি খরগোশ অনেক মানাবে দুটো সৌন্দর্য একসাথে থাকলে উভয়েরই রূপ দ্বিগুণ হবে।'

এবার মেয়েটার গালে লাল ছোপ পড়লো। প্রস্তাবটা বেশ লোভনীয়। বাদা খরগোশ সহজে পাওয়া যায় না।

মেয়েটার সাথি এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছে, 'ঠিক আছে। প্রস্তাব মন্দ না। ঠি দুই দিন সময় দিলাম। এর মধ্যেই দুটো বাদামি খরগোশ এনে দিতে হবে।'

ইভান বেশ আগ্রহী হয়ে উঠলো। তার নজর এখনো একজনের গালের লা ছোপের দিকে, 'দুই দিনের ভেতরেই জোগাড় হয়ে যাবে। কোথায় পৌঁছে দেবো?'

ইভানের একেবারে সামনে চলে এলো মেয়েটা। ইভানের মাথা যেন ঘুরে উঠলো। রণাঙ্গনে শক্ত শক্ত প্রতিপক্ষের সামনেও তার কখন এমন অবস্থা হয়নি মেয়েটা অস্ফুটে বলল, 'দুই দিন পরে নগরের অভিজাত অ্যালেস্টরের বাড়ি খরগোশ নিয়ে চলে আসবে।'

'দিনের বেলা আসতে পারবো না। রাতে আসতে হবে। চাঁদ যখন মাথা ওপরে ওঠে আর তারপরে হেলে পড়ে।'

তির্যক চাহনি হানল মেয়েটা, 'কেন? এত রাতে কেন?'

'না, কোনো বাজে উদ্দেশ্য নেই। বিশ্বাস করুন। আমার দিনে নগরে যে বারণ আছে।'

'আচ্ছা। আমার বাদামি খরগোশ পেলেই হলো। দুই দিন পরে রাতেই তু আসবে। সদর দরজার কাছে এসে ওর নাম বলবে। ডোরা। আর বলবে তুমি আত্মীয়। খরগোশের কথা ভুলেও বলবে না। তারপর ডোরা বেরিয়ে এলে হাতে খরগোশ দিয়ে দেবে। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু বলছিলাম কি আপনার হাতে খরগোশ দুটো দিতে পারলে আমা খুব ভালো লাগতো।'

'তোমার হয়তো ভালো লাগবে, কিন্তু আমার ভালো লাগবে কি না সেটাও তে বুঝতে হবে। আমরা এখন চলি। আর দেরি করা যাবে না।'

'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'না। সেটা তোমার কোনো কাজে আসবে না।'

ডোরা মেয়েটা সম্ভবত তার পরিচারিকা। ইভান সেটাই বুঝতে পারলো। এবার ডোরা ওদের সামনে এগিয়ে এলো, 'আর যদি দুদিন পরের রাতে খরগোশ না নিয়ে আসো, তাহলে মালিকের কাছে বলে দেবো তোমাদের কীর্তির কথা। মনে থাকে যেন।'

দুই তরুণীই স্থান ত্যাগ করলো। ইভান ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ওরিয়ন তাড়া দিলে, 'চলো ইভান, সময় আর বেশি বাকি নেই। খরগোশটা খেয়ে শিবিরে যেতে হবে।

'তুমি এখনো এই খরগোশ খাবার চিন্তা করছো? সেটা না করে দুটো বাদামি খরগোশ কীভাবে ধরবে সেই চিন্তা করো।'

অবাক হলো ওরিয়ন, 'তুমি কি পাগল হলে? ঐ মেয়ের জন্য নগরে খরগোশ নিয়ে যাবে? আমরা এখান থেকে এখন চলে যাবো। এদিকে আর কখনও আসবো না। ওরা আমাদের আর কখনোই খুঁজে পাবে না।'

'পাবে ওরিয়ন। তোমার কেবল শিকারেই মাথা খোলে। অন্য সময় মাথায় কি তালা দিয়ে রাখো না-কি? ঐ মেয়েটা অভিজাতের মেয়ে। আর অভিজাত কে হয় জানো তো। যে আমাদের এখানে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে তরুণ বয়সে। মেয়ের কাছে আমাদের বর্ণনা শোনা মাত্র সে বুঝে ফেলবে আমরা ক্রিপ্ট এয়ারের সদস্য। এই ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

'হুম...।' এবার ভয় পেল ওরিয়ন।

' আর জানোই তো বাদামি খরগোশ তোমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। শিকারে তুমি পাকা। তবে মরা খরগোশ দিয়ে কাজ হবে না। জীবিত ধরতে হবে।'

ওরিয়ন মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। সেই দুই দিনের মধ্যে খুঁজে বের করে ফেলবো। এখন এই খরগোশ খেতে আপত্তি কোথায়?'

' না, আপত্তি নেই।'

খরগোশ আগুনের ওপর চড়িয়ে দিলো ওরিয়ন। ইভান একটু দূরে গিয়ে বসেছে। ওরিয়নকে একটু মিথ্যে বলেছে সে। আসলে এই মেয়ে তার অভিজাত বাবাকে খরগোশের ব্যাপারে কিছুই বলতে পারবে না। তার অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে কোনো অভিজাত পরিবারের মেয়ে এই জায়গায় স্বাভাবিক ভাবে ঘুরতে আসবে না। নিশ্চয়ই এই মেয়ে সঙ্গিনীদের নিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে এসেছে। একটা অভিজাত পরিবারের মেয়ে হিসেবে অপরাধটা ছোটো নয়। তাই বাবাকে কিছুতেই এই খরগোশ হারানোর কথাটা বলতে পারবে না মেয়েটা। এজন্যই সে নিজের নাম বলেনি। ডোরার নাম বলে গেলেও প্রহরীর কাছে খরগোশের কথা বলতে বারণ করেছে। ডোরার আত্মীয় পরিচয় দিয়ে দেখা করতে বলেছে। অতো রাতে আত্মীয় পরিচয় দিয়ে দেখা করতে হলেও একটা যুতসই কারণ লাগবে। কারণ অবশ্য খুঁজে বের করা যাবে।

খরগোশ নিয়ে না গেলেও চলে। তবে কেন সে ওরিয়নকে খরগোশ ধরতে বলল? কেন মিথ্যে ভয় দেখাল?

কারণ, যেভাবেই হোক ঐ অনিন্দ্য সুন্দর মুখটা ইভানকে আরেকবার দেখতেই হবে। সেই সাথে জানতে হবে মিষ্টি নামটাও।

অসিত নর্মদা নদীর তীরে বসে আছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে অনেক ক্ষণ হলো। অঙ্গদকে নিয়ে চলে গেছে রাহু। সেই খবর পেয়েছে বন্দরের প্রহরীর কাছ থেকে। রুদ্রদেব কিছুক্ষণ তার সাথে থেকে আবার নগরের ঐদিকে গেছে। রিপুজিতের সবকিছু ভালোভাবেই সামলে নিতে পারার কথা। তবু যদি কোনো সাহায্য লাগে সেজন্য গেছে। অসিতকে একটু একা থাকতে দিয়েছে। অসিত নিজেও যেতে তেমন একটা আগ্রহী ছিল না।

অঙ্গদকে খোঁজার জন্য নিজের সবটুকু দিয়েছে সে। এই আর্যাবর্তের একেবারে শেষ মাথায় চলে এসেছে। অঙ্গদ একেবারে কাছেই ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হাতে আসেনি। হয়তো ঈশ্বরও চান না, এই জনমে অঙ্গদের সাথে তার দেখা হোক।

একটু দূরে সেই প্রহরী বসে আছে। একটু আগে নিজের পরিণতির কথা ভেবে উত্তেজনায় তার বুক ধড়ফড় করছিল। রুদ্রদেবের অভয় দানে সে এখন মোটামুটি স্বাভাবিক। নিজের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কিন্তু এখনো এখান থেকে যাবার অনুমতি মিলেনি। অনুমতি পরে মিললেও হবে, তার যে প্রাণ বেঁচে গেছে, সে এতেই খুশি।

অসিতের মন বসে থাকতে চাইছে না। অঙ্গদের খবর যেটুকু পেয়েছে তাতে হতাশ হতেই হয়েছে। কোনো আলো নেই সেই পথের শেষে। একটু আশার আশায় সে এগিয়ে গেল বসে থাকা নিরস্ত্র প্রহরীর দিকে।

অসিতকে আসতে দেখে প্রহরী একটু ভয় পেয়ে গেল। সে যা জানে তা তো বলেই দিয়েছে। তাকে অভয় দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তার অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছে। এখন তো শত্রুর তার দিকে এগিয়ে আসার কোনো কারণ থাকতে পারে না। ক্রমশ ভয়টা দৃশ্য হতে লাগলো তার চোখে মুখে।

অসিত এসে তার ঠিক সামনে দাঁড়ালো। প্রহরীর চোখ অসিতের কোমরে ঝোলানো তলোয়ারের দিকে। যে-কোনো সময় খাপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তাহলেই তাকে আর পরিবারের কাছে যেতে হবে না।

অসিত প্রহরীর মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছে। সে তাকে অভয় দিলো, 'ভয় নেই। আমার গুরু তোমাকে অভয় দিয়েছেন। আমি সেই আদেশের লঙ্ঘন কোনোভাবেই করতে পারবো না। আসলে আমি ঐ বানর সম্পর্কে আরও কিছু জানতে চাই।'

'আচ্ছা।' ভয়ার্ত স্বর বেরোল প্রহরীর গলা থেকে।

'রাহুকে তুমি কতদিন ধরে চেন? মানে এই বন্দরে কতদিন ধরে আছে রাহু?'

'অনেকদিন ধরে। একবার মৌসুম শেষ হতেই চলে গিয়েছিল। তারপর ফিরে এলো এক মাস পরে। একটা বানর নিয়ে এলো যেন কোথা থেকে। আগে সে জাহাজের হয়ে কাজ করতো। সেই বানর আনার পর আর সেসব কাজ করতো না। বানরের খেলা দেখিয়েই অনেক মুদ্রা উপার্জন করতো।'

অসিতের কানে কে যেন বিষ ঢেলে দিয়েছে। তার অঙ্গদকে নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে ঐ জোতচোর। কিন্তু অঙ্গদকে দিয়ে খেলা দেখাবে কীভাবে? অঙ্গদ তো তার পোষা। পৃথিবীর আর কারো পক্ষেই এত তাড়াতাড়ি অঙ্গদের মন থেকে তার স্মৃতি মুছে দেয়া সম্ভব না। আর রাহু খেলা দেখানোর কী বোঝে? বানর দিয়ে কীভাবে খেলা দেখাতে হয় তা কি সে জানে? না, এই সন্দেহের নিরসন হওয়া দরকার।

অসিত বসে পড়লো প্রহরীর পাশে। অসিতের শরীরে ঢিলেঢালা ভাব দেখে প্রহরীর মনে একটু স্বস্তি ফিরে এসেছে। ' আচ্ছা, তুমি কখনো রাহুর খেলা দেখেছ? মানে কী খেলা দেখাতো সে ঐ বানরকে নিয়ে?'

এই ছেলে ঐ বানর নিয়ে এত কৌতূহলী কেন তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যাক, এত বুঝে কাজ নেই। কথার সাথে কথা আর তালের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। 'হ্যাঁ, খেলা দেখেছি তো। আমরা তো আর মুদ্রা দিয়ে খেলা দেখতাম না। আমাদের সাথে ভাব রাখতে রাহু মাঝে মাঝে আমাদের খেলা দেখাতো।'

'কী খেলা দেখাতো?'

' মানে?' প্রহরী প্রশ্ন ঠিক বুঝতে পারে না।

খোলাসা করে বলল অসিত, 'মানে? বানরের খেলা তো নানা রকম হয়। বানর নানা ভূমিকায় অভিনয় করে। ভালুকের খেলাও তেমনি। ভালুক দিয়ে নানা ভূমিকায় অভিনয় করায় মালিক। রাহু ঐ বানরকে দিয়ে কীসের কীসের ভূমিকায় অভিনয় করাতো?'

'ও এই কথা। হ্যাঁ, এটা তো জানি। বানরের খেলা আগেও দেখেছি। বানর নানা ভূমিকায় অভিনয় করে। তবে রাহু বানরকে কোনো অভিনয় করাতো না। নানা কসরত করাতো। এটাই তার খেলা।'

অসিত বুঝতে পেরেছে। অভিনয় করাবে কীভাবে। অঙ্গদ কি আর তার পোষ মেনেছে। কিন্তু সে কসরত করাতো কীভাবে? কসরত করাতে হলেও তো অঙ্গদকে পোষ মানাতে হবে। নিশ্চিত হতে কথা আগে বাড়ালো সে, 'কী ধরনের কসরত করাতো সে।'

'অনেক ধরনের। রঙ্গিন বানরের গলায় বাঁধা শিকল ধরে তাকে দৌড় দেওয়াতো, লাফ দেওয়াতো।'

এটুকু শুনেই প্রহরীকে থামিয়ে দিলো অসিত, ' থামো, থামো। কী বললে? বানরের গলায় শিকল বাঁধা থাকতো? লোহার শিকল? সব সময়?'

অসিতের আচমকা থামিয়ে দেওয়াতে অবাক হয়ে গেছে প্রহরী, ' হ্যাঁ, সব সময় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতো। তা রাখবে না কেন? না হলে বানর পালিয়ে যাবে না!'

অসিত দাঁতে দাঁত চাপলো, প্রহরীর নজর এড়িয়ে। ওর এই অবস্থা দেখলে প্রহরী আবার ভয় পেয়ে যেতে পারে। অঙ্গদকে পোষ মানাতে পারেনি রাহু। হারামজাদা অঙ্গদকে সব সময় শিকল পরিয়ে রাখে। অসিতের সাথে থাকলে খেলার সময় ছাড়া কখনো শেকল পরেনি অঙ্গদ। কি কষ্টই না হচ্ছে বেচারার। সারাক্ষণ গলায় শেকল। সারাক্ষণ একটা দম বন্ধ পরিস্থিতি।

চোখের জল বেরিয়ে যেতে চাইলো অসিতের। কিছুদিন আগে হলে হয়তো বেরিয়েই যেতো। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পূর্ণ শিক্ষা সে পাচ্ছে। সেই শিক্ষা তার চোখের জলকে বুকের অনেক গভীরে ঠেলে দিয়েছে। সেই জল বেরিয়ে আসা এখন আর এত সহজ নয়। একটা প্রশ্ন চলে এলো অসিতের মাথায়, 'আচ্ছা, যখন খেলা দেখাতো না তখন ঐ বানরকে কোথায় রাখতো? শেকল দিয়ে বেঁধে?'

'সেটা আমি ঠিক বলতে পারবো না। তবে রাহুর তাবুর বাইরে থেকে একবার ভেতরে উঁকি দিয়েছিলাম। সেখানে একটা বড়ো খাঁচা দেখেছি। মনে হয় ওখানেই বানর রাখতো। এই বানর ওর জন্য লক্ষী। রাহু আগে গরীবের মতো থাকতো। এই বানর নিয়ে আসার পর আমাদের থেকেও বেশি মুদ্রা আয় করতে শুরু করলো সে। ওর ভাগ্য ফিরে গেল।'

'একটা জিনিস লক্ষী না অলক্ষী তা এত সহজে বোঝা যায় না। কোনো কি মানুষের জন্য বর না অভিশাপ তাও বুঝতে অনেক সময় লাগে। ভাগ্য খারাপ না ভালো সেও এত সহজে কী বোঝা যায়?'

রুদ্রদেবের গলার স্বর শুনে ঘুরে তাকাল অসিত। রুদ্রদেব কখন এসে দাঁড়িয়েছে দুজনের কেউই খেয়াল করেনি। রুদ্রদেব এসেছে অনেকক্ষণ হলো। প্রহরী বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। রুদ্রদেবকে দেখলেই সম্ভ্রমের ভাব চলে আসতে বাধ্য।

রুদ্রদেব অসিতের দিকে তাকালো, 'আমার মনে হয় এই প্রহরীর সাথে কথা শেষ হয়েছে তোমার?'

হ্যাঁ-সুচক মাথা নাড়ল অসিত।

এবার রুদ্রদেব ফিরলো প্রহরীর দিকে, 'দেখো, তুমি মনে কোরো না যে তোমার ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। কোনো নগর বিজয় করার পর সেই নগরের সেনাদের তখনই মুক্তি দেবার কোনো নিয়ম নেই। তোমাকে অন্য সেনাদের সাথে আপাতত বন্দি থাকতে হবে। তারপর সব যাচাই বাছাই করে আমরা বন্দিদের বিভিন্ন শর্তে আস্তে আস্তে মুক্তি দেবো।'

ভয় জাঁকিয়ে বসলো প্রহরীর চোখে, 'কিন্তু, আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন। আমার পরিবারের সাথে দেখা করতে দেবেন।'

'কথা দিয়েছি। আর বচন আমি অবশ্যই রাখবো। তোমার পরিবারকে অক্ষত উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের সাথে এক প্রহর সময় কাটাতে পারবে তুমি কারাগারে যাবার আগে। আর মন খারাপ করবে না। তোমাদের কারাদণ্ড সশ্রম হবে না, পুরোপুরি বিনাশ্রম। এখন এই সৈনিকের সাথে যাও। সে তোমাকে তোমার পরিবারের কাছে নিয়ে যাবে।'

রুদ্রদেবের সাথে আসা সৈনিক প্রহরীকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল। এবার রুদ্রদেব বসে পড়লো অসিতের পাশে।

'কী কথা বলছিলে প্রহরীর সাথে? নিশ্চয়ই অঙ্গদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিলে?'

অসিত কোনো কথা বলে না। অসিতের নীরবতা দেখেই যা বোঝার বুঝে নেয় রুদ্রদেব। অসিত এত কাছে এসে ব্যর্থ হওয়া মেনে নিতে পারছে না। কাজটা একটু কঠিন। আমরা যেখানে লক্ষ্য আছে মনে করি সেখানে পৌঁছে যদি দেখি লক্ষ্যবস্তু যথাস্থানে নেই, তখন হতাশা স্বাভাবিক। তবে হতাশা পাশে ঠেলে দিয়ে নতুন লক্ষ্য স্থির করাই সফলতার শর্ত।

অসিত বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারে না। কথা বলে বুকটা একটু হালকা করতে চায় সে, 'রাহু অঙ্গদকে খুব অযত্নে রেখেছে। ওর গলায় সবসময় শিকল পরিয়ে রাখে। ওকে খাঁচায় বন্দি করে রাখে। জীবনে কখনো এভাবে ছিল না অঙ্গদ। সবসময় স্বাধীন ছিল। কি অত্যাচারটাই না হচ্ছে ওর ওপর।'

'বন্দি অবস্থায় সবার ওপরেই অত্যাচার হয়। অঙ্গদ যে এখন বন্দি অবস্থায় আছে তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের পরবর্তী কাজ হচ্ছে অঙ্গদকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করা।'

'সেটা কীভাবে করবো। রাহু তো চলে গেছে সমুদ্রের দিকে। সেখান থেকে সমুদ্র পেরিয়ে কোথায় যাবে কে জানে। এদিকে তো রাহুর খবর ভাগ্যক্রমে পেয়েছি আমরা। সেদিক থেকে তো খবর পাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। অঙ্গদ চলে গেছে। চিরদিনের মতো।'

'শোনো অসিত, আমি তোমার ভাবনায় বাঁধা দেবো না। কেবল একটা কথাই মনে রাখো, যখন রাহু অঙ্গদকে তোমার গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছিল, তখনো ঠিক এই কথাটাই তোমার গ্রামের লোক বলেছিল তোমাকে। অঙ্গদ চলে গেছে চিরদিনের মতো। তাই না?'

'হ্যাঁ', অসিতের মনে পড়ে যায় আদিনাথ আর অধিকারীর বলা কথাগুলো। তাকে নতুন বানর কিনে আবার নতুন জীবন শুরু করার বুদ্ধি দিয়েছিল তারা। উমা পিসিও তাকে বলেছিল রাঁধাকে বিয়ে করে গ্রামেই থেকে যাবার কথা।

'তাহলে এখনো বলো, তোমার গ্রামের লোকজন কি ঠিক বলেছিল? আসলেই কি অঙ্গদ তোমার সাধ্যের চেয়ে বেশি দূরে চলে এসেছিল?'

'না।'

'হ্যাঁ, মানুষের সাধ্য সবসময় তার চিন্তার থেকে আগানো থাকে। তার চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করে তার চারপাশ, আর সাধ্য তার ভেতরের ব্যাপার। তখন যেমন তোমার গ্রামের লোকদের মনে হয়েছিল, অঙ্গদ তোমার সাধ্যের বাইরে চলে গেছে, আজ তোমার মনে হচ্ছে অঙ্গদ এখন তোমার সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। পরিস্থিতি কিন্তু এখনো তেমন একটা বদলে যায়নি। আশা করি তুমি বুঝতে পারছো।'

অসিত বুঝতে পারছে। কিন্তু সামনে কোনো উপায় না দেখা গেলে মানুষ অসহায় হতে বাধ্য, 'আপনার কথা মেনে নিলাম।'

'নিতেই হবে। মানুষ কখনোই তার সাধ্যের আঁচ ঠিকমতো করতে পারে না। কোনো কঠিন কাজে নামলে ভবিষ্যৎ তাকে বলে দেয় তার সামর্থ্যের ব্যাপারে।'

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন আমার কাজটা এখানে কঠিন?'

'তা তো অবশ্যই। আর জীবনে যে-কোনো দুটোর একটা কাজই করা উচিত বলে মনে করি আমি। এক হলে সব ছেড়ে হিমালয় চলে যাও, আর যদি সংসারে থেকে কাজ করতেই হয় তাহলে কঠিন কাজ করো। এজন্যই অঙ্গদকে খোঁজার জন্য আগামীতে আমাদের যেই পথে চলতে হবে, সেই পথে আমি তোমার সাথে চলবো। আমার লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। এবার তোমার লক্ষ্য পূরণের পালা।'

'আপনার কী লক্ষ্য পূরণ হয়েছে?'

'সেটা একটা গূঢ় ব্যাপার। তুমি এখন বুঝবে না। আর যা পূরণ হয়ে গেছে তা নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই। সামনের বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে।'

'আচ্ছা। ঠিক আছে। এখন আমাদের প্রথম কাজ কী হবে?'

'এইতো তোমার চিন্তা সঠিক পথে চলতে শুরু করেছে। যে-কোনো কাজের জন্যই প্রথম পদক্ষেপ নেয়াটাই সবচেয়ে কঠিন। আর আমরা এই কাজের জন্য তা নিয়ে নেবো। অঙ্গদকে খুঁজতে যেতে হবে। রাহু গেছে জাহাজে করে সমুদ্র পথে। আমাদেরও যেতে হবে জাহাজে করে। তাহলেই ওর পিছু নিতে পারবো।'

অসিত হতাশ দৃষ্টি মেলে তাকালো বন্দরের দিকে। খালি বন্দরের সামনে শুধু নর্মদার জলের টলমল খেলা চলছে। জাহাজ তো দূরের কথা, এখানে একটা নৌকাও নেই। রুদ্রদেবের দিকে তাকালো সে, 'কোথায় জাহাজ?'

রুদ্রদেব মৃদু হাসলো। অসিতের মাথায় কাজ ঢুকে পড়েছে। হতাশা দূর করার এরচেয়ে সহজ উপায় আর হয় না। 'আপাতত এখানে কোনো জাহাজ নেই।'

'তাহলে আমরা কোন জাহাজে উঠে রাহুর পিছু নেবো?'

'এইবার তুমি আসল প্রশ্ন করেছ। যেটা আমার মাথায় আগেই এসেছে। ওদিকে সৈন্যদের খবর নিতে গিয়ে এই ব্যাপারেও জেনে এসেছি। মহারাজ সাতকর্ণীর কাজের সাথে সাথে তো আমাদের কাজও করতে হবে। ওদিকে নর্মদার উজানে দুটো বড়ো বন্দর আছে। একটা মিনাগারা আর আরেকটা উজ্জয়িনি। এই উজ্জয়িনি স্বয়ং শক রাজার রাজধানী ছিল। মিনাগারা বন্দরে বেশকিছু জাহাজ আছে। সেই জাহাজ যাবার সময় তো এদিক দিয়েই যাবে। সেগুলোর একটাতে উঠলেই চলবে। মহারাজ সাতকর্ণী যত তাড়াতাড়ি পারেন এখানে চলে আসবেন বলে মনে হয়। আর এসেই উনি যাবেন উজ্জয়িনি দখল করতে। কোনো রাজ্য সম্পূর্ণ দখল করতে হলে ঐ রাজ্যের রাজধানীর পতন আবশ্যক।'

'তাতে আমাদের লাভ কী হবে? এই বন্দরের জাহাজ যেমন পালিয়ে গেছে, ঐ বন্দরের জাহাজও ওভাবেই পালিয়ে যাবে।'

'সেটার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের জন্য একটা ভালো খবর আছে। রাজভবনের পেছনের নদীতে একটা ছোটো জাহাজের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেটা দিয়েই আমরা এই নদী দিয়ে যাওয়া কোনো জাহাজে উঠে পড়বো।'

অসিতের মুখ কথাটা শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'আরে জাহাজ যখন আছে, তখন সেই জাহাজে উঠে আমরা অন্য জাহাজ ধরার কথা চিন্তা করছি কেন? আমরা নিজেরাই তো ঐ জাহাজে করে সমুদ্র যাত্রা করতে পারি।'

'আমি জানতাম তুমি ঠিক এটাই বলবে। প্রথম কথা হচ্ছে, এটা নদীতে চলার মতো জাহাজ। সমুদ্রের ঢেউয়ের তোড় সামলাতে পারবে না। আর জাহাজ চালানোর মতো লোকজন তেমন নেই আমাদের সাথে। শত্রুর নাবিককে নিয়ে আমাদের রওনা দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত হবে না।'

'তাহলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। মিনাগারা অথবা উজ্জয়িনি থেকে জাহাজ আসার। আর ততদিনে রাহু কত দূরে চলে যাবে কে জানে।'

'শোনো অসিত, মানুষ কখনোই নিজের ভাগ্য পেরিয়ে যেতে পারে না। রাহুর ভাগ্য রাহুকে যেটুকু নিয়ে যাবে রাহু ঠিক সেটুকুই যাবে। আমাদের জন্যও এই কথা সত্য। আমরাও আমাদের ভাগ্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারবো না। মাঝে মাঝে নিজের পরিকল্পনা আর চেষ্টা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। এখন আমাদের সেই সময় এসেছে।'

অসিত বুঝে গেল, এখন আপাতত বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। রুদ্রদেব আর কিছুই বলল না। দূর থেকে এক সৈনিককে আসতে দেখা গেল।

সৈনিক সাতবাহনের। এসে দাঁড়ালো রুদ্রদেব আর অসিতের সামনে, 'একটা ভালো খবর আছে সেনাপতি।'

'বলো।'

'সাতবাহন সেনা নাসিকের প্রান্তরে জয়ী হয়েছে। মহারাজ নাহাপনা মহারাজ সাতকর্ণীর হাতে নিহত হয়েছেন। অবশিষ্ট শক সেনা এখন আমাদের সেনার হাতে বন্দি। মহারাজ সাতকর্ণী তার অবশিষ্ট সেনা নিয়ে এদিকেই আসছেন। বিকেল নাগাদ মনে হয় এখানে পৌঁছে যাবেন। সেনাপতি রিপুজিত খবরটা আপনাকে দিতে বললেন। এই নগরে আসছেন মহারাজ সাতকর্ণী। ওনাকে বরণ করে নেবার ব্যাপার আছে। নানা আয়োজন করতে হবে।'

'হ্যাঁ, তা তো হবেই। ঠিক আছে। তুমি যাও। রিপুজিতকে বলবে আমি একটু বাদেই আসছি।'

'আচ্ছা', ফিরতি পথ ধরলো সেনা।

রুদ্রদেব আর অসিত উঠে দাঁড়ালো। নানাকিছুর জোগাড় করতে হবে। রিপুজিতের এখন সাহায্য দরকার। রুদ্রদেব ভাবছে বিশেষ কথা। সবকিছু রাজপ্রাসাদের ভাঁড়ারে পাওয়া গেলেও এই নগরের রাজনর্তকীদের সন্ধান পাওয়া একটু কঠিন হয়ে যাবে। সে জানে, যুদ্ধে পরাজয় হলে প্রথমেই নগরীর নর্তকীরা হয় জহর ব্রত পালন করে অথবা মহাগুপ্ত স্থানে লুকিয়ে পড়ে। তাদের বিপদের সম্ভাবনাই নগরের পরাজয়ের পর সবচেয়ে বেশি থাকে।

পরাজিত পুরুষদের কেবল মৃত্যুই বরণ করতে হয়, কিন্তু নারীদের সেই মৃত্যুর আগে বিজয়ী পুরুষের পৌরুষও গ্রহণ করতে হয়।

রোমান সাম্রাজ্যের ভিত এই নগরেই আছে। এখান থেকেই বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো রাজ্যের প্রজাদের এবং অনুগত রাজাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। রোমের এই প্রাসাদের জ্বলন্ত মশালগুলোর আলো প্রতি রাতেই যেন আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অর্ধেক পৃথিবী থেকে তেলের জোগান আসছে এই আলোগুলোর জন্য।

সম্রাট ট্রাজান প্রাসাদের ভেতরেই বসে আছেন। এক সময় তিনি পুরো রোমান সেনাবাহিনীর সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন। রোমান সাম্রাজ্য তখন বারোতম সম্রাট নার্ভার কাল পার করছে। প্রথম দুই সম্রাটের পর বেশির ভাগ রোমান সম্রাটেরা ক্ষমতায় বেশিদিন থিতু হতে পারেননি। নিরোর বাঁশি বাজানো আর রোম পুড়ে যাবার পরেও রোমানরা টিকে গিয়েছিল একমাত্র নিজেদের সামরিক শক্তির গুণে। শুধু টিকে থাকা নয়, তারা আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছিল নিজেদের সাম্রাজ্যের সীমান্ত। আর সেই বাড়ানোর পূর্ণ সম্প্রসারণ হয়েছে সম্রাট ট্রাজানের বেলায় এসে।

সম্রাট ট্রাজান আগের সম্রাট নার্ভার পালক পুত্র ছিলেন। পালক পুত্র যে সম্রাটের একজন ছিলেন তা নয়। তবে নিজের পুত্র না থাকা আর বেশ কয়েকজন পালক পুত্র থাকার কিছু সুবিধা রাজ্য আর প্রজারা পায়। নিজের পুত্র থাকলে সেই পুত্রকেই সম্রাট বানাতে হবে। রাজার ছেলে হয়ে জন্মাবার এটাই বড়ো সুবিধা। আর পালক পুত্র থাকলে সেখান থেকে একজনকে যোগ্যতা অনুযায়ী বেছে নেয়া যায় সহজেই। আগের সম্রাট নার্ভার পরের সম্রাট নির্বাচন করতে তেমন কোনো সমস্যাই হয়নি। দক্ষ প্রশাসক এবং সমর বিশারদ ট্রাজানকে সম্রাট করার সিদ্ধান্ত নিতে তাকে দ্বিতীয় বার ভাবতে হয়নি।

নার্ভার ক্ষমতায় আসার তেমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তার আগের মহারাজের খুন যখন হলো তখন রোমান সাম্রাজ্যের উত্তপ্ত আসনে কেউই বসতে চাচ্ছিল না। তখনই পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক নার্ভাকে ক্ষমতায় বসানো হয় সিনেটের দ্বারা। আরও বেশ কিছু দিন হয়তো বাঁচতেন তিনি, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ক্ষমতা লাভ করে সেই চাপেই মনে হয় তার সন্ন্যাসী রোগ হয়, আর তারপরেই জ্বর এসে ষোল মাসেই তার শাসনকাল সাঙ্গ করে দেয়।

ট্রাজান প্রাসাদে বসে বসে সেসব কথাই ভাবছেন। এই ভূখণ্ডে রাজপুরুষদের আততায়ী দ্বারা নিহত হবার ইতিহাস খুব বেশি পুরানো নয়। অনেকদিন ক্ষমতায় থাকার জন্য যে কূটনৈতিক দক্ষতা থাকা প্রয়োজন তা তার আছে। নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকলেও তিনি জানেন অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস মানুষকে অসতর্ক করে তোলে

আর তখনই সুযোগ পেয়ে যায় ক্ষমতা লোলুপ কোনো গোষ্ঠী। যদিও এমন সম্ভাব্য গোষ্ঠীগুলোকে তিনি ভালোভাবেই লালন পালন করছেন তবু সতর্কতায় কোনো খাদ নেই।

রোমান সাম্রাজ্যের আকৃতি তার আমলেই সবচেয়ে বিস্তৃত। তবে এই ভূমি তিনি তার পালক পিতা থেকে পাননি। তিনি নিজেই সেনাপতি হিসেবে পুরো মিশর নিজের অধীনে নিয়ে এসেছেন। গ্রিস তো আগেই ছিল। বলতে গেলে এখন ভূমধ্যসাগরের চারপাশের কোনো জায়গাই রোমান সাম্রাজ্যের আওতার বাইরে নেই।

তার পরে সম্রাট কে হবে? তার নিজের কোনো পুত্র নেই। তার অবশ্য বিশেষ একটা কারণ আছে। বেশ কিছু তরুণ রাজপুরুষের ওপর নজর আছে তার। তাদের মধ্যে একজনকে নিজের পালক পুত্র হিসেবে ঘোষণা দিলেই হবে। কিন্তু সেই সময় এখনো আসেনি। মনে হচ্ছে না স্বাভাবিক উপায়ে তিনি এত তাড়াতাড়ি মারা যাবেন। অবশ্য আততায়ীর হাত থাকলে আলাদা কথা।

রোমান সাম্রাজ্য এত বড়ো হবার পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে। জাত্যাভিমান থাকলে কিছুতেই এত বড়ো সেনা পালন এবং তৈরি করা সম্ভব ছিল না। এটা রোমানরা বেশ ভালোভাবেই জানতো। তাই তাদের মধ্যে ইতালীয় আর ইতালির বাইরের লোকের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য করতে এখন আর দেখা যায় না। রোম সাম্রাজ্যের পরিচয়ই এখন বড়ো। ট্রাজান নিজেও ইতালীয় নন। তিনি ইতালির বাইরের। তবে রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি তার সমর্পণ আর প্রশাসনে তার যোগ্যতা তার সেই পরিচয়কে সিনেটের কাছে প্রাধান্য পেতে দেয়নি।

সিনেটের আড্ডা দেবার একটা জায়গা আছে প্রাসাদের ঘরে। সেদিকেই পা বাড়ালেন ট্রাজান। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করতেই তাকে অনুসরণ করলেন তার দুই দেহরক্ষী। কিছুক্ষণ অভিজাতদের সাথে আড্ডা দিয়ে আসা যাক। একা একা বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না।

অভিজাতদের বিনোদন কামরায় প্রবেশ করতেই অভিজাতরা সম্রাটকে সম্মান জানালো। তাতে অবশ্য অতো আড়ম্বর থাকলো না। ট্রাজান সম্রাট হলেও এখানে যারা আছেন তাদের ক্ষমতাও সাম্রাজ্যে মোটামুটি কম নয়। নিজের জন্য নির্ধারিত আসনে বসে পড়লেন সম্রাট। যোগ দিলেন এদিক ওদিকের কথাবার্তায়। অবারিত ভাবেই রাজনৈতিক আলোচনা চলে এলো আলাপের মাঝে। চলে এলো বললে মনে হয় একটু ভুল বলা হবে, রাজনৈতিক আলোচনাই এই ঘরে চলে বেশির ভাগ সময়।

এক অভিজাতই শুরু করলেন, 'ইহুদিদের নতুন কোনো খবর আছে না-কি আমাদের কাছে? অনেকদিন ধরে ওদের কোনো আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। বেশিদিন চুপ করে বসে থাকার মানুষ ওরা নয়। একসময় ওদের জাতি জেরুসালেমে যুদ্ধ করেই টিকে ছিল। তাদের রাজা ডেভিড ওখানেই স্থাপন করেছিলেন তাদের বাড়ি। সেই ভবঘুরে জাতি থেকে মোটামুটি একটা ভালো রাজ্যে বদলে গিয়েছিল তারা। এখন আমরা আবার তাদের ঘরছাড়া করেছি। আমার মনে হয় সম্রাট টাইটাস জেরুজালেমের শহর আর মন্দির না ভেঙ্গে ফেললেই পারতেন। ইহুদিরা বিতাড়িত হয়েছে নিজের বাসভূমি থেকে। কিন্তু আবার নিজেদের সাজিয়ে নিয়ে মরণ কামড় দিতে কতক্ষণ? ওদের ওপর নজর রাখা দরকার।'

এই ঘরে কেউ কোনো কথা বলবে আর সবার অকুন্ঠ সমর্থন পাবে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। আজও ঘটলো না, আরেক অভিজাত বিরোধিতা করে উঠলেন তীব্র স্বরে, 'না বুঝে কথা বললে মুখ থেকে এমন মতামত বেরিয়ে আসাই স্বাভাবিক। আমাদের সম্রাট টাইটাস অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি তখন ওরকম কঠোর না হলে জেরুজালেম এতদিনে আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেতো। ইহুদিদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলেন তিনি। এখনো ওরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ওদের সব কুকর্মের আখড়াই তো বন্ধ হয়ে গেছে।'

দুই অভিজাতদের পক্ষের লোকজন এবার নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে তর্ক শুরু করলো। ব্যাপারটা ক্রমশ গুঞ্জন থেকে ঝগড়ায় রূপ নিতে শুরু করলো। হাত তুললেন ট্রাজান, মুহূর্তে চুপ হয়ে গেল সভা। এই ঘরে অবশ্য এমন তর্ক নিয়ম বিরুদ্ধ নয়। এখানে সবারই নিজের মত প্রকাশ করার পূর্ণ অধিকার আছে।

'সম্রাট টাইটাস ভুল করেছিলেন না-কি সঠিক কাজ করেছিলেন সেটা এখন বুঝতে পারা সহজ নয়। তখন আমাদের শক্তি অনেক কম ছিল। হয়তো ওদেরকে বাহুবল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ এখন হলে আমরা করতে পারতাম, কিন্তু তখন আমাদের সেনাদলের যে অবস্থা ছিল তাতে অতো বড়ো এক বিপদ ঘাড়ে চাপিয়ে চলা বেশ কঠিন ব্যাপারই ছিল। সেদিক দিয়েও চিন্তা করা যায়।'

সম্রাটের কথায় উপস্থিত কেউই তেমন কোনো আপত্তি করলো না। আসলে সম্রাটদের সমালোচনা করা একটু বিপজ্জনকই বটে, স্বয়ং অভিজাতদের জন্য হলেও। একটু পরে পরিস্থিতি একটু সামলে এলে এক বৃদ্ধ অভিজাত আলোচনায় প্রবেশ করলেন, 'আপনারা তো শুধু ইহুদিদের নিয়েই চিন্তা করছেন, কিন্তু আরেক বিপদ ঘনিয়ে আসছে সেই জেরুজালেমের দিকেই। সেই ব্যাপারে আপনারা কেউ কিছু চিন্তা করেছেন?'

গুঞ্জন উঠলো এবার সভার মধ্যে। সবাই জানতে চাইছে। কী সেই নতু
বিপদ? স্বয়ং সম্রাটও আগ্রহী, 'কী সেই বিপদ? আমার কাছে তো এমন কোনে
খবর নেই।'

'সিজার, এই পৃথিবীতে ধর্মের বাণী সবসময় শান্তি আর সমৃদ্ধির কথা বললে
বাস্তবে তা কখনোই ঘটেনি। এই ইহুদিদের কথাই চিন্তা করুন। ধর্মের ওপর ভিি
করেই তারা তাদের রাজনীতি, যুদ্ধ এসব পরিচালনা করে। শেষ পর্যন্ত থাকে এ
রাজনীতি। ধর্ম, ঈশ্বর আর সেই ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবার ব্যাপারটা ফিকে হয়
যায়। আমাদের ধর্মের ব্যাপারেও একই রকম। আমরা নানা দেবদেবীতে বিশ্ব
আর সেই দেবদেবীদের নামে এই সেদিনও এক নগরের সাথে আরেক নগরের যু
হতো। অথচ সেই দেবদেবীরা হচ্ছেন একজন আরেকজনের পুত্র, কন্যা, পি
অথবা বোন। তাদের এক সঙ্গে স্বর্গে থাকতে তেমন কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু এ
পৃথিবীতে তাদের উপস্থিতি নিয়েই আমাদের সমস্যা।'

'আচ্ছা, বুঝলাম ধর্মের থেকে অনেক সমস্যা হয়। কিন্তু এখন আবার নতু
কোন ধর্মের সমস্যা দেখা দিয়েছে? জেরুজালেম মিশরে তো ইহুদিদের মধে
প্রধান অন্য কোনো ধর্ম অথবা বিশ্বাস নেই।'

'নেই মহারাজ। তবে আমি ছোটোবেলায় একজনের কথা শুনেছিলাম।'

'কার কথা?'

'জিসাস। জিসাস অভ নাজারথ।'

সম্রাট একটু ভ্রুকুটি করলেন, 'হ্যাঁ, ইতিহাসের কোথায় যেন এমন একজ
ধর্মপ্রচারকের কথা শুনেছিলাম। কিন্তু এমন ধর্মপ্রচারক তো ঐ জায়গায় অনে
এসেছে এবং এখনো আসছে। আমরা তো ঐ জায়গাকে ধর্মপ্রচারকদের দেশ বলে
জানি। কিছুদিন পরপরই একেকজন আসেন আর কিছু লোকজন জড়ো কর
কিছুদিন বেশ হইহল্লা চলে।'

'হ্যাঁ, ফাঁকির মাঝে আসল চিনে নেয়া অনেক শক্ত। তবে সেই জিসাস কি
তেমন ছিলেন না। তার মাঝে বেশ কিছু ক্ষমতা থাকার কথা শোনা গিয়েছি
তিনি না-কি মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারতেন, যে-কোনো রোগ সারিয়ে দিত
পারতেন, এমনকি কুষ্ঠও।'

'এমনটা তারা করে। সাজানো নাটক।'

'সাজানো নাটক হলে একসময় ধরা পড়ে যায়। তবে তিনি না-কি কখনো
ধরা পড়েননি। আর তিনি ঐ কাজগুলো লোকের আড়ালে করতেন না। সবা
সামনেই করতেন। আকাশ থেকে খাবার নিয়ে আসতেন তিনি। জলের ওপর দিয়
হাঁটতে পারতেন। এগুলো সব লোকে দেখেছে।'

এবার একজন অভিজাত হেসে উঠলেন, 'সব ধর্মপ্রচারকরাই এসব কাজ করতে সিদ্ধহস্ত। একটু আধটু ভেলকি না দেখালে তাদেরকে লোকে মানবে কেন? কেনই তাদের হয়ে গলা ফাটাবে? পিছু পিছু হাঁটবে?'

সম্রাটও তার কথায় সায় দিলেন, 'ঠিক। এসব জাদুবিদ্যা জানার জন্য ধর্মপ্রচারক হতে হয় না। এমনিতেও শেখা যায়। তার মধ্যে তেমন কোনো বিশেষত্ব যদি থেকেই থাকতো তাহলে এখনো তার অনুসারীরা থাকতো। তার মৃত্যুর পরে এখনো একশো বছর পেরোয়নি। এর মধ্যেই তার অনুসারীদের কোনো নাম গন্ধও নেই। কোনো শক্ত মতবাদ যা কিনা কোনো মহান মানুষের কাছ থেকে এসেছে তা কীভাবে এত তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যেতে পারে?'

সম্রাটের কথার সাথে সায় মেলালো আরেকজন, 'হ্যাঁ। ঠিক কথা। কোথায় তার অনুসারীরা? আমি তো শুনেছি যেই ইহুদিদের জন্য তিনি প্রচারক হয়ে এসেছিলেন সেই ইহুদিরাই তার বিচার করেছে। রোমান শাসকের কাছে আবেদন করে তাকে ক্রুশ বিদ্ধ করেছে। আর তার প্রাণ নাশের সাথে সাথেই শেষ হয়েছে সবকিছু। শেষে জেরুজালেম ধ্বংস হবার পরে ইহুদি ধর্মগুরুদের দৌরাত্ম্য কমে এসেছে অনেকটা।'

সেই বৃদ্ধ অভিজাতের মুখ এখনো ভাবলেশহীন, 'হ্যাঁ, ইতিহাস বলে এমন ধর্মপ্রচারকদের কাজ মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আপনারা কি জানেন, তার প্রভাব মৃত্যুর পরেও শেষ হয়নি। তিনদিন সূর্য ওঠেনি জেরুজালেমে। এমনকি তার মৃত্যুর পর তার দেহ যেই সমাধিতে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে তা উধাও হয়ে গেছে। তিনি বেঁচে থাকতে বলে গিয়েছিলেন, মৃত্যুর তিনদিনের মাথায় তিনি পুনরুত্থিত হবেন। আর কেউ কেউ বিশ্বাস করে ঠিক তাই হয়েছে।'

এবার অভিজাতরা সবাই মোটামুটি জোরে হেসে ওঠে। সম্রাটও যোগ দেন হাসিতে, 'আচ্ছা, সেই ইতিহাসের গল্প থাক। সেই মৃত্যুর পরে আবার জীবিত হওয়া লোক এখন কোথায় আছে? আর তার থেকে কি বিপদ হতে পারে জেরুজালেমে?'

' তিনি এখন আর পৃথিবীতে নেই সম্রাট। বারো জন শিষ্যের ওপর সব ভার দিয়ে তিনি স্বর্গে চলে গেছেন। সশরীরে। এখন জেরুজালেমে সেই বিপদই ঘনিয়ে এসেছে। খুব কম হলেও তার বেশকিছু অনুসারী এখনো রয়ে গেছে। তার মতবাদ যে একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেছে, সম্রাট এবং আমাদের এই ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়। কিছু মানুষ এখনো ধারণ করে রেখেছে তার বাণী, তার উপদেশ।'

'তাই না-কি। এরা কোথায় থাকে?'

'সম্রাট, আমি যতটুকু জানি ইহুদিদের অত্যাচারের কারণে এরা কোনো নগরে অথবা গ্রামে থাকতে পারছে না। এরা থাকে বিরান প্রান্তরে, মরুভূমিতে।

গুটিকয়েক লোক চেষ্টা করছে টিকে থাকতে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তাদের মতবাদ ছড়িয়ে দিতে। গসপেল রক্ষা করছে তারাই। এরা এতটাই লুকিয়ে রাখে নিজেদের যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। ইহুদিরা অবশ্য পেলেই মেরে ফেলে। ঐ যে বললাম নিজের ধর্ম রক্ষার জন্যই মানুষ সবচেয়ে বড়ো বড়ো অধর্ম গুলো করে।'

এবার আর কেউ কোনো কথা বলছে না। বৃদ্ধ অভিজাত তাকিয়ে আছেন স্বয়ং সম্রাটের দিকে, 'একবার ভাবুন মহারাজ। এই মতবাদ কি এত সহজে হারিয়ে যাবে? আমার তা মনে হয় না। আর যদি একবার এই মতবাদ যথেষ্ট অনুসারী পায় তবে তো বড়ো ধর্মীয় শক্তি হয়ে যাবে। আর তারপরেই হবে সামরিক শক্তি। বিপদ তো আসবেই। আমার তো মনে হয় এই মতবাদ দিয়েই পৃথিবীতে আগামীতে বড়ো বড়ো যুদ্ধ হবে। তাই একটু সতর্ক থাকতে হবে আমাদের।'

সম্রাট ট্রাজান উঠে দাঁড়ালেন, ' আচ্ছা। এখন থেকে এই বিশেষ মতবাদের অনুসারীদের ওপরেও আমার নজর থাকবে। আপনারা সবাই আলোচনা চালিয়ে যান। আমি এখন অন্দরে যাবো।'

সবাই আবার সম্মান প্রদর্শন করলেন। সম্রাট চলে এলেন অন্দরে। সম্রাটের স্ত্রী মানে সম্রাজ্ঞীকে অন্দরের একেবারে সামনেই পাওয়া গেল। পম্পিয়া সম্রাটকে দেখে মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুললেন। সম্রাট একবার তাকালেন স্ত্রীর দিকে। পম্পিয়ার শরীরে লাবণ্য এবং বাঁকের কোনো অভাব নেই। কিন্তু সেদিকে কোনো আকর্ষণ বোধ করলেন না তিনি। আসলে কখনোই করেন না।

হ্যাঁ, কখনোই নিজের স্ত্রীর শরীরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন না সম্রাট ট্রাজান। নিজের পুত্র না থাকার সেটাও একটা কারণ। যৌনতা হয়ে ওঠে না কখনোই তাদের মাঝে। তবে পম্পিয়ার শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের ভেতরের যৌন ইচ্ছে জেগে উঠলো তার। অন্দরের দিকে পা বাড়ালেন তিনি। হারেম সেখানেই।

পম্পিয়ার গলা দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। না, তিনি কোনোভাবেই রাজপুত্রের মা হতে পারবেন না। সম্রাট পুরুষকামী। তিনি জানেন এখন সম্রাট কোথায় যাচ্ছেন। তিনি নিজেও পিছু পিছু গেলেন। এই অন্দরে সব দাসদাসী। একমাত্র তারা দুজনেই মালিক। সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীরই কেবল এখানে যে-কোনো জায়গায় যাবার অনুমতি আছে। পুরুষ দাসদের হারেমের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলেন পম্পিয়া।

যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরের দৃশ্য স্পষ্ট দেখতে পেলেন তিনি। একজন দাস, সম্রাটের পুষ্ট দেহের কবলে পড়ে বেঁকে

যাচ্ছে, ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে তার চোখমুখ। কিন্তু যন্ত্রণাকাতর কোনো শব্দ সে করতে পারছে না, যদি সম্রাটের কোনো বিরক্তি উৎপাদন হয়। প্রাণ যাবার চেয়ে এটুকু ব্যথা সহ্য করা ভালো। পম্পিয়া বেশ কিছুক্ষণ অবলোকন করলেন সম্রাট আর আরেক পুরুষের এই কামকেলি।

আস্তে আস্তে তার নিঃশ্বাসের ওপর থেকে তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাতে লাগলো। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ঘন হতে লাগলো তার নিঃশ্বাস। শরীরের রক্তে দেখা দিলো জোয়ার। কতই বা আর বয়স হয়েছে পম্পিয়ার। এখনো শরীরের চামড়া টানটান, কোনোকিছুতেই বয়সের ঝুলে পড়া ভাব প্রকাশ পায়নি। নিজের স্বামী সম্রাটের অনাগ্রহের কারণে এখনো অনেককিছুই অনাঘ্রাতা। না, আর পারা যাচ্ছে না। সরে গেলেন তিনি পুরুষ দাসদের হারেমের সামনে থেকে।

সম্রাট পুরুষকামী। সেই হিসেবে কিন্তু সম্রাজ্ঞী পম্পিয়া নারীকামী নন। তিনি পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং বেশ ভালো ভাবেই হন। তার নিজের কামরার কাছে চলে এলেন তিনি। এখানেই পাহারা দিচ্ছে দুজন পাহারাদার। দুজনের চেহারাই পরখ করে নিলেন তিনি এক নিমেষে। একজনকে চিনতে পেরেছেন। লোকান। আগেও এমন অবস্থায় সম্রাজ্ঞীর আদেশ পালন করেছিল সে। লোকানের ঘাড়ে ডান হাত দিয়ে পূর্ণ চাপ দিলেন তিনি। নিজের সাথে টেনে নিয়ে চললেন ঘরের ভেতরে।

লোকান ভালো করেই জানে তাকে এখন কী করতে হবে। একই সাথে বেশ আনন্দদায়ক এবং বিপজ্জনক কাজ করতে হবে তাকে। একটু ভুলচুক হলেই ধরের ওপরে মাথাটা আর আস্ত থাকবে না। এই কাজে সে একটাই নিয়ম জেনে এসেছে। নিজের থেকে কিছু করাই যাবে না। সবই করতে হবে সম্রাজ্ঞীর আজ্ঞায়। তবে সমস্যা একটাই। সম্রাজ্ঞী যখন কামকলায় মগ্ন হন, তখন তাকেও হতে হয়। কামের প্রভাবে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। শরীর মনের কথা শোনে না, বিবেকের কথা শোনে না। তখন কোনো ভুল হয়ে গেলেই সমস্যা।

পম্পিয়ার এত কিছু চিন্তা করতে হচ্ছে না। তার শরীরে কামের আগুন জ্বলছে। একটু আগের সম্রাটের কামকেলির দেখে আসা দৃশ্যটা কিছুতেই মন থেকে মুছে যাচ্ছে না। এক ঝটকায় নিজের শরীরকে পোশাক মুক্ত করলেন তিনি। তারপর তাকালেন লোকানের দিকে। তার চোখে যেন আগুন জ্বলছে। ভয় পেয়ে গেল লোকান। হিসহিসিয়ে উঠলেন পম্পিয়া, 'সব কাপড় খুলে তাড়াতাড়ি বিছানায় আয়।'

লোকান মুহূর্তে সেই আদেশ পালন করলো। নিজের অস্ত্র আর যুদ্ধ সাজ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে উঠে এলো বিছানার ওপরে। লোকানের বিবস্ত্র ব্যায়ামপুষ্ট শরীর

দেখে জিভে জল চলে এলো পম্পিয়ার। মনে পড়ে গেল আগেরবারের স্মৃতি। বে ভালোই দম আছে এই সৈন্যের।

'বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়।'

এবারও বিনা দ্বিধায় আদেশ পালন করলো লোকান। তার পুরুষ শরীর এখ কামকেলির জন্য সম্পূর্ণ তৈরি।

পম্পিয়া উঠে বসলেন লোকানের শরীরের ওপর। ঠিক যেভাবে মাঝে মাঝে নগরের বাইরে বেড়ানোর সময় নিজের ছোটো পনির ওপর চেপে বসেন তিনি সাথে সাথে তার কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এলো একটা আপাত তৃপ্তির হাহাকার। তারপ চলতে লাগলো মৈথুন।

লোকান ভীষণ চমকে উঠছে নিচে থেকে। নিজে ওপরে থাকলে নিয়ন্ত্রণ থা যায় স্নায়ুর ওপর। তার কিছু কৌশল আছে, কিন্তু এখন সে এই কামকলা নিয়ন্ত্র করতে পারছে না। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্রাজ্ঞীর হাতে। আর এভাবে এমন এক মোহনীয় শরীরের নিচে পুরুষ বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না, সেটাই নিশ্চিত।

নিজের অবস্থায় পেতে থাকা ভয় আস্তে আস্তে আতংকে পরিণত হচ্ছে লোকানের। দেহের আন্দোলন বন্ধ হবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না সম্রাজ্ঞী মাঝে। ওদিকে তার তো অন্তিম সময় উপস্থিত। এমন অবস্থায় সম্রাজ্ঞীকে থামা বলার সাহস তার নেই। সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলো। প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে, আটকে রাখতে।

ওদিকে কামের চরমে উঠে গেছেন সম্রাজ্ঞী পম্পিয়া। তার যেন দিকবিদি কোনো জ্ঞানই নেই। কারো সাথে কামে লিপ্ত হলেই তার মনে পড়ে তার প্রথ প্রেমিকের কথা। যে বিয়ের অনেক আগেই হরণ করেছিল তার কুমারিত্ব। সে প্রেমিকের উষ্ণ ছোঁয়ার স্মৃতি মাথায় আসতেই যেন উন্মত্ততা আরও বেড়ে গে তার। শরীর আন্দোলিত হতে লাগলো আরও তীব্র গতিতে।

ঠিক তখনই নিজের ভেতরে পুরুষ রসের ছোঁয়া অনুভব করলেন সম্রাজ্ঞী সাথে সাথে বুঝতে পারলেন কী হয়েছে। তার দাস সৈনিক তার অনুমতি ছাড়া নিজের চরম মুহূর্তে পৌঁছে গেছে। তার অণু ছড়িয়ে দিয়েছে সম্রাজ্ঞীর মধ্যে নিজের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠলো পম্পিয়ার। কেন, তা ঠিক জানা নেই অবৈধ সন্তান চলে আসতে পারে সেই চিন্তায়ও হতে পারে, আবার দাসের কীভা আদেশ ছাড়া কাজ করার সাহস হয়, এটা চিন্তা করেও হতে পারে।

লোকানের ওপর থেকে উঠে পড়লেন পম্পিয়া। বিছানার কাছে থাকা টেবিলে ওপর একটা ছুরি রাখা ছিল। লোকান নিজের ছুরি খুলে এখানেই রেখেছিল পম্পিয়া কোনোদিকে একটুও না তাকিয়ে সেই ছুরি তুলে আমূল বসিয়ে দিলে

লোকানের বুকে। রক্তের তোড়ে পম্পিয়ার মুখ আর বুক ভেসে গেল। একেবারে হৃদপিণ্ডে গেঁথে দিয়েছেন তিনি ছুরিটা। একটু কেঁপে উঠেই নিথর হয়ে গেল লোকান। একটু আগেই চরম সুখ পেয়েছিল সে, এবার চরম শাস্তি।

তখনই ঘরে প্রবেশ করলেন সম্রাট ট্রাজান। তিনি একটু আগেই ঘরের দরজায় এসেছেন, এতক্ষণ দেখছিলেন পম্পিয়ার কামকলা। মৃদু স্বরে বললেন, ' ওকে এভাবে না মারলেও পারতে। আমার দলের অনেক ভালো প্রহরী ছিল।'

পম্পিয়া একটা জোরালো শ্বাস টানলো, 'আমার দলেরও।'

পম্পিয়া আর কোনো কথা বললেন না। তাকালেনও না সম্রাটের দিকে। নিজের দেহ পরিষ্কার করার জন্য সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় প্রবেশ করলেন পাশের জলঘরে।

আজ বিকেলে ইভান অনেকদিন পর দ্বন্দ্বে হেরে গেল। ক্রিস্ট এয়ারের একজনের সাথে আজ খালি হাতের দ্বন্দ্ব চলছিল তার। সেখানেই প্রথমে প্রতিপক্ষের একটা মুষ্টির আঘাতে ঠিক তার নাকের নিচের অংশ ফেটে গেল। রক্তও বেরিয়ে এলো একটু। দ্বন্দ্বে নামলেও আজকে মন অন্যদিকে ছিল ইভানের। তবে নাক ফেটে রক্ত বেরোতেই তার চেতনা ফিরে এলো। সামনের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ক্রোধ অনুভব করলো সে। না, নাক ফেটে গেছে এই কারণে নয়, আজ রাতে তার চেহারার অবস্থা তো একটু হলেও খারাপ হয়ে গেল। অথচ আজ রাতেই তার চেহারার সৌন্দর্য এই জীবনের জন্য সবচেয়ে বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ওরিয়ন রঙ্গক্ষেত্রের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। অবাক হয়ে দেখেছে ইভানের নাকে মুষ্ট্যাঘাত। গেল গেল রব করে উঠলো সে।

ইভান একবার তাকালো তার দিকে। তারপর সামনের প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে নজর দিলো। প্রতিদ্বন্দ্বী এখন আত্মবিশ্বাসে টগবগ করে ফুটছে। সেটাই স্বাভাবিক। খালি হাতের যুদ্ধে যার কাছাকাছি আসাও প্রায় অসম্ভব সেই ইভানের নাক সে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছে।

এবার দুজন দুজনকে সামনে রেখে বৃত্তাকারে ঘুরছে। ইভানের চোখে হালকা ভাব। খুব একটা সতর্ক বলে মনে হচ্ছে না তাকে। সামনের যোদ্ধা এগিয়ে এলো। আক্রমণ করলো প্রচণ্ড লাথিতে।

খুব সহজে কাজটা করলেও কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন ইভানের হাতে। এক ঝটকায় ধরে ফেললো সে প্রতিদ্বন্দ্বীর পা। তারপর একটু টান দিতেই যোদ্ধা ভূপাতিত হলো। সময় দিতে নারাজ ইভান। প্রতিদ্বন্দ্বীর পিঠে চড়ে বসলো সে। তারপর গলায় একটা শক্ত প্যাচ কষল। হালকা শক্তি প্রয়োগ করলেও এই প্যাচ খুব মারাত্মক। ক্ষতি কিছুই হবে না, আবার প্রতিদ্বন্দ্বী ছুটতেও পারবে না।

নিচে পড়ে থাকা প্রশিক্ষণার্থী এবার বুঝতে পারলো, ইভানের নাকে আঘাত করে তেমন ভালো কিছু করেনি সে। ইভান একটু চাপ বাড়ালেই তার কাঁধের হাড় ভেঙ্গে যাবে। সে তাড়াতাড়ি মাটিতে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলো। তাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ইভান। প্রতিদ্বন্দ্বীকেও উঠতে সাহায্য করলো। মৃদু হাসি তার ঠোঁটে, ' ঘুসিটা বেশ জোরেই মেরেছিলে ভাই। নাকটা এখনো টনটন করছে।'

প্রতিদ্বন্দ্বী কিছুই বলল না। তার চোখে কৃতজ্ঞতা। কাঁধের হাড় ভাঙলে এক মাস কষ্ট সহ্য করতে হতো। সাধারণ চিকিৎসা হয় না তাদের। তাদেরকে

চিকিৎসার সময়েও কষ্ট সহ্য করতে হয়। ইভান যদি তার হাড় ভেঙে দিত তাহলে তার কোনো দোষ হতো না। এমনকি মেরে ফেললেও হতো না। ইভান তাকে দয়া করেছে। যদিও এটাই প্রথম বার নয়। ইভান অনেককেই দয়া করে রঙ্গভূমির নরম বালির ওপরে। তার কাছে লড়াই ব্যাপারটা যেন ঠিক লড়াই নয়, একটা মজাদার খেলা।

ইভান রওনা দিলো নিজের তাবুতে। ওরিয়ন এসে যোগ দিলো তার সাথে। ইভান হাঁটতে হাঁটতে ওরিয়নের দিকে তাকালো, 'তোমার এই কুৎসিত চেহারাটা আমার কাছে এত ভালো আর কখনোই লাগেনি। কাজ হয়েছে?'

প্রশ্ন এড়িয়ে গেল ওরিয়ন, 'কাজের কথা পরে হবে। কী বললে? আমার চেহারা কুৎসিত। তোমার উচিত এই মন্তব্য করার আগে নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় দেখা। নাকের যা অবস্থা হয়েছে।'

আজকে রাতে ঐ মেয়েটার সাথে দেখা হবার কথা আছে তার। হয়তো নাও হতে পারে। হয়তো খরগোশ নিতে ঐ পরিচারিকাই আসবে। কিন্তু তবু নিজের চেহারার যত্ন নেয়া উচিত ছিল। এখন ওরিয়নের কথা শুনে তো বোঝাই যাচ্ছে নিজের চেহারার অবস্থা। প্রসঙ্গ বদলালো ইভান, ' আমার নাকে নাক গলানো বন্ধ করো। তোমার কাজ কতটুকু হয়েছে। আজকে রাতেই যেতে হবে কিন্তু।'

'হ্যাঁ, কাজ হয়েছে। তাবুতে চলো। গেলেই দেখতে পাবে।'

তাবুতে এলো দুজনে। এক কোণায় অস্ত্রসস্ত্রের ভিড়ে একটা কাপড়ে ঢাকা কি যেন আছে। সেদিকেই আঙুল তুলল ওরিয়ন, 'এই যে তোমার বাদামি খরগোশ।'

ঢাকনাতে হাত দিতে গিয়েও থেমে গেল ইভান, 'এখানে যদি জীবন্ত খরগোশ থাকে তো কোনো আওয়াজ কেন করছে না? মরে গেল না-কি?'

'আরে না জীবিত আছে। মুখ বেঁধে দিয়েছি। এজন্য কোনো আওয়াজ করতে পারছে না।'

ইভান অধৈর্য হয়ে ঢাকনা তুলল। সাথে সাথে নিচে থেকে একটা বিশ্রী আওয়াজ ভেসে এলো। তড়িৎ গতিতে হাত সরিয়ে নিয়েছে ইভান।

একটা ইঁদুরের ফাঁদ ছিল ঢাকনার নিচে। ইভানের সাথে রসিকতা করেছে ওরিয়ন। ইভানকে অপ্রস্তুত হতে দেখে এবার হো হো করে হেসে উঠলো সে। ইভানকে জব্দ করতে পেরে তার ভারি আমোদ হচ্ছে।

ইভানের চেহারায় অপ্রস্তুত রাগ, 'এটা কি রসিকতা করার সময়? তোমাকে না বলেছি, ঐ খরগোশ ফেরত না দিলে আমাদের কাজের কথা বাইরে প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। আর তা করতে হবে আজ রাতেই। তুমি কি বাদামি খরগোশ জোগাড় করতে পারোনি?'

ইভানের চেহারায় তীব্র জিজ্ঞাসা। ইভানকে আর অন্ধকারে রাখা ঠিক হবে না। ওরিয়ন তাকে অভয় দিলো, 'খরগোশ ধরা পড়েছে। আচ্ছা আগে বল তোমার কী হয়েছে?'

' আমার আবার কী হবে?' ইভানের চেহারা থেকে এখনো অপ্রস্তুত ভাব যায়নি।

'সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না। তোমার মাথা আর শরীর সমান চলে, তুমি কীভাবে এতো বোকা হলে? আমি এই শিবিরের মাঝে খরগোশ নিয়ে আসবো এটা তুমি বিশ্বাস করলে কী করে?'

ঠিকই তো। এই শিবিরে খরগোশ নিয়ে আসা মোটেও নিরাপদ নয়, 'তাহলে খরগোশ তুমি কোথায় রেখে এসেছ?'

'রেখেছি নিরাপদ জায়গায়। চিন্তা কোরো না। এখন এসব বাদ দিয়ে আসো কিছু খরগোশের মাংসের সদ্‌ব্যবহার করা যাক।' একটা পৌটলা বের করলো সে কোমরের লুকানো খোপ থেকে।

এক বড়ো কামড় বসালো ইভান, 'খরগোশ নিয়ে আসলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে আর মাংস নিয়ে আসলে কিছুই বলা হবে না, এই ভাবনা তোমার মাথায় এলো কী করে? তোমার বুদ্ধিও দেখি দিন দিন পাকছে।'

'আরে বন্ধু, খরগোশের মাংস তো আর আওয়াজ করতে পারে না।'

' কিন্তু গন্ধ তো ছড়াতে পারে।'

'এজন্যই তো তাড়াতাড়ি সাবাড় করে দিতে হবে।' আরও বড়ো কামড় বসাতে লাগলো ওরিয়ন, 'তারপর মুখটা ভালো করে ধুয়ে ফেললেই হলো।'

দেখতে দেখতে খরগোশের মাংস নিঃশেষ হয়ে গেল। ওরিয়ন এবার বলতে লাগলো নিজের কাজের কথা, 'মোট বারোটা ফাঁদ পেতেছিলাম। তার মধ্যে তিনটায় খরগোশ ধরা পড়েছে। একটা বাদামি। বাকি দুটো তো আর কোনো কাজে আসবে না। তাই পেটে চালান করে দিলাম।'

ইভানের মুখে একটু চিন্তা দেখা দিলো, 'কী বললে? বাদামি খরগোশ মাত্র একটা পেয়েছ? কিন্তু আমরা তো দুটোর কথা দিয়েছিলাম।'

'আমার কোনো দোষ নেই। চেষ্টা তো করেছি। বাদামি খরগোশ তো আর যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। দুই দিন ধরে অনেক কষ্ট করে একটা ধরতে পেরেছি। এখন চলো, খরগোশের কাছে যাওয়া যাক। একটু পরেই সন্ধ্যা হয়ে আসবে। তখন আবার ফিরে আসতে হবে শিবিরে। তোমার তো খরগোশ না দেখে মনে শান্তি আসছে না।'

'ঠিক বলেছ। চলো যাওয়া যাক।'

ওদিকে স্পার্টার অভিজাত অ্যালেস্টরের বাড়িতেও একই সন্ধ্যার আলো পড়ছে। প্রাসাদসম সেই বাড়ির ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বাড়ির মালিকের একমাত্র

কন্যা। কন্যাসুন্দর আলো এই মেয়ের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য তা না করলেও তেমন ক্ষতি ছিল না। তার চন্দ্র সৌন্দর্যের আভা বাড়িয়ে দেবার জন্য সূর্যের পড়ন্ত আলোর সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই।

ইনোন ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাদের ওপরে। আনমনে। কোনদিকে হাঁটছে, কেন হাঁটছে কিছুই সে জানে না। তার মনে শুধু দুই দিনের আগের ঘটনাটাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই দুই যুবক। দুজনেরই সুঠাম দেহ, তবে সেই যে কোঁকড়া সোনালি চুলের যুবক, তার চেহারাটা কোনোমতেই চোখের সামনে থেকে দূর হচ্ছে না। জোর করে সরাতে চাইলে যেন মনের চাদরে আরও চেপে জড়িয়ে যায়। সেদিন ঐ ছেলেটা তার নাম জানতে চেয়েছিল। বললে কী হতো। কেন যে এতটা সংকোচ চলে এসেছিল তার মনে।

যুবক বলেছিল তাকে বাদামি খরগোশ দেবে। তাকে নিজের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে আসাটা বোকার মতো কাজ হয়ে গেছে। আসলে সেই সময়ে সে এমন হকচকিয়ে গিয়েছিল যে মিথ্যে বলার অথবা লুকাবার কথা মাথায় আসেনি। তার ওপর ঐ গাধা ভোরা প্রথমেই তার বাবার পরিচয় নিয়ে গর্ব করা শুরু করলো। কিন্তু আসলেই কি সে লুকাতে চাইছিল? সে কি আসলেই হকচকিয়ে গিয়েছিল। না-কি তার মন অবচেতনে চাচ্ছিল যুবককে ঠিকানা দিতে?

নিজের বাবার কাছে সব ফাঁস হয়ে যাবে এই ভয় আর পাচ্ছে না সে। যুবক নিশ্চয়ই আসবে না। কেন আসবে? এমন বোকার মতো ধরা দিতে কি কেউ আসে। কে ওরা? দুজনেই হয়তো ভবঘুরে অথবা চোরা শিকারি। এই নগরে এসে সৈনিকদের সাথে ঝামেলা পাকাবার ঝুঁকি কেন নেবে ঐ যুবক। নিজের বচনের জন্য অমন কাজ ঐ যুবক নিশ্চয়ই করবে না।

যুবক আসলে অনেক ঝামেলা হতে পারে। প্রহরী তাকে ধরে ফেলে জেরা করতে পারে। তার বাবার হাতে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না। তিনি জেনে যাবেন ওরা লুকিয়ে নগরের বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল এবং মাঝে মাঝেই ওরা এই কাজটা করে। যুবক আসলে এত ঝামেলার সম্ভাবনা, তবু যুবক আসবে না এই ভাবনাটা মনে আসতেই ইনোনের মনটা ভারী হয়ে আসছে। ওমা, কি আশ্চর্য, তার চোখেও যেন একটু জল চলে এসেছে। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে নিলো সে। কেউ দেখে ফেললে নতুন ঝামেলা শুরু হবে।

আচমকা সে লক্ষ্য করলো, চারিদিকে আঁধার গাঢ় হয়েছে। এখন আর ছাদে থাকা যাবে না। সে নেমে গেল নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে। যাবার আগে শেষ বার তার বাড়িতে আসার রাস্তাটার দিকে নজর বোলাল। সন্ধ্যের এই ক্ষণে সেই রাস্তা পুরোপুরি জনমানবশূন্য।

ওদিকে ইভানের সান্ধ্যকালীন যুদ্ধ শিক্ষা শেষ হয়েছে। এখন রাতে আর কোনো কাজ নেই। কাল একেবারে কাক ভোরে আবার শুরু হবে সমর শিক্ষা।

এবার নিজের কাজে মন দিলো সে। ওরিয়নের কাছ থেকে বুঝে নিলো খরগোশ শিবিরে এখন তার খোঁজ পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর যদি কেউ খোঁজ করেও তাহলে অজুহাত দেবার জন্য ওরিয়ন তো আছেই। বলে দেবে সে গেছে অন্ধকারে জঙ্গলে চলাচলের দক্ষতা বাড়াতে। মাঝে মাঝেই ক্রিস্ট এয়ারের শিক্ষার্থীরা এই কাজে রাতে জঙ্গলে যায়। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।

খরগোশ ভালো করে চেপেচুপে কাপড়ে জড়িয়ে নগরের দিকে রওনা দিলো ইভান। নগরে তাদের যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ হলেও এই নগরের অলিগলি তার সবাই চেনে। ক্রিস্ট এয়ারের সবাইকে নগরের অলিগলি, গুরুত্বপূর্ণ ঘরদোর, গভর্নরের প্রাসাদ এসব অবস্থান জানতে হয়। মাঝে মাঝে তাদেরকে মানচিত্র আঁকার পরীক্ষাও দিতে হয়। অভিজাত অ্যালেস্টরের বাড়ি খুঁজে বের করতে তার তেমন কষ্ট করতে হবে না। এর মধ্যেই সেই বাড়ির অবস্থান মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়েছে সে। কাউকে জিজ্ঞেস করে নিলেই চলবে।

কোথায় জিজ্ঞেস করতে হবে তাও জানে ইভান। নগরে প্রবেশ করতে তার তেমন কোনো সমস্যাই হলো না। ছদ্মবেশে ক্রিস্ট এয়ারের বাচ্চা ছেলেরাও বেশ পাকা। সে কালো পোশাকে নিজেকে ভবঘুরে সাজিয়ে ঢুকে পড়েছে। প্রবেশ করতে তাকে সদর দরজাগুলো ব্যবহার করতে হয়নি। অনেকগুলো গোপন পথ আছে এই নগরে ঢোকার।

নগরে ঢুকেই সে সোজা চলে গেল পানশালায়। এখানে নগদ মুদ্রা না থাকলে টিকে থাকা একটু মুশকিল। ইভানের কাছে জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, সমর শিক্ষা আছে, তবে এই একটা জিনিসেরই ভীষণ অভাব। তার কাছে কোনো মুদ্রা নেই। তবে এই পানশালায় মুদ্রা উপার্জনের কৌশল জানা আছে তার। শক্তি আর বুদ্ধি এক হলে সবই সম্ভব।

পানশালায় মুষ্টি খেলায় বাজি ধরা হয়। ইভান কয়েকবার নিজের পরিচয় না দিয়ে খেলেও গেছে। তবে আজ আর খেলার সময় নেই। রাত আস্তে আস্তে গভীর হয়ে আসছে। টেবিলের এক কোণায় বসে পড়লো সে। তার দিকে কেউ তাকালো না। এখানে কারো যদি কিছু লাগে সে পানশালার মালিকের কাছে যাবে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। আরেকজন এসে বসলো ইভানের পাশে। ইভান তার দিকে সাবধানে তাকাল। তারপর মৃদু কণ্ঠে কেঁদে উঠলো। পাশে বসা লোকটা তাকাল ইভানের দিকে। এক ভবঘুরে কাঁদছে।

'কী ব্যাপার বাপু, তুমি কাঁদছ কেন?'

ইভান চট করে কোনো জবাব দেয় না। শুধু কান্নার তীব্রতা আরেকটু বাড়িয়ে দেয়।

'আরে বল না কী হয়েছে? ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদলে এই জগতের কোনো সমস্যার সমাধান হয় না।'

দার্শনিক লোকের দিকে তাকাল এবার ইভান। চেহারা যথাসম্ভব আড়াল করেই, 'আমি এই নগরে এসেছি আজকে। কিছুই চিনি না। আমার গ্রাম থেকে একজন আমার অনেক মুদ্রা ধার নিয়ে এসেছে। অনেকদিন হয়ে গেছে, সে এখন আর গ্রামে যাচ্ছে না। ওদিকে মুদ্রার অভাবে মহাজন আমার ঘরবাড়ি কেড়ে নিচ্ছে। আজ সারাদিন আমি তাকে অনেক খুঁজেছি। কিন্তু পাইনি।'

'আরে এত বড়ো নগরে কি কাউকে এমনি এমনি খুঁজে পাওয়া যায় না-কি?'

'যায় না?'

'না বাপু। তার তো একটা ঠিকানা থাকতে হবে।'

'ঠিকানা তো একটা আছে। কিন্তু সেই কথা তো সারাদিনেও আমার মাথায় আসেনি।'

' ঠিকানাটা বলো দেখি।'

'অভিজাত অ্যালেস্টরের বাড়ি। এটুকুই জানি। আর কিছু না।'

'ও আচ্ছা, অভিজাত অ্যালেস্টরের বাড়ি। দেখলে, মাথায় বুদ্ধি না থাকলে মানুষের কি দুর্গতি হয়। সকাল থেকে এই ঠিকানা ধরে খুঁজলে কবেই পেয়ে যেতে সেই বাড়ি আর তোমার মুদ্রা।'

'আপনি চেনেন অ্যালেস্টরের বাড়ি?'

'হ্যাঁ, এখান থেকে একেবারে কাছে। পানশালা থেকে বেরিয়ে সোজা যে রাস্তা গেছে সেটা একটা চৌরাস্তায় গেছে। সেই চৌরাস্তার ডানদিকের রাস্তায় গেলেই অ্যালেস্টরের বাড়ি। বাড়ির দরজায় এথেনার একটা মূর্তি আছে। এথেনার মূর্তি চেনো তো? ধর্মে মতি আছে, না-কি মতি অনেক আগেই ভ্রষ্ট হয়ে গেছে?'

'না চিনবো। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

কাজ শেষ। পানশালা থেকে বিনা পানেই বেরিয়ে এলো ইভান। একটু মদ খেতে পারলে খারাপ লাগতো না। অনেকদিন হয়ে গেছে মদ চেখে দেখা হয়নি।

বাতাস যে একটানা বইবে সেই সম্ভাবনা নেই, আর সেই আশাও এই জাহাজের প্রধান নাবিক করে না। বাকি নাবিকেরা সবসময় নজর রাখে বাতাসের দিকে। পাল আর হাল দুটোর নিয়ন্ত্রণই নির্ভর করে এই বাতাসের থেমে যাওয়া অথবা গতিপথ বদলে যাবার ওপর।

এখন মাঝ সমুদ্রে বাতাস একেবারেই নেই। প্রধান নাবিক হাল ধরেছে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইছে জাহাজ সঠিক পথে যাচ্ছে কি না। কাজটা করতে তেমন কোনো বেগ পেতে হচ্ছে না তাকে। অনেকদিনের অভিজ্ঞতায় সহজেই জাহাজকে একেবারে লক্ষ্যের দিকে স্থির রেখেছে।

এই জাহাজে অভিজ্ঞ নাবিক কম নেই। এটা একটা বাণিজ্য জাহাজ। তবে এই জাহাজের প্রধান নাবিকই ব্যবসায়ী। আর বাকি নাবিকেরা খালাসির কাজ করে। দুটো কাজেই তারা সমান পাকা। নিজের জাহাজ হওয়াতে ব্যবসায় মালিকের ভালোই লাভ হয়। আর সেই লাভের ভালো অংশই বেতন হিসেবে পায় অভিজ্ঞ নাবিকেরা। জাহাজের মালিক এখানে বেশ কিছু বিশ্বস্ত আর একই সাথে অভিজ্ঞ নাবিক পেয়েছে।

তবে এই জাহাজের একজন আছে যে খালাসি অথবা নাবিক দুটোর কোনোটিতেই অভিজ্ঞ অথবা দক্ষ নয়। এই জাহাজের প্রাত্যহিক কাজে সেই লোক তেমন কোনো ভূমিকাই রাখতে পারে না, আর তাতে তার কোনো দুঃখও নেই। এসব কাজ করার জন্য তার জন্ম হয়েছে বলে মনে করে না সে। এরচেয়ে অনেক কম পরিশ্রমে সে দক্ষ নাবিকের চেয়ে অনেক বেশি রোজগার করতে পারে।

জাহাজের ডেকের ওপরে এসে দাঁড়ালো সে। তার ওপর চোখ পড়লো প্রধান নাবিকের। প্রধান নাবিকের সাথে মোটামুটি বন্ধুসুলভ সম্পর্ক তার। প্রধান নাবিক তাকে উদ্দেশ্য করে হাসলো, 'কী খবর তোমার?'

'আগের মতোই', রাহুও পাল্টা হাসলো, 'আজ মনে হচ্ছে বাতাসের অবস্থা বেশি ভালো না।'

'হ্যাঁ, একটু খারাপ। তবে আছে। জানো তো মাঝ সমুদ্রে বাতাস একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে নাবিকদের বুক ধড়ফড় করা শুরু করে।'

'হ্যাঁ জানি। স্তব্ধতার পরেই ঝড় আসে।'

'তুমি কখনো মাঝ সমুদ্রে ঝড়ের মুখে পড়েছ? সে এক দেখার মতো দৃশ্য।'

'সেই দৃশ্য দেখার আমার কোনো ইচ্ছে নেই। এমন দৃশ্য কেন দেখবো যা বর্ণনা করার জন্য আর বেঁচে থাকবো না।'

'কথাটা ঠিক বললে না। আমি তো বেঁচে আছি। সেই দৃশ্য দেখার পরেও।'

প্রধান নাবিকের মাথায় তখন মাঝ সমুদ্রের ঝড়ের দৃশ্যের গল্প করার ভূত চেপেছে। আরেক নাবিককে ইশারা করলো সে, 'এই, ভালো করে হাল ধর। একেবারে সোজা করে রাখবি। আমি জাহাজ একেবারে সোজা করে দিয়েছি।'

নিজের হাল ছেড়ে রাহুর পাশে এসে দাঁড়ালো প্রধান নাবিক। রাহু তার দিকে সরাসরি তাকালো না। এই মাজিদ লোকটাকে সে একেবারে মন থেকে সন্দেহ করে। এই জাহাজের মালিক সে। রাহু সেই বিভীষিকার রাতে এই জাহাজে এসেছিল অঙ্গদকে নিয়ে। খাঁচা আর শেকলও সাথে ছিল। উদ্দেশ্য ছিল একটু খেলা দেখাবে। কিন্তু, তারপরেই বন্দরের পাশে নগরী থেকে ভেসে এসেছিল কোলাহল। আস্তে আস্তে তীব্রতা বেড়েছিল। সেই রাতে আসলে কী হয়েছিল তা এই জাহাজের কেউ-ই জানে না।

নগরী আর রাজপ্রাসাদের সেই ভয়ংকর কোলাহল একটা কারণেই হতে পারে এটা সবাই বুঝেছিল। কোনো সাধারণ দস্যুদলের আক্রমনে এমনটা হতে পারে না, কোনো চোর অথবা গুপ্তঘাতকের ধরা পড়াতেও এমন হবে না। একমাত্র বড়োসড়ো যুদ্ধ হলেই এমনটা হতে পারে। সবাই বুঝতে পেরেছিল কী হয়েছে। কিছুদিন ধরেই একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আঁচ করতে পারছিল সবাই। সেই রাতে তাই বন্দর ছেড়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নিতে কোনো জাহাজকেই দুবার ভাবতে হয়নি। রাহুরও কিছুই করার ছিল না। তার সবচেয়ে বড়ো সম্পদ এই জাহাজেই ছিল। সে আর জাহাজ থেকেই নামেনি। এখন আরব সাগরের মাঝে আছে সে। কী হয়েছে বারিগাজার তা অবশ্যই কিছুদিন পরে জানতে পারা যাবে। অবশ্য রাহু সেসব নিয়ে খুব একটা ভাবে না। বারিগাজা গোল্লায় যাক। যে একবার ঘর ছেড়েছে তার জন্য পুরো পৃথিবীই ঘর।

মাজিদ নিজের কামরায় নিয়ে এলো রাহুকে। কাল রাতের অর্ধ সমাপ্ত বোতল খুলে বসলো দুজনে, 'বুঝলে, তোমার সাথে কথা বলে আরাম আছে। আমাদের ভূখণ্ডের নও তুমি, তারপরও আমাদের ভাষায় কেমন সুন্দর করে কথা বলো। তোমার উচ্চারণ শুনতে ভালোই লাগে আমার। এই জাহাজের অশিক্ষিত আর কুরুচিপূর্ণ নাবিকদের সাথে কথা বলতে বলতে মুখ পচে গেছে আমার। নাও।' একটা পাত্র অর্ধেক পূর্ণ করে রাহুর দিকে বাড়িয়ে দিলো সে।

রাহু সাবধানে নিলো পাত্রটা। এবার মাজিদ হালকা স্বরে বলে, 'তোমার ঐ বানরের খবর কী? সে তো এর আগে সমুদ্র যাত্রা করেনি। তার কী অবস্থা? জানো তো, কিছু কিছু মানুষ প্রথম বার সমুদ্র যাত্রায় এসে কেমন ঝামেলায় পড়ে। মাথা ঘোরানো বন্ধই হয় না, ক্রমাগত বমি করে। বানরের আবার এই সমস্যা আছে কি না কে জানে!'

'মনে হয় নেই।' ঘরে ঢোকার পর এই প্রথম কথা বলে রাহু। মৃদু স্বরে। 'এখনো সে স্বাভাবিক আছে। কাল রাতেও যা দিয়েছি তাই খেয়ে নিয়েছে।'

মাজিদকে পাত্রে চুমুক দিতে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিজের পাত্রে চুমুক দিলো রাহু। অঙ্গদই তার একমাত্র সম্পদ যা সে বারিগাজা থেকে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে। কিছু মুদ্রা কাছে আছে। তবে খুব বেশি মুদ্রা জমাতে পারেনি। এমনিতে হিসেবি হলেও অঙ্গদকে দিয়ে তার রোজগারের মাত্রা ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল। আর সেই সাথে লোকের তোয়াজ আর দুধের মাছির ভনভনানির মাত্রা বেড়েছিল বেশ। সেও হয়ে গিয়েছিল বেহিসেবি। মুদ্রা তেমন একটা জমেনি। তবে মুদ্রার যন্ত্র তো তার সাথেই আছে।

তবে একটা ব্যাপার এখনো রাহুর মনে কাঁটার মতো বিধছে। অঙ্গদকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল সে এখনো পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেনি। পুরোপুরি শব্দটা ব্যবহার করলে ভুল হবে, একটুও পারেনি। মনে করেছিল, অঙ্গদ যেমন অসিতের সাথে খোলা অবস্থায় ঘুরত, তার সাথে কিছুদিন থাকলে অঙ্গদের সাথে তারও এমন ভাব হয়ে যাবে। তবে তার সেই ধারণা যে কত ভুল ছিল তা এখন বুঝতে পারছে সে। পশুপাখির মনেও বিশ্বস্ততা থাকে। আর অঙ্গদ রাহুকে এখনো একটুও সহ্য করতে পারে না। কাছে গেলেই কেমন দাঁত মুখ খিচিয়ে ওঠে।

অঙ্গদকে সবসময় খাঁচায় রাখে রাহু। বের করলে অঙ্গদ শেকলে বাঁধা থাকে। গলায় বাঁধা চামড়ার কারণে এখনো তার গলায় তেমন ক্ষত হয়নি। অঙ্গদ প্রথম প্রথম শ্বাস নিতে পারতো না, এখন তার সয়ে গেছে। এখন খেতে আর শ্বাস নিতে তার সমস্যা হয় না। একমাত্র খাবার সময়েই রাহুর সামনে চিৎকার চেঁচামেচি কম করে সে। ভালো খাবার দিলে একটু শান্ত হয়। এই জাহাজ বন্দর ছেড়ে আসার পর বানরের খাবারের অভাব বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। মানুষেরই খাবার ঠিকমতো জুটছে না আবার বানরের। তাড়াতাড়ি ওপারের কোনো বন্দরে পৌঁছতে হবে।

মদ গেলার পরিমাণের সাথে সাথে নেশা বাড়তে লাগলো দুজনেরই। এই একটা জিনিসেই রাহুর প্রচণ্ড দুর্বলতা। মদ সামনে পেলে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারে না। মাজিদও এতদিনে তা বুঝে গেছে।

মদ খেতে খেতে এবার আলাপ জুড়ে দিলো রাহুই, 'আচ্ছা, বারিগাজা বন্দরে কী হয়েছে বলতে পারো?'

'কী যে বলো তুমি। আমি কীভাবে বলবো। তুমি হলে গিয়ে ঐ ভূখণ্ডের লোক। তুমিই যদি না জানো তাহলে আমি বিদেশি লোক কী করে বলবো?'

কথাটা একেবারে ফেলে দেবার মতো না। রাহু ফেলে না দিলেও মোটামুটি একটা যুক্তি দাঁড় করে ফেললো, 'আমিও এখন তোমাদেরই দলে। আমার জন্ম সেখানে হলেও সারাদিন তো পড়ে থাকি তোমাদের সাথে বন্দরে। কীভাবে ভেতরের খবর জানবো বলো।'

'আমি নিশ্চিত বাইরের কোনো সেনাবাহিনী বন্দর আক্রমণ করেছে। নইলে এমন শোরগোল শোনা যেতো না। এমন আওয়াজ কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই হয়।'

'যুদ্ধ যে হয়েছে তাতে আমিও নিশ্চিত। কিন্তু কথা হচ্ছে যুদ্ধটা হলো কার কার মধ্যে? কে আক্রমণ করলো শকদের রাজ্য?'

'এসব চিন্তা করে আমাদের কী হবে? আমরা তো এখন সেই ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরে আছি। যাচ্ছি নিজেদের দেশের দিকে।' পরক্ষনেই মাজিদের মনে পড়লো, তার জন্য কথাটা সত্যি হলেও রাহুর জন্য নয়। রাহু নিজের দেশ ছেড়ে যাচ্ছে। 'নিজের দেশ ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে তোমার?'

'আরে না। এতগুলো ভাষা শিখেছি, নানা দেশ ঘুরেছি, এখন আমার আর আলাদা দেশ বলে কিছু নেই। যেখানে যাবো সেখানেই মিশে যেতে পারবো।'

'তা করতে পারলে ভালোই হয়। কিন্তু তুমি যেখানে যাবে সেখানে হয়তো তোমাকে অতো ভালো ভাবে গ্রহণ নাও করা হতে পারে। পরভূমে সাবধানে থাকাই নিয়ম।'

'আমি নিজের ভূমেও সাবধানে থাকি।' কথাটা নিজের মনেই বলল রাহু। মাথা একটু ঝুঁকিয়ে মাজিদের কথায় সায় জানালো শুধু।

মদের বোতল খালি হয়ে গেল। রাহুর এখনো তৃষ্ণা মেটেনি। এখানে নিজের কোনো অধিকার নেই। আরেকটা মদের বোতল খোলা বা না খোলা পুরোপুরি মাজিদের ওপর নির্ভর করছে।

'আচ্ছা মাজিদ', আলাপটা চালিয়ে গেল রাহু, হয়তো একটু পরে বোতল খোলা হলেও হতে পারে, 'তুমি তো তাড়াহুড়া করে বন্দর থেকে চলে এলে। বন্দরে তোমার কিছু জিনিস রয়ে যায়নি তো?'

'আরে না।' মাজিদের মুখে কান টানা হাসি, 'সব মাল জাহাজে আগেই তুলে রেখেছিলাম, কপাল ভালো। ওদিক দিয়ে লাভই হয়েছে বলতে পারো। অনেকের তো জাহাজের বাইরে অনেক মাল রয়ে গিয়েছিল। লাভের ওপর লাভ হচ্ছে বন্দর ত্যাগের সময় যে শুল্ক সেটাও দিতে হয়নি।'

'বাহ, তাহলে তো অনেক মুদ্রা বেঁচে গেছে তোমার। কিন্তু আবার ব্যবসা করতে আসবে না এখানে? না-কি এমুখো এই জীবনে আর হবে না?'

'কী যে বলো, আসবো না কেন? এদিকে তো আসতেই হবে।'

'কিন্তু বারিগাজা বন্দরের ঝামেলা?'

'আরে বাদ দাও ঝামেলার কথা। যে বারিগাজা বন্দর আক্রমণ করেছে সে শকদের শত্রু, আমাদের নয়। আর যেই রাজা হোক না কেন, আমাদেরকে বাণিজ্যে ডেকে আনবেই, নইলে তার বন্দর চলবে কী করে। সেসব চিন্তা বাদ দিয়ে এসো আরেকটা বোতল খোলা যাক।'

রাহু মনে মনে এটাই চাইছিল। তার মুখেও নির্মল হাসি দেখা দিলো।

এই বোতলে নেশা আরও চড়ে গেল। রাহুকে নিয়ে মাজিদ বেরিয়ে এলো জাহাজের ডেকে। নাবিকদের দিকে চেয়ে চিৎকার করে বলল, 'আজকে অনেক

কাজ হয়েছে। এখন আর কোনো ভাবনা নেই। আমরা কয়দিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবো সাগরের ওপারে।'

নাবিকেরা কেউ কিছু বলে না। মাতাল মালিকের সাথে কথা বলে বিপদে পড়তে চায় না কেউ। মাজিদ এবার রাহুর কাছে গিয়ে হাজির হয়, 'তুমি তোমার ঐ বানর নিয়ে এসো। একটু খেলা দেখি আমরা। এই সমুদ্রের ওপর আর কিছু তো করার নেই আমাদের। যাও, নিয়ে এসো।'

এই মুহূর্তে অঙ্গদকে বের করার কোনো ইচ্ছেই রাহুর নেই। তবে মাজিদের এখন যে অবস্থা তাতে তাকে যুক্তি দিয়ে কিছুই বোঝানো যাবে না। নেতিবাচক শব্দ শুনলেই সে রেগে যাবে। রাহু অঙ্গদকে আনতে নিজের ঘরে গেল।

কাপড়ে ঢাকা দেওয়া অবস্থায় খাঁচার ভেতরে অঙ্গদ বসে আছে। রাহু কাপড় সরাতেই সে বুঝে গেল তাকে এখন বের করা হবে। সে দাঁত মুখ খিচিয়ে বাঁধা দিতে তৈরি হলো। রাহু এই সমাধান পেয়েছে। সেও একটা সরু লোহার তার হাতে নিল। তারটা হাতে নিতেই অঙ্গদের ক্রোধে যেন জল পড়লো। সে কিচকিচ আওয়াজ করতে লাগলো। কোনোরকমের মারমুখী ভঙ্গি এখন আর তার ভেতরে নেই।

খাঁচা খুলে শেকল পরানো অঙ্গদকে বাইরে বের করে আনলো রাহু। তারপর লোহার তারের একটা খোঁচা দিতেই অঙ্গদ রাহুর দেখিয়ে দেওয়া পথে হাঁটতে শুরু করলো। না হেঁটে কোনো উপায় নেই।

অঙ্গদকে নিয়ে জাহাজের ডেকে আসতেই নাবিকদের মধ্যে আনন্দের ধ্বনি উঠলো। এই আনন্দের ধ্বনির জন্য যে কেবল অঙ্গদ দায়ী তা নয়। একটু আগে মাজিদ নাবিকদের জন্য জাহাজের ভাঁড়ার থেকে দুই বোতল মদ বরাদ্দ দিয়েছে। সেই বোতলের কিছু কিছু সদ্ব্যবহার সবাই করেছে। তার ফলেই এই উল্লাস ধ্বনি।

মাজিদ এগিয়ে এসে অঙ্গদের গায়ে হাত বোলাল। রাহু একেবারেই পছন্দ করছে না মাজিদের আচরণ। অঙ্গদের গায়ে সে কেন হাত দেবে? কিন্তু, এখানে কিছু বলা একেবারেই হিতে বিপরীত ডেকে আনবে।

অঙ্গদের গায়ে হাত বুলিয়ে মন্তব্য করলো মাজিদ, 'না, সাধারণ বানরের শরীরের মতোই তো চামড়া। এটার রং এমন হলো কেমন করে? ওপরওয়ালার ইচ্ছা হলে অবশ্য অনেক কিছুই হতে পারে। মানুষ হয়ে এত চিন্তা করার দরকার নেই আমাদের। খেলা দেখানো শুরু করো।'

রাহু প্রথম প্রথম অসিতকে লক্ষ্য করে শেখা ইশারাগুলো ব্যবহার করে অঙ্গদকে নানা কসরত করানোর চেষ্টা করেছিল। অঙ্গদ অবশ্য সেই একই ইশারা আর ধ্বনিতে কোনোরকম খেলা দেখায়নি। রাহু বুঝে গিয়েছিল ইশারা আর ধ্বনি যথেষ্ট নয়, কে সেই ইশারা করছে আর কার গলা দিয়ে সেই ধ্বনি বেরিয়ে আসছে সেটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

তখন সে নিজের কিছু উপায় তৈরি করেছে। এছাড়া আর কোনো উপায় তার মাথায় আসেনি। মারের ওপর কোনো পথ্য নেই।

নিজের হাতের লোহার তার ওপরে তুলল সে। আরেক হাতে ধরে রেখেছে অঙ্গদের গলার শেকল। অঙ্গদ আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোহার তারের দিকে। আচমকা বেশ জোরে তার নামিয়ে আনলো রাহু। আতঙ্কে এক পাশে লাফ দিয়ে সরে গেল অঙ্গদ। সবাই মনে করলো অঙ্গদ লাফিয়ে খেলা দেখিয়েছে। সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। বানরের চোখের আতঙ্ক বোঝার মতো ক্ষমতা এই নাবিকদের নেই।

নিজের হাতের তার দিয়ে অঙ্গদকে বেশ কিছু আঘাত করলো রাহু। কিছু আঘাত অঙ্গদের শরীরে লেগেছে আবার কিছু পড়েছে জাহাজের মেঝেতে। মোটামুটি খেলা দেখানোর নামে কিছুক্ষণ উদ্দাম লাফালাফি শেষ হলো। নাবিকদের উল্লাস ধ্বনি শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল।

মাজিদ খেলা দেখানো শেষ হবার পরে রাহুর পিঠ চাপড়ে দিলো, 'বাহ, বেশ ভালোই খেলা দেখালে। আমার নাবিকেরা অনেক আনন্দ পেয়েছে। তোমাকে ভাগ্যক্রমে আমাদের জাহাজে পেয়েছি। সমুদ্র যাত্রায় এমন আনন্দের উৎস সচরাচর পাওয়া যায় না।'

রাহুও একমত হলো। খেলা দেখা শেষ হতেই নাবিকেরা আবার যে যার কাজে ফিরে গেছে। দুপুরের খাবার সময় হয়ে এসেছে, খেলা দেখতে দেখতে কারো খেয়ালই নেই। মদের নেশাও একটু কেটেছে। এখন খাবারের জোগাড়ে গেল কয়েকজন।

মাজিদ রাহুর পাশে বসে এখনো কথা বলছে। এক নাবিক এগিয়ে এলো তার দিকে। সামনে এসে উসখুস করতে লাগলো।

'কিছু বলবে?'

'জি মালিক। আমাদের জাহাজে পানীয় জলের সংকট দেখা দেবে। সবগুলো পিপে ভরতে পারিনি আমরা। তাড়াহুড়া করে বন্দর থেকে বেরোতে হয়েছিল। এখন আর কয়েক পিপে পানিই বাকি আছে। খুব হিসেব করে খেলেও এক সপ্তাহের বেশি যাবে না বলেই বিশ্বাস।'

'চিন্তার কথা। এই ব্যাপারটা এতদিন তোমরা খেয়াল করোনি কেন? আরব সাগরের ওপারেই থামতে হবে এখন আমাদের। লোহিত সাগরের দিকে আর যাওয়া যাবে না। লোহিত সাগর পর্যন্ত যেতে এক মাস সময় লাগবে। এক সপ্তাহের পানি দিয়ে কোনোমতেই এক মাস কাটানো যাবে না।'

রাহু আপাত ঘনিয়ে আসা বিপদ সম্পর্কে বুঝতে পেরে চুপ করে গেল। এখানে তার কিছুই বলার নেই।

মাজিদ বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। হাক দিলো সে, 'এই একজন মানচিত্র নিয়ে এসো। আর সব বুড়ো নাবিকেরা এখনই আমার সাথে এসে দাঁড়াও।'

আদেশ পালিত হলো। পানির সমস্যার কথা এরই মধ্যে সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বুড়ো নাবিক আর মাজিদ চক্রাকারে দাঁড়িয়ে মাঝখানে রাখল মানচিত্র।

'আমরা এখন কোথায় আছি?' মাজিদ সবার মতামত জানতে চায়।

'কাল রাতে আমি তারা খুব ভালো করে দেখেছি। আমরা এই জায়গাতে আছি বলেই আমার বিশ্বাস। একটু এদিক সেদিক হতে পারে।' এক বুড়ো নাবিক মন্তব্য করলো।

নাবিকেরা কেউই ভয় পায়নি। এই লবনাক্ত জলরাশির ওপর পানীয় জলের অভাব তাদের অনেকবার হয়েছে।

আরেক বুড়ো নাবিক মন্তব্য করলো, 'আমি তোমার সাথে একমত। আমরা এখানেই আছি। কিন্তু আমাদের জাহাজ চলছে এখন আফ্রিকার শিঙয়ের দিকে।'

মাজিদ এরই মধ্যে সূর্যের অবস্থান আর মানচিত্রের দিক পরখ করে নিয়েছে। দুই নাবিকের কথাই সত্য।

'আফ্রিকার শিঙে পৌঁছানো যাবে না। আমাদের হাতে একটা উপায়ই আছে। যদি জলের অভাবে ব্রহ্মতালু শুকানো আটকাতে হয়।' এবার মন্তব্য করলো মাজিদ।

নাবিকেরা সবাই বুঝতে পারলো সেই উপায় কী। বাড়ি পৌঁছানো আরও মাসখানেক পেছাল। এখন ঘুরপথ ধরতে হবে।

নাবিকদের সবার মন বুঝতে পারলো মাজিদ। নিজের সিদ্ধান্ত জানালে, 'আমরা এখনই জাহাজের মুখ আরবের দিকে ঘুরিয়ে দেবো। আরবের অকুলাস বন্দরেই থামবো আমরা। জানি তোমাদের বাড়ি পৌঁছাতে দেরি হবে। কিন্তু আমাদের কিছুই করার নেই। জল সংগ্রহ করার জন্য আমাদের যেতেই হবে অকুলাস বন্দরে।'

নাবিকেরা আপত্তি করতে পারলো না। মাজিদ তখনই রওনা দিলো হালের দিকে। জাহাজের দিক এখনই পাল্টাতে হবে। পালের দিক পাল্টাতে হাত লাগালো বেশ কয়েকজন নাবিক। সবাইকে দাঁড় বাইতে নির্দেশ দিলো মাজিদ। অকুলাসে যেহেতু ভাগ্যচক্রে যেতেই হবে তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গেলেই ভালো হয়।

রাহুকেও দাঁড় বাওয়ার কাজ দেওয়া হলো। অঙ্গদকে নিজের ঘরে রেখে এলো রাহু। তারপর হাত লাগালো দাঁড়ে। জাহাজে জাহাজে ঘুরতে ঘুরতে এসব কাজে সে একেবারে পাকা না হলেও কাজ চালাতে পারে। তবে অনেকদিন পরিশ্রমের কোনো কাজ করেনি সে। তাই মন একটু অনীহা জানাচ্ছে।

ওরা অকুলাস বন্দরে যাবে। অকুলাস বন্দরেই সে নেমে যাবে না-কি এই জাহাজের সাথেই মিশরের দিকে এগিয়ে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর পরে ভাবলেই চলবে। এখন আপাতত দাঁড় টানার দিকে নজর দিলো সে।

অঙ্গদ আছে তার সাথে। পৃথিবীর যে-কোনো নগর অথবা বন্দরে তার জীবিকার অভাব হবে না।

মহারাজ সাতকর্ণী বারিগাজায় আসবেন সেই খবর আগেই পেয়েছিল রুদ্রদেব। সে এর মধ্যেই শক রাজ্যের খোঁজখবর নিয়ে নিয়েছে। শকদের বাণিজ্যিক রাজধানী এই বারিগাজা। তাদের রাজধানী উজ্জয়িনি নর্মদা নদীর পার ধরে আরেকটু দূরে অবস্থিত। সেই রাজধানী এখনো সাতবাহন সেনার অধিকারে আসেনি।

মহারাজের বারিগাজা আসা উপলক্ষে সবকিছু ঠিক করা নিয়ে রুদ্রদেব আর রিপুজিত বেশ ব্যস্ত ছিল। তবে রুদ্রদেব যখন এসব জানতে পেরেছে তখনই রিপুজিতকে বলে দিয়েছে, 'শোনো, আমরা আরও কয়দিন সময় পাব। মহারাজ তার সেনা নিয়ে এখানে থামবেন ঠিকই কিন্তু নগরে প্রবেশ অথবা অবস্থান করবেন না। তিনি উজ্জয়িনির দিকেই যাবেন। সেই নগর দখল করার আগ পর্যন্ত ঠিক শান্তি পাবেন না।'

রিপুজিতও মেনে নিয়েছিল তার কথা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাদেরকেও সাথে করে নিয়ে যাবেন না-কি মহারাজ? না-কি তাদেরকে এখানেই রেখে যাবেন বন্দরের রক্ষার্থে।

মহারাজ সাতকর্ণী বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছেন শক রাজ্যে। নাসিকের প্রজারা খবর পেয়ে রাস্তায় উল্লাস করে মহারাজকে স্বাগত জানিয়েছিল। বিজয়ীর পূর্ণ সম্মান লাভ করে এই নগরে এসেছিলেন তিনি।

রুদ্রদেবের ধারণাই ঠিক। যদিও গুপ্তচরের সংবাদ অনুযায়ী এখন উজ্জয়িনিতে সৈন্য সংখ্যা খুবই কম, তবু নিজের শক্তি দিয়ে রাজধানী দখল করে সম্পূর্ণ পশ্চিম শক রাজ্য নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য বেশি দেরি করেননি মহারাজ সাতকর্ণী। গিরিধারীও সেই পরামর্শই দিয়েছেন রাজাকে। বারিগাজা বন্দর হতে পারে কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে রত্নখনিগুলো, সেগুলো উজ্জয়িনির আশেপাশেই আছে।

রুদ্রদেব আর রিপুজিতকে প্রশংসার জলে ভাসিয়ে মহারাজ চলে গেছেন উজ্জয়িনির দিকে। উজ্জয়িনিতে ছোটোখাটো একটা যুদ্ধ হলেও হতে পারে। যদি চোলা মহারাজ কারিকালার মতো নাহাপনার জামাতা ঋষভদত্ত জেদি হন তাহলে বারবারিকন থেকে ধার করা সেনা দিয়েই তিনি যুদ্ধ করতেন। তবে ঋষভদত্তের মনে তেমন কোনো ইচ্ছেই ছিল না। সে আগে থেকেই খবর পেয়েছিল, শক সেনারা পরাজিত হয়েছে। যে গ্রীক সেনাদের ওপর মহারাজ নাহাপনার সবচেয়ে বেশি আশা ছিল, তারা সেই আশার প্রতিদান দিতে পারেনি। প্রথমে তারা পরাজিত হয়েছে নাসিকের প্রান্তরে, তারপরে বারিগাজা বন্দর রক্ষা করতে এসে। বারিগাজা বন্দর এখন আছে শত্রুদের দখলে। সাতবাহনের প্রচণ্ড বাহিনীর সাথে

লড়াই করে নিজের মৃত্যু ডেকে আনার কোনো কারণ খুঁজে পাননি মহার নাহাপনার জামাতা।

বিশাল সেনা নিয়ে উজ্জয়িনির সামনে এসে হাজির হলেন মহারাজ সাতকর্ণী সেনাকে আক্রমণের নির্দেশ দেবার ইচ্ছে তার মনে ষোলো আনা। তবে গিরিধা কথায় তিনি একটু অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। উজ্জয়িনির সদর ফটক খুলে গে বেরিয়ে এলো মহারাজ নাহাপনার জামাতা, দাঁড়ালো ঠিক সাতকর্ণীর সামনে কুর্নিশ করলো সে। কুর্নিশের ভাব দেখেই বোঝা গেল, এই নগর রক্ষায় যুদ্ধ কর তার কোনো ইচ্ছেই নেই। যুদ্ধ ছাড়াই এই বিজয় অর্জিত হয়ে গেছে।

সাতকর্ণী দয়া ধর্মের প্রদর্শন করলেন, না করে উপায় ছিল না। আত্মসম যে করে সে শরণাগত। আর শরণাগতের রক্ষা করাই ক্ষত্রিয় ধর্ম। 'আপনার নগ কতজন সৈন্য আছে?'

ঋষভদত্ত মিথ্যের ধারেকাছেও গেল না, 'মহারাজ, এই নগরে কোনো শ সেনা নেই। মহারাজ নাহাপনা সব শক সেনা নিয়েই আপনার সাথে যুদ্ধ কর গিয়েছিলেন। এখানে আমাদের সাহায্যার্থে বারবারিকন থেকে দশ সহস্র সে এসেছিল। তারাই এখন নগরে আছে। আপনি আজ্ঞা দিলে তাদেরকে তাদে রাজ্যে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি?'

'আপনাকে কোনো ব্যবস্থা করতে হবে না। আপনি আগে নিজের ব্যবস্থার ক বলুন। আপনি কি এই পরাজিত রাজ্যে থাকবেন? তাহলে আমাদের নজর ব হয়ে থাকতে হবে।'

ঋষভদত্তের কণ্ঠে ভয়, 'মহারাজ, আমি এই রাজ্যে থাকবো না। সংবাদ পে অনেক আগেই পালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু, এই প্রজাদের এবং সেনাদের এক ব্যবস্থা আমি করতে চেয়েছি। আমি যুদ্ধ করতে পারতাম, কিন্তু সেটাও করি একমাত্র তাদের প্রাণ রক্ষায়।'

'ভালো সিদ্ধান্ত। আপনি যেখানে যেতে চাচ্ছেন সেই রাজ্যে আমার সেনা আপনাকে পরিবার-সহ পৌঁছে দেবে। এই দশ হাজার সেনাকেও তাদের রা যাবার অনুমতি দিচ্ছি আমি। তবে তাও যেতে হবে আমার সেনাদের তত্ত্বাবধানে আরেকটা কথা, জানেনই তো, এমন অবস্থায় তারা কেবল বাহন নিয়ে যে পারবে, কোনো রকমের শস্ত্র বহন করতে পারবে না।'

'আজ্ঞে মহারাজ। আপনার কথামতোই সবকিছু হবে।'

তারপরে দুদিনের মধ্যে সবকিছু ঠিক হয়ে গেল। আগের রাজার লোক অমাত্য, মন্ত্রী, সেনা সবাই রাজ্য ছেড়ে চলে গেল। কোষাগার আর অস্ত্রাগারে দখল নিয়ে নিলো সাতবাহন সেনারা। নগরীর প্রজাদের সাহস দিতে সচেষ্ট হলে মহারাজ সাতকর্ণী। রাজ্যের সব জায়গায় দূতেরা পৌঁছে গেল। তারা ঢেরা দিলো

গ্রাম প্রধানদের সাথে কথা বলল। আশ্বাস দেওয়া হলো, অত্যাচারী রাজার হাত থেকে তারা মুক্ত হয়েছেন, এখন তাদের জীবন আরও সুন্দর হবে। কেউ যাতে নতুন রাজার শাসনে ভয় না পায়, কেউ যাতে ভয়ের কারণে রাজ্য ত্যাগ করতে না চায়।

সবকিছু ঠিকমতো সামলে এবার ব্যবসার দিকে নজর দেবার পালা। এর জন্যেই তো এত কিছু। বারিগাজা বন্দরে ফিরে এলেন মহারাজ সাতকর্ণী। গিরিধারী ওনার সাথেই আছেন। পনের সহস্র সেনা আর দুই অমাত্যকে উজ্জয়িনি আর রত্নের খনির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। লোক চিনতে গিরিধারীর তেমন ভুল কখনো হয়নি।

ঘোড়া নিয়ে মহারাজ সাতকর্ণী আর গিরিধারী পাশাপাশি চলছেন। গিরিধারী একটু অনুযোগ করলেন, 'আরও কিছু সেনা বেশি রেখে এলে ভালো হতো উজ্জয়িনিতে।'

'কেন?'

'পশ্চিম শকদের মিত্রদের তো অভাব নেই। যদি এখন আমাদের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে কোনো সেনা পাঠায়। আর মিত্রের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শক রাজ্যের সম্পদের প্রাচুর্য। মিত্রের পরাজয়ের প্রতিশোধের জন্য সেনা না পাঠালেও সেই সম্পদের লোভে যদি সেনা পাঠায়?'

'চিন্তা করবেন না। বারিগাজাতেও আমি বেশ বড় এক বাহিনী রেখে দেবো। আর বারবারিকন ও উত্তর শকদের কাছে এরই মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি করার জন্য লোক চলে গেছে। নাহাপনার চেয়েও বেশি সুবিধা আমি তাদের দেবো। ওনারা রাজি হবেনই।'

এভাবেই টুকটাক কথা হতে লাগলো মহারাজ সাতকর্ণী আর গিরিধারীর মাঝে। এর মধ্যেই ওনারা চলে এলেন বারিগাজায়। এবার কিন্তু আর বাইরে থেকে তাড়াহুড়া করে বিদায় নিলেন না মহারাজ সাতকর্ণী। বারিগাজার সুগভীর পরিখার ওপরের সেতু সসম্ভ্রমে নেমে এলো। মহারাজ সাতকর্ণী প্রবেশ করলেন বারিগাজায়।

রুদ্রদেব জানে এবার প্রস্তুতি সেরে রাখতে হবে। মহারাজ কয়দিনের মধ্যে উজ্জয়িনি ঘুরে আসবেন সেই হিসেব কষে রেখেছিল সে। সেখানে একটু গোলমাল হয়ে গেছে। উজ্জয়িনি তেমন যুদ্ধ করতে পারবে না এটা সেও ভেবেছিল, কিন্তু একেবারে বিনা যুদ্ধে সম্পূর্ণ মেদিনী দিয়ে দেবে এটা ভাবতে পারেনি। তাই তার ধারণার চেয়েও আগে বারিগাজায় চলে এসেছেন মহারাজ সাতকর্ণী।

তাড়াহুড়া হলে যা হয় তাই হলো। কিছু আয়োজন অসম্পূর্ণ থেকে গেল। তবে বারিগাজার নর্তকীদের খুঁজে পেয়েছে তারা। সৈনিকদের মধ্যে কারো কারো যে অনৈতিক কাজ করার ইচ্ছে হয়নি তা নয়, কিন্তু রুদ্রদেবের স্পষ্ট নিষেধ ছিল।

রীতিমতো চোখ গরম করে সে ঘোষণা করেছিল, কোনো রমণীর কোনো ধরনের অপমান সহ্য করা হবে না। এই অপরাধের শাস্তি হবে একটাই, মৃত্যুদণ্ড। সৈনিকেরা এর মধ্যে বেশ ভালোভাবেই জেনে গেছে রুদ্রদেব কে, আর কী করতে পারে। তারা রমণীদের ব্যাপারে উল্টোপাল্টা কিছু করার কথা চিন্তাতেই আনেনি আর।

মহারাজ সাতকর্ণী এমণ অভ্যর্থনা পাবেন তা ভাবতে পারেননি। নানা রকম খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৈনিকেরা রাজকীয় সম্মান জানিয়েছে মহারাজকে। মহারাজ সাতকর্ণী কোষাগার পরিদর্শনে গেছেন প্রথমেই। দেখাই যাক না কী কী আছে এই বারিগাজার রত্ন ভাণ্ডারে। সাথে গিরিধারী, রুদ্রদেব, রিপুজিত। অসিতও আছে তাদের সাথে। রুদ্রদেবের শিষ্য হবার বেশ কিছু সুবিধা সে অবশ্য অনেক আগ থেকেই পাচ্ছে।

বারিগাজার রত্ন ভাণ্ডার দেখার মতো। রিপুজিত আর রুদ্রদেব সব গুছিয়ে রেখেছিল। তারা তেমন চমকে গেল না। মহারাজ সাতকর্ণী আর গিরিধারীর মুখের অবস্থা দেখার মতো। মহারাজ সাতকর্ণী চমকে গিয়ে তো মন্তব্যই করে বসলেন, 'এরা তো দেখি এক রত্ন ভাণ্ডারেই পুরো সাতবাহনের সম্পদ নিয়ে বসে আছে।' গিরিধারী আর কিছু বললেন না। উজ্জয়িনির রত্ন ভাণ্ডার দেখেও তাদের ঠিক এমন অনুভূতিই হয়েছিল।

মহারাজ সাতকর্ণী এরপর রত্ন ভাণ্ডারে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। সবগুলো সিন্দুকের ওপর ঘুরে এলো তার দৃষ্টি।

রিপুজিত বুঝতে পারলো মহারাজ কিছু একটা খুঁজছেন। সে বিনীত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি কিছু খুঁজছেন মহারাজ? আমাকে বলতে পারেন। আমি আর রুদ্রদেব মিলেই সব রত্ন হিসেব করে গুছিয়ে রেখেছি।'

মহারাজ সাতকর্ণী জবাব দিতে দেরি করলেন না, 'হ্যাঁ, খুঁজছি। শুনেছিলাম কি একটা রত্ন আছে এই বারিগাজা রাজ্যে। কি এক বিশেষ রত্ন। সেই রত্নের গুণে মহারাজ নাহাপনার শ্রীবৃদ্ধির দিন দিন বৃদ্ধি হয়েছিল। সেই রত্ন কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না তো? কোনো সিন্দুকের ভেতরে না-কি?'

গিরিধারী সায় দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিও শুনেছি সেই রত্নের কথা।'

রিপুজিতের মুখ হয়েছে গর্তে পড়া ইঁদুরের মতো। সে ঐ রত্নের কথা শোনেনি, 'মহারাজ, সব রত্নই তো গুছিয়ে রেখেছি। এখানকার সিন্দুকের মধ্যে রাখা রত্নগুলোকে জহুরি দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে বিন্যাস করেছি। কিন্তু এর মধ্যে সেই রত্ন কোনটা সেটা তো জানি না। তেমন কোনো বিশেষ রত্ন তো আমরা খুঁজে পাইনি।'

মহারাজ সাতকর্ণীর চোখ একটু কুঁচকে এলো, ' কিন্তু সেই রত্ন তো এখানেই থাকার কথা। আমার গুপ্তচর নিজে দেখে গিয়েছিল সেই রত্ন। উজ্জয়িনিতেও সেই রত্ন নেই। তাহলে সেই রত্ন গেল কোথায়?'

এবার জবাব দিলো রুদ্রদেব, সতর্ক গলায়, 'মহারাজ, সেই রত্ন যে-কোনো জায়গায় চলে যেতে পারে। হতে পারে মহারাজ নাহাপনা নিজের সৌভাগ্যের প্রতীক সেই রত্ন নিজের সাথে করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানেই সেই রত্ন কোথাও আছে। হতে পারে, অ্যালেকের ওপর নির্দেশ ছিল, সে যাতে ঐ রত্নকে কিছুতেই শত্রুর হাতে পড়তে না দেয়। হয়তো অ্যালেক আমাদের আক্রমণের মুহূর্তে সেই রত্নকে বিশেষ কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে, নদীতে ফেলে দিয়েও থাকতে পারে।'

'তাহলে তো সেই রত্ন আমাদের হাতে আসবে না', আফসোসের সুরে বললেন মহারাজ সাতকর্ণী।

'রত্ন হিসেবে সেটা বহুমূল্য হতে পারে, সেই হিসেবে ঐ রত্ন না পেলে আপনার ক্ষতিই হবার কথা', রুদ্রদেব মহারাজকে বোঝাতে সচেষ্ট হলো, 'কিন্তু আপনি যদি মনে করে থাকেন মহারাজ সেই রত্ন আপনার জন্যও ভাগ্যের চাকা হিসেবে কাজ করবে, তবে বলতেই হয় আপনার হিসেবে একটু ভুল আছে।'

মহারাজ সাতকর্ণী অবাক হলেন, 'সবাই এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল, ঐ রত্নের জন্যই শকদের এত সমৃদ্ধি। এখানে সেই রত্ন আমার কোনো কাজে আসতো না, এই কথা কেন মনে হলো তোমার?'

'মহারাজ, ঐ রত্ন যে মালিকের কাছে ছিল সেই মালিককেও সেই রত্ন থাকা অবস্থাতেই জীবনের চরম দুর্ভাগ্য বরণ করে নিতে হয়েছিল।'

'মানে? কে মালিক? কার কাছে ছিল?'

চট করে নিজেকে সামলে নিলো রুদ্রদেব, 'মহারাজ, আমি শক রাজার কথা বলছি। তিনি এই রত্নের মালিক থাকা অবস্থায়ই আপনার হাতে পরাজিত হয়েছেন। তার রাজধানী আর বন্দরের পতন হয়েছে। আসলে মহারাজ, কোনো রত্নই মানুষের ভাগ্য বদলে দিতে পারে না। ভাগ্য কেবল ওঁত পেতে বসে থাকে। মানুষের কর্মই করে বাকিটা।'

'সেটা ঠিক আছে। তবে সেই আশ্চর্য রত্ন দেখার একটা ইচ্ছে ছিল। হারিয়ে গেলে কী আর করা। ইতিহাসে এর আগেও পরাজিত পক্ষ রাজ্যের এমন অনেক মূল্যবান সম্পদ লুকিয়ে ফেলেছিল। সেই তালিকায় আরেকটা যোগ হলো। আচ্ছা, সেসব বাদ। এখন আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে?'

প্রশ্নটা মন্ত্রী গিরিধারীর উদ্দেশ্যে করেছেন মহারাজ সাতকর্ণী। গিরিধারী আগেই এসব ভেবে রেখেছেন, 'মহারাজ, এই মুহূর্তে আমাদেরকে বারিগাজার প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করতে হবে। আমরা আমাদের তিনটা বন্দর তৈরি করেছি। এখন

থেকে সেগুলোকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে হবে। এখানে আমাদের বেশকিছু খরচ হবে, কিন্তু তাতে আমাদের চারটা বন্দরই বড়ো হবে, আরও অনেক জাহাজ আসবে, বাণিজ্যও অনেক বেশি হবে।'

নিখুঁত বিশ্লেষণ। কেউ বিরুদ্ধ কোনো মত প্রদান করলো না। সাতকর্ণী রত্ন ভান্ডার থেকে বেরোলেন, 'ঠিক আছে। এবার তাহলে বেরোনো যাক। একটু এই প্রাসাদের রাজসভাকক্ষে গিয়ে বসি।'

সবাই রাজ সভায় ফিরে এলো। মহারাজ সিংহাসনে আর সবাই যেখানে জায়গা পেল বসে পড়লো। মহারাজ সাতকর্ণী বেশ সুস্থির বোধ করছেন, 'আচ্ছা তোমাদের বারিগাজা জয়ের গল্পটা তো বললে না। আমি তো ভেবেছিলাম তোমাদের সাহায্য লাগবে। শুধু অবরোধ করার জন্যই পাঠিয়েছিলাম তোমাদের। কিন্তু এসে দেখি তোমরা এখানের কাজ সেরে রেখেছ। বেশ।'

রুদ্রদেব নিজের কৃতিত্বের কথা সাবধানে এড়িয়ে গেল, 'আপনি না শুনলেও আমরা কিন্তু মহারাজ নাহাপনার সাথে আপনার সেই ভয়ংকর যুদ্ধের ব্যাপারে শুনেছি মহারাজ। কীভাবে আপনি বুদ্ধি, সাহস আর সমর কৌশলের প্রয়োগ করে মহারাজ নাহাপনাকে সমরে পরাজিত করেছেন। এই আর্যাবর্ত সেই অসম্ভব বীরত্বের কথা সহজে ভুলতে পারবে না।'

নিজের প্রশংসা শুনে মহারাজ সাতকর্ণী অভ্যস্ত, তবু তার ভালো লাগলো। তবে রিপুজিত কিন্তু রুদ্রদেবের মতো নিজেদের কৃতিত্ব ঢাকতে চাইলো না, 'মহারাজ, আপনার সাথে মহারাজ নাহাপনার লড়াইয়ের কথা আমিও শুনেছি। তবে এখানে যা হয়েছে তাও কম রোমাঞ্চকর নয়। শত্রু বিশেষভাবে আক্রমণ করেছিল আমাদের।'

'বিশেষ ভাবে মানে?'

'আমরা যুদ্ধ করছিলাম। হঠাৎ দেখি হাজার হাজার বাজ। এত বাজ একসাথে আমি কখনো দেখিনি। তারা পাথর নিয়ে আমাদের আক্রমণ করলো। বড়ো বড়ো পাথর ছুঁড়তে লাগলো আমাদের দিকে। সাথে শত্রুর তীর তো আছেই। আমরা কোনোমতে পালিয়ে বেঁচেছি।'

গিরিধারী বাজের হামলার কথা শুনে অবাক হয়ে গেছেন, 'এটা তো আপনাদের পরাজিত হবার কথা বললেন। ওরা যদি বাজ দিয়ে আক্রমণ করে থাকে তাহলে আপনারা জয়ী হলেন কী করে?'

অসিত আর নিজেকে রাখতে পারলো না। সেদিন রাতের সেই আশ্চর্য ঘটনার কথা মনে পরে গেছে তার, 'সাপ দিয়ে।'

'সাপ!' গিরিধারী আর মহারাজ সাতকর্ণী দুজনেই এক সাথে উচ্চারণ করলেন শব্দটা।

রিপুজিতের উৎসাহ তখন চরমে, 'মহারাজ, আমরা রাতে দুর্গ আক্রমণ করলাম। কোথেকে যেন চলে এলো হাজার হাজার রাজগোখরো। আমাদের সেনাদের কিছুই বলে না তারা, শুধু শত্রুর সেনাদের ছোবল দেয়। সেই ছোবল একবার খেলে তিন মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু।'

'সাপ এলো কীভাবে?' গিরিধারীর প্রশ্ন রুদ্রদেবের উদ্দেশ্যে।

রহস্যময় মুচকি হেসে রুদ্রদেব বলল, 'ঠিক জানি না। মনে হয় জঙ্গল থেকে আমাদের সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর ওদেরকে পাঠিয়েছিলেন।'

'আচ্ছা।' গিরিধারীর মুখ দেখেই বোঝা যায় তিনি একমত হননি।

যুদ্ধের আলামত শেষ হয়েছে। মহারাজ সাতকর্ণী নিজের রাজ্যে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই বিশেষ সেনা দায়িত্বে থাকবে বারিগাজার। 'তোমরা দুজনে সেনা নিয়ে বারিগাজার দায়িত্বে থাকবে। বলতে গেলে তোমরা দুজন শুধু সেনাপতি নও, এই বারিগাজার আমার পক্ষের শাসক।'

রুদ্রদেব বিনীত হলো, 'মহারাজ, একই সাথে সেনাপতি আর শাসকের দায়িত্ব রিপুজিত খুব ভালোভাবেই পালন করতে পারবে। আমাকে আর আমার শিষ্যকে মুক্তি দিতে হবে মহারাজ।'

'কেন?' মহারাজ সাতকর্ণীর গলায় অবিশ্বাস। এমন নির্ভেজাল জীবন আবার কেউ পায়ে ঠেলে দেয় না-কি।

'আমাদের একটা কাজ এখনো বাকি আছে মহারাজ। আমাদেরকে একটু সমুদ্র যাত্রা করতে হবে।'

'সমুদ্র যাত্রা? বাণিজ্য করার খায়েশ হলো না-কি?'

' না মহারাজ। একটা বিশেষ কাজ আছে। আমাদের এক বন্ধু সমুদ্রের ওপারে চলে গেছে। ওকে নিয়ে আসতে হবে।'

'আমি কিন্তু তোমার জন্য ভালো জায়গার ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম রুদ্রদেব। তোমাকে আমার প্রধান সেনাপতিদের একজন করে নেবার চিন্তা করেছিলাম।'

রিপুজিত কথাটা শুনে ঢোক গিলল। এই সৌভাগ্য সহজে কারো হয় না।

রুদ্রদেব মহারাজের প্রস্তাব মেনে নিলো, 'আমার ভাগ্যে যদি আপনার প্রধান সেনাপতিদের একজন হবার গৌরব লেখা থাকে তাহলে সেটা হবেই। আমি সমুদ্রের ওপার থেকে ফিরে এসে আপনার সেনায় অবশ্যই যোগ দেবো। অবশ্য ততদিনে যদি আমার জন্য সুযোগটা অবারিত থাকে আরকি।'

'অবশ্যই থাকবে। তোমাদের আমি বাঁধা দেবো না। পথের সম্বল হিসেবে যথেষ্ট মুদ্রা রাজকোষ থেকে নিয়ে যাবার অনুমতি এখনই দিয়ে দিলাম।'

সাতকর্ণীর মুদ্রার সমাধানে অসিতের মন ভরল না। তারচেয়েও বড়ো সমস্যা আছে তাদের সামনে। সে ভয়ে ভয়ে বলল, 'মহারাজ, আমরা সমুদ্রের ওপারে

যাবো কী করে? এই বন্দরে তো কোনো জাহাজ নেই এখন। সব যুদ্ধের গোলমাে পালিয়েছে।'

কথা ঠিক। গিরিধারী এই সমস্যার সমাধান দিলেন, যদিও তিনি ভাবছিলে অন্য কথা, 'বারিগাজার সব জাহাজ চলে গেলেও উজ্জয়িনি আর মিনাগারা বন্দে এখনো কিছু বন্দর আছে। তাদের সাথে আমি নিজে কথা বলেছি। ওরা সমুদ্রে নামার আগে বারিগাজায় থামবে কেনাকাটা করার জন্য। তখন সেই জাহাজগুলো একটায় তোমরা যেতে পারবে।'

সমাধান পেয়ে অসিতের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। না, জাহাজ পাওয়া গেছে সমুদ্রে শীঘ্রই যাওয়া যাবে।

খাবার সময় হওয়ায় সবাই খাবার ঘরের দিকে গেল। সবার পেছনে আছে গিরিধারী। একটা চিন্তা কিছুতেই মাথা থেকে দূর করতে পারছেন না তিনি বারিগাজা জয়ের সেই রাতের যুদ্ধে সাপ এলো কোত্থেকে? নিশ্চয়ই এতে রুদ্রদেবের হাত আছে। আগে রুদ্রদেবকে শুধু অসাধারণ মনে হতো, এখন তাকে একটু অস্বাভাবিকও মনে হচ্ছে।

রুদ্রদেব সমুদ্রযাত্রা করবে শুনে একটু স্বস্তি পেলেন গিরিধারী। আসলে এমন লোক যত দূরে থাকে ততই ভালো।

সাম্রাজ্য পেলেই যে মানুষ সুখী হবে তা খুব একটা পোক্ত ধারণা নয়। এই আসনের উত্তাপ কেবল সেই অনুভব করতে পারে যে একবার এই আসনে নিজের পেছন ঠেকিয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে কেবল মহারাজের আরাম, মহারাজের প্রতি অভিজাতদের তোষামোদ আর ক্ষমতাই চোখে পড়ে। কিন্তু সম্রাটের শরীর আর আত্মার যে বন্দিত্ব তা কেউই বুঝতে পারে না। সবার দেওয়া সম্মান আর সম্ভ্রম একসময় জমতে জমতে কাঁধে মস্ত জোয়াল হয়ে দাঁড়ায়।

সম্রাট ট্রাজান জানেন, এই রোমান সাম্রাজ্য এখন সবচেয়ে বেশি বিস্তারে আছে। রোমানরা যতই সাহসী যোদ্ধা আর কুশলী হোক না কেন, সব রাজ্যই একটা সময় পরে সংকুচিত হয়ে আসতে শুরু করে। তিনি দিনরাত এখন একটা প্রার্থনাই করেন, তার শাসনে যেন সেই সংকোচন শুরু না হয়। সেজন্য যা করা দরকার তাই করছেন তিনি।

তবে তার আগে নিজের ঘরের সমস্যাও সমাধান করতে হবে তাকে। সম্রাটের স্ত্রী হিসেবে পম্পিয়ার প্রভাব এই সাম্রাজ্যে কম না। সম্রাট হিসেবে একজন সম্রাজ্ঞী না থাকলে ঠিক মানায় না। চিরকুমার রাজা কেউ মেনে নেবে না, এজন্যই বিয়েটা করেছিলেন তিনি। আর যেনতেন কাউকে তো বিয়ে করা যায় না। এজন্য একজন অভিজাত পরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলাই উপযুক্ত। প্রথম সময়ে বেশ সাবধানে পা ফেলতে হয়েছিল তাকে। তিনিই এই রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম ইতালির বাইরের সম্রাট। নাক উঁচু জাতীয়তাবাদী নেতারা যে তার বিরোধিতা করেনি তা নয়, তবে নিজের যোগ্যতা দিয়ে সেসব এড়িয়ে গেছেন তিনি সদর্পে। আর সেই এগিয়ে চলার শুরুতেই তিনি বুঝেছিলেন, যত বড়ো অর্জন, তত বড়ো ত্যাগও করতে হবে। আর সম্পূর্ণ পুরুষাসক্ত হয়েও পম্পিয়ার মতো একজন মহিলাকে বিয়ে করা অনেক বড়ো ত্যাগ।

বিয়ের পরের প্রথম রাতের কথা তার মনে পড়ে এখনো। সাধারণ পুরুষের কাছে সেই রাতের স্মৃতি সারাজীবন সুখ দিয়ে যায়, অথচ সেই বিভীষিকাময় রাত তার জন্য এখনো দুঃস্বপ্ন। সেই তার প্রথম কোনো নারী দেহের কাছে আসা। পম্পিয়া কী ভেবেছিল তা তিনি ঠিক বুঝতে পারেননি, তবে বিছানার ওপর অনেক সময় কেটে যাবার পরেও স্বামীকে এগোতে না দেখে পম্পিয়া নিজেই এগিয়েছিলেন। স্বামীর শৈথিল্য আর ঠান্ডা শরীর দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছিলেন তিনি। আর ট্রাজানও সেদিন বুঝেছিলেন, তার স্ত্রীর পুরুষ শরীর সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ আর অভিজ্ঞতা দুই-ই আছে।

'আমাকে বলি না দিলে হতো না?' অনেকক্ষণ পরে পম্পিয়া বলেছিলেন মৃদু স্বরে। সেই স্বরে জোর ছিল না, তবে যে আক্ষেপ ছিল তার ভার পৃথিবী সমান।

'আমাদের সবাইকেই বলি দিতে হয়। আমাকেও দিতে হয়েছে। তুমি তো বুঝতেই পেরেছ, আমি সাধারণ পুরুষ নই। পুরুষ শরীরেই আমি আসক্ত। যত তাড়াতাড়ি তুমি ব্যাপারটা জানতে পারতে ততই ভালো হতো। যাক, আজ রাতেই তুমি জেনে গেলে। আমার পক্ষে কোনো মেয়ের গর্ভ দান করা সম্ভব নয়।'

পম্পিয়া রোমান সেনাবাহিনীর পুরুষদের সম্পর্কে আগে থেকেই জানেন। পুরুষ ভিড়ে থেকে থেকে এদের মধ্যে সমকামিতা বেশ ভালোভাবেই গেঁড়ে বসে। কিন্তু তার নিজের স্বামী যে এমন হবে তা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। রোমান সম্রাজ্ঞী হতে পারবেন তিনি, তার হবু স্বামী এই সাম্রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকার হবার দৌড়ে প্রথম অবস্থানে আছেন, এসব বলে আজ বিকেলেও তার বান্ধবীরা তার সাথে ঠাট্টা মশকরা করেছে। সম্রাজ্ঞী হলে সে কত সুখে থাকবে তাও বলেছে তারা। ঈর্ষা যেন ওদের চোখ থেকে ঠিকরে বেরচ্ছিল, আর ঈর্ষার পাত্রী হতে পেরে গর্বে চোখে নানা রকম রং দেখা শুরু করেছিলেন পম্পিয়া। সেসব রং এক সাথে ফিকে হয়ে যেতে বেশি সময় লাগলো না।

ট্রাজান অনেক বড়ো সেনা চালিয়ে অভিজ্ঞ। তিনি জানতেন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবেই। আর বলির বিপরীতে পম্পিয়া তার স্ত্রী হিসেবে কী পাবে সেসবের তালিকা তিনি আগেই করে রেখেছিলেন, 'আমাকে বিয়ে করে তুমি হয়তো প্রথম রাতে আঘাত পেয়েছ। তবে ভালো করে ভেবে দেখো, শরীরের সুখ কয়দিনের? তুমি কত সময় অতিবাহিত করতে পারবে মিলনে? খুব বেশি সময় না। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যে তুমি সম্রাজ্ঞীর সম্মান পেয়ে যাবে। তোমার হাতে থাকবে অবারিত ক্ষমতা। সফল মানুষ বলির তুলনায় বেশি লাভ করে থাকে। এখানেও তুমি ঠিক তাই লাভ করবে।'

সদ্য হওয়া স্বামীর দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়েছিলেন পম্পিয়া। ক্রোধ ঠেলে উঠতে চাইছে তার ব্রহ্মতালুতে, 'ক্ষমতা দিয়ে আমি কী করবো? আমার ভেতরে যে ঋতু জন্ম নেয়, সেই রসের টান প্রতি নিয়ত আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাবে। সেই আকর্ষণ কোন ক্ষমতা দিয়ে এড়িয়ে যাবো আমি? রোমান সম্রাট কি ক্ষমতার প্রয়োগ করে আমার ভেতরে তৈরি হতে থাকা সেসব নারী রস নিষ্ক্রিয় করে দেবেন? সেই ক্ষমতা কি আপনার আছে?'

'সেই ক্ষমতা আমার নেই। তবে সেই আকর্ষণের উপায় তো অবশ্যই আছে। আমি তোমাকে বিয়ে করেছি। তুমি আমাকে। সেটা শুধু রাজনৈতিক কারণে। দেহের ক্ষুধা আমিও মেটাবো। এত দাস আছে কী করতে? সম্রাজ্ঞী হিসেবে তুমিও তো অনেক দাস আর সেনার মালকিন। তারা তোমাকে পাহারা দেবে, তোমার সেবা করবে। যে-কোনো সেবা তুমি তাদের দিয়ে করিয়ে নিতে পারো। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, যে পুরুষের সাথে ইচ্ছে তুমি বিছানায় যেতে পারো। আমি সেই অনুমতি তোমাকে দিয়ে দিলাম। তবে একটা ব্যাপার মাথায় রাখবে, কখনোই

যেন দাসদের সন্তান তোমার পেটে না চলে আসে। এই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে কোনো দাসের সন্তান দাঁড়াবে তা আমি চাই না।'

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন পম্পিয়া, মুখে শুধু একটা শব্দই এসেছিল তার, 'ছি।'

তারপর অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। যেই প্রস্তাবে ছি বলেছিল পম্পিয়া সেটাই তার জন্য সবচেয়ে আনন্দদায়ক পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন মনে হয় তার স্বামী সমকামী হয়ে ভালোই হয়েছে। স্বামী যদি তার শরীরের অধিকার নিয়ে নিতো তাহলে সে কি আর প্রতিদিন এভাবে নতুন শরীরের সাথে পরিচিত হতে পারতো? না, কিছুতেই না। পুরুষ যখন নারীর শরীরের অধিকার নেয়, ঠিক তখনই সে পূর্ণভাবে নারীকে নিজের সম্পদ ভাবা শুরু করে। ঠিক যেন নিজের ঘোড়া অথবা তলোয়ারটার মতো। তারচেয়ে এই ভালো।

কাল রাতের বীভৎস কাণ্ডটার পরেও আজ পম্পিয়ার মনে কোনো হেলদোল নেই। আগে জল শুধু হাতের রক্তই ধুয়ে দিতে পারতো, মনের দেওয়ালে রক্ত জমে থাকতো বেশকিছু সময়। এখন জল দুটোই ধুয়ে দিতে পারে একই সাথে। লোকানের রক্ত সাথে সাথেই ধুয়ে ফেলেছিলেন তিনি, ঘর থেকে দেহটা সরিয়ে নিতে তেমন একটা সময় লাগেনি।

অন্দর মহলে একজন প্রহরী কমে গেছে। অন্দরে কম প্রহরী রাখা যাবে না। নতুন প্রহরী নির্বাচন করতে হবে। সেনানিবাস থেকে দশজন সেনা পাঠিয়েছেন সম্রাট ট্রাজান। এদের থেকেই পম্পিয়াকে একজন নির্বাচন করতে হবে।

দশ জন সৈন্য এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। পম্পিয়া এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের সামনে। তার ঠিক পেছনেই আছে তার একান্ত দাসী। পম্পিয়া একজন একজন করে সৈনিকের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, ছুঁয়ে দেখছেন তাদের বাহুর কাঠিন্য।

'নাহ, তোমার প্রশিক্ষণ ঠিক হয়নি। আমার পাথরের মতো দেহ দরকার, তোমারটা নরম রয়ে গেছে।'

তারপর নাকটা নিয়ে গেলেন সৈনিকের বুকের কাছে, 'নাহ, গন্ধেও তেমন মাদকতা নেই। তোমাকে দিয়ে হবে না।'

এভাবে প্রত্যেক সৈনিকেরই সামনে গিয়ে একাধারে বাহু ধরে আর গন্ধ পরীক্ষা করলেন তিনি। পেছনের দাসী কেবল মালকিনের কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছে। দাসীর আগ্রহও এখানে কম নয়। যাকেই বাছাই করা হোক না কেন, সে এই অন্দরের সদস্য হয়ে যাবে। আর অন্দরের সদস্য হয়ে গেলে সেই সৈনিক কেবল সম্রাজ্ঞীর ভোগের বস্তুই থাকবে না, ভাগ কিছু তারাও পাবে। সম্রাজ্ঞীর প্রিয় দাসী হিসেবে তার ভাগ্যে ভাগটা একটু বেশিই পড়বে।

দশ জনকে পরীক্ষা করার পর একজনকে বেছে নিলেন পম্পিয়া। বাকিদের চলে যাবার আদেশ দিয়ে দাসীর দিকে ফিরলেন তিনি, 'শোনো, এই সৈনিককে আজ রাতে আমার শোবার ঘরের দরজায় পাহারার দায়িত্ব দেবে।'

দাসী মুখ টিপে একটু হাসলো, 'আজ্ঞে সম্রাজ্ঞী।'

পম্পিয়া শাসন করে দিতে ভুল করলেন না, 'খবরদার আমার শোবার ঘরের বারান্দায় সৈনিককে নিয়োজিত করার আগে নিজের শোবার ঘরে ঢুকিয়ে ফেলো না আবার। আগে আমি, তারপর তোমরা।'

'সেই সাহস আমার কখনোই হবে না সম্রাজ্ঞী। এই প্রাসাদের কোনো মেয়েরই হবে না।'

'এবার যাও।'

দশ জন সৈন্যের মধ্যে নয়জন সেনানিবাসে ফিরে এসেছে। পুরো দৃশ্যটা সম্রাট ট্রাজান দেখলেন আড়চোখে। পম্পিয়া নতুন সঙ্গী বেছে নিয়েছে। তাকে দিয়েই কয়দিন চলবে।

নিজের অভিজাত মন্ত্রণা কক্ষে এসে বসলেন ট্রাজান। অন্দরের দিক থেকে চিন্তাটা রাজ্য শাসনে নিয়ে আসতে হবে। এখানে সব অভিজাতরা নেই। বাছাই করা মন্ত্রণা করার লোকেরা আর সেনাপতিরা অবস্থান করছে সেখানে।

নিজের আসনে বসেই সেনাপতির দিকে তাকালেন ট্রাজান, 'তোমাদের নিজ নিজ এলাকার খবর বলো। কোথাও কোনো ঝামেলা আছে?'

এক সেনাপতি উত্তর দিলো, 'সম্রাট, এত বড়ো রাজ্যে ঝামেলা তো থাকবেই। মিশরে এক ইহুদি গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। আমাদের রোমের নিয়ন্ত্রণে থাকা নীলনদের কিছু বন্দরে এর মধ্যেই আক্রমণ করেছে ওরা। কিছু সোনাও হাতছাড়া হয়ে গেছে আমাদের।'

'এটা এমন কোনো সমস্যা না। দস্যুদের মাঝে মাঝে দস্যুবৃত্তি করতে দিতে হবে। তাহলে তাদের আর পেটের চিন্তা করতে হবে না। পেট ভরা থাকলে মানুষের মাথায় স্বাধীনতার চিন্তা আসে না। আর এই দস্যুদের স্বাধীন হবার চিন্তা করতে দেওয়া যাবে না। তাহলে তারা তখন রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।'

'আজ্ঞে মহারাজ। তাদের সাথে আমাদের নিয়োগ করা স্থানীয় রাজশক্তির সহযোগিতার কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। তারা এখনো আমাদের অনুগতই আছে।'

'সে ভালো। মিশরের বন্দরগুলোতে গুপ্তচর আরও নিয়োগ করো। যারা ওসব বন্দরে ঘুস খেয়ে ব্যবসায়ীদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে তাদের কোনো ক্ষমা নেই।'

এক অভিজাত এবার বলে উঠলো, 'সম্রাট, এতে আমার একটা কথা আছে। মাঝে মাঝে ব্যবসায়ীরা বন্দরে ঘুস দিয়ে কাজ করাতে সুবিধা বোধ করে। আপনি তো জানেন সম্রাট আমি অনেক দিন বেরেনিকেতে কাজ করেছি। সেখানে দেখেছি, একটু অন্যায় সুবিধা নিতে ব্যবসায়ীরা কর্মচারীদের ঘুস দেয়। তাতে আমাদের রাজশক্তির কোনো ক্ষতি হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। ঘুসটা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত হবে না।'

'আমি সারাজীবন সেনা চালিয়েছি। সেনা চালাতে হলে নিয়ম একেবারে কড়া হতে হয়। কিন্তু বাণিজ্যের এসব খুঁটিনাটি জানাবার জন্যই আপনাদের এখানে রাখা। ধন্যবাদ আপনার মতের জন্য। ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা দাও মিশরে। কিছু দস্যু ধরে মৃত্যুদণ্ড দাও। ব্যবসায়ীরা যাতে মনে করে রোমান রাজশক্তি তাদের কথাই চিন্তা করে।'

'আজ্ঞে সম্রাট।'

'আর দস্যুদলের নেতার সাথে কথা বলার চেষ্টা করো। দেখো তারা কী চায়। আর কী দিয়ে তাদেরকে আমাদের বশে রাখা যায়।'

'আজ্ঞে সম্রাট।'

'রাজ্যের অন্য দিকের কী অবস্থা?'

'আমাদেরকে মিশরের দিকেই বেশি নজর রাখতে হবে সম্রাট। মিশরের এই ইহুদি জাতিটা বেশি সুবিধার না। ওরা স্বাধীনচেতা। কিছুতেই হার মানে না। সময় যতই যায় ততই যেন ওদের প্রতিজ্ঞা আরও শক্ত হয়। এদের সামলানোর জন্য আমাদের শুধু সেনার দিকে তাকিয়ে থাকলেই হবে না। ওদেরকে পুষে রাখতে হবে।'

'সেসবে এখন আর কাজ চলবে না। ওদের প্রধান মন্দির রোমানরাই ধ্বংস করেছে। ওরা কখনোই আর রোমানদের আপন করে নেবে না।' মতটা দিলেন একজন বৃদ্ধ অভিজাত। তার কথা কেউই ফেলে দিতে পারলো না।

সম্রাটও একমত হলেন, 'ঠিক বলেছেন। তাদেরকে নিয়েই সমস্যা। আমাদের ওপর তারা প্রতিশোধ নেবেই। ওদের বিরুদ্ধে সামাজিক কোনো পদক্ষেপই নিতে পারছি না মিশরে। এটা নিয়ে আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে।'

'হ্যাঁ। এদিকে গ্রীস অবশ্য শান্তই আছে। কোনো হেলদোল নেই। ওদিকে আমাদের ফ্রি টাউনের নীতি বেশ কাজে দিয়েছে। গ্রীকদের থেকে আমরা তেমন সুবিধা নিতে পারছি না সত্য, ওদেরকে দিয়ে তেমন কিছু করাতে পারছি না, তবে ওরা শান্ত আছে।'

সম্রাট ট্রাজান একমত হতে পারলেন না, 'আমি ইতালির বাইরে থেকে এসেছি। তবু এই অঞ্চল সম্পর্কে যেটুকু জানি, গ্রীকরা প্রচণ্ড যুদ্ধবাজ আর সাহসী জাতি। আর এদেরকে কোনো ধরনের লোভ দেখিয়েই শান্ত রাখা যায় না। গ্রীসে যদি মাঝে মাঝে একটু বিদ্রোহ হতো, কোনো অংশ আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইতো তাহলে আমার মাথায় চিন্তা আসতো না। কিন্তু তারা একেবারে শান্ত আছে। এমন হবার কথা নয়।'

'ওখানে আমরা কিছু কিছু জায়গায় শাসক হিসেবে আমাদের লোক নিয়োগ দিচ্ছি। তাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। সবাই তাদের অনুকূলে আছে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু মিশরে লোহিত সাগরের দুপাশে নজর দিতে গিয়ে আমাদের ঘাড়ের ওপরে বসে থাকা শত্রুদের হালকাভাবে নিলে চলবে না। গ্রীসের সবচেয়ে বিপজ্জনক জাতি কারা?'

প্রশ্নটা করা হয়েছে সবার উদ্দেশ্যে। এখানে সবাই গ্রীস সম্পর্কে সমান জ্ঞাত না। এখানেও সেই বৃদ্ধ অভিজাত এগিয়ে এলেন, 'এথেন্স আর স্পার্টা। নিঃসন্দেহে। ওরাই আগে প্রচুর বড়ো বড়ো যুদ্ধ করেছে। এরাই পারে আবার আমাদের বিরুদ্ধে শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে। ম্যারাথনের যুদ্ধ, হট গেটের যুদ্ধ এমনকি হাজার বছর আগের ট্রয় যুদ্ধে এই দুই রাজ্যের ভূমিকা ছিল সবার আগে। এখন আমাদের বিরুদ্ধে গ্রীস থেকে কেউ যদি সেনা একত্র করতে চায় তাহলে এরাই হবে। তবে আশার কথা হচ্ছে এদের মধ্যে সম্পর্ক অতো ভালো না। স্পার্টা আর এথেন্সের মধ্যে অনেক যুদ্ধ হয়েছে।'

'তাহলে এই দুই রাজ্য আমাদের চোখে চোখে রাখতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ওদেরকে আমরা সুবিধা দেবো, যত চাই তত, কিন্তু কিছুতেই সুযোগ দেবো না। ওখানে গভর্নর কারা আছে এখন?'

'স্পার্টায় আছেন পায়াস। তার আনুগত্য প্রশ্নাতীত। রোমের নির্দেশেই সে স্পার্টা চালায়।'

'তার কাছে দূত পাঠান। আরামে ডুবে থাকুক তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু চোখ যাতে বন্ধ করে না রাখে। তাকে এটা ভালো করে বোঝাবেন, যদি কোনো বিরুদ্ধ শক্তি জেগে ওঠে, তাহলে আমাদের কাছে আসার আগে তার বুকে ছুরি বসিয়ে তারা আসবে। তাই অসাবধান হলে মৃত্যু অনিবার্য।'

'হ্যাঁ, ভয় দেখালেই কাজ হবে। আমি এথেন্সেও একই দূত পাঠাবার ব্যাবস্থা করছি সম্রাট।' রোমের প্রধান সেনাপতি বেরিয়ে গেলেন। কাজের আদেশ পাওয়া গেছে। আর দেরি করা যাবে না।

'পায়াস কেমন লোক? বুদ্ধি আছে?' প্রশ্নটা সম্রাট এবার করলেন বৃদ্ধ অভিজাতকে।

'বুদ্ধি যদি কিছুটা থাকেও তবে সে সেটা কাজে লাগায় বলে মনে হয় না। সারাক্ষণ প্রাসাদে মেতে আছে নানা আনন্দে। স্পার্টা নগরীতে আরাম আয়েশের কোনো অভাব নেই। তাদের দাসের অভাব নেই, খাবারের অভাব নেই, অভিজাতদের জন্য সেসব যথেষ্ট আছে।'

'ওদিকেও অভিজাত নিয়ম চলে তাহলে। অভিজাতরা কি স্পার্টায় শাসনে কোনো ভূমিকা রাখে?'

'না মহারাজ। ওরা শুধু বিশেষ নাগরিক সুবিধাই গ্রহণ করে। শাসনের ঝামেলায় যায় না। ওদের মধ্যে অভিজাত নির্বাচনের নিয়ম আছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাও আছে।'

'থাকুক। যে অধীন যত আরামে থাকে তার শাসকও ততই আরামে থাকে।'

'আজ্ঞে সম্রাট। আমি তাহলে যাই। দেখি, গ্রীসে পাঠানোর জন্য গ্রীসের বাসিন্দা কোনো গুপ্তচর পাই কি না।'

'আচ্ছা।'

সম্রাট নিজেও বেরিয়ে এলেন মন্ত্রনাকক্ষ থেকে। অন্দরের দিকে হাঁটতে লাগলেন তিনি। রাজ কাজে এতক্ষণ ব্যস্ত থেকে নিজেকে একটু হালকা মনে হচ্ছে। এতক্ষণে কাল রাতের পম্পিয়ার করা বিভীষিকাময় কাজটার কথা মন থেকে মুছে গেছে।

পানশালা থেকে বেরিয়ে ইভান আর দেরি করলো না। অন্ধকার তার জন্য কোনো সমস্যাই নয়। অন্ধকারে চলাচল করার বেশ কঠিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে। তার ওপর একেবারে জঙ্গলের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেই নগরে। পথের মাঝে মাঝেই জ্বলছে মশাল। সেও শিবির থেকে একটা ছোটো মশাল নিয়ে এসেছে। লুকানো আছে কোমরের কাছে।

মহামান্য অ্যালেস্টরের বাড়ি খুঁজে পেতে খুব একটা সময় লাগলো না। পানশালার ঐ লোক একেবারে সঠিক দিশাই দিয়েছিল। বাড়িটা দূর থেকে দেখেই চিনতে পারলো ইভান। একটু দূরে থাকতেই দাঁড়িয়ে পড়লো সে। সদর দরজায় গিয়ে প্রহরীর কাছে ঐ দাসীর আত্মীয় পরিচয় দেওয়ার কোনো মানেই হয় না। দুই তরুণী সেদিন নিশ্চয়ই তার সামনে অন্য কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে এই আত্মীয় হবার উপায় বলেছিল। ইভান একমনে তাকিয়ে আছে বাড়ির দিকে। ঐ দাসীর আত্মীয় হবার কোনো ইচ্ছে তার মনে নেই। তবে তার মালকিনের আত্মীয় হবার কোনো সুযোগ যদি পাওয়া যায় তবে সেটা লুফে নেবে সে।

যে কাজটা এখন সে করতে যাচ্ছে তাতে বিপদের সম্ভাবনা ষোলো আনা। তার পুরো জীবন সংশয় হতে পারে এতে। ক্রিল্ট এয়ারের কর্তারা ধরতে পারলে নিশ্চিত নির্বাসন দেবেন অথবা প্রাণদণ্ড। তবে তাদের হাত পর্যন্ত নাও যেতে পারে সে। এখানে প্রহরীদের হাতে ধরা পড়লে সাথে সাথেই ব্যাবস্থা হয়ে যাবে। একজন মহা অভিজাতের বাড়িতে চোর সম অনুপ্রবেশের ফল তাই হবার কথা।

ফিরে যাবার ইচ্ছেটা যে তার মধ্যে একবারও আসেনি সেটা বললে ভুল বলা হবে। তবে কোমরের কাছে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা খরগোশটা একটু নড়ে উঠতেই নিজের এখানে আসার কারণ আর আত্মবিশ্বাস দুটোই ফিরে পেলো সে। সে তার দলের সেরা ক্রিল্ট এয়ার। এখানে যারা পাহারা দিচ্ছে তারা নিশ্চয়ই যোগ্যতায় তার মতো নয়। আর হলেই অসুবিধে কী? ঐ নাম না জানা মেয়ের জন্য এটুকু তো করতেই হবে। নামটা অন্তত জেনে নিতে হবে। আর সেই সাথে যদি চোখের দেখা দেখতে পাওয়া যায় তবে তো পোয়াবারো।

এবার নিজের কাজে মন দিলো সে। অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে বাড়িটা চারপাশ থেকে ঘুরে দেখতে লাগলো। খুব সাবধানে। কোনো শব্দ করছে না। রাস্তায় থাকা আলোগুলো থেকেও যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চলছে সে। মনের ভেতরে চলছে হিসেব। কয়েকবার ঘুরে এসে একটা অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে হিসেব করতে শুরু করলো সে।

প্রায় ত্রিশ জন প্রহরীকে দেখেছে সে। তারা পাহারা দিচ্ছে। ভেতরে আরও প্রহরী থাকতে পারে। এটা তার সন্দেহ নয়, সে নিশ্চিত বাইরে থেকে অদৃশ্য

অনেক প্রহরী আছে ভেতরে। এত অসুবিধার মাঝে একটাই সুবিধা আছে তার। তাদের সবার অবস্থান সে জানে, কিন্তু এই প্রহরীরা কেউই জানে না, সে ভেতরে আসছে।

দেবতাদের নাম স্মরণ করে আর দেরি করলো না সে। একবার কার্য স্থির করে নিতেই তার মন থেকে সব সন্দেহ উবে গেল। এরই মধ্যে ঘুরে ঘুরে বাড়িতে প্রবেশের জন্য সবচেয়ে উপযোগী জায়গাটা নির্ণয় করে নিয়েছে। সেই দেওয়ালের নিচের অন্ধকারে একেবারে মিশে গেল ইভান। একটাই প্রার্থনা, খরগোশটা যেন কোনোভাবেই শব্দ করে না ওঠে। যদিও মুখ বাঁধা আছে, তবু প্রার্থনা করতে তো অসুবিধা নেই।

দেওয়ালের ওপাশে প্রহরীর হাতের আলোর চলাচল লক্ষ্য করছে সে শিকারি বেড়ালের মতো সন্তর্পণে। আলোটা ঠিক তার বিপরীত দিকটা পেরিয়ে যেতেই এক লাফে সে চড়ে বসলো দেওয়ালের ওপর। এদিকে স্থির আলোর উৎসগুলো থেকে আলো তেমন একটা আসছে না। মোটামুটি অন্ধকার আছে। এক লাফে নেমে পড়লো সে দেওয়াল থেকে। বাড়ির ভেতরে তার পা পড়লো একেবারে নিঃশব্দে। যে প্রহরী একটু আগে এখান দিয়ে আলো হাতে পেরিয়ে গিয়েছিল সে এখন বড়োজোর দুই পেস দূরত্বে আছে। দম আটকে ফেললো সে। আসার আগে স্নান করে আসার জন্য নিজেকে ধন্যবাদ দিলো সে। নইলে গায়ে যে ঘামের উৎকট গন্ধ হয়েছিল। এই প্রহরী সেই গন্ধ শুঁকেই ওর উপস্থিতি টের পেয়ে যেতো।

যাক, প্রহরী ফিরে এদিকে তাকাবার আগেই পগার পার হয়ে যেতে হবে। নিঃশব্দে অন্ধকার আর দালানের দেওয়াল আর থামের ছায়া ধরে ধরে এবার বাড়ির দেয়ালের লাগোয়া এসে দাঁড়ালো সে। সদর দরজা বন্ধ। শুধু বন্ধই নয়, সেই সাথে দুজন প্রহরী নিশ্চল সেই দরজা পাহারা দিচ্ছে। ওদিক দিয়ে প্রবেশ করা যাবে না। সেই আশাও করেনি ইভান। সে এই দেওয়াল বেয়ে উঠে যাবে। একবার দোতালার বারান্দায় উঠতে পারলে বাকিটা দেখা যাবে। তবে ইভান জানে এই বাড়িগুলো বানানো হয় স্পার্টার সেরা কারিগরদের দিয়ে। এখানে দরজা অথবা জানালা ছাড়া প্রবেশ করা অতটা সহজ হবে না। তবে ইভানকে যারা যুদ্ধ আর কৌশল শিক্ষা দিয়েছিল তাদের একটা কথা মাথায় বেজে চলছে তার। পৃথিবীতে মানুষের বানানো কোনো জায়গা নেই যেখানে প্রবেশ করা যাবে না। সব জায়গাতেই পরিচয় আর অবস্থান গোপন করে ঢোকা যায়। অবশ্য যেসব জায়গা দেবতারা বানিয়েছেন, মানে এই প্রকৃতি তার রহস্য মাঝে মাঝেই মানুষকে ধন্ধে ফেলে দেয়। তার সাথে না লড়াই করাই শ্রেয়।

অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে রেখে দোতলায় ওঠার উপায় খুঁজতে লাগলো ইভান। দোতলার বারান্দা থেকে কিছু লতা নেমে এসেছে। তবে এগুলো তার

দেহের ভার রাখতে পারবে না। না এদিকে হবে না। বাড়ির অন্য পাশে গি
দেখা যাক।

এদিকে এসে একটা উপায় মাথায় এলো তার। আসলে মাথায় নয়, এদি
আসতেই দেখতে পেলো সে উপায়টা। এদিকে একটা গাছের একটা ডাল বারান্দা
মোটামুটি কাছেই আছে। চেষ্টা করলে লাফিয়ে সে ধরতে পারবে বারান্দার পা
রেলিং। এখন গাছে চড়তে হবে।

গাছে তরতর করে উঠে সেই ডাল বেয়ে বারান্দার যত কাছে আসা যায় চ
এলো সে। এদিকে একজন প্রহরী আছে। এমনিতে তার চোখ এখন এদিকে নে
কেউ গাছ বেয়ে উঠবে এটা মনে হয় কেউ চিন্তাও করেনি। তবে সে যদি বারান্দা
লাফিয়ে পড়ে তাহলে শব্দ হবে। আর শব্দ না করার একটাই উপায় আছে।
হাত পায়ে বারান্দার রেলিং ধরা যাবে না। শুধু দুই হাতের দশ আঙ্গুল ভরসা ক
ঐ রেলিং আঁকড়ে ধরতে হবে।

নিজের চোখকে অন্ধকার আরও ভালো করে সয়ে নেবার সময় দিলো
তারপর আর দেরি করলো না। কারো চোখ এই ডালের ওপর পড়লেই হয়ে গে
এক লাফ দিলো সে বড়ো করে দম নিয়ে। দূরত্বের হিসেব আর লাফের শ
সমন্বয় একেবারে নিখুঁত হয়েছে। দুই হাতের আঙ্গুল গুলো এসে পড়
দেওয়ালের রেলিঙের ওপর। তারপর শরীর টেনে অপরে তুলতে তেমন কো
সমস্যা হলো না।

এবার আরও বেশি সতর্ক হলো ইভান। তাদেরকে এভাবে মানুষের বাড়ি
গোপনে ঢোকার প্রশিক্ষণ যখন দেওয়া হয়েছিল, তখন একটা কথা সবসময় ব
হতো, পুরুষ সৈনিক হিসেবে যতই প্রশিক্ষণ নেক না কেন, প্রকৃতির দেওয়া
ইন্দ্রিয় ব্যবহারে নারীর সমান ক্ষমতা পুরুষ কখনোই অর্জন করতে পারে না।
কোনো অন্দরে প্রবেশ করলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হবে।
শিক্ষাই এখন মানছে ইভান। একটা তরল ছড়িয়ে দিলো নিজের পোশাকের ও
এখন আর তার দেহের গন্ধ আচমকা কারো নাকে ধাক্কা দেবে না।

দোতলার একটা দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো সে। সাথে সাথে জমে গেল।
ঘরে একটা মেয়ে। মেয়েটাকে সে চেনে। ডোরা। তার দিকে পেছন ফিরে আ
দরজা দিয়ে বেরোতে যাবে সে, এমন সময় দুই প্রহরী এসে একেবারে দরজা
সামনেই দাঁড়িয়েছে। বাইরে বেরোনোর কোনো উপায় নেই। আর এই ঘ
আচমকা লুকিয়ে পড়ার কোনো জায়গাও চোখে পড়ছে না। একটা কাজই কর
আছে এখন। সেটাই করলো ইভান।

ডোরার দিকে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেল ইভান। মেয়েটা তার দিকে ফিরলে
বিপদ। তার আগেই মেয়েটার পেছনে পৌঁছে গেল সে। শক্ত হাতে আলতো ক
পেছন থেকে চেপে ধরলো মেয়েটার মুখ।

ওদিকে বিছানায় শুয়ে আছে ইনোন। ভেবেছিল শুয়ে থাকলেই ঘুম চলে আসবে। কিন্তু চিন্তা রোগের তো কোনো ওষুধ নেই, আর যখন এই রোগ হয় তখন মনকে বশে নিয়ে নিতে তার তেমন সময় লাগে না। ইনোন বিছানায় স্থির থাকতে পারছে না, বারবার মনে হচ্ছে ঐ যুবক চলে এলে কি হবে। এখন আর মনে কোনো রাগিণী বাজছে না তার। কোনো রোমান্টিসিজমের কথাও মনে আসছে না। ধরা যাক, ঐ ছেলে এসেছে, তারপর কিছু একটা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল প্রহরীদের হাতে। তখন তো সেও মরবে আর মরার আগে মার খেয়ে তাকেও মেরে রেখে যাবে। না, এভাবে শুয়ে থেকে লাভ নেই।

সে জানে এখন কোন পদক্ষেপ নিতে হবে। যুবক যে সময় বলেছিল তা হয়ে এসেছে। যদিও মনে হয় আসবে না তবু ডোরাকে একটু বাইরে পাঠালে ক্ষতি কী। ডোরা একটু বাইরে থেকে দেখে আসুক। যুবক যদি বাইরে এসেও থাকে তাহলে ডোরা তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে পার করে দিতে পারবে।

নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো সে। চলতে লাগলো ডোরার কামরার দিকে। ডোরা তার দাসী হলেও প্রায় সখীর মতো প্রিয়। অন্য দাসীদের মতো তাকে নিচতলায় একই ঘরে গাদাগাদি করে থাকতে দেওয়া হয়নি। ছোটো হলেও এই দোতলায় তার জন্য একটা কামরার ব্যাবস্থা করে দিয়েছে ইনোন। বাবাকে একটু মিষ্টি করে বলতেই রাজি হয়ে গেছেন তিনি। স্পার্টার ঐ প্রবল প্রভাবশালী লোকটা মেয়ের সামনে এলেই যেন একেবারে নরম পনিরের মতো হয়ে যান।

বাবার কথা এখন মাথা থেকে দূর করে দিলো সে। কাজে মন দিতে হবে। একটা কেলেঙ্কারি কিছুতেই হতে দেওয়া চলবে না। ডোরার কামরার সামনে চলে এলো সে। দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। এদেরকে দূরে পাঠাতে হবে।

প্রহরী দুজন ইনোনকে দেখে মাথা নিচু করলো। ইনোন কৃত্রিম রাগ দেখালো, 'তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কী করছো? এভাবে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কি পাহারা দেওয়া যায়? যাও টহল দিতে থাকো। ফাঁকিবাজি করলে জানো তো কী হবে। বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন বাবা তোমাদের । তখন দস্যুদের পাহারা দিতে হবে। আরামের চাকরি আর কপালে থাকবে না।'

প্রহরীরা যথেষ্ট অবাক হয়েছে। মালিকের এই মেয়েকে তারা অনেক শান্ত বলেই জানে। এমন ব্যবহার সে কখনোই করেনি। তারা আর দেরি করলো না। টহল দিতে শুরু করলো দ্রুত পায়ে। চলে গেল বারান্দার অন্যদিকে।

যাক, একটা কাজ শেষ হয়েছে। এবার ডোরাকে সাবধানে বাইরে পাঠাতে হবে। সেদিনের সেই নিয়ম ভঙ্গে সেও ছিল। তারও কিছু দায়িত্ব আছে।

তবে ডোরার ঘরে প্রবেশ করেই জমে গেল ইনোন। একটা অস্ফুট আর্তনাদ তার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইলো। একটু বেরোতেই সেই স্বর গিলে ফেলল সে। আরেকটু জোরে আওয়াজ হলেই প্রহরীরা শুনে ফেলতো। ভাগ্য ভাল একটু

আগেই প্রহরীদের একটু দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে সে। নইলে প্রহরীরা এটুকু আওয়াজই শুনে ফেলত আগের জায়গায় থাকলে।

ডোরাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে এক যুবক। যুবকের হাত ডোরার মুখে চাপা দেওয়া। ডোরা জোরাজুরি করছে কিন্তু কিছুতেই নড়তে পারছে না। এমনকি মুখ দিয়ে একটু শব্দও বের করতে পারছে না।

না, চিৎকার করলে হবে না। যে যুবক ডোরাকে ধরে আছে তাকে চিনতে পেরেছে ইনোন। সেদিনের সেই যুবক। এই পাগল চলে এসেছে। শুধু চলে আসেনি, একেবারে তাদের অন্দরে ঢুকেও পড়েছে।

ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে ইনোনের মাথায়। প্রথমেই দৌড়ে গিয়ে ও দুজনের সামনে দাঁড়ালো।

এভাবে মেয়েটা এই ঘরে ওর সামনে চলে আসবে তা ভাবতেও পারেনি ইভান। মেয়েটাকে দেখেই সে যেন ভুলে গেল, কোথায় আছে সে, কী করছে ভুলে গেল সে একটা মেয়ের মুখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে। মেয়েটাকে দেখে তার সব বিস্মরণ হলো। ডোরার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিলো সে। সেই সাথে ডোরার ওপর থেকে সরিয়ে নিলো আরেক হাতের বাঁধন। এক দৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে এখন সামনের মেয়েটার দিকে।

ডোরা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মুখের ওপর থেকে হাতটা সরে যেতেই এবার সে জোরে চিৎকার দিয়ে বাড়ির সব মানুষ জড়ো করার জন্য গলায় সব শক্তি এনে জমা করলো।

ইনোন বুঝতে পারলো সমূহ বিপদ। একবার ডোরা চিৎকার করে উঠলে প্রহরীরা চলে আসবে। তখন কিছুতেই আর ব্যাপারটা সামলানো যাবে না। ও এবার জোরে চেপে ধরলো ডোরার মুখ। তারপর ডোরার কানের কাছে মুখ এনে মৃদু স্বরে বলল, 'আরে গাধা, চুপ কর। এই ছেলেকে চিনতে পারছিস না? সেদিনের সেই ছেলেটা। ও ধরা পড়ে গেলে আমরাও ধরা পড়ে যাবো।'

ডোরা এতক্ষণ ছেলেটাকে দেখতেই পায়নি, 'আরে না দেখলে চিনবো কী করে। আমি তো মনে করেছি কোনো দস্যু বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। আমার জান বেরিয়ে যাচ্ছিলো।' ডোরার ক্রোধ গিয়ে পড়লো যুবকের ওপর। তার দিকে বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো সে। এবারো বাঁধা দিলো ইনোন, 'থাক, কেলেঙ্কারি যা হবার হয়েছে। আর বাড়াতে হবে না। তুই এখন এই ঘরের দরজার বাইরে যা। ওকে আমি দেখছি। খবরদার, কেউ যেন এই ঘরে ঢুকতে না পারে। আর কেউ যদি একান্ত চলেই আসে, তাহলে সংকেত দিবি।'

ডোরার মনে এই আদেশ মানার কোনো ইচ্ছেই নেই। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছে, ভালো গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে তারা। এখন সাবধানে কাজ না করলে চলবে না। কোনোভাবেই ধরা পড়া চলবে না। সে চলে গেল দরজার বাইরে।

এবার ইনোন সরাসরি তাকালো যুবকের দিকে, 'তুমি কি পাগল?'

প্রশ্নটা যেন যুবক শুনতেই পায়নি। সে তখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ইনোনের দিকে। প্রশ্নটা আবার করতে হলো ইনোনকে, 'তুমি কি পাগল?'

একটু জোরে প্রশ্নটা করা হলো এবার। ইভানের জ্ঞান ফিরে এলো যেন। সে থতমত খেলো, 'না, পাগল হতে যাবো কেন? এমনই তো কথা হয়েছিল সেদিন। আজকে না আপনাকে খরগোশ দেবার কথা। আমিও তো বলেছিলাম, চাঁদ যখন মাথার ওপর থেকে হেলে পড়বে তখনই আমি আসবো। তাই তো এসেছি।'

'তোমাকে বলা হয়েছিল দরজায় এসে বলতে, তুমি ডোরার আত্মীয়।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু মিথ্যে বলার ক্ষমতা আমার নষ্ট হয়ে গেছে। প্রহরীরা একটুতেই আমার মিথ্যে ধরে ফেলতো। তারপর দিতো উত্তম মধ্যম।'

'মিথ্যে সবাই বলতে পারে। তুমি মিথ্যে বলতে পারো না?'

'না। মিথ্যে সবাই বলতে পারে না। শুধুমাত্র বুদ্ধিমান লোকেই মিথ্যে বলতে পারে।'

'তোমার বুদ্ধির কী হয়েছে? মাথায় তো কম ঘিলু নেই। ঘিলু কম থাকলে তো এতদূর চলে আসতে পারতে না।'

'এতদূর আসতে তো মিথ্যে বলতে হয়নি। শুনেছিলাম প্রেমে পড়লে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়। আমার মনে হয় তাই হয়েছে। মিথ্যে বলা সম্ভব নয়। আবার আপনাকে কথা দিয়েছি। তাই এভাবেই আসতে হলো। খরগোশ নিয়ে এসেছি।'

ইনোন বুঝতে পেরেছে, ভালো পাগলের পাল্লাতেই পড়েছে সে। বেশিক্ষণ এখানে থাকা নিরাপদ না। এই প্রাসাদ থেকে বাইরে যাবার বেশ কয়েকটা গুপ্ত রাস্তা আছে। সেগুলোর একটা দিয়েই যুবককে বের করে দিতে হবে। একটা রাস্তা এই ঘরের কাছেই আছে। প্রহরীরাও সেটার কথা ভালোভাবে জানে না।

প্রস্তাব শুনে ইভান খুশি হলো, 'যাক, ভালোই হয়েছে, যেভাবে এসেছি, সেভাবে যেতে হলে মুশকিল হয়ে যেতো।'

যুবক কীভাবে এসেছে সেটা জানার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ইনোনের। সে চলে এলো ডোরার কাছে, 'শোন, আমি ওকে প্রাসাদ থেকে বের করে দিয়ে আসি। তুই আমার ঘরে যা। কেউ যদি আমার ঘরের দিকে যায়, কিছু একটা করে সামলে নিস।'

'আচ্ছা', যুবক প্রাসাদ থেকে বের হবে শুনেই ডোরা স্বস্তি পেলো।

চারদিকে তাকিয়ে ইনোন দেখলো এখনই সুযোগ। কাছেধারে কেউ নেই। যুবককে ইশারা করলো সে। দুজনের মিলে একটা ছোটো দরজা খুলে তার মধ্যে ঢুকে পড়লো। দরজা বন্ধ করে দিলো ইনোন।

ইনোনের একেবারে পেছন পেছন যাচ্ছে ইভান। গোপন রাস্তা স্বাভাবিক রাস্তার মতো চওড়া হয় না। এই রাস্তাটাও যথেষ্ট সরু। ইনোনের কাছ থেকে মোটামুটি দূরত্ব বজায় রেখেছে ইভান। তবে সেটা ইনোনের শরীরের তরুণী সুঘ্রাণ নাকে না আসার

জন্য যথেষ্ট নয়। এক রাতের জন্য নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলো ইভান। যাকে এক নজর দেখার জন্য এসেছিল, এখন তার সাথে এত কাছাকাছি হাঁটছে সে।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসতে তেমন সময় লাগলো না। একটু পরে প্রাসাদের আস্তাবলের পেছনের একটা সুরঙ্গ দিয়ে বের হলো ওরা।

ইনোন দেওয়ালের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলো, 'এখানে যেহেতু ঢুকতে পেরেছ, আশা করি, এই দেওয়াল পেরিয়ে যেতে তোমার কোনো সমস্যা হবে না।'

'যাবার আগে আপনার জিনিসটা দিয়ে যাই। এত কষ্ট করে আনলাম। ফিরিয়ে নিয়ে গেলে বেচারার মন খারাপ হবে।'

'কার মন খারাপ হবে?'

নিজের কাপড়ের ভেতর থেকে খরগোশটা বের করে আনলো ইভান। বাড়িয়ে দিলো ইনোনের দিকে, 'দুটো খরগোশের কথা হয়েছিল। একটাই জোগাড় করতে পেরেছি।'

খরগোশ এখনো সুস্থই আছে। খরগোশ হাতে নিল ইনোন, যুবকের দিকে তাকালো পূর্ণ দৃষ্টি মেলে। গোপন পথে ঢোকার সময়েই একটা মশাল নিয়ে ঢুকেছিল ইনোন, তা এখনো জ্বলছে। সে আলোয় ইনোনের দৃষ্টি ইভানের চো এড়ালো না।

'তুমি কি কেবল এই খরগোশ দেবার জন্যই এসেছ?'

'নাহ', এবার ইভানও নিজের পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো ইনোনের দিকে, 'আ আপনাকে এক নজর দেখতে এসেছিলাম। দেবতাদের ধন্যবাদ, তারা আমার প্রার্থ শুনেছেন, আমার চাওয়ার চেয়ে আজ রাতে আমার প্রাপ্তির মাত্রা অনেক বেশিই।'

এবার লজ্জা পেলো ইনোন। সেও গত দুদিন কেবল এই যুবককে নিয়ে ভেবেছে। নিজেকে মনে মনে অনেক চোখ রাঙ্গিয়েছে, অনেক বার বাঁধা দিয়েছে, কি কিছুতেই এই যুবকের কথা ভাবা থেকে নিজের মনকে বিরত রাখতে পারেনি।

ইভান মৃদু স্বরে বলল, 'আপনার নামটা কিন্তু সেদিন বলেননি। আজকেও কি বলবেন না? বললে হয়তো জপ করার জন্য একটা কিছু পাওয়া যেতো। এখ কেবল অনুভূতি আছে, কোনো ভাষা নেই।'

ইনোন মৃদু স্বরে বলল, 'ইনোন। তোমার নাম কী?'

'ইভান।' আরেকবার ইনোনের দিকে তাকিয়ে জোরে শ্বাস নিল ইভান, 'আজ আমি তাহলে যাই। দেরি হলে সবাই আবার আপনাকে খুঁজতে শুরু করবে।'

ইভান দেওয়ালের দিকে এগোতেই পেছন থেকে ডাকলো ইনোন, 'দাঁড়াও।'

ইভান ফিরে এলো, সে অবাক হয়েছে, এখানে আর কিছুই করার নেই বলে ধারণা তার, 'আর কিছু বলবেন?'

ইনোনের মুখ থেকে কোনো কথা বেরিয়ে এলো না। তার হাতের মশালের আলো আস্তে আস্তে কমে আসছে। সে নত দৃষ্টিতে একবার তাকাচ্ছে নিচের দিকে আবার দৃষ্টি তুলে তাকাচ্ছে ইভানের দিকে।

ইভান এর আগে পরিণয় তো দূরের কথা প্রেমের কথা ভেবেও দেখেনি। কিন্তু ইনোনের চোখে এখন যে ভাষা, তা পড়তে অভিজ্ঞতা থাকার দরকার পড়ে না, কিওপিড সবসময় যুবক যুবতীর মনে সেই ভাষার গান গেয়ে চলে। ইভান বুঝতে পারলো এখন তাকে কী করতে হবে।

ইভান ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ইনোনের দিকে। একটু ঝুঁকে এলো সে। ইনোনের ওষ্ঠ ও অধরের মধ্যে কিঞ্চিত ব্যবধান দৃষ্ট হলো। ইভান এগিয়ে দিলো তার ঠোঁট। দু জোড়া ভাষা প্রকাশের মাধ্যম মিলিত হলো নিজেদের মধ্যে। কোনো কথা বলতে হলো না।

নিজের এক হাত থেকে মশাল আর আরেক হাত থেকে খরগোশটা ছেড়ে দিলো ইনোন। জড়িয়ে ধরলো ইভানকে। এমন শক্ত করে কোনোকিছু এই জীবনে জড়িয়ে ধরেনি সে। ইভান হাত রাখলো ইনোনের কপোলে। আবেগের আবেশে ইনোনের ডান গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো এক ফোঁটা অশ্রু। ইভানের হাতের ওপর পড়লো যেন একটা মুক্তো বিন্দু হয়ে।

ইভান চোখ মেলল কিছুক্ষণ পরে, মশালটা নিভে যাচ্ছে প্রায়। নিজের কোমরের মশালটা খুলে নিলো সে, জ্বেলে বাড়িয়ে দিলো ইনোনের দিকে, 'এবার আসলেই আপনার যাওয়া প্রয়োজন। তেমন কিছু হলে বিপদে পড়বেন।'

'তুমি আবার কবে আসবে?' গলা ধরে আসছে ইনোনের।

'আমাকে তো আসতেই হবে। আরেকটা খরগোশ দিতে হবে না আপনাকে। দুদিন লাগবে। নিয়ে আসবো। ঠিক একই সময়ে।'

'আবার বাড়িতে ঢুকতে যেও না। এখানে আসবে। জায়গাটা চিনতে পারবে?'

'অবশ্যই। আপনার হাত থেকে তো খরগোশ পালিয়েছে।'

'পালাক। আমার আর বাদামি খরগোশের দরকার নেই।'

ইভান নিজেকে জোর করে দেওয়ালের দিকে ফেরালো, 'যাই তাহলে।'

'হ্যাঁ। পরশুদিন রাতে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো এখানে। আসবে তো?'

ইনোনের দিকে তাকিয়ে মাথাটা একটু ঝোঁকাল সে। চোখের ভাষাতেই বুঝিয়ে দিলো তার উত্তর। তারপর একটু দৌড়ে এক লাফে উঠে গেল দেওয়ালের ওপর। ওপাশে লাফিয়ে পড়তে তেমন অসুবিধা হলো না।

ইনোনের শরীরের আবেশ এখনো কাটছে না। কী থেকে কী হয়ে গেল। ঐ টান সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারেনি। ঘোর লাগা পায়ে সে মশাল নিয়ে ঢুকে পড়লো গোপন সুরঙ্গের ভেতর।

মহারাজ সাতকর্ণীর কাছ থেকে বিদায় নেবার কঠিন কাজটা সারা গেছে। এ
সহজে মহারাজ রাজি হয়ে যাবেন তা ভাবতে পারেনি রুদ্রদেব। এসব রাজাদে
মনমানসিকতার সাথে সে ভালো ভাবেই পরিচিত। নিজের প্রজাদের তা
আক্ষরিক অর্থেই নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে। তারা গুণীর মান রাখে,
প্রতিভাবানের কদর করে, তবে সেসব শুধু তাদেরকে নিজের বশে রাখার জন্য।
যদি কেউ তাদের বশ থেকে বেরিয়ে স্বাধীন হতে চায় তাতেই তাদের যত আপত্তি
হয়। রুদ্রদেবের মতো কাউকে মহারাজ এত সহজে নিজের আওতা থেকে বেরিয়ে
যেতে দেবেন এটা রুদ্রদেব ভাবতে পারেনি।

তবে মহারাজের এহেন আচরণের একটা উত্তরও এরই মধ্যে খুঁজে নিয়েছে
সে। মহারাজের সামনে এখন আর কোনো যুদ্ধ নেই। সংকট আপাতত কেটে
গেছে। আর যখন যুদ্ধ থাকবে না তখন সৈন্যের প্রয়োজনও থাকবে না। মহারা
তাই ছেড়েছেন রুদ্রদেবকে।

মহারাজ সাতকর্ণীর মন্ত্রী গিরিধারী রুদ্রদেবকে তার মনোভাব ভালোই বুঝি
দিয়েছেন। তিনি রুদ্রদেবের আশেপাশে থাকতে চান না। সেটা কোনো বুদ্ধিম
লোকেই চাইবে না। সে সাতবাহনের সেনায় এসেছে একটা রহস্য হয়ে, আর য
যাবার সময় হয়েছে, তখন সেই রহস্যের সমাধান তো দূরে থাক, রহস্যের কুয়া
আরও যেন দিক বিদিক ছেয়ে ধরেছে। বিশেষ করে ঐ সাপের গল্প এখনো সেনা
মুখে মুখে। এই গল্প ছড়িয়ে পড়তে দিতে চাইছে না রুদ্রদেব। তাহলে তাদে
জাহাজ পেতে কষ্ট হবে। কেউই এমন আপদ নিজের জাহাজে নিতে চাইবে না
একটাই ভরসা। এসব কথা সাতবাহনের সেনাদের মধ্যে হচ্ছে। তাদের সা
এখনো নাবিকদের তেমন দহরম মহরম হয়নি।

বারিগাজায় জাহাজ আসা শুরু হয়েছে একদিন হলো। আর দেরি করা যা
না। অসিতকে তাই বলেছে রুদ্রদেব, 'আর দেরি করবো না অসিত। আমাদের
একটা জাহাজ বেছে নিয়ে চড়ে বসতে হবে।'

অসিতের সমুদ্র যাত্রা নিয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। কাজটা কঠিন আর নিষি
হলেও করতেই হবে। তবে ভয় যে একেবারে পাচ্ছে না তা নয়, 'হ্যাঁ, যাত্রা তো
করতেই হবে। রাহু তো এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুনেছি, সমুদ্রে জাহাজডুবি হ
অনেক।'

'তুমি দেখছি এই কদিন সমুদ্র নিয়ে মানুষের সাথে অনেক আলোচনা করেছ
তা ঐ মানুষেরা তোমাকে ভয় দেখানো বাদে আর কোনো সাহায্য করতে পারেনি
তাই না? কে বলেছে সমুদ্রে কেবল জাহাজডুবি হয়?'

'অনেকেই বলেছে। কিছুদিন আগেই রাতে এক জাহাজ যাত্রা করেছিল। সমুদ্রে গিয়ে ডুবেছে।'

'তারপর নিশ্চয়ই শত শত জাহাজ এই বন্দর থেকে বেরিয়েছে। সেগুলো তো ডোবেনি।'

'হ্যাঁ। কিন্তু বিপদ তো শুধু একটা নয়। জাহাজ ধরুন ডুবল না। কিন্তু সমুদ্র অসুখের কী হবে?'

'সমুদ্রের আবার কী অসুখ হলো?'

গুরুকে জ্ঞান দেবার উত্তেজনায় পেয়ে বসেছে অসিতকে, 'আমি কদিন ধরে মানুষের সাথে সমুদ্র নিয়েই আলাপ করেছি। জানেন, যারা প্রথম বার সমুদ্রে যায়, তাদের জন্য সমুদ্র নরকের চেয়েও খারাপ। সমুদ্রে জাহাজে চড়লেই নতুন মানুষদের একটা বাজে অসুখ হয়, মাথা ঘোরায়, কিছুক্ষণ পরপর বমি আসে।'

'হতেই পারে। প্রথম বার ঘোড়ায় অথবা রথে চড়লেও মানুষের তাই হয়। নতুন কিছুতে শরীরকে মানিয়ে নেয়ার সময় দিতে হবে। ওসব মাথা ঘোরানো আর বমি করা আসলে শরীরের মানিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া। একবার মানিয়ে নিলে সেসব আর হবে না। সব কিছুতেই প্রথম বার আছে, সমুদ্র যাত্রাতেও।'

অসিত এবার দমে গেল। এই কিছুদিনের জড়ো করা জ্ঞানের বাহার দেখিয়ে রুদ্রদেবকে চমকে দেবে ভেবেছিল। লোকটা আর যাই করুক কখনো তো সমুদ্রে যায়নি। কিন্তু এখানেও তার জ্ঞান আছে। যোগীর কাজই এই। সে অজানাকে নিজের উপলব্ধি দিয়ে জেনে ফেলে। বেদের জ্ঞান অজানাই ছিল। যোগী ঋষিরা কারো কাছে গিয়ে সেই জ্ঞান আনেননি, নিজেরাই নিজেদের আত্মার কাছে সন্ধান করে পেয়েছেন।

রুদ্রদেব এবার কাজের কথায় ফিরে এলো, 'খালি তো উদ্ভট উদ্ভট ব্যাপারে লোকজনের সাথে আলোচনা করে তাদের মাথা খেয়েছ, সাথে নিজেরটাও খেয়েছ। কাজের কথা তো কিছুই আলোচনা করোনি।'

অসিতের মুখটা একেবারে তেতো হয়ে গেল, 'কাজের কথা মানে? এসব কি অকাজের কথা?'

'না, এসবও কাজের কথা। তবে এসব এখন না জানলেও তেমন কোনো ক্ষতি নেই। সেগুলো সামলানো যাবে। আচ্ছা, বলো তো আমরা এখন কী করতে যাচ্ছি?'

'সমুদ্র যাত্রা করতে যাচ্ছি। আর কি?'

'সমুদ্র যাত্রা কেন করতে যাচ্ছি? প্রমোদ ভ্রমনের জন্য?'

'না, রাহুকে ধরতে যাচ্ছি। অঙ্গদকে ফেরত আনতে হবে।'

'ঠিক বলেছ। সমুদ্র যাত্রা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য রাহুকে ধরা। এখন আমাদের বুঝতে হবে, কারো পিছু নিয়ে কাউকে ধরতে গেলে কী করতে হয়।'

'কী করতে হয়? আমি তো কখনো কারো পিছু নেইনি।'

'ভুল বললে। তুমি তো গ্রাম থেকে রাহুর পিছু নিয়েই এখানে এসেছ। রাহুর পিছু নেবার সময় তুমি জানতে সে পশ্চিমের সমুদ্র বন্দরে কাজ করে। তোমার সামনে একটা দিক ছিল। এবার চিন্ত করো, এখানে কি কোনো দিক আছে? বলো তো, কোনদিকে গেছে রাহু?'

এবার ধন্ধে পড়লো অসিত, আসলেই তো। এই ব্যাপারে তো কোনো চিন্তাই করেনি সে। রাহু গেছে কোনদিকে, মাথা চুলকালো সে, ' জানি না।'

'তা তো জানবেই না। সেটাই বের করতে হবে। আর এখানে প্রথম উত্তর, রাহুর কাছে তেমন কোনো পছন্দ করার ব্যাপার ছিল না। একটা ঝামেলায় পড়ে জাহাজগুলো পালিয়েছে। সেও পালিয়েছে। এখন কথা হচ্ছে, সব জাহাজ কোনদিকে গেছে?'

'কোনদিকে গেছে? সব জাহাজ তো আর একদিকে নিশ্চয়ই যায়নি।'

'হ্যাঁ। এটা নিয়েই তোমার সবার আগে খোঁজখবর নেয়া উচিত ছিল। সব জাহাজ একদিকে যায়নি। তবে চিন্তা করো, এখানে দেশি বিদেশি সব রকমের জাহাজই ছিল। দেশি জাহাজগুলো পালিয়ে নিজেদের বন্দরে ফিরে যাবে। আর বিদেশিগুলো কোথায় যাবে?'

'অবশ্যই নিজেদের দেশে। এমন অবস্থায় এই দেশে তারা থাকতে চাইবে না।'

'হ্যাঁ। আর আমরা যতটুকু খবর পেয়েছি, রাহু একটা বিদেশি জাহাজেই ছিল। এমনিতেও বাণিজ্যের হিসেব মতো জাহাজগুলো বারবারিকন থেকে শুরু করে এখানে এসে বাণিজ্য শেষ করে। তাই রাহু এখন এই ভারত মহাসাগর পেরিয়ে যাচ্ছে ঐ পারের দিকে। আর ঐ পারে কী আছে তা সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।'

'না, নেই।'

'আমি আসলে তোমাকে বোঝাতে চাইছি, যে-কোনো একটা জাহাজে উঠে বসলেই আমাদের চলবে না। আমাদেরকে অবশ্যই ঠিক জাহাজে উঠতে হবে। যেটা বিদেশি। আর আমাদেরকে রাহুর কাছে নিয়ে যেতে পারবে।'

'সেই জাহাজ আমরা কীভাবে চিনতে পারবো? আমরা কীভাবে বুঝবো, রাহু যে জাহাজে উঠেছে, সেটা কোথায় গেছে?'

'হ্যাঁ, বোঝার কোনো উপায় নেই। সমুদ্রের ওপারেও নিশ্চয়ই মাত্র একটা বন্দর নেই। অনেক বন্দর। রাহুর জাহাজ কোন বন্দরে যাবে তা আমরা কীভাবে

বুঝবো?' এই চিন্তাই গত কয়েকদিন ধরে করছে রুদ্রদেব। আর আজ তা দিয়ে দিলো অসিতের মাথায়।

অসিত মাথা নিচু করে এপাশ ওপাশ করছে, 'আমি তো ভেবেছিলাম, একটা জাহাজে উঠে পড়লেই হবে। এখন তো দেখছি তা নয়।'

'হ্যাঁ, তা নয়। তারমানে আমাদেরকে সম্ভাব্য পথ পাড়ি দিতে হবে। পথে যতগুলো বন্দর পড়ে সবগুলোতে খোঁজ নিতে হবে। আমি সেই বন্দরের ব্যাপারেই খোঁজ নিয়েছি বেশ কয়েকদিন ধরে।'

'খোঁজ নিয়ে কী জানতে পারলেন?'

'জেনেছি অনেক কিছুই। তবে সেসব আমাদেরকে একেবারে সঠিক পথে নিয়ে যাবে তা বলতে পারছি না। তবে শুরু করতে পারবো।'

'আচ্ছা। তাহলে জাহাজ পছন্দ করে উঠে পড়ি।'

'হ্যাঁ, সেই কাজটাই করতে হবে। দাঁড়াও প্রথমে হিসেবটা আরেকবার ঝালিয়ে নিই। এইদিক থেকে জাহাজ যায় মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত।' মাটিতে কাঠি দিয়ে মানচিত্রটা আঁকার চেষ্টা করছে রুদ্রদেব, 'এখন কথা হচ্ছে, সেই আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছানোর অনেকগুলো উপায় আছে। মোটামুটি বড়ো ছোটো মিলিয়ে শ খানেক বন্দর আছে।'

অসিত এবার মাথায় আক্ষরিক অর্থেই হাত দিলো, 'তাহলে সেরেছে। এই শ খানেক বন্দরের যে-কোনো একটাতেই রাহু গিয়ে থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ, সম্ভাবনা তো তাই বলে। যে-কোনো একটায় যেতে পারে সে।'

'তাহলে উপায়। এখানের কোনো জাহাজ নিশ্চয়ই সেই সব বন্দরে যাবে না। আমরা তাহলে উঠবো কোন জাহাজে?'

'মানুষ হিসেব করে কেন জানো তো অসিত?'

'অংক মেলানোর জন্য। কার ভাগে কয় মুদ্রা পড়েছে তা জানার জন্য।'

'হ্যাঁ, ঠিক। সেটাও একটা হিসেব। এছাড়া আরেকটা কারণেও মানুষ হিসেব করে। তা জানো?'

'না তো। আবার কীসের হিসেব।'

'একটু আগে বললাম না সম্ভাবনার কথা। সেই সম্ভাবনার ক্ষেত্র ছোটো করে আনার জন্য মানুষকে মাঝে মাঝে হিসেবে বসতে হয়।'

'আসুন, তাহলে সেই হিসেব করি।'

'হ্যাঁ, করতে হবে। তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ, একজন গুপ্তচরকে যখন কোনো অপরাধীর পেছনে পাঠানো হয় তাকে ধরে আনার জন্য তখন সেই গুপ্তচর কীভাবে বোঝে অপরাধী কোথায় আছে অথবা কোথায় গেছে? সে তখন এই সম্ভাবনার ক্ষেত্র সংকুচিত করে আনার হিসেব করে আমাদের তাই করতে হবে। প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, রাহু শুধু জানে এই বন্দর আর নগর আক্রমণ করা

হয়েছিল। তাই আতঙ্কে অন্য সবার সাথে সেও ভেগেছে। তার তো কোনোভাবেই জানার কথা ছিল না যে আমরা দুজন এই বন্দরে এসেছি তারই খোঁজে, তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক! রাহু তো জানে না আমরা ওর পিছু নিতে নিতে বারিগাজা পৌঁছে গেছি। ঠিকই তো।'

'বেশ। এইতো আমরা সম্ভাবনার ক্ষেত্র সংকুচিত রাখার উপায় পেয়ে গেছি। তারমানে সে এমন কোথাও যাবে, যেখানে অঙ্গদকে দিয়ে তার অনেক আয় হবে। ছোটো বন্দরে এসব রোজগার করে সুবিধা হবে না। এটা রাহুও জানে। তাই সে যাবে বড়ো বন্দরে। সে ঐ এলাকায় আগেও গেছে। বড়ো সব বন্দর তার চেনা। দেখলে তো এবার সম্ভাবনার সংখ্যা কমে এসেছে। এবার আমাদের দেখতে হবে, আমাদের পথে বড়ো বন্দর কী কী আছে।'

'আমি তো সেসব কিছুই জানি না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন।' অসিতের গলায় স্পষ্ট উত্তেজনা।

'আমি যে পুরোপুরি জানি তা নয়। তবে সবার কথা শুনে আমার যা মনে হচ্ছে তাতে রাহু অঙ্গদকে নিয়ে বড়ো বন্দরে থাকবে। আর এসব বন্দরের মধ্যে আছে বেরেনিকে, মিয়োস হোমোস, আরসেনি আর আলেকজান্দ্রিয়া।'

অসিত অবাক হয়ে নামগুলো শোনে। এমন নাম সে আগে কখনো শোনেনি। এসব আবার কীসের নাম? এসবের অর্থই বা কি। নিজের দেশে অথবা রাজ্যে এমন শব্দ নেই। রুদ্রদেবও বেশ কষ্ট করেই নামগুলো উচ্চারণ করেছে। বিজাতীয় ভাষা উচ্চারণ করতে কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক।

রুদ্রদেবের কথা এখনো শেষ হয়নি, 'আরেকটা ব্যাপার আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। মাঝে মাঝে কোন কোন যাত্রী দল বেরেনিকে বন্দর থেকে আরসেনি সমুদ্র পথে যায় না। তারা সেখান থেকে যায় কপ্টস বন্দরে। কপ্টস বন্দর না-কি অবস্থিত মিশরের সবচেয়ে বড়ো নদীর তীরে। ঠিক যেমন আমাদের নর্মদা অথবা গোদাবরী। ওদের আছে নীল নদ। সেই নীল নদ ধরেও না-কি অনেক জাহাজ সরাসরি আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছায়। সেই পথেও রাহু যেতে পারে।'

'এই পথের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে কোনটা পড়ে?'

'যতটুকু জেনেছি আর হিসেব করেছি, প্রথমে পড়বে বেরেনিকে। কিন্তু তার আগে আরেকটা বন্দর আছে যাকে অস্বীকার করলে চলবে না। একটা ছোটো বন্দর। কিন্তু এদিকে আসা জাহাজ না-কি সেই বন্দরে পানি আর অন্যান্য রসদ নিতে থামে। নাম অকুলাস। আমাদের ঐ বন্দর দিয়েই শুরু করতে হবে। এখান থেকে জাহাজগুলো তাড়াহুড়া করে চলে গেছে। ঠিকমতো পানি আর অন্যান্য রসদ নিতে পারেনি। তাই রাহু যে জাহাজে করে গেছে সেই জাহাজ খুব সম্ভব অকুলাসেই প্রথম নোঙ্গর ফেলবে। আমাদেরও এমন এক জাহাজ ঠিক করতে হবে যেটা অকুলাস বন্দরে প্রথম নোঙ্গর ফেলবে।'

এবার পুরো ব্যাপারটা অসিতের মাথায় ঢুকলো, 'তাহলে জাহাজ কেন ঠিক করছি না আমরা? এখন তো বারিগাজা বন্দরে বেশ কিছু জাহাজ আছে।'

'হ্যাঁ। চলো যাওয়া যাক। দেখি এখানে কোন কোন জাহাজ অকুলাস বন্দরে যাবে। সেগুলোর একটাতে উঠে বসলেই চলবে।'

উঠে দাঁড়িয়ে বন্দরের দিকে হাঁটতে শুরু করলো দুজনে। দুজনের গায়েই এখন সাধারণ পোশাক। তাদের ঘোড়াগুলো নেয়া যাবে না। যোদ্ধা ঘোড়া ছাড়া যে কতটা অসহায়, জীবনে প্রথম বারের মতো উপলব্ধি করলো অসিত। কিছু করার নেই। ঘোড়া জাহাজে তোলা যাবে না। তারা যুদ্ধ সাজ ত্যাগ করেছে। এমনকি নিজেদের অস্ত্রসস্ত্র সাথে নিয়েছে কাপড় দিয়ে ঢেকেঢুকে। তাদের আসল পরিচয় জাহাজের লোকের কাছে শুরুতেই প্রকাশ করে দিতে চায় না রুদ্রদেব।

প্রথম যে জাহাজটা বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে গেল রুদ্রদেব। অসিত ঠিক তার পেছনেই আছে। ভাষা নিয়ে একটা ঝামেলা হবে এটা আগেই ভেবে রেখেছে রুদ্রদেব। দেখা যাক কী হয়।

'জাহাজের কাছে আসতেই তাদের দিকে এগিয়ে এলো এক নাবিক, 'কী চাই তোমাদের?'

নাবিকের প্রশ্ন শুনে রুদ্রদেবের সংশয় কেটে গেল। না, তাদের ভাষাতেই প্রশ্ন করেছে। এদিকে ব্যবসা করতে করতে এদিকের ভাষা আয়ত্তে নিয়ে এসেছে বিদেশিরা। রুদ্রদেব ধীরে উত্তর দিলো, 'এই নগরে শত্রু আক্রমণ করেছে। আমাদের আর এখানে থাকার ইচ্ছা নাই।'

'তাহলে আমাদের জাহাজে উঠে বিদেশ যেতে চাইছো?'

'আজ্ঞে। যদি একটু ব্যাবস্থা করে দেন তো ভালো হয়।'

'আমি কী করে ব্যবস্থা করবো। দাঁড়াও, সর্দারকে ডাকি। তিনি এসে সিদ্ধান্ত নেবেন। ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে কোনোদিন জাহাজে ওঠোনি। জাহাজের কাজ তো কিছুই জানো না। সর্দার নিতে রাজি হবেন কি না কে জানে।'

সর্দারকে ডাকতে হলো না, তিনি এদিকেই আছেন, নাবিকের কথাবার্তা শুনে এগিয়ে এলেন, 'কী হয়েছে?'

'এরা জাহাজে উঠতে চায় সর্দার।'

ওদের দুজনের ওপর নজর ঘুরে এলো সর্দারের। এই জাহাজের মালিক তিনি। এমনিতেও এই অবস্থায় জাহাজের দেশি কাজের লোকেরা অনেক আগেই ভেগে গেছে। এই দুজন জাহাজ চালনার ব্যাপারে কোনো সাহায্য আপাতত করতে পারবে না, তবে জাহাজে অনেক কাজের জন্যই লোকের দরকার হয়। আর শিখিয়ে দিলে এরা পালের দড়ি ধরে টানাটানি ভালোই করতে পারবে। দুজনের শরীরই যথেষ্ট শক্তপোক্ত। সারা জীবন নাবিকের শরীর দেখে তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করতে হয়েছে তাকে। নিশ্চিত হয়ে তারপর ভাড়া করেছেন

নাবিকদের। সর্দার মনে মনে রাজি হয়ে গেলেন এই দুজনকে নিতে, 'তোমর কোথায় যাবে?'

রুদ্রদেব এবারো জবাব দিলো, 'বিদেশে।' তারপর তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা কৃত্রিম বড়ো শ্বাস, 'এই জায়গার ওপর কোনো আকর্ষণ অনুভব করি না। কী আছে এখানে। সব বদলে গেছে। বিদেশ গিয়ে দেখি কী আছে কপালে।'

সর্দার যা বোঝার বুঝে নিলো, 'ঠিক আছে। যেতে পারবে। তবে জাহাজে তোমাদের আশ্রিত হিসেবে জায়গা হবে। আমি কোনো রকমের বেতন দিতে পারবো না। কেবল খাওয়া আর থাকা। চলবে?'

রুদ্রদেবের চেহারা বেশ হাসি হাসি হয়ে উঠলো, 'চলবে, চলবে। বেতন কে দেবেন। আমরা তো আপনাদের তেমন কোনো কাজই করে দিতে পারবো না। তবে যা শিখিয়ে দেবেন তা করার চেষ্টা করবো অবশ্যই।'

'বেশ। আজকে আমাদের কিছু গোছগাছ আছে। কাল ঠিক সকালে বায়ু ঠিক থাকলে আমরা রওনা দেবো। তোমরা এখন উঠবে, না-কি কাল সকালে?'

'কাল সকালেই উঠবো।' একটু ইতস্তত ভাব করে প্রশ্নটা করলো রুদ্রদেব, 'আপনাদের জাহাজ কি অকুলাস বন্দরে থামবে?'

সর্দারের ভ্রু কুচকে এলো, 'কেন? অকুলাস বন্দরের কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?'

'না, মানে আমি তো চিনি না। তবে শুনেছি অকুলাস বন্দর না-কি অনেক বড়ো বন্দর। সব জাহাজ সেখানেই না-কি প্রথমে থামে।'

সর্দার খেঁকিয়ে উঠলো, 'কোথেকে শুনেছ এসব ভুলভাল কথা। অকুলাস বড়ো বন্দর! আর জায়গা পেলে না। অকুলাস বড়ো বন্দর হলে বেরেনিকে কী? আর হ্যাঁ, একটা কথা ঠিক বলেছ, বড়ো বন্দর না হলেও সেখানে প্রায় জাহাজই থামে।'

'আপনাদের জাহাজ থামবে?' রুদ্রদেব নিশ্চিত হতে চাইছে। তার কণ্ঠে এক একটু কাঠিন্য।

সর্দার স্মিত হাসলো। জ্ঞানীর হাসি, 'তোমাদের সমুদ্র নিয়ে কোনো ধারণা নেই দেখেই এই প্রশ্ন করছো। আমাদের এই জাহাজ ছোটো। ইচ্ছে করলেও আমরা বেশি খাবার আর জল নিয়ে যেতে পারবো না। আরব সাগর পাড়ি দেবার জন্য আমাদেরকে হিসেব করে জল খরচ করতে হবে। আমাদের মতো জাহাজের অকুলাস বন্দরে না গিয়ে উপায় নেই। সেখান থেকেই আবার খাবার আর জল নিয়ে যাত্রা করবো মিশরের দিকে। অকুলাস বন্দরে আমাদের যেতেই হবে। এবার পেয়েছ উত্তর?'

রুদ্রদেব মাথা একটু নিচু করলো, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সাথে নিতে রাজি হবার জন্য। আমরা কাল ঠিক ভোরে চলে আসবো।'

'আচ্ছা। গোছগাছ করে আসো তাহলে।'

রুদ্রদেব সর্দার নাবিকের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। ওদের দুজনকে জাহাজে উঠে অনেক খাটতে হবে। শুধু খাবারের বিনিময়ে ওরা দুজন কাজের লোক পেয়েছে। রুদ্রদেবের তাতে কোন আপত্তি নেই। যেতে পারলেই হলো।

পরদিন ভোরে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে ওরা চলে এলো জাহাজের সামনে। জাহাজের ভেতরে আর বাইরে সমান তোড়জোড় চলছে তখন। সবাই শেষ সময়ে সবকিছু দেখে নিচ্ছে। মাঝ সমুদ্রে কোনো কিছুর অভাবে পড়লে সে অভাব কিছুতেই মিটবে না।

রুদ্রদেব আর অসিতকে জাহাজে ওঠার ইশারা করলো কালকের সেই নাবিক। উঠতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে একটা ডাক শুনতে পেলো তারা, 'শুনে যান।'

পেছনে তাকালো রুদ্রদেব। একটু অবাক না হয়ে পারলো না। গিরিধারী দাঁড়িয়ে আছেন। গত দুদিন ধরে তার সাথে একটু শীতল সম্পর্ক বজায় আছে।

'আপনি কষ্ট করে এখান আসতে গেলেন কেন আবার?'

'না, মহারাজের কাছ থেকে তোমরা বিদায় নিয়ে এসেছো শুনলাম। আমার সাথে তো দেখা করলে না।'

'মহামন্ত্রী, অপরাধ নেবেন না। মহারাজের কাছে যখন কাল গিয়েছিলাম আপনি তখন সেখানে ছিলেন না। রাত করে আপনার আবাসে গিয়ে আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাইনি।'

'তোমাকে দেখে আমি মাঝে মাঝে ধন্ধে পড়ে যাই। তুমি আসলে কী? যোদ্ধা নাকি অন্যকিছু? এই বর্তমান ভারতের অনেক ধাঁধা আমি সমাধান করেছি, কিন্তু তুমি একটা ধাঁধাই রয়ে গেলে আমার কাছে।'

'আমরা সবাই আসলে ধাঁধা মহামন্ত্রী। কেউই কাউকে সম্পূর্ণ পড়তে পারে না। কার ভেতরে কী আছে সেটা কেবল সেই জানে। এখন আমাদের অনুমতি দিন। আমাদের জাহাজ ছেড়ে দেবে।'

'ঠিক আছে। মহারাজ যেমন তোমাদের বাঁধা দেননি, আমিও দেবো না। যার কাছে সাতবাহনের সেনাপতি হবার চেয়ে সমুদ্রের ওপার যাওয়া বেশি জরুরি, তার জন্য নিশ্চয়ই সমুদ্রের ওপারে অনেক বড়ো কিছু অপেক্ষা করছে। আমি আরেকটা কারণে এখন এখানে এসেছি।' কোমর থেকে একটা থলি বের করলেন গিরিধারী, 'মহারাজ তোমাদের যত ইচ্ছে মুদ্রা নিয়ে যেতে বলেছেন, কিন্তু তোমরা তো কানাকড়িও নাওনি। এজন্য আমি কিছু নিয়ে এলাম।'

'আমাদের এসব লাগবে না মহামন্ত্রী। জানেনই তো, এসব পথে বিপদ বাড়াবে।'

'কিন্তু তাই বলে মহারাজ সাতকর্ণীর কাজ করে পারিশ্রমিক না নিয়েই তো আর চলে যাওয়া যায় না।'

গিরিধারীর একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো রুদ্রদেব, 'মহামন্ত্রী, আপ্নি আমার হয়ে মহারাজকে বলে দেবেন, আমি আর আমার শিষ্য যতটুকু পরিশ্রম করেছি, তারচেয়ে অনেক বেশি প্রতিদান নিয়ে আমরা সমুদ্রের ওপারে যাত্রা করেছি।'

গিরিধারী কিছুই বুঝতে পারলেন না। শেষবারের মতো অসিত আর রুদ্রদেব গিরিধারীকে সম্মান প্রদর্শন করে জাহাজে উঠে পড়লো। ততক্ষণে জাহাজের দড়ি খোলা আর নোঙ্গর তুলে ফেলার কাজ মোটামুটি শেষ পর্যায়ে।

জাহাজ নড়ে ওঠার সময়ে গিরিধারী ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন একটু। রুদ্রদেব মাথা ঝোঁকালো। তারপর নিজের কপালে হাত দিলো। আসলে সাতবাহন সাম্রাজ্যের কাছ থেকে প্রতিদান হিসেবে সে অনেক বড়ো রত্ন নিয়ে যাচ্ছে। এই রত্নের আসল মালিক সে হলেও এই রত্ন প্রাপ্তিতে মহারাজ সাতকর্ণীর ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই।

'আপনাদের কী মনে হয় জানি না। কিন্তু আমার নিজেকে একটা পোকা বাদে আর কিছুই মনে হয় না। আমরা যে সিংহের পেট থেকে জন্মেছি, তাও মনে হয় না। প্রতি বেলায় যখন বাড়ির পরিচারিকা আমার খাবার গুছিয়ে দেয়, তখন তার চোখে আমি করুণার হাসি দেখি। দাসকে তার আচরণের জন্য শাসন করা যায়, কিন্তু আমার মনে যে দাস বাস করে তাকে শাসন করার কোনো উপায় আমি দেখি না। এই অতুল বাহুবল, ইতিহাস, নিঃশ্বাসের আগুন এসব কোনো কাজে না লাগিয়েই কি আমরা চিতায় উঠবো? যখন আমরা পতিত হয়েছিলাম, যখন আমরা কারো জুতোর তলায় পড়েছিলাম, তখন আমরা কী করেছিলাম? আমাদের দেবতাদের আমরা কী উত্তর দেবো? হেডিস মৃত্যুর পর আমাদের বিচার করবেন তো? আমার তো মনে হয় দেখেই নাক সিটকাবেন, বিনা বিচারেই আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে নরকের অন্ধকার কক্ষে। অনন্ত কালের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। যে বীর কাপুরুষের মতো জীবন যাপন করে তার জন্য এরচেয়ে বেশি আর কিইবা অপেক্ষা করছে।'

লম্বা সময় নিয়ে কথাগুলো বলছেন অ্যালেস্টর। তার শরীর বৃদ্ধ হয়েছে। কপালে আর গালের চামড়ায় একটু ঝুল ধরেছে বটে তবে সেটা খুব কাছে না গেলে বোঝা যাবে না। এখনো তিনি যদি জোর করে হাত মুঠো করেন তাহলে হাতের সবগুলো শিরা উপশিরা ফুলে ওঠে। এই হাতের শক্তি এখনো একটুও ঝুলে যায়নি। বহু বছর যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া হয়নি। শুধু মহড়া আর প্রশিক্ষণের সময় বাদে যুদ্ধের সাজও তার পরা হয় না, তবু এই শরীরের বাহুভাজ দেখলেই বোঝা যায়, এই শরীর তৈরি হয়েছে এই মসৃণ সুখমাখানো লাল কাপড়ের পোশাক পরার জন্য নয়, বরং ঘামের গন্ধ মেশা রুক্ষ সমরসাজ পরার জন্য।

অ্যালেস্টরের সামনে আরও অনেকেই বসে আছেন। সবার বয়সই মাঝ সায়াহ্ন পেরিয়ে গেছে। এই বয়সে উদ্যম কমে আসা স্বাভাবিক, তবে এই অল্প আলোর ঘরে বসে থাকা অস্বাভাবিক লোকগুলোর ভেতরে উদ্যমের কোনো অভাব নেই।

একজন বলে উঠলেন, 'আপনার কথা শুনলে গায়ে যেন আগুন ধরে যায় মহামান্য অ্যালেস্টর। ইচ্ছে করে এখুনি ছুটে যাই, ঐ রোমানদের বুকে গেঁথে দিই আমাদের ধারালো বর্শা, গলাটা কেটে ফেলি ধারালো তলোয়ারে। কিন্তু, কী করবো। আমরা তো নিজেদের স্বভাব দিয়েই বন্দি হয়ে আছি। স্পার্টার লোকজনই এখন আর স্বাধীন হতে চায় না। তাদের দেখে মনে হয় কিছুই হয়নি, সব ঠিকমতো চলছে। সবাই খাচ্ছে-দাচ্ছে, আড্ডা দিচ্ছে, কলোসিয়ামে শরীর চর্চা করছে আর দাসেদের শাস্তি দিচ্ছে।'

আরেকজন বলে উঠলেন বেশ জোরালো গলায়, 'হ্যাঁ, সবকিছু স্বাভাবিক রেখেছে ওরা। ভুলিয়ে দিয়েছে মানুষের মন। ভুলিয়ে দিয়েছে আমাদের পরাধীনতার কথা। আমাদের ওরা বিশ্বাস করিয়েছে, আমরা ভালোই আছি।'

নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন অ্যালেস্টর, সবার ওপর থেকে ঘুরে এলো তার দৃষ্টি, 'আমরা আরামে আছি কথাটা ঠিক, কিন্তু আমরা কি ভালো আছি?'

'না, নেই।' সমস্বরে জবাব এলো।

'হ্যাঁ। আমাদের নাগরিকদের নপুংসক বানিয়ে রেখেছে তারা। শাসন চলছে তাদের ইশারায়। তাতে আমাদের অপমান হচ্ছে। আর অপমান যে-কোনো সুখকে তেতো বানিয়ে দেয়। কেন আমাদের মাতৃভূমি আরেক ভূখণ্ডের লোক শাসন করবে?'

এখানে যারা আছে তারা সবাই স্পার্টার অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। তারা সবাই উত্তেজিত। সবার মধ্যে একজন বৃদ্ধ অভিজাতও আছেন। সবার তুলনায় তার শরীরে বয়সের ভার একটু বেশিই বোঝা যাচ্ছে। তিনি কিন্তু সবার মতো উত্তেজনায় নিজেকে বিলিয়ে দেননি। এবার তিনি একটু নড়েচড়ে বসলেন, 'আচ্ছা, আমরা যে কাজ করতে যাচ্ছি, তা কি আমরা ভেবে করছি? আমার মনে হয় আমাদের আরও একবার ভালো করে ভাবা দরকার।'

সবগুলো চোখ ফিরে গেল তার দিকে। অ্যালেস্টর একটু শান্ত গলায় বললেন, 'আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'আমরা আসলে কীসের গর্ব করছি। আমাদের ইতিহাসের? কিন্তু সে তো অনেক পুরানো। পৃথিবী কি আর এখন সেই জায়গায় আছে? আমরা আগে লড়তাম এথেন্সের সাথে, থিবসের সাথে। ওরাও ছিল আমাদের মতো নগর রাজ্য। এখন আমরা এই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে আসলে কাদের সাথে লড়তে যাচ্ছি? রোমান সাম্রাজ্যের সাথে। যারা এই পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো এবং সুসংগঠিত সেনা আর রাজ্যের মালিক। তাদের সাথে আমরা কীভাবে লড়াই করবো?'

'আপনি কাপুরুষের মতো কথা বলছেন।' অ্যালেস্টরের চোখ যেন বিদ্ধ করলো বৃদ্ধ অভিজাতকে।

বৃদ্ধ সেই দৃষ্টির সামনে মিইয়ে গেলেন না, 'জানি, আমি কাপুরুষের মতো কথা বলছি। তবে এটা তো অস্বীকার করা যাবে না, একই সাথে আমি একজন বাস্তববাদীর মতোও কথা বলছি। পরিকল্পনা না করে কোনো কাজেই সফল হওয়া যায় না। আর এখানে পরিকল্পনা করার মতো কিছুই আমাদের কাছে নেই।'

এবার চট করে কেউ প্রতিবাদ করতে পারলো না। একজন কেবল বলে উঠলো, 'বড়ো সেনাবাহিনীর মোকাবেলা স্পার্টানরা আগেও করেছে। সেই তিনশো জনের কথা কি ভুলে গেলেন? জারাক্সিসের সেনাও কম বড়ো ছিল না।'

'হ্যাঁ, আপনাদের চেয়ে সেই ইতিহাস আমার বেশি মনে আছে। তবে সেই তিনশো জন একটা সুবিধাজনক ভৌগলিক অবস্থানের সুবিধা পেয়েছিল। আর সেই সুবিধা সরে যেতেই সেই তিনশো জনের প্রাণ হারাতেও এক মুহূর্তও লাগেনি।'

এবার সব জোঁকের মুখেই নুন পড়লো। অ্যালেস্টর এবার গিয়ে দাঁড়ালেন সেই বৃদ্ধ অভিজাতের সামনে, 'তাহলে আমাদেরকে আপনি কী করতে বলেন? আমরা কিছুই করবো না? আমরা এভাবেই মরে যাবো, আর আমাদের উত্তরাধিকারকে রেখে যাবো এভাবেই গোলামি করার জন্য?'

'গোলামি কথাটা আসছে কেন? পৃথিবীর পরিবর্তন হচ্ছে। আর আমরা সেই নতুন পৃথিবীতে বেঁচে থাকার নিয়ম অর্জন করবো। আপনাদের কি দেখে মনে হচ্ছে রোমানরা আমাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে? আপনারা তো সবাই জানেন, রোমানরা গ্রীসের কয়েকটা নগরকে ফ্রি টাউন ঘোষণা দিয়েছে। আমাদের শাসন ব্যবস্থা স্বাধীন। আমরা আমাদের শিক্ষা আর বিনোদনের আখড়া চালাতে পারছি। আমাদের দাস ব্যবস্থাও আমরাই নিয়ন্ত্রণ করছি। ওরা শুধু আমাদেরকে অনুরোধ করছে যাতে আমরা কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করি।'

ব্যাঙ্গের সুরে বললেন অ্যালেস্টর, 'কে অনুরোধ করেছে আপনাকে? আমার মনে হয় রোমান সম্রাট ট্রাজান নিজে এসে আপনার বাড়িতে আপনার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে আপনাকে অনুরোধ করেছে।'

সবাই হেসে উঠলো। বৃদ্ধ আর কিছু বললেন না। তবে অ্যালেস্টর নিজের কথা এখনো শেষ করেননি, 'সময় বদলে যাচ্ছে। আপনি ঠিকই বলেছেন। এই সময়ে ওরা খুব সাবধানে খেলছে। আপনাকে বুঝিয়ে যাচ্ছে, আপনি ভালোই আছেন। শাসক যেই থাকুক না কেন তাতে আপনার কী? আরামের ঠুলি চোখে পরিয়ে শাসন করছে তারা। আর ভেতর থেকে তাদের অনুগত শাসক দিয়ে আপনার সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে। আপনি জানেন, কতজন দাস আমাদের গভর্নর তাদেরকে ভেট দিয়েছেন? ভেট হলেও এটা আসলে ওদের আদেশ ছিল। এভাবে আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবার দিন গুনছে তারা। আর একবার আমাদের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেলেই ওরা অত্যাচার শুরু করবে। আপনার মতো একজন পাকা মাথা কীভাবে এই সহজ জিনিস বুঝতে পারছেন না, তা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'হ্যাঁ' আরেকজন অভিজাত মত দিলো, 'এটাই করছে তারা। শাসক শ্রেণি নানা কৌশলে আমাদেরকে পরিচালিত করছে। তারা হাত করেছে আমাদের ধর্ম প্রচারকদের। আমাদের জনগণকে বোঝানো হচ্ছে এই পৃথিবী আসলে কিছুই না। আসল হচ্ছে পরজন্ম। আমাদেরকে দুনিয়ার চিন্তা না করে সেই পরের জন্মের চিন্তা করা উচিত।'

সবাই সমস্বরে এই কথাতে সমর্থন দিলো। এভাবেই স্পার্টা গৌরব হারিয়ে ফেলছে। বৃদ্ধ অভিজাত সবার বিরুদ্ধে কথা বলে একটু মিইয়ে গেছেন, তবে একটু

বাদেই সামলে উঠলেন তিনি, 'শাসক শ্রেণি এমনটা করবে তাই স্বাভাবিক। আমরা কি আমাদের দাসেদের সাথে ঠিক একই ব্যবহার করি না? আমরা আমাদের দাসদের বুঝাই, এই পৃথিবীতে তাদের একটাই কাজ, আমাদের সেবা করা। আর আমরা ওদের যেভাবে রেখেছি, সেটাই ওদের সর্বোচ্চ প্রাপ্য। দাসেরা সেটাই মেনে নিয়েছে।'

অ্যালেস্টর বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ। দাসেদের সেটাই প্রাপ্য। জন্ম জন্মান্তরে সেটাই হয়ে এসেছে। ঈশ্বর আমাদের সেবা করার জন্যই ওদের সৃষ্টি করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি আবারও একটু ভুল করেছেন। দাসেদের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক, রোমানদের সাথে সেই সম্পর্ক নেই।'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন মহামান্য অ্যালেস্টর। আমি আমাদের স্বাধীনতার বিপক্ষে না। পরের শাসনে থাকা লম্বা সময়ের জন্য আমাদের অথবা আমাদের জাতির জন্য কখনোই মঙ্গল বয়ে আনবে না। আমি যদি আমাদের স্বতন্ত্র স্বাধীনতার বিপক্ষে থাকতাম তাহলে কিছুতেই আপনারা আমাকে এই সভায় পেতেন না। আমি এই চিন্তাতেই সবসময় নিজের মনকে ব্যস্ত রাখি। আমি তো কেবল আমাদের সামনে যেসব সমস্যা আছে সেসবের কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম।'

'আচ্ছা, বলুন তো আমাদের সামনে কী সমস্যা?' অ্যালেস্টর আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়লেন।

'প্রথমত আমাদের যে জিনিস প্রথমেই দরকার তা হচ্ছে জনসমর্থন রোমানদের হাত থেকে স্পার্টার শাসন কেড়ে নিতে হলে জনসমর্থন লাগবেই। কথা হচ্ছে এমন বিপজ্জনক পদক্ষেপ আমরা যদি নেই তাহলে জনগণ আমাদেরকে কেন সমর্থন দেবে? তারা মনে করবে, তারা তো ভালোই আছে। আপনারা সবাই জানেন, আমাদের বীরপ্রসবিনী মায়েরা এখন আর সিংহের জন্ম দেয় না।'

এবার চট করে কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না। সমস্যা আসলেই জটিল। জনগণের মনে আসলেই রোমানদের ব্যাপারে তেমন কোনো অভিযোগ নেই। এটা শুধু তাদের জন্য না গ্রীসের সবগুলো ফ্রিটাউনের জন্যই সত্য।

অ্যালেস্টর সমাধান দিলেন, তবে তা তেমন জোরালো হলো না, 'এটা সবসময়ের জন্যই একটা সমস্যা। রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে সাধারণ জনগণ কখনোই তেমন মাথা ঘামায় না। আর সবসময়েই কিছু রাজনীতিবিদ থাকেন তারা ক্ষমতার পক্ষে থাকেন। আপনার তো এসব না জানা থাকার কথা নয়। আমাদের এখানে গভর্নর পায়াসের তাবেদারি করা অভিজাতের অভাব নেই। তা থাকবেই। জনগণের মন বদলে দিতে হবে। আর জনগণের মনের গতি পরিবর্তন করে দেওয়াই আসল রাজনীতিবিদের কাজ।'

'হ্যাঁ', সায় জানালেন আরেকজন, 'জনগণ কবে নিজের ভালোটা বুঝেছে? তাদেরকে সবসময় ঘাড়ে ধরে বোঝাতে হয়।'

বৃদ্ধ অভিজাত বললেন, 'জনগণ আমার মতে দুটো সময় নিজের মত বদলায়। এক যখন তারা শাসকের দ্বারা অত্যাচারিত হয়। অথবা, যখন শাসকের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিজাত লোকজন দাঁড়িয়ে যায়। এখানে আমরা দুটোর একটা সুবিধাও পাবো না। আমরা এখানে কয়েকজন আছি। আমাদের সবার গোপন আর প্রকাশ্য বাহিনী একত্র করলে সেটা রোমানদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। জনগণ তাহলে আমাদের কথা কেন মানবে?'

অ্যালেস্টর একটু হাসলেন, 'আরেকটা কথা আপনি ভুলে গেছেন। মানুষ ক্ষমতা অপছন্দ করলেও আসলে সে চায় তার একজন প্রভু থাকুক, আর সেই প্রভু যাতে তাকে আগলে রাখে। স্পার্টার জনগনের প্রভু হতে হলে আমাদেরকে আগে স্পার্টার প্রভু হতে হবে। আর প্রভুর কথা সবাই শুনবে।'

'তাহলেও প্রশ্নটা থেকেই যায়। আমরা কীভাবে স্পার্টার প্রভু হবো?'

'সহজ ব্যাপার। আমরা বর্তমান রোমান মদদপুষ্ট গভর্নরকে নিজেদের দলে ভেড়ানোর কিছু চেষ্টা পরোক্ষভাবে করেছি। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। সেই রাস্তায় আর চেষ্টা করে লাভ নেই। একটাই উপায় আছে। তাকে সরিয়ে অথবা তাড়িয়ে দিতে হবে।'

'তাতেও কি শেষ রক্ষা হবে? রোমানরা এই খবর পাওয়া মাত্র ছুটে আসবে বিশাল লিজিয়ন নিয়ে স্পার্টায়। তখন আমরা কী করে সামাল দেবো?'

এই প্রশ্নের উত্তরও সাথে সাথে দেওয়া গেল না। কোনোভাবে পরিকল্পনা করে যদিও বা স্পার্টার গভর্নর পায়াসকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তবু রোমান সেনার মোকাবেলা কীভাবে করা যাবে?

এবার বৃদ্ধ অভিজাত বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে আমরা ভুল পথে চলছি। এজন্যই আপনাদেরকে এতগুলো কথা বলতে হলো। আমাদের যে শক্তি আছে তাতে ঐ বিশাল শক্তির মুখোমুখি হওয়া সম্ভব নয়। আমাদেরকে শক্তির উৎস খুঁজে বের করতে হবে।'

'শক্তি মানে তো সেনা আর অস্ত্র। কোথায় পাবো? এই ভূমধ্যসাগরের সব জায়গা রোমানরা নিয়ন্ত্রণ করছে। যে জায়গায় যত শক্তিশালী আর ভালো সেনা আছে তাদেরকে তারা নিজেদের দলে ভিড়িয়েছে। তাদের নিজেদের সম্রাটও আসলে পুরোপুরি তাদের জাতের না। আর বাইরের সেনারা কেন আসবে স্পার্টাকে সাহায্য করতে? কেন বাইরে থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র কেউ আমাদের সরবরাহ করবে?'

'কেউ করবে না মহামান্য অ্যালেস্টর। তবে জানেন কি যা একবারে তোলা যায় না তা অল্প অল্প করে তোলা যায়। আমরাও ধীরে ধীরে আমাদের সেনা

বাড়াতে পারি। একটা গোষ্ঠী তৈরি করতে পারি। আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে অ্য জমা করতে পারি। আমাদের সৈনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সক্ষমতা তো আছেই। হয়তো আমাদের প্রজন্ম পারবে না, হয়তো পরের জন্মও পারবে না, হয়তো শং বছর লাগবে, কিন্তু একসময় দেখবেন আমাদের উত্তরপুরুষরা এই রোমানদে কবল থেকে বেরিয়ে গিয়ে গ্রীস দেশকে আবার স্বতন্ত্র আসন দেবে।'

দীর্ঘসূত্রিতার এই আলাপ এখানে অবস্থান করা কারোই ভালো লাগলো না। তবে না মেনে নিয়ে উপায় নেই, এটা খুবই কার্যকর একটা পদ্ধতি।

'এই উপায়টাই আপনার মাথায় এসেছে?' অ্যালেস্টর জিজ্ঞেস করেন।

' হ্যাঁ, আপনার মাথায় এরচেয়ে ভালো কোনো উপায় আছে?'

' না, নেই', স্বীকার করতে বাধ্য হলেন অ্যালেস্টর, 'আমাদের হাতে এরচেয় ভালো কোনো উপায় নেই। কিন্তু তাতেও কি আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে? এ বছর চেষ্টা করেও তো খুব বেশি সেনা আর অভিজাত সদস্য আমাদের এই গোষ্ উদ্দেশ্য সাধনে জোগাড় করতে পারিনি। আমাদের উত্তর প্রজন্ম কি পারবে?'

'আপনার মনে সন্দেহ শোভা পায় না মহামান্য অ্যালেস্টর। আমরা বীজ র্ ঠিকমতো পুঁতে যেতে পারি তাহলে একসময় সে মহাবৃক্ষ হয়ে উঠবেই। দ্বি করবেন না। স্বদেশ প্রেমের বীজ আমাদেরকে পুঁতে দিতে হবে। কিছু নাট্যকা আর অভিনেতা আমাদের দলে আছেন। তারা কৌশলে আমাদের ইতিহাস আ বীরগাঁথা রচনা করে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবেন। এভাবেই আমরা প্রজন্ম থে প্রজন্মে যুদ্ধটাকে বাঁচিয়ে রাখবো।'

আহত বাঘের দৃষ্টি অ্যালেস্টরের চোখে, 'আমাদের কি কিছুই করার নেই একেবারে কিছুই না।'

'হ্যাঁ আরেকটা কাজ করার আছে।' বৃদ্ধ অভিজাত এবার শব্দ চয়নে এব সতর্ক হলেন, 'কিন্তু সেই পথ তো আপনার অথবা আপনাদের পছন্দ হবে না। সে পথ অবলম্বন করতে গিয়ে তো আমরা আগেও ব্যর্থ হয়েছি।'

'সেই কথা আর বলবেন না। আপনার কথা শুনে আমার বিশজন লোক তারা বণিকের ছদ্মবেশে পাঠিয়েছিলাম। সাথে ছিলেন অভিজাত ক্রেয়ন। কত তা একজন যোদ্ধা। আপনি বললেন ঐ পাথরই টিয়ার অভ এপোলো। কিন্তু তা আমার একুশ জন সেনাই মারা গেল। আমার তো মনে হয় শুধু শুধু প্রাণ হারিয়ে তারা। ঐ রত্ন নিয়ে এলেও তেমন কোনো লাভ হতো না। একটা পাথরের মূর্তি জরাজীর্ণ শেকল দিয়ে সেই আদিকাল থেকে একটা গুহায় বন্দি হয়ে আছে। ঐ শুধুই একটা ভাস্কর্য, আর কিছুই না।'

'মহামান্য অ্যালেস্টর, আপনি দেবতার ক্ষমতায় বিশ্বাস না করতে পারে কিন্তু তাতে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমাদের প্রজন্মকেই যদি রোমানদে

হারানোর মতো অসাধ্য সাধন করতে হয়, তাহলে দেবতাদের সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই।'

আবার অ্যালেস্টরের গলায় বিদ্রুপের স্বর শোনা গেল, 'তাহলে অলিম্পাসে দূত পাঠাই। অলিম্পাসের ঠিকানাটা আছে আপনার কাছে? অবশ্য রাস্তা যদি খুব একটা কঠিন না হয় তবে দূত হিসেবে আপনিই যেতে পারেন।'

এবার অবশ্য সবাই হেসে উঠতে পারলো না। দেবতার বিশ্বাসে একেকজনের মত একেক রকম। কেউ বিশ্বাস করে, আবার কেউ করে না।

'আমার মনে হয়, আমাদের আরেকবার চেষ্টা করা উচিত। আমি অলিম্পাসের রাস্তা না চিনলেও কিছু উঁচু মানের পুরোহিতের সাথে আমার পরিচয় আছে। তারা নক্ষত্রের গণনা করতে পারেন। তাদের মতে সামনে একটা বেশ ভালো সময় আছে। তখন দেবতার পূজা দিলে দেবতা সন্তুষ্ট হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।'

সবাই এই কথায় সমর্থন দিলো। পূজা দিতে বেশি ঝামেলা নেই। একজন পুরোহিত লাগবে, সাথে কিছু বলি আর নৈবদ্য।

এসব দেবতায় অ্যালেস্টরের কোনো বিশ্বাস নেই। তবে নেতা হিসেবে সবার মতকে একটু হলেও প্রাধান্য দিতে হয়। আর আরেকটা চিন্তা তার মাথায় এসেছে, এবার তারা দেবতার পূজায় ব্যর্থ হলে এরপর নিশ্চয়ই কেউ আর শুধুশুধু দেবতাদের ওপর নির্ভর করে বসে থাকবে না। তিনি এখানের সবার অঘোষিত নেতা। তার একটা ঘোষণার দরকার আছে। সেটাই উঠে দাঁড়িয়ে করলেন তিনি, 'ঠিক আছে। সময় মতো ব্যবস্থা করুন। দেখি, মহা শক্তিশালী যুদ্ধের দেবতা এরিস শেকলের বাঁধন খুলে আবার জীবিত হতে পারেন কিনা।'

স্পার্টায় এই প্রাসাদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আকার আকৃতিতেও একটু আলাদা। এমনিতে এই নগরের কারিগরেরা প্রাসাদ বানাবার সময় এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। তাদের সৃষ্টিশীলতা যে নেই তেমন নয়, কারিগর হিসেবে তারা গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠদের মধ্যে অবশ্যই স্থান পাবার যোগ্য। কিন্তু সেই সৃষ্টিশীলতার মাঝেও কিছু নিয়ম মানতে হয় যা সার্বজনীন। এজন্য এই নগরের রাস্তার ধারে বাড়ির গঠন দেখেই বলে দেওয়া যায়, এখানে কে থাকে। কোনো বাড়ি বানানো হয়েছে বড়ো সেনা অভিজাতের জন্য, কোনো বাড়ি হয়তো বানানো হয়েছে বংশগত অভিজাতের জন্য, কোনটা আবার বণিকের। নানা রকম দেবতার ভাস্কর্য আছে, পুরাণ থেকে উঠে আসা চরিত্রদের প্রতিকৃতিও আছে। কিন্তু দূর থেকে বাড়ির গঠন দেখেই বলে দেওয়া যায়, এই বাড়িতে কোন ধরনের লোকের বাস।

সেই হিসেবে এই প্রাসাদ অন্য রকম। নগরীতে এমন গঠনের প্রাসাদ একটাই আছে। এই ভবন বানাবার সময় কারিগরেরা অন্য রকম নকশা পেয়েছিলেন। তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল কিছু রোমান কারিগর। তাদের জ্ঞান ফুটে উঠেছে এই ভবনে যা গ্রীক নির্মাণ শৈলী থেকে আলাদা। এই ভবনের চারপাশে বেশ খোলা জায়গা আছে। সেখানে বাগানে নানা রকম ফুল, ভাস্কর্য আর ফোয়ারা শোভা পাচ্ছে।

এই প্রাসাদ স্পার্টার বাকি প্রাসাদ থেকে আলাদা হবার কারণ আছে। আগে অভিজাতদের মাঝে যেমন রাজার নিবাস একটু বিশেষ ছিল, তেমন কোনো রাজা তো আর এখন নেই। এখন আছেন সম্রাট, তিনি থাকেন রোমে। সেই রাজপ্রাসাদের রমরমা ব্যাপার এখন আর নেই। তবে রোমান রাজা এখানে না থাকলেও তার প্রতিনিধি তো থাকবেন। তার ভূমিকাই বা রাজা থেকে কম কীসে। সেই গভর্নর এখানেই থাকেন। তাই এটাই বলতে গেলে এখন স্পার্টার রাজপ্রাসাদ। অন্তত সাধারণ লোকে তাই মনে করে।

প্রাসাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ জোরদার। আগে এমন ছিল না। তবে রোমে একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর থেকে সবকিছু বদলে গেছে। ব্যাপারটা প্রায় দুশো বছর আগের হলেও এখনো প্রভাব আছে। এক দাস ছিল। নাম স্পার্টাকাস। বোকা ছিল না সাহসী ছিল তা বোঝার উপায় নেই, তবে তার ঘাড়ের রগে যে সমস্যা ছিল সেটা নিশ্চিত। পুরো রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নিজের গ্ল্যাডিয়েটর বন্ধুদের নিয়ে বিদ্রোহ করেছিল সে। যদিও সেই বিদ্রোহ সফল হয়নি, সমস্ত সেনা-সহ তাকে সার্ভিলের তৃতীয় যুদ্ধে রোমান লিজিয়ন পিষে দিয়েছিল, তবে তার আগেই সে রোমানদের পেটে শূন্য অনুভূতি ধরিয়ে দিয়েছিল, কয়েকবার পরাজিতও করেছিল

তাদের। তারপর থেকে রোমানরা দাসদের আর হেলাফেলা করে না। আর এই স্পার্টায় তো এরা আরেক কাঠি বাড়া। এরা সুযোগ পেলেই মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যায়। এমনকি অত্যাচারী মালিককে অনেকদিন ধরে পরিকল্পনা করে হত্যা করে পালিয়ে যাবারও নজির আছে। এখন আবার শোনা যাচ্ছে, সময়ে সময়ে সেই পালিয়ে যাওয়া দাসেরা না-কি একত্রিত হয়েছে জঙ্গলের ভেতর। সেখান থেকে তারা আবার এক বড়ো বিদ্রোহ করতে চাইছে। হতে চাইছে এই যুগের স্পার্টাকাস।

এমন পরিস্থিতিতে রোমান নিয়োজিত গভর্নরের প্রাসাদে যে কড়া পাহারা থাকবে তা বলাই বাহুল্য। এখানে প্রশিক্ষিত দুই সেনা সদর দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। দরজার ঠিক ওপরেই আছে উচ্চ পাহারার স্থান। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আরেক সৈন্য। কোনো ক্লান্তি অথবা ঘুমের লেশ মাত্র নেই তাদের চোখেমুখে। রাতের এই সময়েও শরীর সম্পূর্ণ টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

কিন্তু কালো কাপড় পরা আর ঠিক একই রঙের কাপড়ে মুখ ঢেকে এই রাতের আঁধারে যে মূর্তি তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো তার এই পাহারা সম্পর্কে তেমন একটা ভীতি আছে বলে মনে হলো না। আগন্তুক গতি কমালো না। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে লাগলো।

আরেকটু এগিয়ে আলোর কাছে আসতেই এবার সেনারা দেখতে পেলো তাকে। সাথে সাথে তাদের ঋজু দেহ একেবারে টানটান হয়ে গেল। হাতের বর্শা সজোরে মাটিতে ঠুকল তারা। মাত্র একজন লোক এভাবে এগিয়ে আসছে কেন? কোনো চোর অথবা দস্যু হবার সম্ভাবনা নেই। চোরেরা এই প্রাসাদে ঢোকার সাহস করবে না, আর করলেও এভাবে সদর দিয়ে যে করবে না তা নিশ্চিত।

এক সৈনিক আরেক বার বর্শার ভোঁতা প্রান্ত দিয়ে জোরালো আঘাত করলো মাটিতে, 'সাবধান হও। আর এগিয়ে এসো না।'

সৈনিকের কথা শুনে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়লো কালো মূর্তি।

'খবরদার, পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে না। হাত দুটো মাথার ওপরে তুলে ফেলো।'

এবারো আদেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে পালিত হলো। একজন প্রহরী এগিয়ে গেল মশাল হাতে। মশালের আলোয় এবার আগন্তুকের আকার আর আকৃতি বেশ ভালোভাবেই ফুটে উঠলো। সৈনিক খুবই সতর্ক, 'মুখের ওপর থেকে কাপড়টা একটু সরাও তো। চাঁদমুখটা একটু দেখি।'

ধীরে ধীরে মুখের ওপর থেকে কাপড়টা সরালো আগন্তুক। সৈনিক দেখে নিলো ভালো করে। না, চিনতে পারছে না। এই নগরে অথবা এই প্রাসাদের আশেপাশে এই লোককে আগে কখনো দেখেনি।

'এবার বলো এখানে কেন এসেছ? দেখে তো মনে হচ্ছে নগরে নতুন। আর পথ ভুল করে ঢুকে পড়েছ এই পথে। জানো তো মাঝে মাঝে আমাদের ভাগ্যের দোষে আমাদেরকে ছোটো ভুলে প্রাণ দিতে হয়। আরেকটু হলেই তোমার ক্ষেত্রেও তাই হতো।'

এবার আগন্তুক কথা বলল, ' আমি এই নগরে নতুন এসেছি, সেটা ঠিক। তবে আমি এই নগর চিনি। এই প্রাসাদও চিনি। আমি ভুল করিনি। এই প্রাসাদই আমার গন্তব্য।'

প্রহরীর ভ্রু কুঁচকে গেল, 'এই প্রাসাদ তোমার গন্তব্য? কেন? রাতের এই সময়ে এই প্রাসাদ তোমার গন্তব্য হতে যাবে কেন?'

'একটু আগে তুমিই তো বললে বন্ধু, সামান্য একটা ভুলে ভাগ্যের দোষে মাঝে মাঝে আমাদের প্রাণ সংশয় হয়। আমাকে উপদেশ দিলে, বেশ ভালো। কিন্তু নিজেই এখন সেই ভুল করতে যাচ্ছো। আমি এখানে কেন এসেছি, সেটা যদি তুমি জানতে পারো, অথবা আমার পরিচয়ও যদি তুমি জানতে পারো, তবে তোমাকে মেরে ফেলা আমার রাজ কর্তব্য।'

আগন্তুকের কথার ভাজে এমন একটা হুমকি লুকিয়ে ছিল, তাতে প্রহরী ভয় না পেয়ে পারলো না, তবু মরিয়া হয়ে বলল, 'আচ্ছা, তোমার জন্য এখন আমাদের কী করতে হবে?'

'বলার কিছু নেই, তবে দেখানোর আছে।' নিজের পোশাকের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলো আগন্তুক। সাথে সাথে নিজের বর্শা বাগিয়ে ধরলো প্রহরী, 'খবরদার, কোনো রকমের অস্ত্র বের করার চেষ্টা করবে না।'

মুচকি হাসলো আগন্তুক, 'আরে না না, অস্ত্র বের করবো কেন? আর বের করতে চাইলেই বা আমার পোশাকের ভেতর থেকে কি অস্ত্র বেরোবে? তোমার হাতের বর্শার মতো বড়ো কোনো অস্ত্র, তলোয়ার অথবা ধনুক তো বের করতে পারবো না। বড়ো জোর দুয়েকটা ছুরি বের করতে পারি। সেসবে তো আমি তোমার কিছুই করতে পারবো না।'

কথা বলতে বলতে নিজের পোশাকের ভেতর থেকে ছোটো পাখির ডিমের আকৃতির একটা রত্ন বের করে আনলো সে, রত্ন মশালের আলোয় ঝিকমিক করে উঠলো, 'নাও, ধরো।'

প্রহরী রত্ন হাতে নিলো অবাক হয়ে। যদিও এখন মনোযোগ হারানো জীবন হারানোর কারণ হয়ে যেতে পারে, তবু রত্ন হাতে নেবার লোভ সে সামলাতে পারলো না। একমনে দেখতে লাগলো সেটা।

'থাক, আর দেখতে হবে না। তুমি হয়তো ভাবছ, এটা আমি তোমাকে উপহার দিয়েছি। তেমন কিছু আসলে হয়নি।

এটা নিয়ে তাড়াতাড়ি মহামান্য গভর্নর পায়াসের কাছে যাও। উনি যদি ঘুমিয়েও থাকেন তবু জাগাবার ব্যাবস্থা করো। এই রত্ন দেখলেই মহামান্য পায়াস আমাকে চিনতে পারবেন। আর তখন তিনিই তোমাকে বলে দেবেন কী করতে হবে।'

এবার প্রহরী ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পারলো। এই লোক সাধারণ কেউ নয়। রত্ন হাতে সে প্রাসাদের ভেতরে যেতে উদ্যত হলো। তবে যাবার আগে নিজের সাথিকে সতর্ক হতে বলে যেতে ভুললো না, 'এই লোকের হাবভাব কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি গভর্নরকে খবর দিতে ভেতরে গেলাম। ভালো করে নজর রেখো। ব্যাটা সন্দেহজনক কিছু করলেই একেবারে বর্শা বিঁধিয়ে দেবে।'

প্রহরী চলে গেল ভেতরে। গভর্নর পায়াসের এত রাতে জেগে থাকার কোনো কারণ নেই। তিনি ঘুমিয়েই ছিলেন অন্দরে। এত রাতে ওনাকে জাগানোর কথা বলতে সংকোচ হতে লাগলো প্রহরীর। যদি আসলেই আগন্তুক ধাপ্পা দিয়ে থাকে। তবে গভর্নরকে জাগাবার কথা না বলে উপায়ও নেই।

অন্দরের পরিচারিকা পায়াসের ঘুম ভাঙালো। পায়াস বেরিয়ে এলেন শয়নকক্ষ থেকে, 'কী হয়েছে আবার এত রাতে?' তার চেহারায় ভয় আর বিরক্তির মেশানো অনুভূতি। ভয়ের পরিমাণ তেমন নেই। কোনো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ জীবনের হুমকি তিনি এখনো পাননি।

'ক্ষমা করবেন মহামান্য। সদর দরজার প্রহরী এসেছে। বলছে আপনার সাথে বেশ জরুরি দরকার।'

'আচ্ছা, তাকে আমার মন্ত্রণা কক্ষে যেতে বলো। আমি আসছি।' পায়াসের মনে চলছে নানা ভাবনা। কী হলো আবার। সদরের প্রহরী কী খবর নিয়ে এলো এত রাতে।

প্রহরী এসে দাঁড়ালো আসনে বসে থাকা পায়াসের সামনে, 'মহামান্য, এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করতে হলো বলে দুঃখিত।'

'ভনিতা রাখো', বিরক্তির মাত্রা আরও বেড়েছে পায়াসের গলায়, 'কী হয়েছে? এত রাতে সদর দরজা পাহারা দেওয়া ছেড়ে এখানে এসেছ কেন?'

'কালো পোশাক পরা এক আগন্তুক এসেছে। আপনার সাথে দেখা করতে চায়।'

'কে এসেছে? চিনতে পেরেছ?'

'না। তাকে আমি কখনো আগে প্রাসাদে দেখিনি।'

'আচ্ছা, কেন এসেছে?'

'তা তো আমাকে বলেনি মহামান্য। শুধু আমাকে একটা রত্ন দিয়েছে। কালো রঙের। বলেছে এই রত্ন দেখালেই আপনি তাকে চিনতে পারবেন।'

'কোথায় সেই রত্ন?' এবার শশব্যস্ত হলেন পায়াস।

নিজের হাতের তালুতে রত্ন রেখে পায়াসের সামনে ধরলো প্রহরী।

রত্নটা একবার দেখেই চিনতে পারলেন পায়াস। সাথে সাথে আতঙ্কে তা চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি নির্দেশ দিলেন তিনি, 'তাকে খুব গোপনে এই ঘরে নিয়ে আস কেউ যেন তাকে এখানে আসতে না দেখে। আর তোমার মুখ বন্ধ রাখবে। কে যদি এই রত্ন অথবা ঐ আগন্তুকের কথা জানতে পারে তাহলে কিন্তু তোমার মু আর কখনোই খোলার মতো অবস্থায় থাকবে না।'

আর দেরি করলো না প্রহরী। তাড়াতাড়ি সদর দরজায় চলে এলো। আগন্তু এখনো তাকে যেখানে রেখে যাওয়া হয়েছিল সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রহ ফিরে আসতেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো, 'কী মনে হয়? ঠিকানা ভুল কর আমি?'

' নাহ, আপনাকে কষ্ট দেবার জন্য ক্ষমা চাইছি। আমার আচরণের কথা ম রাখবেন না।'

'নাহ, কেউ না জেনে অপরাধ করলে ক্ষমা চাইবার আগেই ক্ষমা করে দে আমি।'

'চলুন।' প্রহরীর সাথে সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো আগন্তু গোপন অন্ধকার কোণগুলো ঘুরে আগন্তুককে পায়াসের কামরার সামনে পৌঁ দিলো প্রহরী, 'আমাদের মহামান্য গভর্নর পায়াস এই কক্ষেই আছেন। আপ ভেতরে যান।'

আগন্তুক প্রবেশ করলো। পায়াস আগে থেকেই প্রহরীকে নির্দেশ দি রেখেছিলেন যাতে সে আগন্তুকের সাথে এই ঘরে না ঢোকে। বাইরে দাঁড়ি পাহারা দেয়। এবং কেউই যেন এই ঘরে না আসতে পারে।

আগন্তুক প্রবেশ করতেই নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন পায়াস। য এই আগন্তুক পদবিতে তারচেয়ে কোনোভাবেই ওপরে নয়, তবু মাঝে ম পদবির চেয়ে মানুষের গুরুত্ব বেশি হয়ে যায়, আবার উল্টোটাও ঘটে।

পায়াসকে উঠে দাঁড়াতে দেখে আগন্তুক বলে উঠলো, 'আরে মহামান্য পায় আপনি নিজের আসন ছেড়ে উঠছেন কেন? নিজেকে লজ্জিত মনে হচ্ছে।'

পায়াস হাসলেন, 'এমনিতে কেউ আপনাকে অথবা আপনাদের কাজ অ পদবি সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে না। কিন্তু আমি তো জানি আপনারা রো সাম্রাজ্যের সাধারণ কেউ নন। স্বয়ং সম্রাটের একান্ত গুপ্তচর। আপনারা য সম্রাটের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে কোনো প্রাদেশিক রাজা অথবা গভর্নরের কাছে য তখন তাদের হৃদপিণ্ড কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।'

এক পাশে রাখা একটা আসনে বসলো আগন্তুক, 'তার মানে আপনি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?'

এবার সতর্ক হলেন পায়াস, 'না, আসলে সেই অর্থে ভয় পাচ্ছি না। তবে অস্বস্তি যে হচ্ছে তা অস্বীকার করবো না।'

'হ্যাঁ, ভয় না পেলেই ভালো। আমাদের দেখে ভয় পাওয়ার মানে তো বোঝেনই। তার মানে আপনি রোমান সম্রাটের অপ্রিয় কোনো কাজ করেছেন।' আগন্তুকের পরের কথাটা এলো আচমকা, 'সেরকম কিছু করেছেন না-কি?'

তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে জবাব দিলেন পায়াস, 'আরে না, সেরকম কিছুই করিনি আমি। শপথ করে বলতে পারি। সম্রাট ট্রাজান আমাকে কত সুবিধা দিয়েছেন। এই ঝামেলাহীন ফ্রিটাউনের গভর্নর বানিয়েছেন। এখানে আমি কত রকমের সুযোগ ভোগ করছি কোনো ঝামেলা ছাড়াই। সম্রাটের বিরুদ্ধে যাবার কী কারণ থাকবে আমার?'

'হ্যাঁ। তাই তো। আপনার তো সম্রাটের বিপক্ষে যাবার তেমন কোনো কারণ নেই। কিন্তু ঐ যে বললেন ঝামেলাহীন একটা ফ্রিটাউন, এই ঝামেলার অনুপস্থিতিই আমাকে এখানে টেনে এনেছে।'

কথাটার মানে বুঝতে পারলেন না পায়াস, 'মানে? ঝামেলা নেই সেটা তো ভালো কথা।'

'না, মাঝে মাঝে কিছু ঝামেলা থাকা ভালো। এটা আমাদের রোমের রাজনীতি বিশেষজ্ঞ লোকজন বলাবলি করছিলেন। তারা খুব সুন্দর একটা উপমাও দিয়েছেন। যদি কোনো সমুদ্রে কোনো বাতাস না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সেই সমুদ্রে অচিরেই এমন একটা ঝড় উঠবে যা জাহাজ ডুবিয়ে ছাড়বে। এজন্যই গ্রীস নিয়ে ওনারা চিন্তিত। গ্রীস একটু আশ্চর্য রকমের শান্ত হয়ে রয়েছে। এই শান্তি গ্রীসের, বিশেষ করে স্পার্টার মতো শহরের জন্য একটু অস্বাভাবিক।'

'ঝামেলা যে একেবারে নেই তা নয়। কিছু দাস বিদ্রোহীরা আছে। তারা মাঝে মাঝে উৎপাত করে। তবে নগরের ভেতরে এখন পর্যন্ত কিছু করার সাহস পায়নি তারা। তাদের কাজকর্ম নগরের বাইরের পথিকদের ওপরেই সীমাবদ্ধ। এই দাস বিদ্রোহীদের গ্রীসের লোকেরাও পছন্দ করে না। রোম তো এই দাস বিদ্রোহীদের কথা আগে থেকেই জানে।'

'হ্যাঁ, জানে। কিন্তু এদের নিয়ে রোমের মাথা ব্যথা নেই। এই গ্রীস ফ্রিটাউনে আমরা জনবিদ্রোহের আশঙ্কা করছি। যদিও নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলা যাচ্ছে না, কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই, তবু আপনাদেরকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করতেই আমাকে গ্রীসে পাঠানো হয়েছে।'

'বুঝতে পেরেছি। আর সাধারণ কোনো দূত না পাঠিয়ে আপনাকে পাঠানো হয়েছে, তাতেই বুঝতে পারছি ব্যাপারটা নিয়ে সম্রাট বেশ ভালো করেই চিন্তিত।'

'একদম ঠিক বলেছেন। এবার আপনাদেরও চিন্তিত হতে হবে।'

'আমাদের প্রতি সম্রাটের নির্দেশ কী?'

'সহজ নির্দেশ। যেসব প্রভাবশালী অভিজাত এই স্পার্টায় আছেন, যাদের জনগণ এবং সেনা একত্র করে একটা ঝামেলা বাঁধানোর সামর্থ্য আছে তাদেরকে আপনার নজরদারিতে আনতে হবে। ভালো করে বুঝুন, আপনার কারো সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের এখন আর কোনো গুরুত্ব নেই। সবাইকেই দেখতে হবে সন্দেহের চোখে। তারপরে যদি কিছু খুঁজে পান অথবা না পান সেটা আমাদেরকে জানাবেন।'

একটু চিন্তিত হলো পায়াসের মুখ, 'কিন্তু এত গুপ্তচর আমি কোথায় পাবো? এভাবে কাজ করার জন্য তো সক্ষম অনেক গুপ্তচর লাগবে। তেমন ব্যাবস্থা তো এই ছোটো নগরে নেই। একসাথে সব সামর্থ্যবান অভিজাতের ওপর নজর রাখতে হবে।'

'মহামান্য পায়াস। রোম কখনো কাউকে বিনা অস্ত্রে যুদ্ধে পাঠায় না। আপনার সাহায্যার্থে অচিরেই রোম থেকে প্রশিক্ষিত গুপ্তচরেরা স্পার্টায় এসে পৌঁছবে। আপনি শুধু আমাদেরকে সামর্থ্যবান অভিজাতদের তালিকা এবং তাদের তথ্য পাঠাবেন। তাতেই আমরা বুঝে যাবো আমাদেরকে কতজন গুপ্তচর পাঠাতে হবে।'

'আচ্ছা।'

আগন্তুক উঠে দাঁড়ালো, কাজ শেষ হয়েছে, আশা করি আগামী পূর্ণিমার আগেই আমাদের কাছে তালিকা পৌঁছে যাবে।'

চকিতে হিসেব সেরে নিলেন পায়াস, 'হ্যাঁ, পূর্ণিমার আগেই পাঠিয়ে দিতে পারবো।'

'তাহলে এবার আমাকে আজ্ঞা দিন।'

'অবশ্যই' আগন্তুকের সাথে পায়াসও বেরিয়ে এলেন। বাইরে দাঁড়ানো প্রহরীকে নির্দেশ দিলেন, 'ওনাকে প্রাসাদ থেকে বাইরে রেখে এসো। সদর দরজা ব্যবহার করবে না। নাচঘরের পাশের গুপ্তরাস্তা ব্যবহার করবে। খবরদার, কেউ যেন না দেখতে পায়।'

'আজ্ঞে মহারাজ।' হুকুম তামিলে ব্যস্ত হলো প্রহরী। গুপ্ত রাস্তা ভ্রমণ করে প্রাসাদের বাইরে চলে এলো দুজনে।

আগন্তুক নিজের হাত বাড়িয়ে দিলো, 'আমার একটা জিনিস তোমার কাছে রয়ে গেছে মনে হয়।'

এতক্ষণ প্রহরীর মনে ছিল না। তাড়াতাড়ি পোশাকের ভেতর থেকে কালো রত্ন বের করে দিলো সে। চট করে আগন্তুক সেটা নিজের পোশাকে লুকিয়ে ফেললো। তারপর কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে কোনো কিছু না বলে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

ওরিয়ন ছোক ছোক করছে অনেকক্ষণ ধরে। হতে পারে তাদের ধৈর্যের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সেই শিক্ষণ একেবারে বিফল হয়েছে তাও বলা যায় না। ধৈর্য তাদের বেশ ভালোই আছে। তবে ইভানের পাশে বসে থেকে এখন সেই ধৈর্য বাঁধ মানতে চাচ্ছে না। ক্রমশ অক্ষম ক্রোধ জন্ম নিচ্ছে তার মনে।

এই পরিস্থিতির জন্য ওরিয়নকে কোনোভাবেই দোষ দেওয়া যাবে না। সেদিন রাতে যখন ইভান নগরে গিয়েছিল তখন থেকেই অপেক্ষায় ছিল সে। ফিরে এলেই শুনবে নগরে কী হলো। এমনিতে তাদের জীবনে উত্তেজনার অভাব নেই। নানারকম অস্ত্রের আর সমরের কৌশল শিখতে শিখতেই সময় চলে যায়। তবে কাজ যতই উত্তেজনার হোক না কেন, সেটা যদি নিয়মিত করা হয় তাহলে সেখানে উত্তেজনা আর বেশি অবশিষ্ট থাকে না। সেই হিসেবে সেদিনের ঘটনা আর ইভানের নগরে যাওয়া বেশ রোমাঞ্চকর। আর এমন রোমাঞ্চের মধ্যে না থাকা যাক, গল্প শোনার ইচ্ছে তো হতেই পারে। ওরিয়নের সেই ইচ্ছেই হচ্ছে। কিন্তু ইভানের মুখে কুলুপ আঁটা, নগরে কী হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই বলছে না সে। জিজ্ঞেস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে ওরিয়ন।

এখন দুজনেই শুয়ে আছে নরম ঘাসের ওপরে। জায়গাটা তাদের প্রশিক্ষণ শিবির থেকে খুব একটা দূরে না। দুপুরের নিয়মিত খাবারের পড়ে কিছু সময় পাওয়া যায় বিশ্রামের। তখনই তারা এসেছে এখানে।

কণ্ঠে ধৈর্যের লেশমাত্র না রেখে জিজ্ঞেস করলো ওরিয়ন, ' তোমাকে শেষ বারের মতো জিজ্ঞেস করছি, নগরে কী হয়েছে তা বলো আমাকে।'

ইভান যেন ওরিয়নের কথা শুনতেই পায়নি, পাশ ফিরে শুলো সে, 'দেখো, জীবনে এমন কিছু সময় আসে, যখন মানুষকে একা থাকতে দিতে হয়। তুমি আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু তাতে কোনো সন্দেহ নেই, একমাত্র বন্ধুও বটে, তাই তোমার উচিত বন্ধুকে এই সময়টা উপভোগ করতে দেওয়া।'

'এই সময় মানে? আর কী উপভোগ করছো তুমি?'

'সেটা তোমার শিকারি মাথায় ঢুকবে না।'

'কিন্তু এখন তো আর সেই কথা বললে চলবে না চাঁদ। ঘটনা যখন শুরু হয়েছিল সেখানে আমিও ছিলাম। আমাকেও হুমকি দিয়ে গিয়েছিল ওরা। আমিই তোমাকে দেখা করতে যাবার আগে খরগোশ জোগাড় করে দিয়েছি। রাতে তোমার হয়ে পাহারা দিয়েছি যাতে তোমার অনুপস্থিতি কেউ টের না পায়। আর এখন তুমি একা একা অনুভূতি উপভোগ করবে, তা তো হবে না।'

খরগোশের কথা কানে যেতেই সম্বিত ফিরে পেলো যেন ইভান। তাকে যে আরেকটা খরগোশ জোগাড় করতে হবে। ওরিয়নকে এবার কিছুটা হলেও বলতে হবে, 'আমি যে অনুভূতি উপভোগ করছি তা তো আর তোমাকে বোঝানো যাবে না। সেই কাজটা যে না করেছে সে কীভাবে অনুভব করবে?'

'তাহলে অন্তত বলো, কী কাজ করে এসেছ তুমি? দেখি আমি চেষ্টা করে যদি সেই কাজটা করতে পারি। তাহলে এমন অনুভূতি আমিও পাবো।'

চোখ পাকালো ইভান, 'সেই কথা মনেও এনো না। ঐ কাজ ঐ জায়গায় আমি বাদে আর কেউ করতে পারবে না।'

'আচ্ছা। তুমি একে একে বলো। ঐ মেয়েটার কথা অনুযায়ী তুমি কি অভিজাতের বাড়িতে গিয়ে ঐ মেয়ের আত্মীয়ের পরিচয় দিয়েছিলে?'

'পাগল। তা কোনোভাবেই বলা যেতো না। আর কারো চোখে পড়া আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। কয়দিন পরেই আমরা প্রশিক্ষণ শেষ করে নগরে বাস করতে ফিরে যাবো। তখন কি আর সৈন্য আমাকে দেখে চিনতে পারবে না? অবশ্যই পারবে।'

'তাহলে তুমি ঐ মেয়ের সাথে দেখা করোনি? খরগোশ দাওনি? না দিলে খরগোশ গেল কোথায়?'

'আরে না, দেখা তো করেছি। দুটো মেয়ের সাথেই দেখা হয়েছে। নইলে কি আর আমার মনে এমন অনুভূতি আসে?' ইভানের লজ্জাযুক্ত হাসি দেখে অবাক হয়ে গেল ওরিয়ন।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, ঘটনা বুঝতে দাও আমাকে। সদর দরজার প্রহরীর কাছে তুমি নিজের পরিচয় দাওনি। তাকে নিজের চেহারাও দেখাওনি। তাহলে তুমি বাড়িতে ঢুকলে কীভাবে? অতো রাতে নিশ্চয়ই ঐ দুই মেয়ে বাইরে তোমার সাথে দেখা করতে আসেনি?' সম্ভাবনাটা মাথায় উঁকি দিতেই চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল ওরিয়নের, 'না, না, তুমি নিশ্চয়ই এখন বলবে না, তুমি লুকিয়ে ঐ বাড়িতে ঢুকেছ।'

মৃদু হাসি ফুটে উঠলো ইভানের ঠোঁটে, 'আমি তাই করেছি।'

মাথায় হাত দিলো ওরিয়ন, 'ধরা পড়লে কী হতো ভেবে দেখেছ? তোমার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল।'

' মৃত্যুকে বাজি রেখে যে জিনিস জয় করে এসেছি তা তুমি বুঝতে পারবে না ওরিয়ন। আচ্ছা, তুমি কখনো মনে ভালোবাসা টের পেয়েছিলে?'

' ভালোবাসা? মানে প্রেম। যেই ফালতু অনুভূতি থেকে আমাদের সবসময় দূরে থাকতে বলে প্রশিক্ষকেরা। না, সে আমি কখনো টের পাইনি।'

' তাই তো তুমি বুঝতে পারছো না। আমি আমার ভালোবাসার সন্ধান পেয়েছি বন্ধু। ঐ মেয়ে আমার শরীরের সব শক্তি যেন কেড়ে নিয়েছে। একটা চুম্বনে কে

সে শুষে নিয়েছে আমার মনের ক্রোধ। আমি ভুলতে বসেছি, আমি একজন যোদ্ধা। বিশ্বাস করো, কোনো মল্লে জিতে আমি নিজের মনকে এতো হালকা অনুভব করিনি।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, তুমি করেছ কি! চুম্বন মানে কি? তুমি বলতে চাচ্ছো, তুমি ঐ বাড়িতে ঢুকেছ, শুধু ঢোকইনি, তার সাথে সাথে খরগোশ দিয়েছ, আর সবশেষে তুমি ঐ মেয়েকে একটা চুম্বন করেছ? উল্টাপাল্টা কিছু নিশ্চয়ই খেয়ে এসেছ তুমি নগর থেকে। তাই এসব উল্টোপাল্টা বকছ।'

'উল্টোপাল্টা তো খেয়েছিই। মদের থেকে কোনো অংশে কম না সেটা।'

ওরিয়ন কি করবে বুঝত পারছে না। ইভান সত্য বলছে কি না বুঝতে পারছে না। তবে যদি সত্যি বলে থাকে তবে তার প্রতি ঈর্ষা অনুভব করাটা রীতিমতো আবশ্যক। তার মেয়েদের প্রতি তেমন একটা আকর্ষণ নেই, কিন্তু সেদিন ঐ অভিজাতের মেয়েকে দেখে তার চোখেও যে চমক লেগে গিয়েছিল সেই কথা অস্বীকার করা যায় না।

'তুমি নিজের চেহারা ইদানীং দেখেছ? তুমি আমাকে কেটে ফেললেও বিশ্বাস করবো না, ঐ অভিজাতের অমন সুন্দরী মেয়ে তোমাকে চুমু খেতে দিয়েছে।' একটু বাজিয়ে দেখতে চায় ওরিয়ন।

'বিশ্বাস করা না করা তোমার ব্যাপার। আমি তো কালও আবার যাবো। তেমনই কথা হয়েছে।'

'কাল যাবে মানে! এত ঘন ঘন শিবিরের বাইরে যাওয়া ঠিক নয়। যে-কোনো সময়ে শিক্ষকদের কাছে ধরা পড়ে যেতে পারো। তারা নিশ্চয়ই এত বোকা নয়। তোমার সাথে সাথে আমাকেও ডুবতে হবে।'

এবার ইভান দৃষ্টি নরম করে ওরিয়নের দিকে তাকালো, 'শিক্ষক কেন, কোনোকিছুই আমাকে আটকাতে পারবে না। তোমাকে শুধু একটা কাজ করতে হবে।'

'বুঝতে পারছি। আবার আমাকে যেতে হবে খরগোশ শিকার করার জন্য। আমি পারবো না।'

'সে কথা বললে তো চলবে না বন্ধু। গাছে উঠে পড়েছি, এখন তুমি কোনোভাবেই মই কেঁড়ে নিতে পারবে না। নইলে সামনের মল্লের প্রশিক্ষণে আমি তোমাকে বেছে নেবো। লড়তে পারবে আমার সাথে?'

ইভান মল্লে হাসতে হাসতে যে কাউকে ঘোল খাইয়ে দিতে পারে। হাড় ভেঙ্গে এক মাস বিছানায় পড়ে থাকার কোনো ইচ্ছে ওরিয়নের নেই, 'তুমি কিন্তু কাজটা ভালো করছো না। আমাকে হুমকি দিয়ে কাজ সারছো।'

'আমি দুঃখিত বন্ধু । আমার হাতে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই ।'

তখনই ওরিয়নের মাথায় মতলবটা খেলে গেল, 'আচ্ছা। আমি তোমার জন্য খরগোশ ধরে আনবো। তবে আমার একটা শর্ত আছে।'

'তোমার আবার কী শর্ত?'

'আমাকে কালকে তোমার সাথে নিয়ে যেতে হবে। তাহলেই আমি খরগোশ ধরতে যাবো।'

'তুমি যাবে মানে? তাহলে শিবিরে আমাদের ঘরে পাহারা দেবে কে?'

'সেটা আমি জানি না। ধরা পড়লে আমি এমনিও শেষ, অমনিও শেষ। নগরে ঘোরাফেরা করে মরাই ভালো। তুমি সব মজা নিয়ে নেবে তা তো আর আমি হতে দিতে পারি না। রোমাঞ্চের স্বাদ আমাকেও নিতে হবে।'

'মল্লের কথা ভুলে গেলে?'

'সেই ভয় আর দেখানো লাগবে না। দরকার হলে এক মাস বিছানায় শুয়ে থাকবো। তবু আমাকে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি না দিলে বাদামি খরগোশ আনতে পারবো না। তোমার হয়ে পাহারাও দিতে পারবো না।'

ওরিয়নের গলার স্বরেই ইভান বুঝতে পেরেছে ওরিয়নকে আর টলানো যাবে না, 'ঠিক আছে। কাল রাতে তোমাকে নিয়ে যাবো। যাও, বাদামি খরগোশ ধরে আনো। আমি আবার ভাবতে বসি।'

'কী ভাববে?'

'আরে দরকারি কথাই ভাববো। ধরা পড়লে কী অজুহাত দেওয়া যায় সেটা। তুমি যাও তো।'

ওরিয়ন চলে যেতে ইভান ভাবতে বসলো। তার ভাবনার বিষয় এখন কেবল একটাই। মন এখন তার চেতনার অধিকার নিয়ে নিয়েছে। অন্যকিছু এখন আর তার মাথায় আসছে না। উঠে চলে গেল সে শিবিরে। ওরিয়ন তার কাজ ঠিক করে ফেলবে।

পরদিন রাতে শিবির থেকে গোপনে বেরিয়ে গেল দুজনে। শেষ মুহূর্তে ওরিয়নকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল ইভান, কিন্তু সফল হলো না। ওরিয়ন একেবারে জোঁকের মতো লেগে রয়েছে।

প্রথম দিনের মতো এত কষ্ট হলো না। কারো কাছ থেকে ঠিকানা জানতে হলো না। ভেতরে ঢোকার সহজ রাস্তা ইনোন সেদিন দেখিয়েই দিয়েছে। গাছ বেয়ে ওঠার দরকার পড়লো না। সেদিন ইনোনের সাথে দেখা করে যে দেওয়াল ডিঙিয়ে বেরিয়েছিল, সেদিক দিয়েই ইভান ঢুকে পড়লো ওরিয়নকে নিয়ে।

চাঁদ এখন মোটামুটি মাথার ওপর। হেলে পড়তে এখনো দেরি আছে। সময় হয়নি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। একটা সুবিধাজনক আড়াল দেখে দুজনে

বসে পড়লো। বিন্দুমাত্র শব্দ করছে না। ইন্দ্রিয় পুরোপুরি সজাগ। যে-কোনো মুহূর্তে প্রহরী এদিকেও চলে আসতে পারে।

'আমার মনে হয় কেউ আসবে না। তুমি সেদিন স্বপ্ন দেখছিলে আসলে। ঘুমিয়ে পড়েছিলে। খরগোশ গেছে পালিয়ে। আর জেগে উঠে তুমি সেই স্বপ্নকেই সত্যি মনে করেছ। আর ফিরে এসেছ শিবিরে।'

'আচ্ছা, তোমার তাই মনে হয়। তাহলে এই যে আমরা এখানে বসে আছি এই জায়গার সন্ধান আমি পেলাম কী করে? স্বপ্নে?'

'এই জায়গা দেখে তো কোনো অভিজাতের বাড়ির স্থান বলে মনে হচ্ছে না। কে জানে কোন চুলোয় আমাকে বসিয়ে রেখেছ।'

'ঠিক আছে, চাঁদটা হেলে পড়ুক। তারপরেই প্রমাণ পেয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, চুপ করলাম তাহলে।'

আরও কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে কোনো কথা হলো না। চাঁদ আস্তে আস্তে হেলে পড়ছে। হঠাৎ করে খুব মৃদু একটা আওয়াজ হলো। একটা দরজা খুব আস্তে খুলছে।

ইভানের গলার স্বর প্রায় শোনা গেল না, 'এই যে, ও এসে গেছে। নড়বে না। আগে আমি দেখছি।'

গুপ্ত দরজা দিয়ে প্রথমে একটা মশাল বেরিয়ে এলো। মশালের পিছু পিছু বেরিয়ে এলো ইনোন। এমনিতে তার খুব একটা সাজার দরকার পড়ে না। বিধাতা তাকে পাঠানোর সময় সব প্রসাধনের সর্বোত্তম ব্যবহার করেই পাঠিয়েছেন। তবু আজ ইভানের সাথে দেখা হবে ভেবে নিজেকে একটু সাজিয়ে নিয়েছে ইনোন। বিধাতার দানের সাথে মানুষের সাজিয়ে নেয়াটা দারুণ মানিয়েছে। চাঁদের নিচে এসে যখন দাঁড়িয়েছে ইনোন, তার হাতে থাকা মশালের আলোটাকে বড্ড ম্লান লাগতে লাগলো।

এই জায়গা ইনোনের একেবারে হাতের তালুর মতো চেনা। ছোটোবেলায় এখানে নির্জনে কত খেলেছে সে। তার যুবতী জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও সেদিন এখানেই ঘটেছিল। এসেই মশালের অপ্রতুল আলোয় চারপাশে দেখতে লাগলো সে। না, কই ইভানকে তো দেখা যাচ্ছে না। তবে কি সে ভুলে গেছে এই জায়গার পথ। না-কি সে আর আসবেই না।

ইনোনের ঠিক পেছনেই বেরিয়ে এসেছে ডোরা। তাকে ইনোনের শরীরের অন্ধকারের কারণে এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না।

'আমার মনে হয় ঐ ছেলে আসবে না। আপনি শুধু শুধু এই সময়ে এখানে এসেছেন।'

ইনোন মৃদু হাসলো, 'আমি নিশ্চিত সে আসবে ডোরা।'

'কীভাবে এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন?'

চোখের পলক একবারের জন্য ফেললো ইনোন, 'আমি তার চোখ দেখেছিল সেদিন ডোরা। আলো অনেক কম ছিল, তবু নিশ্চিত, সেই চোখের ভাষা কিছুতে ধোঁকা দিতে পারে না।'

চোখের ভাষার বিপরীতে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ডোরা, ঠিক তখন অন্ধকার আড়াল থেকে মশালের আলোর আওতায় বেরিয়ে এলো ইভান কোনরকম শব্দ না করে। ইনোনের মুখের হাসিটা একটু ছড়িয়েই মিলিয়ে গে তাকে দেখে। তার চোখে মুখে এখন লজ্জার ছাপ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। এমন কেন হচ্ছে?

ইভান এগিয়ে এলো, 'আমি একটু আগেই এসেছি। ওদিকটায় বসেছিলাম।'

ডোরা ইভানকে ভালো করে মাপছে, 'তুমি কি একাই এসেছ না-কি?'

'না, আমার সেদিনের বন্ধু আজ আমার সাথে এসেছে। আমাকে কিছুতে একা আসতে দিলো না। তুমিও তো এজন্যই এসেছ। নিশ্চয়ই ওকে একা ছাড় চাওনি।'

'হ্যাঁ, আর কখনো একা ছাড়বোও না।'

ইনোন এবার যোগ দিলো আলোচনায়, 'আচ্ছা, তোমার বন্ধু কোথায় আছে'

ঝোপের দিকে ইশারা করলো ইভান, 'ঐ ঝোপের আড়ালে।'

ডোরার দিকে তাকালো ইনোন, 'দেখ, সে আজকে আমাদের বাড়িতে প্র বার এসেছে। প্রথমবার আসা অথিতিকে ভালো করে যত্ন করতে হয়। তুই ওদি যা।'

ডোরার গলা কঠিন হয়ে এলো, 'আমি আপনাকে এখানে একা রেখে কোথা যাচ্ছি না।'

'ডোরা', এবার চোখটা একটু পাঁকালো ইনোন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঝোপের দিক পা বাড়ালো ডোরা।

ইভানকে নিয়ে ইনোন একটা গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মশালটা গুঁ দিলো কাছের ছোটো একটা কোঠরে।

ইভান কী বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না। শুধু বুঝতে পারছে, গত দুদি ধরে পাকানো কথাগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, কথারাও পালিয়ে যে পারে। ইনোনই কথা বলল, 'এই গাছটা আমার খুব প্রিয়। কতদিন ধরে এক জায়গায় আছে। আমি ছোটোবেলায় খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে গেলে এই গাছে গুঁড়িতে এসে বসতাম।'

ইনোনের সাথে সাথে ইভানও বসলো গাছের গুঁড়িতে। ইভান এখনো বুঝ পারছে না কী বলা উচিত। তবে কিছু তো বলতেই হবে। প্রেয়সীর পাশে এভা নীরবে বসে থাকা বেশ অস্বস্তিকর।

মুখ খুলতে যাবে ইভান ঠিক সে সময়েই তার মুখ বন্ধ করে দিলো ইনোন। আর তা অবশ্যই হাত দিয়ে নয়। সেই সাথে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে শক্ত আলিঙ্গনে।

ওদিকে ডোরা আর ওরিয়ন অন্ধকারে আছে। ওদের সাথে কোনো আলো নেই। অথিতি সৎকার করতে বলা হয়েছিল ডোরাকে। কিন্তু এই উটকো আপদের সৎকার করতে বয়েই গেছে। নীরবেই বসে আছে দুজনে। সেদিনই ডোরার রুদ্ররূপ দেখেছিল ওরিয়ন। তার কিছু বলার প্রশ্নই আসে না। ডোরা যে চুপ করে আছে এতেই সে খুশি।

ওদিকে ওরা মশালের মৃদু আলোয় ইভান আর ইনোনকে দেখছে। ওদের চুমু খাওয়ার দৃশ্য দেখল ওরিয়ন হাঁ করে। ডোরাও দেখে কম অবাক হয়নি। ওরিয়ন ডোরার দিকে তাকালো, কেমন বিহ্বল দৃষ্টি।

ডোরা অন্ধকারে অতকিছু বুঝতে পারলো না, শুধু চাঁদের আলোয় এটুকু বুঝতে পেরেছে, ওরিয়ন তাকিয়ে আছে তার দিকে। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল ডোরা, রীতিমতো ধমকে উঠলো, 'এই তুমি আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন?'

'ওরা কী করেছে দেখেছ?'

'কেন দেখবো না। আমি কি কানা?'

'না, অমন ভয়ংকর চোখের যে মালিক সে কানা কীভাবে হবে। আচ্ছা আমরা যা করার তাই করি, ওদেরকে পাহারা দিই।'

'হ্যাঁ, তাই দাও। ওদের দিকে তাকিয়ে ওদেরকে পাহারা দাও। আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন?'

ওদিকে ইনোন ইভানের কাঁধে মাথা রেখেছে, ইভানকে যেন জন্ম জন্মান্তরের আপন মানুষ মনে হচ্ছে তার, 'জানো। ভালোবাসা নিজের সাথে করে কী নিয়ে আসে?'

ইভান মাথা নাড়লো, 'জানি না। আমি ভালোবাসা সম্পর্কে অজ্ঞ।'

'হারিয়ে যাবার ভয়। সেদিন রাতের পর থেকে আমার কেবলই ভয় হয়, তুমি আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে না তো?'

'আপাতত তেমন কোনো ইচ্ছে আমার নেই। হারিয়ে তো যাবোই না, যাতে করে এভাবে বাড়ির পেছনে আমাদের গোপনে দেখা করতে না হয়, সেই ব্যবস্থা করবো আমি। তোমাকে বিয়ে করবো। তাহলেই তো আর হারিয়ে যাবার প্রশ্ন থাকবে না।'

'সেখানেই তো সমস্যা', ইনোন মাথা ওঠালো। 'আমার বাবার নাম তো শুনেছ তুমি। কিন্তু তিনি আসলে কে, তা কি তুমি জানো?'

'অবশ্যই জানি। তিনি একজন অভিজাত। যেনতেন অভিজাত নয়। একেবারে ক্রিপ্টেয়ারের বাহিনীতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। সেখান থেকে যখন সেনা অভিজাত বাছাই করা হয়েছিল তাকেই অভিজাত সমাজ বেছে নিয়েছিল প্রথমে।'

'বাহ, এই কদিনে তো বেশ ভালোই জেনে ফেলেছ। তাহলে তো এটা অবশ্যই জানো স্পার্টার এক অভিজাতের মেয়েকে কোনো এক অভিজাত ঘরে বিয়ে দেওয়া হবে। আমারও বিয়ে হতে আর বেশি দেরি নেই।'

'হ্যাঁ, আমি সেটাও জানি।'

'আমি শুধু তোমার নামটাই জানি', ইভানের হাত চেপে ধরলো ইনোন, 'কিন্তু তোমার পরিচয় তো জানি না। তোমাকে জঙ্গলে শিকার করতে দেখেছি আমি। তুমি কি কেবল একজন সাধারণ শিকারি?'

'যদি তাই হয়?' ইভান মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে।

'তাহলে আমাদের বিয়ে হবে কী করে? বাবা কখনোই একজন শিকারির সাথে আমার বিয়ে দেবেন না। কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না।'

'তুমি আমার সাথে পালিয়ে যেতে পারবে না? ভালোবাসার জন্য তো আমাদের দেবদেবীরাও তাদের বাবা আর মায়ের আদেশ অমান্য করতেন।'

চট করে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব না। ইনোন চুপ করে রইলো। তার ভেতরে যে প্রেম জন্ম নিয়েছে সে প্রথমেই লঙ্ঘন করেছে সীমা। তাকে আর সংবরণ করার কোনো উপায় নেই।

ইভান এবার নিজের পরিচয় দিলো, 'আমি যেনতেন কোনো শিকারি নই। আমি আর আমার বন্ধুর শিকার করে মাংস খাবার শখ হয়েছিল সেদিন।'

'তাহলে তুমি কী করো?'

'আমি সৈনিক। আমার বন্ধুও। আমাদের পরিচয় কারো কাছে প্রকাশ করা একেবারে মানা। তবু তোমার মন শান্ত করার জন্য বলতে বাধ্য হলাম। আমরা ক্রিপ্টেয়ারের প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। আর কিছুদিন পরেই আমাদের চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে। তারপর আমাদের মধ্য থেকে অভিজাত বাছাই হবে। তোমার বাবার মতো প্রথম না হতে পারি, তবে অনায়াসে অভিজাত সেনার তালিকায় নাম লেখাতে পারবো বলেই বিশ্বাস আমার। এবার চিন্তা কমেছে?'

ইনোন এতক্ষণ বিশ্বাস করতে পারছিল না। তবে এটুকু বুঝতে পারলো ইভান মিথ্যে বলছে না। ইভানকে জড়িয়ে ধরলো সে। মুখে কিছু না বললেও অন্তর থেকে বেরিয়ে এলো স্বস্তির নিঃশ্বাস।

নিজেদের পেছনে কারো উপস্থিতি টের পেলো ওরা। পেছনে তাকাতেই দেখে ডোরা আর ওরিয়ন দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের দেহ তাড়াতাড়ি আলাদা হলো।

হালকা কেশে নিলো ওরিয়ন, 'অনেকক্ষণ তো হয়ে গেছে। এরপরে যাত্রা করলে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে। আমাদের এখন এখান থেকে বেরিয়ে পড়া উচিত।'

ইনোন জিজ্ঞেস করে, 'আবার কবে আসবে?'

ইভান মৃদু স্বরে বলে, 'শীঘ্রই। ভেবো না, আমি আসার আগে তুমি আমার আসার সংবাদ পেয়ে যাবে। আশা করি আমার সংকেত বুঝতে পারবে তুমি।'

'পারবো।'

এবার কথা বলে উঠলো ডোরা, 'তুমি আসবে ঠিক আছে। আর সাথে করে কাউকে নিয়ে আসতে হলে বুদ্ধিশুদ্ধি আছে এমন কাউকে নিয়ে এসো। এই মর্কটকে আর নিয়ে এসো না।'

নিজের অপমান গায়ে মাখলো না ওরিয়ন, শুধু ইনোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় আপনারও সঙ্গী বদলানোর সময় চলে এসেছে। স্পার্টায় সুন্দরী আর ভালো ব্যবহারের মেয়ের অভাব আছে বলে মনে হয় না।'

ডোরা কিন্তু নিজের অপমান হজম করলো না, 'কী বললে তুমি! এত বড়ো সাহস। আমাকে কোন দিক দিয়ে কুৎসিত মনে হচ্ছে তোমার?' কথাটা বলতে বলতে ডোরা একেবারে ওরিয়নের মুখের সামনে চলে এসেছে।

ভয়ংকর শিকারি, অন্ধকার-রাত্রি কোনো কিছুকেই ভয় না পাওয়া ওরিয়ন ভিজে তুলোর মতো চুপসে গেল। ইনোন হাসলো, 'না ডোরা, রেগে যাস না। ও মজা করার জন্য কথাটা বলেছে', নিজের হাতে সরিয়ে দিলো ডোরাকে।

ইভান আর ওরিয়ন দেওয়াল টপকে বেরিয়ে গেল। গুপ্ত দরজায় ঢোকা মাত্র ডোরা জিজ্ঞেস করলো, 'ইভান ছেলেটা বেশ। তবু প্রথমেই এতটা বিশ্বাস করা উচিত হচ্ছে না। আরেকটু বাজিয়ে নিলে হতো না?'

লজ্জা পেলো ইনোন, বুঝতে পারছে ডোরা কোন দিকে ইঙ্গিত করছে। কথা ঘোরালো সে, 'তুই তো অনেকক্ষণ বসেছিলি ওরিয়নের সাথে। ওর সাথে কেমন আলাপ জমিয়েছিস?'

হেসে ফেললো ডোরা, 'ঐ হতভাগার সাথে আলাপ জমাতে আমার ঠেকা নেই।'

মৃদু স্বরে বলল ইনোন, 'আলাপটা জমাতে পারিস। ছেলেটা তো দেখতে ভালোই। আবার সামনে ওরা দুজনেই অভিজাত হচ্ছে।'

'অভিজাত!' ক্ষণিকের জন্য থমকে গেল ডোরার পা।

'হ্যাঁ। ওরা দুজনেই ক্রিন্টেয়ারের সদস্য।'

আরবের এদিকে সমুদ্র আর মরুভূমি একসাথে এসে মিশেছে। একমাত্র বেদু
জাত ছাড়া আর কেউ এই মরুকে আপন করে নিতে পারেনি। ঘোড়া, রথ, প
হাঁটা কোনোকিছুই এই মরুর রাজ্যে তেমন একটা সুবিধাজনক না। পথ চল
অসুবিধা, তার ওপর সবচেয়ে বড়ো কষ্টটা হচ্ছে জলের। জল এখানে স
চেয়েও দুষ্প্রাপ্য। তাই বড়ো মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আরব বণিকের দল এইদি
বন্দর ব্যবহার করে না। এই বন্দর মূলত সমুদ্রযাত্রীদের জল আর রসদের জো
দেয়।

অকুলাস বন্দরে ক্রেতা বিক্রেতার ব্যাপারটাও এজন্য আলাদা। দোক
বলতে কিছু শুকনো খাবার, মাংস আর ফলের দোকান। মরুভূমিতে দেদার
জন্মানো খেজুর সমুদ্র যাত্রার খাবার হিসেবে বেশ প্রসিদ্ধ। অল্প খেলেই
আর মন দুটোই ভরে। শরীরে শক্তিও থাকে অনেকক্ষণ। আরও এক ধর
দোকান আছে এই বন্দরে। জলের দোকান। যেসব জায়গায় বিধাতার কৃ
বড়ো এবং প্রশস্ত নদী বয়ে চলে তারা এই পৃথিবীতে এমন দোকানের অস্তি
কথা কল্পনাই করতে পারবে না, কিন্তু এমন দোকানও আছে। বড়ো ব
পিপায় ভরা থাকে মাটির তলদেশ থেকে উঠে আসা প্রস্রবণের জল। এই
স্বাদে অনন্য। সেই জল কিনে নিয়ে যায় জাহাজের নাবিকেরা। জলের দ
নেহাত কম নয়।

ক্রমাগত দাঁড় বেয়ে রাহুদের জাহাজ ভেবে রাখা সময়ের আগেই পৌঁছে গে
অকুলাসে। দূর থেকে অকুলাস বন্দর দেখতে পেয়েই নাবিকদের মধ্যে একটা
বয়ে গিয়েছিল। অকুলাস বন্দরে জল আছে, তাদেরও জল ফুরিয়েছে প্রায়। ত
হল্লা সেই কারণে নয়। অনেকদিন পর তারা ডাঙার দেখা পেয়েছে। আর এই ড
যে সে ডাঙা নয়, আরব সাগর পাড়ি দিয়ে তারা ফিরে এসেছে এপাশে, তার ম
নিজেদের ভূখণ্ডের অনেক কাছে।

মাজিদ সবকিছু তদারক করছে। অকুলাস বন্দরে জাহাজ ভেড়ানোর
অবশ্য এভাবে তদারক করার কিছু নেই। এখানে তেমন কোনো চোরাস্রোত অ
ডুবো পাথর নেই। জাহাজ নির্বিঘ্নেই ভিড়তে পারে এসব বন্দরে। তবে নাবিক
ওপর খবরদারি চালানো সব প্রধান নাবিকের রক্তেই বাসা বাঁধে। নিজেই নি
কতৃত্বের সাধ নিতে লাগলো মাজিদ। নানা রকম চিৎকার করে বিভিন্ন সং
দিতে লাগলো নাবিকদের। আশে পাশে আরও কিছু জাহাজ আছে। সে
জাহাজের নাবিকেরা এই জাহাজের দিকে তাকাতে লাগলো নিরাসক্ত চো
প্রাত্যহিক দৃশ্য দেখার নিয়মিত আগ্রহ তাদের চোখেমুখে।

রাহু নিজেও একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। মাজিদের হাবভাব তার কিছুদিন ধরেই ভালো লাগছিল না। আর এক জায়গায় অনেকদিন থেকে সে কারো মায়ায় জড়াতে চায় না। সেই সাথে এটাও চায় না, অন্য কেউ তার ওপর কোনো অধিকার ফলাক।

জাহাজ বন্দরের জেটিতে বাঁধা হতেই নোঙ্গর ফেলে দিলো নাবিকেরা। পুরোপুরি স্থির হয়ে গেল জাহাজ। ঢেউয়ের ধাক্কায় এখন কেবল এক জায়গায় ওপর নিচ করছে।

মাজিদের হম্বিতম্বি এবার একটু শান্ত হয়েছে। নিচে নামতে হবে। একবার ডাঙ্গায় এলে নাবিকদের আর বেঁধে রাখা যায় না। সেই চেষ্টাও করলো না সে। এরা এতদিন অনেক কষ্ট করেছে। অনেকদিন পরিবারের মুখ দেখেনি। স্ত্রী সন্তানদের বিরহ এখন তারা মদে আর বন্দরের নিষিদ্ধ নারীতে ভুলে থাকার চেষ্টা করবে। তাদের সবাইকেই কিছু কিছু করে মুদ্রা দিয়ে দিয়েছে মাজিদ। নাবিকেরা মালিকের বদান্যতায় বেশ খুশি, কিন্তু মাজিদ জানে এটা আসলে কোনো দাক্ষিণ্য নয়। বাড়ির বন্দরে পৌঁছানোর পর মূল বেতন থেকে এই মুদ্রা কেটে রাখবে সে। করুক এখন নাবিকেরা আনন্দ। এক পলের মধ্যে নাবিকেরা কেউ সিঁড়ি, কেউ পাটাতন আবার কেউ দড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে। কেউ কেউ আনন্দের আতিশায্যে মুদ্রা থলিটা নিরাপদে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে।

নাবিকদের আনন্দ দেখতে দেখতে হাসছে মাজিদ। হাঁটতে হাঁটতে সে চলে এলো জাহাজের ডেকের ওপর। তারও যে নিচে নামতে ইচ্ছে করছে না তা নয়। তবে নাবিকদের সাথে হুড়োহুড়িতে যোগ দিলে তো আর নিজের ওজন থাকে না। নাবিকেরা বন্দরের ভেতরে চলে গেলে ধীরেসুস্থে নামা যাবে।

তবে জাহাজের সবাই নেমে যায়নি। রাহুও দাঁড়িয়ে ছিল ডেকের এক কোণে। ডাঙ্গায় আসার বিপদ নিয়ে চিন্তা করছে সে। এতদিন তারা ছিল মাঝ সমুদ্রে। অঙ্গদকে তখন কেউ চুরি করলে কোনোদিকে নিয়ে যেতে পারতো না, তাকে থাকতে হতো সমুদ্রেই। কিন্তু ডাঙ্গা মানুষের সামনে অনেক পথ খুলে দেয়। এখন যদি কেউ অঙ্গদকে চুরি করে নিয়ে যেতে চায়, সে সহজেই পালিয়ে যেতে পারবে। অঙ্গদকে যেদিন থেকে নিজের করে নিয়েছে সেদিন থেকে এই চিন্তা তার মাথা থেকে দূর হয়নি। বারিগাজায় থাকতেও এই চিন্তা তার মাথায় আসতো হামেশা। কিন্তু সেটা ছিল তার চেনা বন্দর। সে যতই নানা ভাষা জানুক না কেন, এখন সে আছে পরদেশে। আর পরদেশে অঙ্গদের মতো একটা লোভনীয় জিনিস রক্ষা করা বেশ কঠিনই হবার কথা। চিন্তা করতে করতে দাঁতে দাঁত চেপে বসলো রাহুর। না, এত পরিকল্পনা করার পর ভাগ্য তার হাতে এসেছে। কিছুতেই এই ভাগ্যকে সে হারিয়ে যেতে দেবে না।

মাজিদকে দেখতে পেলো রাহু, তার দিকেই এগিয়ে আসছে হাসিমুখে।

'কী খবর তোমার। তেমন উত্তেজনা তো দেখছি না তোমার মধ্যে। দেখলে, নাবিকেরা অনেকদিন পর ডাঙ্গা দেখতে পেয়ে কেমন উত্তেজিত। যে যেভ পেরেছে নেমে পড়েছে। তোমার নামতে ইচ্ছে করছে না?'

'হ্যা করছে, নামবো তো।' মনে মনে বলল, 'নাবিকদের কাছে তো অঙ্গদ নেই। ওরা তো লাফিয়েই নামবে।'

'তুমিও যে নামলে না? তোমার নামতে ইচ্ছে করছে না?'

রাহুর প্রশ্নে হাসল মাজিদ, 'হ্যা, ইচ্ছে করবে না কেন? তবে জানো জাহাজের মালিক হিসেবে জাহাজ একেবারে খালি রেখে নামতে ইচ্ছে কর উপায় নেই। পৃথিবীর যে-কোনো বন্দর সম্পর্কে একটা কথা চির সত্য। জায়গায় চোরের অভাব নেই। দেখবে জাহাজে ভয়ংকর চুরি হয়ে গেছে। কিছু পেলে দাঁড় নিয়ে যায় চোরেরা।'

'হ্যা, এটা ঠিক বলেছ।' রাহুও একটু হাসলো।

'কোনো নাবিক ফিরে এলেই আমি নামবো। তুমি একটু ঘুরে আসো। মুদ্রা না থাকে তাহলে আমি দিচ্ছি।'

প্রধান নাবিকের ভদ্রতা অস্বাভাবিক লাগছে রাহুর, অতি ভক্তি চোরের ল 'হ্যা, আমিও এখনই নামবো। যাই, একটু ঘুরে আসি। মুদ্রা লাগবে না। সাথে আছে।'

অঙ্গদকে খাঁচায় নিয়েই নামতে উদ্যত হলো রাহু, পেছন থেকে ডাক দি মাজিদ, 'আরে খাঁচা নিয়েই নামছো যে! বোঝা নিয়ে কতক্ষণ হাঁটবে। এখা রেখে যাও। আমি তো আছি।'

সুকৌশলে প্রস্তাব এড়িয়ে গেল রাহু, 'আরে না। চোরের জন্য না। আ আমার বাঁদর অনেকদিন ধরে জলের ওপর ছিল তো। তাই ওকেও একটু ডা নামাবো। অনেকদিন পরে মাটির ওপর একটু কসরত করিয়ে আনি।'

এবার আর মাজিদ মানা করলো না, 'আচ্ছা যাও। বন্দরের বাজা একেবারে শেষে একটা শরবতের দোকান আছে। সেখানে যেও কিন্তু। শরব দাম খুবই কম, তবে একবার খেলে সহজে সেই দোকান থেকে বেরোতে পা না, যতক্ষণ না তোমার পেট ফুলে ঢোল হয়।'

'হ্যা, অবশ্যই যাবো।' আর কোনো কথা না বলে জাহাজ থেকে নেমে পড়ে রা

এদিকের সমুদ্রে আগেও যাত্রা করেছে রাহু। অকুলাস বন্দরেও এসেছিল, তখন বেশিক্ষণ এই বন্দরে থাকার সুযোগ পায়নি। সেসব জাহাজ অনেক ছিল। খাবার আর পানি নিয়েই ছেড়ে গিয়েছিল বন্দর। এই জাহাজের ভাব মনে হচ্ছে সহজে নড়বে না।

রাহু তার অকুলাসের স্বল্প সঞ্চিত স্মৃতি ব্যবহার করে একটা দোকানে এসে উপস্থিত হলো। সে সব বন্দরে আগে একটা জিনিসই খোঁজে। মদ। আগের বার এখানে এসে মদ গিলেছিল, এবং হ্যাঁ, বেশ উপাদেয় ছিল সেই পানীয়।

কয়েকটা মুদ্রা বের করে সরাইয়ের মালিকের হাতে দিলো সে। তারপর মদের পাত্র নিয়ে একটা কোণে বসে পড়লো। মাতাল হওয়া চলবে না। এই অকুলাস বন্দরে অঙ্গদকে দিয়ে খেলা দেখানোর কোনো ইচ্ছে তার নেই। এখানে মানুষ এবং মুদ্রা দুটোই অপ্রতুল।

মদ গেলা শেষ হতে সরাই থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ এদিক সেদিক হেঁটে বেড়ালো সে। অঙ্গদের খাঁচা সবসময় হাতে রাখতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই তার দুই হাতই ব্যথা হয়ে গেল। খাঁচার ওজন তো আর নেহাত কম নয়। জাহাজে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো রাহু। নাহ, এভাবে একটা ওজনদার জিনিস নিয়ে হাঁটাচলা করার কোনো মানে নেই।

বন্দরের একটা প্রায় অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়লো সে। যদিও চেনে না, তবে জানে বন্দরের এসব গলি একসময় সমুদ্রে গিয়েই শেষ হয়। আর সমুদ্রের পাড়ে যেতে পারলেই জাহাজে পৌঁছানো যাবে।

এই গলিতে লোকজন তেমন নেই। তখনই পেছন থেকে নিজের নামটা শুনতে পেলো সে।

'রাহু।'

পেছনে তাকালো রাহু। একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। বেশ নাবিকের। এই নাবিককে চেনে সে। তাদের জাহাজেরই। এখন নামটা মনে করতে পারছে না।

'তুমি এদিকে কোথায় যাচ্ছো? আমাদের জাহাজ তো ওদিকে।'

'ওহ..., দিক ভুল করে ফেলেছি।'

'এদিকে আসো।'

রাহু এগিয়ে গেল নাবিকের দিকে। নামটা মনে পড়েছে। বাসিল।

রাহু কাছে আসতেই কোমর থেকে তলোয়ার বের করে ফেললো বাসিল।তবে রাহু আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল। অঙ্গদকে বহন করা খাঁচার ঢাকনার কাপড়ের আড়ালেই একটা মাঝারি ছুরি ধরে রেখেছিল সে বন্দরে নামার পর থেকেই। অতিরিক্ত সতর্কতাই বাঁচিয়ে দিলো তাকে। বাসিল তলোয়ার বের করতেই নিজের ছুরি দিয়ে বাসিলের গলা ফাঁক করে দিলো সে।

তলোয়ার ছেড়ে দিয়ে নিজের গলা চেপে ধরলো বাসিল। তার পাশে বসলো রাহু, 'তোমাকে প্রথম দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। আমি না হয় না চিনে ভুল রাস্তায় চলে এসেছি, কিন্তু তুমি তো রাস্তা চেনো, তুমি কেন এই ভুল রাস্তায় এসেছ? নিশ্চয়ই আমার পিছু নিয়েছিলে? বলো, কী ছিল তোমার উদ্দেশ্য? কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

প্রশ্নটা করেই রাহু বুঝতে পারলো, এখন আর এই উত্তর দেবার ক্ষমতা বাসিলের নেই। তার স্বরযন্ত্র কেটে গেছে। একটু পরে তড়পাতে থাকা শরীর স্থির হয়ে গেল।

ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে রাহুর মাথায়। অপকর্ম জীবনে কম করেনি সে, তার সারা জীবনটাই আসলে চুরি, লুট আর বিশ্বাসঘাতকতার সমষ্টি। তবু সে আসলে মনের দিক থেকে অতো সাহসী নয়। মানুষ হত্যা করতে দুটো জিনিসের ভীষণ প্রয়োজন। নিষ্ঠুর এক মন আর সাহস। ঘটনাচক্রে এমন ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে সারা শরীর কাঁপতে লাগলো তার। কিছুক্ষণের জন্য বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। তবে তার ধূর্ত মন নিমেষেই সামলে নিলো।

প্রথম কাজ হচ্ছে, কিছুতেই ধরা পড়া চলবে না। আশেপাশে বেশ কিছুক্ষণ নজর বোলালো সে। না, কেউ কোথাও নেই। তাকে কেউ এই কাজ করতে দেখেনি। এই স্থান এখনই ত্যাগ করতে হবে। তাড়াতাড়ি গলির মুখের দিকে হাঁটতে লাগলো সে। সেই সাথে নিজের কাপড় পরীক্ষা করছে। তার দেহে রক্ত পড়েনি। তবে অঙ্গদের খাঁচার চাদরে রক্ত লেগে গেছে। তাড়াতাড়ি ফাঁকা পেয়ে পাশের গলিতে ঢুকে পড়লো সে। অঙ্গদের খাঁচার চাদরও উল্টে নিলো। এখন আর রক্ত দেখা যাচ্ছে না।

আর বাইরে থাকা যাবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে হবে জাহাজে। তাহলে সে সন্দেহের বাইরে থাকবে। অবশ্য কেউ তাকে সন্দেহ করবে না। বাসিলের সাথে তার কোনো কালেই কোনো শত্রুতা ছিল না।

জাহাজে উঠে এলো সে কিছুক্ষণের মধ্যেই। সঠিক রাস্তার সন্ধান পেয়ে গেছে। ছুরিটা থেকে রক্ত আগেই সমুদ্রের জলে ধুয়ে নিয়েছে। এখন জাহাজে উঠেই খোলে একটা গর্ত পেয়ে ছুরিটা রেখে দিলো সেখানে। নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছে রাহুকে। তবে সফল হয়েছে সে। প্রধান নাবিক জাহাজে নেই। দুজন নাবিক ফিরে আসাতে সে জাহাজ থেকে নেমে গেছে। মাজিদের অনুপস্থিতিতে জাহাজ পাহারা দিচ্ছে দুই নাবিক। তারা স্থল থেকে জোগাড় করে আনা আপাত উৎকৃষ্ট মদের সদ্‌গতিতে ব্যস্ত হয়ে আছে। রাহুর দিকে তাকাবার সময় তাদের নেই।

রাহু জানে বাসিলের মৃত্যুর সংবাদ খুব বেশিক্ষণ গোপন থাকবে না। ঐ গলি নির্জন হলেও কেউ না কেউ যাবেই সেখানে। আবিষ্কার করবে লাশ। তারপরে কী হবে জানে রাহু। নিজেকে একেবারে অটল রাখতে হবে। সবাই যখন শোক প্রকাশ করবে, ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে, বন্দরের প্রহরীরা আসবে, তখনো সবার আচরণের সাথে মিশে যেতে হবে তাকে।

রাহুর অনুমান মিথ্যে হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্দরের দিক থেকে একটা ভিড়কে জাহাজের দিকে আসতে দেখা গেল। ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন একটা নিথর দেহকে তুলে ধরে রেখেছে। কেউ কেউ আর্তনাদ করছে।

বাসিলের প্রাণহীন দেহটা জাহাজের ওপরে এনে রাখা হলো। সবার মাঝের উত্তেজনা যেন একেবারে মিইয়ে গেছে। তাদের একজন সাথি এই মাত্র প্রাণ হারিয়েছে।

মাজিদ তাকালো প্রহরীর দিকে, 'খুনিকে ধরতেই হবে। কে খুন করেছে। নিশ্চয়ই কোনো ডাকাত।'

প্রহরীর তেমন একটা মাথাব্যথা হলো না। এরা এই ভূখণ্ডের প্রজা না। তবে এমন ঘটনা হলে বন্দরের দুর্নাম হবে। এমন ঘটনা যে বন্দরে একেবারেই ঘটে না তা নয়, সে মত দিলো, 'ডাকাতি করার জন্যই মনে হয় হত্যা করা হয়েছে। আপনার এই লোক ঐ নির্জন গলির ভেতরে কেন গিয়েছিল? ঐ জায়গা ভালো নয়।'

'আমার নাবিক এখানে মরে পড়ে আছে, আর আপনি আমার নাবিককেই দোষ দিচ্ছেন? খুনি ধরার দায়িত্ব তো আপনার।'

'দেখুন, সেটা আমরা জানি। আমরা চেষ্টাও করে দেখবো। তবে কোনো চাক্ষুস সাক্ষী না থাকলে কাউকে গ্রেফতার করা অসম্ভব হয়ে যাবে। দেখি কোনো প্রমাণ উদ্ধার করতে পারি কি না।'

'কী প্রমাণ উদ্ধার করবেন জানা আছে। আমাদেরকে ওর লাশ কবর দেবার অনুমতি দিন। আর এই অভিশপ্ত বন্দরে আমি একদিনও আমার জাহাজ রাখবো না। আজকেই রওনা দেবো।'

প্রহরী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, 'ঠিক আছে। বন্দর প্রধানের সাথে কথা বলে আমি অনুমতি জোগাড় করে দেবো।'

প্রহরীর হাঁফ ছেড়ে বাঁচার কারণ স্পষ্ট। এই জাহাজ চলে গেলে এই খুনের খুনির পেছনে আর মিছে দৌড়ঝাঁপ করে মরতে হবে না। খুব তাড়াতাড়ি অনুমতি পাওয়া গেল। জলের পিপেগুলো ভরে নিয়ে নাবিকদের একটু বিশ্রাম নিতে বলল মাজিদ। এক প্রহর বিশ্রামের পরেই জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হবে।

মাজিদ নিজের কামরায় বসে আছে। একজন নাবিক হারিয়ে সে যে খুবই মুষড়ে পড়েছে তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। রাহু তার কামরার বাইরে এসে দাঁড়ালো, 'ভেতরে আসবো? একটু কথা আছে।'

মাজিদ তাকিয়ে রাহুকে দেখলো, 'এসো।'

রাহু এসে দাঁড়ালো তার পাশে, 'আমি জানি এখন তোমার মনের অবস্থা খুবই খারাপ। কিন্তু একটা জরুরি কথা তোমাকে না বলে পারছি না। আর সময়ও নেই।'

'কী কথা?'

'তোমরা তো একটু পরে অকুলাস ছেড়ে চলে যাবে। আমি আসলে এই বন্দরে কিছুদিন থাকতে চেয়েছিলাম। আসলে আমার জীবনটা এমনই। কিছুদিন পরপর জাহাজ আর বন্দর বদল করতে হয়।'

'তাহলে জাহাজ থেকে নেমে যেতে চাইছো তুমি?'

'হ্যাঁ।'

নিজের জায়গা থেকে উঠে গেল মাজিদ। তার চেহারা থেকে সমস্ত ক্রোধ আর শোকের চিহ্ন মিলিয়ে যেতে লাগলো। দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো সে, আচমকা করে বসলো প্রশ্নটা, 'বাসিলকে কীভাবে মারলে তুমি?'

সমুদ্র খুব একটা সুখকর জায়গা না। নেশা একটা আছে বটে, তবে সেই নেশার কাছে পৌঁছাতে ভালোই কাঠখড় পোড়াতে হয়। সমুদ্রের ঢেউয়ে জাহাজের ওঠানামার ছন্দের সাথে তাল মেলানোর জন্য শরীর কিছুটা সময় নেয়। যতক্ষণে শরীর মানিয়ে নেয় ততক্ষণে সেই শরীরের মালিকের অবস্থা বেশ সঙ্গিন করে তোলে।

জাহাজের মালিক যখন জানতে পেরেছিল রুদ্রদেব আর অসিত প্রথম বার সমুদ্র যাত্রা করছে তখনই সে বুঝেছিল, এই দুজনকে দিয়ে কাজের কাজ কিছুই হবে না। তার ওপর দুজনকে সামলাতে কিছুটা বেগ পেতে হবে। সে পোড় খাওয়া লোক। অনেক নতুন লোকের দুর্দশা দেখে অভ্যস্ত। তার নিজেরও প্রথম সমুদ্র যাত্রার স্মৃতি সুখকর নয়।

রুদ্রদেব এমন অবস্থার সামনে আগে পড়েনি। কিছু নৌ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তার আছে। তাও অনেক আগে। অসিতের নৌ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বলতে কিছু নদীপথ পাড়ি দেওয়া। নদীর সাথে সমুদ্রের কোনো অংশেই মিল নেই। এরই মধ্যে দুদিন কেটে গেছে। রুদ্রদেব অসিতকে খুব একটা ভরসা দিতে পারেনি। তার নিজের অবস্থাই খারাপ।

'বুঝলে অসিত, আমি এখন বুঝতে পারছি, কেন রাম লঙ্কা যাবার জন্য বানরদের দিয়ে এত কষ্ট করে সেতু বানিয়েছিলেন। কেন তিনি বড়ো নৌকা বানিয়ে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করেননি।'

'হ্যাঁ, আমিও বুঝতে পারছি' বিষণ্ণ স্বরে উত্তর দিলো অসিত। তার এখনো পেট গোলাচ্ছে। একটু আগেও বমি করেছে সে।

'রামের বানর বাহিনী যদি নৌকা নিয়ে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করতো তাহলে তাদের যে অবস্থা হতো তাতে যুদ্ধ আর করতে হতো না। অর্ধেক বাহিনী সমুদ্রেই মারা পড়তো আর বাকি অর্ধেক লঙ্কায় গিয়ে মরতো।'

'হ্যাঁ, কপাল ভালো পাথর ভেসেছিল।'

'তোমার শরীরের এখন কী অবস্থা?'

'পেটটা এখনো কেমন জানি করছে। কিছুক্ষণ পরপর শরীর গুলিয়ে উঠছে। একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। তেমন কিছু খাচ্ছিও না, জলও খাচ্ছি একেবারে কম। এতো বমি আসছে কোথেকে?'

'এই প্রশ্নের উত্তর তো আমিও পাচ্ছি না। তবে আমার মনে হচ্ছে তিন দিন কেটে গেলেই আমাদের শরীর ঠিক হয়ে যাবে।'

এরই মধ্যে প্রধান নাবিক ওদের সামনে দিয়ে ঘুরে গেছে। জাহাজের লোকজনের কাজের অভাব নেই। এই সমুদ্রের দুলুনিতে ঠিক দিকে জাহাজের মুখ

সোজা রাখতে হালে-পালে-দাঁড়ে সমানে কাজ করতে হচ্ছে। কেউ বসে নেই। যার জাহাজ চালানোর কাজ নেই সে খোলের ভেতরে জমতে থাকা পানি পরিষ্কার করছে অথবা পরের বেলার খাবারের ভাগ ঠিক করছে। জাহাজের নাবিকদের অলস সময় বলে কিছু নেই। সমুদ্র শান্ত হলে অবশ্য কাজ এতটা করতে হয় না। ঘুমাবার সময় পাওয়া যাচ্ছে না বললেই চলে। আর সেই জায়গায় যদি দুজন শক্ত সমর্থ লোক এভাবে বসে থাকে, তাহলে কারোই তাদের প্রতি সুদৃষ্টি নিক্ষেপ করার কথা না। প্রধান নাবিকও আস্তে আস্তে ওদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠছে।

রুদ্রদেব সবই বুঝতে পারছে। কিন্তু কিছুই করার নেই আপাতত, 'শোনো অসিত, আমাদেরকে মন অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। দেহে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে মনেও সমস্যা দেখা দেয়। মনকে ব্যস্ত রাখলেই দেহের কষ্ট মাঝে মাঝে লাঘব হয়।'

'এখন কী করে মন ব্যস্ত রাখবো? এখন কি আমরা অনুশীলন করবো?'

'আরে না। সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আসো, তোমাকে আজ একটা বিচিত্র জিনিস দেখাই। সময় মাপার একটা কৌশল বলতে পারো এটাকে।'

'আচ্ছা', কৌতূহলী হয়ে ওঠে অসিত।

রুদ্রদেব নিজের পোঁটলা থেকে একটা ছোটো মাটির পাত্র বের করলো। বাটি আকৃতির সেই পাত্র দেখেই বোঝা গেল বেশ যত্ন নিয়ে কুমোর বানিয়েছে সেটা। সাধারণ কাজের জিনিস হলে ভাগ্যে এতটা যত্ন জুটত না। নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো ব্যবহার আছে এই জিনিসের।

সমুদ্রে জলের কোনো অভাব নেই। দড়ি বাঁধা একটা ছোটো বালতি দিয়ে লোনা জল তুলে নিয়ে এলো রুদ্রদেব। তারপর আরেকটা বড়ো পাত্রে ঢেলে নিলো সেই জল। মাটির ছোটো বাটিটাকে বসিয়ে দিলো সেই জলের ওপর।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সেটা ভেসে রইলো। এবার কথা বলতে শুরু করলো রুদ্রদেব, 'দেখেছ, এই বাটিটা ভেসে আছে।'

'হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু তাই তো প্রকৃতির নিয়ম, তাই না। ওজনে হালকা জিনিস জলে ভেসেই থাকবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখানে একটা কৌশল আছে। এই যে ছোটো মাটির বাটি, এর নিচে খুব ছোটো একটা ফুটো করা আছে। এখন কী হবে বলো তো?'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে অসিত, 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। এখন এই ফুটো দিয়ে আস্তে আস্তে জল ঢুকবে এই বাটিতে। আর তখন বাটির ওজন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে।'

'হ্যাঁ, আর একসময় এই বাটি জলে ডুবে যাবে।' কথাটা শেষ করলো রুদ্রদেব। 'এই যে জলের ওপরে ছেড়ে দেওয়া থেকে জলে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত সময়,

এটা কিন্তু একেবারে সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। এই পাত্র এভাবেই বানানো হয়েছে। সবসময় ডোবার জন্য একই সময় নেবে এই বাটি। এভাবেই সময় মাপা যায়।'

অসিত এবার আগ্রহী হয়ে উঠেছে, 'এই বাটি ডুবতে কত সময় লাগবে?'

'এক মুহূর্ত। ঠিক এক মুহূর্ত পরেই ডুবে যাবে এই বাটি। তবে এই বাটি ব্যবহার করার সময় সাবধান হতে হবে। কোনমতে ঘষা খেয়ে অথবা বাড়ি খেয়ে যদি ক্ষয়ে যায় অথবা একটু ভেঙ্গে যায়, তবে আর সঠিক সময় দেবে না।'

'বুঝতে পেরেছি। তখন তো আর ওজন আগের মতো থাকবে না।'

অসিত মজার খেলা পেয়েছে। রুদ্রদেবও তাকিয়ে আছে বাটির দিকে। আস্তে আস্তে বাটিতে জল ঢুকছে। পূর্ণ ভাসমান থেকে অর্ধ নিমজ্জিত অবস্থার দিকে এগোচ্ছে এখন বাটি। বাটির অর্ধেকের মতো এখন জল দিয়ে পূর্ণ।

অসিত বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। আরেকটু সময় পেরিয়ে যেতেই রুদ্রদেব একবার তাকালো সূর্যের দিকে। সাথে সাথে তার মুখে একটু সন্দেহের ছাপ পড়লো। এখন বাটিটা জল থেকে তোলা যাবে না। আরও খানিক সময় নিয়ে তারপর বাটিটা ডুবে গেল। অসিত হেসে তাকালো, 'বাহ, এই সময় মাপার যন্ত্র তো বেশ মজার।'

'শুধু তাই নয়, বড়ো মজাটা হচ্ছে, কিছুক্ষণের জন্য তুমি এই বমি, দুলুনি আর মাথা ঘোরা থেকে নিজের মনকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছ। এজন্যই কাজে মনকে ব্যস্ত রাখতে হয়।'

অসিত স্বীকার করতে বাধ্য হলো, 'আসলেও তো, এতক্ষণ ভাবিনি, শরীর ঠিক ছিল, এখন আবার শরীরের দিকে নজর দিচ্ছি, আর আবার পেটে হালকা গোলমাল টের পাওয়া যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক। তবে একটা ঘটনা স্বাভাবিক ভাবে ঘটেনি।'

'অস্বাভাবিক আবার কী হলো?'

'এই বাটি।' এবার বাটিটা তুলে ধরলো রুদ্রদেব, 'নাহ, কোনো ঝামেলা তো চোখে পড়ছে না। কিন্তু, এটা তো এক মুহূর্তের মধ্যেই ডুবে যাবার কথা। আমি সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলাম। মনে হয়েছে কিছুটা সময় বেশি লেগেছে।'

অসিতও স্বীকার করলো, 'হ্যাঁ, আমারও মনে হয়েছে এক মুহূর্তের চেয়ে সময় কিছু বেশি লেগেছে।'

'এমনটা কেন হবে? বাটি ক্ষতিগ্রস্থ হলে তো সময় কম লাগার কথা। বেশি কেন লাগছে? নাহ, বোঝা যাচ্ছে না।'

'এমনটা হবার কারণ আছে।'

কথাটা রুদ্রদেব অথবা অসিত বলেনি। তাদের কাছাকাছি এসে দাঁড়ানো তৃতীয় ব্যক্তির দিকে তাকালো দুজনে।

এই লোকটাকে আগেও খেয়াল করেছে ওরা। শরীরের গঠন আর চেহারার অবস্থায় লোকটা যে বৃদ্ধ তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। পরনে নাবিকদের পোশাক নয়, অন্যরকম পরিধেয়। হাতে একটা পাকা লাঠি। লাঠি হাতে থাকলেও লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নেই বৃদ্ধ। তার মানে নিজের দুই পায়ের ওপর এখনো ভরসা রাখতে পারছেন তিনি। সবচেয়ে বিশেষ হচ্ছে লোকটার চোখ। বিশেষত্ব আছে। অধিকাংশ বৃদ্ধেরা জগত সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন বলে তাদের দৃষ্টি হয় উদাসীন, তবে এখানে এনার চোখ মারাত্মক উজ্জ্বল। লোকটার সাথে ভারতের কোনো অঞ্চলের লোকেরই কোনো মিল নেই, তার মানে বিদেশি। এই জাহাজের আরব নাবিকদের সাথেও তার তেমন মিল নেই। তার মানে সে আরবও নয়।

বৃদ্ধকে দেখে মনে মনে এসব হিসেবই কষে নিলো রুদ্রদেব। বৃদ্ধকে প্রথম থেকেই খেয়াল করছে সে। জাহাজে ওঠার পর থেকেই। উনিও কোনো কাজ করেন না। একমনে এক পাশে বসে থাকেন। মাঝে মাঝে প্রধান নাবিক কথা বলে তার সাথে। তারা দুজন কাজ করে না বলে প্রধান নাবিক যেমন বিষ বিষ নজরে তাদের দিকে তাকান, বৃদ্ধের বেলায় হিসেব ঠিক তার উল্টো।

'কী কারণ?' রুদ্রদেব জানতে চাইলো।

বৃদ্ধ উত্তর এড়িয়ে গেলেন, 'তোমরা দুজন এই প্রথম সমুদ্রে এলে, তাই না?'

'হ্যাঁ।' জবাব দিলো অসিত।

'এজন্যই হিসেব বুঝতে পারছো না। কেন এই বাতি কাজ করছে না, সেটা অভিজ্ঞ হলে এতক্ষণে বুঝে ফেলতে।'

'একটু বুঝিয়ে দিলে উপকার হয়।' বৃদ্ধের ভাবসাব ভালো লাগছে না রুদ্রদেবের। এমনিতে কারো সাথে জড়ানোর ইচ্ছে তার ষোলোআনা। সে যেখানে যাচ্ছে সেখানে সাথি দরকার হবে। তবে সাথি হিসেবে এই বৃদ্ধ যে একেবারেই বেমানান, তা না চিন্তা করেই বলে দেওয়া যায়। তবে পরক্ষণেই মনে মনে চিন্তা করলো। প্রধান নাবিক কেন এই অচল বুড়োকে এত খাতির করছে রহস্য কী?

'আচ্ছা, সে না হয় বুঝিয়ে দেব। আগে পরিচিত হয়ে নেয়া যাক।'

'আমার নাম রুদ্রদেব। ওর নাম অসিত। আমরা আর্যাবর্তের লোক। রাজ্য সাতবাহন।'

'সাতবাহন রাজ্যের নাম আমি আগেই শুনেছি। এবার তো কীর্তি একেবারে চোখে দেখে এলাম। বেশ ভালো। আমার নাম শেইরন। আমি গ্রীসে থাকি। গ্রীসের নাম শুনেছ?'

দুজনেই মাথা নাড়ে। শোনেনি।

'না শুনলেও ক্ষতি নেই। সমুদ্রে যখন বেরিয়ে পড়েছ, একসময় শুনবে। এখন শোনো, কেন তোমাদের এই যন্ত্র কাজ করছে না। এই যন্ত্রে কোনো সমস্যা নেই। বাটি একদম ঠিক আছে। সমস্যা জলে।'

'জলে! জলে আবার কী সমস্যা?' রুদ্রদেব ধরি ধরি করেও ধরতে পারছে না বিষয়টা। অসিত জানার জন্য কান খাড়া করে রেখেছে।

'শোনো, পৃথিবীতে দুই ধরনের জল আছে। মিঠা জল আর নোনা জল। এই দুই জলের বৈশিষ্ট্য এক নয়। লোনা জলে লবন মিশে থাকার কারণে সেটা সাধারণ জলের চেয়ে একটু ঘন হয়। এজন্য জলঘড়িতে সেই জল পূর্ণ হতে সময় বেশি লেগেছে।'

'আচ্ছা', এবার ঘটনা বুঝতে পারে রুদ্রদেব।

অসিতও বুঝতে পেরেছে, 'তার মানে আমরা যে জল খাই, সেই জল দিলে এই বাটি ঠিক এক মুহূর্ত পরেই ডুববে?'

'হ্যাঁ', বৃদ্ধের গলায় আত্মবিশ্বাস, 'পরীক্ষা করে দেখো। যাও, খাবার জল নিয়ে এসো।'

রুদ্রদেব বাঁধ সাধল, 'খাবার জল নষ্ট করতে দেখলে প্রধান নাবিক যদি খেপে যান?'

'আরে আমি আছি। যাও তুমি।'

এরপর আর কোনো কথা চলে না। খাবার জল এনে আবার পরীক্ষা শুরু হলো। রুদ্রদেব এবার জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি এদিকের ভাষা এত ভালো করে শিখলেন কী করে?'

'আমি অনেক আগে থেকেই ঘুরে বেড়াই বিভিন্ন জায়গায়। এই জায়গা থেকে ঐ জায়গা। এই বন্দর থেকে ঐ বন্দর। ভাষা এই জীবনে কম শিখিনি। আমাকে কষ্ট করে শিখতে হয়নি, আপনা থেকেই হয়েছে। আমার কথা থাক। আমার কাল শেষ। তোমাদের দেখে কৌতূহল অনুভব করছি। তোমাদের বেশ তো নাবিকের না। তোমাদের ভাব দেখেও তো মনে হচ্ছে না, সমুদ্রে ব্যবসা করা অথবা নাবিক হবার উদ্দেশ্য আছে। তাহলে সমুদ্রে ভাসার ইচ্ছে হলো কেন?'

'এমনিতেই।' রুদ্রদেব এবার সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো।

'না, মিথ্যে বলছ তুমি। তোমাদের দেহের মধ্যে যোদ্ধার ভাব আছে। আমার চোখ এখনো পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি। এই অভিজ্ঞ চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তোমাদের গল্পটা কী বলো তো। ভয় পেয়ো না। এই মাথায় এই জীবনে অনেকের অনেক গোপন কথা কবর দিয়েছি। তোমাদেরটাও করে দেবো।'

কিছুক্ষণ ভাবলো রুদ্রদেব। তারপরে ধীরে-সুস্থে খুলে বলল সব কথা। সবকিছু নীরবে মনোযোগ দিয়ে শুনে গেলেন শেইরন। তারপর মন্তব্য করলেন, 'আমিও সেই বানর দেখেছি। বারিগাজা বন্দরে। তোমরা তো প্রায় অসম্ভব একটা কাজে

হাত দিয়েছ। আমাকে সঙ্গে নিতে পারো। অনেক উপকার হবে আগেই বলে দিচ্ছি। আমি সব বন্দর চিনি, সব রাস্তা চিনি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা সব ভাষা জানি, সেগুলো তোমাদেরকে শিখিয়েও দিতে পারবো। ভাষা না জানলে তোমরা বোবা, কালাও বটে।'

রুদ্রদেব জিজ্ঞেস করে, 'আপনি আমাদের সাহায্য করবেন কেন? আপনার স্বার্থ কী?'

'স্বার্থ তো অবশ্যই আছে। অনেকদিন ধরে জীবনে কোনো আনন্দ পাচ্ছি না। সব কেমন যেন রসকষহীন হয়ে গেছে। জীবনের শেষ রোমাঞ্চকর যাত্রাটা তোমাদের সাথে করতে পারলে মন্দ হতো না।'

'আচ্ছা। আমাদেরকে একটু সময় দিন। ভেবে দেখি।'

বৃদ্ধ বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন, 'হ্যাঁ, ভাবো। আমাদেরকে পথে এখনো অনেকদিন এই জাহাজে থাকতে হবে। অতো তাড়াহুড়া নেই। শুধু একটা উপদেশ দিয়ে যাই। যখনই সমুদ্রের দুলুনিতে শরীর খারাপ লাগবে, তখনই জাহাজের পাশে জলের দিকে তাকাবে। জলের ওঠানামা আগে থেকেই দেখতে পাবে। বুঝতে পারবে জাহাজ কখন নিচে যাবে, কখন ওপরে যাবে। তখন আর শরীর খারাপ লাগবে না। আর এমনিতেও তিন-চার দিন পর এই সমস্যা থাকবে না।'

শেইরন ওদের কাছ থেকে উঠে আগের জায়গায় গিয়ে বসলেন। রুদ্রদেব এতক্ষণে তাকালো জলঘড়ির পাত্রের দিকে।

পাত্রটা এই মাত্র ডুবছে। আর এবার মুহূর্তের হিসেবে কোনো ধরনের গন্ডগোল হয়নি।

অ্যালেস্টর ফিরে এসেছেন গোপন সভা থেকে। মানুষ বৃদ্ধ হলে তার মধ্যে আশ্চর্য কিছু পরিবর্তন আসে। বেশির ভাগ সময়েই তার মধ্যে শিশু ভাব ভর করে। যেসব বৃদ্ধের মনে শিশুভাব প্রবল হয় তারা আদতে ভাগ্যবান। একটা সময় পর যখন তারা দেখতে পান, এতদিন যেসব কাজ তাদের ছাড়া চলতো না, যেসব সিদ্ধান্ত তাদের ছাড়া কেউ নেবার কথা ভাবতেও পারতো না, সেসব কিছু এখন তাদের কোনোরকম ইশারা ছাড়াই চলছে। পৃথিবীতে হঠাৎ ব্রাত্য হবার মতো কষ্ট অল্প কিছুতেই আছে। অন্তরের শিশুভাব সেই দ্বন্দ্ব থেকে মানুষকে শেষ বয়সে মুক্তি দেবার একটা চেষ্টা করে।

যে হিসেবে বৃদ্ধের কথা বলা হচ্ছে অ্যালেস্টরের বয়স এখনো সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি। তিনি মাঝ বয়স সবে পার করেছেন। এখনো তার মেরুদণ্ড একটুও বাঁকা হয়নি। অনেকদিনের সমর চর্চা আর কড়া নিয়মে বাঁধা শরীর এখনো অটুট আছে। এখনো তিনি যদি স্পার্টার রঙ্গভূমিতে মল্লে নামেন তাহলে যে-কোনো জোয়ানের হাওয়া ছুটিয়ে দিতে পারবেন। তবে এখন আর অভিজাত সম্প্রদায়ের সভায় তাকে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ডাকা হয় না। এক প্রজন্মের কাছ থেকে নগরের ক্ষমতা অন্য প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর হচ্ছে। এই সময়টা তার মতো প্রভাবশালী লোকের জন্য অনেক শক্ত। মানিয়ে নিতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়।

তবে মানিয়ে নেয়া অথবা মেনে নেয়ার মানুষদের দলে তাকে ফেলা যাবে না। যোদ্ধা হিসেবে খুব বড়ো কিছু করার সামর্থ্য তার ছিল, কিন্তু সেই সুযোগ এই পরাধীন নগর তাকে কখনোই দেয়নি। তবে জীবনকে এভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে দেবেন না তিনি। যে দুর্বল, যার কিছু করার সামর্থ্য নেই, সে একটা সাধারণ জীবন যাপন করতেই পারে, কিন্তু সামর্থ্যবান ব্যক্তি যদি কিছু না করেই জীবনের অন্ত করে ফেলে তাহলে সেটাই পরম ব্যর্থতা। তিনি করবেন, এবং এই স্পার্টার ইতিহাস যেন তাকে মনে রাখে সেই ব্যবস্থাই করে যাবেন।

আজকে সভায় সবার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। অনেক আলোচনা হয়েছে। এবার সময় হয়েছে কিছু করে দেখানোর। কিন্তু তার সহযাত্রীরা এখনো অবুঝ। তারা এখনো ভরসা করে আছে দেবতার ওপর। একজন দেবতা আসবেন, তার পূজায় তাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তিনি তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা আর সেনা নিয়ে যুদ্ধ করবেন তাদের পাশে। এরকম অলীক চিন্তা যারা করে তাদের দিয়ে বিপ্লব হয় না। এখন আর দেবতাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। অলিম্পাস অনেক আগেই পরিত্যক্ত হয়ে গেছে।

নিজের প্রাসাদের সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন তিনি। দুপাশে দুজন প্রহরী একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপও করলেন না তিনি। নিজের চিন্তায় ডুবে আছেন।

গোপনে এরিসের পূজা দেবার জন্য পুরোহিত ঠিক করা হয়েছে। সামনে ভালো সময়ের তিথিও ঠিক হয়ে গেছে এর মধ্যে। এখন কেবল কিছু জিনিসপত্র জোগাড় করতে হবে, এবং সেসব করতে হবে অতি গোপনে।

বাড়ির উঠানে এখন দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। বাগানে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। মৃদু বাতাস অথবা ফুলের সুঘ্রাণ কিছুই তার চিন্তা দূর করতে পারলো না। কেন সবাই তার মতো করে ভাবতে পারছে না? কেন সবাই তার মতো করে সাহসী হতে পারছে না? কেন ঐ রোমানদের পা চাটা গভর্নরকে সরিয়ে স্পার্টার রাজ প্রাসাদ নিজেদের করতলে আনার কথা চিন্তা করতে পারছে না তার সাথিরা?

আরও নানা চিন্তা হয়তো চলতো। নতুন করে চিন্তা আরও হতাশা হয়তো ডেকে আনতো। কিন্তু বাঁধ সাধলো ডোরা। সে বাগানে ফুল তুলতে এসেছিল। নিজে দাসী হলেও এই বাড়িতে ইনোন তাকে নিজের বোনের মতোই দেখে, আর অ্যালেস্টর দেখেন নিজের মেয়ের মতো। ডোরা অ্যালেস্টরের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো, 'এখানে কী করছেন আপনি? আপনি তো আজ সেই সকালে বেরিয়েছেন। দুপুরেও কিছু খাননি। আমরা আপনার জন্য বসেছিলাম। ইনোন তো এখনো খায়নি।'

এতসব চিন্তার মাঝে মেয়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। ইনোনের নামটা কানে যেতেই তার মন যেন একটু শান্ত হলো। প্রশান্তির শীতল বাতাস এতক্ষণে তিনি অনুভব করতে পারলেন, দেহেও, মনেও।

'ইনোনকে আবার আমার জন্য বসে থাকতে কে বলেছে? আমি তো বাইরে থেকেও খেয়ে আসতে পারি।'

'কিন্তু সেরকম নিমন্ত্রণ থাকলে তো আপনি বলে যেতেন।'

অকাট্য যুক্তি। অ্যালেস্টর হাসলেন, কেন যেন এই মেয়ের সাথে সাধারণ দাসীর মতো আচরন করতে পারেন না তিনি, 'আচ্ছা চল, আর তুই শুধু ইনোনের কথা বলছিস কেন? আমার তো মনে হচ্ছে তুইও দুপুরে খাসনি।'

নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করবে ডোরা তেমন মেয়েই নয়, 'আমি খাইনি তা ঠিক।'

'আচ্ছা চল। আগে খাবার ঘরে যাই। ফুল পরে নিস।'

ডোরা প্রথমে গিয়ে ইনোনকে ডেকে আনলো। ইনোনের সুশ্রী চেহারায় একটা অন্ধকারের ছাপ। শুভ্র কাপড়ে একটু দাগও অনেক বড়ো হয়ে চোখে লাগে, 'কি

মা, তোর চেহারা এমন কেন? তোকে না বলেছি খাবারে কখনো অনিয়ম করবি না।'

ডোরা ফুট কাটে, 'শুধু তো খাবারের জন্য না, আরও কারণ আছে।'

'আরও কারণ?'

'হ্যাঁ, ওনার এখন ঘুমেরও সমস্যা হচ্ছে।'

ইনোন ডোরার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকাল। অবশ্যই বাবার অলক্ষ্যে।

'ঘুমের সমস্যা হচ্ছে মানে?' অ্যালেস্টরের গলায় চিন্তা, 'এটা তো ভালো কথা নয়। তেমন হলে বৈদ্যকে একবার দেখাতে হবে।'

'না বাবা, ওর কথা তুমি আবার গুরুত্ব দিচ্ছ। জানো না, সারাক্ষণ উল্টোপাল্টা বকে ও। বলেছিলাম আমাদের প্রাসাদের জন্য একটা ভালো দাসী নাও। তুমি তো আমার কথা শুনলেই না, এই বাচালকেই রেখে দিলে।'

'তাই! আমার দোষ এখন। ছোটোবেলায় কে আমাকে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, ডোরাকে আমাদের বাড়িতে এনে রাখো বাবা। চিরদিনের মতো।'

ডোরা হেসে উঠলো। ইনোনের মুখেও হাসি।

ডোরা অভ্যস্ত হাতে টেবিল তৈরি করে ফেললো। খাবার এর মধ্যেই পরিচারিকা গরম করে নিয়ে এসেছে। খেতে বসলো ওরা।

খেতে বসে পুরোপুরি সহজ হয়ে গেলেন অ্যালেস্টর। স্পার্টা, স্বাধীনতা, গভর্নর, বিদ্রোহ, এরিস, পূজা সবকিছু যেন ক্ষণিকের জন্য তার মনের সাগরে ডুব দিয়েছে। ক্ষিধে ভালোই পেয়েছে।

ইনোনের মুখের দিকে তাকালে তার দুশ্চিন্তা কেটে যায়। খেতে খেতে মেয়ের দিকে তাকান তিনি। কি সরল চাহনি। পৃথিবীর জটিলতা ঐ চেহারা স্পর্শ করেনি, তিনি চান কখনো স্পর্শ না করুক।

ইনোনের চেহারা দেখতে দেখতে আচমকা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন তিনি। তার এই একটাই মেয়ে। আজকেই মেয়ের সাথে কথা বলবেন তিনি। এই মেয়েই তার সমস্ত সম্পদ আর দাসদের মালিক। হঠাৎ মেয়েরা এসব কথা শুনলে একটু ঘাবড়ে যায় স্বাভাবিকভাবেই। তাই আগে থেকেই মেয়েকে প্রস্তুত করে রাখবেন তিনি।

খাওয়া শেষ হলো। টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অ্যালেস্টর, 'ইনোন, মা আমার ঘরে একটু এসো তো। ডোরা, তুমি এবার ফুল তুলে নিয়ে এসো।'

কথাটার মানে দুজনেই বুঝতে পারলো। ইনোনকে একা ডেকেছেন তিনি। ইনোন আর ডোরা দুজনের বুকই ধরাস করে উঠলো। তিনি কি কিছু বুঝতে পেরেছেন? তাহলে মহা সর্বনাশ।

ডোরা তাড়াতাড়ি ফুলের সাজি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। ইনোন ধীর পায়ে প্রবেশ করলো বাবার ঘরে। দেওয়ার মতো কোনো অজুহাতই নেই। উনি জিজ্ঞেস করলে কী বলবে সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছে সে। তার বাবার চোখ ফাঁকি

দেওয়া অনেক কঠিন। স্পার্টায় বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ লোক হিসেবে তার বাবার সুনাম আছে।

অ্যালেস্টর নিজের কামরায় ঢুকে আসনে পান পাত্র হাতে নিয়ে বসে পড়েছেন। নিজের মনে কথাগুলো সাজিয়ে নিচ্ছেন তিনি। মেয়েকে কোনোদিন এসব নিয়ে কিছু বলেননি তিনি। এই পরিস্থিতি তার জন্যও নতুন।

ইনোন কিছু বলছে না। ভেতরে ভেতরে আশঙ্কা। বেশিক্ষণ চুপ থাকা গেল না, 'কিছু বলবে বাবা?'

'হ্যাঁ। না হলে তোমায় ডাকলাম কেন? এতদিন শুধু তোমার জন্মদিন পালন করে গেছি , কিন্তু একটা একটা করে তোমার কত জন্মদিন পেরিয়ে গেছে সেদিকে খেয়ালই রাখিনি। আজ আমার মনে হচ্ছে তুমি বড়ো হয়ে গেছো। এখন আর আমার সেই ছোটো মেয়েটি নেই।'

ইনোনের ভয় এবার আরও বৃদ্ধি পেলো। হঠাৎ তার বড়ো হওয়া নিয়ে তার বাবা এতো চিন্তিত হলেন কেন? নিশ্চয়ই সে যে অপকর্ম করেছে তা যৌবনের দোষেই মানুষ করে, আর তার বাবা সেদিকেই ইঙ্গিত করছেন।

'আমি এই নগরের একজন অভিজাত। নগরে আমার সম্মান কারো থেকে কম না। ক্ষমতাও আছে। কিন্তু বাবা যতই ক্ষমতাবান হন না কেন, এই জায়গায় এসে সব বাবারা এক জায়গায় মিলে যায়। কন্যাদায় যে কোনো পিতার ঘাড়েই পাহাড়সম বোঝা। আমি এই বোঝা নামিয়ে রাখতে চাই মা। তুমি এই স্পার্টার যে-কোনো মেয়ের চেয়ে সুন্দরী। তোমার জন্য আমি যোগ্য পাত্র বাছাই করবো। এই বছরের মধ্যেই তোমার বিয়ে দেবো আমি।'

অ্যালেস্টর এবার উঠে এলেন। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলেন কপালে, 'তোমার মা বেঁচে থাকলে এত দেরি হতো না। আগেই আমাকে এই পথ দেখিয়ে দিতেন।' হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো মেয়ের মুখের দিকে। ইনোনের চেহারা একটু পাণ্ডুর হয়ে গেছে, 'কী হলো মা! বিয়ের কথা শুনে তুমি খুশি হওনি? মুখটা শুকনো হয়ে গেল কেন?'

'না বাবা, ও কিছু না।' ইনোন বুঝতে পেরেছে তার রাতের গোপন অভিসার সম্পর্কে তার বাবা কিছুই জানতে পারেননি। কিন্তু তিনি তার বদলে যে কথা বললেন তাও কোনো অংশে কম ভাবনার না। তার পরিকল্পনা মাঠে মারা যাচ্ছে। ইভানের আসল পরিচয় পাবার পর থেকেই সে এই পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিল। এখন কেবল একটু অপেক্ষার পালা। কিন্তু তার বাবা সেই অপেক্ষা করতে দিলেন না তাকে। তার জন্য কাকে খুঁজে আনবেন কে জানে। বাবার পছন্দ করা পাত্রের বিরুদ্ধে সে তো কিছু বলতেও পারবে না।

'জানি মা, বাবা মেয়েকে বিয়ের কথা সরাসরি বলে না। স্পার্টার অন্য বাবারা হয়তো তাই করে। একজন পাত্র ঠিক করে দিনক্ষণ দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়ে

দেয়। কিন্তু আমি তা করতে পারি না। তোমার তো প্রস্তুত হবার জন্য একটা সময়ের প্রয়োজন আছে।'

ইনোন এবারেও কিছু বলে না। ইভান এখনো অভিজাত হয়নি। আর অভিজাত হবার আগ পর্যন্ত সে একজন সাধারণ যুবক। তার কথা বাবার কাছে কিছুতেই বলা যাবে না।

'আমি জানি তোমার মাথায় কি চলছে মা। বাবা আবার কাকে ঠিক করে আনবে। তুমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো। কদিন পরেই এই মৌসুমের সেনা অভিজাত নির্বাচনের কাজ শুরু হবে। স্পার্টার অভিজাত মহল সেই অভিজাতদের নির্বাচন করবে। সেই সেনা অভিজাতদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠের সাথেই আমি তোমার বিয়ে দেবো। তুমি আমার মেয়ে হয়ে যে প্রভাব নিয়ে সমাজে চলতে, ঐ অভিজাতের স্ত্রী হয়েও সেই প্রভাব নিয়েই চলবে। আমি তোমাকে ছেড়ে এই প্রাসাদে একা থাকতে পারবো না। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে আর তোমার স্বামীকে দিয়ে দেবো। তোমরা আমার এই প্রাসাদেই বাস করবে।'

ইনোন এবার মুখ তুলল। তার মুখে একটু রক্ত যেন ফিরে এসেছে, ' আমি জানি বাবা, আপনি আমার জন্য সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্তই নেবেন। তবু, সবকিছু একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? বিয়ের জন্য আমাকে অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে তো।'

'হ্যাঁ জানি। তোমার পোশাক, তোমার সব সখীদের পোশাক, নানা খাবারদাবার, অথিতি, বাড়ি সাজানো- সেসব নিয়ে চিন্তা কোরো না। সেসব হয়ে যাবে। তুমি শুধু তোমার মনের দিক থেকে প্রস্তুতি নাও।'

'আচ্ছা বাবা।'

'বাবা হিসেবে তোমার সমস্ত দেখাশোনাই আমি করার চেষ্টা করি। সময় মাঝে মাঝে পাই না। তবু একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করা দরকার। আচ্ছা, তোমার পছন্দের কেউ কি আছে? এই নগরে এমন কোনো যুবক কি আছে?'

নিজের আরক্ত গাল নিচের দিকে নামিয়ে নিলো ইনোন, না-সূচক মাথা নাড়লো।

'তাহলে অন্য কিছু নিয়ে তুমি আর চিন্তা কোরো না। তোমার বিয়ে এমন ধুমধাম করে দেবো, সবার তাক লেগে যাবে। স্পার্টার সব হেলটদের পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করা হবে। সব অভিজাতরা আসবে। সাতদিন ধরে চলবে ভোজ সভা। এমন অনুষ্ঠান হবে যা দেখে দেবতাদেরও তাক লেগে যেতো।'

ইনোন বাবার উচ্ছ্বাস দেখে একটু হাসলো, 'আচ্ছা বাবা, এখন তুমি বিশ্রাম করো। আমি আসছি।'

ইনোন বেরিয়ে যায়। বাবা আর মেয়ের মনে চলছে নিজেদের মতো করে চিন্তা। নিজের শয্যায় শুয়ে পড়লেন অ্যালেস্টর। নিজেকে তিনি বোঝাচ্ছেন। এটা

তিনি মেয়ের ভালোর জন্যই করেছেন। কিন্তু সেটা তো আসলে ঠিক নয়। তিনি করছেন সেই বড়ো কাজে নামার আগে নিজেকে চিন্তামুক্ত রাখার জন্য। যাতে তার কাজ ব্যর্থ না হয়ে যায়। পিছুটান নিয়ে যুদ্ধে যাওয়া যায় না। তিনি তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধে নামতে যাচ্ছেন। এখন মেয়েকে নিজের দায়িত্বে রাখা যাবে না। না, তিনি ভুল করেননি। ঠিকই আছে। শয্যায় চোখ বুজে ফেললেন তিনি। ঘুম আসবে না জানেন। তবু একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে অসুবিধা নেই।

ওদিকে ইনোন ফিরে এসেছে নিজের ঘরে। সেখানেই আছে ডোরা। ইনোন ওকে দেখে অবাক হলো না। ডোরাও এই কাজে তার সাথে ছিল। তার মনেও ভয় আছে।

'কী জিজ্ঞেস করলেন উনি? ধরে ফেলেছেন আমাদের, তাই না? আগেই বলেছিলাম এসব বাড়াবাড়ি করবেন না। এখন হলো তো। ফলে গেল তো আমার কথা।' ডোরার গলায় স্পষ্ট ভয়।

'আরে, এত অস্থির হবার মতো কিছু হয়নি।'

'হ্যাঁ, তা তো বলবেনই। আপনার আর কী? আপনার তো বাবা। ধরা পড়লে আপনাকে একটু বকাঝকা করে ছেড়ে দেবেন। আমার কী হবে ভেবে দেখেছেন? প্রাণ যদিও বা না নেন, তবু আমাকে নিশ্চিতভাবেই এই বাড়িতে থাকতে দেবেন না। আমি এই বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাবো? আমার কে আছে?'

'আচ্ছা। ঠিক আছে। তুই তো আর ডেলফির পুরোহিত না। এত ভবিষ্যৎ বাণী করা বন্ধ কর। বাবা কিছুই ধরতে পারেননি।'

'আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আবার মিথ্যে বলছেন না তো? ধরতে না পারলে আপনাকে হঠাৎ করে এভাবে ডেকে নিয়ে গেলেন কেন?'

'যে জন্য নিয়ে গেছেন সেটাও কম ভাবনার কথা না। বাবা আমার বিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আমার জন্য পাত্র খোঁজা শুরু করবেন।'

এবার ডোরা নিশ্চিন্ত হলো আবার একই সাথে চিন্তিতও হলো, 'আপনি বাবাকে ইভানের কথা বলেননি?'

'তুই তো দেখছি আসলেই পাগল হয়েছিস। বাবাকে বললে বাবা রেগেমেগে একটা কাণ্ড করবেন। সবদিক সামলে চলতে হবে আমাদের। বাবা বলেছেন অভিজাত সেনাদের যখন বাছাই করা হবে, সেখান থেকেই আমার জন্য পাত্র পছন্দ করবেন। সম্ভাবনা তো আছে ইভানেরও। বাবা তো তাকেও পছন্দ করতে পারেন। আর ইভানকে যদি তখন পছন্দ নাও করেন তখন আমি বাবাকে ইভানের কথা বলতে পারবো। ইভান ততদিনে অভিজাত হয়ে যাবে। তিনি আর আমাকে না করতে পারবেন না। বুঝতে পেরেছিস?'

এবার ইনোনের পরিকল্পনা একটু মাথায় ঢুকেছে ডোরার, 'না, আপনি ভালোই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন বললে নানা প্রশ্ন উঠতো। আমরা ওদেরকে কোথায়

দেখেছি। গোপন সেনাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ হলো কী করে? না বলে ভালোই করেছেন।'

'হ্যাঁ, আচ্ছা সেসব বাদ দে। তোকে যে একটা ভালো বুদ্ধি দিয়েছিলাম তার কী করলি?'

'বুদ্ধি? কোন বুদ্ধির কথা বলছেন?'

'ইভানের সাথে যে ছেলেটা এসেছিল, নাম ওরিয়ন। তুই ওর সাথে একটা সম্পর্ক করে ফেল। ওর সাথে বিয়ে হলে তোকে আর দাসী হয়ে থাকতে হবে না। অভিজাতের বৌ হতে পারবি। কথাটা কিন্তু আমি মজা করে বলছি না। সত্যি সত্যি। আমাকে ইভান বলেছে, এই মৌসুমে ওরা দুজনেই অভিজাত হবে।'

'ঐ ছন্নছাড়ার কথা আমাকে আর বলবেন না। অভদ্র একটা।'

'কী অভদ্রতা করেছে তোর সাথে? আচ্ছা, দাঁড়া দাঁড়া, আমি যখন ইভানের সাথে কথা বলছিলাম তখন কি তোর সাথে উল্টোপাল্টা কিছু করেছে?'

হেসে উঠলো ডোরা, 'না, তা করেনি। তাহলে ওর আর অভিজাত হওয়া হতো না। চোখ গেলে দিতাম। অভিজাত হিসেবে কানা লোক মানায় না।'

দুজনেই হেসে ওঠে। ডোরা সাবধান করে দেয় ইনোনকে, 'তবে, আমার মনে হয় আপনার আরও সাবধান হতে হবে। উনি যে-কোনো সময় টের পেয়ে যেতে পারেন।'

ইনোন ডোরার নিয়ে আসা ফুলগুলো থেকে একটা ফুল হাতে তুলে নিলো, 'প্রেমে পড়া আর সাবধান হওয়া দুটো একসাথে হয় না। সাবধান মানুষ কখনও প্রেমে পড়ে না।'

সন্ধ্যে ঘনাবে ঘনাবে করছে। জঙ্গলের ভেতর অন্ধকার একটু আগে নামে। পা
ফিরে আসতে শুরু করেছে। এটাই নিয়ম। একটু আগে স্পার্টার গোপন সেনার,
ক্রিপ্টেয়ারও নিজেদের নিয়ম অনুযায়ী অনুশীলনের কাজ শেষ করেছে। এ
তাদেরও নিয়ম মেনে নিজের নিজের তাবুর দিকে যাবার কথা। কেউ হয়তো এ
বিশ্রাম নেবে, আবার কেউ চলে যাবে নিকট ঝর্ণায় শরীরের ক্লান্তি ধুয়ে ফেল
জন্য। কিন্তু পশু আর মানুষে তো এই একটাই অমিল। মানুষের নিয়ম যে ক
ভেঙ্গে পড়বে তা সে নিজেও জানে না।

অনুশীলন শেষ হলেও ক্রিপ্টেয়ারের সৈন্যদের সবচেয়ে বয়স্ক দলকে যা
অনুমতি দেওয়া হলো না। তারা আদেশ পালন করে সারি বেঁধে দাঁড়ালো।
প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রধান প্রশিক্ষক এখন তাদের সাথে কথা বলবেন।

সবাই নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সারাদিনের ক্লান্তি তাদের মনে এ
চেহারায় কোনো ধরনের ছাপ ফেলতে পারেনি। প্রত্যেক মুখ পাথরের ম
অটল। এরা যে কঠোর থেকে কঠোরতম প্রশিক্ষণ লাভ করেছে তাতে সং
নেই। দলটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে মুগ্ধ হলেন প্রধান প্রশিক্ষক।

একটু পরেই নিজের মুগ্ধতা কাটিয়ে উঠলেন তিনি। আজকে এদেরকে সা
আর কৌশলের শেষ পরীক্ষা দিতে হবে। পুরো দলের দিকে তাকিয়ে তিনি ব
উঠলেন, 'সাহস।'

সমস্বরে উত্তর এলো, 'সিংহের।'

'কৌশল।'

এবারো সমস্বরে জবাব এলো, 'শেয়ালের।'

'যুদ্ধে।'

শেষ প্রশ্নের উত্তরও সবার গলা থেকে একই সাথে বেরোলো, 'নেকড়ে।'

একবার মাথা নাড়িয়ে শুরু করলেন প্রধান প্রশিক্ষক, 'তোমরা তো স
জানো, এই শিবির থেকে তোমাদের বের হবার সময় চলে এসেছে। আজ
তোমাদের শেষ পরীক্ষা দিতে হবে। এই পরীক্ষা আমরা আচমকা ঠিক ক
সবসময়। এবারো তাই করা হয়েছে। তবে কাজটা কী তা শোনার আগে জে
নাও, এই কাজ তোমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজের পরে যারা স
হবে তারা এই শিবির থেকে বেরিয়ে যাবে, আর যারা ব্যর্থ হবে তারাও বে
যাবে। পার্থক্য হবে, যারা সফল হয়ে বেরোবে তারা হবে স্পার্টার মহান যে
অভিজাত, আর যারা ব্যর্থ হবে, তারা হবে তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক। আমরা

রাজ্যের সেরা সেনাদের তৈরি করি। এখানে ব্যর্থ হবার কোনো সুযোগ নেই। বুঝতে পেরেছ?'

সমস্বরে জবাব এলো, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। এবার তাহলে শোনো কী করতে হবে। একবারই বলবো আমি। কানের পোকাও যেন তোমাদের না নড়ে।

তোমাদের মধ্যকার সাহসী আর কুশলী যোদ্ধার বৈশিষ্ট্য জন্ম দেবার জন্য আমরা আগেও এমন কাজ তোমাদের দিয়ে করিয়েছি। তোমরা এই নগরের প্রান্তে যেসব কৃষক হেলট বাস করে তাদের ঘরে ঢুকেছিলে, তাদেরকে হত্যা করেছ, মাঝে মাঝে প্রশিক্ষণের জন্য তাদের গৃহে ডাকাতি করেছ। এবারের কাজটাও তেমনই।

তোমাদেরকে এবার একা কাজ করতে হবে না। কাজটা একজনের জন্য দুরূহ। দুজন করে প্রতি দলে ভাগ হয়ে যাবে। তার আগেও তোমরা ভাগ হয়ে নানা কাজ করেছ। এবারো আশা করি ভাগ হতে কোনো সমস্যা হবে না।'

পুরো দল কোনো শব্দ করছে না। একটা সুই এখানে পড়লেও কানে ঠন করে বেজে উঠবে। কাজটা এখনো বলা হয়নি। সবাই সেটা শোনার জন্যই অপেক্ষা করছে।

'শোনো। তোমাদের প্রতি দলকে একেকটা কৃষক হেলটদের যে-কোনো ঘরে প্রবেশ করতে হবে। এমন ঘর যেখানে পরিবার আছে। সেই সম্পূর্ণ হেলট পরিবারকে মেরে তারপর তাদের লাশ, হত্যার সমস্ত চিহ্ন সরিয়ে ফেলতে হবে। তোমাদেরকে কেউ যাতে না দেখে, কেউ যাতে কোনো কিছু সন্দেহ না করে। অন্য হেলটরা যদি টের পেয়ে যায় তবে তোমরা অকৃতকার্য হবে। সকালে উঠে সবাই যেন মনে করে তেরোটা হেলট পরিবার যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। তাদের ঘরে কোনো রক্তের চিহ্ন থাকবে না, কোনো ধস্তাধস্তির চিহ্নও থাকবে না। বুঝেছ?'

'জি', সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো সেনারা।

'কাজটা সহজ মনে হলেও তেমন সহজ না। হত্যা করা তোমাদের জন্য কোনো কঠিন কিছু না, কিন্তু ঐ ঘনবসতির মধ্যে দাসেদের কাউকে না জাগিয়ে একটা পরিবারকে হত্যা করা আর সেই লাশগুলো গুম করে ফেলাই সবচেয়ে বড়ো ঝুঁকি। আমার কথা শেষ। এখন তোমরা যার যার শিবিরে যাও। দল ঠিক করো। আজ রাতেই কাজ সেরে ফেলতে হবে। আর একটা কথা তো জানাই আছে, হেলটদের রক্তমাখা কাপড় নিয়ে আসতে হবে প্রমাণ হিসেবে।'

প্রধান প্রশিক্ষকের কথা শেষ হয়েছে। তিনি আর কিছু না বলে নিজের শিবিরের দিকে যাত্রা করলেন। সেনারাও যার যার তাবুর দিকে গেল।

ইভান আর ওরিয়ন এসেছে নিজেদের তাবুতে। তাদের দল গড়ে তোলায় কোনো ঝামেলা নেই। তারা প্রথম থেকে এমন দল করা হলে এক দলেই থাকে। আজকের কাজেও তাদের দুজনকে একসাথেই কাজ করতে হবে।

ওরিয়ন মন্তব্য করলো, 'কাজটার সবচেয়ে কঠিন জায়গাটা বুঝতে পেরেছ?'

'তা একটু পেরেছি। রাতের বেলা ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত হেলট হত্যা করা তেমন কঠিন কিছু না। তবে সেই লাশগুলো গুম করতে হলে বয়ে নিতে হবে, আর সেই সাথে সমস্ত রক্তের দাগও এমন ভাবে মুছে ফেলতে হবে যাতে কিছুই হয়নি। সম্পূর্ণ কাজটা করতে হবে কারো চোখে না পড়ে। এই অংশটাই সবচেয়ে কঠিন। তবে সমস্যা নেই। দুজন করে দিয়েছে এক দলে। একজন পাহারা দেবার কাজ করবে, আরেকজন কাজ সারবে। তেমন সমস্যা হবে না।'

'তো এখন কী করবো আমরা?'

'এখন আবার কী করবো? আগের থেকে কিছুই চিন্তা করে এখানে লাভ নেই। কাজের সময় কাজ করে ফেলবো। রাত আরেকটু গভীর হলে শিবির থেকে বেরিয়ে পড়বো। এখন চল একটু বিশ্রাম নিয়ে নিই। আজ রাতে মনে হচ্ছে ঘুম কপালে নেই।'

ওরিয়ন শুয়ে পড়লো নিজের বিছানায়, 'ভাবতেই ভালো লাগছে, এই কাজের পরে আমরা নগরে ফিরে যাবো সম্মান নিয়ে। আমাদের আর প্রতিদিন নিয়ম করে এই ক্লান্তিকর আর বিরক্তিকর কাজগুলো করতে হবে না। তোমার তো মেয়েও ঠিক হয়ে গেছে, ইচ্ছে করলে বিয়েও করে ফেলতে পারবে।'

'হ্যাঁ। মেয়ে তো ইচ্ছে করলে তুমিও ঠিক করে ফেলতে পারো।'

'আমি আবার কাকে ঠিক করবো?'

'কেন? ডোরার সাথে তো দেখলাম ঐদিন ভালোই গল্পগুজব করলে। মেয়েটা তো দেখতে শুনতে খারাপ নয়। বিয়ে করে ফেলতে পারো।'

ওরিয়ন ফোঁস করে উঠলো, 'আর মেয়ে পেলে না। ঐ মেয়েকে বিয়ে করলে আমাকে প্রতিদিন এই শিবিরের কথা স্মরণ করতে হবে। ভাবতে হবে, আমার জীবন ছিল সেই প্রশিক্ষণ শিবিরে। আমি এই জীবনে আর এই শিবিরের কথা মনে করতে চাই না।'

হেসে উঠলো ইভান। আশেপাশের শিবিরে খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে। ওরা নিশ্চয়ই অস্ত্র আর সাজ ঠিক করে নিচ্ছে। ওদেরকেও তাই করতে হবে।

রাতের কাজ। কালো পোশাকে সারা শরীর আবৃত করে ফেললো ইভান আর ওরিয়ন। এখন ওদেরকে অন্ধকারে কোনোভাবেই চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। শরীরের নানা খাপে নানা রকমের অস্ত্র নিয়ে নিলো দুজনে। এখন তারা পুরোদস্তুর যোদ্ধা। আজ রাতের কাজের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি।

রাত আরেকটু গভীর হতেই বেরিয়ে পড়লো দুজনে। ওরা দুজন এখন স্বতন্ত্র দল। অন্য প্রতিযোগীদেরও এখন সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। ভাগ্যচক্রে দুটো দল যদি এক জায়গায় চলে যায় তবে তাদের মধ্যে লড়াইও হতে পারে। ক্রিস্টেয়ারের সেনারা সবচেয়ে বেশি পটু হয় যে ব্যাপারে তা হচ্ছে নিষ্ঠুরতা।

দুটো করে কালো ছায়া বেরিয়ে যাচ্ছে শিবির ছেড়ে। নানা পথে গা ঢাকা দিয়ে তারা চলেছে নগর ঘিরে থাকা উপকন্ঠের কৃষক হেলটদের বস্তিগুলোর দিকে। সেখানে থাকে এই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীবেরা। তারা জন্তুর চেয়েও অধম। ঈশ্বর তাদের বানিয়েছেন উচ্চ জাতের সেবা করার জন্য। তারা আজ রাতে সেনাদের যোগ্যতা পরিমাপের একটা মাধ্যম মাত্র।

গাছের নিচের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এগোচ্ছে ইভান আর ওরিয়ন। দুজনে শুধু ইশারা আর চাপা স্বরে একজন আরেকজনের সাথে যোগাযোগ রাখছে। নগরের কোন প্রান্তে যাবে সেটা আগেই ঠিক করা ছিল। সেই জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলো দুজনে অল্প সময়ের মধ্যে। মিশে রইলো একটা গাছের অন্ধকার আড়ালে।

ওরিয়নের স্বর বেশ সতর্ক, 'আগে আমাদের একটা ঘর বেছে নিতে হবে। তারপর প্রবেশ করবো। এইদিকে এসে মনে হয় ভালো করিনি। সবগুলো ঘর একটা আরেকটার সাথে লেগে আছে। কোন ধরনের আওয়াজ না করে ঢোকা প্রায় অসম্ভব।'

'অসম্ভব বলছো কোন আক্কেলে? সেদিন আমরা এক অভিজাতের বাড়ি ঢুকে গেছি। এখন একটা হেলটের ঘরে ঢুকতে পারবো না?'

'পারবো তো বটেই। কিন্তু কোনো রকমের শব্দ করা যাবে না, এটাই সমস্যা।'

'দেখা যাক, কী করা যায়। এসো আমার সঙ্গে।'

দুজনে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল বস্তির দিকে। হেলটদের বাড়িতে কোনোভাবেই শক্তপোক্ত ভাবে বানানো হয় না। যে দরজা লাগিয়েছে তা একটা আঘাত করলেই ভেঙ্গে যাবে। তবে ঐ যে, শব্দ করা যাবে না। এখানে বলের নয় বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে।

নিঃশব্দে ঘরে ঢোকার একটা উপায়ই আছে। কোমর থেকে চওড়া পুরু ফলার ছুরি বের করলো ইভান, 'এই ছুরিটা বের করো।'

ছুরি বের করলো ওরিয়ন। জিজ্ঞেস করলো, 'ছুরি দিয়ে কী হবে?' পরক্ষণেই ইভানের মতলব বুঝতে পেরেছে সে, 'বাহ, এই সহজ বুদ্ধি তো আমার মাথায় আসেনি। এজন্যই নগরের এই দিকটা বেছে নিয়েছ তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ, নগরের এদিকের মাটি সবচেয়ে নরম। আমরা সিঁদ কেটেই ঘরে ঢুকবো। দরজা দরজার জায়গাতেই থাকবে।'

নরম মাটিতে দুজনের হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকার মতো জায়গা করতে শক্তিশালী ছুরির বেশিক্ষণ লাগলো না। দুজনেই এমন কাজ প্রশিক্ষণে করেছে অনেক বার। জায়গা হয়ে যেতেই দুজনে বেড়ার নিচ দিয়ে ঢুকে পড়লো ঘরে।

একটা ঝুঁকি অবশ্য থেকেই যায়। তাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হেলট পরিবার হত্যা করার জন্য। যদি ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখা যায় এখানে কোনো পরিবার নেই, কেবল একজন হেলট তাহলে আবার পরিশ্রম করতে হবে।

ঘরের ভেতরে কালিগোলা অন্ধকার। বাইরে নক্ষত্রের আলো ওদের চোখে সয়ে এসে যা একটু পথঘাট দেখাচ্ছিল, ভেতরে তা অনুপস্থিত। মশাল না জ্বেলে উপায় নেই, কিন্তু তাতে ভেতরের লোকজনের জেগে যাবার সম্ভাবনা আছে। ভেতরে লোক আছে নিশ্চিত। তাদের ছন্দময় ঘুমন্ত নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

নীরবে মশাল জ্বালানোর কৌশল আছে। চকমকি ঘষে আগুন জ্বেলে ফেললো ওরিয়ন। অভ্যস্ত হাত ধোঁকা দিলো না। আগুন জ্বালতেই হাত দিয়ে আলো ঢেকে ফেললো সে। আস্তে আস্তে হাতটা সরালো সে, না, কেউই জেগে উঠলো না। আস্তে আস্তে আলোকিত হয়ে উঠলো ঘরের ভেতরটা।

না, আলো জ্বলে ওঠার পর ওদের দুজনকে হতাশ হতে হলো না। ঘরের ভেতরে মাটিতে পাতা একটা নোংরা বিছানায় একটা হেলট পরিবার শুয়ে আছে। সারাদিনের ক্লান্তি দেহে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে তারা। তিনজনের ছোটো পরিবার। একটা ছোটো শিশু। যে কেবল জগতের আনন্দই বোঝে, এখনো কোনো বিষাদ বোঝার সামর্থ্য হয়নি। স্বামী-স্ত্রী শুয়ে আছে সদ্য মিলনের তৃপ্তি মুখে নিয়ে। হেলটদের দেহে এমনিতেও কাপড় তেমন একটা থাকে না। এখন তো একেবারেই নেই। কিন্তু সেই নগ্নতায় কোনো ধরনের কুৎসিত ব্যাপারের প্রতিফলন হল না। ঐ ভঙ্গিমাতেই যেন ফুটে উঠছে জগতের সব সৌন্দর্য।

ওরিয়ন মশালটা ঘরের বেড়ায় গুঁজে নিলো। তারপর কোমর থেকে বের করলো নিজের ভয়ংকর তলোয়ার, 'দেরি করছো কেন? এদেরকে হত্যা করার পর রাজ্যের কাজ সারতে হবে। এই লাশগুলো এখান থেকে বের করতে রাজ্যের হ্যাপা পোহাতে হবে। তাড়াতাড়ি অস্ত্র বের করে কাজ শেষ করো।'

ওরিয়ন খোলা তলোয়ার হাতে এগিয়ে যায়। নিজের কোমরের তলোয়ারের হাতলে হাত দিয়েও ইভানের হাত যেন থমকে উঠতে চায়। আগেও এমন হত্যা করেছে সে। হেলটদেরকে মারা তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যম ছিল। কিন্তু অনেক বার করা কাজটা আজকে যেন কিছুতেই করতে সায় দিচ্ছে না মন। ইভানকে থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরিয়ন একটু অবাক হল, 'কী হয়েছে তোমার? অস্ত্র বের করছো না কেন? রাত তো কাবার হয়ে যাবে।'

'ওরিয়ন, থামো। এই পরিবারকে মারতে পারবো না আমরা।'

'কেন?'

'কারণ, এই পরিবারকে মারার কোনো কারণ নেই। আমাদেরকে পরীক্ষা হিসেবে এই কাজটা দেওয়া হয়েছে সত্য, কিন্তু এতে না বীরত্বের প্রকাশ হবে, না কৌশলের। শুধু শুধু মানুষ হত্যা করবো কেন?'

'এই কথা তো তোমার মুখ থেকে আগে শুনিনি। আগেও তো আমরা দুজনে মিলে হেলট হত্যা করেছি। আর মানুষ হত্যা করার কথা আসছে কেন? এরা তো হেলট।'

'এবং অবশ্যই মানুষ। তাকিয়ে দেখো, এদের দেহে আমাদের মতোই শ্বাস বইছে। এদের শিশু আমাদের শিশুদের মতোই স্নিগ্ধ। কোনো কারণ ছাড়া এদেরকে হত্যা করতে এসেছি আমরা।'

'তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ ইভান। এসব দয়া-মায়া কিছুই আমাদের মনে থাকা শোভা পায় না। আমাদের কেবল আদেশ পালন করে যেতে হবে।' ওরিয়ন তলোয়ার হাতে এগিয়ে যায়। ইভান আবার তাকায় বিছানার দিকে। একটু পরেই ওদের প্রাণহীন দেহ পড়ে থাকবে এখানে। কে জানে, হয়তো সেই প্রাণহীন চেহারাতেও এভাবে জীবনের তৃপ্তি মিশে থাকবে। সে নিজেও বুঝতে পারছে না, কোত্থেকে এই মায়া তার মধ্যে এলো। তার কেবলই মনে হচ্ছে, না, এভাবে একটা পরিবারের ভালোবাসার অন্ত করার কোনো অধিকার তার নেই। ওরিয়নের কাঁধ খামচে ধরল সে পেছন থেকে, 'ওরিয়ন, আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি কি না, সেই পরীক্ষা নিতে যেও না। আমার কথা শোনো। আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না এই হত্যাকাণ্ডে। আর তুমিও এই পরিবারের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

হতাশ ওরিয়ন থেমে যায়, তাকায় ইভানের দিকে, 'তুমি কী চাও তীরে এসে তরী ডুবুক? আমি বুঝতে পারছি, তোমার জন্য কাল হয়েছে ঐ ভালোবাসা। এজন্যই আমাদের জন্য নারীসঙ্গ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মেয়েদের মন নরম হয়। তার সংস্পর্শে আসলে পুরুষের মনও নরম হয়ে যায়। তুমি নিশ্চয়ই এই দুই হেলট নারী পুরুষের মধ্যে তোমাকে আর ইনোনকে কল্পনা করতে শুরু করেছ?'

অস্বীকার করলো না ইভান, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ। যেভাবেই হোক আমি এই জীবনে আর অন্যায় করবো না। আর এই রাতে আমার সাথি আর বন্ধু হিসেবে তোমাকেও কোনো ধরনের অন্যায় করতে দেবো না।'

ওরিয়ন অবাক দৃষ্টিতে তাকায় ইভানের দিকে, ' তুমি পাগল হয়ে গেছো। যা বলছ তা ভেবে বলছ তো? এই কাজটা শেষ না করলে আমরা অকৃতকার্য হবো। আমাদের স্থান হবে তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকদের মধ্যে। সেই ছোটোবেলা থেকে আমরা যে উদ্দেশ্য বুকে নিয়ে এই সেনা দলে প্রশিক্ষণ নিয়েছি, তা কি এই শেষ সময়ে এসে ব্যর্থ করে দেবে? প্রথম শ্রেণির অভিজাত হবার সুযোগ এভাবে হেলায় হারাতে বলছ তুমি আমাকে?'

এই চিন্তা এতক্ষণ ইভানের মাথায় আসেনি। এবার ভাবতে বাধ্য হলো সে তাকে অবশ্যই প্রথম শ্রেণির সেনা অভিজাত হতে হবে। নয়তো কিছুতে ইনোনের বাবা তার সাথে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। কিছুক্ষণ ভাবতেই মতলব মাথায় এলো তার, 'আচ্ছা ওরিয়ন, আজকে আমাদের পরীক্ষার শর্তগুলো কী ছিল?'

'একটা হেলট পরিবারকে মেরে গুম করে ফেলতে হবে। কেউ যাতে কিছু টের না পায়। রক্তের কোনো চিহ্ন যাতে না থাকে। আর প্রমাণ হিসেবে রক্তমাখা কাপড় নিয়ে যেতে হবে।'

'আচ্ছা, হেলট পরিবারকে গুম করতে হলে ওদেরকে মেরে ফেলার দরকার কী? এমনিতেও তো কাজটা করা যায়।'

'মানে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'দেখো' নিজের মুখটা কালো কাপড়ে ঢেকে নিলো ইভান, ' মুখ ঢেকে নাও।'

ওরিয়ন আদেশ পালন করলো। ইভান এবার এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। নিজের হাতে বেরিয়ে এসেছে খোলা তলোয়ার। বিছানার কাছে গিয়ে পা দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিলো হেলট পুরুষের পায়ে। কয়েকবার এমন করতেই পুরুষের ঘুম ভেঙে গেল। অবাক হয়ে ঘুম থেকে উঠলো সে। চোখ খুলতেই ঘরের আলোয় দুই যুব পুরুষ দেখে পুরো শরীর যেন জমে গেল তার। এদেরকে সে কখনো না দেখলেও এদের সম্পর্কে সে জানে। এরা হেলটদের যম। মহা শক্তিশালী ক্রিপ্টেয়ার সেনা।

হেলট পুরুষের উদ্দেশ্যে চাপা গলায় বলল ইভান, 'বেঁচে থাকতে চাইলে আর নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে টুঁ শব্দও করবে না।'

নির্দেশ পালিত হলো। ওরিয়নের দিকে তাকালো ইভান, 'আমাদের রক্তের দরকার না। কাপড়টা এদিকে দাও।' ওরিয়ন কাপড়টা এগিয়ে দিলো।

হেলটের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো ইভান, ' দেখি তোমার হাতটা দাও। কোনো শব্দ করবে না। হাতটা কাটতে হবে। আমাদের একটু রক্তের দরকার। বলতে পারো তোমার জীবনের বদলে এই রক্ত দিয়ে দাম চুকালে।'

হাতের চামড়ায় ইভানের তলোয়ারের ঘষা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করলো হেলট পুরুষ। তেমন একটা ব্যথা লাগলো না। বেশ ধারালো তলোয়ার। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। কাপড়ে সেই রক্ত ভালো করে মাখিয়ে নিতে লাগলো ইভান, 'একটা কাজ শেষ হয়েছে। এবার গুম করে ফেলার ব্যাপারটা করতে হবে।'

'গুম' শব্দটা শুনতে পেয়েছে হেলট। তার চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়া আরও গাঢ় হলো। ইভান তার হাতের রক্ত বন্ধ করার জন্য একটা পরিষ্কার কাপড় বেঁধে দিচ্ছে, 'তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও? পরিবার বেঁচে থাকুক এটা চাও?'

হেলট কোনো কথা বলে না। ধমকে ওঠে ইভান, ' কথা বলছ না কেন?'

' আজ্ঞে চাই।'

'তাহলে আমার কথা ভালো করে শোনো। বেঁচে থাকার জন্য কিছু মূল্য তো তোমাকে দিতে হবে। রক্ত দিয়ে অর্ধেক দিয়েছ। এবার বাকি অর্ধেক হিসেবে এই ঘর ত্যাগ করবে। তোমার স্ত্রী আর শিশু-সহ। আমরা তোমাদেরকে জঙ্গলের কাছে দিয়ে আসবো। এখন থেকে তোমার পরিবার জঙ্গলেই থাকবে। জঙ্গলে থাকতে কষ্ট হবে তা ঠিক। তবে সেখানে স্বাধীন ভাবে থাকতে পারবে। আর আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, কোনো সেনা তোমাদের খোঁজে জঙ্গলে যাবে না। এতে তোমাদের লাভ বই ক্ষতি হবে না। হেলটদের কাছে এই পৃথিবীতে স্বাধীনতার চেয়ে প্রার্থিত আর কিইবা হতে পারে?'

' আমি রাজি', এবার হেলট পুরুষ বেশ আত্মবিশ্বাস মাখানো স্বরে বলল।

'তাহলে জাগাও তোমার স্ত্রীকে।'

একই কৌশলে হেলটের স্ত্রীকেও জাগানো হলো। সেও যথেষ্ট আতঙ্কিত হলো। তবে চিৎকার করার সুযোগ পেলো না। অল্প কথায় স্বামী তাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলেছে। সে তাড়াতাড়ি ঘুমন্ত বাচ্চাকে কোলে নিলো। সাবধান থাকল যাতে কোনোমতেই শিশুর ঘুম না ভাঙ্গে।

মশাল নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সবাই। ইভান নির্দেশ দিতেই বেড়ার নিচের খোঁড়া মাটি আবার ঠিক করে বুজিয়ে দিলো ওরিয়ন। কারো জোরপূর্বক অনুপ্রবেশের কোনো চিহ্নই আর থাকলো না।

এবার আর কষ্ট করে বেরোতে হয়নি। দরজা দিয়েই বেরিয়েছে ওরা। তারপর অন্ধকারে গা ঢেকে সবাই বেরিয়ে এলো আবাস বস্তি ছেড়ে। চলতে লাগলো জঙ্গলের দিকে। শিশুটা এখনো মায়ের কোলে আরামে ঘুমাচ্ছে। জেগে ওঠেনি।

জঙ্গলের কাছে এসে ইভান হেলট পরিবারের সামনে দাঁড়ালো, 'তোমরা আর কখনো লোকালয়ে আসবে না। খবরদার। জঙ্গলে ভালোভাবেই বেঁচে থাকতে পারবে। সমস্যা হবে না।'

হেলট পুরুষের মন থেকে ভয় এখনো কাটেনি, 'আমাদের খোঁজে আসলেই কোনো সেনা আসবে না?'

' না, নিশ্চিন্ত থাকো। যাও, জঙ্গলে ঢুকে পড়ো।'

হেলট পরিবার ঢুকে পড়লো জঙ্গলে। ইভান আর ওরিয়ন মুখের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে ফেললো। এতক্ষণে মুক্ত ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

এতক্ষণ পরে কথা বলে উঠলো ওরিয়ন, 'বাবা, কী খেল দেখালে। আমাদের প্রমাণও যোগাড় হয়ে গেল, হেলট পরিবারও গুম হয়ে গেল। কাল সকালে ওরা যখন গুম হওয়া হেলট পরিবারের সংখ্যা হিসেব করবে তখন আমাদের এই

পরিবারের হিসেবও আসবে। আমরা কৃতকার্য হয়ে গেলাম। তবে তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি, এই মায়ার জন্য একদিন তোমাকে বিপদে পড়তে হবে। আর তোমার সাথে থাকি বলে আমাকেও বিপদে পড়তে হবে।'

'আচ্ছা, সে যখন পড়বো তখন দেখা যাবে। এখন শিবিরে চলো। সকাল হতে বেশি বাকি নেই। সকাল হতে না হতেই আবার প্রমাণ জমা দেবার জন্য ডাক পড়বে।'

দুজনে পা বাড়াল শিবিরের দিকে। ওরিয়ন ইভানের কাছে স্বীকার করলো না বটে, তবে এই পরিবারের প্রাণ দান করে এক আশ্চর্য তৃপ্তি কোত্থেকে যেন তার মনে এসেও হাজির হয়েছে। এই অনুভূতির উৎস বুঝতে পারছে না সে, কিন্তু অনুভূতির ফলাফল যে স্বর্গীয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো ওরিয়ন, তার মনে আবার মায়ার সৃষ্টি হলো কবে?

ইভান আর ওরিয়ন ওদিকে শিবিরে ফিরে গেছে। কিন্তু সব সেনা জোড়ার কাজ শেষ হয়নি। আরও অনেক জোড়া বেরিয়েছিল শিবির থেকে। এই মুহূর্তে আরও দুজন সেনা সম্পূর্ণ কালো পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে হেলট বসতির সামনে। দুজনের দেহ একটুও নড়ছে না। পরিস্থিতি বিচার করছে দুজন। না, একটু ভুল হলো। একজনই কেবল পরিস্থিতি বিচার করছে। আরেকজন তাকিয়ে আছে সঙ্গীর দিকে।

মরিসের এছাড়া তেমন কোনো কাজ নেই। নিকোলাসের ওপর তার ভরসা অগাধ। এই পর্যন্ত নিজের শক্তি আর বুদ্ধি খরচ করে এসেছে সে, তাতে সন্দেহ নেই, তবে এতেও সন্দেহ নেই নিকোলাস তাকে এই পর্যন্ত অনেক পরীক্ষায় সাহায্য করেছে। মরিসের ভরসা অর্জন করাও নিকোলাসের একটা উদ্দেশ্য ছিল। কদিন পরে যখন সে অভিজাত হবে তখন এমন কাউকে দরকার যে মর্যাদার আসনে আছে এবং সেই সাথে তার গুণমুগ্ধ। এসব চিন্তা করেই মরিসকে সবসময় নিজের কাছে কাছে রেখেছে নিকোলাস। মরিসের মাথায় এতকিছু ঢোকে না, সে নিকোলাসের সাহায্য পেয়েই খুশি। দুজনেরই স্বার্থ আছে এই বন্ধুত্বে, আর সেই স্বার্থ সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা এখনো প্রবল বলেই তাদের বন্ধুত্বে একটুও পড়তি হয়নি।

মরিস আর সব বোকা লোকের মতোই একটু অধৈর্য। সময় এবং পরিকল্পনা বোঝার মতো সামর্থ্য তার নেই। সে উশখুশ করে উঠলো, 'আর কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো? একটা ঘরে ঢুকে পড়লেই তো হয়। এই হেলটরা তো আমাদের কাছে পোকামাকড় ছাড়া আর কিছুই না। কয়েকটাকে পিষে মেরে কবর দিয়ে ফেললেই তো হয়ে গেল।'

নিকোলাসের দৃষ্টি এখনো সামনের দিকে নিবদ্ধ, 'হ্যাঁ, কিন্তু এটা কি আর আমাদেরকে যারা কাজ দিয়েছে তারা জানে না? অবশ্যই জানে। তার মানে এখানে একটা ফাঁক আছে। দাঁড়াও, আমি এরই মধ্যে একটা ঘর ঠিক করে ফেলেছি। এখন ঘরে ঢোকার উপায় খুঁজতে হবে।'

'সে আর এমন কী? ওদের ঘরের দরজা আর কত শক্ত হবে। এক লাথি মারলেই ভেঙ্গে যাবে।'

'কিন্তু আমাদের তো শব্দ করলে চলবে না। ঢুকতে হবে গোপনে। এবার আমাদের প্রশিক্ষণ কাজে লাগাবার সময় এসেছে।'

কথাটা বলেই বস্তির দিকে পা বাড়ালো নিকোলাস। মরিস আর কিছু না বলে তার পিছু নিলো। একটা ঘরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো দুজনে। এইদিকের ঘরগুলো বেশ সহজে আর সস্তায় তৈরি হয়েছে। চিকন দড়ি দিয়ে ডালপালা বেঁধে তৈরি হয়েছে ঘরের বেড়া।

নিকোলাস গলা নামিয়ে নিলো, 'এই দড়িগুলো দেখেছ? ঠিকমতো কয়েকটা কাটতে পারলেই বেড়া খুলে আসবে। তারপর আমরা সহজেই ঘরে ঢুকে যেতে পারবো। আমি সাথে করে দড়ি নিয়ে এসেছি। কাজ শেষ করে আবার দড়ি দিয়ে বেড়াটা বুনে দিলেই হবে।'

'দড়ি যেহেতু নিয়ে এসেছ, তার মানে তুমি এই পরিকল্পনা আগে থেকেই করে রেখেছ, তাই না? তাহলে এতক্ষণ দেরি করলাম কেন আমরা?'

'তোমাকে যে প্রশিক্ষণের সময় এত করে এত কিছু শেখানো হয়, তার কিছুই তোমার মনে থাকে না, তাই না?'

মরিস একটু হাসে, 'না, আসলে আমি মনে রাখার চেষ্টাই করি না। তুমি থাকতে কষ্ট করে এতকিছু মনে রাখার দরকার কী?'

'আচ্ছা, শোনো তাহলে, রাতের একটা নির্দিষ্ট সময়ে মানুষের ঘুম সবচেয়ে বেশি গভীর হয়। সেই সময়ের অপেক্ষা করছিলাম আমি। এবার সেই সময় হয়েছে। শক্ত আর ধারালো ছুরিটা বের করে নাও। দড়িগুলো কাটতে থাকো।'

নিকোলাসের দেখিয়ে দেওয়া জায়গায় দড়ি কাটতে লাগলো মরিস। নিকোলাস অন্যদিকে কাটছে। দেখতে দেখতে বেড়ার একটা বড়ো অংশ খুলে চলে এলো। একজন করে সহজেই ঢুকে যেতে পারবে। দুজনেই ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতর। দড়ি দিয়ে বেড়া আবার বুনে দিতে দেরি হলো না। কাজটা করতেই হতো। নইলে মশালের আলো বাইরে থেকে অন্য কারো চোখে পড়ে যেতে পারে।

বেড়ার ঝামেলা শেষ করে এবার ঘরের দিকে নজর দেবার সময় পেল দুজনে। মেঝেতে পাতা বিছানায় দুটো শরীর শুয়ে আছে। যুবক যুবতী। যুবতীর চেহারা থেকে এখনো কিশোরী ভাব পুরোপুরি মুছে যায়নি। মরিস তাকিয়ে আছে সেই যুবতীর প্রায় অনাবৃত বুকের দিকে। তার চেহারায় নগ্ন লোভ।

নিকোলাসের দৃষ্টি এড়ালো না মরিসের অভিসন্ধি, 'মনকে লাগাম দাও। আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসেছি। এখন এসবের সময় নয়।'

মরিস কথাটা জানে কিন্তু মানতে চাইলো না, 'কাজটা করতে তো অসুবিধা নেই। মেয়েটার দিকে একবার তাকাও। মাঝে মাঝে দেবতারা ভুল জায়গায় ভুল মানুষের জন্ম দিয়ে দেয়। হেলটের ঘরে এমন মেয়ে মানায়, তুমিই বলো।'

'বলাবলির কিছু নেই। এসব এখন চিন্তা করারও সময় নেই। কাজটা করতে হবে। ওদেরকে মেরে ফেলতে হবে তাড়াতাড়ি। মেরে ফেলার পরে কাজগুলোই কঠিন। গুম করে ফেলতে হবে লাশগুলো। কিন্তু কোনো চিহ্ন রাখা যাবে না। কীভাবে করবো কাজগুলো বুঝতে পারছো?'

' তুমি বুঝতে পারলেই হবে। আমি কেবল আমারটা বুঝে নেবো।'

চোখে ইশারা করলো নিকোলাস। দুজনেই অস্ত্র হাতে এগিয়ে গেল ঘুমন্ত দুটো শরীরের দিকে। দুজনে একসাথে ঝুঁকে পড়লো দেহ দুটোর ওপর।

যুবকের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল নিকোলাস। প্রথমেই লোহার মতো শক্ত হাতে চেপে ধরলো ঘুমন্ত যুবকের মুখ। আতঙ্কিত হয়ে চোখ খুলল যুবক, কিন্তু সেই আতঙ্ক অনুভব করার পর্যাপ্ত সময় পেল না সে। নিকোলাসের হাতের ধারালো ছুরি ততক্ষণে তার কণ্ঠনালী ফাঁক করে দিয়েছে। একেবারে নিখুঁত আঘাত। একটা ঘড়ঘড় শব্দ বেরোলো যুবকের গলা দিয়ে। তেমন কোন সময় না নিয়েই নিথর হয়ে গেল যুবক।

নিজের কাজ শেষ করে পাশের দিকে নজর দিলো নিকোলাস। মরিসকে ঠিক এই কাজটা করার ইশারাই দিয়েছিল সে। কিন্তু তাকাতেই সে দেখতে পেলো, মরিস সেই কাজটা করেনি। সে শুধু যুবতীর মুখে হাত চাপা দিয়েছে। যুবতী প্রাণপণ চেষ্টা করছে মরিসের হাত থেকে নিজের মুখ ছাড়াতে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না। পারার কথাও নয়, ক্রিস্টেয়ারের একেকজন সেনার গায়ে হাতির বল আছে।

নিকোলাস বেশ বিরক্ত হলো, 'মরিস, এসব কী করছো? তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করো। তোমাকে না বলেছি আজকে এসব হবে না।'

মরিসের স্বভাব সম্পর্কে জানে নিকোলাস। তাকে অনেক বার বাঁচিয়ে এসেছে সে। মাঝে মাঝেই সে শিবির ছেড়ে বেরিয়ে যায় নগরের উদ্দেশ্যে। পতিতাদের সাথে সময় কাটিয়ে আসে। কিছু মানুষ নাকি আছে যাদের বিকৃত যৌনক্ষুধার কোনো সীমা নেই। মরিস সেই বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মেছে। পতিতাদের সাথে সময় কাটানো অবশ্য এমনিতে হয় না। মুদ্রা লাগে। তার ব্যবস্থাও নিকোলাস করে দিয়েছিল। পানশালার বাজি খেলা একটা ভালো উপায়। স্পার্টার প্রায় সব পানশালাতেই বাজিতে পাঞ্জা লড়া হয়। মরিসকে সেখানে যাবার বুদ্ধি দিয়েছিল সে। পাঞ্জা লড়লে ক্রিস্টেয়ারের সেনার সাথে কেউ এঁটে উঠতে পারে না। সেখানে তো আর অভিজাত সেনারা পাঞ্জা লড়তে আসে না, আসে নিচু শ্রেণির লোকেরা। তাদের সাথে সহজেই জিতে যায় মরিস। আর সেই জেতা টাকা দিয়েই পতিতাদের দেনা মিটায়। এত ঝামেলা মাথায় নিয়ে যে নারী দেহের স্বাদ নিতে যায়, সে চোখের সামনে এমন সদ্য যৌবনপুষ্ট নারীর দেহ পেয়ে ছেড়ে দেবে তা হতে পারে না।

মরিসের নারী দেহ সামলানোর অভিজ্ঞতা অনেক। সে সহজেই ধরে রেখেছে হেলেট যুবতীর মুখ। সারা দেহ এখন তার নিয়ন্ত্রণে। নিকোলাসের দিকে তাকিয়ে করুণ গলায় অনুরোধ করলো সে, 'তুমি তো জানো, কতদিন ধরে উপোষ করে আছি। এখন একটা সুযোগ এসেছে। প্রতিজ্ঞা করছি, বেশি সময় নেবো না। তুমি কেবল একটু অপেক্ষা করো।'

মরিসকে আর বাঁধা দিয়ে লাভ হবে না, বুঝে ফেলেছে নিকোলাস। সে এক পাশে বসলো, 'ঠিক আছে, যা করার তাড়াতাড়ি করো। খবরদার যাতে মেয়েটা কোন আওয়াজ করতে না পারে সেদিকে ভালো করে খেয়াল রাখবে। এই সময়ে তো মানুষের মাথা গরম হয়ে যায়।'

নিকোলাসের অনুমতি পাওয়া গেছে। নিজের কাজে আর দেরি করলো না মরিস। নিকোলাস তাকিয়ে আছে অন্যদিকে।

প্রথমেই মেয়েটার মাথায় একটা জোরালো আঘাত করলো মরিস। চেতন আর অচেতনের মাঝামাঝি পর্যায়ে চলে গেল যুবতী। তার মুখ থেকে সাবধানে হাত সরালো মরিস। নিশ্চিত হলো, না এখন আর চিৎকার করার শক্তি অবশিষ্ট নেই যুবতীর গলায়। পুরোপুরি চেতনাহীন করে দেওয়া যেত, কিন্তু তাতে মিলনের সুখ থেকে বঞ্চিত হতো সে। নারী কণ্ঠের মিলনকালীন সুখ শব্দ কানে না এলে তার ঠিক জমে না। মুখে কাপড় গুঁজে দিলেও চলতো, কিন্তু তাতেও সমস্যা। মেয়েটার ঠোঁট খুবই আকর্ষণীয়।

ঘুমে থাকার কারণে মেয়েটার শরীরে কাপড়চোপড় এমনিতেই অসংলগ্ন ছিল। সেদিকে বেশি কষ্ট করতে হলো না মরিসকে। দুটো টানেই মেয়েটার শরীর বস্ত্রমুক্ত হলো। নিজের লালসা আগে থেকেই সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল মরিসের। কাজটা শুরু করতে দেরি করলো না সে। মরিসের দেহের প্রবল চাপে আর কামের অত্যাচারে মেয়েটা অর্ধ অচেতন অবস্থায় গুঙ্গিয়ে উঠলো। সেই গুঙ্গিয়ে ওঠাকেই কামের বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নিলো ধর্ষক। তার শরীরের আন্দোলন আরও বৃদ্ধি পেলো। একটা সময় সে আন্দোলন পৌঁছে গেল চরমে। নিজে চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে যেতেই মেয়েটার ঠোঁট জোরে কামড়ে ধরল মরিস। নাকি সুরে আবার গুঙ্গিয়ে উঠলো মেয়েটা। সেটাই ছিল তার জীবনে করা সর্বশেষ শব্দ। ততক্ষণে মেয়েটার গলায় ছুরি বুলিয়ে দিয়েছে মরিস। কিছুক্ষণ তড়পে দেহটা স্থির হয়ে গেল।

মরিস উঠে দাঁড়ালো, 'হয়ে গেছে।'

এতক্ষণ উল্টো দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল নিকোলাস। এবার ফিরল এদিকে। দেখেই তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, 'এটা আবার কী করলে? মেয়েটার গায়ে একটা কাপড় দিয়ে দাও।'

মরিস নোংরা হাসলো, 'এখন আর কাপড় দিয়ে ঢাকলেই কী আর না ঢাকলেই কী। আমাদেরকে তো এটাও শেখানো হয়েছিল, আমাদের আত্মাই কেবল হেডিসের রাজ্যে যায়, দেহ মরার পরে একটা আবর্জনা।'

'থাক, আর দার্শনিক বাণী কপচাতে হবে না। রুচির একটা ব্যাপার আছে।' মেয়েটার নগ্ন শরীর একটা চাদর চাপা দিলো নিকোলাস।

তারপরের নিয়মিত কাজগুলো করলো ওরা। ঘরের এদিক সেদিক পড়ে থাকা প্রত্যেক রক্তের ফোঁটা মুছে দিলো। যেসব কাপড়ে রক্ত লেগে গেছে সেগুলো জড়ো করে পুঁটুলি বানিয়ে ফেলা হলো। সেগুলোকেও গুম করে ফেলতে হবে। সব গুছিয়ে নিয়ে এবার বেরোবার পালা। দুটো দেহকে ভালো করে কাপড়ে মুড়িয়ে নেয়া হয়েছে।

নিকোলাস আদেশ দিলো, 'যুবকের দেহটা তুমি তুলবে।'

মরিস একটু টিপ্পনী কাটলো, 'কেন, আমাকে কেন যুবকের দেহ তুলতে বললে। তোমারও কি নারী দেহ ছুঁয়ে দেখার সাধ হলো না-কি? তাহলে আগেই বলতে। মেয়েটাকে একটু পরে মারতাম। তুমি একটু স্পর্শ করে নিতে পারতে।'

'তোমার রুচির সাথে আমার রুচি মেলাবে না। আমি এসব পছন্দ করি না। তোমাকে যুবকের দেহ বইতে বলার কারণ আছে। তুমি এখানে একটু আনন্দ ভোগ করেছ। যেহেতু তোমার লাভের ভাগ বেশি তাই তোমার পরিশ্রমের ভাগও বেশি হবে। বুঝেছ?'

মরিসের মনে মিলনের আর নিষ্ঠুরতার আনন্দ একসাথে জেগেছে, সে বেশি পরিশ্রম করতে অপারগতা প্রকাশ করলো না, 'আরে রেগে যেও না। তোমার রুচি অনেক অভিজাত, তা আমি জানি। আমারও যুবকের দেহ বহন করতে কোনো আপত্তি নেই।'

'আপত্তি না থাকলে তুলে নাও।'

দুজনের দেহ আর রক্তমাখা কাপরের পুঁটুলি তুলে নিয়ে দুজনে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। অন্ধকারে মিশে চলে গেল বসতি থেকে দূরে। একটা দেহ আর পুঁটুলি বহন করতে সাধারণ মানুষের কষ্ট হবার কথা। সাথে আছে পুঁটুলি আর নিজেদের অস্ত্র। তবে ওদের তেমন কষ্ট হচ্ছে না। শরীরের দেড় গুণ ওজন ওরা সহজেই বহন করতে পারে। দিনের পর দিন প্রশিক্ষণে ওদের পেশী এমনভাবেই তৈরি হয়েছে।

মৃতদেহ গুম করার উপায় আগেই ভেবে রেখেছিল নিকোলাস। মরিস এসব নিয়ে চিন্তা করছে না। জানে, একটা না একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

খুব বেশিদূর হাঁটতে হলো না। কাছেই একটা পাহাড়ি খাদ আছে। তার ওপাশ থেকে জঙ্গল শুরু হয়েছে। এই খাড়িতে লাশগুলো ফেলে দিলে কেউ কোনদিন খোঁজ বের করতে পারবে না। আর আজ না হোক, কাল রাতের মধ্যেই শেয়াল নেকড়েরা লাশের একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে। দুজনেই ঘাড়ের ওপরের বোঝা ছুঁড়ে দিলো সেই খাদে। কিছুক্ষণ পরে নিচ থেকে আওয়াজ ভেসে এলো।

আওয়াজ ভেসে আসতেই মরিস বলে উঠলো, 'তোমার তাড়াহুড়াতে মজাটা বাড়িয়ে করতে পারলাম না। এখন তো কাজ শেষ। রাতের এখনো কত বাকি। শুধুশুধু আমাকে তখন কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে বলেছিলে। তুমিই বলো, এতক্ষণ তো মেয়েটার শরীর ধরে ছিলে। কেমন?'

'বাজে কথা শোনার ইচ্ছে নেই এখন। মশালগুলো নিভিয়ে ফেলতে হবে। তার আগে দেখে নাও, কারো শরীরে কোনো রক্ত লেগে আছে কিনা। তুমি আমার শরীর দেখো, আমি তোমারটা দেখছি।'

দুজনেই পরীক্ষা করা শুরু করলো। মরিসের মুখ থেমে নেই, 'তোমাকে বলেছিলাম মাঝে মাঝে আমার সাথে নগরে যেতে। পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো

জিনিসের স্বাদ থেকেই বঞ্চিত থেকে গেলে। আমি তো তোমার খুব ভালো বন্ধু, তাই তোমার ভালোই চাই। এমন নিরস ভাবে আর জীবন কাটিয়ো না।'

'পৃথিবীতে এরচেয়েও অনেক ভালো জিনিস আছে মরিস। সেটা তুমি কদিন পরে এমনিতেই টের পাবে। এখন এই জিনিসটা তোমার জন্য নিষিদ্ধ, আর এ জন্যই তোমার মন পড়ে থাকে এটার দিকে। যখন কদিন পরে অভিজাত হবে, সুন্দরী বড়ো ঘরের কোনো মেয়ে বিয়ে করবে তখন দেখবে এসবে আর তোমার অগ্রহ থাকবে না।'

'ভুল বললে বন্ধু। হ্যাঁ, বড়ো ঘরের একটা সুন্দরী মেয়ে আমি বিয়ে করবো তা ঠিক। সমাজের প্রয়োজনে তা তো করতেই হবে। কিন্তু প্রতিদিন এক নারীর স্বাদ নেয়ার মানুষ আমি না। প্রতিদিন এক নারীতে মজে থাকা কোনো কাজের কথাও না। পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু খাদ্য এই নারী দেহ, কিন্তু অবশ্যই তোমার স্বাদ বদলে বদলে খেতে হবে।'

কাজ শেষ করে দুজনে ততক্ষণে রওনা দিয়েছে শিবিরের দিকে। রক্তমাখা কাপড়টা ভালো করে গুছিয়ে নিয়েছে। কেমন যেন গন্ধ ভেসে আসছে সেই কাপড় থেকে। রক্তের গন্ধ ওদের ভালোই লাগে। তাজা হলে তো কথাই নেই।

শিবিরের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। জানে ওদের দলের কোনো সেনাই আজকে ঘুমাবে না। সবাই দুজন দুজন করে একই কাজ করতে গেছে। যদিও কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। নিকোলাস জানে সবাই অপেক্ষা করছে। রক্তমাখা কাপড় জমা দিতে হবে ঠিক ভোরে।

শিবিরে ঢুকে নিজেদের তাবুর দিকে পা বাড়াতেই একটা কোণের দিকে দুজনকে দেখতে পেলো নিকোলাস। এই দুজনকে সে ভালো করে চেনে। দুজনের একজন তার সেরা সেনা অভিজাত নির্বাচিত হবার সামনে সবচেয়ে বড়ো বাঁধা। ছোটোবেলা থেকেই তাকে ছাড়িয়ে যাবার অনেক চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু ব্যবধানটা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ইভানের দিকে এগিয়ে গেল নিকোলাস, মরিস আছে তার পেছনে। ইভানের থেকে একটু দূরে এসে দাঁড়ালো সে, 'তোমাদের দুজনের কী খবর? কাজ শেষ করে এসে বসেছ? না-কি কাজটা করতেই যাওনি?'

ইভান তার সম্পর্কে নিকোলাসের মনোভাব ভালো করেই জানে। সে মৃদু হাসলো, 'তোমার কী মনে হয়?'

'মনে তো হয় একটা ভজকট পাকিয়ে বসে আছো। এখন পরিস্থিতি সামলাতে পারছো না।'

ওরিয়ন একটা শক্ত উত্তর দেবে ঠিক করেছে। কিন্তু ইভান ওকে কিছু বলতে দিলো না, 'তোমার মনে কী হচ্ছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কে কী কাজ করেছে তা একটু পরেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'যাই হোক, কাজটা কিন্তু অনেক সহজ ছিল। কী বলো?'

'সবার জন্য হয়তো না। কেউ কেউ শিবির থেকে পালিয়ে অজায়গায় কুজায়গায় ঘুরে বেড়ায়। তাদের জন্য এমন সহজ কাজও মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে ওঠে।'

খোঁচাটা ওরিয়ন কাকে মেরেছে তা সবাই বুঝতে পেরেছে। মরিসের মুখ ক্রোধে লাল হয়ে গেল, 'মুখ সামলে কথা বলো। এসব কথা বলার সাহস কোত্থেকে পেয়েছ? আমার নামে এসব রটিয়ে বেড়াচ্ছ, তাই না?'

ইভান হেসে বলল, 'তুমি যে কোন মাপের যোদ্ধা আর কী করে বেড়াও এটা সবাই জানে। রটিয়ে বেড়ানোর কিছু নেই। আর ওরিয়ন তো কারো নাম নিয়ে কিছু বলেনি। তোমার গায়ে লাগছে কেন?'

এবার একটু থতমত খেলো মরিস। নিকোলাস কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করলো না, 'তোমার বন্ধুর মুখটাকে একটু সামলে রাখতে বলো ইভান। কদিন পরে আমরা সবাই অভিজাত হবো। আর তখন আমাদেরকেই রাজ্যের নানা দিক সামলাতে হবে। এমন গুজব ছড়ানো নিশ্চয়ই কোনো অভিজাতের কাজ হতে পারে না, তাই না?'

ইভান এবার উঠে নিকোলাসের সামনে দাঁড়ালো, 'আমার তো মনে হয় অভিজাত হয়ে আমরা যখন রাজ্যের নানা দিক দেখভাল করবো, তখন আমাদেরকে ভালো আর খারাপের পার্থক্য জানতে হবে। সেখানে আমার বন্ধু তো খারাপ কিছু বলেনি। উল্টো আমার এটাও মনে হয়, তোমার বন্ধুকে তোমার বোঝানো উচিত। একজন অভিজাতের জন্য ছোঁকছোঁক স্বভাবটা কিছুতেই ভালো কিছু নয়।'

নিকোলাস এক পা এগোলো, কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখ, কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিলো। সে পৃথিবীর নিয়ম ভালো করেই জানে। কারো ভালো সময় চিরদিন থাকে না। হয়তো এখন না, কিন্তু কখনো তো ইভানেরও খারাপ সময় আসবে। তখন একেবারে হিসেব করে হিসেব মিটিয়ে দেওয়া হবে। তারা তো থাকবে একই নগরে। তখন দেখা যাবে।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। সবাই ফিরে এসেছে এরই মধ্যে। প্রশিক্ষকরা সবাইকে ডাকলেন। প্রত্যেক দল একে একে তদের কাছে গেল। নিজেদের কাজের প্রমাণস্বরূপ রক্তমাখা কাপড় তুলে দিলো প্রশিক্ষকের হাতে। প্রত্যেক কাপড় ভালো করে পরীক্ষা করা হলো। না, সবগুলোই একেবারে তাজা রক্তে ভেজা। এরা সবাই নিজেদের কাজে সফল হয়েছে।

প্রধান পরীক্ষক সবাইকে যার যার তাবুতে যেতে বললেন। এবার বিশ্রামের পালা। যে যার তাবুতে ফিরে গেল।

শুধু উঠানের এক কোণে পড়ে রইলো হেলটদের রক্তে ভেজা কাপড়ের টুকরোগুলো। ভোরের আলো এসে পড়তেই একটু যেন ঝিকমিকিয়ে উঠলো জীবনের রস।

এখন আর তেমন সমস্যা হচ্ছে না। সমুদ্রের দুলুনির সাথে ওরা বেশ ভালো ভাবে মানিয়ে নিয়েছে। শেইরনের কথা শুনে ফলও পাওয়া গেছে বেশ। সমুদ্রের দিকে চেয়ে থেকে ঢেউয়ের ভাব বুঝলে শরীরের ওপর দুলুনির তেমন প্রভাব পড়ে না। তবে মাঝে মাঝে সমুদ্রে ঢেউ অনেক বড়ো হয়, সেগুলোর দিকে চেয়ে থাকলে বুকের ভেতরটা শূন্য হয়ে যায়, ভয়ের অনুভূতি বাসা বাঁধে, মনে হয় এই জাহাজ এবার টিকবে তো?

কিন্তু না, প্রতিবারেই টিকে যায় জাহাজ। রুদ্রদেবের অবশ্য এত ভয় লাগে না। যখনই সমুদ্রে বড়ো ঢেউ হয় তখন সে লক্ষ্য করে নাবিকদের। নাবিকেরা স্বাভাবিক থাকলে বুঝতে হবে এই ঢেউ এমন বেশি কিছু না। সেটাই হয়েছে। নাবিকেরা নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে।

এখন শরীর ভালো হওয়াতে রুদ্রদেব আর অসিতের বসে বসে খাবার দিন শেষ হয়েছে। তাদেরকে এখন প্রধান নাবিক হিসেব করে কাজ করতে দেয়। সেই সকাল থেকে দড়ি টানানো, পালের দিক পরিবর্তন করা, দাঁড় টানা সবদিকেই কাজ করতে হয় তাদের। এই জাহাজের একমাত্র একজনই আছে যাকে কোন কাজ করতে হয় না। তার খোঁজেই রুদ্রদেব ডেকের ওপর এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, 'আমাদের গুরুমশাইকে তো আশেপাশে দেখতে পাচ্ছি না।'

রুদ্রদেব আর অসিত একটু ছুটি পেয়েছে। একটু পরে অবশ্য জল তুলে ডেক ভেজাতে হবে। দুপুরের রোদে কাঠ চড়চড় করে ওঠে। এজন্য নিয়ম করে কাঠে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হয়। নয়তো কাঠ শক্তি হারাবে। ডেকের ওপরের জিনিসপত্রের ভার আর নিতে পারবে না। সমুদ্র থেকে জল তুলে পুরো ডেক ভিজিয়ে দিতে পরিশ্রম নেহাত কম হয় না। আগেরবারের দেওয়া পানি অবশ্য এখনো পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি। এখন একটু বিশ্রাম নিচ্ছে দুজনে।

অসিতও আশেপাশে তাকালো, 'আমিও সকাল থেকে দেখিনি ওনাকে।'

'মনে হয় ঘুমাচ্ছে। বুড়ো হয়েছে তো। এই সময় মানুষের ঘুমের সমস্যা হয়। অনিয়মিত হয়ে যায় নিদ্রানিয়ম। এজন্য হয়তো টানা দুই দিন ঘুম আসবে না, আবার ঘুম এলে দেখা যাবে আট প্রহর পেরিয়ে যাবে।'

'তাই হবে হয়তো। দেখে আসবো না-কি?'

'না থাক, ঘুমালে ঘুমিয়ে থাকুক। দুপুরের খাবার সময়ও না এলে তখন ডেকে তোলা যাবে। এসো সময় নষ্ট না করে উনি আমাদের যেসব ভাষা শেখাচ্ছেন, সেগুলো একটু চর্চা করি।'

'হ্যাঁ', অসিত বেশ মজা পেয়েছে এই নতুন ভাষা শিখতে।

শেইরনের প্রস্তাব রুদ্রদেব পরদিনই মেনে নিয়েছিল। ভালো ভাবে ভেবে দেখেছে, এই বৃদ্ধ তাদের জন্য কোনো ভবিষ্যৎ হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না। এই জাহাজের কারো সাথে কথা বলতে পারেনি ভাষা না জানা থাকার কারণে। তাদের ভাষা ভালো করে কেউই জানে না। তারপরে বৃদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে তারা।

শুরুতেই ভাষার দিকে নজর দিয়েছেন বৃদ্ধ, 'শোনো, কোনো জায়গায় কোনো কাজ উদ্ধার করতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে সেই জায়গার ভাষা। নইলে কিছুতেই কাজ উদ্ধার হবে না। শুরুই করতে পারবে না তো উদ্ধার হবে কীভাবে?'

রুদ্রদেব সায় দিয়েছিল, 'ঠিক। অচিন জায়গাকে চেনার প্রথম উপায় হচ্ছে ভাষা।'

'হ্যাঁ, তবে তোমাদের ওদিকের ভাষা আর এদিকের ভাষায় কিছু সমস্যা আছে। ভারতবর্ষের একটা ভালো দিক হলো, সেই ভূখণ্ড অনেক আগে থেকেই একত্রিত হয়ে আছে। তোমাদের সব জায়গায় একই ধর্ম আর ধর্মগ্রন্থ ব্যবহার হয় বিশ্বাসের কাজে। আমি যতটুকু জানি ততটুকুই বললাম। কি, ঠিক বললাম তো?'

রুদ্রদেব মাথা দোলাল, 'হ্যাঁ, কিছু গভীর ব্যতিক্রম ছাড়া মোটা দাগে চিন্তা করলে তাই দাঁড়ায়।'

'হ্যাঁ, আর যেহেতু একই ধর্মগ্রন্থ সব জায়গায় ব্যবহার হয়, তাই সেই ধর্মগ্রন্থের ভাষা ভারতের সবাইকেই জানতে হয়েছে। সেটা হচ্ছে সংস্কৃত। আরও অনেক আঞ্চলিক ভাষা ভারতে থাকতে পারে, আমার তো মনে হয় আছেও, কিন্তু এই সংস্কৃত কিন্তু সবাই জানে। তাতে হয়েছে কী, তোমাদের ধর্ম তোমাদেরকে অনেক বড়ো একটা সুবিধা দিয়েছে। তোমরা পুরো ভারতে এক ভাষা পেয়ে গেছো। যোগাযোগ অনেক সহজ হয়ে গেছে তোমাদের জন্য।'

'হ্যাঁ।' অসিত এবার কথাটার মানে আর গুরুত্ব দুইই বুঝতে পেরেছে।

'কিন্তু, সমুদ্রের এপারের দিকে, মানে আমাদের দিকে কিন্তু ব্যাপারটা তেমন নয়। এই কিছুদিন আগেও মেডিটেরিয়ান সাগরের- ও আচ্ছা, তোমরা তো আবার এই সাগরের নামই শোননি। আগে বলে নেই, এই আরব সাগর যেমন ভারতকে পৃথিবীর পশ্চিম অংশ থেকে আলাদা করেছে তেমনি ভূমধ্যসাগর আমাদের দেশ আর মিশর-পার্সিয়াকে আলাদা করেছে। তাই আমাদের ওদিকে যেমন একরকমের ভাষা যেমন ল্যাটিন, গ্রীক, তেমনি মিশরে কিন্তু মিশরীয় ভাষার চল। মিশরের লোক আগে ছিল গ্রীকদের কবলে, এজন্য গ্রীকরা তাদের ভাষা ওদের ওপর চাপিয়েছে, এখন আবার তারা রোমানদের কবলে, এজন্য রোমানরা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে নিজেদের ভাষা। আবার তারা এখনো মিশরীয় ভাষাও বলে। তাই তোমাদের ভারতের মতো একটা ভাষা শিখলে চলবে

না। যদি ওদিকে কাজ উদ্ধার করতে হয় তাহলে কম করে হলেও তিনটে ভাষা জানতে হবে।'

'তিনটে!' বিস্ময়ের প্রকাশ হয় অসিতের গলায়।

'হ্যাঁ, গ্রীক, মিশরীয় আর ল্যাটিন। তাহলেই সম্পূর্ণ রোমান সাম্রাজ্যে ভাষা নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না।'

'আচ্ছা, প্রথমে কোন ভাষা দিয়ে শুরু করবো?' রুদ্রদেব জানতে চায়।

'আমরা প্রথমে মিশরীয় দিয়ে শুরু করবো। ওটাই তো আগে পথে পড়বে। তবে শুরুটা আজকে হবে না। কালকে। আজকের মতো যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বলতে পারো প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে।'

'আচ্ছা। আমরা তাহলে আসি।' অসিত উঠতে চায়।

শেইরন বাঁধা দেন, 'আরে না। শিক্ষা তো আর বিনা মূল্যে দেওয়া যায় না। তোমাদের দেশে না-কি খুব ভালো একটা রীতি আছে। গুরু দক্ষিণা। সেটা কই?'

রুদ্রদেব বুঝতে পারেন শেইরন মজা করছেন, 'হ্যাঁ, সেই রীতি তো আছে। বলুন আপনি কী দক্ষিণা চান?'

'তোমার কাছে কিছু চাই না। তোমার চ্যালাকে বলো আমার হাত আর পাগুলো একটু টিপে দিতে। বুড়ো বয়সে শরীর আরাম চায়। আমি আবার কেউ কিছু চাইলে না করতে পারি না।'

রুদ্রদেব হেসে অসিতের দিকে তাকালো, 'লেগে পড়ো অসিত। গুরুকে সেবা করে দেখো, শিক্ষা শীঘ্র লাভ করতে পারবে। আমি একটু প্রধান নাবিকের সাথে দেখা করে আসি।'

অসিতকে গুরু সেবায় নিয়োগ করে সেদিন চলে গিয়েছিল রুদ্রদেব। আর এই সেবাই অসিতের জন্য হয়েছিল শাপেবর। সেবার সময়ে শেইরন অনেক কথা বলেন। আর গুরুর কাছে বেশি সময় কাটানোর কারণে অসিতের শিক্ষা মোটামুটি এগিয়ে গেছে, রুদ্রদেব একটু পেছনে পড়ে গেছে এইদিকে। এজন্য সময় পেলেই অসিতের সাথে ভাষা চর্চা করতে বসে পড়ে সে।

'আচ্ছা, জলের গ্রীক যেন কী বলেছিল?'

অসিত রুদ্রদেবকে শেখাতে পারছে এটা ভেবে একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, 'এটা তো খুব সহজ। আপনার মনে নেই?'

'এত কথা না বলে, কী বলেছিল সেটা বললেই তো হলো তাই না?'

'তো নেরো।'

'কী বললে?'

'আরে, আপনাকে কিছু বলিনি। জলের গ্রীক হচ্ছে তো নেরো।'

রুদ্রদেব বুঝতে পারে তার সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলো আবার ফিরে আসছে। নতুন ভাষা শেখায় তার দুর্বলতা আছে। গুরুকুলে গুপ্তচর ব্যবস্থার শিক্ষা হিসেবে সে যখন গোপন ভাষা শিখেছিল তখন বেশ হিমসিম খেতে হয়েছিল। তবে সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সে জানে, লেগে থাকলে হবে না এমন কাজ পৃথিবীতে নেই। কারো একটু আগে কারো একটু পরে। অসিতের ক্ষেত্রে এই ভাষা শেখার ক্ষমতা সহজাত।

ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে করতে আবার কাজের ফরমায়েশ চলে এলো। সেই কাজ শেষ করতে করতে দুপুরের খাবার সময় হয়ে এসেছে। রোদের কড়া তাপে শরীর ঘামে একেবারে আঠা আঠা হয়ে গেছে। জল যে ইচ্ছেমতো খাবে সে উপায়ও নেই। সমুদ্রে জীবন অনেক কষ্টের। সাগরের নোনা জলে দুজনে স্নান সেরে নিলো। গা মুছতে মুছতে রুদ্রদেব অসিতকে বলল, 'ঐ বুড়োর তো এখনো কোনো খবর নেই। তুমি একটু যাও তো।'

'যাবো। কিন্তু আপনার তো ওনাকে বুড়ো বলে অপমান করা ঠিক হচ্ছে না। তিনি তো আমাদের গুরু। আর গুরুকে যে সম্মান করতে হবে সেটাও তো আপনিই আমাকে শিখিয়েছেন।'

রুদ্রদেব হাসল, 'আমি আমার ভুল স্বীকার করছি। যাও, আমাদের মহামান্য গুরুকে ডেকে নিয়ে এসো।'

'আমার ব্যাপারেই কি কথা বলছো তোমরা?' ওদের ঠিক পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছেন শেইরন।

অসিত এরই মধ্যে শেইরনকে অনেক পছন্দ করে ফেলেছে, 'হ্যাঁ। আপনি কোথায় ছিলেন? সকাল থেকে আপনাকে না দেখে আমরা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

শেইরন অসিতের বালতিতে জমে থাকা জলে মুখটা একটু ভিজিয়ে নিলেন, 'ঘুমাচ্ছিলাম। আরও কিছুক্ষণ ঘুমাতাম, কিন্তু বিচ্ছিরি ক্ষিধেটা এসে ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিলো।'

রুদ্রদেব টিপ্পনী কাটতে ছাড়লো না, 'আপনি সকাল থেকে ঘুমিয়েছেন বলে প্রধান নাবিকের নিশ্চয়ই অনেক আনন্দ হয়েছে। একজনের সকালের খাবার বেঁচে গেল।'

শেইরন হাসলেন, 'তা যা বলেছ। তবে দুপুরের খাবার বাঁচাবার সুযোগ তাকে আমি দেবো না। অসিত যাও, আমাদের খাবার নিয়ে এসো।'

তিনজনের খাবারই নিয়ে এলো অসিত। শুকনো মাংস বাদে খাবার তেমন কিছু নেই এখানে। তবে ওরা শুধু শুকনো শস্য আর সবজির মিশ্রিত খিচুড়ির মতো

জিনিসটা খায়। ওরা মাংস খায় না দেখে প্রধান নাবিক দয়া করে ওদের ভাগে খিচুড়ি বেশি করে বরাদ্দ করেছেন।

শেইরন মাংসের একটা টুকরো মুখে দিলেন, 'তাজা মাংস আর শুকনো মাংসের স্বাদে আকাশ পাতাল পার্থক্য। কতদিন আমার দেশে যাই না। ওখানে উৎসবের সময় আমরা প্রচুর মাংস খাই। শিকার করে খেতাম খরগোশের মাংস। ছাগলের মাংস জলপাইয়ের তেল দিয়ে রান্না করলে কি যে মজা লাগে খেতে।'

এর আগে শেইরন কখনো নিজের মাতৃভূমি নিয়ে কথা বলেনি। এবার সুযোগ পেয়ে রুদ্রদেব জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার দেশ কোথায়?'

'গ্রীস। চমৎকার দেশ। সেখানের স্পার্টা নামক নগরে জন্মেছিলাম আমি। এখন অবশ্য জায়গাটার প্রতি কোন টান অনুভব করি না।'

রুদ্রদেব অমত করলো, 'মনে হয় না। করেন। তাই তো মাংসের প্রশ্ন উঠতে আপনার নিজের রাজ্যের কথা মনে পড়েছে।'

'তা পড়েছে। মাঝে মাঝে যে পড়ে না তো নয়। তবু আমি এখন আর সেই দেশে যেতে চাই না। এখন আমরা পরাধীন। আর পরাধীন কোনো দেশ যার স্বদেশ তার মতো দুঃখী মানুষ কমই আছে।'

'পরাধীন?' অসিত প্রশ্ন করে।

'হাঁ, আমরা এখন রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে। রোমানরাই শাসন করছে আমাদের। তাই তো এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াই। আমার আবার এটা ভালো লাগে। কোথায় যাবো না জেনে পথে বেরিয়ে পড়া। এই যে তোমাদের সাথে যোগ দিয়েছি, তার বড়ো কারণ এটাই। কোথায় যাবো, তোমরাও জানো না, আমিও জানি না। হয়তো তোমাদের সাথে চলতে চলতে আবার গ্রীসের মাটিতে পা পড়েও যেতে পারে আমার।'

রুদ্রদেব মন্তব্য করে, 'এই পৃথিবীতে স্বাধীন বলে কি আসলে কোনো রাজ্য আছে? এইতো কিছুদিন পরপরই বদলে যায় রাজ্যের সীমানা।'

'তোমাদের দেশের পরিস্থিতি আর আমাদের পরিস্থিতি এক নয়। আগেও আমাদের দেশে আগামেনন পুরো গ্রীসের সম্রাট ছিলেন। আলেকজান্ডার পুরো গ্রীস শাসন করেছিলেন। কিন্তু তারা সবাই ছিলেন গ্রীক, আমাদের নগরের না হলেও একই জাতির। কিন্তু এভাবে বহিরাগত দিয়ে শাসিত হবার অনুভূতি তোমরা কখনো বুঝবে না। তোমাদের ভারত কখনো কোনো বহিরাগত দখল করতে পারেনি। শুনেছি আলেকজান্ডার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একটু গিয়েই থমকে যেতে হয়েছিল তাকে।'

'তার মানে আপনারা যুদ্ধে হেরে গেছেন? আপনাদের রাজ্যে কি যথেষ্ট শক্তিশালী যোদ্ধা ছিল না?' অসিতের প্রশ্ন সরল।

আবার একটু উদাস হলো শেইরনের কণ্ঠ, 'আমাদের গ্রীসের যোদ্ধারা জগতের সবচেয়ে ক্ষিপ্র যোদ্ধা ছিল। কেউ তাদের সামনে দাঁড়াতে পারতো না। কিন্তু আমরা রোমানদের রাজনীতি আর সমরনীতির কৌশলের কাছে হেরে গিয়েছিলাম। আসলে অতো বড়ো বাহিনীর সাথে লড়াই করার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। রোমানরা আস্তে আস্তে পুরো গ্রীস গ্রাস করে নিয়েছিল, ঠিক যেমন এই থালায় আমরা খাবার গ্রাস করছি। থালার ধার থেকে শুরু করে শেষে মাঝ পর্যন্ত।'

মাংসের শেষ টুকরোটা মুখে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেন শেইরন। তারপর আবার ওদের পাশে বসলেন, 'দেখি জলটা এগিয়ে দাও।'

জল খেয়ে নিজের কাজ শুরু করলেন বৃদ্ধ, 'আচ্ছা, তোমাদের ভাষা শিক্ষার কী অবস্থা? সবকিছু মনে থাকছে তো?'

'হ্যাঁ, ভালোই মনে থাকছে', অসিতের সোৎসাহে উত্তর।

'আচ্ছা, ধরে দেখি।' বৃদ্ধ বেশ কয়েকটা শব্দের মানে জিজ্ঞেস করলেন। অসিত বেশির ভাগের উত্তর দিলো। রুদ্রদেবও দিলো কিছুর উত্তর। শেইরন খুশি হয়েছেন ওদের উন্নতি দেখে। আরও কিছুক্ষণ নানা কথা আর হাসি ঠাট্টায় কাটলো। দুপুরের খাবারের পর সবারই একটু বিশ্রাম। বাতাস এখন একদিকে আছে। পালের দড়ি নিয়ে টানাটানি করার দরকার নেই।

একটু পরে প্রধান নাবিককে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল। অসিত একটু ভয় পেয়েছে। প্রধান নাবিক কেন জানি তাকে দেখতে পারেন না। হয়তো অকর্মণ্য বলে অথবা অযাচিত বলে।

তবে প্রধান নাবিক ওদের দুজনের কাছে আসেননি। তার দরকার শেইরনের সাথে। ওদের কাছেই তিনি দাঁড়ালেন। শেইরনের তেমন কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, কেবল মাথাটা একটু ঘোরালেন, 'কী হয়েছে? কিছু বলবে না-কি?'

একটা অজ্ঞাত কারণে শেইরনকে অনেক শ্রদ্ধা করে প্রধান নাবিক, গলার স্বরে সেই শ্রদ্ধা বেশ ভালো করেই মিশে আছে, 'আজ্ঞে, আপনার কি দুপুরের খাবার হয়েছে?'

'কে দুপুরের খাবার এনেছে আর কে আনেনি তার খবর তো অনেক আগেই তোমার কাছে চলে গেছে। দরকারি কথা বলো।'

'আমি আসলে বাতাসের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। দুই দিন ধরে অনেক গরম পড়ছে। বাতাসের দিকও ঠিক যেদিকে থাকার কথা সেদিকে নেই। আমার কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক লাগছে। আপনার কী মনে হচ্ছে?'

শেইরন উঠে দাঁড়ালেন, বাতাসের দিকটা একটু পরখ করলেন, তারপর তাকালেন সূর্যের দিকে। নিজের হাতের অনাবৃত চামড়ায় সূর্যের তেজ পরীক্ষা করলেন কিছুক্ষণ। তারপর ফিরলেন প্রধান নাবিকের দিকে, 'তুমি ঠিকই সন্দেহ করছো। অস্বাভাবিক আচরন করছে প্রকৃতি। আর প্রকৃতি কখন অস্বাভাবিক আচরন করে?'

এবার ভয়ে ভয়ে বলে উঠলেন প্রধান নাবিক, 'যখন প্রকৃতি নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে চায়। তার মানে আপনি বলতে চাইছেন'

'হ্যাঁ, একটা বড়োসড়ো ঝড় আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তুমি এসে ভালোই করেছ। নইলে একটু পরে আমিই তোমাকে ডেকে পাঠাতাম। তোমার নাবিকদের তৈরি থাকতে বলো। এই ঝড়ের সাথে যুদ্ধ করতে চাইলে শরীর আর মনের সম্পূর্ণ শক্তির দরকার হবে।'

প্রধান নাবিক চলে গেল হনহন করে। শেইরন সমুদ্রের জলে সূর্যের আলোর তীব্রতার দিকে তাকিয়ে আছেন।

রুদ্রদেব আর অসিত সব কথাই শুনতে পেয়েছে এতক্ষণ। দুজনেই মিশরীয় ভাষায় কথা বলাতে তেমন কিছুই বুঝতে পারেনি তবে 'সামুদ্রিক ঝড়' কথাটা যে তারা বেশ কয়েকবার উচ্চারণ করেছে তাতে অসিতের কোনো সন্দেহ নেই।

মাজিদের প্রশ্নটা শুনে রাহুর হতভম্ব হয়ে যাওয়াই উচিত, তাইই হলো সে। তবে পরক্ষণেই সামলে নিলো নিজেকে, 'কী বললে! আমি মেরেছি বাসিলকে? হঠাৎ করে এসব কি উল্টাপাল্টা কথা!'

'শোনো রাহু', মাজিদের গলা বেশ শান্ত এখন, 'আমার কাছে অস্বীকার করে কোনো লাভ হবে না। তোমার কী মনে হয়? বাসিলকে অন্য কেউ কেন মারবে? ওর কাছে তেমন কিছুই ছিল না যার জন্য কোনো ডাকাত তার প্রতি আকৃষ্ট হবে।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে। তার কাছে কী ছিল না ছিল সেসব তো আমার চেয়ে তোমারই ভালো জানার কথা। কিন্তু আমি ওকে কেন মারতে যাবো?'

'তোমার কাছে বাসিলকে মারার যথেষ্ট কারণ ছিল। বাসিলের কাছে মূল্যবান কোনো কিছু ছিল না ঠিক আছে কিন্তু তোমার কাছে তো ছিল। হয়তো বাসিল সেই জিনিসের জন্য তোমাকে আক্রমণ করেছে আর তুমি নিজেকে আর নিজের সম্পত্তি বাঁচাতে বাসিলকে মেরে ফেলেছ।'

'এমন কিছুই হয়নি', রাহুর গলার জোর একটু কমে এসেছে। সে একটা জিনিস বুঝতে পারছে না, বাসিলকে যে কেউই মারতে পারে, তাহলে তাকেই কেন সন্দেহ করছে মাজিদ? না-কি সে এই বন্দরে নেমে যাবার কথা বলতেই মাজিদের এই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

'আমার মনে হয় তোমার বানরকে ছিনিয়ে নেবার জন্যই তোমাকে আক্রমণ করেছিল বাসিল। আর প্রতি আক্রমণে সে মারা গেছে।'

আচমকা ব্যাপারটা মাথায় খেলে গেল রাহুর, সে বুঝতে পারলো কেন মাজিদ এতো নিশ্চিত, কঠিন হয়ে এলো তার গলা, 'তার মানে, বাসিলকে আমার পেছনে তুমিই লাগিয়েছ, তাই না?'

'তোমার মতো একজন বুদ্ধিমান লোক কীভাবে এই জিনিস এতক্ষণ বুঝতে পারোনি, সেটাই তো আশ্চর্যের। বাসিলের মতো একটা মদ্যপ বোকা নাবিক তোমাকে কেন শুধু শুধু আক্রমণ করবে? সে অঙ্গদের কদর কীভাবে বুঝবে? হ্যাঁ, আমিই পাঠিয়েছি বাসিলকে তোমার পেছনে। যাতে সুযোগ বুঝে তোমাকে মেরে অঙ্গদকে কেড়ে আনতে পারে। কিন্তু, উল্টো হয়ে গেছে পরিস্থিতি। এখন তোমার হাতেই মরেছে বাসিল।'

এবার আর অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। পুরো ব্যাপারটা প্রথম থেকেই জানে মাজিদ। শুধু জানেই না, সেই পুরো ব্যাপারটার কারিগর। রাহু বুঝতে পারলো সাবধানে খেলতে হবে। এই অঙ্গদকে সেও একজনের থেকে কেড়েই এনেছে। কতটুকু বেপরোয়া হয়েছিল তাও মনে আছে তার। অঙ্গদকে পাবার লোভে মাজিদও যে-কোনো পর্যায়ে নামতে পারে।

'তুমি এই জাহাজ থেকে নামতে পারবে না। সেই চিন্তা মাথা থেকে বে
ফেলে দাও। পালাবার চেষ্টা করেও লাভ নেই। এখন কাউকে জাহাজ থে
নামতে দেওয়া হবে না।'

'আমার সাথে কী করার পরিকল্পনা করছো তুমি?'

'পরিকল্পনা তো একটা করেছিলাম, সেটা তো কাজ করলো না। ত
অঙ্গদকে নিয়ে যে পরিকল্পনা করেছিলাম এখনো সেটাই আমার মাথায় আছে। ত
তখন কাজটা আমি একা একা করতাম আর এখন তোমাকে আমার সাথে রাখ
হবে।'

'অঙ্গদকে নিয়ে তুমি আবার কী পরিকল্পনা ঠিক করলে?'

'বলছি। তার আগে বলি, তুমি হয়তো ভাবছো, কেন তুমি যে হত্যাকারী
জানা সত্ত্বেও তোমাকে বন্দর রক্ষীদের হাতে তুলে দেইনি, তাই না?'

'সেটা আমি ভালো করেই জানি। তাতে হয়তো বাসিলের হত্যার একটা কি
হতো, কিন্তু তোমার স্বার্থ রক্ষা হতো না। কারণ আমাকে ধরে নেবার সাথে সা
আমার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করে নিত বন্দর কর্তৃপক্ষ। অঙ্গদ চলে যেতো অক্ষ
বন্দরের হাতে।'

'একেবারে ঠিক। দেখো, বাসিলের মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নেই।
তলোয়ার দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, তার জীবনের অন্তও তলোয়ার দিয়েই হ
বাসিলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার চিন্তা আমার মাথায় নেই।'

'অঙ্গদকে নিয়ে তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী সেটা কিন্তু জানতে পার
না। জানতে পারলে বলতে পারতাম তোমার সাথে থাকবো কি থাকবো না।'

'আমার সাথে না থেকে তোমার কোনো উপায় নেই। তবে আমার মনে হ
আমার পরিকল্পনা শুনলে তুমি আমার সাথে থাকতে রাজিই হবে।'

'তাহলে তো ভালোই।'

'আমার অঙ্গদকে নিয়ে পরিকল্পনাটা বলি। তোমার কাছ থেকে অঙ্গদকে কে
নেবার পর আমি নিজেও বাসিলকে মেরে ফেলারই পরিকল্পনা করেছিলাম।'

'সেটা আমি জানি। তোমার মতো লোক তেমন কাজই করবে।'

'মন্তব্যে আমার রেগে যাওয়া উচিত তবু আমি রাগছি না। সেই কোন ক
থেকে সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছি। আজ এখানে কাল সেখানে। জাহাজের নানা ক
দিয়ে এখন আর ব্যবসা করে পোষাচ্ছে না। ছুটাছুটি করাও এখন মন আর শ
মেনে নিচ্ছে না। আমি কিছুদিন ধরেই এক জায়গায় থিতু হবার চিন্তা কর
অঙ্গদকে দেখে সেই থিতু হবার মোক্ষম চিন্তা আমার মাথায় আসে। বাসিলকে দি
অঙ্গদকে হাতানোর কাজে তো ব্যর্থ হলাম। এখন অঙ্গদের মালিককেই দ
ভেড়াবো বলে চিন্তা করছি।'

'অঙ্গদকে দিয়ে তোমার কী কাজ করার ইচ্ছে? রোজগারটা করবে কী করে?'

'তুমি যেভাবে রোজগার করবে ভাবছিলে সেভাবেই করবো। দেখো, ওদিকে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা শুরু হয়েছে। সেখানে গিয়ে এখন বিশেষ সুবিধা করতে পারব না। আমাদের এদিকেই তোমাকে থাকতে হবে। তাই আমার সাথে কাজ করলেই ভালো করবে। আমিও যে-কোনো একটা বন্দরে থিতু হবো। জাহাজ বিক্রি করে দেবো। তারপর নতুন একটা বিয়ে করে সুখে শান্তিতে ঘর সাজাবো। অঙ্গদকে প্রদর্শন করে ভালোই আয় হবে।'

মাজিদের গলায় আর চোখেমুখে আগত ভবিষ্যতের স্বপ্নের ছাপ। কিন্তু নিজের সবচেয়ে বড়ো সম্পদের ভাগ কেন দেবে রাহু। সে কিছুতেই রাজি হবার কথা না, 'কিন্তু আমি যদি তোমার কথা না মানি?'

'সেখানে তোমার দুটো কাজ করার আছে। এই জাহাজ থেকে নেমে যাওয়া। সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে ধরিয়ে দেবো বন্দরের প্রহরীদের কাছে। অঙ্গদ হাতছাড়া হয়ে যাবে ঠিক, কিন্তু তোমার যাতে অবস্থা খারাপ হয় সেই ব্যবস্থা আমি করবো। তোমার পোশাকে এখনো খুঁজলে রক্তের চিহ্ন পাওয়া যাবে। দুয়েকটা ফোঁটা তো এখনই আমার চোখে পড়ছে। তুমি বাঁচতে পারবে না।

আর যদি তুমি এখন জাহাজে থাকো আর পরে বেঁকে বসো, তাহলে নাবিকদের আমি বলে দেবো যে বাসিলকে তুমিই হত্যা করেছ। তুমি তো ভালো করেই জানো, নাবিকদের একজনের সাথে আরেকজনের কী সম্পর্ক। সেক্ষেত্রে নাবিকেরা তোমাকে ছিঁড়ে ফেলবে। ওদেরকে কিছু বকশিশ দিলেই অঙ্গদকে আমার হাতে ছেড়ে দেবে ওরা। অথবা অঙ্গদকে বিক্রি করে ভালো পরিমাণ টাকা লাভ করতে পারবো। তবে তোমার এবং আমার জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে প্রথম পথটা। একজন যদি আরেকজনের অংশীদার হয়ে যাই। হাঁসের স্বর্ণ ডিমের লোভে একবারে হাঁস হত্যা করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

রাহু বুঝতে পারছে এই ঝামেলা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে না। মাজিদ তাকে ছেড়ে দেবে না। এখন মাজিদের ব্যবস্থায় রাজি হয়ে যাওয়াই ভালো। শ্বাস থাকলে আশও থাকবে, রথ থাকলে পথও পাওয়া যাবে। রাহু একটা বড়ো নিঃশ্বাস নিয়ে হাল ছেড়ে দেবার ভান করলো, 'ঠিক আছে। আমি তোমার সাথে অংশীদার ব্যবস্থা করতে রাজি। তবে অঙ্গদের আয়ের অর্ধেক অর্ধেক ভাগ হবে।'

'হ্যাঁ। তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে কিছুতেই অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা কোরো না। আমার এই উপদেশটা মেনে চলবে আশা করি। আমার শরীরে বেদুইনের রক্ত বইছে। বিশ্বাসঘাতকদের আমরা একদমই পছন্দ করি না।'

ভেবে দেখলাম আমারও এতে ভালোই হবে। বেরেনিকে বন্দরে একজন চেনা জানা লোক থাকলে পসার জমাতে সুবিধাই হবে।'

তাহলে এটাই আমাদের চূড়ান্ত চুক্তি।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে হাত মেলাও', নিজের ডান হাত বাড়িয়ে দিলো মাজিদ। রাহ্‌
বাড়িয়ে দিলো নিজের হাত। হাত মেলানো শেষ হতে দুজনে অংশীদার হবা
নজির হিসেবে আলিঙ্গনও সেরে নিলো।

দুজনের বুক একে অপরের সাথে মিশে আছে। কিন্তু দুজনেই জানে বিপ
তাকে একটুও বিশ্বাস করবে না। মানুষের দাঁতে যে অদৃশ্য বিষ থাকে, সুযো
পেলেই তারা একে অপরকে সেই বিষ দাঁত ফুটিয়ে দেবে।

উৎসবের কোনো বাঁধাধরা নেই এখানে। ঈশ্বর আগেই না-কি মানুষের ভাগ্য লিখে দেন। এদের ভাগ্যে চিরকালই উৎসব আর আনন্দ লেখা। অন্যদিকে এই উৎসবের মাঝেও দাসেদের থাকতে হয় তটস্থ হয়ে। এমনিতে হয়তো ভুল করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে, কিন্তু এসব সময়ে ভুল করলে পেতে হয় চরম শাস্তি। কোনো মালিকই তার বাড়িতে অন্য অভিজাতদের সামনে নিজের অপমান মেনে নিতে পারেন না। আসলে ব্যাপারটা শুধু যে হেলটদের ভুল করাতে সীমাবদ্ধ তা নয়। অভিজাতকে অন্যদের সামনে নিজের মেজাজ দেখাতে হয়, প্রভাব দেখাতে হয়। আর বিনা কারণে অথবা প্রায় তুচ্ছ কারণে হেলটদের মারধর করার চেয়ে এই উদ্দেশ্যের জন্য মানানসই কাজ খুব কমই আছে।

পায়াসের স্পার্টার গভর্নর প্রাসাদে আজ বিশাল উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। কোনো বিশেষ উপলক্ষ যে এতে আছে তা নয়। মাঝেমাঝেই এমন উৎসবের আয়োজন করতে হয়। এতে যারা অনুগত হয়ে আছে তাদের আনুগত্য বাড়ে, আর নতুন নতুন অনুগত দলেরও সৃষ্টি হয়। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে হলে ক্ষমতার সাথিদের তোয়াজ করতে হয়।

পায়াস এতক্ষণ আসরের মধ্যমণি হয়ে ছিলেন। মুখে একটা স্মিত হাসি থাকলেও মনে মনে বেশ চিন্তিত তিনি। সেদিন রাতে যে আগন্তুক এসেছিল সে বেশ বিপজ্জনক কথা বলে গেছে। তার আসন মুহূর্তে টলমল করে উঠতে পারে তেমন কিছু ঘটলে। এই উৎসব আয়োজন করার পেছনে সেই আগন্তুকেরও কিছুটা ভূমিকা আছে। আজ সব অভিজাতরাই এখানে আছেন। তাদের সবার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সবার মনোভাব একটু একটু বোঝার চেষ্টা করছেন তিনি। এখন পর্যন্ত যদিও কেউই তেমন কিছুই করেনি, কিন্তু এদের মধ্যেই কেউ হতে পারে তার শত্রু, এদের মাঝেই হয়তো কেউ কেড়ে নিতে চাচ্ছে তার স্বর্ণ সিংহাসন। সেটা তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না।

এতক্ষণ ঘরের শ্রী এই উৎসব প্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন না। অথিতিরা মাঝে মাঝেই সেই কথা বলে উঠছিল। কিছু অভিজাত নিজেদের সহধর্মিণীদের নিয়ে এসেছেন। পায়াসের স্ত্রী এখনো আসেননি বলে তারাও একটু অস্থির বোধ করছেন। পুরুষদের দলের মধ্যে নিজেদের একটু অপাংক্তেয় মনে হচ্ছে।

তখনই ঘোষক নিজের বিশাল ঘন্টা বাজিয়ে দিলো। তীক্ষ্ণ সেই শব্দে উৎসবের কোলাহল থেমে গেল। উল্লাসরত আমন্ত্রিতদের মাঝে এতক্ষণ হেলট পরিচারকেরা বেশ সাবধানে ধীর পায়ে চলাচল করছিল। এই ঘন্টার শব্দে তাদের চলাফেরা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। যে যার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো।

ঘরে যে রমণীরা আছেন তারা কোনো অংশে কম নয়। তবে কোনো সম্মিলি ফুলের সাজিতে ফুটন্ত পদ্ম যেমন অন্য সব ফুলের অবস্থান ম্লান করে দিত পারে ঠিক সেই কাজটাই করলেন সদ্যাগতা। সবাই মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে বরণ করে নিলেন প্রাসাদের রানীকে। পায়াস এগিয়ে গিয়ে ধরলেন স্ত্রীর হাত।

সবাই এবার কিন্তু দৃশ্যটা পছন্দ করতে পারলো না। এতক্ষণ পায়াসের স্ত্রী টায়রা একা ছিলেন। তার সৌন্দর্য উপভোগ করছিল সবাই, এমনকি নারীরাও। যখনই পায়াস গিয়ে সঙ্গ দিলেন তখনই সবার মনে পড়লো যেন এই লোকই এই নারীর স্বামী। পায়াস আর টায়রার ব্যাপারটা মেনে নেয়া একটু কষ্টকরই বটে। একটু বেশি বয়সেই বিয়ে করেছেন পায়াস। যৌবনে যদিও শরীরের চর্চায় আর একটু আধটু দৌড়ঝাঁপে শরীরের গঠন একটু ঠিক ছিল, কিন্তু বয়স বাড়তে সেসব গেছে। এখন বয়সের তুলনায় তাকে বেশিই বুড়ো লাগে। সমর প্রশিক্ষণে তিনি নিয়মিত নন দেখে শরীর যেন একটু ঝুলে পড়েছে ইদানীং, পেট বুকের সীমা পেরিয়ে সামনে এগিয়ে আসতে চাইছে, মুখে দেখা দিয়েছে বলিরেখা। তিনি যথেষ্ট প্রসাধন নিয়ে এসেছেন উৎসবের প্রাঙ্গনে, কিন্তু বর্ষার জলের স্রোত কি আর কাঁদা দিয়ে আটকানো যায়।

তবে যতই বেমানান হোক না কেন, এসব নিয়ে কেবল মনে মনেই মনোভাব প্রকাশ করা যায়। বাইরে মুচকি হাসাও চলবে না। প্রাসাদের মালিক আর মালকিন একত্রিত হয়ে সবার মধ্যমণি হয়ে দাঁড়ালেন। চুম্বন করলেন একে অপরকে। সবাই এবার হাততালি দিয়ে উঠলো। উৎসব এবার যেন এগিয়ে যাচ্ছে পূর্ণতার দিকে।

টায়রা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন অন্য মহিলাদের মাঝে। মহিলারা তাকে আসতে দেখেই নিজ নিজ স্বামীদের ছেড়ে এক জায়গায় জড়ো হয়েছেন। এখন তাদের একান্ত নিজস্ব কিছু সময় কাটবে। স্বামীদের শাসন আর ভ্রুকুটি সেখানে থাকবে না।

স্ত্রীর জন্য নিজের কাজে ঢিল দিয়েছিলেন পায়াস। এবার সেটাতে আবার ফিরে গেলেন। তার চোখ বেশ সাবধানে ঘুরছে বেশকিছু অভিজাতের ওপর। কারো মুখে কোনো ছায়া এখন পর্যন্ত অবশ্য দেখা যায়নি। কে হতে পারে বিশ্বাসঘাতক? কে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে তার? কে করতে চাচ্ছে স্পার্টার ক্ষতি?

অভিজাতদের মাঝে অ্যালেস্টরও এসেছেন। নিমন্ত্রিত হলে পায়াসের প্রাসাদে আসতেই হবে। কোনোভাবেই নিজের মনের বিদ্বেষ পায়াসের সামনে উপস্থিত হতে দেওয়া যাবে না। আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে মনে একটু দ্বন্দ্ব আছে অ্যালেস্টরের। কেমন যেন সব মেকি মেকি মনে হচ্ছে। নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে যথেষ্ট মেনে চলেন তিনি। আর সেটাই তাকে আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সাবধান থাকতে বলছে। অবশ্য তিনি আর তার সাথিরা এসব নিয়ে বেশ আগে থেকেই সচেতন। এখানে কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না, যেন তেমন করে কেউ কাউকে

চেনেই না। শুধু একই নগরে একই সম্মান নিয়ে চললে যতটুকু কথা হয়, দেখা হয় ততটুকুই।

নিজের স্ত্রী চলে আসায় এখন একটু যেন জোর পেয়েছেন পায়াস। এবার আজকের উৎসবের কাজগুলো শুরু করা যায়। কাজ তো আর কিছুই নেই, শুধু খাওয়া আর পান। বড়ো ঘরের ঠিক মাঝে রাখা টেবিলের ওপরটা উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। একটু নিম্নমানের অভিজাতরা তার অপেক্ষাতেই ছিল। একটু আধটু দ্বিধা যে তারা করলো না তা নয়, তবে সেসবই লোক দেখানো ভদ্রতা। তারা অভিজাত হলেও মাংস কেবল এসব উৎসবের সময়ই পাওয়া যায়। স্পার্টার চারিদিকে সমুদ্র থাকায় মাছই তাদের প্রধান খাদ্য। আজকে এই টেবিলে বেশকিছু মাংসের পদ দেখা যাচ্ছে। পুড়ে লাল হয়ে আছে। যেন একেবারে লোভের রং। জিভ বের করে লকলক করে ডাকছে তাদেরকে।

টেবিলের প্রত্যেক আসনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন করে হেলট। কিছু মেয়ে হেলটও আছে। তাদের টেবিলের ওপরের খাদ্যের দিকে তাকাতেও মানা। আস্তে আস্তে সবগুলো আসন ভরে উঠলো। শুধু গভর্নর, তার পরিবার আর বিশেষ অভিজাতদের জন্য রাখা কিছু আসন বাদে। সেগুলো একটু পরেই অবশ্য ভরে উঠবে।

টেবিলে বসা সবার দিকে সাবধানে লক্ষ্য করছেন পায়াস। একদিকে তার স্ত্রী অন্য অভিজাতদের স্ত্রীদের মধ্যমণি হয়ে বসেছেন। নিজের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই হলো তাকে। এখন আর স্ত্রীর পাশের আসনে বসতে ইচ্ছে করে না তার। ইচ্ছে করে না বললে ভুল হবে। আসলে অভিজাত সম্মানে বেমানান আঘাত লাগানোর কোনো ইচ্ছে তার নেই।

টায়রা ওদিকে বসেছেন অন্য অভিজাত নারীদের সাথে। তাদের মধ্যে টায়রার পাশে বসার একটা প্রতিযোগিতা চলছে। তারা টায়রার মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করছে সর্বত ভাবে। কোনো না কোনোভাবে গভর্নরের স্ত্রীর সুদৃষ্টি পেতে হবে। নারীদের জন্য সবচেয়ে অপছন্দের কাজ আরেক নারীর রূপের প্রশংসা করা। সেই কাজটাই এখন করছে সবাই মিলে।

সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার নিজের কাজে মন দিলেন পায়াস। টেবিলের দিকে নজর দিতেই দেখলেন সর্বোচ্চ অভিজাতদের আসনগুলোর মধ্যে একটা আসন খালি। কেউ একজন এখনো এই ভোজ সভায় যোগ দেননি। কে তিনি?

সেই লোকের খোঁজে তার দৃষ্টি এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেলেন তিনি। পানস্থানের একটু পাশে নির্জনে একটা পান পাত্র হাতে এদিকেই তাকিয়ে আছেন সেই লোক। এগিয়ে গেলেন পায়াস, 'আপনি

রূপ কীভাবে হবে?'

' একটু থতমত খেলেন পায়াস,

...সেদের বিদ্রোহের কথা বলেছেন তো?

...একটু বেড়েছে। তবে তারা কেবল দস্যুবৃত্তি করেই

...শক্তিশালী গভর্নরের তো সেটা নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু

পায়াস সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না, অভিজাতদের বি...

...হবে কি না। তিনি একটু কৌশলে খেলতে চাইলেন,

...। কিন্তু আমার চিন্তা অভিজাতদের নিয়ে। তারা য...

...বসে?'

'অভিজাতরা কী করবে আপনার বিরুদ্ধে?' বুকের ...

...রের।

'না, আমিই প্রথম রোমানদের নিয়োগ করা গভর্ন...

...। আপনার কাছে বলে একটু হালকা হতে পার...

...আমাকে পছন্দ করেন?'

'হ্যাঁ। পছন্দ না করার কী আছে? আপনি ...

...করেন।'

'তবু চিন্তা করে দেখুন, আমার আগে রো...

অভিজাতদের কেউই কাজ করতো। আমি আপ...

কোনো কোনো অভিজাতের আমার প্রতি বিদ্বেষ...

'সেটা স্বাভাবিক। আপ...

...করতে পা...

...

দেখছি এখনো টেবিলে বসেননি। আজকের খাবার তালিকা কিন্তু বেশ লম্বা। আর আমার বাবুর্চিদের প্রশংসা এই নগরের সবাই করে।'

'খাদ্য সুস্বাদু তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু, রুচি বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। আজকে কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। এসব খাবারে আমার কেমন যেন বদহজম হয়।'

অ্যালেস্টরের গলার স্বর অনেকটা গম্ভীর। এই তীব্র ব্যক্তিত্বের সামনে পায়াস তেমন একটা সুবিধা করতে পারলেন না। এই লোকটাকে সবসময় ভয় করেন তিনি। স্পার্টার অভিজাত মহলে কেউ তার কথা ফেলতে পারে না। তিনি এই নগরে রোমানদের নিয়োগ করা গভর্নর হতে পারেন, কিন্তু প্রভাবে ওনার সাথে পারেন না।

আচমকা সেদিন কালো পোশাকে আসা চরের কথা মনে পরে গেল তার। এই নগরের কোনো না কোনো বিদ্রোহী এই অভিজাতদের মধ্যেও থাকতে পারে। স্বাধীনতা কামনা করতে পারেন তারা। সেই চিন্তা এতদিন তার মাথায়ও আসেনি। আর কোন অভিজাত যদি এমন কোনো পদক্ষেপ নেয় তাহলে সেটা অ্যালেস্টর জানবেন না তা হতেই পারে না। এই লোককে যেভাবেই হোক দলে রাখতে হবে। তবে সমস্যা হচ্ছে এই লোকের কোনো লোভ নেই। আর যে মানুষের লোভ নেই তাকে কিনতে পারা খুবই কঠিন।

একটা পাত্র নিয়ে অ্যালেস্টরের পাশেই বসে পড়লেন পায়াস, 'আমারও ইদানীং এসব খাবারে তেমন রুচি নেই। মদ মাংসে এখন আর আগের মতো তৃপ্তি পাই না।'

'সেটাই স্বাভাবিক। আমার বয়স হয়েছে। আপনার বয়স হচ্ছে। এসব সময়ে ভোগের ব্যাপারগুলো কমে যেতে থাকে। আর সেই সাথে বেঁচে থাকার ইচ্ছেও।'

'হ্যাঁ। আপনার কথাই ঠিক।' কথাটা কীভাবে বলবেন তা ঠিক করতে পারেন না পায়াস। সেই কালো পোশাকের দূতের কথা কিছুতেই বলা যাবে না, 'আমার মনে হয় স্পার্টার সুসময় পেছনে পড়ে গেছে। সামনে কিছু বিপদের আশঙ্কা করছি আমি। আপনার কী মনে হয়? স্পার্টার অবস্থা কী?'

অ্যালেস্টর জানেন, স্পার্টার সুসময় অনেক আগেই পেছনে চলে গেছে। রোমানদের আগমনের সাথে সাথেই। এই যে অভিজাতরা লাল পোড়া মাংসে মজে রয়েছে এটা সেই দুঃসময়েরই একটা লক্ষণ মাত্র। তবে এবার সাবধান হলেন তিনি। নিজের দলকে নিয়ে ভয় পাচ্ছেন না তিনি। তাদের খোঁজ বের করা একমাত্র কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না করলে সম্ভব না। আর তিনি জানেন ঐ দলে বিশ্বাসঘাতকতা করার মতো কেউ নেই।

'আপনি কোন সুসময় চলে যাবার কথা বলছেন? সামনে তাকিয়ে দেখুন। কি অবলীলায় সবাই ভোজন করছে। আমাদের পুরঃনারীরা কেমন সুখে আছে। তাহলে সময় খারাপ কীভাবে হবে?'

'না' একটু থতমত খেলেন পায়াস, 'আমি আসলে বিদ্রোহ নিয়ে চিন্তিত।'

'দাসেদের বিদ্রোহের কথা বলেছেন তো? সেটা তো চিরদিনই ছিল। এখন কেবল একটু বেড়েছে। তবে তারা কেবল দস্যুবৃত্তি করেই সন্তুষ্ট থাকবে। আপনার মতো শক্তিশালী গভর্নরের তো সেটা নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই।'

পায়াস সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না, অভিজাতদের বিদ্রোহ নিয়ে কিছু বলা উচিত হবে কি না। তিনি একটু কৌশলে খেলতে চাইলেন, 'দাসেদের বিদ্রোহ তো আছেই। কিন্তু আমার চিন্তা অভিজাতদের নিয়ে। তারা যদি আমার বিরুদ্ধে কিছু করে বসে?'

'অভিজাতরা কী করবে আপনার বিরুদ্ধে?' বুকের ভেতরে ধরাস করে উঠেছে অ্যালেস্টরের।

'না, আমিই প্রথম রোমানদের নিয়োগ করা গভর্নর কি না, তাই এমনটা মনে হচ্ছে। আপনার কাছে বলে একটু হালকা হতে পারছি। শাসক হিসেবে কি আপনি আমাকে পছন্দ করেন?'

'হ্যাঁ। পছন্দ না করার কী আছে? আপনি তো আপনার সব কাজই ভালো মতোই করেন।'

'তবু চিন্তা করে দেখুন, আমার আগে রোমান গভর্নর হিসেবে আপনাদের অভিজাতদের কেউই কাজ করতো। আমি আপনাদের অভিজাত দলের কেউ নই। কোনো কোনো অভিজাতের আমার প্রতি বিদ্বেষ থাকা স্বাভাবিক না?'

'সেটা স্বাভাবিক। আপনাকে কেউ না কেউ উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন বলে মনে করতে পারে। তবে তাতে আপনার তো কিছুই যায় আসে না। আপনি ভালোই রাজ্য চালাচ্ছেন। আর সবাইকে রেখেছেন আনন্দে। কেউই আপনার বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু করবে বলে মনে হয় না। কারো মনের লুকানো বিদ্বেষ নিয়ে আপনার ভাবা উচিত বলে আমি মনে করি না।'

কথাটায় একটু হলেও যেন স্বস্তি পেলেন পায়াস। অ্যালেস্টর যেহেতু বলেছে অভিজাতরা তার সাথে তেমন কোনো শত্রুতা পোষণ করছে না, তাই এদিক দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হওয়াই যায়। তবে চরেরা চলে এলে ওদেরকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে, 'আমাকে একটু ছাড়তে হবে যে। একটু ওদিকে যাবো। আর আপনি চাইলে কিন্তু এই নগরে রোমান সেনার অধ্যক্ষের পদটা এখনো খালি আছে। আগেও আপনাকে আমি এই প্রস্তাবটা দিয়েছি।'

'আমার বয়স হয়ে গেছে গভর্নর। আমি এখন আর এসব ভারী কাজের উপ
নই। আপনার আগের প্রস্তাবের মতো এই প্রস্তাবও আমি বিনীতভাবে প্রত্যা
করলাম।'

পায়াস উঠে গেলেন। অ্যালেস্টর একটা ছোটো চুমুক দিলেন পানপা
রোমান সেনার অধ্যক্ষ হলে অবশ্য তার মূল কাজের সুবিধাই হয়। তবে সেটা হ
বিশ্বাসঘাতকতা। সেটা তিনি করতে পারবেন না। যখন সময় আসবে ত
শত্রুদের মাথাগুলো তিনি সরাসরিই ফেলে দিতে পারবেন। এই ক্ষমতা ত
আছে।

ওদিকে খাবার টেবিলে ততক্ষণে কাণ্ড হুলুস্থুলের দিকে যাওয়া শুরু করে
এতক্ষণ সবার সামনের পাত্রগুলোতেই খাবার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এখন সে
পরিমাণ কমে এসেছে কিন্তু সবার পেটে ক্ষিধে এখনো ভালোই। এবার অন্য
পাত্রের দিকে হাত বাড়ানোর পালা। সেই কাজটাই হইহল্লা করে করছে সবা
শুধু হেলটেরা দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে, অনড়।

তখনই খাবার টেবিলের পুরুষদের বিশেষ করে যাদের বয়স এখনো মধ্যব
পৌঁছায়নি তারা একটু থমকে যেতে বাধ্য হলো। একটু বেশি বয়স্করাও যে সে
প্রভাব থেকে বেঁচে গেল তা নয়। কারো মুখের আধপোড়া মাংস অর্ধেক ছিন্ন হ
ঠোঁটে ঝুলে রইলো। কেউ কেউ নিজেদের মুখের খাবার তাড়াতাড়ি চালান ক
দিলো মুখটা স্বাভাবিক করার জন্য, কেউ বা সেই একই কাজ করতে গিয়ে উ
বিষম খেলো।

উৎসবের কামরায় তখন প্রবেশ করেছে নিক্স, গভর্নর পায়াসের একম
কন্যা। নিজের মায়ের রূপ পুরোটা তো পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহই নে
তবে তার ওপরে তার চোখে আছে অমোঘ টান, বহুদূর থেকেও সেই তীর
কারো বুকে বিদ্ধ হতে পারে, তলোয়ারের মতো শরীরের কথা তো বলাই বাহুল

নিক্সকে দেখে খাবার টেবিলের কোলাহল একেবারে কমে গেছে। এই উৎ
নিক্স যে এভাবে একেবারে সভা মধ্যে চলে আসবে সেটা কেউই জানতো ন
চমক হজম করতে একটু সময় লাগলো।

নিক্স এগিয়ে গেল মায়ের দিকে। টায়রা একটু বিরক্ত হয়েছেন, 'তুমি আ
এখানে কী করছো?'

'জানি মা, এখানে আসা উচিত হয়নি। তবে খিদে লেগেছে বলেই এলা
একটু মাংস খেতে ইচ্ছে করছিল।' নিক্স এগিয়ে গেল খাবার টেবিলের দি
পেছনে পড়ে রইলো মায়ের ভ্রুকুটি। পুরুষেরা এবার আবার ঢোক গিলতে ব
হলো। নিক্স ঘরের পোশাকেই চলে এসেছে। স্বল্প বসনা নিক্সকে তাতে একটু
বেমানান মনে হচ্ছে না।

টেবিলের কাছে গিয়ে একজন হেলটকে একটু ইশারা করলো সে, 'আমার জন্য এই মাংসের পাত্রটা তুলে নাও। তারপর পিছু পিছু আসো।'

মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে, 'আর রাগ করতে হবে না মা। আমার কাজ শেষ। এখুনি বাধ্য মেয়ের মতো ভেতরে চলে যাচ্ছি।'

নিক্স যে বাধ্য মেয়ে না এটা তার মা ভালো করেই জানে। যাক ভেতরে, এই মেয়ে যতক্ষণ এখানে থাকবে ততক্ষণ বিব্রত হয়েই থাকতে হবে, 'আচ্ছা মা, ভেতরে যাও। এরপর কিছু লাগলে লোক পাঠিয়ো, কেমন?'

নিক্স আর কোনো কিছু না বলে ভেতরে চলে গেল। সভা কক্ষের পুরুষেরা যেন এতক্ষণে একটু বুক হালকা করে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলো।

নিক্স ভেতরে চলে এলো। সে ইচ্ছে করেই গিয়েছিল সভা কক্ষে। সবাইকে চমকে দিয়ে একটা চমৎকার কাজ হয়েছে। নিজের ঘরে চলে এলো সে। পেছনে পেছনে হুকুম তামিল করছে সেই হেলট।

তখন হেলটের দিকে এক নজর দেখেছিল। এখন ভালো করে দেখলো সে। নিশ্চয়ই আগে মাঠে কাজ করতো, নইলে শরীর এত সুগঠিত কেন হবে। আদেশ বেরিয়ে এলো নিক্সের গলা দিয়ে, 'এখানে মাংসের পাত্রটা রাখো।'

আদেশ পালন করলো দাস। নিক্সের বিছানার পাশের একটা ছোটো চৌপায়াতে নামিয়ে রাখলো পাত্র।

নিজের বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়লো নিক্স। এক অত্যন্ত টানে নিজের দেহকে বসন মুক্ত করলো, 'ঐ টেবিলের ওপর থেকে তেলের বোতলটা নিয়ে এসো। তার আগে তোমার হাতটা ধুয়ে নেবে।'

আদেশ পালিত হলো, 'এবার তুমি আমার শরীরটা মালিশ করে দেবে। পারো তো? অবশ্য না পারলেও ক্ষতি নেই। করতে করতে শিখবে। নাও শুরু করো।'

হেলট তার কাজ শুরু করলো। পাত্র থেকে এক টুকরো মাংস নিয়ে মুখে দিলো নিক্স। মসলা আর মরিচের স্বাদ তার জিভে আগুন ধরিয়ে দিলো যেন। আর সেই সাথে হেলটের তৈলাক্ত গরম হাত ধরিয়ে দিয়েছে শরীরে আগুন। কামের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল সে সাথে সাথে। হিসহিসিয়ে উঠলো তার গলা, 'আরও জোরে হাত বোলাও।'

যুবক হেলট নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না। এমন দেবভোগ্যা শরীর সে এত কাছ থেকে আগে দেখেনি। তবে সে এও জানে সামান্য একটু ভুল তার প্রাণ কেড়ে নেবে। তবে নিক্সের কাম চরমে উঠেছে। একটু পরেই এলো হেলটের জন্য এলো সুসংবাদ, 'বিছানার ওপরে উঠে এসো তুমি। আর হ্যাঁ, গায়ে যেন একটু কাপড়ও না থাকে।'

সেতু শুধু কোনো জলাধারের মধ্যের দুই পাড়কে একত্র করে না, মাঝে মা সময়ের মধ্যেও যোগাযোগ ঘটায়। আজ সেই সেতু তৈরি হবার দিন ন উদ্‌বোধন হবার দিন। স্পার্টার আগ্রহী লোকজন বেশ উৎসাহ নিয়ে ভিড় জমিয়ে বড়ো ঘরটায়। চারিদিকে বসবার আসনগুলো অনেক আগেই পূর্ণ হয়ে গেছে। ত লোক আসার বিরাম নেই। ভাব দেখে মনে হচ্ছে একটু পরে দাঁড়িয়ে থাক হলেও রীতিমতো শারীরিক শক্তির পরিচয় দিতে হবে।

আজ এই নগরের মানুষের জন্য একটা বিশেষ দিন। এই দিনটা যে বছ একবার আসে অথবা নিয়ম মেনে কয়েক বছর পরপর আসে তা নয়। এখা সময়ের চেয়ে যোগ্যতা প্রমাণের প্রশ্ন আসে আগে। যখন স্পার্টার গোপ সেনাদলের একটা অংশ নিজেদের জন্য বরাদ্দ রাখা সবগুলো পরীক্ষা শেষ ক তখন আসে এই সময়। সেই সেনাদের থেকে অভিজাত সেনা বাছাই করা হ আজকে। সেই অভিজাত সেনারা হঠাৎ করেই নিজেদের আবিষ্কার করবে চরম সৌভাগ্যবান হিসেবে। আচমকা তাদের হাতে চলে আসবে বৈভব, ক্ষম আয়েশের সব উপকরণ। ছোটোবেলা থেকে চরম চরম পরীক্ষা দিয়ে আসা ব্যক্তি আজকেই হয়ে উঠবে এই সমাজের হর্তাকর্তার একটা অংশ। মানুষ নিজে প্রভুদের নির্বাচিত হতে দেখতে ভালোবাসে। এই ঘরের গমগম করা ভিড় সে কথাই বলছে। তারা আজ নির্বাচিতদের দিকে তাকিয়ে থাকবে বুক ভরা ঈ নিয়ে, সাথে থাকবে কিছু দুঃখবোধ। তবে উত্তেজনা কিছুক্ষণ পরেই এসব অনুভূ ঢেকে দেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

চব্বিশ জন সেনাকে আজকে এখানে আনা হবে। এই ঘোষণা আগে থেকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রশিক্ষণ-পরীক্ষা দুইই শেষ হয়েছে। এবার কেব ফল ঘোষণার পালা। আর স্পার্টার মানুষ এই উপলক্ষকে উৎসবের উপলক্ষ বানিয়ে ফেলেছে। বাইরে অনেক বণিক খবর পেয়ে নিজেদের পসরা নিয়ে এসেছে সেখানে অনেকে ভিড় করেছে। একটু পরেই ঘরের ভেতর শোনা গেল ঢং ঘণ্টার আওয়াজ। ভেতরের শোরগোলের আওয়াজ যেন একটু কমে এলো বাইরের লোকজন বুঝতে পারলো ভেতরে অনুষ্ঠান শুরু হবার পথে। আর বাইরে থাকলে চলে না। তারা সবাই মিলে হুড়োহুড়ি করে ঢুকতে গিয়ে যে কাণ্ডে অবতারণা করলো তাকে কোনোরকম বিবেচনা ছাড়াই বিশৃঙ্খলা বলা যা সেনাদের রীতিমতো হাত লাগাতে হলো সেই ভিড় সামলাতে। ভেতরে এক সময় আর কেউ প্রবেশ করতে পারলো না। তার বদলে মোক্ষম জায়গা হ দাঁড়ালো জানালাগুলোর সামনে।

ঘোষক উঠে দাঁড়ালো। আবার ঘন্টার শব্দ হল বেশ জোরে। এবার সবাই মুখে কুলুপ আঁটল। যে যার জায়গায় কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোষকের কণ্ঠ বেশ জোরালো, 'আমাদের আজকের উৎসব শুরু হতে যাচ্ছে। এখন আমি মহামান্য গভর্নর পায়াসকে অনুরোধ করছি তিনি যাতে আজকের উৎসবের সূচনা করার অনুমতি দেন।'

উৎসবে সবাইকে ধাক্কাধাক্কি করতে হচ্ছে এমন না। বিশেষ অভিজাতদের বসার জন্য বেশ আরামদায়ক জায়গা আছে। সেই জায়গার ঠিক মাঝখানে নিজ পরিবার নিয়ে শোভা পাচ্ছেন পায়াস। তার স্ত্রী এবং কন্যার রুপ যথারীতি ঝলমল করছে। নিক্সের এসব উৎসব নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই। সে তার সদ্যযুবতী চোখে সবকিছুকেই দেখছে হালকা ভাবে। এই উৎসব আগে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি। তবে শুনেছে, এখানে না-কি স্পার্টার শ্রেষ্ঠ পুরুষদের দেখা পাওয়া যাবে। সেজন্য একটু উৎসাহ অনুভব করছে সে।

পায়াস উঠে দাঁড়ালেন। হাতের রুমাল উড়িয়ে দিলেন তিনি, সাথে মুখে বললেন, ' উৎসব শুরু করো।'

এত বড়ো ঘরে সেই ক্ষীণ গলার স্বর কেউই শুনতে পেলো না। কিন্তু ইশারা সবাই দেখতে পেয়েছে। দর্শকদের মধ্যে হর্ষধ্বনি উঠলো আবার।

এবার ঘোষক মধ্য মঞ্চের মাঝখান থেকে সরে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, 'এবার আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্পার্টার গর্ব সেই সব মহান যুদ্ধকলার শিক্ষকদের যাদের অবদানে এখনো দেবতাদের দান এই স্পার্টা থেকে হারিয়ে যায়নি। যারা এখনো সেই বিশাল বর্মের ভার বহন করে চলেছেন, যারা বহন করে চলেছেন আমাদের ঐতিহ্য তাদের চওড়া কাঁধে।'

এবারে দর্শকেরা হর্ষধ্বনি তেমন করলো না। তাদের আগ্রহ জমে উঠলো ঘরের মাঝের স্থানের দিকে। ঘোষক এবার আর কিছু বলল না। তার কাজ শেষ হয়েছে। এখান থেকে ক্রিস্টেয়ারের শিক্ষকেরাই অনুষ্ঠানের ভার সামলাবেন।

শিক্ষকেরা প্রবেশ করলেন একে একে। বারো জন বয়সে বৃদ্ধ কিন্তু যুবকসম শক্তিতে বলীয়ান শরীরের অধিকারী, ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে প্রবেশ করলেন তারা। যারা আগে কোনো ক্রিস্টেয়ারের শিক্ষক দেখেননি তাদের মুখ বড়ো হাঁ হয়ে গেল। এদেরকে তারা চেনেন, কিন্তু এই ভূমিকায় না। তাদেরকে সাধারণ মানুষ হিসেবে চিনলেও আজকে তাদের নতুন পরিচয় জানা গেল। গোপনীয়তা আজকে শেষ হয়েছে। আজ এই বারো জনের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বের অবসান হবে। নতুনের আগমন আর পুরানোর বিদায়ের সমন্বয় হবে আজ।

এবারে সবচেয়ে বড়ো চমকের অপেক্ষা। অনেক গোপনে ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নগরী থেকে। কারো কারো আত্মীয় স্বজন নেই, কেউ কেউ হয়তো জেনেশুনেই নিজের সন্তানকে এই পথে দিয়েছেন, কিন্তু কখনো প্রকাশ করেননি।

সেই গোপন মুখগুলো এই নগরের ছেলেদেরই মুখ। আর সেই মুখগুলোর রহস্য উন্মোচন হবে আজ।

বারো জন শিক্ষক তাদের জন্য নির্ধারণ করে রাখা আসনে গিয়ে বসলেন। তারপর একজন উঠে এলেন, ভাবে বোঝাই যাচ্ছে তিনিই এই বারোজনের মধ্যে নেতা গোছের, আর আজকে তাদের এতদিনের লালিত সম্পদ সবার সামনে উন্মোচনের কাজটা তিনিই করবেন।

গমগম করে উঠলো তার গলা, 'স্পার্টাবাসী, প্রথমে আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আজকে আমরা আপনাদের সামনে যোগ্য সেনাদের উপস্থিত করার জন্য সমবেত হয়েছি। তাদের কোনো প্রশংসা আমি করবো না, তাতে প্রকারান্তরে নিজেদেরই প্রশংসা করা হবে। আমাদেরকে ধন্যবাদ পরে আপনারা দেবেন। যখন সেই যোগ্য হাতগুলো আপনাদের নিরাপত্তা আর শাসনের ভার নেবে।'

অভিজাতদের মধ্যে বসে থাকা অ্যালেস্টরের মুখ যেন একটু কুঞ্চিত হলো এই কথাটা শুনে। কোনো স্পার্টান আর সহজে স্পার্টার শাসনের ভার নিতে পারবে না। এই কথাটা আসলে অনেকদিন থেকে চলে আসছে, এখনো বদলানো হয়নি। আর বদলানো হোক, এটা তিনি চানও না। এই উৎসব তার পরিচিত। সেই পুরানো ভঙ্গি, কোথাও একটুও বদল হয়নি। তিনি নিজেও এমন এক উৎসবের মধ্যে দিয়েই স্পার্টা অভিজাত সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তবে আজকের এই অনুষ্ঠান নিয়ে তার মধ্যে কম আগ্রহ নেই। কিছু শক্তিশালী সদস্য হয়তো কাজের জন্য জোগাড় হলেও হয়ে যেতে পারে।

ওদিকে শিক্ষকদের প্রধান তার কথা চালিয়ে যাচ্ছেন, 'এবার সময় এসেছে স্পার্টার ভবিষ্যৎ সামনে নিয়ে আসার। আমি এক এক করে তাদেরকে হাজির করছি।'

প্রথম যোদ্ধার নাম ঘোষণা করা হলো। সে এসে দাঁড়ালো সভাকক্ষের একেবারে মাঝখানে। পুরোপুরি যুদ্ধ সাজে আছে সে। যুবক দেহেই একেবারে পূর্ণ শক্তির পুরুষের গড়ন। আস্তে আস্তে এই শরীর একদিন অর্জন করবে দেবতাদের শক্তি। কোনো নড়চড় নেই সেই শরীরে, কিন্তু সেই অলস পেশিগুলোই যেন অচল থেকেই বুঝিয়ে দিচ্ছে নিজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা শক্তির ছন্দ। যেন এক স্ফুরণ হচ্ছে। দর্শকদের জন্য আর কোনো প্রভাবকের দরকার পড়লো না। ছাদ কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলো জমায়েত।

নিক্সের চোখে আগ্রহ যেন বাড়লো। আজকের এই উৎসবে আসার ইচ্ছে ছিল না তার। বাবার জোরাজুরিতে আসতে হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে এসে তেমন একটা ভুল হয়নি।

প্রথম সেনা এসে দাঁড়াতেই প্রধান শিক্ষক সেই যোদ্ধার ক্ষমতার পরিচয় দিলেন, 'বর্শায় এই যোদ্ধা আর সবার চেয়ে আলাদা। যে-কোনো লক্ষ্য হোক সে

স্তব্ধ অথবা ছুটন্ত, যেই গতিতেই চলুক, যেখানেই থাকুক, দৃষ্টির সীমায় থাকলে এই সেনা অবলীলায় সেই লক্ষ্য ভেদ করতে পারবে।'

দর্শকেরা বাহবা দিয়ে উঠলো। তারপর একে একে প্রবেশ করলো অন্য যোদ্ধারা, তাদের গুণের কথা একে একে প্রচারিত হলো। কোনো যোদ্ধাই একে অপরের চেয়ে কম না। অন্তত প্রথম দেখাতে তো পার্থক্য করার কোনো উপায়ই নেই।

ইভানের প্রবেশের সময় আসতেই তার নাম ঘোষণা করা হলো। অ্যালেস্টরের পাশে বসে থাকা ইনোনের কান এতক্ষণ এই নামটা শোনার জন্যই অধীর হয়ে ছিল। মনে যে তার একটু সন্দেহ ছিল না তা বললে ভুল হবে। ভেবেছিল হয়তো ইভান ওর মন রাখার জন্য নিজেকে অভিজাত সেনা হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল। তবে ইভানের দেহ গঠন আসলেই সেনাদের মতো। সে নিশ্চিত হলো এতক্ষণে। আর তখনই খেয়াল করলো তার এখন সভার মাঝখানের দিকে তাকাতে লজ্জা করছে। মনে হচ্ছে সে যে একটু পরে দুই চোখ মেলে ইভানকে দেখবে, সেটা এই ভিড়ের প্রত্যেকটা মানুষ বুঝতে পারবে। চোখ আপনাআপনি নেমে গেল তার। কিন্তু মন খুব বেশিক্ষণ সেই চোখকে নামিয়ে রাখতে দিলো না। বাধ্য হলো সে একটু পরেই চোখ তুলতে।

পুরুষ সিংহের মতো মাথা উঁচু করে সভা কক্ষে প্রবেশ করলো ইভান। তার গায়ে যুদ্ধ সাজ চমৎকার মানিয়েছে। সভার সবাই যেন এবার একটু বেশিই প্রশংসা প্রকাশ করলো। কারো কিছু বলে দিতে হলো না, সবাই বুঝতে পারছে এই যোদ্ধা বিশেষ কেউ, তবু ঘোষক তার ভূমিকা পালন করে গেল, 'এই যোদ্ধা সম্পর্কে বাড়তি করে আর কিছুই বলার নেই। সবাই যে-কোনো একটা অথবা দুটো অস্ত্রে দক্ষ হয়, কিন্তু এই যোদ্ধা সবরকমের অস্ত্রে সিদ্ধহস্ত। মল্লে কেউ তার সামনে দাঁড়াবার সামর্থ্য রাখে না। পৃথিবীর যে-কোনো সেনাকে ঘায়েল করে দিতে পারে এই যোদ্ধা।'

শেষ লাইনটার সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করলো ইনোন। ইভানের পরেই শেষ যোদ্ধা হিসেবে সভা কক্ষে প্রবেশ করেছে ওরিয়ন। তাকে চতুর এবং কুশলী বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডোরা কোনোভাবেই ওরিয়নের অভিজাত সেনা হবার কথা বিশ্বাস করেনি। বিশেষ অভিজাতদের পরিচারিকাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে সে বসেছে, সেখান থেকেই অবিশ্বাসের দৃষ্টি মেলে সে দেখছে ওরিয়নকে। ওরিয়ন অবশ্য অন্য সেনাদের মতো পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো না। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলো। ভাগ্যচক্রে এতজনের মধ্যেও তার নজর পড়লো ডোরার ওপর। একটু মৃদু হাসি বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে। ডোরার শরীর যেন জ্বলে গেল। এটাও এক ধরনের অপমান।

এবার উৎসবের পরের ধাপ শুরু হবে। যোদ্ধাদের পরিচয় দেওয়া শেষ। এখন তাদেরকে স্থান দেওয়া হবে। অভিজাত নানা শ্রেণিতে হবে যোদ্ধাদের স্থান। সবচে সেরা জন হবে মহা অভিজাত। বাছাই প্রক্রিয়ায় দর্শকদের আগ্রহ চরমে উঠছে। কেউ কেউ আবার বাজি ধরতে শুরু করেছে নানা যোদ্ধার ওপর। কে মহা অভিজাত হবে তাই নিয়ে হচ্ছে বেশির ভাগ বাজি।

এতক্ষণ যে শিক্ষক দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি এবার বসে পড়লেন। উঠে দাঁড়ালেন আরেকজন। দৃপ্ত তার ভঙ্গিমা, গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, ' এই চব্বিশ জন আমার খুবই পছন্দের ছাত্র। আমরা অনেক যত্ন নিয়ে ওদের শিক্ষা দিয়েছি, দেবতাদের শপথ, আমরা কখনো একটুও হেলা করিনি। তবে অতি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, এই চব্বিশ জনের মধ্যে ছয়জনকে আমরা প্রথম শ্রেণির অভিজাত ঘোষণা করতে পারছি না।'

এবার শোরগোল উঠলো দর্শকদের মাঝে। এই কথার মানে স্পষ্ট। তার মানে ওরা কোন একটা পরীক্ষায় পুরোপুরি কৃতকার্য হতে পারেনি।

দর্শকদের কৌতূহলের জবাবও চলে এলো, 'ওদেরকে শেষ যে কাজটা দেওয়া হয়েছিল তাতে এই ছয়জন ঠিকঠাক করতে পারেনি। ওদের ওপর আদেশ ছিল যাতে কাজটা করার সময় কেউ টের না পায় সেভাবে করতে হবে। কিন্তু এই ছয়জনের কাজ লোকে টের পেয়ে গেছে।'

দর্শকেরা কাজটা কী ছিল সেটা জানার চেষ্টা করলো না। জানে সেটা উনি কিছুতেই বলবেন না।

'ঐ ছয়জন প্রথম শ্রেণির অভিজাত হতে পারবে না। ওদেরকে হতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণির অভিজাত।'

উপস্থিত চব্বিশ জনের মনের ভেতর ততক্ষণে ঝড় শুরু হয়ে গেছে। এই ঝড়ের মাত্রা দুজনের মনে বাকিদের চেয়ে একটু বেশিই ওলটপালট করতে শুরু করলো। আড়চোখে ওরিয়ন তাকালো ইভানের দিকে। ইভানের চোখে কোনো অনুভূতি নেই, সে ওরিয়নের দিকে একবার তাকিয়ে আবার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো। ওরিয়ন বুঝতে পারছে স্পষ্ট, ঐ ছয়জনের মধ্যে তাদের দুজনের নাম অবশ্যই আছে।

এক এক করে ছয়জনের নাম উচ্চারণ করা হলো। কারো বুঝতে বাকি রইলো না, সেই ছয়জনের ওপর বাজ পড়েছে নাম ঘোষণার সাথে সাথে, কিন্তু সেই ছয়জনের অনেক অভ্যাসে রপ্ত করা অনুভূতির ওপর নিয়ন্ত্রণে কোনো ধরনের তারতম্য হলো না। প্রথম শ্রেণি থেকে নিম্নগামী হতে হয়েছে তা মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সবাই এতক্ষণ এক সারিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও সেই ছয়জন এখন এক পা করে পিছিয়ে গেছে। প্রথম শ্রেণির সারিতে দাঁড়ানোর যোগ্যতা হারিয়েছে তারা।

এবার প্রথম শ্রেণির সম্মান সবাইকে দেওয়ার পালা। এখানে যারা বাকি আছে তারা সবাই প্রথম শ্রেণিতে যাবার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। ওরিয়ন হাঁ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। আরও অনেকেই ফেলেছে তাই তার কর্মটা আলাদা করে কারো নজরে পড়লো না।

তবে এখনো দর্শকদের জন্য আসল আকর্ষণ বাকি রয়ে গেছে। বাকি আঠারো জনের একজন হবে মহা অভিজাত। এবার সেই মহা অভিজাতের নাম ঘোষণা করা হবে। তাকে পানীয় প্রদান করে স্বয়ং বরণ করে নেবেন গভর্নর পায়াস। সে গিয়ে বসবে মহা অভিজাতদের জন্য ঠিক করে রাখা জায়গায়।

প্রধান শিক্ষক এবার দুই হাত তুললেন, সময় এসে গেছে, এখনই ঘোষণা করা হবে। ঠিক তখনই কক্ষে প্রবেশ করলো এক কালো মূর্তি। সম্পূর্ণ শরীর কালো কাপড়ে ঢাকা, এমনকি মুখও। সবাই বুঝতে পারছে, আগন্তুক নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে চায় না। আচমকা এই আগন্তুকের আগমনে দর্শকদের মধ্যে আবার একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হলো।

কালো পোশাকে আপাদমস্তক ঢাকা লোকটা সরাসরি এসে দাঁড়ালো ঘোষণা করতে উদ্যত শিক্ষকের সামনে, মৃদু গলায় বলল 'থামুন, একটা খবর আছে।'

আগন্তুককে এই শিক্ষক চেনেন। সেও ক্রিস্টেয়ারের শিক্ষক। এখনো অবসর নেবার সময় আসেনি দেখে সে নিজের চেহারা সবাইকে দেখাতে পারবে না। তবে নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর খবর আছে। তার গলাও নিচু হয়ে এলো, 'কী খবর আবার? পরে দিলে চলতো না?'

'না। দেরি করলে আমাদের বিচারে অনেক বড়ো ভুল হয়ে যাবে। আমি একেবারে সময়মতো চলে এসেছি।'

তাদের কানাকানি দেখে দর্শকদের মনেও এতক্ষণে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। গুঞ্জন বাড়ছে তাদের মধ্যে।

'আচ্ছা, কী খবর তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।'

'আমরা তো এরই মধ্যে ছয়জন ব্যর্থ সেনা খুঁজে পেয়ে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ সকালেই আরও দুজন সেনার কথা জানতে পারলাম। যারা তার থেকেও বিশদ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।'

'কী বলছ এসব! আমাদের নজর কীভাবে এড়িয়ে গেল?'

'এড়িয়ে আর গেল কই? তবে ঐ দুজন বেশ কৌশল খাটিয়েছিল। তারা ঐ রাতে কোনো হেলট পরিবারকে মারেনি। তারা শুধু রক্ত ভেজা কাপড় নিয়ে এসেছে আর হেলট পরিবারকে পালিয়ে যেতে দিয়েছে জঙ্গলে। কপাল ক্রমে সেই হেলট পরিবার ধরা পড়েছে। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সেনাদল জানতে পেরেছে আসল ঘটনা, তাদের থেকে জেনেছি আমরা। আর দিন তারিখ বিচার করে দেখলাম এটা সেদিন রাতের ঘটনা। তার মানে আমাদের কোনো দুইজন কাজটা

তো করেইনি, উল্টো ক্রিস্টেয়ারের সেনাদের যে সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা, সেই দয়ার বহিঃপ্রকাশ করেছে।'

জ্বলে উঠলো প্রধান শিক্ষকের চোখ, 'কোন দুজন?'

' তা এখনো আমরা জানি না।'

'মানে! তাহলে আমি এখন কীভাবে ঘোষণা করবো? এখন তো মহা সমস্যা হলো।'

'সমাধান আছে। যে হেলট পরিবার পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে, তারা ঐ দুই সেনাকে দেখেনি সেটা ঠিক, তবে গলা তো শুনেছে, আর সেই গলা তারা আরেকবার শুনলে না চিনতে পারার কোনো কারণ নেই।'

প্রধান শিক্ষক বুঝতে পারলেন তাকে কী করতে হবে, 'ঠিক আছে। ঐ হেলট পরিবারকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

আদেশ পালিত হলো। দর্শকেরা কিছুই বুঝতে পারছে না। এই হেলট পরিবার আবার এলো কোত্থেকে? এসব তো ছিল না সূচিতে। নিশ্চয়ই কোন ঝামেলা হয়েছে। গুঞ্জন এবার শোরগোলের দিকে এগিয়ে গেল।

প্রধান শিক্ষক এবার দর্শকদের দিকে তাকালেন, 'আমরা এই মাত্র একটা গুরুতর সংবাদ পেয়েছি। শুধু ছয়জন নয়, আরও দুই জন নিজেদের কাজে ব্যর্থ হয়েছে। এবং তা ঐ দুজনের চেয়েও গুরুতরভাবে। এখনো সেই দুজনকে আমরা খুঁজে বের করতে পারেনি, এখন আপনাদের সবার সামনেই সেই কাজটা করা হবে।'

দর্শকেরা এই কথায় বেশ আমোদ পেয়েছে। যাক, এবার একটা ভালো মজা দেখার সুযোগ হয়েছে।

ওদিকে হেলট পরিবারকে দেখে ওরিয়ন বার বার ঢোক গিলছে, ইভান তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না, কিন্তু বুঝতে পারছে বিপদ তাদের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে।

হেলট পরিবারকে সবার সামনে একবার একবার করে দাঁড় করানো হচ্ছে। সেনারা নিজেদের নাম বলছে আর পূর্ণ বাক্য বলছে। হেলট পুরুষ মাথা নাড়াচ্ছে, না, এই লোক ছিল না সেদিন রাতে।

এক এক করে এবার ইভানের পালা এলো। আস্তে করে একটা বড়ো দম নিলো ইভান, তারপর বলল, 'আমার নাম ইভান।'

স্বরটা কানে যেতেই চট করে চোখ তুলে ফেললো হেলট দম্পতি। সাথে সাথে যা বোঝার বুঝে নিলেন শিক্ষকেরা, 'এই লোকই সেদিন রাতে তোমাদের ঘরে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ', স্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিলো হেলট পুরুষ।

চোখ বন্ধ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ইভান, আর কিছুই করার নেই। তারা ধরা পরে গেছে।

ওরিয়নের সামনে আর নেয়া হলো না হেলট দম্পতিকে। সে এমনিতেই অভিযুক্ত হয়েছে। হেলট পরিবারকে বের করে দেওয়া হলো সভা কক্ষ থেকে।

প্রধান শিক্ষক এবার সামনে আসতে আদেশ করলেন ইভান আর ওরিয়নকে। তারপর জোরালো গলায় বললেন, 'এই দুই ছাত্র আমাদের মাথা নিচু করে দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্পার্টার সেনাদের মধ্যে যে দোষ থাকা মহাপাপ, সেই পাপেরই চর্চা করেছে তারা। তারা সামান্য এক হেলট পরিবারকে দয়া করেছে। তাদেরকে যে আদেশ করা হয়েছিল তা তারা পালন করেনি, সেই চেষ্টাও করেনি।'

'লজ্জা' 'লজ্জা' রব উঠলো দর্শকদের মধ্যে। প্রধান শিক্ষকের গলা সেই চিৎকারের মধ্যে আরও জোরালো হয়ে শোনা গেল, 'এই দুজনকে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজকে তো পুরস্কার দেবার পালা। তাই সেই পুরস্কারই শাস্তি হিসেবে দেওয়া হবে এই দুজনকে। আজ থেকে তাদের আমি স্পার্টার তৃতীয় শ্রেণির অভিজাত নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করলাম।

দুই পা পিছিয়ে গিয়ে সবার পেছনে দাঁড়ালো ওরিয়ন আর ইভান। ওরিয়নের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না তেমন কোনো ক্ষতি হয়েছে, তবে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ইভানের মুখ। সে জানে ইনোনকে এখন আর কিছুতেই নিজের করে পাওয়া যাবে না।

প্রধান শিক্ষক যখন মহা অভিজাতের মুকুট পরিয়ে দিলেন নিকোলাসের মাথায়, তখন যিনি পরিয়ে দিলেন আর যার মাথায় পরানো হলো, তারা দুজনেই জানে এই মুকুটের অধিকার আজ অন্য কারো ছিল। নিকোলাস ভাগ্যচক্রে মহা অভিজাতের সম্মান লাভ করেছে।

ইভান নিজের দুঃখ সামলে তাকালো ওরিয়নের দিকে। ওরিয়নের এই অবস্থার জন্য সে নিজেই দায়ী। নীরবে অনেকদিনের পুরানো বন্ধুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলো সে। আরেকজনের চোখের দিকেও তাকাতে হবে, আরেকজনের কাছেও ক্ষমা চাইতে হবে। সেই কাজটা হবে প্রায় অসম্ভব পর্যায়ের।

অভিজ্ঞতা সবসময় ভবিষ্যতবাণী করতে সাহায্য করে, আর বেশির ভাগ সময়ে তা কাজ করে জাদুমন্ত্রের মতো। একেকবারে ফলে যায়। তবে এই সময় শেইরনের ভবিষ্যতবাণী মিলে যাক, সেটা এই জাহাজের কেউই বোধহয় চাচ্ছে না।

মানুষের চাওয়া অথবা না চাওয়ায় প্রকৃতির তেমন কিছুই আসে যায় না। আমরা যতই আমাদেরকে বড়ো করে দেখার চেষ্টা করি না কেন, আসলে তো প্রকৃতির কাছে মানুষ তার অগুনতি সৃষ্টির একটা ভাগ মাত্র। তার জন্য প্রকৃতি কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করে রাখবে তা চিন্তা করা বোকামি। হয়তো মানুষের বুদ্ধি অনেক বেশি, তবে প্রকৃতির কাছে তা সমুদ্রে গোষ্পদের মতোই।

প্রকৃতি প্রকৃতির মতো চলবে। তাকে থামানোর কোনো উপায় নেই। এক প্রশ্ন একটাই, কোনদিকে চলবে মানুষ? স্রোতের দিকে না-কি বিপরীত দিকে? দু দিকেই সময় বুঝে চলতে হয়। আর সেই পথ চিনে নেয়াতেই উৎরে যাবার রহস্য নিহিত।

নাবিকদের মাঝে এক অদ্ভুত চঞ্চলতা লক্ষ্য করছে ওরা। কেমন যেন অস্থির হয়ে আছে সময়। বাতাস আরও কমে এসেছে। সবসময় চুল উড়াতে থাকা বাতা এখন কেবল মুখে একটু ঝিরিঝিরি অনুভূতির সৃষ্টি করছে মাত্র। দুপুরের খাবারে পর প্রধান নাবিক আর শেইরন সন্দেহ করেছিলেন বটে কিন্তু এখন প্রায় স নাবিকই বুঝতে পারছে। নানা জিনিস পরীক্ষা করে দেখছে সবাই। পালে দড়িগুলোর সাথে আরও কিছু বাড়তি দড়ি বেঁধে নিতে লাগলো তারা।

'কী মনে হচ্ছে অসিত?', রুদ্রদেব চারিদিকে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞে করলো। তাদেরকে পালের কাজে লাগানো হয়নি। এই কাজে দক্ষতা এব অভিজ্ঞতা দুইয়েরই দরকার আছে। তাদের তার কোনোটাই নেই। তবে বৃ শেইরন বসে নেই। তিনি এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে চোখ ব করে বাতাসের দিক বোঝার চেষ্টা করছেন। তাকে এত সতর্ক হতে কখনো দেখেনি ওরা।

'মনে হচ্ছে, বৃষ্টি আসবে। বৃষ্টির আগে এমন গুমোট হয়ে আসে বাতাস।' অসিত উত্তর দেয়।

'হ্যাঁ, ডাঙ্গার হিসেবে এখন হয়তো জোরালো বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। কি সমুদ্রের হিসেব আলাদা। সমুদ্রের বৈশিষ্ট্য আমি জানি না, তোমাকে শেখাতে পারবো না। তবে মানুষের লক্ষণ বিচার করা একটু আধটু যা শিখেছি তাতে জানি শুধু জোরালো বৃষ্টির আশঙ্কা করছে না তারা। নিশ্চয়ই বড়ো কোনো ঝড় আসবে।

এতদিন সমুদ্রের ঝড়ের কথা কেবল লোকমুখে শুনেই এসেছি, এবার হয়তো চোখে দেখতে পাবো।'

অসিতের গলায় ভয়, 'ঝড় এলে তো ছোটো নদীতেও অনেক বড়ো ঢেউ ওঠে, নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এই জাহাজ আবার ডুবে যাবে না তো?'

'যেতেই পারে। কিন্তু তা প্রতিকার করার কোনো উপায় নেই। আমাদেরকে নাবিকদের কাজের ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে। যার প্রতিকার অথবা প্রতিরোধ তুমি করতে পারবে না, তার সামনে কখনও লড়াই করতে যেও না। মাঝে মাঝে আত্মসমর্পণ করাই সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত।'

ভয় যে লাগছে তা অস্বীকার করতে পারলো না অসিত। তবে কিছুই বলল না সে। ঈশ্বরকে ডাকার কথা একবার মনে হলো তার। সমুদ্রের জন্য তো আবার আলাদা দেবতা। সেই দেবতার নাম কিছুতেই মনে পড়ছে না তার। অদৃশ্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকার উপায়ও বন্ধ হয়ে গেল চোখের সামনে।

বিকেলের রোদ আস্তে আস্তে কমে আসছে। আকাশের উজ্জ্বল রং একটু কালো হয়ে এলো। সূর্য জলের দিগন্তে নেমে এসেছে ঠিক কিন্তু এতটাও নামেনি যে কারণে রোদ এভাবে অদৃশ্য হতে থাকবে। একটু পরেই রহস্য বোঝা গেল। মেঘ জমছে আকাশ জুড়ে। ধীরে ধীরে বাতাসের গতি বাড়তে লাগলো বেশ দ্রুত ত্বরণে। মেঘের দল নানান দিক থেকে এসে জমা হতে লাগলো ওদের মাথার ওপর। দিনের বেলা নেমে আসতে লাগলো রাতের ঘন অন্ধকার। নাবিকেরা সবাই এসে জড়ো হলো ডেকের ওপর। ঠিক যেন কোনো যুদ্ধক্ষেত্রের এক পাশে শত্রুসেনার সামনে অপর পাশে জমা হয়েছে তারা। তাদের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে শত্রু ভীষণ বলবান, কিন্তু তারা এটাও জানে তারা লড়ে যাবে একেবারে শেষ পর্যন্ত।

প্রধান নাবিক একেবারে সেনাপতির মতো দাঁড়িয়েছে সবার সামনে। প্রথমেই অসিত আর রুদ্রদেবের দিকে তাকালেন তিনি, 'তোমরা দুজনে এখনই নিচে নেমে যাও। ডেকের ওপরে আর আসবে না। ঝড় শুরু হলে বাতাস কোনদিক থেকে কত বেগে বইবে তার ঠিক নেই। অভ্যাস নেই তোমাদের, প্রথমেই গিয়ে পড়বে জলে।'

আদেশ পালনে রুদ্রদেব আর অসিতের বিলম্ব করার কোনো কারণ নেই। তারা কী করছে সেদিকে আর তাকালেন না প্রধান নাবিক, গিয়ে দাঁড়িয়েছেন শেইরনের সামনে, ওদের সামনে কথা বলার সময় গলার স্বর যেমন জোরালো ছিল এখন অনেকটাই নরম হয়ে এসেছে, 'আপনিও নিচে নেমে গেলেই ভালো করবেন। ভাব দেখে মনে হচ্ছে এই ঝড় ঘূর্ণিবায়ু নিয়ে আসবে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে', শেইরন সায় দিলেন, 'আমি নিচে যাচ্ছি। জাহাজ ডোবার সময় এলে আমাকে ওপরে ডেকো। একটা বন্ধ ঘরে বন্দি থেকে শেষ মুহূর্ত

কাটানোর ইচ্ছে আমার নেই। স্বাধীন হয়েই মরতে চাই। আর এই যাত্রা গেলে তো ভালোই।'

এরপরে তিনি তাকালেন অসিত আর রুদ্রদেবের দিকে, ভাষাতেই বললেন, 'চলো, নিচে যাই। হয়তো এই বৃদ্ধের শেষ যাত্রার সঙ্গী তোমরা।'

ওরা নিচে নেমে এলো। ততক্ষণে দিনের আলো যেটুকু ছিল সেটুকুও আড়ালে ঢাকা পরে গেল। সময়ের আগেই নেমে এলো ঘোর সন্ধ্যা। নিচে ভেতরে একটা মশাল জ্বলছে। তাড়াতাড়ি তেল পরীক্ষা করে নিলো রুদ্রদেব, খুব বেশি তেল নেই। বেশিক্ষণ জ্বলবে না।'

শেইরন একটা সুবিধাজনক পিপা দেখে ততক্ষণে আয়েশ করে বসে 'তেল থাকলেও বেশিক্ষণ জ্বলত না। বাতাস এই বন্ধ জায়গাতেও ঢুকবে।'

'তার মানে ওপরের মশাল কোনোভাবেই জ্বলা সম্ভব নয়। অন্ধকারে নাবিক কাজ করবে কীভাবে?' অসিত প্রশ্নটা কাকে করেছে ঠিক বোঝা গেল না, নিজেকেই করেছে।

শেইরন একটু হেসে বললেন, 'তখন তাদের জন্য প্রকৃতির মশাল উঠবে। বিদ্যুৎ চমকের আলো ব্যবহার করেই কাজ চালাতে হবে।'

এরপর আর কেউ কিছু বলে না, জানে এখন শুধু একটা অপেক্ষাই আছে। প্রলয় তাণ্ডবের অপেক্ষা।

খুব বেশিক্ষণ করতে হলো না। জাহাজের মৃদু দুলুনি ধীরে ধীরে লাগলো। আরও বেশি করে ওপর নিচ করতে লাগলো জাহাজ। এই বন্ধ থেকেও ওরা বুঝতে পেরেছে, বাইরের সমুদ্রের ঢেউয়ের আকার অনেকগুণ গেছে। দানবের মতো একেকটা ঢেউ এখন খেলা করতে শুরু করেছে নিয়ে।

তারপরই এলো সেই ঘূর্ণিবায়ু। বাতাসের শো শো আওয়াজের চেয়ে বেশি তাদের কানে আসছে না। এতক্ষণ জাহাজ কেবল ওপর নিচেই যাচ্ছিল, মনে হচ্ছে দশ দিকেই সমান ভাবে চলতে চাইছে। কখন কোনদিকে যাচ্ছে নেই, গোত্তা খাচ্ছে পাগলা ঘুড়ির মতো। শেইরনের কথাই ঠিক, খোলের ভেতরে ঢুকে পড়তে শুরু করেছে সেই বিশৃঙ্খল হাওয়া।

শেইরন এমন পরিস্থিতির সাথে ভালোভাবেই পরিচিত হলেও অসিত রুদ্রদেবের জন্য এটাই প্রথম। রুদ্রদেব বুঝতে চেষ্টা করছে পরিস্থিতি। জাহাজের অবস্থা তেমন সুবিধার মনে হচ্ছে না। যেই অবস্থা তাতে ডুবে গেলেও নাবিকদের দোষ দেওয়া যাবে না। ওদিকে অসিত চোখ বন্ধ করে বসে আছে, একটা দড়ি পেঁচিয়ে রেখেছে হাত।

হাওয়ার শব্দকে পরাজিত করতে রীতিমতো জোরালো গলায় চিৎকার করতে হলো রুদ্রদেবকে, 'আমাদের কি ওপরে গিয়ে সাহায্য করা উচিত না? কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবো?'

শেইরন কথা শুনতে পেলেন, তিনিও চেঁচালেন, 'কী আর সাহায্য করবো? যা হবার এমনিতেই হবে।'

'জাহাজ কি ডুবে যাবে?'

'সেই কথা আমি কী করে বলবো? ঝড় অনেক দেখেছি। তবে আজকের ঝড়ের মতো বাতাসের এমন ঘোর শব্দ আগে আর শুনিনি। বাতাস আর ঢেউয়ের এই তেজ এই জাহাজ সহ্য করতে পারবে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'কোনো আশার কথা শোনান না। আপনার চেহারার মতো আপনার কথাগুলোও নিরস।'

'মিথ্যে আশার বাণীর চেয়ে সত্যকে আপন করে নেয়া অনেক ভালো।'

হঠাৎ ওপর থেকে চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে এলো। এই ভয়ংকর ঝড়ের রোষযুক্ত শব্দের মধ্যেও নাবিকদের মিলিত ভয়ার্ত কণ্ঠ কানে এসেছে ওদের। নিশ্চয়ই ওপরে ভয়ংকর কিছু হয়েছে।

উঠে দাঁড়ালো রুদ্রদেব, 'আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। এভাবে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। অসিত ওপরে চলো। দেখি কী করা যায়।'

অসিত নিজের নাম উচ্চারিত হতে বন্ধ করা চোখ খুলল। এতক্ষণ ধ্যান করে মোটামুটি ভয় ভুলে থাকা গেছে। এভাবে পাগলের মতো সমুদ্র যাত্রা করা উচিত হয়নি। অঙ্গদকে তো পাবার কোনো আশাই নেই, বরং এবার হবে সলীল সমাধি।

রুদ্রদেবের পেছন পেছন উঠছে অসিত। সামনে থেকে চিৎকার করছে রুদ্রদেব, 'শোনো, ভালো করে খেয়াল করো, ডেকে বেরিয়েই প্রথমে একটা শক্তপোক্ত দড়ি ধরে ফেলবে, নইলে হাওয়ার প্রথম তোড়েই উড়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়বে।'

রুদ্রদেব প্রথমে উঠে এলো ডেকে, এতক্ষণ তাণ্ডবের মাত্রা কেবল শব্দ দিয়ে বিচার করেছিল, এবার স্বয়ং চোখে দেখতে পেলো। ডেকের ওপরে ঝড় ভালোই ছাপ রেখেছে। পালের অনেক দড়ি ছিঁড়ে গেছে। এখনো নিজের অবস্থায় মাস্তুল আর পাল টিকে থাকলেও বেশিক্ষণ থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। জাহাজ একেক সময় একেক দিকে যাচ্ছে। নাবিকেরা বেশির ভাগ নিজেকে বাঁচাতেই ব্যস্ত। শুধু প্রধান নাবিক এখনো নিজের কাজে মনোযোগ ধরে রেখেছেন। জাহাজের হাল এখনো তার হাতে। প্রাণপণ চেষ্টা চলছে জাহাজের মুখ সোজা রাখতে, কিন্তু জাহাজ হয়ে গেছে পাগলা ঘোড়া, কোনো লাগামেই তাকে এখন আর বশে রাখা যাচ্ছে না।

নিজে একটা শক্ত দড়ি হাতে আটকালো রুদ্রদেব, অসিতের জন্যও একট ব্যবস্থা করে দিলো। তারপর নিজের চোখে দেখতে লাগলো ঝড়ের তাণ্ড ভয়ংকর হলেও রুদ্রদেবের মনে হলো দেখার মতো একটা দৃশ্য। জাহাজে উচ্চতার চেয়েও বড়ো বড়ো ঢেউ আঘাত করছে জাহাজের গায়ে। প্রতি ঢেউয়ে আঘাতে ডেকের ওপরটা জলে ভেসে যাচ্ছে, ওদেরকে একেবারে চুপচুপে কর দিচ্ছে নোনা জলে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে নাবিকদের সবাই কিছু একটা ধরে কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করে চলেছে।

অসিতের মনে হচ্ছে এই ঝড় কখনো শেষ হবে না, 'আর কতক্ষণ চলবে' চিৎকার করলো সে।

'মনে হচ্ছে আমাদের অন্ত না করে শেষ হবে না', উত্তর দিলো রুদ্রদেব নাবিকদের অবস্থা দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। এখন আর নিয়তি ছাড় কারোই কিছু করার নেই।

নাবিকেরা জাহাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছুই করতে পারছে না। নিজেদের নিয়ন্ত্র করাই বিপত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাও জাহাজ টিকে থাকলে টিকে থাকার একটা সম্ভাবনা আছে। যে কারিগর এই জাহাজ নির্মাণ করেছিল সে নিশ্চয়ই এত ভয়ংক ঝড়ের কথা চিন্তা করেনি।

ঠিক তখনই ঘটলো ঘটনাটা। একজন নাবিক বিকট চিৎকার করে উঠলো সে যেই দড়িটা ধরে ঝুলে ছিল সেটা জাহাজের দুলুনির কারণে হোক, ঝড়ে গতির কারণে হোক অথবা নাবিকের ওজনের কারণে হোক একেবারে গোঁড়া থেকে ছিঁড়ে গেছে। সাথে সাথে নাবিক হারিয়েছে তার সম্বল। ঝড়ের ঘূর্ণির মধ্যে পাক খেতে খেতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ার দশা হলো তার।

সমুদ্রে গিয়েই পড়তো। সম্বল ছাড়া এই ঝড়ের সাথে লড়ার কোনো উপা নেই। তখনই বিদ্যুৎ চমকে রুদ্রদেব দেখতে পেলো প্রায় উড়ন্ত নাবিককে। তার আয়ত্তের মধ্যে আসতেই এক হাতে জাপটে ধরল নাবিকের এক হাত। আরেক হাতে ধরে রেখেছে নিজের দড়ি। তবে এখন সন্দেহ হচ্ছে দুজনের ভার এই দড়ি বেশিক্ষণ নিতে পারবে না। চিৎকার করে উঠলো রুদ্রদেব, ' অসিত, নাবিকে আরেক হাত ধরো।'

নাবিক নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসতে পেরে শরীরের শেষ শক্তি জড়ো করে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল রুদ্রদেবকে। ওদিকে নাবিকের একটা হাত ধরেছে অসিত। তাকেও রীতিমতো লড়াই করতে হলো কাজটা করতে।

ওদিকে প্রধান নাবিক এখনো দাঁতে দাঁত চেপে তার কাজ করে যাচ্ছে। সবাই জানে একবার যদি প্রধান নাবিক হাল ছেড়ে দেয় তাহলে জাহাজ গোত্তা খেতে থাকবে। আর একবার গোত্তা খাওয়া শুরু করলে পানিতে জন্ম নেয়া ঘূর্ণি গিলে

নেবে জাহাজকে। বলতে গেলে এখন সবার জীবন নির্ভর করছে প্রধান নাবিকের ঐ হাল ধরে রাখা হাতের শক্তির ওপর।

নাবিকেরা জানে সেই শক্তি বেশিক্ষণ থাকবে না। সমর্থ কেউ একটু একটু করে এগোতে লাগলো হালের দিকে। বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে একবার প্রধান নাবিকের দিকে তাকালো রুদ্রদেব। তার দাঁত দাঁতে চেপে গেছে, রুদ্রদেব বুঝে গেছে আর বেশিক্ষণ লড়াই করতে পারবে না নাবিক। আর তার সাহায্যে কেউ সহজে যেতেও পারবে না। সে নিজে চেষ্টা করে লাভ নেই। হাল ধরতে হলে শক্তি থাকলেই হবে না, দক্ষতাও থাকতে হবে। এমন হতবুদ্ধি অবস্থায় অনেকদিন পড়েনি সে। মাথা ঠান্ডা রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো সে।

ওদিকে নাবিকেরা আর্তচিৎকার করেই চলেছে। প্রলয় কাল বুঝি এমনই হয়। তাদের নিয়ে খেলা করছে ঝড়। তবে সব নাবিক হাল ছাড়লেও একজন ছাড়েনি, রুদ্রদেবকে জড়িয়ে ধরে রাখা নাবিক এতক্ষণে ভয় কাটিয়ে উঠেছে, সে মিশরীয় ভাষায় বলে উঠলো, 'প্রধান নাবিক আর বেশিক্ষণ হাল ধরে রাখতে পারবেন না। আমাদেরকে সাহায্য করতে যেতে হবে।'

রুদ্রদেব যেন নতুন পথের দিশা পেলো। সে মিশরীয় তেমন একটা না শিখলেও ভাঙা ভাঙা কথাটা বুঝতে পেরেছে। নাবিককে যে করেই হোক এখন হালের কাছে পাঠাতে হবে। এই বায়ুর মধ্যে তা করা একেবারেই অসম্ভব, তবে কিছু একটা তো করতেই হবে।

পায়ের কাছে দড়ির তাড়া দেখতে পেলো রুদ্রদেব। বুদ্ধিটা তখনই এলো মাথায়। হাতে থাকা দড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে নিয়ে নিচে থাকা দড়িটা নাবিকের পায়ে বেঁধে দিলো সে। তারপর নাবিককে ইশারা আর ভাষা মিলিয়ে বলল, 'তুমি হামাগুড়ি দাও। আমি দড়ি ধরে রেখেছি। শুয়ে থাকলে বাতাসের বেগ গায়ে কম লাগবে।'

বিপদ কালে বুদ্ধি নাশ হয় এটা যেমন সত্য কিছু কিছু সময় বিপদে মানুষের মাথা খুলে যায় এটাও সত্য। নাবিক রুদ্রদেবের সেই বিচিত্র মিশরীয় ভাষা আর ইশারা মিলিয়ে বলা কথাটা বুঝতে পেরেছে। উপুড় হয়ে শুয়ে হামা দিতে শুরু করলো সে। বাতাস আর তাকে তেমন কাবু করতে পারলো না। ওদিকে দড়ি ধরে রেখেছে রুদ্রদেব। আস্তে আস্তে টান ছাড়ছে।

দেখতে দেখতে নাবিক পৌঁছে গেল হালের কাছে। প্রধান নাবিকের সাথে হাত লাগালো হাল নিয়ন্ত্রণে। রুদ্রদেব একটু স্বস্তি পেলো, মনে হয় আরেকটু সময় পাওয়া গেছে।

অসিত চিৎকার করে বলল, 'আপনার মিশরীয় ভাষা বলাটা ভালো ছিল। নাবিক কিছু না বুঝতে পারলেও আমি বুঝতে পেরেছি', ফিক করে একটা হাসি সৃষ্টি হয়েই মিলিয়ে গেল অসিতের মুখে।

মুখে অপ্রসন্ন ভাব এনে রুদ্রদেব শিষ্যের দিকে তাকালো, 'এই অবস্থা আমাকে খোঁচা মারছো তুমি? ঈশ্বরকে ডাকো।'

'তাইই করছি।'

মনে মনে একটু প্রসন্ন না হয়ে পারলো না রুদ্রদেব। দিন অনেক পাল্টেছে তাদের সময়ে কেউ গুরুর দিকে চোখ তুলে কথাও বলতো না। ঠাট্টা মশকরা দূরে থাক। তবে সেসব তো তিন হাজার বছর আগের কথা। কলি ভালো করে এসেছে। প্রসন্ন হবার কারণ অবশ্য অন্য। এই ঘোর বিপদ আর প্রাণ সংকটের মধ্যেও অসিত স্বাভাবিক থেকে উপহাস করতে পারছে। তার মানে বিদ্যে ভালো শিখেছে শিষ্য।

তখনই রুদ্রদেবের মনে হলো শেইরনের কথা। বৃদ্ধ মানুষ একা একা খোলের মধ্যে বসে আছেন। কী অবস্থা কে জানে। যদিও বিপদ এখান থেকে ওখানে কম তবু একবার গিয়ে দেখে আসা উচিত।

তবে রুদ্রদেবকে সেই পদক্ষেপ নিতে হলো না। তখনই নিচ থেকে ওপরে উঠে এসেছেন শেইরন। ঝড়ের ঘূর্ণি তাকে কাবু করলেও একেবারে টলাতে পারলো না। তিনিও ধরে ফেললেন সুবিধা মতো একটা দড়ি।

রুদ্রদেব তার দিকে ফিরে চেঁচালো, 'আপনি আবার উঠে এসেছেন কেন?'

নির্বিকার চেহারায় দুঃসংবাদটা ঘোষণা করলেন শেইরন, রীতিমতো চিৎকার করে, 'খোলের ভেতরে আর থাকা গেল না। জল ঢুকছে গলগল করে।'

জাহাজ অকুলাস বন্দর ছেড়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। বন্দর রক্ষীরাও জাহাজটাকে বন্দর ত্যাগ করতে দেখে স্বস্তি পেলো। শাসকের কানে নিজেদের দুর্বলতার কথা তুলতে কোনো রক্ষীই চায় না। এই বন্দরে যখন হত্যাকাণ্ডটা হলো তখন বেশ ধন্দেই পরে গিয়েছিল তারা। এই বন্দরে তেমন একটা বাণিজ্য হয় না। তাই দক্ষ রক্ষীদলের পরিবর্তে কাজ চালাবার মতো একটা দলই গঠন করেছিলেন রাজা। ছোটোখাটো চুরি আর ডাকাতির খবর মাঝে মাঝে কানে আসে আর সেসব তো হবেই এমন জায়গায় কিন্তু মানুষ খুন অনেকদিন ধরে এখানে হয়নি। আর এমন একটা হত্যার রহস্য ভেদ করা তাদের জন্য অসাধ্য। এখন জাহাজটা বন্দর ছেড়ে যাওয়াতে দুটো উপকার হয়েছে। যাদের লোক মরেছে তারাই যখন অনুপস্থিত তাহলে ঘটনা নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য হবে না। শাসকের কানে ঘটনা পৌঁছানোর সম্ভাবনাও তেমন আর থাকলো না।

তবে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা রাহু জানে তার স্বস্তি দূর হয়েছে একটু আগে। সে কাজটা করে ধামাচাপা দিতে পেরেছে ভেবেছিল, কিন্তু ভাগ্য যেন তার জন্য অন্য চমক সাজিয়ে রেখেছিল। ভাগ্য যখন মানুষের পথের ভার নিজের কাঁধে নিয়ে নেয় তখন তার ওপর আবার নিয়ন্ত্রণ নেয়া প্রায় অসম্ভব।

তবে নিজেকে ভাগ্যের হাতে সহজে সঁপে দেওয়া মানুষদের তালিকায় খুব সহজেই রাহুকে ফেলে দেওয়া যাবে না। তার মাথার চিন্তার চক্র তখনই চালু হয়ে গিয়েছিল। নাবিকদের সবাইকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে সে এখন। কি জানি, মাজিদ একাই আছে এই ষড়যন্ত্রে, না-কি অন্য কেউও জানে গোপন ব্যাপারটা। মানুষ খুন করে অভ্যাস নেই রাহুর। তার কেবলই মনে হচ্ছে, যেই তার দিকে তাকাচ্ছে সেই বুঝতে পারছে তার মনের কথা। দেখতে পাচ্ছে তার হাতে লেগে থাকা অদৃশ্য রক্তের দাগ।

মাজিদও তার একটু পরেই ডেকে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু আগে নিজের কক্ষে বসে সে যখন রাহুকে ভবিষ্যৎ বোঝাচ্ছিল, তখনকার সেই কূট হাসি এখন তার মুখে অনুপস্থিত। তার মুখ এখন একেবারে থমথমে। তার একজন নাবিক মারা গেছে। সবার চেয়ে বেশি শোক তো তারই হওয়া উচিত।

এক নাবিক নিচু স্বরে আরে নাবিকের সাথে আলোচনা করছে, আবছা আবছা কানে আসছে রাহুর।

'আচ্ছা, আমরা এত তাড়াতাড়ি বন্দর ছেড়ে চলে এলাম কেন? আমাদের সাথের একজন ঐ বন্দরে খুন হয়েছে। হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেবার

দরকার ছিল। বাসিল লোক খারাপ ছিল মানছি কিন্তু ছিল তো আমাদেরই একজন। সর্দার এতো তাড়াহুড়া করলেন কেন বুঝতে পারছি না।'

যে এই মন্তব্যটা দড়ি বাঁধতে বাঁধতে করেছে তার বয়স একটু কমের দিকে। তার সাথে দাঁড়িয়ে আছে একজন বয়স্ক নাবিক। অভিজ্ঞতায় পূর্ণ তার মাথা 'শোন, এসব নিয়ে মানে প্রধান নাবিকের সিদ্ধান্ত নিয়ে বেশি কথা বলিস না। অনেক তো দেখলাম। বিদেশের কোনো বন্দরে কোনো ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে সেই স্থান ত্যাগ করাই উচিত। তোর কী মনে হয়? যেই ডাকাত এই ঘটনা ঘটিয়েছে, ঐ রক্ষীরা ঐ ডাকাতের বিচার করবে?'

'কেন করবে না?'

'করবে না। আমরা ওদের কাছে বিদেশি। আর ডাকাতেরা যদিও ডাকাত তবু ওদের দেশের মানুষ। আমাদের জাহাজ ছোটো, রাজার ওপর আমাদের তেমন প্রভাব নেই, কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই। পরে দেখা যাবে এই খুন নিয়ে আমাদেরই বিপদে ফেলে দিয়েছে রক্ষীরা। তাই জাহাজ ছেড়ে চলে এসে আমরা ঠিক কাজই করেছি। এসব নিয়ে আর বেশি কথা বলিস না। আমাদের সাথে একজন মারা গেছে ঠিক আছে। এখন সাবধানে থাক। নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারলেই হয়। জানিস তো সমুদ্র যাত্রায় নাবিকের মৃত্যু খুবই অমঙ্গলের চিহ্ন।'

'সে তো আর সমুদ্র যাত্রায় মরেনি। ডাঙ্গায় মরেছে।'

ফিচকে ছোঁড়ার এই কথার উত্তর বয়স্ক নাবিকের কাছে নেই। সে আর কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওদের কথাটা আবছা করে শুনতে পেয়েছে রাহু। তার নিজের মাথায়ও চলছে চিন্তা। কিন্তু কোনো কুল কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত, নিজের অধিকার সে প্রাণ থাকতে ছেড়ে দেবে না।

এতক্ষণে জাহাজ একটু গভীর জলে চলে এসেছে। প্রধান নাবিক এখন দিক ঠিক করছেন। আফ্রিকার শিঙয়ে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগবে না।

দিক ঠিক করে হালটা আরেক প্রৌঢ় নাবিকের হাতে সঁপে দিয়ে নিচে নেমে এলো মাজিদ। এসে দাঁড়ালো রাহুর ঠিক সামনে। নিচু গলায় বলল, ' নাবিকদের হাবভাব কেমন বুঝছ?'

রাহুর গলাও নিচু, ' তেমন কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ওরা থম মেরে আছে। শোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারছে না।'

'হুম, এখন শোক কাটাবার জন্য কিছু করতে হবে। কী বলো?'

'শোক আপনা আপনিই কেটে যাবে মনে হয়।'

'না। কেটে যাবে না। কিছু একটা করা দরকার। নইলে সমুদ্র থেকে নামার আগ পর্যন্ত ওরা এমনই থাকবে। ওদেরকে ঘটনাটা ভুলিয়ে দিতে হবে।'

'কীভাবে?'

'সেটা আমি দেখছি। ওরা আমার নাবিক। আমিই ওদের সামলাচ্ছি। তুমি এখন আমার অংশীদার। কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করবে না। তুমি শুধু অঙ্গদকে দেখেশুনে রাখো। আমাদের দুজনের ভাগ্যই অঙ্গদের ভবিষ্যতে সুস্থ থাকার ওপর নির্ভর করছে।'

সায় দিলো রাহু। আর তখনই তার মনে পড়লো, অঙ্গদকে এই বেলা কোনো খাবার দেওয়া হয়নি। অসিতের সাথে থাকার সময় অঙ্গদের খাবারের নিয়ম ভালো ভাবেই শিখে নিয়েছিল সে। এক বেলা খাবার না পেলেই অঙ্গদ ছটফট করে। সে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

মাজিদ দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে লাগলো রাহুর যাওয়া। সে জানে রাহুর হাতে এখন আর অন্য কোনো উপায় নেই। তার সাথেই থাকতে হবে। এই জাহাজে আর কোনো ঘটনা ঘটানো চলবে না। এমনিতেই একবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। এরপরে নাবিকেরা জানতে পারলে তারাও ছেড়ে কথা বলবে না। কোনোমতে একবার রাহু আর অঙ্গদকে নিয়ে বেরেনিকে বন্দরে যেতে পারলেই হলো। সেখানে তার অনেক যোগাযোগ আছে আর রাহু কেবল একজন সাধারণ বিদেশি। সেখানে রাহুর মতো দশ জনকে হজম করে দেওয়াও কোনো বিষয় নয়।

বাতাস পড়ে এসেছে। এই জায়গায় সমুদ্রের মোটামুটি ধার ঘেঁষেই চলতে হচ্ছে। এখানে আবার দাঁড় টানতে হবে। এই বাড়তি কষ্ট করতে নাবিকদের কখনোই আপত্তি থাকে না। তবে মনের ভার তাদের শরীরে বাসা বেঁধেছে। দাঁড় ঠিক ছন্দে পানিতে আছড়ে পড়ছে না।

রাহু চলে এসেছে নিজের ঘরে। মাজিদ এখন আর উল্টোপাল্টা কিছুই করবে না। সে তাকে বাগে পেয়েছে। বেড়াল যখন একবার ইঁদুরকে বাগে পেলে খেলিয়ে খেলিয়ে মারে, তেমনি মাজিদও এখন তাকে খেলাচ্ছে।

অঙ্গদের জন্য রাখা খাবার থেকে দুটো কলা অঙ্গদের খাঁচার ভেতরে ফেলে দিলো সে। অঙ্গদ এতক্ষণ ক্ষিধেয় অধীর হয়ে ছিল। বাধ্য হয়ে খেয়ে নিতে লাগলো। কিছু বাদামও দিলো রাহু। অঙ্গদকে খাওয়াতে খাওয়াতে সে ভাবতে লাগলো। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। বেরেনিকে বন্দরে অঙ্গদের ভাগ সে কিছুতেই পাবে না। প্রথম সুযোগেই তাকে সরিয়ে দেবে মাজিদ। ঐ বিদেশ বিভূঁইয়ে তাকে সাহায্য করার কেউ নেই।

রাহু বেশ বুঝতে পারছে যা করার এই জাহাজ থেকে নেমে পড়ার আগেই করতে হবে। একবার জাহাজ বেরেনিকে বন্দরে চলে গেলে সে আর কিছুই করতে পারবে না। তার সাথে যে আচরণ করেছে মাজিদ তাতে মাজিদকে ক্ষমা করার কোনো কারণই নেই। সাপের মাথা থেঁতলে দিতে না পারলে ছোবল নিশ্চিত।

অঙ্গদের খাওয়া শেষ হয়েছে। এবার নিজের পেটেও কিছু দেওয়া দরকার। মাথা গরম হবার মতো ব্যাপার তার জীবনে অনেক বার ঘটেছে। মাথা ঠান্ডা করতে হলে পেট ঠান্ডা করা একটা ভালো পন্থা। একটা কলা ছিলে মুখে পুরল সে, যথেষ্ট মিষ্টি স্বাদ। খাদ্য হিসেবে কলার মানুষের মন ভালো করার সামর্থ্য আছে। একটা খুনের বিভীষিকাকে আস্তে আস্তে ভুলে যেতে পারছে রাহু। আর সেই সাথে সচল হয়ে উঠছে তার মাথা।

নিজের হাতের সুযোগগুলো ধীরে ধীরে বিচার করে দেখতে লাগলো সে। প্রথম সুবিধা হচ্ছে অঙ্গদ এখনো তার হাতেই আছে। আর দ্বিতীয় সুবিধা হচ্ছে, একবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে আবার একই ভুল করবে না মাজিদ। তার মানে এই জাহাজ বেরেনিকে পর্যন্ত যাবার আগ পর্যন্ত সুযোগ আছে তার সামনে। এখান থেকে বেরেনিকে যেতে কয়দিন লাগতে পারে তার পুরোপুরি ধারণা তার না থাকলেও একটা আবছা ধারণা আছে। তার হিসেব বলছে পনের দিনের মতো লাগতে পারে।

প্রধান নাবিকের নজর এড়িয়ে সেদিন তার কক্ষ থেকে বিপদের বন্ধু হিসেবে একটা অর্ধেক ভর্তি বোতল নিয়ে এসেছিল সে। পেটে একটু কিছু পড়তেই এবার সেই বোতলের ভেতরের তরলের নেশা পেয়ে বসলো তাকে। তবে শুধু নেশার জন্যই সে এই বোতল গোপন জায়গা থেকে টেনে বের করলো না। চিন্তার খোরাক জোগাতে এই জিনিসের জুড়ি নেই। হিসেব করে খেলে বুদ্ধি খোলে, আর হিসেবের বাইরে গিলে ফেললে হিসেব আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। হিসেব করে দুই ঢোক ঢেলে দিলো সে সরাসরি গলায়, জিহবা কিছু বুঝে ওঠার আগেই জিনিস পেটে চলে গেল।

তরল বেশ কাজের। সাথে সাথে একটা আলোর দিশা যেন দেখতে পেলো সে। হ্যাঁ, একটা বুদ্ধি তার মাথায় উঁকি দিচ্ছে। খেলাটা বিপজ্জনক। একটু এদিক ওদিক হলেই আর রক্ষে নেই, তবে একবার ঠিক করে খেলে দিতে পারলে সব কূলই রক্ষা পাবে।

চিন্তাটা আরেকটু বাড়ত, কিন্তু তখনই নিজের কামরার দিকে একটা পদশব্দ শুনতে পেয়ে ক্ষান্ত দিতে হলো। বোতলটা লুকানোর সময় পেলো না, তার আগেই আগন্তুক তার ঘরে উঁকি দিয়েছে।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইলো রাহু। কোনো নাবিক এখন তার ঘরে আসার কোনো কারণ নেই। কোনো ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনায় বুকের ভেতরে হাতুড়ির ঘা পড়বে, এখন তাই স্বাভাবিক। সময়টাই এমন।

কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে তবে সেদিকে এখন আর কথা বাড়ালো না নাবিক। তার নজর পড়েছে রাহুর বোতলের দিকে, 'এটা আবার কোথায় পেলো' ঘরের ভেতরে পুরোপুরি ঢুকে পড়েছে সে।

চুরি করে আনার কথা স্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না, 'সেদিন প্রধান নাবিককে বলে নিয়ে এসেছি। পরে খাবো বলে। আজকে যে ঘটনা ঘটে গেছে, তাতে মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। তাই খুলে বসেছি।'

'ভালো করেছ। মনটা আমারও খুবই খারাপ।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলো রাহু। আরেকটা চুমুক দিয়ে বোতলটা বাড়িয়ে দিলো নাবিকের দিকে। খুশিতে প্রসন্ন হয়ে উঠলো নাবিকের চোখ, একটা বড়ো চুমুক দিয়ে অবশিষ্ট তরলের সিংহভাগ ফাঁকা করে দিলো সে, 'এতক্ষণে মনে হচ্ছে একটু ভালো অনুভব করছি। নাও, এটা তাড়াতাড়ি শেষ করো। প্রধান নাবিক তোমাকে ডাকছেন। এখনই যেতে হবে।'

বুকের ভেতরটা আবার ধরাস করে উঠলো। মাজিদ আবার তাকে ডাকবে কেন? তার কি সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয়েছে? তা তো হবার কথা নয়। অনেক কষ্টে নিজের কণ্ঠে ভয়ের আগমন থামিয়ে রাখলো রাহু, 'আমাকে এখন আবার কী জন্য ডাকছে?'

'শুধু তোমাকে না, সবাইকেই ডেকেছে। আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে ডেকে নেবার জন্য। সবাই এখন আছে ডেকের ওপর।'

রাহুর ভয় ক্রমশ বাড়ছে। তবে সেই ভয় একেবারে চলে গেল নাবিকের পরবর্তী কথায়, 'একটা ভোজ আর পানের আয়োজন হবে বলে মনে হচ্ছে। এই ঘটনার পর আসলে এই কাজই করার আছে। শোক মনে রেখে কাজ করা যায় না। মনে হয় পিছুটান রয়ে গেছে। একটু পানাহার হলে মন্দ হবে না। সবাই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। প্রধান নাবিক নিশ্চয়ই এটাই ভেবেছেন।'

মনে পড়লো রাহুর, মাজিদ এমন একটা কথা বলেছিল। নাবিকদের কে এই ঘটনার কথা ভুলিয়ে দিতে হবে। এখন সেটারই আয়োজন চলছে, 'আচ্ছা, তুমি যাও। আমি আসছি।'

সুরার বোতল খালি হয়ে গেছে। এখানে থাকার আর কোনো কারণ নাবিকের নেই। সে বেরিয়ে গেল একটা কথা বলতে বলতে, 'তোমার বানর নিয়ে এসো। তার খেলাও না-কি দেখানো হবে।'

'আচ্ছা।'

অঙ্গদকে নিয়ে বেরিয়ে এলো রাহু। ডেকের ওপর সব নাবিকেরা এসে জড়ো হয়েছে। পাড়ের থেকে জাহাজ এখন খুব বেশি দূরে নেই। সমুদ্রের মেজাজ শান্ত। জাহাজ চলছে মৃদু গতিতে।

মাজিদ এসে দাঁড়ালো সবার সামনে। নাবিকদের মনে সেই আদিকাল থেকেই প্রধান নাবিকের সম্পর্কে একটা সম্মান আছে। এখনো সেই ভাব বজায় আছে।

গম্ভীর গলায় শুরু করলো মাজিদ, 'আমাদের জাহাজে অনেক বড়ো একটা ঘটনা ঘটে গেছে। আমরা সবাই শোকাহত। আমাদের সাথি, আমাদের ভাই খুন হয়েছে অকুলাস বন্দরে। কিন্তু আমরা তার জন্য কিইবা করতে পারি? তেমন কিছুই

না। আমি সবাইকে বন্দরে একসাথে থাকতে বলেছিলাম। একজন মৃত মানুষে দোষ ধরা উচিত নয়, তবু বলছি কেন বাসিল বন্দরের ঐ নির্জন রাস্তায় কাউকে কিছু না বলে গিয়েছিল? কেউ কি বলতে পারো?'

সবাই নিশ্চুপ। মাজিদ জানে, সেটাই স্বাভাবিক। কারো কাছেই কোনো উত্ত নেই। মাজিদ আবার শুরু করলো, 'আমিও জানি না কেন গিয়েছিল। আমার মনে হয় বাসিলের এই বন্দরে অন্য কোনো গোপন উদ্দেশ্য ছিল। যাই হোক, এসব আমার ধারণা। তবে মূল সত্য হচ্ছে, বাসিল মরে গেছে। এই সত্য বদলানো যা না। এখন আমরা শুধু একটা কাজই ভালোভাবে করতে পারি। বাণিজ্য ক নিরাপদে ঘরে ফিরে যেতে পারি। আশা করি তোমরা সকলেই জানো, সমুদ্র যাত্র কোনো নাবিকের যাত্রা পথে মৃত্যু হলে, সেটা খুবই অশুভ লক্ষণ। আমাদের মধ্যে আর কারো প্রাণহানি হোক তা আমি চাই না। তাই শোক ভুলে আমাদের এখন য তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরেনিকে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে।'

রাহুও সবার সাথে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছে। মনে মনে মাজিদের ধূর্ততা প্রশংসা না করে পারছে না। নিদারুণ কৌশলে প্রথমে বাসিলের ব্যাপা নাবিকদের মনে একটা সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপরে বাসিলের মৃত্যু অলক্ষণের কথা বলে নাবিকদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে ভয়। এবার নাবিকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা ছাড়া আর কোনো কথা চিন্তাই করবে না।

মাজিদ এবার উৎসবের ঘোষণা দিলো খুবই সাবধান বাক্যের ব্যবহারে, 'আ জানি একটু ভালো খাবার, ভালো পানীয় তোমাদের মানসিকতা এখন একটু ঠা করতে পারবে। প্রধান নাবিক হিসেবে এই সময়ে একটু সাহসের ব্যবস্থা ক আমার কর্তব্য। জানি এই ক্ষত পুরোপুরি ভরবে না। তবু একটু কমলেই বা ক্ষ কী। তোমরা খাবার আর পানীয় গ্রহণ করো।'

দুজন নাবিক বেশি করে মাংস আর কয়েক বোতল সুরা নিয়ে এসেছে। এ দুঃখজনক পরিস্থিতির মাঝেও সেসব দেখে চকচক করে উঠলো নাবিকদের চোখ একটু পরেই তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লো ভাগাভাগিতে। সবার সাথে অংশ নি রাহুও। সবার মতোই আচরণ করতে হবে এখানে।

খাওয়ার পর পানীয় পান করা হলো আড়ম্বরে। তারপরে মাজিদের অনুরো অঙ্গদের কিছু খেলা দেখালো রাহু। রাহুর চোখ সবার সাথে ভোগের স্থানে থাকলে তার মন খুঁজছে অন্য জিনিস।

সবার মুখ আস্তে আস্তে চিন্তামুক্ত হয়ে এলো। অঙ্গদের লাফালাফিতে কে কেউ দুই একটা তালিও বাজালো। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে লাগলো

অঙ্গদকে লাফ দেওয়াতে দেওয়াতে সেই স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে এক অস্বাভাবিকতার খোঁজে চারিদিকে দৃষ্টি বোলাতে লাগলো রাহু। সে যেই পথে যা চিন্তা করছে, তার জন্য একটু অস্বাভাবিক পরিস্থিতির বড়ো প্রয়োজন।

তাদের সভাটা স্পার্টার আর সাধারণ কয়েকটা আড্ডার মতো নয় এটা উপস্থিত সবাই জানে। তবু আজকে একজন এই সভায় বিরক্তি প্রকাশ না করে পারলো না, 'আমরা প্রতি সপ্তাহে একবার করে মিলিত হচ্ছি। কিন্তু আসলে কি কিছু করতে পারছি? আমার তো মনে হচ্ছে কাজ তো দূর, কী কাজ করতে হবে সেই চিন্তাও আমরা ঠিকমতো করতে পারছি না।'

'ভুলে যাবেন না, আমাদের হাতে একটা কাজ আছে। আমরা প্রার্থনা আর উপচার দিয়ে এরিসকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করবো।' একজন মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করলো তাদের বর্তমান হাতের কাজ।

'সেই চেষ্টা তাহলে করছি না কেন?' এবার প্রশ্নটা একটু অন্যদিকে ঘুরে গেল, 'আগেও তো আমরা এমন চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হইনি।'

আরেকজন এবারও তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, 'কারণ সেই কাজের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন আছে। সময়ের আগে তো আর সেই কাজ করা যাবে না।'

'ঠিক আছে। আমাদের হাতে একটাই কাজ করার আছে। সেই কাজ করার সময় এখনো আসেনি। তাহলে আমরা প্রতি সপ্তাহে মৃত্যুভয় মাথায় আর গোপনীয়তা কাঁধে নিয়ে কেন এই সভা করে যাচ্ছি? সময় আসলেই কাজ করবো।'

এবার অ্যালেস্টর কথা বলে উঠলেন, 'কেন? তোমার কি এখানে বসে থাকতে খুব সমস্যা হচ্ছে? তোমার মনে কি এখন নির্বিঘ্ন সুখ ভোগ করার ইচ্ছে জেগেছে না-কি? জানো তো, সেই ইচ্ছে প্রকাশ করাও আমাদের এখানে অপরাধ। একবার যে এই দলে ঢুকে পড়েছে সে আর কিছুতেই বেরিয়ে যেতে পারবে না। চেষ্টা করলে তার পরিণতি কী হবে তা সকলেই জানে।'

অন্য লোকের সাথে বিরক্ত কথক যেভাবে বার্তালাপ চালাচ্ছিল, মহা অভিজাত অ্যালেস্টরের সাথে তো সেভাবে কথা বলা যায় না। তার গলা নিচু আর করুণ হয়ে এলো, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আসলে এই গোপন পরিচয় বহন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। এত ত্যাগের বিনিময়ে যদি আসল কাজ কিছু হতো তাহলেও চলতো। কিন্তু জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিয়েও যখন দেখি আদতে কিছুই লাভ হচ্ছে না, তখন আর ভালো লাগে না, সত্যিই ভালো লাগে না।'

'ভালো আমাদের কারোই লাগছে না, ব্যর্থ হতে কারোই লাগে না। কিন্তু আমাদেরকে আমাদের শপথ মনে রাখতে হবে।'

অনুভূতির গভীর আলাপ থেকে আরেকজন তাদেরকে বের করে আনলেন, 'আমরা আজকে কী নিয়ে আলাপ করতে পারি?'

'অবশ্যই দল ভারী করা নিয়ে। নতুন অভিজাত বেছে নেওয়া হয়েছে। তাদে মধ্য থেকে কয়েকজনকে বেছে নিতে পারলে ভালো হয়।'

'হ্যাঁ' অ্যালেস্টর সায় দিলেন, 'সেই কথাই আলোচনা করবো। এরই মধ্যে বাছাই হওয়া অভিজাতদের আচার আচরণ পরীক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে আমাদের বাছাই করা লোকেরাই সেই কাজ করছে।'

'এরই মধ্যে কি কাউকে বেছে নেয়া হয়েছে?' এক বৃদ্ধ জানতে চাইলেন।

'এখনো না। এই কাজে তাড়াহুড়া করলে চলবে না। একজন ভুল লোককে বাছা করলে আমাদেরকে জীবন দিয়ে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমার নজর অব এবারের মহা অভিজাত হওয়া ছেলেটার দিকে আছে। তবে ছেলেটার চোখেমু উচ্চাভিলাষের ছায়া স্পষ্ট।' অ্যালেস্টর নিজের মত ব্যক্ত করেন।

বৃদ্ধ একমত হলেন, 'আমিও তাই দেখেছি। ছেলেটার নাম নিকোলাস। ত জানোই তো আমার সাথে ক্রিস্টেয়ারের শিক্ষকদের এটা যোগাযোগ আছে। যদি তেমন গভীর নয়, তবু খবর পাবার জন্য যথেষ্ট। সেখান থেকেই শুনলাম নিকোলাসের আসলে এবারের মহা অভিজাত হবার কথা ছিল না। একেবারে শে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হয়েছেন শিক্ষকেরা।'

এই কথায় সবাই অবাক হয়। মহা অভিজাত বাছাই করার সিদ্ধান্ত বেশ ভে নেয়া হয়। হঠাৎ করে বদলে নেবার মতো সিদ্ধান্ত এটা না। সবার মধ্যে একটা গুঞ্জন ওঠে।

ব্যাপারটা অ্যালেস্টরও খেয়াল করেছিলেন, 'অনুষ্ঠানের মধ্যে তো দেখলাম একটা ঝামেলা হয়েছিল। দুজন সৈনিকের ব্যর্থতা ধরা পড়েছিল। পরে ঐ দুজন তৃতীয় শ্রেণীর অভিজাত বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর তেমন কোনো খ পাইনি।'

একটা গোপন খবর দেবার উত্তেজনা বৃদ্ধের গলায়, 'ঐ দুজনের মধ্যে একজনের মহা অভিজাত হবার কথা ছিল। সেই ছেলে না-কি কিছু কিছু জায়গা শিক্ষকদেরও মাত করে দিয়েছিল। এমন ছাত্র না-কি ক্রিস্টেয়ার অনেক ক পায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা হেলট পরিবারকে দয়া করার ভুল করেই ছেলে নেমে এলো একেবারে তৃতীয় শ্রেণিতে।'

'যে তৃতীয় শ্রেণিতে নেমে এসেছে তাকে নিয়ে আর চিন্তা করে লাভ কী তৃতীয় শ্রেণির একজনকে নিশ্চয়ই আমরা আমদের এই সভায় জায়গা দেবো না এক যুবক অভিজাত মতামত দিলো।

বৃদ্ধ নিজের মতামত তখনো পুরোপুরি জানায়নি, 'আমার মনে হয় তৃতী শ্রেণি হলেও সেই ছেলের কথা আমাদের একটু চিন্তা করা উচিত। যুদ্ধ

গুপ্তচরগিরির কৌশলে সেই ছেলের সমকক্ষ কেউ নেই। এমন একজন আমাদের দলে থাকলে নিশ্চয়ই কাজে লাগবে।'

অ্যালেস্টর বৃদ্ধের এই মত হাতের বাতাসে উড়িয়ে দিলেন, 'আরে কী আর এমন করেছে। হয়তো দুই একটা ঝলক দেখিয়েছে। কিন্তু সে যেই ভুল করেছে তা তো আর সাধারণ ভুল নয়। সামান্য একটা হেলট পরিবারের প্রতি দয়া দেখিয়েছে সে। মনে হয় রক্ত দর্শনে তার ভয় জন্মেছে। যে যোদ্ধার মনে দয়ার উদ্রেক হয়, সে আর কোনো কাজে লাগে না। ঐ ছেলের কী যেন নাম?'

'ইভান।'

'ওর চিন্তা বাদ দিয়ে আপনারা সবাই বাকিদের কথা চিন্তা করুন। প্রথম শ্রেণির অভিজাতদের দলে ভেড়াতে হবে। তাদের কাছে নিজের ছোটো একটা সেনাদল থাকে, দাপ্তরিক অনেক কাজে তাদের অংশগ্রহণ থাকে। কেবল শক্তি থাকলেই হবে না, তার সেই শক্তি প্রয়োগের সুযোগ আর ক্ষমতাও থাকতে হবে।'

বৃদ্ধ আর কিছুই বললেন না। একেকজন একেক নয়া অভিজাতের আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। শুধু নিজেদের দলে প্রবেশ করানোই একমাত্র লক্ষ্য নয়। সেই সাথে নতুন অভিজাতদের নিজস্ব সেনাদলের মধ্যে নিজেদের সেনাদেরও ঢুকিয়ে দিতে হবে। নিজের দলের বাইরের সবার ওপরেই চরগিরি চালানোর উপায় রাখতে হবে। সেই গুপ্তচর নিয়োগের উপায় নিয়েও বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা চললো। আস্তে আস্তে পরিকল্পনায় চেপে বসলো সবার মাথা। সভার প্রথমে যে হতাশার আভা সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল তা আর এখন অবশিষ্ট নেই।

সৈনিকদের নাম ধাম আর কৌশল ঠিক করতে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। এখন নগরের দিকে যাত্রা করতে হবে। তারা সবাই এক সাথে যাবেন না, এক দিক দিয়েও যাবেন না। এই সভার বাইরে তারা এক অপরকে ঠিকমতো চেনেনও না।

অ্যালেস্টর নিজের ঘোড়ার গাড়িতে চড়লেন। তিনি আজকে প্রবেশ করবেন পূর্ব দিক দিয়ে। নিজেকে লুকিয়ে রাখার কোনো উপায় তার নেই। স্পার্টায় তিনি একজন সম্মানিত লোক। যা সম্ভব নয় সেই চেষ্টা তিনি করেনও না। এক ঘোড়ায় টানা রথের ওপর মাথা উঁচু করে নগরে প্রবেশ করলেন তিনি। রাস্তার লোকজন মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাচ্ছে তাকে। তিনি জবাব দিচ্ছেন না। নাক উঁচু করে এগিয়ে যাচ্ছেন। আহা, এই লোকেরা যদি বুঝতো, তাদের অনাগত ভবিষ্যতের জন্য তিনি কত পরিশ্রম করে চলেছেন, তাহলে তাকে শুধু ওপরে ওপরে সম্মান দেখাতো না, বরং মন থেকেও সম্মান করতো।

নিজের বাড়ির কাছে আসতেই মনটা ভালো হয়ে গেল তার। বাইরে থেকেই ইনোনকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি। তার জীবনে ব্যক্তিগত বলতে এই মেয়েটাই আছে। আর কারো জন্য ব্যক্তিগত অনুভূতি লালন করেন না তিনি।

ইনোন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকেই দেখতে পেয়েছে বাবার রথ। চোখ আসলে দেখতে পেয়েছে অনেকক্ষণ আগেই, কিন্তু মন যে পড়ে আছে অন্য কোথাও। শূন্য দৃষ্টি মেলে পথের দিকে তাকিয়ে আছে সে। যে পথের কোনো অন্ত নেই। মহাকালের মতো যা চলে গেছে পৃথিবীর বুক চিঁড়ে অন্ধকার পাতালের দিকে।

অঙ্গভঙ্গি করে মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেননি অ্যালেস্টর। তবে তিনি একটু অবাক হলেন। মেয়েটা এদিকেই তাকিয়ে আছে, নিশ্চিত তাকে দেখতে পেয়েছে, তবু তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। এমনিতে তাকে দেখলে এখনো যেন শিশুর মতো আচরণ করে ইনোন। আজ কী হলো!

নিজের মনের অন্দরে একটু চিন্তায় ডুব দিলেন তিনি। মেয়ের আচরণের কারণ ধরতে পারলেন। এখন আর তাকে দেখে শিশু হয়ে থাকার বয়স নেই তার। এখনই তো বয়স। চোখে রং লাগবে। নানা স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠবে। মেয়েকে নিয়ে এতদিন যে ভাবনাটা মনের গভীরে একটু নড়াচড়া করতো সেটা যেন এবার একটু ওপরে উঠে এলো। না, এবার মেয়েকে পাত্রস্থ করতে হবে। সুপাত্রের অভাব হবে না। সদ্য বেছে নেয়া অভিজাতদের মধ্যে কাউকে বেছে নিতে হবে।

ভাবনাটা তার মাথায় আসতেই আরেকটা চিন্তাও খেলে গেল। এই নগরে তিনি একাই কন্যা দায়গ্রস্থ পিতা নন। আরও অনেকেই আছেন। আর তারা সবাই এখন হন্যে হয়ে অভিজাতদের কাছে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিতে চাইবেন। না, তাকেও এই প্রতিযোগিতায় শামিল হতে হবে। তার প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। তিনি এক সময়ের মহা অভিজাত। প্রতিযোগিতায় তিনি ভালোভাবেই এগিয়ে থাকবেন।

প্রাসাদের সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো তার রথ। নেমে দাঁড়াতেই দুই প্রহরী ঘোড়া আর গাড়ি সামলাতে চলে এলো। তিনি প্রবেশ করলেন প্রাসাদে। সরাসরি চলে গেলেন দোতলার বারান্দায়। মেয়ের সাথে কথা বলার জন্য আর তর সইছে না। মেয়েকে বিদায় করতে নিশ্চয়ই বুক ফেটে যাবে। তবে একটা ভালো পাত্রের দায়িত্বে মেয়েকে দেবার মতো স্বস্তির ব্যাপার খুব কমই আছে।

ইনোনের পেছনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ইনোন এখনো খেয়াল করেনি। পাথরের মূর্তির মতো এক মনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিঃশ্বাস পড়ছে খুবই ধীরে। বুকের ওঠানামা একেবারেই ধরা যাচ্ছে না।

'এখানে কী দেখছিস মা?'

আচমকা বাবার গলার স্বর কানে যেতেই একটু থতমত খেলো ইনোন। সামলে নিতে পারলো না পুরোপুরি, তার গলা কেঁপে উঠলো উত্তর দিতে গিয়ে, 'কিছু না বাবা, এমনিতেই দাঁড়িয়ে আছি।'

'তোর গলার স্বর এমন শোনা যাচ্ছে কেন?'

'কিছু না বাবা। এইতো ঠিক হয়ে গেছে। তুমি কখন এসেছ?'

'এখনই এসেছি। সেই রাস্তা থেকেই দেখলাম তুই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছিস। একটুও নড়ছিস না। কোনো সমস্যা হয়েছে না-কি?'

ইনোন কিছুই বলল না। বাবাকে এই কথা সে কিছুতেই বলতে পারবে না। বাবা সেদিন যখন তাকে পছন্দের কাউকে নিয়ে প্রশ্ন করেছিল সেদিন সে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি তাকে এমন কোনো পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। নিজের অবস্থা নিয়ে অহংকার তার কোনদিনও ছিল না। এসব আরাম আয়েশকে সে কখনোই আবশ্যক ভাবেনি, মহা অভিজাতের মেয়ে হয়েও কারো প্রতি অনাবশ্যক বিদ্বেষ পোষণ করেনি। কিন্তু রক্তের একটা ব্যাপার বোধহয় থেকেই যায়। আর সেই জিনিসের জন্যই মনের ভেতরে পাহাড়সম ভালোবাসাও যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। কেউ যেন তার মনের ভেতর থেকে ক্রমশ বলে চলেছে, না, ইভান তোমার কোনোদিন হবে না। বাবাকে এত বড়ো অপমান তুমি করতে পারো না, এই বংশকেও অপমান করতে পারো না। সেই ছেলে ছিল খুবই সুন্দর একটা স্বপ্ন যার রেশ ভোরের রোদ চড়লেই মিলিয়ে যায়।

নিজের মুখে অনেক কষ্টে হাসি ফুটিয়ে তুলল ইনোন, 'না, কী সমস্যা হবে। এমনিতেই একটু চিন্তা করছিলাম। তুমি তো অনেকক্ষণ না খেয়ে আছো। খেতে দেবো?'

'সে পরে হবে। আগে তোর সাথে একটু কথা বলি। অভিজাত বাছাইয়ের অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সেই অনুষ্ঠান তো হয়ে গেল। কেমন দেখলি?'

'কী?' গলার স্বরে আপ্রাণ স্বাভাবিক থাকার প্রয়াস।

'আরে অনুষ্ঠানের কথা বলছি। তুই তো আগে কখনো এই অনুষ্ঠান দেখিসনি। তাই বললাম আরকি। ক্রিপ্টেয়ারের যোদ্ধাদের কেমন দেখলি?'

'কেমন আবার দেখবো? তুমিও তো ঐ দলেই ছিলে? তোমাকে তো ছোটোবেলা থেকেই দেখছি।'

'আরে আমার সেই চেহারা তো তুই দেখিসনি। দেখেছিল তোর মা। তুই আমাকে যখন দেখেছিস ততদিনে আমার সেই শরীর কি আর ছিল। একেকজন যেন পাথরের ভাস্কর্য। জানিস, শরীরের কোনো পেশীতে একটুও খামতি থাকলে তাকে কৃতকার্য করানো হয় না।'

ইনোন কিছু বলে না। তার কথার জন্য অপেক্ষাও করেন না অ্যালেস্টর, 'ওদের থেকে একজনকে বেছে নিতে হবে এবার আমাদের। জানিস তো, এখন স্পার্টার সবাই ওদের পেছনে লাগবে। দেরি করলে পরে দেখা যাবে, সবাই ভালো জিনিস নিয়ে গেছে আমাদের জন্য ফেলে রেখে গেছে বাতিল মাল।' এবার একটু জোরেই হেসে উঠলেন অ্যালেস্টর।

ইনোন এবারও কিছু বলল না। 'আচ্ছা', অ্যালেস্টর এবার মেয়ের মতামত জানতে চাইলেন, 'সেদিন ওখানে যারা ছিল তাদের মধ্যে কাকে তোর পছন্দ হয়েছিল? অবশ্যই বাছাই তো করেছিস তুই? জানতি ওখান থেকেই একজনের সাথে আমি তোর বিয়ে দেবো। বল।'

মাথা নিচু করে ফেললো ইনোন। হ্যাঁ, ঐ চব্বিশ জনের মধ্যেই একজনের ওপর তার চোখ আর মন দুইই পড়েছিল। কিন্তু, তার কথা বাবাকে কিছুতেই বলা যাবে না। আর বাকিদের কারো দিকেই তো সে তাকায়নি। ঐ ঘটনা যখন সেদিনের উৎসবে তাকে আঘাত করেছিল, তার আগে তো সে কেবল ইভানের দিকেই তাকিয়ে ছিল। আর কাউকে দেখার, কারো নাম জানার সময় সুযোগ কোনোটাই হয়ে ওঠেনি তার। এখন বাবাকে কী বলবে সে। তিনি নিশ্চয়ই ইনোনের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছেন।

এই বিপদ থেকে তাকে বাঁচালো ডোরা। একটু আগেই ডোরা বাবা আর মেয়ের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই এবার বলে উঠলো, 'আপনার যেমন কথা। কোনো মেয়েকে কি বাবা এভাবে এই কথা সরাসরি জিজ্ঞেস করে? মেয়ে বাবাকে এসব কথা সরাসরি কখনো বলে?'

নিজের ভুলটা বুঝতে পারলেন এবার অ্যালেস্টর, 'তাই তো। কিন্তু তাহলে আমার মেয়ের মনের কথা কে আমাকে জানাবে?'

'সেটা এই দাসীই করবে। আপনি কোনো কিছু চিন্তা করবেন না। আমি ছেলের নাম, গোত্র, বংশ সবই আপনাকে জানিয়ে দেবো। এখন আপনি খেতে চলুন। আপনার খাবার সাজিয়ে দিয়েছি।'

'যাক, তুই থাকাতেই রক্ষা। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে যাই। তোরা কথা বল।'

অ্যালেস্টর চলে যেতেই ডোরা এগিয়ে এলো ইনোনের দিকে। সে তো সবকিছুই জানে। সেদিনের সেই উৎসবে সেও ছিল। কিছু বলতে হলো না এতদিনের সাথিকে। কাঁধে হাত রাখতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ইনোন। চোখের জল অনেকক্ষণ আটকে থেকে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, এখন আর বাঁধ মানলো না।

চারিদিকে চকিতে চোখ বুলিয়ে নিলো ডোরা। এখন ইনোনকে কেউ কাঁদতে দেখলে বিপদ হতে পারে। সে ইনোনের হাত ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকতেই ইনোন এবার চোখের জল বর্ষণ করতে লাগলো।

ডোরা বলে বসে, 'আপনি বাবাকে সবকিছু বলে দিন। এভাবে নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী?'

'কী বলবো', কাঁদতে কাঁদতে বলে ইনোন, 'আমি তৃতীয় শ্রেণির এক অভিজাতকে বিয়ে করতে চাই। বাবা রাজি হবেন?'

'হতেও তো পারেন। আপনাকে কত পছন্দ করেন তিনি। আবদার করলে তিনি নাও ফেলতে পারেন। চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?'

'তুই জানিস না, স্পার্টার মহা অভিজাত কী ধাতু দিয়ে তৈরি। একবার আমার এই কথা শুনলে তার অহংকার জেগে উঠবে। তখন পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে উঠবে। ইভানকে তিনি শত্রু ভাববেন। আমি ইভানের কোনো ক্ষতি হোক তা চাই না।'

'তাহলে এখন কী করবেন?'

ইনোন বিছানার ওপর বসে পড়ে, 'তুই একটু বাবার কাছে যা। যাবার সময় ঘরের দরজাটা লাগিয়ে দিস। বাবা জিজ্ঞেস করলে আপাতত কিছু বলার দরকার নেই।'

'এটা তো আমি কী করবো সেটা বললেন। আপনি এখন কী করবেন?'

'দেখি, এই চোখে এই কদিন ধরে যে ছবিটা এঁকে চলেছি, চোখের জলে সেই ছবিটা মুছে ফেলা যায় কি না।'

বৃদ্ধ শেইরনকে ওপরে উঠতে দেখে সবাই বৃদ্ধের বিপদ শঙ্কায় চিন্তিত হয়েছিল। কিন্তু জগতে যখন নিজের বিপদের সময় আসে তখন অন্য সবার বিপদ গৌণ মনে হয়। বৃদ্ধ এখন ঝড়ের তোড়ে উড়ে যাবেন কিনা সেই চিন্তা কারো মাথায়ই এলো না, সবাই কেবল একটা কথাই শুনতে পেয়েছে, 'নিচে জল ঢুকছে।'

অভিজ্ঞ নাবিকেরা তো তার মানে জানেই, রুদ্রদেব আর অসিতেরও বুঝতে সমস্যা হলো না ঘটনার গুরুত্ব। নিচের জাহাজের খোলের কিছু অংশ ঢেউয়ের বিশাল বিশাল ধাক্কা সামলাতে পারেনি, ভেঙ্গে গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কতটুকু ভেঙ্গেছে।

পানি যদি একবার খোল ভরিয়ে ফেলে তবে আর রক্ষা নেই। প্রধান নাবিক চিৎকার করে উঠলেন, 'জলদি যতজন পারো নিচে যাও। ঈশ্বরের দোহাই দেখো কী হয়েছে।'

নাবিকেরাও বুঝতে পেরেছে এখানে জমে বসে থাকলে আর বেঁচে যাবার উপায় নেই। জাহাজ ডুবে যাবে কিছুক্ষণ পর। প্রধান নাবিক হাল ধরে বসে আছেন, তিনি নড়তে পারবেন না। বাতাসের বেগকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতেই হবে। কয়েকজন নাবিক অতি কষ্টে এগোলো খোলে নামার সিঁড়ির দিকে। বাতাসের চিৎকার কমার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই।

জলের তোড়ে যাতে নিভে না যায় এমন বেশ কিছু বিশেষ লণ্ঠন আছে জাহাজে। সেগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটা ভেঙ্গে গেছে। যে দুই একটা আস্ত ছিল সেগুলো নিয়েই নিচে নেমেছে তারা। রুদ্রদেব আর অসিতও নেমেছে।

নিচে নেমে যা দেখল তাতে শেইরনকে ওপরে উঠে পড়ার জন্য দোষ দেওয়া গেল না। যে পরিমাণে পানি ঢুকছে তাতে বৃদ্ধের পক্ষে একা কিছুই করার ছিল না। বৃদ্ধও নিচে নেমেছে তাদের সাথে। এখানে বাতাসের আওয়াজ একটু কম, বৃদ্ধের গলার স্বর স্পষ্ট শোনা গেল, 'অবস্থা দেখি আরও খারাপ হয়েছে। ওপরে ওঠার সময় হাঁটু পানির ওপরে ছিল, আর এখন হাঁটু পানির নিচে।'

নাবিকেরা এরই মধ্যে নিজেদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। দুটো কাজই এক সাথে করতে হবে। জল ঢোকার জায়গা খুঁজে বের করে বন্ধ করতে হবে, তারপর জল সেঁচে বের করে দিতে হবে।

প্রথম কাজটা সহজ হবে না। জল যে জায়গা দিয়ে ঢুকছে সেটা পানির ওপরে নেই, জায়গাটা চলে গেছে পানির নিচে। এখন পায়ের নিচ থেকে জল উঠে আসছে। তার ওপর আলোর ভীষণ অভাব। কালিগোলা অন্ধকারে কী খুঁজবে সেটা বোঝা মুশকিল। তবু নাবিকেরা জলের নিচে হাত চালাতে লাগলো উৎসের সন্ধানে। জাহাজ দুলছে পাগলা ষাঁড়ের মতো। এই দুলুনিতে নিজের পাও সামলে রাখা দায়।

রুদ্রদেব নিজেও হাত লাগিয়েছে জল ঢোকার উৎসের সন্ধানে। কিন্তু হাতিয়ে মরাই সার হচ্ছে। কিছুক্ষণ পড়ে যখন জলের স্তর উরু স্পর্শ করলো, তখন নাবিকদের টনক নড়ল। এক নাবিক চেঁচিয়ে বলল, 'সবাই মিলে খোলের ফাটল না খুঁজে কেউ কেউ জল বাইরে বের করে দাও। নইলে একটু পরে আর কিছুই করা যাবে না।'

নাবিকের পরামর্শ সবাই মেনে নিয়েছে। বেশির ভাগ এখন জল সেঁচে ফেলার কাজে লেগেছে। শুধু দুই থেকে তিনজন আছে হাতড়ানোর কাজে। রুদ্রদেব অসিতকে জল সেঁচার কাজে লাগিয়েছে। খোলের ভেতরে বালতির অভাব নেই। সবাই যে যেভাবে পারছে খোলের জানালা দিয়ে জল বাইরে ফেলছে। আগমন আর নির্গমনের ভারসাম্য রক্ষা করে জেতার তুমুল চেষ্টা চলছে।

অসিত পূর্ণ বেগে কাজ করছে। শরীরে ক্লান্তির লেশ মাত্র আসছে না তার। আর অবাক হয়ে খেয়াল করছে, তার একটুও ভয় লাগছে না। শুধু ভয় যে লাগছে না তাই নয়, তার অদ্ভুত এক আনন্দ হচ্ছে। মৃত্যুর এত কাছে দাঁড়িয়ে থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করার মধ্যেও যে আনন্দ থাকতে পারে তা আগে জানা ছিল না।

এতজনে মিলে সেঁচেও ঠিক কুল পাওয়া যাচ্ছে না। রুদ্রদেব জলের মধ্যে বসে পড়েছে। তখনই এক নাবিক অন্ধকার কোণ থেকে চিৎকার করে উঠলো, 'এদিক দিয়ে জল ঢুকছে। এদিক দিয়ে।'

সাথে সাথে তার দিকে এগিয়ে গেল দুজন। খোলের ভেতরে আলমারির মধ্যে হাতুড়ি আর পেরেক আছে। খোলের ফাটল কত বড়ো সেটা আগে দেখতে হবে। একটু পরীক্ষা করতেই আন্দাজ করা গেল। সেই মাপে একটা কাঠের টুকরো জলের ভেতর ডুবিয়ে ফাটল বন্ধ করে দেওয়া হলো। তারপর পেরেক চারটে বিঁধিয়ে দিতেই জল ঢুকে আসা কমে এলো। এখনই আনন্দ করার কোনো কারণই নেই, তবু জল ঢুকে যাওয়া কমে যেতেই নাবিকদের মধ্যে একটু হর্ষধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছে। রুদ্রদেব অবাক হয়ে দেখছে সেই ধ্বনির সবচেয়ে বড়ো আওয়াজটা বেরিয়েছে অসিতের মুখ দিয়ে।

একজন ওপরে ছুটল প্রধান নাবিককে খবর দিতে। নিচের দুশ্চিন্তা একটু হলেও কেটেছে। বাকিরা নিচের জমা জল বাইরে ফেলে দিতে লাগলো।

রুদ্রদেবের মাথায় ঘুরছে অন্য চিন্তা। জাহাজের খোল একবার যখন ফেটেছে তখন আরেকবার ফাটতে দোষ কী। এখনো ঢেউ এসে খোলের গায়ে বেদম আঘাত করছে। নাবিকদের কেউ কেউ যে রুদ্রদেবের মতো ভাবছে না তা নয়। উল্লাস করার দলে তারা ছিল না। অসিত ওদিকে জল সেঁচে ফিরে এসেছে রুদ্রদেবের দিকে, 'জাহাজ মনে হয় ডুববে না। কী বলেন আপনি?'

'না ডুবলেই ভালো। তুমি এখানেই থাকো। যত কিছুই হোক না কেন, জল ঢুকবে। ওদেরকে সেঁচার কাজে সাহয্য করো। আমি একটু ওপরে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা।'

রুদ্রদেব ওপরে চলে এলো। নিচের কম বাতাসের পরিবেশ থেকে বেশি বেগের বাতাসের মধ্যে পড়তেই শরীর পাক দিয়ে উঠতে চাইলো। কিন্তু, নিজের দেহের ভারসাম্য আর শক্তি সম্পর্কে ভালোই জ্ঞান রাখে সে। ব্যাপারটা আমলে দিলো না। বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে মনে হলো। বাতাসের সাথে যুদ্ধ করে সে পৌঁছে গেল প্রধান নাবিকের কাছে।

এখন আর নাবিকেরা কোনো ধরনের চিৎকার করছে না। না প্রার্থনা, না আতংক। এখন কিছুই নেই। মানুষ জীবনের একটা সময় নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিতে বাধ্য হয়। প্রধান নাবিকের অবস্থাও এখন তেমন। কোনোমতে কেবল ধরে রেখেছে হালের হাতল।

রুদ্রদেব জিজ্ঞেস করলো, 'এই ঝড় আর কতক্ষণ থাকবে?'

প্রধান নাবিক হাতলটা একটু বামে ঘোরালো, 'সমুদ্রের ঝড় কতক্ষণ থাকবে তা কেউ বলতে পারে না। এটা সমুদ্রের মর্জির ওপর নির্ভর করে। তবে আমি এটুকু বলতে পারি আমরা আর বেশিক্ষণ থাকবো না। এই জাহাজ আর টিকবে না। সামনের ঘূর্ণি আস্তে আস্তে জাহাজকে ঘিরে ফেলছে। একবার ঘিরে ফেললেই আর কোনো উপায় নেই।'

রুদ্রদেব আর কিছু বলার মতো খুঁজে পেলো না। এবার বোধহয় ভাগ্যের হাতেই নিজেকে সঁপে দিতে হবে। তখনই একবার বেশ জোরে দুলে উঠলো জাহাজ। নিজের কথা ফলে যেতে এই বিপদেও প্রধান নাবিকের মুখে হাসি দেখা দিয়েছে, 'কী বলেছিলাম না, ঘূর্ণি এগিয়ে আসছে। চলে এসেছে। এখন দেখবে বাতাসের মধ্যে পড়ে জাহাজ পাক খেতে শুরু করবে। জল আর বাতাস এক সাথে জাহাজ নাচাবে।'

একটু দূরেই শেইরনের ওপর নজর পড়লো রুদ্রদেবের। বাতাসের বেগ বেড়ে যেতে তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি। শুয়ে পড়েছেন। সেই সাথে নিজের দেহকে নিজের হাতেই দড়ি দিয়ে বেঁধেছেন।

রুদ্রদেব কাছে যেতেই তিনি বললেন, 'তোমাদের ভাষা শিখে বেশি লাভ হলো না। বিদ্যা কাজে লাগাতে না পারলে সেটা মরুভূমির সমান।'

রুদ্রদেব একবার অশান্ত গর্জন করা সমুদ্রের দিকে তাকালো, 'আপনার ভয় করছে না?'

এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না শেইরন, তবে বললেন, 'বাহ, তোমার এই মিশরীয় বাক্যটা তো একেবারে নির্ভুল হয়েছে।'

এবার হাসলো রুদ্রদেব, 'আমার কিন্তু ভয় করছে। অনেকদিন পরে ভয়ের অনুভূতি টের পাচ্ছি।'

'আমিও পাচ্ছি। তবে ভয় পেলেও এই জীবন নিয়ে আফসোস নেই। আমি এই জীবনের যাপন নিয়ে খুশি। তুমি খুশি না?'

একটু ভাবলো রুদ্রদেব, 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আমিও সন্তুষ্ট।'

'বাহ, এই বাক্যটাও তো ঠিক হয়েছে।'

তখনই অসিত উঠে এলো নিচ থেকে। সাথে আরও দুই নাবিক। চিৎকার করে ওরা বলছে, খোলের এক পাশে বড়ো একটা অংশ ভেঙ্গে পড়েছে। জল বানের মতো ঢুকছে। সেই ফাটল বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। সেঁচে জল বাইরে বের করে দেবারও কোনো উপায় নেই।

কথাটা শুনে প্রধান নাবিক হতাশ হলো না। সে জানে, এই খোল অনেক যত্ন করে বানানো হলেও এতক্ষণ পানির চাপ সহ্য করার মতো শক্তি তার নেই। একসময় ভেঙ্গে পড়তোই। নাহ, আর চেষ্টা করে লাভ নেই। জাহাজ ঘূর্ণিতে পড়লেও ডুববে, জল ঢুকে ডুবলেও ডুববে।

হালটা ছেড়ে দিলো প্রধান নাবিক। সাথে সাথে জাহাজ স্রোতের অনুকূলে ঢুকে পড়লো। তীব্র বেগে পাক খেতে লাগলো। প্রধান নাবিক সেসব দেখতে পেলো না। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেও এবার হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়েছে সে। তাকিয়েছে ওপরের দিকে। নাহ, প্রার্থনা করার জন্য নয়। এতক্ষণ বাতাস আর বৃষ্টি ঠিক অনুভব করতে পারছিল না কর্তব্যের খাতিরে। এবার বাতাসের ঝাপটা আর বৃষ্টির ফোঁটা দুইই অনুভব করতে লাগলো সে। বুজে এলো চোখ। এটাও মনে হচ্ছে এক রকমের প্রার্থনা।

রুদ্রদেব উঠে দাঁড়ালো। তাকিয়ে দেখলো সমুদ্রের দিকে। বিদ্যুৎ চমকের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলো দৃশ্যটা। সমুদ্রের বুকে একটা ভয়ংকর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সবগুলো জল যেন প্রতিযোগিতা করছে কার আগে কে ঐ গর্তে পড়বে। জাহাজটা সেই জলের স্রোতের সাথে ঘুরে ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছে ঐ গর্তের দিকে। জলের সাথে প্রতিযোগিতা করছে সেও।

অসিত বিরস মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রুদ্রদেব তার দিকে তাকালো, 'মন খারাপ কোরো না। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। সেটাই বড়ো কথা।'

কথাটা বলেই আচমকা কথাটা মনে পড়লো রুদ্রদেবের। সেই তিন হাজার বছর আগের সেই ঘটনা। তার শিক্ষা। না, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় আছে। এতক্ষণ কেন সেই উপায় মাথায় এলো না তা ভাবতেই নিজেকে মৃদু তিরস্কার করতে ইচ্ছে করলো তার। তাড়াতাড়ি অসিতের দিকে তাকালো সে, 'তুমি এখানেই থাকবে। শেইরনের কাছে। আমি একটু আসছি।'

'আপনি আবার কোথায় যাচ্ছেন?'

'একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেল।'

'একটু পরে সবাই মিলে ডুবে মারা যাবো, আর এখন আপনার মনে পড়েছে কাজের কথা।'

'এজন্যই তো তাড়াহুড়া করে যাচ্ছি। হাতে সময় থাকলে ধীরে সুস্থে যেতাম। কথা বাড়িও না। অপেক্ষা করো এখানে। ভাগ্য ভালো হলে আমাদের আবার দেখা হতেও পারে।'

অসিতকে স্তব্ধ করে রুদ্রদেব নিজেদের কামরার দিকে চলে গেল। সেখানে এসে বের করলো নিজেদের অস্ত্র গুছিয়ে বেঁধে রাখা পুঁটুলিটা। জলে ভিজেছে কিন্তু তেমন কিছু হয়নি। বাঁধন খুলতেই অস্ত্রগুলো বেরিয়ে এলো। সেগুলোর ভেতর থেকে নিজের ধনুক খুঁজে নিতে তেমন কোনো সমস্যা হলো না তার। ধনুকটা হাতে নিয়ে কামরা থেকে বেরোল সে। একটা আড়াল মতো জায়গা দেখে দাঁড়ালো শরীর সোজা করে।

জলের দিক আগেই দেখে নিয়েছে সে। এবার বাতাসের বেগ আর দিকটাও বুঝে নিলো। তারপর দাঁড়িয়ে পড়লো বীরভদ্রাসনে।

ওদেরকে শিক্ষার সময় গুরু একটা কথা বলে দিয়েছিলেন। সেই তিন হাজার বছর আগে। দিব্যাশাস্ত্রের শক্তি প্রকৃতির নানা শক্তি থেকেই পাওয়া যায়। নিজের দেহের ভেতরে জমা থাকা প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করাই দিব্যাশাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। তবে এসব অস্ত্র কেবল শত্রুর বিপক্ষেই ব্যবহার করা যায় না। প্রাকৃতিক শক্তি যখন নিজের বিরুদ্ধে চলে যায় তখনো ব্যবহার করা যায়। তবে গুরু নিষেধ করেছিলেন, শুধুশুধু এসব অস্ত্র ব্যবহার না করতে। যখন প্রাণ সংশয় হবে তখন ব্যবহার করা যাবে অবশ্য।

প্রাণ সংশয়ের এরচেয়ে বড়ো সময় নিশ্চয়ই এই জীবনে আর আসবে না। ধনুকের ছিলায় টান দিলো রুদ্রদেব। মনোযোগ মূলাধারে নিয়ে এসেছে। সাথে সাথে বায়বাস্ত্র দেখা দিলো ধনুকে। জ্যা সম্পূর্ণ টেনে অস্ত্র মুক্ত করলো রুদ্রদেব।

সাথে সাথে সেই অস্ত্র পূর্ণ বায়ু ঘূর্ণি তৈরি করলো। এই ঘূর্ণি লড়াই করতে শুরু করলো ঝড়ের সাথে। ঝড়ের বিপরীত দিকে অস্ত্র চালিয়েছে রুদ্রদেব। বেশি সময় লাগলো না। রুদ্রদেব অনুভব করলো, বাতাসের গতি কমে আসতে শুরু করেছে। তার মানে অস্ত্র কাজ করছে।

তবে বিপদ এখনো কাটেনি। জাহাজ এখনো তীব্র বেগে ছুটে চলেছে জলঘূর্ণির দিকে। বাতাসের বেগ সম্পূর্ণ কমলে জলের ঘূর্ণির বেগ কমবে। তত সময় হাতে নেই। তার আগেই জাহাজ গিয়ে পড়বে ঘূর্ণির কেন্দ্রে।

আবার বীরভদ্রাসনে দাঁড়ালো রুদ্রদেব। এবার সিদ্ধান্ত নিলো বরুণাস্ত্র প্রয়োগের। জ্যা টেনে ধরতেই অস্ত্র দেখা দিলো। জ্যা মুক্ত করতেই ছুটে গেল জলরাশি। জলঘূর্ণির গতি কমে আসতে লাগলো এবার। জাহাজের পাগলা ঘোড়ার মতো ঘুরতে থাকা গতিও কমে আসছে।

কাজ শেষ। এবার নাবিকেরা সক্রিয় হবে নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে ধনুক আর বাকি অস্ত্রগুলো আবার পুঁটুলির মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললো সে। তারপর

বেরিয়ে এলো ডেকের ওপর। নাবিকেরাও দাঁড়িয়েছে ডেকের ওপর। হঠাৎ করে বাতাসের থেমে যাওয়া, মেঘের কেটে যাওয়া আর এই শান্তি তাদেরকে হতভম্ব করে দিয়েছে। রুদ্রদেব সবার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, 'ঈশ্বরের আশীর্বাদে ঝড় থেমে গেছে। কিন্তু আমাদের জাহাজের খোলে এখনো ফাটল আছে আর নিচে অনেক জল। সেগুলো তো জাহাজ ডুবিয়ে দেবে।'

প্রধান নাবিক আবার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। আশার আলো দেখা গেছে। চিৎকার করে উঠলো সে, 'সবাই নিচে চলে যাও। ফাটল বন্ধ করতে শুরু করো। আর জল সেঁচে ফেলো।'

ওপরে আর কেউই থাকলো না। সবাই নেমে গেল নিচে। নিচে অথৈ জল। বুক সমান চলে এসেছে। তবে এখন আর জাহাজ দুলছে না। শান্ত জল এখন আর খুব বেশি ঢুকছে না। নাবিকেরা দক্ষ সাঁতারু। দম ধরে রাখতে ওস্তাদ। পানিতে ডুব দিয়ে সহজেই ওরা ফাটল খুঁজে পেলো।

সবাই মিলে সেঁচে সহজেই বের করে দিতে পারলো খোলের পানি। আপাতত ফাটল আর গর্তগুলোর একটা ব্যবস্থা করার পরে কারো শরীরেই আর শক্তি বলে কিছু অবশিষ্ট রইলো না। তবে কারো মুখেই হাসির কমতি নেই। নিশ্চিত জীবন ফিরে পেয়েছে তারা।

কতক্ষণ লড়াই করতে হয়েছে সে নিয়ে কারোই কোনো ধারণা ছিল না। দিগন্তে সূর্যের আভা দেখতে পেয়ে বুঝতে পারলো, এই দুঃস্বপ্নের মধ্যে পুরো রাতই কেটে গেছে।

ডেকের ওপর শুয়ে পড়েছে সবাই। সবাই নিশ্চিন্ত। শুধু শেইরন আর প্রধান নাবিক বাদে। শেইরন আর সবার সাথে নিচে যাননি। ডেকের ওপরেই শুয়ে ছিলেন। কিছু একটা অনুভব করতে পারছেন তিনি। একটা অদ্ভুত শক্তি, যা ঠিক প্রাকৃতিক না। তেমন কিছু একটার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

দুজনে একটা কথাই ভাবছেন। মুহূর্তের মধ্যে এমন ঝড় থেমে গেল কী করে? এমনটা তো কেউই কখনো দেখেনি, শোনেওনি। ঝড় আচমকা আসতে পারে, কিন্তু এমন আচমকা যায় না। কমলেও রেশ ধরে রাখে। একটা ধারণা উঁকি দিয়ে যাচ্ছে দুজনের মনের মধ্যেই।

সমুদ্রে অনেক ধরনের অপদেবতা থাকে। সেই প্রাচীন শক্তিগুলো। যেগুলোর অনেকগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। আবার কিছু কিছু এখনো টিকে আছে। নানা জিনিসের আড়ালে। সেখান থেকেই কি কিছু বেরিয়ে এসেছিল?

রুদ্রদেব এই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়েই তাদের মনের সন্দেহের কথা পড়তে পেরেছে। তবে আরেকজনের মুখের দিকে সে তাকায়নি।

অসিতের মুখেও একটা চিন্তার ছায়া পড়েছে।

পেছনের সারির দুজনের দিকে কারোই নজর ছিল না। সবাই অভিনন্দন জানিয়েছে সামনের সারির দলকে। দ্বিতীয় সারি কিছু অভিনন্দন যে পায়নি তা নয়, তবে কিছুই জোটেনি তৃতীয় সারির ভাগ্যে। অনুষ্ঠানের পর এক পাশে নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিল দুজনে। ব্যর্থ দুজনের দিকে নজর দেবার জনতার সময় কোথায়।

কেউ যদি সমাজে অনেক পরিশ্রম করে সফল হয়, তবে অনেকেই তাকে মাথায় তুলে নাচে। সেই নাচের পেছনে যে আনন্দের স্বাভাবিক কোনো ছন্দ কাজ করে তা নয়, মাঝে মাঝেই তা হয় কেবল মাত্র স্বার্থের কারণে, গুণমুগ্ধ ভক্ত যে একবারেই থাকে না এমন না, কিন্তু সেই সংখ্যা অনেক অল্প। ব্যর্থদের গুণের প্রতি কেউ মুগ্ধ হয় না।

তবে সমাজে কেউ যদি অনেক পরিশ্রমের পরে ব্যর্থ হয়, তাহলে সবাই তাকে বাহ্যিক করুণার দৃষ্টিতে দেখে, কিন্তু সাধারণ তা দেখে মনে মনে খুশি হয়। নিজে অলস, সারা জীবন কিছুই করেনি। এখন সেও যেখানে, একজন পরিশ্রমী ব্যর্থ মানুষও সেখানে। এই অনুভূতি আসলে অনেক আনন্দের। ইভান আর ওরিয়নকে দেখে সেই আনন্দের অনুভূতিই হচ্ছে এখন সবার। ছোটোবেলা থেকে এরা কত পরিশ্রম করেছে। পরিবার স্বজন ছেড়ে কাটিয়েছে জঙ্গলে জঙ্গলে। এখন সময় এসেছিল তাদের প্রভু হবার। কিন্তু হতে পারেনি। অপরের পরিশ্রম বৃথা যেতে দেখার মাঝে মানুষ এক ধরনের সুখ পায়।

অনুষ্ঠান কক্ষের বাইরে এসে দাঁড়ালো দুজনে। এতক্ষণ মানুষের করুণ আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি সহ্য করেছে। কেউ কারো সাথে একটা কথাও বলেনি। কেউ কারো দিকে ভালো করে তাকায়ওনি।

সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলেও যে ওদের দায়িত্বে আছে সে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারলো না। ওরা কাগজে কলমে একেবারে নিকৃষ্ট শ্রেণির অভিজাত হলেও ওদেরকেও কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে হবে নিয়মানুযায়ী। যার কাঁধে এসব বিলি বন্টনের দায়িত্ব সে এবার ওদের দিকে এগিয়ে এলো। এতক্ষণ সেও ব্যস্ত ছিল প্রথম শ্রেণির অভিজাতদের প্রাসাদের বিলি বন্টনে।

' তোমরা দুজন আমার সাথে এসো। কিছু দলিল বুঝিয়ে দিতে হবে।'

ইভান আর ওরিয়ন এতক্ষণে নিজেদের মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাতে পারলো। একটু ধন্যবাদ দিলো বন্টন অধিকারীকে।

ইভান আর ওরিয়নকে সবকিছু বুঝিয়ে দিতে বেশি সময় লাগলো না। ওরা খুবই কম জিনিস পেয়েছে। কোনো মাসিক রেশনের অধিকারী তৃতীয় শ্রেণির

অভিজাতরা হয় না। ওরা প্রাসাদের বদলে পেলো কেবল একটা ছোটো এক ছাদের ঘর। সেখানে নিজের পরিবার নিয়ে থাকা যাবে। দাসদের থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই।

ঘরের কাগজ বুঝে নিলো ওরা। দাস আর দাসীদেরও বুঝে নিলো। ওদেরকে দেওয়া হলো প্রায় মুক্ত দাসদাসী। দাসেদের হাবভাব দেখেই বোঝা গেল তেমন কোনো সম্মান এরা মালিককে করবে না। এরা দৈনিক দাস। দিনের বেলাতেই কাজ করবে। রাত হলে ফিরে যাবে নিজের গৃহে। নিজেদের রক্ষা অথবা প্রহরার জন্য কোনো সেনা বরাদ্দ দেওয়া হলো না ওদের।

দুটো কাগজ নিয়ে বাইরে এলো ওরা। এতক্ষণে ওরিয়ন প্রথম কথা বলল, 'যাক, আমি তো ভেবেছি নির্বাসন দিয়ে দেবে। তার চেয়ে ঘর তো দিয়েছে। একটা মাথা গোঁজার ঠাই হলেই হলো।'

নগরের মাঝখানে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। এই নগর এর আগেও অনেকবার এসেছে। তবে ছদ্মবেশে। আজ আর কোনো ছদ্মবেশ নেই। এরই মধ্যে মানুষের কাছে ওদের দুজনের খবর চাউর হয়ে গেছে। অনেককেই দেখা গেল মুখ টিপে হাসছে ওদের দেখে।

ইভানের এসব একটুও ভালো লাগছে না। না, মানুষের এই হাসাহাসিতে তার কোনো সমস্যা নেই। সে জানে, সে কোনো ভুল কাজের শাস্তি পায়নি। সঠিক কাজের শাস্তি পুরস্কারের সমতুল্য। তবে ইনোনের কথা যতই মনে হচ্ছে ততই যেন বুকের ভেতর ছুরি বিঁধিয়ে দিচ্ছে কেউ। এই নগরের কোলাহল, আনন্দ, আয়োজন, সব বৃথা মনে হচ্ছে। একটু নির্জনে গেলে ভালো লাগতো।

রাস্তায় পা বাড়ালো ইভান। এই ভিড় থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ঐ ঘরে ওদের সর্বনাশ হবার পর থেকে একবারও ইনোনের দিকে তাকাতে সাহস পায়নি সে। কোনোমতে অনুষ্ঠান শেষ করে বেরিয়ে এসেছে। ইনোনকে বোঝানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। কিছু ক্ষত এমনিতেই সেরে যায়, হয়তো এই ক্ষতও তাই যাবে।

ওরিয়ন একটু আগে কথা বলে জবাব পায়নি। সেও যাচ্ছে ইভানের পেছন পেছন, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা? ঘর দেখতে না-কি?'

এবার কথা না বলে থাকতে পারলো না ইভান। উদাসীন তার স্বর, 'আমরা নয় ওরিয়ন। আমি যাচ্ছি। এখন আমরা আর শিবিরে নেই। এখন আমরা মুক্ত, স্বাধীন। এখন আর আমাদের এক সাথে থাকার দরকার নেই।'

'এসব বলে তো আমাকে ভোলাতে পারবে না বন্ধু। এতদিন তোমার সাথে ছিলাম। তোমার মতো কুশলী মানুষ আমি দুটো দেখিনি। তোমার সাথে থাকার

সুযোগ আমি কিছুতেই ছাড়বো না। তুমি যদি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও তাও আমি তোমার সাথেই থাকবো। আমি একটা বুদ্ধি পেয়েছি।'

'কী বুদ্ধি?' ওরিয়নের বেশির ভাগ বুদ্ধিই উদ্ভট পথের দিশা দেয়।

'আমরা দুটো ঘর পেয়েছি। এক কাজ করি। একটা বিক্রি করে দেই। আমাদেরকে তো নগদ মুদ্রা কিছুই দেয়নি। ঘর বেচা টাকা খরচ করা যাবে। আমাদের দুজনের জন্য একটা ঘর হলেই হবে। মাথার ওপরে ছাদ তো আছেই।'

'না, ওরিয়ন। আমাকে কুশলী বলে আর লজ্জা দিও না। তোমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি তো আমিই করেছি। আমার কথাতেই তো তুমি ভুলটা করেছ।'

'তাতে তোমার কৌশলের দোষ যে নেই তা বলবো না। জীবনে প্রথম দয়ার অনুশীলন করেছিলাম আমরা। প্রথম বার একটু ভুল হতেই পারে। তা নিয়ে আর মন খারাপ কোরো না। এখন বলো, ঘর বিক্রি করার বুদ্ধি তোমার কেমন লেগেছে?'

'খুবই খারাপ। কিছুদিন পরে তুমি বিয়ে করবে। বৌ নিয়ে কি আমার সাথে থাকবে না-কি?'

'বিয়ে কি কেবল আমিই করবো? তুমি করবে না।'

একটু স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল ইভানের মন। এই কথায় আবার তার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

ওরিয়ন সেটা না বোঝার মতো বোকা নয়, 'আমার মনে হয় তুমি ইনোনের সাথে একবার কথা বলো।'

'কোন মুখে কথা বলবো। আমি প্রথম শ্রেণির অভিজাত হবো বলেছিলাম। তারপর ওর বাবার কাছে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন তো সব ভেস্তে গেল।'

'তুমি তো মিথ্যে কিছু বলনি। যা সত্যি তাই বলেছ। সত্যি বলতে গেলে তোমার এই অসফলতার পেছনে ইনোনের প্রভাব পুরোপুরি দায়ী।'

'পাগলের মতো এসব কী বলছ!'

'আমি পাগলের মতো কথা বলছি না। তুমি ইনোনকে ভালবেসেছিলে বলেই তোমার মনে দয়া এসেছে। সেই জন্যই ঐ হেলট পরিবারকে আমরা হত্যা করতে পারিনি। বলো, এই দোষ কার?'

'দোষ পুরোপুরি আমারই। প্রেমে তো ইনোন আমাকে ফেলেনি। আমিই ওকে দেখে নিজেকে সামলে রাখতে পারিনি। এখন কীভাবে ওকে দোষারোপ করবো।'

'দোষারোপ না করো, একটা শেষ চেষ্টা তো করে দেখতে পারো।'

'বলতে পারো, শেষ চেষ্টা করলে কী হবে? ওর বাবা কিছুতেই রাজি হবেন না। আর যদি তিনি রাজি হন তাহলে তার মৃত্যুর পর তৃতীয় শ্রেণির অভিজাত হিসেবে আমাকে থাকতে হবে ছোটো ঘরে। কোনো রকমের সুযোগ সুবিধা ছাড়া। ইনোন আমার সাথে পালিয়ে এলে আমাকে জঙ্গলে চলে যেতে হবে। কোনো পথেই তো আমি ইনোনকে সুখি করতে পারবো না। চিরদিন ঐ মেয়ে দাসীদের সেবা পেয়ে অভ্যস্ত, তার কমল পায়ে কখনো একটু মাটিও লাগেনি। এখন প্রেমের জন্য আমি স্বার্থপর হতে পারি না।'

ওরিয়ন বুঝতে পারলো ইভানের মনে কী চলছে। এই দোলাচলে সে আসলে তেমন কিছু করতে পারবে না। তবে তার জন্য ইভানের মনে যে অপরাধ বোধ জন্মেছে সেটা বোধহয় কমাতে পেরেছে। এবার প্রসঙ্গ বদলে ফেললো সে, 'আচ্ছা, আমাদের ঘরের দিকে তো যাওয়া প্রয়োজন। দেখি কী প্রাসাদ দিয়েছে আমাদেরকে।'

ঘরের কাগজ ওদের দুজনের কাছেই ছিল। সেটাতে লেখা আছে ঠিকানা। নগরের একটু বাইরের দিকের কথা বলা আছে সেখানে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে অবশেষে পৌঁছানো গেছে।

দুটো ঘর পাশাপাশি। কোনো বাজার অথবা বিনোদনের পানশালা আশেপাশে নেই। দৈন্য অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়, এখানে অবহেলিতদের জায়গা হয়। তবে ওরা দুজন এতকিছু বুঝতে পারলো না। এতদিনে নিজের থাকার একটা ঘর হয়েছে। এতদিনে সবার সামনে নিজের পরিচয় নিয়ে চলা যাবে। এই চিন্তাটা ওরিয়নের মন থেকে একটু আগের বিভীষিকা ভুলিয়ে দিলো। সে ঘর দেখে উল্লসিত, 'তুমি যেমন খারাপ বলেছিলে অতো খারাপ নয়। আমি তো ভেবেছিলাম হেলটদের কুঁড়ের মতো একটা ঘর দেবে, এটা তো অনেক ভালো।'

'হ্যাঁ, একেবারে প্রাসাদ।'

ওরিয়ন ইভানের টিপ্পনীতে দমে গেল না, 'তুমি কোনটা নেবে বলো। আমাকে একটা দিলেই চলবে। দুটোর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য দেখছি না।'

'সেটা পরে চিন্তা করবো। এসো, এখন যে-কোনো একটাতে ঢুকে পড়ি।'

ওদের জন্য যেসব দাসেদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তারা সবাই অতি বৃদ্ধ। সারা জীবনের কঠিন পরিশ্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ এখন ওরা এই দায়িত্ব পেয়েছে। অশক্ত হলেও নিজেদের কাজে তারা পটু। ইভান আর ওরিয়ন প্রবেশ করতেই তারা সম্মান জানালো। তারপর দুজনের জন্য নিয়ে আসা হলো শরবত। জানানো হলো খাবারের ব্যাবস্থা আছে। তবে সেই খাবার তাদের নিজেদের নিয়ে খেতে হবে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, এখন তাদের চলে যাবার সময়।

দুটো ঘরেই আলোর ব্যবস্থা করে দাসেরা প্রস্থান করলো। শরবত পান করে ওরিয়ন শুয়ে পড়লো বিছানায়, 'এই ঘরে যদি এত আরাম থাকে তাহলে প্রাসাদ কোন ছাড়। খাবারের ব্যবস্থা আছে। যখন ইচ্ছে খাওয়া যাবে। আর কী চাই।'

ইভানের এখন আরাম উপভোগ করার অবস্থা নেই। শরবত তার পিপাসা মেটাতে অসমর্থ। তবে পিপাসা মেটাতে না পারলেও তার চিন্তায় একটু পরিবর্তন এসেছে। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। তার এবং ইনোন দুজনের ভালোর জন্যই। এই তৃতীয় শ্রেণির অভিজাত হয়ে নগরে থাকার কোনো মানে হয় না। তার আর ওরিয়নের যে ক্ষমতা আছে তাতে যে-কোনো জায়গায় গিয়ে তারা উন্নতি করতে পারবে। যদিও ক্রিপ্টেয়ারের সেনাদের জন্য স্পার্টার বাইরের কোনো সেনাদলের হয়ে যুদ্ধ করা মহা অপরাধ তবু সে চলে যাবে, এখন রোমানরা ক্ষমতায়, আর রোমান সেনারা তাদেরকে পেলে লুফে নেবে। তখন স্পার্টার কেউ তাদের কিছুই করতে পারবে না। সেখানে সম্মানও পাওয়া যাবে। ইনোনের জন্যও ভালো হবে। সে নিশ্চয়ই এই নগরের কোনো অভিজাতকে বিয়ে করে সুখী হবে। তার রাস্তায় এই জীবনে আর আসতে চাচ্ছে না সে। নগর ছেড়ে চলে যাওয়াই উত্তম সিদ্ধান্ত।

'তোমার বুদ্ধিটা কাজে লেগেছে ওরিয়ন।'

'কোন বুদ্ধি?'

'ঘর বিক্রির বুদ্ধি। ঘর আমরা বিক্রি করে দেবো। একটা নয় দুইটা।'

'তাহলে আমরা থাকবো কোথায়?'

'আমরা স্পার্টায় থাকবো না। বিদেশ চলে যাবো। যোগ দেবো রোমান সেনাদলে।'

'সারছে। তাহলে তো আমাদের মারার জন্য ওরা চর পাঠাবে।'

'না, পারবে না। রোমান সেনাদলে যোগ দেবো আমরা পরে। আগে বণিকের বেশে বেরিয়ে যাবো নগর থেকে। দুজন তৃতীয় শ্রেণির যোদ্ধা অভিজাত যারা বণিক হয়ে গেছে তাদের কথা লোকে বেশিদিন মনে রাখবে না।'

ওরিয়ন একটু আগে বলা নিজের আরামের কথাটা ভুলে গেল। চকচক করে উঠলো তার চোখ। অচেনা পথে বেরিয়ে পড়ার যে উত্তেজনা সেটা কিছু কিছু মানুষের জন্য নেশা দ্রব্যের মতো কাজ করে। ওরিয়ন সেই জাতের লোক। এক লাফে বিছানায় উঠে বসলো সে, 'তাহলে ঘর কখন বিক্রি করবো?'

'ধীরে। এখনই না, কিছু সময় যাক। একটা কাজ বাকি আছে।'

'কী?'

'স্পার্টা ত্যাগ করার আগে ইনোনের সাথে একবার দেখা করে যেতে হবে। কেন যেন মনে হচ্ছে আমার দুর্ভাগ্যে আমার থেকেও কষ্টে আছে সে। আমাদের

দেখা হওয়া দরকার। একজন চাইবে ক্ষমা, আরেকজন দেবে সান্ত্বনা, আর এভাবেই শেষ হবে আমাদের এই জীবনের লেনদেন।'

প্রেমিক ভাষা তেমন একটা বুঝতে পারেনা ওরিয়ন, ' কি বললে কিছুই তো বুঝলাম না। শুধু বুঝলাম ইনোনের সাথে দেখা করবে তুমি। তাহলে আর বসে থেকে লাভ কি। চলো, আজ রাতেই যাই।'

'ঠিক বলেছ। আজ রাতেই যাবো।'

সেদিন রাতেই ওরা দুজন এসেছিল। মশকের অত্যাচার আর রাতের অসহ্য নীরবতা সহ্য করে কেটে গিয়েছিল রাত। ইনোন আসেনি। বাড়ির পেছন দিকের সেই পরিত্যক্ত জায়গায় ভালোবাসার প্রত্যাশায় কেটেছে ইভানের সময়।

আজকেও এসেছে তারা। রাত একটু গভীর হয়েছে। নিশুতি রাতের গুঞ্জন একটু একটু করে বাড়তে শুরু করেছে। ওরিয়নের মনে আজকে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, ' আমার মনে হয় ইনোন আসবে না। আর আসবেই বা কেন? সে কি আর জানে তুমি তার জন্য বসে আছো।'

' ঠিক বলেছ। দেখি, আজকে যদি না আসে তাহলে ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখা করে আসবো।'

তারপর অপেক্ষার পালা শুরু হয় দুজনের। ওদিকে ইনোন নিজেকে ঘরবন্দী করে রেখেছে। কিছুতেই নিজের বাবার সামনে পড়তে চাচ্ছে না। মনে হয়, বাবা ওর দিকে একটু ভালো করে তাকালেই সব বুঝে ফেলবেন।

একটা কাজ করতেই এখন ভালো লাগে তার। ইভানের কথা ভাবতে। খুবই কম সময় কাটিয়েছে ওরা দুজনে, কিন্তু মনে হয় সেই ক্ষীণ পরিমাণ সময়ই এই জীবনের সঠিক সুখের সময়। প্রথম দেখা হয়েছিল সিসলিক পর্বতের ওখানে। তারপর এই প্রাসাদের পেছনের সেই গুপ্ত জায়গা। ভাবতে ভাবতেই ইভানের স্মৃতির কাছে সশরীরে যাবার ইচ্ছে চাড়া দিয়ে উঠলো তার মাথায়। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে।

বাইরেই ছিল ডোরা। ইনোনকে এই অবস্থায় একা ছাড়তে একেবারেই ইচ্ছে নেই তার। সব সময় তার ঘরের কাছে থাকতেই চেষ্টা করে সে। ইনোনকে এভাবে দেখে অবাক হলো সে, ' আপনি এখন বেরিয়ে এলেন যে। কিছু লাগবে?'

' ডোরা, আমি একটু বাড়ির পেছনে যাবো। কেন যেন কিছুতেই নিজেকে ঘরে আটকে রাখতে পারছি না। তুই কি আমার সাথে যাবি?'

ডোরা সবই বুঝতে পেরেছে, ' হ্যাঁ, চলুন।'

আশেপাশে কেউ নজর রাখছে কি না ভালো করে দেখার পরে গুপ্ত দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো দুজনে। মশাল জ্বালিয়ে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে আসতে বেশি

সময় লাগলো না। খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াতেই বসার জায়গাটা দেখতে পেলো ইনোন। এখানেই গতদিন ইভানের সাথে বসেছিল সে। ওখানে যেতেই হঠাৎ কেউ যেন ডেকে উঠলো তাকে, 'ইনোন।'

না, তার ভুল হচ্ছে না। এতদিন অসংখ্যবার এই স্বর সে মনে মনে শুনেছে। এখনো তার মনে হচ্ছে ভুল, কিন্তু ভুল কখনো এতো স্পষ্ট হয়?

ডোরাও শুনতে পেয়েছে সেই স্বর। তার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেছে। তাহলে আসলেই সে এসেছে।

একটু তাকাতেই ইভানকে দেখতে পেলো সে। নিজেকে কিছুতেই আর সামলে রাখা গেল না। দৌড়ে এসে ইভানের বুকে নিজেকে সঁপে দিলো। ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর ইভান চুলে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

ওরিয়ন দাঁড়িয়ে আছে ইভানের পাশে। তাকে আজকে আর কোন কড়া কথা বলল না ডোরা, 'ওদেরকে একটু একা থাকতে দাও। তুমি আমার সাথে ওদিকে চলো।'

সেদিনের সেই জায়গাতেই বসলো দুজনে। ইনোন একটু স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। প্রথম কথা বলল ইভান, 'আমাকে কি ক্ষমা করা সম্ভব হবে তোমার পক্ষে?'

'আমি কাউকে ক্ষমা করতে চাই না। তোমাকেও না, দেবতাদেরও না। এই যদি আমার ভাগ্যে ছিল তবে কেন তারা সেদিন তোমাকে আমার সামনে এনেছিলেন?'

'দেবতাদের চাল সবসময় বোঝা যায় না। এখন কারো প্রতি রাগ না দেখিয়ে আমরা কি আমাদের শেষ দেখাটা উপভোগ করতে পারি না?'

'শেষ দেখা!'

'হ্যাঁ, ইনোন, আমি স্পার্টা ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেটা তোমার আমার দুজনের জন্যই ভালো হবে।'

'আমি আর কারো ভালো বুঝতে চাচ্ছি না। তোমার কথাই ঠিক। আমাদের এই সময়টা উপভোগ করা উচিত। হতে পারে এটাই আমার জীবনের শেষ উপভোগ। তারপরে কেবল আরেকজনের ভোগের বস্তুতে পরিণত হয়ে হবে।'

ইভান জড়িয়ে ধরল ইনোনকে। আগের দিনগুলোর চেয়ে অনেক শক্ত করে। ইনোনকে আজকের পর থেকে হারিয়ে ফেলতে হবে এই চিন্তার পীড়া সে কিছুতেই কাটাতে পারছে না। শক্ত করে চুমু খেলো দুজন দুজনকে। যেন আজই পৃথিবীর শেষ রাত।

ইভানকে নিয়ে দেওয়ালের কোন ঘেঁষা এক জায়গায় চলে এলো ইনোন। দুজনের ঠোঁট কিছু সময়ের জন্য আলাদা হলো, 'আজকে আমাদের শেষ দেখা তাই না?'

ইভান কিছু বলতে পারলো না, ইনোন কিছু শুনতেও চায়নি, 'তাহলে আজ আমাকে তুমি পূর্ণ করে দাও। আমি এই কদিন তোমার স্মৃতি নিয়েই বেঁচে ছিলাম। সারা জীবন কাটানোর মতো যথেষ্ট স্মৃতি দিয়ে যাও আমাকে।'

ইভান কিছুই বুঝতে পারলো না, আবছা আলোয় কেবল ইনোনের অবয়বটা বোঝা যাচ্ছে, 'কীভাবে?'

ঘরের সাধারণ পোশাকে চলে এসেছে ইনোন। জমকালো পোশাকের জটিল বাঁধন এখন তার দেহে অনুপস্থিত। সহজেই নিজের সম্পূর্ণ শরীর বস্ত্রমুক্ত করলো সে। এই অন্ধকারেও ইভানের চোখ যেন দেখতে পেলো ইনোনের দেহের দ্যুতি। বুঝতে পারলো ইনোন কী চাচ্ছে, 'এমন কোনো পাপ করা কি উচিত হবে যার প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব নয়?'

ইনোনের স্বর শান্ত, 'নরক যন্ত্রণা তো এমনিতেই ভোগ করছি। সামনেও করতে হবে। তারচেয়ে তোমাকে সম্পূর্ণভাবে পাবার স্মৃতি নিয়েই জীবনটা কাটুক।'

ইভান আর কিছুই বলতে পারলো না। আসলে কিছুই বলতে দিলো না তাকে ইনোন। জড়িয়ে ধরেছে সে ইভানকে। ইভানের ভেতরের পুরুষ সেই দেহের নরম স্পর্শে নিমেষে জেগে উঠলো। তারা দুজনেই ভুলে গেল কয়েকদিনের ব্যথা, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা-সব। একজন আরেকজনের শরীরে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় যেন লিপ্ত হয়েছে। এমনকি তারা ভুলে গেছে একটু দূরে থাকা ওরিয়ন আর ডোরার কথাও।

ওরিয়ন আর ডোরাও সেদিনের সেই জায়গাতেই বসেছিল। আজ আর ওরিয়ন ইভানের আর ইনোনের দিকে নজর রাখছে না। ডোরাই কথা শুরু করেছে, 'তোমাদের দুজনের বোকামির কথা তো পুরো স্পার্টায় সবার মুখে মুখে। নিজের পায়ে নিজে কুড়াল এভাবে মারতে আমি আগে কখনো শুনিনি।'

'আমার তেমন ক্ষতি হয়নি। আমি তো আর অভিজাতের মেয়েকে ভালবাসিনি। আমার এমনিতেও চলবে।'

'বিয়ে করবে না না-কি? প্রথম শ্রেণির অভিজাত হলে কত ভালো মেয়ে পেতে বিয়ে করার জন্য।'

' নাহ, ওসব মেয়ে বিয়ে করে লাভ নেই। ওদের ঢং অনেক। সহ্য হবে না আমার।'

'তাহলে মেয়ে পাবে কোথায়?'

'দাসীদের মধ্য থেকে একজনকে বিয়ে করে ফেলবো। দাসীদের মধ্যেও অনেক সুন্দরী আছে। একজনকে বিয়ে করে মুক্তি দিতে সাহায্য করবো। তখন সে আমাকে এমনিতেই ভালোবাসবে।'

কথাটা কেন জানি পছন্দ হয়ে গেল ডোরার, 'আমিও কিন্তু দাসী।'

থতমত খেলো ওরিয়ন, 'না, মানে আমি তা ভেবে কথাটা বলিনি।'

ডোরা ঐদিন উৎসবে ওরিয়নকে বেশ ভালো করেই খেয়াল করেছিল। কেন জানি আজ এই বোকাসোকা যুবকের প্রতি এক ধরনের মায়া অনুভব করলো সে। একেই কি প্রেম বলে?

নিজের ঠোঁট এগিয়ে আনলো ডোরা। ওরিয়নের চিবুকে আলতো করে চুমু দিলো। ভীষণ ঘাবড়ে গেল ওরিয়ন। কী করবে বুঝে উঠতে পারলো না।

ওদিকে ডোরা কেবল মুখ টিপে হাসছে।

মানুষ বেছে নেয়া শক্ত কাজ। সে যে কারণেই হোক না কেন। খারাপ কিংবা ভালো সব কাজেই যোগ্যতা লাগে। মানুষের ভেতরের গুণগুলো সে কী কাজ করবে তার ওপর খুব একটা নির্ভর করে না। সেসব মানুষের ভেতরেই থাকে। সাহস, অধ্যবসায়, একাগ্রতা খারাপ কাজেও লাগে আবার ভালো কাজেও লাগে। মানুষের স্বভাব তার লক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে, গুণের ওপর নয়।

রাহুর এই কাজের জন্য বেশ সাহসী কয়েকজনকে লাগবে। সে যে কাজে নেমেছে তাতে অনেক চিন্তা করার সময় পেয়েছে তা বললে ভুল হবে। তবে এছাড়া তার হাতে আর কোনো উপায় নেই। অঙ্গদকে সাথে নিয়ে সে যেই অনন্ত সুখের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে রেখেছিল তাতে কারো বাঁধ সাধা অতি সহজে মেনে নেয়া যায় না। সেও নেয়নি। আর এখানে এই একটা উপায়ই আছে। প্রধান নাবিকের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু করা যাবে না। তাহলে মরতে হবে। অনেক ভেবে এই একটা উপায় মাথায় এসেছে।

রাহুকে তেমন ভারী কাজ দেয় না প্রধান নাবিক। আজকেও তার ভাগে কেবল পালের দড়ি তদারকির কাজ পড়েছে। আজ বেশি দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। বাতাস আজকে অনুকূলে বেশ ভালো বেগেই বইছে। জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে তরতর করে।

এই জাহাজের সবাইকেই এরই মধ্যে ভালো করে চিনে নিয়েছে রাহু। কারো কারো সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তবে আজ সেসবে কাজ হবে না। নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে আড় চোখে নজর রেখে চলেছে সে নাবিকদের ওপর। মানুষের শরীরের ভাষা পড়াতে সে মোটামুটি দক্ষ। এখান যারা আছে তাদেরকে নিয়েই কাজ চালাতে হবে। কিছু বাছ বিচার করেই সে নাবিকদের কাছ থেকে দুজনকে বেছে নিলো। এদের দিয়েই কাজ হবে। একটা শর্ত মানতে হয়েছে তাকে বাছাবাছির বেলায়। যে দুজনকে সে বেছেছে তারা একই ঘরে থাকে, ওদের মধ্যে বন্ধুত্বও আছে বেশ। আরেকটা কারণও আছে ওদের দুজনকে বেছে নেবার।

প্রথম কাজ শেষ হয়েছে। এবার পরের ধাপে যেতে হবে। রাহু জানে তাকে কী করতে হবে। প্রথম জীবনে যখন সে বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াতো তখন একটা গুণ বেশ ভালোই আয়ত্ত করেছিল। একজন গুরু ছিল তার। হাত সাফাইতে ওস্তাদ। তার থেকেই মানুষের জিনিস লুটে নেবার বিদ্যা আয়ত্ত করা। দুপুরে সবাই যখন খাওয়াদাওয়ায় ব্যস্ত, নীরবে সবার অলক্ষ্যে ভাঁড়ার ঘরে চলে এসেছিল রাহু।

ভাঁড়ার ঘরে পাহারা সবসময় থাকে। তবে এই পাহারা একটা সময়ই একটু শিথিল হয়। খাবারের সময়। বেশিক্ষণ সময় পাওয়া যাবে না। ভাঁড়ার ঘর থেকে খাবার বের করে নিয়ে গেছে ভাঁড়ারের প্রহরী। ক্ষণিক সময় পাওয়া গেছে, তাই রাহুর জন্য যথেষ্ট। চট করে সে ঢুকে পড়লো ভাঁড়ারে। চোখের পলক পড়ার

আগেই দুটো মদের মাঝারি আকারের বোতল পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে ফেললো। তারপর ভাঁড়ার থেকে বেরিয়ে এলো কোনো শব্দ না করে।

পথ আগেই ঠিক করে রেখেছিল সে। বোতল দুটো নিয়ে চলে এলো নিজের ঘরে। যথাস্থানে লুকিয়ে আবার বেরিয়ে এলো। খাবারের জায়গায় গিয়ে বুঝে নিলো নিজের খাবার।

তবে একেবারে কারো চোখে পড়েনি তা বললে ভুল হবে। মাজিদের এক চোখ এখন রাহুর দিকেই থাকে, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি? সবাই খাওয়া শুরু করে দিয়েছে।'

রাহুর বুকে ধুকপুক করতে শুরু করেছে, 'আমি একটু ঘরে গিয়েছিলাম। অঙ্গদকে দেখতে। খাবার দিয়ে এলাম।'

অঙ্গদের বাহানা আগেই বানিয়ে রেখেছিল সে। জানতো, অঙ্গদের যত্ন করেছে জানলে মাজিদের কিছু সন্দেহ করার সম্ভাবনা কম। মাজিদ আর সন্দেহ করলো না, 'খাবার দিয়ে ভালো করেছ। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। কাজ শুরু করতে হবে। এই পথ যত তাড়াতাড়ি শেষ হবে ততই ভালো। এই পথের শেষেই আরামের ভবিষ্যৎ।'

রাহু আর কিছু না বলে খেতে শুরু করলো। যা করেছে তাতে এখন ধরা না পড়লেই হলো। দুপুরের খাবারের পরে আর আরাম পাওয়া গেল না। বাতাস একটু পড়ে গেছে। নাবিকেরা আবার ফিরে গেছে দাঁড়ে। রাহুকেও যেতে হয়েছে। দাঁড় বাওয়া প্রচণ্ড কষ্টের কাজ। তার শরীরে আগে কষ্ট সইতো, অঙ্গদের মালিক হবার পরে আর সয় না। সন্ধ্যা পর্যন্ত দাঁড় বাইলো নাবিকেরা, তারপরে নোঙর ফেলে সেদিনের মতো কাজ শেষ হলো। রাতে জাহাজ চলবে না।

সারাদিন পরিশ্রমের পর নাবিকদের আর কিছু করার শক্তি অথবা মানসিকতা কিছুই বাকি থাকে না। কোনোমতে খাবার পেটে পড়লেই চলে আসে ঘুম। নিজের নোংরা দুর্গন্ধের বিছানাকে তখন মনে হয় স্বর্গের পালঙ্ক, সেই বিছানা থেকে তখন গোলাপের সুবাস আসে।

রাহুর ক্ষিধে লেগেছে ভীষণ। সবার সাথে প্রতিযোগিতা করে যতটুকু পারা যায় খেয়ে নিলো সে। তারপর চলে এলো ঘরে। অঙ্গদ জায়গামতোই আছে।

সবার মতো নিজের শরীরকে বিছানায় এলিয়ে দিলো না সে। আজ এই অন্ধকারেই কাজটা সারতে হবে। দুপুরে চুরি করে আনা দুটো বোতল নিজের পোশাকের ভেতরে আবার লুকিয়ে ফেললো সে। নিজের ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলো। তারপর সাবধানে বেরোলো দরজার ফাঁক গলে।

জাহাজের কোথাও কারো নড়াচড়া নেই। সেটাই স্বাভাবিক। দেওয়ালের পাশের অন্ধকার ধরে হাঁটতে লাগলো সে। একটু পরেই পৌঁছে গেল মাজিদের ঘরের সামনে। ঘরের ভেতরে কোন আলো জ্বলছে না। আশেপাশে দেখে নিয়ে

ঘরের দরজায় কান পাতলো। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। মাজিদ মরার মতো ঘুমাচ্ছে। তার নাক ডাকার আওয়াজ বাইরে থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

রাহু কোনো ক্লান্তি অনুভব করছে না। একটু পরে সে যেই ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছে তাতে উত্তেজনার যথেষ্ট উপাদান আছে। সবকিছু সাবধানে করতে না পারলে মৃত্যু নিশ্চিত। হয়তো কাল সকালের সূর্যও তাকে আর দেখতে হবে না।

জাহাজের খোলের ভেতরে নেমে এলো সে। এখানেই কিছু নাবিকের থাকার ঘর। এর মধ্যে একটা ঘর আছে বাকি নবিকদের ঘর থেকে একটু আলাদা অবস্থানে। সেখানে গিয়ে আবার কান পাতল সে। এখান থেকেও নাক ডাকার আওয়াজ আসছে। তবে মাজিদের ঘরের মতো এই ঘর ভেতর থেকে বন্ধ করা না।

আস্তে করে ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। আলো নেভানো, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নিজের কাছে থাকা ছোটো লণ্ঠনটা জ্বেলে নিলো সে। ঘরের ভেতরটা আলোকিত হয়ে উঠলো। এবার দুজনের গায়েই ধাক্কা দিলো সে, আলতো করে, 'ওঠো।'

ঘুম এসেছে দুজনের তবে মধ্যরাত এখনো হয়নি। ঘুম এখনো জাঁকিয়ে বসতে পারেনি। একজন চোখ মেলল, 'কী হয়েছে?' স্বরে স্পষ্ট বিরক্তি।

রাহু নিজের মুখ যথেষ্ট ফ্যাকাশে করে রেখেছে, 'কিছু হয়নি। নিজের ঘরে একা থাকতে ভালো লাগছিল না। তাই তোমাদের ঘরে এলাম। একটু কথাবার্তা বলবো।'

ততক্ষণে আরেকজনেরও ঘুম ভেঙ্গেছে, 'রাত করে আর কোনো বুদ্ধি পেলে না। আমাদের সাথে আবার কীসের গল্প? কাল সকালে উঠে আবার কাজে নামতে হবে, এখন সারারাত ঘুমাবো। তুমিও যাও, ঘুমাও।'

'আমি কিন্তু গল্পের সঙ্গী সাথে করেই নিয়ে এসেছি।' নিজের পোশাকের আবরণ সরিয়ে দিলো রাহু। ভেতর থেকে উঁকি দিলো মদের বোতল। তাও আবার একটা নয়, দুটো।

এবার তাজিম আর শরিফ দুজনের চোখেই লোভ ঝিলিক দিয়ে উঠলো। মদের বোতল দেখেই ওরা গলে গেছে। রাহু ওদের দুটো গুণ আছে বলেই ওদেরকে বেছে নিয়েছে। এই দুজন প্রচণ্ড সাহসী এবং সেই সাথে প্রচণ্ড বোকাও। শক্তিও গায়ে কম নেই।

'এই বোতল তুমি আমাদের জন্য এনেছ?'

' তাহলে আর কার জন্য আনবো।'

'পেলে কোথায়?' শরিফ জিজ্ঞেস করে।

'এটা আবার কেমন প্রশ্ন? এই জাহাজে এই জিনিস তো কেবল একটা জায়গাতেই আছে। সেখান থেকেই এনেছি।'

এবার নাবিক তাজিম কথা বলে ওঠে, 'তার মানে তুমি ভাঁড়ার ঘর থেকে চুরি করেছ। তুমি তো সমুদ্রে নতুন নও, অনেক দিন ধরেই জাহাজে জাহাজে ঘুরছ। জানো না, ভাঁড়ার ঘর থেকে চুরি করার শাস্তি কী। সরাসরি মৃত্যুদণ্ড। তাও আবার যে সে উপায়ে না। তোমাকে জীবিতাবস্থায় সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হবে। কপাল ভালো হলে সাগরের হাঙর এক কামড়ে মেরে ফেলবে, নইলে জলের সাথে লড়াই করে ডুবে মরতে হবে।'

এসবই জানে রাহু, তবু আজকের এই ভয়ংকর পথে পা বারিয়েছে সে। ওরা দুজন যে এই মদের বোতল দেখলে এই কথা বলবে তাও সে জানে। রাহু বসলো একজনের বিছানায়, 'এসব আমার জানা আছে। তবু এনেছি। এখন তোমরা কি আমার সাথে যোগ দিতে চাচ্ছো না? আমি কি ফিরে যাবো?'

লোভী দৃষ্টিতে বোতলের দিকে এখনো তাকাচ্ছে দুজনে। রাহু পড়তে পারছে সেই দৃষ্টি, 'চুরি তো আমি করেছি। কিছু হলে আমার হবে। তোমাদের তো আর কিছু হবে না। আর কাজটা করার সময় আমাকে কেউ দেখেনি, কোনো প্রমাণও নেই। তাহলে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কী করে নেবে?'

'তা ঠিক বলেছ। এই কাজ করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়লে সমস্যা। এমনিতে কোনো ঝামেলা নেই। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, আমাদের দুজনের কাছে বোতল নিয়ে এলে কেন? নিজেই তো সাবাড় করে দিতে পারতে।'

এবার করুণ হয়ে এলো রাহুর গলা, একটু ধরে এলো, 'জানো তো ভাই, দুঃখ ভাগ করলে কমে যায়। আমার মনের ভেতরে যে কষ্ট আছে সেই কষ্ট কমাবার জন্যই আজকে আমি এই বোতল চুরি করেছি। তোমরাও এই বোতলের সাথে আমাকে সঙ্গ দিয়ে আমার দুঃখের ভাগ একটু নিয়ে নেবে। এজন্যই তোমাদের দুজনের কাছে এসেছি। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমার। এখন তোমরা ইচ্ছে করলে আমাকে মাজিদের কাছে ধরিয়ে দিতে পারো।'

তার প্রশ্নই ওঠে না। শরিফ একটা বোতল হাতে তুলে নিলো, 'কী এত দুঃখ তোমার মনে?'

'আমাদের জাহাজে কি একটা ঘটনা ঘটে গেল। একজন মানুষ হারিয়ে গেছে আমাদের মাঝ থেকে। নৃশংস ভাবে খুন হয়েছে সে। তোমাদের এই জাহাজে আমার যদিও বেশিদিন থাকা হয়নি, তবু ঐ বাসিলের মুখটা এখনো আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি রাতে ঘুমাতে পারি না।'

কথা বলতে বলতেই একটা বোতল খুলে ফেললো রাহু। এক ঢোক চালান করে দিলো গলায়, বোতলটা তারপর বাড়িয়ে দিলো তাজিমের দিকে।

তাজিম আলতো করে বোতল ধরেছে, ছোটো করে একটা চুমুক দিলো সে। এই জিনিস তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলার কোনো মানেই হয় না। এরপরে আর কথা বিশেষ হলো না। তিনজনে বিরস মুখে বোতলের পানীয় নিঃশেষ করতে

লাগলো। শেষ ফোঁটাটা ঠোঁট দিয়ে চেটে নিলো শরিফ, 'এবার এই বোতল দুটোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলো কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ।' ব্যবস্থা পাশেই আছে। ছিপি খোলা বোতল সমুদ্রে ফেলে দিলেই হলো। এক নিমেষে ডুবে যাবে।

মদে নেশা হবার এবং সেই নেশা উপভোগ করার কিছু শর্ত আছে। খেয়ে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকতে হয়। তারপর চলে বাক্যালাপ। এসব আলাপে যুক্তির কোনো ভারসাম্য থাকে না।

তবে রাহুর পানের মাত্রা অত্যধিক। সে জানে আজকে দুজনের সাথে বসে সে যেই মাত্রায় পান করেছে তাতে তার নেশা একটুও হবে না। তবু নেশাগ্রস্থের ভান ধরলো সে। আচমকা কেঁদে উঠলো ঢুকরে, 'এটা আমি কী দেখলাম। কী দেখলাম আমি।'

শরিফ আর তাজিন আচমকা তেমন কিছু বুঝতে পারে না। তবে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মানুষ তেমন কিছু বোঝার চেষ্টাও করে না। দুজনেই হাত রাখল রাহুর পিঠে, দুজনেরই চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে নেশার আবেগের তোড়ে।

'বাসিল আমার খুব ভালো বন্ধু ছিল। কাউকে ভয় পেতো না সে। কেউ কেউ তো বলে সে ছিল দস্যুদলের সদস্য। এমন লোককে হারালাম আমরা।'

এত অযুক্তির মধ্যেও এবার তাজিম এটা যুক্তির প্রশ্ন করে বসলো, 'আমরা সবাই বাসিলের মৃত্যুতে কষ্ট পেয়েছি। সাথির মৃত্যু হলে এমনই লাগে। কিন্তু তুমি এভাবে নিজেকে সামলাতে পারছ না কেন? বাসিল কি তোমার পূর্ব পরিচিত ছিল?'

'না', রাহু মাথা নেড়ে উত্তর দেয়। এই প্রশ্ন তার কাজ সহজ করে দিয়েছে, 'তোমরা কেবল বাসিলের মৃতদেহ দেখেছ। আমি যা দেখেছি তোমরা কিন্তু তা দেখোনি।'

'কী দেখেছ তুমি?' এবার দুজনেই এক সাথে প্রশ্নটা করে।

রাহু এবার সাবধানে বলে, গলা নামিয়ে, 'আমি বাসিলকে খুন হতে দেখেছি। আমার চোখের সামনেই খুন হয়েছে সে। আহা, সেই আতঙ্কের কথা আমি কীভাবে ভুলবো?'

নেশার ঘোরের মধ্যেও শরিফ আর তাজিমের চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে। একটা ক্রোধ কোথাও হয়তো জেগে ওঠে তাদের মধ্যে, তাজিম বলে ওঠে, 'তাহলে অকুলাস বন্দরে তুমি সেই কথা কেন বলোনি? কেন বেঁচে যেতে দিলে সেই খুনিকে। তুমি বললেই তো বন্দর রক্ষীরা সেই খুনিকে ধরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতো। বলো, কেন তুমি চুপ ছিলে? আহা বাসিল।' তার কথায় স্পষ্ট ক্রোধ প্রকাশ পাচ্ছে।

রাহু কান্না মাখা গলায় বলল, 'আমার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। যে বাসিলকে হত্যা করেছে তার কথা বলতে আমি ভয় পেয়েছিলাম।

কিন্তু এখন সেই অপরাধবোধ আমাকে ভেতরে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। এই যন্ত্রণা থেকে আমি কীভাবে মুক্তি পাবো?'

এতক্ষণে কাজের প্রশ্নটা করে শরিফ, 'কে হত্যা করেছে বাসিলকে?'

নিজের মাথা একটু নামিয়ে আনে রাহু, একটু ঘাবড়ে যাবার ভঙ্গি করে, 'সেই কথা না বললেই আমার জন্য ভালো। কিন্তু সেই কথা পেটে নিয়ে বেঁচে থাকাও আমার জন্য সম্ভব নয়। আমি দম বন্ধ হয়েই মনে হয় মারা যাবো।'

মাতালের ধৈর্য কম থাকে, তাজিম চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বাসিলের হত্যাকারীর নাম বলো।'

ইতস্তত ভঙ্গিতে অবশেষে নামটা বলে রাহু, 'মাজিদ। এই জাহাজের প্রধান নাবিকই হত্যা করেছে বাসিলকে। একেবারে আমার চোখের সামনে।'

চোখ বড়ো হবার সর্বশেষ সীমা শরিফ আর তাজিমের ক্ষেত্রে বহু আগেই পেরিয়ে গেছে। নয়তো তা আরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেতো নিশ্চিত। তাজিম এবার ভয়ে ভয়ে বলে, 'মাজিদ খুন করেছে বাসিলকে? কী বলছ এসব?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস না হবারই কথা। কিন্তু আমার চোখের সামনে যা ঘটেছে তা অবিশ্বাস কীভাবে করি।'

এবার যেন একটু সম্পৃক্ততা খুঁজে পায় শরিফ, 'হ্যাঁ। কথাটা ঠিকই বলেছ। এজন্যই মাজিদ তাড়াতাড়ি অকুলাস বন্দর ছেড়ে চলে এসেছে।'

রাহুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সন্দেহ পাকা হচ্ছে আস্তে আস্তে, 'হ্যাঁ। একমাত্র আমিই জানতাম কেন করছে সে এমনটা, কিন্তু বলতে পারিনি।' শেষ দিকে তার গলা আবার ভরাট হয়ে আসে।

মাজিদ তখন ভাবছে অন্য কথা, 'কিন্তু মাজিদ কেন বাসিলকে হত্যা করবে৷ বাসিল তো ছিল মাজিদের কাছের মানুষ। তাদের মধ্যে কখনো ঝগড়া বিবাদ হতেও দেখিনি।'

রাহু বুঝতে পারলো এবার সন্দেহের আসল বীজ বপনের সময় উপস্থিত, 'ওরা অনেকক্ষণ ধরেই কথা কাটাকাটি করছিল। আমি শুনেছি। তারপরেই তো বাসিলকে ছুরি মারে মাজিদ।'

'তাই না-কি? কী নিয়ে কথা কাটাকাটি করছিল?' শরিফ জিজ্ঞেস করে।

একটু আগেই একটা তথ্য জানতে পেরেছিল রাহু। এই বাসিল দস্যুদলের সদস্য ছিল। সেটাকেই কাজে লাগাবে বলে সিদ্ধান্ত নিলো সে, 'বাসিল আসলে তোমাদের জন্যই মরেছে। ঐ মাজিদের লোভের বলি হয়েছে সে।'

'আমাদের জন্য মরেছে মানে?'

রাহু জানে শুধু প্রতিশোধের জন্য এরা মাজিদের বিরুদ্ধে কিছুই করবে না। এখানে প্রয়োগ করতে হবে ষড়রিপুর অন্যতম রিপু লোভ। লোভে পড়েই এরা কাজ করবে মাজিদের বিরুদ্ধে। সে জোরে একটা দম নিলো।

ওদিকে অধৈর্য হয়ে পড়েছে দুজনে, 'বলো, কেন মরেছে বাসিল। কী কথা হয়েছিল দুজনের মধ্যে?'

রাহু বলতে শুরু করে, 'তোমরা তো জানোই বাসিলের ব্যাপারে একটা গুজব আছে। সে দস্যুদলের সদস্য ছিল। ব্যাপারটা আসলে গুজব নয়। আসলেই বাসিল এক দস্যুদলের সদস্য ছিল। কিন্তু তোমরা এটা জানতে না, সেই দস্যুদলের সাথে মাজিদেরও সম্পর্ক ছিল। সেই দলের লুট করা অনেক রত্ন একটা জায়গায় লুকানো আছে। বাসিলের কাছে ছিল সেই রত্নভান্ডারের মানচিত্র। মাজিদ সেই জায়গার ঠিকানা জানতো না।

বাসিল আসলে তোমাদের সবাইকে নিয়ে ঐ গুপ্তধন উদ্ধার করতে চেয়েছিল। কিন্তু, তাতেই বাঁধা দেয় মাজিদ। তোমাদের সবাইকে ভাগিদার বানানোর কোনো ইচ্ছেই তার ছিল না, এখন তো একেবারেই নেই। বাসিলকে মেরে সেই নকশা এখন মাজিদের হাতে চলে এসেছে। আগে গুপ্তধন অর্ধেক অর্ধেক হতো, কিন্তু এখন তা পুরোটাই পাবে মাজিদ। এই কারণেই বাসিলকে হত্যা করেছে সে। এখন আমি আছি ভয়ে। কোনোমতে যদি মাজিদ জেনে যায় আমি এই ঘটনার একমাত্র সাক্ষী তাহলে আমাকেও জীবিত রাখবে না। এখন আমি কীভাবে বাঁচবো জানি না।'

কথাটা শেষ হতেই দুজনের প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইলো রাহু। দুজনেই এখন বাসিলের মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করছে না, রাহুর জীবন নিয়েও চিন্তা করছে না। তারা কেবল ভাবছে ঐ গুপ্তধনের কথা। চেহারা তাদের জ্বলছে।

মাজিদ ঢুলুঢুলু চোখে রাহুর দিকে তাকালো, 'তুমি ভয় পেও না। মাজিদ কখনোই তোমার সাক্ষী হবার কথা জানবে না। এখন তুমি ঘরে যাও। কাল রাতে আবার এসো। আমরা একটু আলোচনা করে নিই।'

'আচ্ছা', আস্তে করে ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো রাহু। নিজের কাজটা সে ভালো ভাবেই করতে পেরেছে। এতে কাজ না হয়েই যায় না। স্তুপে আগুন লাগিয়ে দেওয়া গেছে, এবার তার আর কিছুই করতে হবে না। আগুন নিজের মতো করেই ছড়িয়ে পড়বে।

উল্লাসের সময় পেরিয়ে গেল। প্রাণ বেঁচেছে সেটাই বড়ো কথা। তবে মানুষ প্রকৃতির সবচেয়ে অকৃতজ্ঞ প্রাণী। একটু পরেই কৃতজ্ঞতার বদলে তার মনে স্থান করে নেয় ভবিষ্যতের চিন্তা। সেটাই এখন ভাবতে বসেছে সবাই।

ঝড় শেষ হতেই পূর্ব আকাশে সূর্য দেখা দিয়েছিল। সেই আলো প্রথমে আবছা থাকলেও একটু পড়েই যখন আলোর ঝিলিক বাড়লো তখন নাবিকদের চোখে পড়লো জাহাজের অবস্থা। কঠিন রোগ যেমন রোগীকে মারতে না পারলেও একেবারে যমের দুয়ার থেকে ঘুরিয়ে আনে, এই ঝড়ও জাহাজের সেই অবস্থা করেছে। একটা দড়িও আস্ত নেই। জাহাজের গায়ের অনেক অংশ ভেঙ্গে গেছে। পালের অবস্থা একেবারে তথৈবচ। মোটামুটি একটা অবস্থায় আনতে হলেও অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

প্রধান নাবিকের মনে আবার চিন্তা এসে জায়গা নিয়েছে। এখনো আরব সাগরের বুকের অনেক অংশ পেরোতে হবে। এই জাহাজ চালিয়ে সঠিক দিকে যাওয়া মুশকিল। প্রধান মাস্তুল ভেঙ্গেছে, কিন্তু এখনো দাঁড়িয়ে। হালের হাতলও ঠিক আছে, কিন্তু সেখানেও মেরামত করতে হবে। তবে সেসব কাজ এক্ষ নাবিকেরা করতে পারবে না। সারারাত ঝড়ের সাথে লড়ে তারা জয়ী হয়েছে সত্য, তবে কাজ করার মতো শক্তি এখন কারো মধ্যেই অবশিষ্ট নেই।

শক্তি ফিরিয়ে আনতে একটাই উপায়। খাবার আর পানি। এই দুটোর খোঁজ প্রথমে করলেন প্রধান নাবিক, 'কেউ গিয়ে জাহাজের পানির অবস্থা দেখে এসো। আমাদের অবস্থা এখনো ভালো হয়নি। ঝড়ের জলে যদি পানি দূষিত হয়ে যায় তাহলে বুক ফেটেই মরে যাবো। আর হ্যাঁ, খাবারের সন্ধানও করতে হবে। খাবার নষ্ট করতে পারবে না অবশ্য নোনা জল। পানি নিয়েই ভয়।'

নাবিকেরা আদেশ পালন করতে নড়ে উঠলো। কয়েকজন নেমে গেল খোলের ভেতর। পানির পিপা সেখানেই রাখা হয়। প্রত্যেকটা পিপার মুখ খুলে পরীক্ষা করতে লাগলো তারা। সবগুলো অবশ্য মিঠা অবস্থায় পাওয়া গেল না। কিছু কিছু পিপায় সূক্ষ্ম ছিদ্র অবলম্বন করে জল তার জায়গা করে নিয়েছে। সেগুলো আর খাওয়া যাবে না। প্রধান নাবিককে খবর দিতে ওপরে উঠে এলো তারা।

প্রধান নাবিক সব শুনে রায় দিলেন, 'আমাদের হাতে সময় এখন অনেক কমে গেল। আমাদের নির্ধারণ করে রাখা সময়ের আগেই অকুলাসে পৌঁছতে হবে। এখন থেকে আমরা বিশ্রাম পাবো কম। আমাদের জাহাজের অনেক ক্ষতি হয়েছে এই ঝড়ে। আমাদের কিছু পণ্যও নষ্ট হয়েছে। এই যাত্রা কোনোমতে বেঁচে ফিরতে পারলে হয়। তবে নাবিকদের অতিরিক্ত পরিশ্রমের দাম আমি দিয়ে দেবো।'

নাবিকদের পরিশ্রম করতে আপত্তি নেই। জাহাজের রসদ যদি মাঝ সমুদ্রে ফুরিয়ে যায় তাহলে সবাইকেই মরতে হবে। জীবন বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে সবার আগে। নাবিকেরা দড়ি, হাতুড়ি আর পেরেক গোছানো শুরু করলো।

তবে তার আগে খেয়ে নিতে হবে। তারপর পালা হবে কাজের। খাদ্য ভান্ডারের সবকিছু ভিজে গেছে। সেই শস্য দিয়েই খাবার পালা চলতে লাগলো। বাকি শস্য শুকাতে দেওয়া হলো। ভিজে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে।

রুদ্রদেব আর অসিত খেয়ে নিচ্ছে। শেইরনও বসে আছেন তাদের সাথে। তার না-কি খেতে ইচ্ছে করছে না। রুদ্রদেব শস্য দানা মুখে দিলো, 'আপনি খাচ্ছেন না কেন? এখন সবাইকেই কাজে লাগতে হবে। কখন আবার খাওয়ার সুযোগ আসে কে জানে।'

অসিতও খাবার গিলছে, 'ঠিক কথা।'

শেইরনের চোখে চিন্তা, 'ঝড়টা এমন আচমকা বন্ধ হয়ে গেল কেন?'

প্রশ্নটা কাউকে উদ্দেশ্য করে করেননি তিনি। নিজের মনে তার এই কথাই চলছে। তবে রুদ্রদেব শুনতে পেয়েছে, 'প্রকৃতির রহস্যের কতটুকুই আর আমরা জানি। কত খেয়ালে মাতে এই প্রকৃতি। সেই রহস্যের কথা যতই ভাবনে কোন কূল পাবেন না। তার চেয়ে সময়মতো খাবার খেয়ে কাজ করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলেই হলো। এসব ভেবে শুধু শুধু মাথায় দুশ্চিন্তার জন্ম দেবার কোনো মানে হয় না।'

'না, আমি দুশ্চিন্তা করছি না। তবে চিন্তা তো অবশ্যই করছি। প্রকৃতির ক্ষমতা তো দেবতাদের হাতে থাকে। ঝড়ের দেবতা এওলাস। তবে সে যদি সমুদ্রের মধ্যে ঝড় সৃষ্টি করতে চায় তখন তাকে অনুমতি নিতে হয় পসিডনের কাছ থেকে।'

অসিত একটু উৎসাহী হলো, শেইরন দেবতাদের কথা বলছেন। কিন্তু কই এমন দেবতাদের কথা তো সে কখনো শোনেনি, 'এই যে দেবতাদের কথা বললেন, তারা আবার কীসের দেবতা। নামই তো শুনিনি।'

শেইরন এবার শিষ্যকে শেখাবার সুযোগ পেলেন, কাজটায় তার বরাবরই আনন্দ, 'এগুলো তোমাদের দেবতা নয়, আমাদের দেবতা।'

'মানে?' অসিত অবাক হয়, 'তাই আবার হয় না-কি? দেবতারা তো এই সম্পূর্ণ পৃথিবীর অধিকারী। আপনাদের দেবতা, আমাদের দেবতা বলে কিছু হয় না-কি?'

' হবে না কেন? আমি তোমাদের আর্যাবর্তের ধর্ম সম্পর্কে কিছু কিছু জানি। তোমাদের সেখানে অনেক দেবতা আছে। নানা অঞ্চলে না-কি নানা দেবতার পূজা হয়। দেবতাদের রাজ্য আছে, রাজ সভা আছে, তারাও নানা রকমের বিপদে পড়ে, মানুষ বিপদে পড়লে তাদের কাছে নানা ন্যায়-অন্যায় সাহায্য চায়, ঠিক কি না?'

' ঠিক।' রুদ্রদেব এবার প্রবেশ করে আলোচনায়। শাপ মোচনের সময়ে মহাকাল তাকে যে কথা বলেছিলেন তার সাথে মিল পাচ্ছে সে শেইরনের কথাগুলোর।

'তাহলে আমাদের গ্রীসে যারা বাস করে তারা তাদের অভিযোগ কোথায় জানায়? তোমাদের দেবতাদের কথা তো তারা জানেও না। তাদের তাহলে কী হবে?'

অসিত এই কথার উত্তর দিতে পারে না। এমন যে-কোনো প্রশ্ন আসতে পারে সেটাই সে কখনো ভেবে উঠতে পারেনি, 'তাই তো? তারাও তো খেয়ে পরে ব্যবসা বাণিজ্য করে বেঁচে আছে। সেখানেও প্রাসাদ আছে, ঘোড়া আছে, ঘর আছে। কিন্তু সেসব নিয়ন্ত্রণ করে কে?'

' দেখো, আমিও জানি না, তবে আমাদের দেবতারা অলিম্পাসে থাকে বলে শুনেছি। আমার মনে হয় পৃথিবীর সীমা দেবতাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেবতারা যেমন আমাদের দিকটা দেখবেন, তোমাদের দেবতারা দেখবেন তোমাদের দিকটা।'

'হ্যাঁ, ঠিক যেন সাম্রাজ্যের মতো, এক জনের সাম্রাজ্যে আরেকজন নাক গলাবে না।'

'ঠিক। রোমান সাম্রাজ্য যেমন কিছুতেই মহারাজ সাতকর্ণীর রাজত্বে গিয়ে ঘাঁটি গাড়বে না তেমনি মহারাজ সাতকর্ণীও কখনো চেষ্টা করবেন না রোমান সম্রাটের সাথে যুদ্ধ করতে।'

রুদ্রদেব নিজের মত দেয়, 'এখন হয়তো এই সমুদ্রের বাঁধার কারণে করবে না। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে। হয়তো তখন আপনাদের রাজ্যের লোকেরা আসবে আমাদের রাজ্য আক্রমণ করতে। গ্রীসের আলেকজান্ডার নামে একজন তো মোটামুটি কাছাকাছি চলেও এসেছিলেন।'

'হ্যাঁ, তাও হতে পারে। আগের থেকে আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে পৃথিবী।'

'হ্যাঁ, আর এই বদলের কালকেই কলিযুগ বলা হয়েছে।'

অসিতের মাথায় ঘুরছে অন্য চিন্তা, 'কথা সেটা না। কলি যুগে নানা কাহিনি হবে ঠিক আছে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যদি সত্যি সত্যি আপনাদের ওদিকের কেউ আমাদের দেশে আক্রমণ করে তাহলে কী হবে? আমাদের দেবতারা তো এতদিন নিরপেক্ষ থাকতেন। আপনাদের দেবতারাও। এখন কি তবে আপনাদের আর আমাদের দেবতাদের মধ্যেও যুদ্ধ লেগে যাবে না-কি? তাহলে কে জিতবে?'

প্রশ্নটা হাসির উদ্রেক করলেও বেশ গভীর। শেইরন হেসে উঠলেন বটে কিন্তু অসিতের আপাত সরল সুরে জিজ্ঞেস করা প্রশ্নের কোনো উত্তর তার কাছে নেই।

রুদ্রদেব অবশ্য উত্তর শুনেই ছাড়বে, 'বললেন না তো, আপনাদের দেবতারা আর আমাদের দেবতারা যুদ্ধ লাগলে কে জিতবে?'

শেইরন অনিশ্চিত সুরে বললেন, 'তা কী করে বলবো? এমন ঘটনা কি কখনও হয়েছে না-কি? দেবতারা তাদের শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করবেন, সেই শক্তির সামনে কি কেউ দাঁড়াতে পারে। এখন কথা হচ্ছে দুটো অসীম শক্তি যখন একে অপরের সামনে দাঁড়াবে, তখন কী হবে তা বলা মুশকিল।'

রুদ্রদেব ক্ষণিকের জন্য চুপ করে গেল। দুটো অসীম শক্তি একে অপরের সামনে দাঁড়ালে কী হয় তা সে জানে। সেই চিন্তা কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন করে ফেললো তাকে। সম্বিত ফিরতেই দেখা গেল দুই পক্ষের দেবতাদের শক্তি নিয়ে হিসেব কষতে বসে গেছে অসিত, শেইরনও ভালোই সায় দিচ্ছেন সেই আলোচনায়।

'আমাদের দেবতারা অবশ্য কিছু হলেই ত্রিদেবের কাছে ছুটে যান। আরেকজন আছেন মহামায়া। উনিও দেবতাদের থেকে উঁচু। উনিও অনেক অসুর মেরেছেন।'

'আচ্ছা, তার মানে দেবতারা অনেক যুদ্ধেই হারেন।'

'হ্যাঁ, এই পর্যন্ত অনেক যুদ্ধেই তো তাদের হারের প্রমাণ আছে। আমাদের ধর্মগ্রন্থেই আছে।'

'আমাদের দেবতারাও হারেন। আগে যখন আমাদের এখানে রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ লাগতো তখন দেবতারা নিজেদের রাজ্যের পক্ষ হয়ে লড়তেন। তখন এক পক্ষ হারতো, আরেক পক্ষ জিততো।'

'তাহলে এখন আপনাদের দেবতারা কোথায় আছেন? তারা আপনাদেরকে কেন রক্ষা করেননি? রোমানরা এখন কীভাবে আপনাদের শাসন করছে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে শেইরনের বুক চিরে, 'দেবতারা মনে হয় আমাদের ত্যাগ করেছেন। দেবতারা শক্তি পান আমাদের প্রার্থনা থেকে। আগের মতো আমরা প্রার্থনা করি না। তাই দেবতারা সব নির্জীব হয়ে গেছেন মনে হয়।'

রুদ্রদেব প্রশ্ন করে নিজের কৌতূহল থেকে, 'আচ্ছা, আপনাদের দেবতাদের কিছু অস্ত্রের কথা বলুন না। কোন দেবতা কি অস্ত্র ব্যবহার করেন? দেখি আমাদের দেবতাদের সাথে মিল আছে কি না।'

'তাদের কাছে তো আসলে অস্ত্র হিসেবে শক্তি থাকে। জিউসের হাতে আছে বজ্রের শক্তি, পসিডনের আছে ত্রিশুল, হেডিসের হাতেও তাই। আর অন্য দেবতারাও নানা রকম অস্ত্র শক্তির ছদ্মবেশ হিসেবে ব্যবহার করেন। সূর্য এপোলো ব্যবহার করেন তীর ধনুক। তিনি তার অভিশাপও তীর ধনুকের মাধ্যমে ছুঁড়ে মারেন।'

রুদ্রদেব শোনে আর অবাক হয়, 'বাহ, আমাদের ওদিকের সাথে তো ভালোই মিল আছে। আমাদের ইন্দ্রেরও অস্ত্র হচ্ছে বজ্র, মহাদেবের অস্ত্র হচ্ছে ত্রিশূল। আমাদের সূর্যও ব্যবহার করেন তীর আর ধনুক।'

'তবে যুদ্ধ যদি বেঁধেই যায় তাহলে যে দেবতা সবার আগে যুদ্ধে নেমে যাবে তিনি হচ্ছেন এরিস। তিনি হচ্ছেন যুদ্ধের দেবতা। তিনি যখন যা পান সেই অস্ত্র ব্যবহার করেন। তোমাদের কথা শুনে চিন্তাটা মাথায় এসেছে। সত্যি যদি তোমাদের আর আমাদের দুই জায়গার দেবতাদের লড়াই লাগে তাহলে জিতবে কে?'

রুদ্রদেব হাসলো, 'এই প্রশ্নের উত্তর তো আর এমনিতে দেওয়া যাবে না। আমরা বলবো আমাদের দেবতার কথা আর আপনি আপনাদের দেবতাদের পক্ষ টানবেন। যুদ্ধ লাগলেই আসল সত্যটা বোঝা যাবে। তবে আমি চাই সেদিন কখনো না আসুক। সেই সময় পৃথিবী সহ্য করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

সবার খাওয়াই এখন শেষের দিকে। বসে বসে কথা বললে চলবে না। কাজে নেমে পড়তে হবে। রুদ্রদেব আর অসিতের দক্ষতা না থাকতে পারে, শক্তি আছে। সেটা নিয়েই তারা নেমে গেল বাকি নাবিকদের সাথে। দড়ি এদিকে-সেদিকে, ওপরে- নিচে টানতে টানতে অবস্থা খারাপ হবার জোগাড় হলো। হাতে ফোস্কা পড়ে গেল দুজনেরই। নাবিকদের হাত আগেই শক্ত হয়ে গেছে। জলে নেমে কি নাবিক হাল পরীক্ষা করে মেরামত সেরে আবার উঠে এসেছে। পালের কাপড় জোড়া দিয়ে মোটামুটি একটা অবস্থায় আনা গেছে। পুরোপুরি ঠিক না হলেও তা এখন বাতাস ধরতে পারছে। সারাদিনের টানা পরিশ্রমের পর জাহাজ এখন আবার চলাচলের জন্য তৈরি।

প্রধান নাবিক সবার ওপর দারুণ সন্তুষ্ট, 'সবার কাজে আমি খুব খুশি হয়েছি। মনে হচ্ছে এবার আমরা নিরাপদেই বাড়ি পৌঁছতে পারবো। আজকে রাতের চাঁদ দেখে আমরা যাত্রা শুরু করবো। যেভাবেই হোক আমাদেরকে জল শেষ হবার আগে অকুলাস বন্দরে পৌঁছতে হবে। কয়েকজন নাবিক পালা করে রাতে পালের দড়িতে কাজ করবে। আমি সারারাত জেগে থেকে হাল ধরে রাখবো।'

এবার নাবিকদের রাতের খাবার পরিবেশনের পালা। জলের পরিমাণ মাপা। নাবিকেরা এতে অভ্যস্ত, কিন্তু অসিতের ছাতি যেন নিমেষেই গলায় ঢেলে দেওয়া জল শুষে নিচ্ছে। রুদ্রদেব বুদ্ধি বাতলালো, 'এক কাজ করো। ছোটো ছোটো চুমুক দাও, কম জলেই তখন ভেতরটা ভিজে যাবে।'

ভালো বুদ্ধি। কোনোমতে খাবার খেয়ে নিলো সবাই। কারোরই শরীর চলছে না। নাবিকেরা পালা করে দড়িতে কাজ করার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। সন্ধ্যা হতেই উত্তর আকাশে ধ্রুবতারার দেখা মিলল। নিজের মানচিত্রে হিসেব করে নিলেন প্রধান নাবিক। তারপর আদেশ দিলেন পাল তুলতে। দড়ির বাঁধন নেড়েচেড়ে পালের দিক ঠিক করা হলো। এবার জাহাজ চলতে লাগলো অকুলাসের দিকে।

যোগ্যতা না থাকার সুবিধা পেলো দুজনে। রুদ্রদেব আর অসিত এখন বসে আছে ডেকের এক পাশে। সারাদিন ঘামে শরীরের অবস্থা সঙ্গিন। একটু জলের স্পর্শ না পেলে চলছে না। অসিত স্নান করতে শুরু করেছে।

ওরা দুজনে হাল বা পালের কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না। সমুদ্রের ওপর ঝিরিঝিরি বাতাস বইছে। দুজনেই সদ্য স্নান করা শরীরে ডেকের একটু খোলা জায়গায় বসেছে। মৃদু সেই হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে বসে আছে রুদ্রদেব। প্রকৃতির সাথে যেন আলাপ চলছে নরম ভাষায়। মানুষের জীবনে আসলে পরম অবসরের মুহূর্ত খুব একটা আসে না। যখন কাজ থাকে না তখন মানুষ হয় অতীতের জন্য আফসোস করে অথবা ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশা করতে থাকে। জীবন উপভোগ করার একমাত্র পথ হচ্ছে সময় উপভোগ করা। যা হবে, যখন হবে, তখন দেখা যাবে।

অসিতও উপভোগ করছে এই সন্ধ্যা। রুদ্রদেব নীরবতা ভাঙলো, 'শেইরন কোথায়? তিনি তো সারাদিন বিশ্রাম করেছেন। এখন আমাদেরকে একটু ভাষা শেখালে হতো না। এমনিতে নানা ঝামেলায় শিক্ষায় বিরতি পড়েছে।'

অসিত উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, শিক্ষায় বিরতি দেওয়া ঠিক না। আপনার তো মোটে একজন শিক্ষক। আমার শিক্ষক আবার দুজন। আমার তো যুদ্ধ বিদ্যা শেখা আটকে গেছে।'

'আটকে যাবে কেন? জাহাজে তো আর সব অনুশীলন করতে পারবে না। যেগুলো করা যায় সেগুলো করো। তবে কোনো অস্ত্রের চর্চা করবে না। আমাদের হাতে অস্ত্রসস্ত্র দেখলে নাবিকেরা অন্যরকম কিছু ভাবতে পারে।'

'তা ঠিক। শেইরন আমাকে এখানেই থাকতে বলে গেছেন। আপনাকেও। একটু পরেই তিনি আসবেন।'

'তাহলে অপেক্ষা করি।'

'আচ্ছা শেইরন যে বললেন, সমুদ্রের ঝড়ের হঠাৎ থেমে যাওয়া অস্বাভাবিক। আসলেই কি তাই?'

'আমি কী করে বলবো?'

'আপনি না বললেও আমি বলতে পারবো। আমি জানি এই ঝড় কীভাবে থেমেছে।'

রুদ্রদেব একটু ভড়কে গেল, 'ঝড় আবার কীভাবে থামবে? আপনাআপনিই থেমে গেছে।'

অসিত হেসে বলল, 'গুরু যদি শিষ্যের কাছে মিথ্যে বলেন তাহলে তো শিষ্যের মধ্যেও সেই গুণ চলে আসবে, তাই না?'

'কি বলতে চাচ্ছো? আমি মিথ্যে বলছি?'

'হ্যাঁ। আপনি ঝড়ের শেষ দিকে আমাকে শেইরনের সাথে থাকতে বলে আমাদের ঘরের দিকে গিয়েছিলেন। আমার মনে তেমন কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবেই শেইরনকে ছেড়ে আপনার পিছু পিছু গিয়েছিলাম। দেখি আপনি ঘর থেকে ধনুক নিয়ে বের হয়েছেন।'

'তারপর?' রুদ্রদেবের গলা শান্ত।

'তারপর আপনি ধনুকের ছিলায় টান দিলেন। কোনো তীর ছিল না আপনার কাছে। কিন্তু একটা উজ্জ্বল তীর কোত্থেকে যেন উদয় হলো আপনার ধনুকে। সেই তীর আপনি ছুঁড়ে দিলেন। তারপর আরেকটা তীর এলো আপনার ধনুকে, সেটা ছুঁড়ে দিতেই উজ্জ্বল জলের স্তম্ভ হয়ে ছুটে গেল সাগরের দিকে। তার একটু পরেই আচমকা ঝড় পুরোপুরি থেমে গেল।'

রুদ্রদেব বুঝতে পারলো, অস্বীকার করে কোনো লাভ হবে না। তখনই শেইরনকে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল। ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে। অসিত নিজেও জানে না সে কী দেখে ফেলেছে। এই অস্ত্র জ্ঞান এই পৃথিবীতে জীবিত মানুষের মধ্যে একমাত্র সেই সম্ভবত জানে।

রুদ্রদেব অসিতের দিকে ফিরে নিচু গলায় বলল, 'গুরু শিষ্যকে মিথ্যে বলতে অপরাধ হয়। কিন্তু শিষ্য যদি গুরু আদেশ না মানে তাহলে আরও বড়ো অপরাধ হয়। যাই হোক, এই ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সাথে রাতে কথা বলবো। এখন আর একটা শব্দও উচ্চারণ করবে না।'

শেইরন এসে ওদের সামনে বসলেন। তার দিকে স্বাভাবিক চোখে তাকিয়ে আছে দুজনে।

রুদ্রদেব মনে মনে ভাবছে অসিতের আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে। সে সেই ভোররাতেই পুরো ঘটনা দেখেছে। সারাদিন এই জিনিস মনে চেপে রেখেছে। কিছুই জিজ্ঞেস করেনি।

ধরা পড়ে যাওয়াতে আফসোস হচ্ছে তার। তবে সেই সাথে নিজেকে প্রকৃত গুরুও মনে হচ্ছে। অসিতকে সঠিক শিক্ষা দেওয়া গেছে এখন পর্যন্ত।

আচ্ছা, বিকৃতি কখন করে মানুষ? মনে হয়, যখন কোনো কিছুর সীমা লজ্ঘিত হবার উপক্রম হয় তখন। যে জিনিসে মানুষের বিরক্তি জন্মে সেই জিনিসেই সে পরিবর্তন করে। সবকিছুর থেকে মানুষ বেশি ভয় পায় এই বিরক্তিকে। নিত্য যারা পেটের চিন্তায় রত থাকে তাদের মনে আসলে এই জিনিস কখনোই জায়গা পায় না। আর যাদের চিন্তার অধিকার হরণ করা হয়েছে তাদের তো মনই নেই, সেখানে বিরক্তি থাকার প্রশ্নও নেই।

এই নগরে অভিজাতদের মধ্যে বিরক্ত হবার প্রবণতা খুব বেশি। সারাক্ষণ নানা রকম সম্ভোগে মত্ত থাকার সবচেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে এক সময় গিয়ে দেখা যায় সম্ভোগে অরুচি ধরে গেছে। এই সসাগরা পৃথিবীর জানা অংশে এমন কোনো বিনোদনের বস্তু নেই, যা তার উপভোগ করা হয়নি। তখনই আসে জীবনের বিষণ্নতা।

এজন্যই ছোটোবেলা থেকে নানা রকম আরাম বিলাসের শিক্ষা পাওয়া এই অভিজাতরা নিত্য নতুন বিনোদনের খোঁজে থাকে। আর নতুনত্ব আনতে গেলে মাঝে মাঝেই তা গড়াবে বিকৃতিতে সেটা তো বলাই বাহুল্য।

জ্ঞান হবার পর থেকে নিজের চোখ থেকে রঙিন চশমা কখনো সরেনি। সেই যে পায়াসের মেয়ে হয়ে সে জন্মালো, তখনই ঈশ্বর যেন তাকে প্রদান করলেন সব ঐশ্বর্য। যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায় এই প্রাসাদে। এই অভিজাতদের শিক্ষায় নিযুক্ত থাকেন যারা তারা খুবই দক্ষ এবং চতুর। ছোটোবেলা থেকেই নানা জ্ঞানের পাশাপাশি বিলাসের প্রয়োজনীয় বিকৃতির শিক্ষাও তাদেরকে ভালোভাবেই দেওয়া হয়।

ছোটোবেলায় শরীরে রতি রসের অভাব থাকে। তবে বড়ো হতে হতে যখন নিজের দেহ সেই রসের ব্যাপারটা বুঝতে পারলো তখনই বিনোদনের ব্যাপারে তার ধারণা হয়ে গিয়েছিল। সে বুঝেছিল, এই দেহই আনন্দ লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। আর কোনো রাখঢাক তো নেই-ই। নিজেকে কেবল বাইরে সম্ভ্রান্ত আর অভিজাত করে রাখো। প্রাসাদের ভেতরে যে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। রতি রসের পূর্ণ ব্যবহার যৌবনের প্রায় প্রথম অধ্যায় থেকেই করতে শুরু করেছিল সে। এক সময় পূর্ণ ব্যবহারের সব পর্যায় শেষ হয়ে গেছে। এখন শুরু হয়েছে বিকৃতি।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই একটা নতুন বুদ্ধি মাথায় এসেছিল তার। ঋতু গেছে দুই দিন হয়। এই দুদিনে নতুন কোনো পুরুষ তার বিছানায় ওঠেনি। এর মধ্যে অভিজাত নির্বাচনের একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। তারও কিছু তোড়জোড় চলেছে। মন আর শরীর দুইই ক্লান্ত হয়ে আছে। এখন উত্তেজনাকর কিছু না করলে আর চলছে না।

বিছানায় বসেই চিন্তাটা ঝালিয়ে নিতে শুরু করলো সে। না, বেশ উত্তেজনা অনুভূত হবার কথা এই কাজ করলে। হয়তো নাও হতে পারে, হয়তো খুবই খারাপ অভিজ্ঞতা হবে, তবে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?

এক দাসী তার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাই তার কাজ। ঘুম থেকে উঠলেই প্রক্ষালন সামগ্রী আর নানা পরিধেয় এগিয়ে দেবে সে। এই মুহূর্তে নিক্সের শরীরে কেবল এক টুকরো কাপড় জড়ানো আছে।

দাসী ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতর। মাথা নিচু করে রেখেছে। একে একে এগিয়ে নিক্সের সামনে রাখছে সব প্রয়োজনীয় জিনিস।

নিক্স আচমকা দাসীর হাত চেপে ধরলো। ঘটনার আকস্মিকতায় ভয় পেয়ে গেলেও গলায় চলে আসা চিৎকারটা গিলে ফেললো দাসী। এই মালিকদের নানা রকম বাহানা আর অত্যাচার সহ্য করার জন্যই তাদের জন্ম হয়েছে। এমন আকস্মিক আক্রমণের সাথে তারা পরিচিত।

নিক্স এক টানে দাসীকে এনে ফেললো বিছানার ওপর। নিক্সের কোমল নমনীয় কমনীয় শরীরে অবশ্য এত শক্তি নেই যে, কঠিন কাজে অভ্যস্ত একজন দাসীকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিছানায় নিয়ে আসবে। দাসী কোনো বাঁধা না দিয়ে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়লো।

আজকে রতি রসের সাথে মদন রসের মিলন না ঘটিয়ে রতিতে রতিতে কী হয় তাই দেখার সাধা জেগেছিল নিক্সের। সমকামিতা যে এই সমাজে একেবারে নেই তা নয়। সমকামিতা, উভকামিতা সবই আছে, তবে নিক্স এমন কিছু জানতো না। এই ব্যাপারটা যে তার জন্য প্রাকৃতিক তা নয়, বরং ঐ যে নতুন কিছু করার যে বিকৃতি আনন্দ, তা পাবার লোভেই তার এই পদক্ষেপ নেয়া।

দাসীর ঠোঁট কামড়ে ধরল নিক্স। সাথে চলতে লাগলো গভীর চুম্বন। সব রকমের দেহ লীলা করে দেখতে হবে। তবে নিজের গভীরে চিন্তা করে কাজটা শুরু করলেও ক্ষণিক পরেই নিক্স বুঝতে পারলো তার শরীর সাড়া দিতে শুরু করেছে। যেভাবে সে চিন্তা করে রেখেছিল সেসব এখন আর মনে নেই। শরীর নিজের নিয়মেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, নিচ্ছে একের পর এক পদক্ষেপ। একটু পরেই নিজের এক টুকরো কাপড়ের সাথে দাসীর শরীরের সব কাপড় বিছানার চ্যুত হলো। ছিটকে মেঝেতে এসে ছড়িয়ে পড়লো।

দাসী এতক্ষণে নিজেকে পুরোই সামলে নিয়েছে। নানা সময়ে প্রাসাদের নানা পুরুষের আচমকা অত্যাচার সহ্য করতে হয় তাদের। এই ভবনে নানা অভিজাত পুরুষেরা সময়ে সময়ে আসেন। মাঝে মাঝে গভর্নর তাদেরকে আপ্যায়নের ভার দেন দাসীদের ওপর। তখন যে দাসী পছন্দ তাকেই যেখানে খুশি সেখানে সম্ভোগ করার অধিকার অর্জন করে সেই অথিতি। আর এই অধিকারের পূর্ণ ব্যবহার যে করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হেলটদের মধ্যে বিয়ে যে হয় না তা নয়, এই

দাসীরও বিয়ে হয়েছে। যেদিন রাতে স্বামীর সাথে থাকার ভাগ্য হয়, সেদিনও সে আনন্দে উদ্বেলিত হতে পারে না। যৌনতা যে ভালোবাসা প্রয়োগ করার, অনুভব করার একটা বড়ো পন্থা এই ধারণা এই নগরীর খুব কম মানুষের মধ্যেই আছে। হোক সে অভিজাত, হোক সে হেলট।

বিছানায় ততক্ষণে পরিস্থিতি আরও চরমে উঠেছে। হিসহিসিয়ে উঠলো নিক্স, 'তুই এভাবে মরার মতো পড়ে আছিস কেন? নড়াচড়া কর, শব্দ কর, চিৎকার করে ওঠ। বাইরে থেকে যেন তোর চিৎকার শুনতে পাওয়া যায়।'

কোনোদিন কোনো মেয়ের সাথে দাসী এমন কাজ করেনি। এই ভূমিকা তার অপরিচিত। কীভাবে অভিনয় করতে হবে তাও সে জানে না। নাট্যমঞ্চের একেবারে বাজে অভিনেত্রীর মতো আচরণ করতে শুরু করলো সে। যেসব শব্দ দাসীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো সেগুলোকে কোনোভাবেই যৌন সুখের প্রকাশক বলা যাবে না। যন্ত্রণা আর শিহরণ মিলে এক অব্যক্ত ভাষা উৎপন্ন হচ্ছে।

নিক্সের অবশ্য কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তার উদ্দেশ্য পুরোপুরি পূর্ণ হয়েছে। অনেকদিন পরে শরীরের রতি চাহিদা পুরোপুরি মিটেছে তার। সেনাদলের, রক্ষী দলের তাগড়া তাগড়া জোয়ান সেনাদের নিজের বিছানায় টেনে এনেও গত কিছুদিন যে সুখ পাওয়া যাচ্ছিল না, এবার অচিরেই সেটা পাওয়া গেছে। উত্তেজনাটাকে আরও কিছুক্ষণ ধরে রাখল সে। আহ, ঈশ্বর বড়োই অবিবেচক। এমন অনুভূতি মানুষ কেন শুধু ক্ষণিকের জন্য পাবে? একটু পরেই তার উত্তেজনার পারদ নিচে নেমে এলো।

দাসীর নগ্ন দেহের ওপর থেকে উঠে এলো নিক্স। হঠাৎ উত্তেজনা কমে যেতে তার শীত করতে শুরু করেছে। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নিলো সে। তারপর তাকালো দাসীর দিকে, 'তুই এখনো শুয়ে আছিস কেন? আমার কাজ শেষ। তোর মনে হচ্ছে এখনো হয়নি। প্রহরী ডাকবো নাকি?'

তাড়াতাড়ি উঠে বসলো দাসী। এবারে শরীর শান্ত হয়েছে নিক্সের। দাসীর দিকে তাকিয়ে এবার একটু আফসোস হলো তার। নারীর দেহেই যে নারী এমন সুখ খুঁজে নিতে পারে তা তো সে আগে বুঝতে পারেনি। তবে প্রথম বার কোন হেলটের সাথে কাজটা না করে অভিজাত কারো সাথে করলে অভিজ্ঞতা আরও ভালো হতো মনে হচ্ছে। তাও করা যাবে। সময় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। এই নগরের অনেক অভিজাত যেমন তার বাবাকে তোষামোদ করে তেমনি অনেক অভিজাতের মেয়েই আছে, যারা তার এক অঙ্গুলি হেলনে যে কোনো আদেশ পালন করবে।

তবে এখন আর তার এসব নিয়ে ভাবতে ভালো লাগছে না। সঙ্গমের পরে সঙ্গীর প্রতি বিরক্তি জন্মানো মানুষের জন্য খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

পরিশ্রম খুব একটা কম হয়নি। ঘরের বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না। এখানেই খাবার আনানোর সিদ্ধান্ত নিলো সে।

তখনই বাইরে থেকে এক প্রহরীর মুখ উঁকি দিলো, 'ক্ষমা করবেন কুমারী। মহামান্য গভর্নর পায়াস আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী। তিনি চান আজকে সকালের খাবার আপনি খাবার ঘরে গিয়েই খান।'

নিজের 'কুমারী' সম্বোধনে একটু না হেসে পারলো না নিক্স, 'ঠিক আছে। বাবাকে গিয়ে বলো আমি আসছি।'

এবার দাসীর নিয়ে আসা কাপড় কাজে লাগলো। সবকিছু গায়ে জড়িয়ে প্রসাধনগুলোর সদ্ব্যবহার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নিক্স। তার চেহারায় দেখা দিয়েছে বহুকালের চর্চিত আভিজাত্যের ছায়া। প্রাসাদের সবার কুর্নিশ পেতে পেতে খাবার ঘরে চলে এলো সে।

পায়াস মেয়েকে খুবই পছন্দ করেন। মেয়েকে নিয়ে তার সবকিছুতেই যেন ন্যাকামি। তবে আজ তিনি নিক্সকে দেখে অতোটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। তার মুখ ভার। নিক্স এসব অতো খেয়াল করলো না। নিজের জন্য বরাদ্দ করা আসনে বসে পড়লো। ক্ষিধের তোড়ে টেবিলে রাখা মাংসের টুকরায় একটা কামড় বসালো।

নিজের স্ত্রীকে চোখ দিয়ে ইশারা করলেন পায়াস। স্বামীর ইশারা বুঝতে পারলেন টায়রা, তাদের মধ্যে আগেই কথা হয়ে গেছে। আজ সকালে নিক্স যা করেছে তা নিয়ে দুজনেই জ্ঞাত। এবং সেই সঙ্গে শঙ্কিত।

টায়রা সুরাতে একটু চুমুক দিলেন, 'কেমন আছো নিক্স? আশা করি তোমাকে শুভ সকাল বলা যায়।'

'সকালে যখন উঠেছিলাম তখন হয়তো বলতে পারতে না মা। তবে এখন বলতে পারো। আমার মন এখন অত্যন্ত ভালো।'

টায়রা মেয়ের এমন উত্তরে কী বলবেন ভেবে পেলেন না। এই মেয়ে অনেক আগেই তার শাসনের আওতার বাইরে চলে গেছে। পায়াস বুঝতে পারলেন কথাটা তাকেই বলতে হবে। নিজের মেয়ের সাথে এমন কথা বলা যথেষ্ট বিব্রতকর। তবে কিছুই করার নেই। ঘটনা এখানেই আটকাতে হবে।

'তুমি আজ সকালে যে কাজটা করেছ তা কিন্তু আমরা দুজন জানি। অবশ্য তুমি লুকিয়ে কিছু করতে চাওনি।'

একটু অবাক হলো নিক্স, 'কী কাজের কথা বলছো বাবা?'

'দেখো, সরাসরি সেই কথা আমি তোমাকে বলত পারবো না। তবে তুমি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। তোমার স্বামী ভবিষ্যতে এই নগরের গভর্নর হবে। সেই হিসেবে তুমি হবে এই নগরের রানী। সেই তুমি যদি এমন বিকৃত যৌনাচার

করো তাহলে তো আর বংশের মান থাকবে না। সমকামিতা আমাদের সমাজে অপরাধ নয়, অনেকেই করে, কিন্তু তোমার একটু সামলে চলা উচিত।'

এবার জোরে হেসে উঠলো নিক্স, 'এই কথা। আমি ভাবলাম কি না কি। আমার তেমন কোনো সমস্যা নেই বাবা। আমি সেরকম কোনো মেয়ে নই যার পুরুষদের ভালো লাগে না। আমার তো পুরুষদের অনেক ভালো লাগে। আজ সকালে শুধু অন্য কিছু করার জন্য দাসীকে ব্যবহার করলাম। এতে আমার স্বভাব পরিবর্তন হয়নি। তুমি মিছিমিছি চিন্তা করছো। যখনই তুমি অভিজাত পাত্র ধরে আনবে তখনই আমি তার গলায় বরমালা দিয়ে দেবো। বিয়ের পরে এসব বন্ধ হয়ে যাবে। আমি হয়ে যাবো একেবারে সম্রান্ত, অভিজাত গৃহিণী।'

টায়রা এবার কথা বলার সুযোগ পেলেন, 'তোমাকে তো বলেছিলাম, মেয়ে আমার ওরকম নয়। এই বয়সে একটু আধটু এমন কাজ মেয়েরা করে। তোমার মেয়ে তোমার সম্মানের কোনো ক্ষতি করবে না।'

মেয়ের কথা শুনে ততক্ষণে হাঁফ ছেড়েছেন পায়াস, বৌয়ের কথায় অতো গুরুত্ব দিলেন না, 'আমাদের হাতে এখন দারুণ সুযোগ এসেছে। স্পার্টার অভিজাত সম্প্রদায় বেছে নেবার কাজ শেষ হয়েছে। এর পরের দলের জন্য অপেক্ষা করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ততদিনে নিক্সের বয়স বেড়ে যাবে। আমি ঠিক করেছি এই দলের একজনকেই বেছে নেবো। তোমাদের কী মত?'

টায়রা মত দেওয়ার সুযোগ পেয়ে ছাড়লেন না, 'ভালোই তো হয়। মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমাদের উত্তরাধিকার ঠিক করে নেবার এই সুযোগ ছাড়া উচিত হবে না।'

নিক্স যে কথাটা শুনে খুব একটা আনন্দিত হলো তা নয়। তবে সে জানে এই দিনটা একদিন আসবে। পায়াস তার বাবা হলেও পায়াসের মৃত্যুর পর স্বামীর শাসনেই তাকে থাকতে হবে। তখন এত সব অনিয়ন্ত্রিত আনন্দ আর উপভোগ করা যাবে না। নিজের মত দিলো না নিক্স, এক মনে খেতে লাগলো।

পায়াস ভ্রু কুঁচকালেন একটু, 'তোমার কি এই ব্যাপারে কিছুই বলার নেই?'

নিক্স এবার মাথা তুলল, 'বিয়ে তো আমাকে করতেই হবে। মেয়েদের শাসক হবার তো কোনো নিয়ম এখানে নেই।'

'তা ঠিক। তাহলে আমি পাত্র দেখা শুরু করি?'

' হ্যাঁ, আমার কোনো আপত্তি নেই।'

এবার মেয়ের ওপর রাগ পুরোপুরি চলে গেল পায়াসের। মেয়ের জন্য একটা বিশেষ উপহার আছে। কাল রাতেই এসে পৌঁছেছে। সকালের এই ঝামেলা না হলে খাবার আগেই মেয়েকে উপহারটা বুঝিয়ে দিতেন।

'তোমার জন্য একটা উপহার আছে মা। অনেক দূর থেকে এসেছে। তুমি দেখলে অনেক খুশি হবে।'

'উপহার?' নিক্স মনে মনে একটু খুশি হয়ে উঠলো। বাবার উপহারগুলো দারুণ হয়।

'দেখি তুমি আন্দাজ করতে পারো কি না?'

'পুবের সেই সিন্ধদেশ থেকে কোন দামি রত্ন এসেছে না-কি?'

'না, মা হলো না। জানি, সেটা হলে তুমি অনেক খুশি হতে। তবে আমি যা আনিয়েছি তাতে তুমি ঐ রত্নের চেয়েও বেশি খুশি হবে।'

তখনই নিক্স বুঝতে পারলো উপহারটা কী, চিৎকার করে উঠলো সে, 'আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি আমার জন্য নতুন কোনো পশু নিয়ে এসেছ?'

'ঠিক ধরেছ মা', হাসলেন পায়াস, ' সুদূর আফ্রিকা থেকে ধরা একটা বিশেষ অজগর আজকেই নগরে এসে পৌঁছেছে। এর মধ্যেই তা পৌঁছে গেছে তোমার চিড়িয়াখানায়।'

যথেষ্ট খাবার খেয়ে নিয়েছে নিক্স। পেটে একটু ক্ষিধে থাকলেও টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লো সে। টায়রা একটু অনুযোগ করলেন, 'খেয়ে যাও।'

'দুপুরে এসে খাবো মা', নিক্স ততক্ষণে চিড়িয়াখানার পথে পা বাড়িয়েছে। পায়াস মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন মেয়ের চলে যাওয়া। এই খুশির জন্য পৃথিবীর সব কঠিন কাজ করা যায়। নিজের খাবারে এতক্ষণে মন দিতে পারলেন তিনি।

নিক্সের একটা ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা আছে। ছোটোবেলা থেকেই সব ধরনের পশুপাখির প্রতি আকর্ষণ আছে তার। তবে শুধু পশু হলেই চলবে না। সেই পশুর থাকতে হবে বিশেষ কোনো শারীরিক লক্ষণ, যা তাকে আলাদা করবে তার প্রজাতির অন্য পশুর থেকে। বিশেষ সেই প্রাণীতে ভর্তি তার চিড়িয়াখানা। বাঘ, ভালুক, সাপ সবই আছে। দেখতে আলাদা।

পায়াস চিড়িয়াখানায় সাপুড়েকে তৈরিই থাকতে বলেছিলেন। সাপুড়ে জানতো নিক্স আসবে। সেও সাপ নিয়ে তৈরি ছিল। সাপের সামনে এসে চমকে গেল নিক্স। আসলেই অন্যরকম এক সাপ। অন্য সাধারণ অজগরের মতো এই সাপের গায়েও ডোরাকাটা, তবে শরীরে লাল লাল এক ধরনের ছোপ আছে। কোনো অজগরে এমন লাল ছোপ সে কখনও দেখেনি, মনে হয় কেউই দেখেনি।

সাপটাকে আদর করার তীব্র ইচ্ছে পেয়ে বসলো তাকে। সাপুড়েকে আদেশ দিলো, 'সাপটার মুখটা বেঁধে দাও।'

একটা বিশেষ ধাতব ঢাকনা লাগিয়ে দিলো সাপুড়ে অজগরের মুখে। এখন অজগর কামড়াবার জন্য মুখ আর খুলতে পারবে না। অবশ্য শরীর দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিতে পারবে। তবে নিক্সের সেই ভয় নেই। বড়ো সাপের শরীরের শক্তি কীভাবে কেড়ে নিতে হয় তা সে ভালো করেই জানে।

আর তর সইছে না নিক্সের, সাপুড়েকে আদেশ দিলো, 'তুমি বাইরে যাও। ভালো করে নজর রাখবে। কেউ যেন চিড়িয়াখানার ভেতরে এসে আমাকে বিরক্ত না করে।'

সাপুড়ে এই আদেশও সাথে সাথে পালন করলো। আজকের দিনকে আবার ধন্যবাদ দিলো নিক্স। আজকের দিন তার জন্য আনন্দের ঝাপি নিয়ে এসেছে। অজগরকে আদর করতে সবসময়ই ভালো লাগে তার।

নিজের শরীরের সব কাপড় খুলে ফেললো নিক্স। সাপের গলার বিশেষ একটা স্নায়ুতে আঙ্গুলের চাপ দিলো। এখন সাপের নড়াচড়াও হবে তার নির্দেশে। সাপটাকে জড়িয়ে ফেললো সে নিজের শরীরের সাথে। শুয়ে পড়লো সঙ্গমের ভঙ্গিতে। মনে হচ্ছে সাপটার সাথেই বুঝি সঙ্গম করছে সে। সাপটা আস্তে আস্তে পেঁচিয়ে ধরছে তাকে। গলার স্নায়ুতে চাপ দিতেই খুলে যাচ্ছে সেই প্যাঁচ।

চোখ বন্ধ করে নিজের সাড়া শরীরে সাপের স্পর্শ অনুভব করলো নিক্স। কোনো মানুষের স্পর্শে এমন অনুভূতি কখনোই হবে না। সাপটা যখন তাকে তিনটে প্যাঁচ দিয়ে ধরে চাপ দিলো তখন মনে হলো পুরো শরীরেই যেন কিলবিল করছে কিছু একটা।

আজ সকালে দ্বিতীয় বারের মতো পরম তৃপ্তি লাভ করলো নিক্স।

দেহ তত্ত্বে তথ্য লুকিয়ে থাকে না-কি দেহ তথ্যে তত্ত্ব লুকিয়ে থাকে তা বলা শক্ত। তবে জীবনের পূর্ণ আনন্দের সন্ধান করতে গেলে তত্ত্ব আর তথ্য দুইয়েরই দরকার হয়। এই হালকা চাঁদের আলোয় দেওয়ালের আড়ালে দুটি প্রাণী এক অপরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আবিষ্কার করলো অনেকক্ষণ ধরে। পার্থিব দেহ আর অপার্থিব প্রেম যেখানে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

ইনোন ডোরা অথবা ওরিয়নের চলে আসার ভয় পাচ্ছিলো, দ্রুতহাতে নিজের কাপড় পরে নিলো সে, ' তুমি এভাবে বসে আছো কেন? কাপড় পরে নাও।' গলায় এক রাশ লজ্জা মাখিয়ে কথাটা বললো ইনোন।

ইভানের পাথর তুল্য পেশীতে যেন কাপড় তুলে ধরার শক্তিও নেই, পা যেন অবশ হয়ে পরে আছে। ধীরে ধীরে নিজেকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনলো সে।

ইনোন জানে এবার যেতে হবে, 'আমার ইচ্ছে পূরণ করার জন্য ধন্যবাদ। জানি, আজ আমি দেবতাদের চোখে অপবিত্র হয়ে গেছি, কিন্তু এখন যদি আমাকে নরকেও যেতে হয় তাহলেও আমার কোনো আপত্তি নেই।' ইভানকে জড়িয়ে ধরলো সে। কপালে একটা গাঢ় চুম্বন একে দিলো। চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে, জলটা মোছার কোনো চেষ্টাই করলো না। ইভানকে হতভম্ব দাঁড় করিয়ে রেখে দৌড়ে গেল গোপন দরজার মুখের দিকে। প্রাণপণে চাচ্ছে যেন ইভান তাকে পেছন থেকে যেন না ডাকে। ইভান ডাকলে ঐ দরজা দিয়ে সে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারবে না।

ইভান এখনো ঘোরের মধ্যে আছে। ইনোনকে নিয়ে ডোরা চলে যাবার পর ওরিয়ন এসে দাঁড়ালো তার কাছে, 'কোথায় চলে গিয়েছিলে তোমরা? আমরা অনেকক্ষণ তোমাদের দেখতে পেলাম না।'

ইভানের সম্বিত ফিরে এসেছে। তার চোখ খুঁজছে ইনোনকে, কিন্তু সেখানে কেউই নেই। ওরিয়নের কথা তার কানে ঢুকেছে, কিন্তু এর জবাব কী দেবে? সে যে কোথায় ছিল এই কথার জবাব তো তার কাছেও নেই।

ওরা বেরিয়ে এলো সেই ঘর থেকে। পরদিন সকাল পর্যন্ত ইভানের বুদ্ধি ফিরলো না। কিছু খেলোও না সে। সকালে হেলটেরা রান্না করে দিয়ে গেছে। সেই সাথে জানিয়ে দিয়েছে, ঘরে এখন আর কিছুই নেই। নগর থেকে যা দিয়ে দিয়েছিল সেসব প্রায় শেষের পথে। খাবার বাইরে থেকে আনতে হবে।

এতদিন খাবারের ঝামেলা করতে হয়নি ওদের। খেতে কষ্ট হলেও, তেমন কোনো উপাদেয় খাদ্য না থাকলেও শিবিরে শিক্ষকেরাই খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এবার নিজেদের ব্যবস্থা করতে হবে।

রুটির টুকরায় একটা কামড় দিলো ওরিয়ন, রুটির দিকে তাকাচ্ছে ভয়ে ভয়ে, এই বেলা শেষ হয়ে গেলে আবার জোগাড় হবে তো, 'ইভান, তুমি যে বলেছিলে দুটো ঘরই বিক্রি করে দেবে সেটার তো একটা ব্যবস্থা করা উচিত। ক্রেতা খুঁজতে হবে। এই নগরে থাকার কোনো কারণই এখন আর আমার নেই। তোমার যে কারণ ছিল তা তো ফুরিয়েছে।'

ইভান সেই কথা মানতে নারাজ, রুটির গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে মৃদু গলায় বলল, 'পরিকল্পনায় সামান্য পরিবর্তন এনেছি। আমার পক্ষে এই নগর ছেড়ে চলে যাওয়া এখন আর সম্ভব নয়। এই নগরের বাইরে আমি হয়তো সবকিছুই পেতে পারি। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু এই নগরের ভেতরেই আছে।'

'তুমি কীসের কথা বলছ তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু কালই তো তোমার মুখে অন্য কথা শুনেছিলাম। কালই তো বলছিলে, তুমি এই নগরে থাকলে ইনোনের জন্য সবদিক থেকেই খারাপ হবে। তোমাদের দুজনের জন্যই সবচেয়ে ভালো হচ্ছে তোমার নগর ত্যাগ করা। একদিনের মধ্যে কী এমন হলো?'

কী হয়েছে সেটা কোনোমতেই ওরিয়নকে বলা চলে না, 'হয়েছে কিছু একটা। যা আমার ভেতর পুরো নাড়িয়ে দিয়েছে। কাল রাতে আমার কোনো কিছু বোঝার ক্ষমতা না থাকলেও একটা কথা বেশ বুঝেছি, আমাকে ছাড়া ইনোন কিছুতেই ভালো থাকতে পারবে না। আমি ওর যেসব সুখের কথা চিন্তা করে কাল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমাদের ভালোবাসার কাছে সেসব সুখ তুচ্ছ। তাই এখন ঘর বিক্রি করার চিন্তা বাদ।'

ওরিয়ন সিদ্ধান্তের বদল হতে যে অথৈ জলে পড়লো, 'তাহলে এখন মুদ্রা আসবে কোত্থেকে? দাসেরা কী বলে গেছে তা তো শুনতেই পেয়েছ। দুপুর থেকে ঘরে আর খাবার মতো কিছু নেই। না খেয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এখানে তো আর শিবিরের লোক এসে খাবার দিয়ে যাবে না।'

এটা অবশ্যই চিন্তার ব্যাপার, সরল চিন্তাই করলো ইভান, 'আর লোকে যেভাবে খাবার জোগাড় করে, মুদ্রা রোজগার করে সেভাবেই করবো আমরা।'

'আর লোকে কীভাবে করে?'

ইভান চাপড় দিলো ওরিয়নের পিঠে, 'কেমন করে আবার, কাজ করে।'

'আমরা তো যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো কাজ জানি না। কে দেবে আমাদের কাজ? আর এখন আমাদের সুনাম তো পুরো নগরেই ছড়িয়ে পড়েছে।'

'আমরা সব কাজই করতে পারবো। মনে রেখো, যে শস্ত্র চালাতে জানে সে আসলে সবকিছুই চালাতে জানে। তবে হ্যাঁ, সুনামের কথাটা যে বললে তা নিয়ে চিন্তা করার ব্যাপার আছে। সেটা এড়িয়ে যাওয়া একটু কষ্টের হবে।'

'কিন্তু এড়িয়ে যাবার তো একটা উপায় বের করতে হবে। তুমি একটু ভাবো। দেখবে রাস্তা পেয়ে গেছো।'

ঘরে থাকা রুটির শেষ টুকরোটা মুখে পুরে দিলো ইভান, 'সবসময় এ ভাবাভাবির ভেতরে আমি নেই। এত ভাবলে সঠিক সময়ে মাথা কাজ করতে চাইবে না। বসে পড়বে। চলো, আমরা কাজ খুঁজতে বেরিয়ে যাই। আমাদের সুনাম যতই ছড়িয়ে যাক, আমরা যে স্বয়ং ক্রিস্টেয়ারের সেনা, তাদের শিক্ষকদের দ্বারা প্রশিক্ষিত সেটা তো আর মিথ্যে নয়। দেখাই যাক না, কপালে কী আছে।'

দ্বিমত করলো না ওরিয়ন। এতক্ষণে একটা করার মতো কাজ পাওয়া গেছে। দুজনে যা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো পোশাক পরে নিয়ে রওনা দিলো নগরের মধ্যভাগের দিকে।

কাজ খুঁজতে হলে যেতে হয় সরাইখানায়। নগরের সবচেয়ে বড়ো সরাইখানার পানশালায় গিয়ে প্রবেশ করলো দুজনে। সেদিনের অনুষ্ঠানের পর বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গেছে। লোকের মন থেকে ওদের দুজনের স্মৃতি একটু হালকা হয়ে গেছে কিন্তু পুরোপুরি মুছে যায়নি। সরাইখানার ভেতরে ওদের দুজনকে দেখে সবাই একটু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। কারো কারো আলোচনাও একটু বিরতি পেলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি আবার ফিরে গেল আগের অবস্থায়। এই সমাজে তৃতীয় শ্রেণির অভিজাত ভালো পরিমাণেই আছে।

ইভান আর ওরিয়ন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। গিয়ে বসলো এক কোণের একটা টেবিলে। সবাই যে যার মতো কথা বলছে। চারিদিক যেন গমগম করছে। এতদিন এসব জায়গায় এলে ছদ্মবেশে আসা লাগতো তাদের। আজ এসেছে নিজেদের পরিচয়ে।

পানশালার লোক এগিয়ে এলো ওদের দিকে, 'কিছু লাগবে?'

ইভান চকিতে উত্তর দিলো, 'সেই কিছুর বিনিময়ে যদি মুদ্রা দিতে হয় তাহলে লাগবে না। অবশ্য যদি মুদ্রা পরে দেবার শর্তে দিতে চাও তাহলে বলবো, দুই পাত্র ভালো মদ নিয়ে এসো।'

পানশালার লোকটা ওদেরকে চিনতে পেরেছে। এই জায়গা ভবঘুরেদের আখড়া। এরাও বলতে গেলে সেই দলেরই অংশ। আর এসব ভবঘুরেদের ব্যবস্থা আছে এখানে। একটা মাটির তৈরি পাত্র নিয়ে এলো সে, বাড়িয়ে দিলো দুজনের দিকে, 'মুদ্রা ছাড়া তো উৎকৃষ্ট মদ দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে এটা পান করে দেখতে পারো। এটা বিনা মূল্যেই পাওয়া যাবে। আগেই বলে রাখছি, খেতে জঘন্য, কিন্তু কথা দিচ্ছি, নেশা অবশ্যই হবে।'

লোকটা চলে যেতেই পাত্রের দিকে তাকালো ইভান আর ওরিয়ন। পাত্রের বাইরে ময়লার স্তর পড়ে গেছে। ভেতরের পানীয় থেকে একটা উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। কোনোভাবেই এই পানীয় মুখে দেবার মতো না। পাত্রটা টেবিল থেকে সরিয়ে দিতে পারলে বাঁচা যায়।

নিজের মনোযোগ পাত্র থেকে সরিয়ে লোকজনের ওপর নিয়ে এলো ইভান। সঠিক লোকের সন্ধান করতে লাগলো মনে মনে। এমন লোক যে ওপরের থেকে ভেতরের দিকে নজর দিতে জানে বেশি।

সেরকম একজনকে পেয়েও গেল। একজন বুড়ো গোছের লোক একটু দূরের একটা টেবিলে বসে পানাহার করছে। লোকটা অন্য সবার মতো গল্পে মত্ত নয়। তার মানে এই লোকের কাছে খবর পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ওরিয়নকে ইশারা করে টেবিল থেকে উঠে এলো ইভান। লোকটার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো, 'আশা করি মহাশয় এখানে বসলে আপত্তি করবেন না।'

একবার ওদের দিকে তাকিয়েই আবার নিজের খাবারে মন দিলো লোকটা। এক দফা শেষ করে বলল, 'আপনাদেরকে আমি চিনি। ভাগ্যের বড়ো ধরণের ধাক্কাই আপনারা খেয়েছেন। স্পার্টায় থাকা আপনাদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে গেল।'

যাক, একজনকে তো অন্তত পাওয়া গেল, যে ওদের প্রতি সহানুভূতিও লালন করছে। ইভান বেশ নরম সুরে বলল, 'আমাদের পরিচয় যখন জানেন, তখন তো এও জানেন, আমরা এখন কী অবস্থায় আছি। যে খাবার রেশন আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তা শেষ হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি। তৃতীয় শ্রেণির অভিজাতদের পক্ষে নগরের রেশন দিয়ে মাসকাবার করা সম্ভব না।'

'তাই আপনার কাছে এসেছি। এখানে সবাইকে দেখে একমাত্র আপনাকেই বিবেচক মনে হয়েছে। আমাদের দুজনের একটা কাজের খুব দরকার।'

'তাও জানি। বেশির ভাগ তৃতীয় শ্রেণির অভিজাত হয় নিজের ঘর বিক্রি করে দিয়ে ব্যবসা করে, নয়তো অন্য কোনো দ্বিতীয় অথবা প্রথম শ্রেণির অভিজাতের হয়ে কাজ করে। আমি এখানে কী করতে পারি?'

'আপনি আমাদের জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। আমাদের যোগ্যতা নিয়ে নিশ্চয়ই কোনো প্রশ্ন আপনার মনে নেই।'

'না, তা নেই। কিন্তু আমি তো আর অভিজাত কেউ নই। আমি নিতান্ত সাধারণ নাগরিক, তবে স্বাধীন। আমার কাছে তো কোনো কাজ নেই।'

'তাহলে অন্তত আপনি এটা তো নিশ্চয়ই বলতে পারবেন কোথায় গেলে আমাদের কাজের ব্যবস্থা হতে পারে?'

লোকটা একটু ভেবে নিলো, 'হ্যাঁ, তা হয়তো বলতে পারি। নগরের পুবের এক দ্বিতীয় শ্রেণির অভিজাত ইদানীং ব্যবসায় মুদ্রা বিনিয়োগ করেছেন। শুনেছি তিনি ব্যবসার মালামাল বন্দর থেকে নগরে নিয়ে আসার জন্য রক্ষীদল নিয়োগ দিতে চাচ্ছেন। সেই পথে তো আবার এখন ডাকাতের অভাব নেই। সেখানে গিয়ে দেখতে পারেন। আপনাদের কাজ হলেও হয়ে যেতে পারে।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

লোকটার কাছ থেকে ঐ অভিজাতের বাড়ির ঠিকানা জেনে নিলো ইভান। তারপর দুজনে মিলে রওনা দিলো সেদিকে। নগরের পুবে বেশ মনোরম জায়গায় তার বাড়ি। বাড়ির সদর দরজায় প্রহরী ওদের পথ আটকালো, 'কার কাছে যাবে তোমরা?'

ওরিয়ন অপমানটা গায়ে একটু মাখলো, 'আমরা অভিজাত। এভাবে কথা বলার সাহস কোথায় পেলে তুমি?'

'আরে তোমরা কী অভিজাত তা আমার জানা আছে। পুরো নগরীই জানে তোমাদের কথা। তোমাদের আর সাধারণ প্রজার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এখন যা জিজ্ঞেস করেছি, জবাব দাও।'

ইভান অপমানিত বোধ করলেও অনুভূতি বের করলো না, 'তোমার মালিক কি ঘরে আছেন? আমরা ওনার সাথেই দেখা করতে এসেছি। ওনার রক্ষী দলে সৈনিকের কাজের জন্য।'

প্রহরী দরজা খুলে দিলো না, 'ঠিক আছে। তোমরা এই বাইরের ঘরে বসো। মালিকের সাথে কথা বলে আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাবো।'

বাইরের ঘরের মলিন আসনে বসে নিজেদের চাকরির সম্ভাবনার কথা ভাবতে লাগলো দুজনে। তবে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটু পরেই ওদের ডাক এলো।

তৃতীয় শ্রেণির অভিজাতরা যখন দ্বিতীয় শ্রেণির অভিজাতের সামনে যাবে তখন নিচু আসনে বসাই নিয়ম। সেই নিয়ম মেনেই বসলো ওরা।

অভিজাত অভিজাতের মতোই বসে ছিলেন, ভারিক্কি চাল তার, 'শুনলাম, তোমরা না-কি এখানে কাজ খুঁজতে এসেছ। ভালো করেছ। তৃতীয় শ্রেণির অভিজাতরা তো আর বাবুগিরি দেখিয়ে চলতে পারে না। আমার কাছে কাজ আছে। তবে আগেই বলে রাখছি, অঢেল মুদ্রা পাবে সেটা মনে করো না। তোমরা ভাড়াটে হিসেবে কাজ করতে পারবে। প্রতি বার আমার মাল নিরাপদে পৌঁছে দিতে পারলেই কিছু বখরা জুটবে তোমাদের। কাজ আছে, মুদ্রা আছে, কাজ নেই, মুদ্রা নেই।'

ইভান মাথা নাড়লো, 'আপনি যেমন বলবেন। আমরা এই কাজ করতে রাজি। আপনি যদি আরেকটু বুঝিয়ে বলতেন কাজটার ব্যাপারে তাহলে সুবিধা হতো।'

'হ্যাঁ, তা তো বলতেই হবে। শুনেই তো এসেছ, আমি পুবের সাথে নানা জিনিসের ব্যবসা করি। জাহাজে আগে থেকেই বলা থাকে, জাহাজ ভিড়লে তারা আমার লোকের হাতে মালামাল দিয়ে দেয়। আমার প্রতিনিধি হবে তোমরা। বুঝতে পেরেছ?'

ইভান আরও কিছু হয়তো জিজ্ঞেস করতো, কিন্তু তখনই আবার প্রহরী ভেতরে ঢুকলো, 'মহাশয়, ওনারা চলে এসেছেন।'

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যেন অভিজাত, 'কী বলছো! এত তাড়াতাড়ি। তাড়াতাড়ি যাও, আমি এখনই আসছি।'

অভিজাত তাড়াতাড়ি নিজের পোশাকের ওপর আরেকটা জমকালো পোশাক জড়িয়ে নিলেন। একটু পরেই অভ্যর্থনা করে অথিতিদের ভেতরে নিয়ে এলেন। মহামান্য অথিতিদের দেখে ইভান আর ওরিয়নের ইচ্ছে করলো মাটির সাথে মিশে যেতে।

ভেতরে ঢুকেছে নিকোলাস আর মরিস। তারা এখন প্রথম শ্রেণির অভিজাত, আর নিকোলাস তো মহা অভিজাতই হয়ে গেছে। তাদের আপ্যায়ন হলো দেখার মতো।

সর্বোচ্চ আসনে বসলো নিকোলাস। ভেতরে ঢুকেই তার চোখ পড়েছে ওরিয়ন আর ইভানের ওপর। তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে, 'এই দুজন আপনার বাড়িতে কী করছে?'

'ওরা কাজের খোঁজে এসেছে। আপনি এখনই চলে আসবেন তা আমি জানতাম না, তাহলে ওদেরকে এখানে বসাতাম না। শুধু শুধু আপনাকে বিব্রত অবস্থায় পড়তে হলো। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'না, না, আপনি ক্ষমা চাইবেন কেন? ঠিক আছে।'

'আমাকে একটু আজ্ঞা করুন। ভেতরে যেতে হবে। আপনার কিছু লাগলে সাথে সাথে বলবেন। এই প্রাসাদের সব দাস আপনার আদেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত।'

বাড়ির মালিক ভেতরে চলে গেলেন। ইভান আর ওরিয়ন আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলো। নিকোলাস মুখে টিপ্পনীর হাসি এনে বলল, 'তোমরা তাহলে এখানে এসেছ কাজ খুঁজতে। আমার প্রাসাদে গেলেও পারতে। সহজেই তোমাদের জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম। জানোই তো, আমার প্রাসাদ এখন নতুন করে গুছিয়ে নিচ্ছি। কত কাজের লোক দরকার আমাদের।'

টিপ্পনীতে যোগ দিলো মরিস, 'হ্যাঁ, ওদেরকে দিয়ে আস্তাবল পরিষ্কার আর ঘোড়া সামলানোর কাজটা ভালোভাবেই চলে যেতো।'

ইভানের ধৈর্য একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। ওরিয়নের মাথায়ও আগুন জ্বলছে, 'আমরা তো তোমাদের কাছে কাজ খুঁজতে যাইনি। তাহলে আর ওসব কেন বলছো?'

নিকোলাস উঠে দাঁড়ালো, 'কাজ তোমাদের খুঁজতে যেতে হবে না। এখনই আমি তোমাদের কাজ দিচ্ছি। দুজনে দুটো মুদ্রা পাবে। দেখতেই তো পাচ্ছো, এখানে আসার পথের রাস্তায় কত ধুলো। রথ থেকে নেমে বাকিটা হেঁটে আসার

সময় আমাদের জুতোতে ধুলো লেগে গিয়েছে। তোমরা এখন আমাদের জুতোর ধুলোটা পরিষ্কার করে দেবে। ইভান করবে আমার জুতো, আর ওরিয়ন, তুমি করবে মরিসের। দুটো মুদ্রা পেয়ে যাবে সাথে সাথে।'

ইভান চোখ তুলল, রক্তে ভরে গেছে তার দুই চোখের সাদা অংশ। নিকোলাসের ভেতরটা যেন কেউ নাড়িয়ে দিয়েছে। তার মনে পড়ে গেল ইভানকে। সে কী করতে পারে। তবে এখন আর সেসবে কোনো লাভ নেই। সে এখন মহা অভিজাত। তার ক্ষমতা এই স্পার্টায় সীমাহীন।

মরিস এত কিছু বুঝতে পারছে না। সে হাঁক দিয়ে উঠলো, 'কই, তোমরা দুজনে এখনো কাজ শুরুর করছো না কেন? না-কি চাবুকের বাড়ি খাবার শখ হয়েছে?'

ওরিয়ন এবার জোরালো গলায় হুমকি দিয়ে উঠলো, 'আর একবার যদি আমাদের অপমান করার চেষ্টা করো, তাহলে কিন্তু পরিণতির জন্য পস্তাতে হবে।'

তখনই বাড়ির মালিক এসে ঢুকলেন ঘরে। পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে এটা বুঝতে পারলেন, 'তোমার তো সাহস কম নয়। এটা তুমি কী বললে। এখনই হাঁটু গেঁড়ে বসো। নইলে এখনই সমুচিত শাস্তি পাবে।'

হাঁটু গেঁড়ে বসার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না ওরিয়নের মধ্যে। অভিজাতের ইশারা পেয়ে এক সৈনিক এসে ঘাড়ে হাত দিলো ওরিয়নের। তাকে চেপে ধরে বসানোর চেষ্টা করলো।

কিন্তু, ওরিয়নের শক্তির সাথে পারবে কেন? ওরিয়ন এক ঝটকা দিতেই প্রহরী ছিটকে পড়লো। মরিস কোমর থেকে খুলে নিলো তলোয়ার। তার চোখে খুনে দৃষ্টি। এই দৃষ্টি চেনে ইভান, বেশ ভালো করেই চেনে। ওরিয়ন নিরস্ত্র, তার ওপর পেছন থেকে হামলা করা হচ্ছে, কোনো সুযোগই পাবে না সে।

ভাবার সময়ই পেলো না ইভান, শরীর আপনাতেই নড়ে উঠলো। বিদ্যুৎ হয়ে উঠলো তার হাত, এক ঝটকায় মরিসের হাত আটকে তাকে ছিটকে ফেলে দিলো। দেখা গেল মরিস মাটিতে পড়ে আছে, আর তার হাতের তলোয়ার এখন শোভা পাচ্ছে ইভানের হাতে। সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে ইভান, তার যোদ্ধা সত্ত্বা পুরোপুরি জেগে উঠেছে।

যেই সেনাকে ছিটকে ফেলে দেওয়া হয়েছে সে ততক্ষণে নিজের অস্ত্র দিয়ে ওরিয়নকে আঘাত করেছে। কিন্তু অস্ত্র ওরিয়নের শরীর ছুঁয়ে দেবার আগেই ইভানের তলোয়ার সৈনিকের গলা ছুঁয়ে গেল। ওরিয়ন ততক্ষণে নিহত সৈনিকের অস্ত্র তুলে নিয়েছে। দেখতে দেখতে আরও দুটো সৈনিকের দেহ মাটিতে পড়লো। আর কোন সৈনিক ওদের দিকে এগোতে সাহস পাচ্ছে না।

সৈনিকদের ভয় পেতে দেখে আরেক তলোয়ার নিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে এলো মরিস। আঘাতটা এড়িয়ে গেল ইভান, সেই সাথে মরিসের বুকে বেশ গভীর একটা

ক্ষত সৃষ্টি করলো ইভানের তলোয়ার। আর্তনাদ করে চিত হয়ে পড়লো মরিস। তড়পাতে লাগলো প্রচণ্ড ব্যথায়।

চিৎকার করে উঠলো নিকোলাস, 'কেউ এগোবে না।' ইভানের উদ্দেশ্যে এবার বলল, 'তুমি আত্মসমর্পণ করো। যা হবার হয়ে গেছে। একজন প্রথম শ্রেণির অভিজাতকে তুমি আহত করেছ। তিনজন সৈন্য তোমরা হত্যা করেছ। এর পরিণতি জানো তো?'

ইভানের স্বর বজ্রের মতো কঠোর, বরফের মতো শীতল, 'আমি পরিণতি জানি। কিন্তু তুমি তো আমার সামর্থ্যের কথা জানো। আমাদের পরিণতি তো পরে দেখা যাবে। আমার পদ ছোটো হয়ে গেছে তা ঠিক, কিন্তু তুমি কি ভাবছ সেই সাথে আমাদের ক্ষমতাও চলে গেছে? আমি দেবতাদের নামে শপথ করে বলছি, আমাদের ধরার চেষ্টা করলে এই ঘরের সব সৈনিক মরবে, তুমিও আস্ত থাকবে না।'

নিকোলাস ইভানকে ভালো করেই চেনে। এই সেনাদের মেরে তাকে মারতে তার বেশিক্ষণ লাগবে না। তার ওপর সাথে থাকা ওরিয়নও মারাত্মক যোদ্ধা। ওদিকে মরিসের রক্ত পড়াও বন্ধ করতে হবে। সে কূট সিদ্ধান্ত নিলো, 'সৈনিকেরা সবাই সরে দাঁড়াও। ওদেরকে কেউ আক্রমণ করবে না।'

সৈনিকেরা এই আদেশ পালন করতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ইভান তীব্র চোখে একবার তাকালো নিকোলাসের দিকে, তারপর ওরিয়নকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রাস্তা দিয়ে গেল না সে। ঝোপঝাড় আর গাছের আড়ালে অদৃশ্য হবার বিশেষ প্রশিক্ষণ তারা আগেই পেয়েছে।

ওদিকে মরিসের শুশ্রূষা শুরু হয়ে গেছে। বাড়ির মালিক বললেন, 'দুজনকে এভাবে চলে যেতে দিলেন। এই কজন সৈন্য মিলে ওদেরকে কাবু করতে পারতো না?'

'না, পারতো না। আমি হয়তো পারতাম, কিন্তু আমি তো যুদ্ধবেশে নেই। তাই এটাই এখন সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

'কিন্তু ওরা দুজন তো পালিয়ে গেল।'

মরিসের ক্ষত একটু পরীক্ষা করলো নিকোলাস, সঙ্গীর আর্তনাদ এখন একটু কমে এসেছে। একটা ধবধবে কাপড়ে মুছে নিলো রক্তটা, 'পালিয়ে আর যাবে কোথায়? ওদেরকে নগরের মাঝখানে ফাঁসিতে ঝোলাবো আমি।'

নিজের কাজ গত রাতে রাহু ভালো করে করেছে। তবে মাঝে মাঝে কাজের সম্পূ সফলতা মানুষের হাতে থাকে না। নিজের ভাগের কাজ পুরো করেও তখন হয় হয় অসফল। আর সেই অসফলতার ভাবনাতেই পরের দিন শুরু হলো তার সকালে ডেকে কাজ করতে করতে শরিফ আর তাজিমের সামনে পড়েছিল সে কিন্তু দুজনেই চমৎকার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। রাহুর দিকে তারা একবার ভাল করে তাকায়ওনি। রাহুও ওদের দিকে তাকায়নি বললেই চলে।

এখন পুরো ব্যাপারটা এই দুজনের ওপর নির্ভর করছে। অনেক কিছুই হতে পারে। হতে পারে এরা ভাববে, এখন বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। আর কিছুক্ষ পরেই ফিরে যাবো নিজের ঘরের আশ্রয়ে। কে কাকে মেরেছে, কার ধনরত্ন কার কাছে আছে এসব দিয়ে আমাদের কী। ভুলে যাও। কাউকে কিছু না বলে কাল রাতের পুরো ঘটনা মাতালের প্রলাপ বলেও উড়িয়ে দিত পারে। সেক্ষেত্রে রাহু পরিকল্পনা একেবারে মাঠে মারা যাবে। নতুন করে আরও দুজন খুঁজে বের কর শক্ত। ঝুঁকিও তো কম নেই। কে যে আবার মাজিদের একেবারে আপন লোক সে তো আর সে জানে না।

সে না জানলেও ঐ দুজন অবশ্যই জানে। তাজিম আর শরিফ। সারাদিন কেটে গেল নানা রকমের চিন্তায়। কি জানি, ঐ দুজন কী করছে? মাজিদের কা খবর পৌঁছে যাবারও সম্ভাবনা আছে। সেই ঝুঁকিও সে নিয়েছে, তবে তার পরিম অনেক কম। চিন্তা আরও আছে। এই জাহাজে মদের বোতলের সংখ্যা কম এসেছে। হাতে গোণা কয়ে বোতলই কালকে দেখেছে সে। যদি ভাঁড়ারের লোক দুটো মদের বোতল চুরি হওয়া ধরতে পারে তাহলে অবশ্যই জাহাজে হাঙ্গা হবে। এই মুহূর্তে রাহু কোনো ধরনের হাঙ্গামা চাচ্ছে না। পরিস্থিতি নিজে অনুকূলে সাজিয়ে নেবার জন্য পরিস্থিতি শান্ত থাকা অনেক জরুরি।

সারাদিন দাঁড় বেয়েছে সবাই পালা করে। করেছে অন্য কাজও। এখন তা রাতের বেলা অতো কাজ নেই। আফ্রিকার শিং আসতে খুব বেশি দেরি নেই। রা নিজের কামরায় এসে ঢুকেছে। সন্ধ্যা হতেই ক্লান্ত নাবিকেরা যার যার খাবার নি নিয়েছে। সেও নিয়ে এসেছে তার ভাগ। লোহিত সাগরে জাহাজ প্রবেশ করতে আর খুব বেশি দেরি হবে না, তা শরিফ আর তাজিমও জানে। অপেক্ষা করা লাগলো রাহু। অঙ্গদ খাঁচার মধ্যে ঘুমাচ্ছে।

অপেক্ষা খুব বেশি করতে হলো না। ওরা সন্ধ্যাতে আসবে না, তাতে নিশ্চি ছিল রাহু। রাত একটু বাড়তেই এলো দুজনে। চট করে ওদেরকে নিজের ঘ ঢুকিয়ে ফেললো রাহু।

শরিফের গলা একেবারে নেমে আছে, 'তোমার কালকের বলা কথা আমরা দুজনে অনেক আলোচনা করেছি। আমাদের অবশ্যই বাসিলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া উচিত। এত বড়ো অন্যায় করে কেউ পার পেয়ে যাবে, তা আমরা হতে দেবো না।'

রাহ্ মনে মনে হাসলও। খুব বাসিলের হয়ে প্রতিশোধ নিতে এসেছে। আসলে তো এসেছে নিজেদের আখের গোছাতে। রাহুর গলা ভয়ার্ত, নিচু, 'বাসিলের মৃত্যুর প্রতিশোধ অবশ্যই নিতে হবে। কিন্তু আমরা তিন জনে মিলে কী করবো? এই জাহাজের সবাই তো মাজিদের প্রতি অনুগত। সবাই তার কথায় উঠে আর বসে। কেউ তো আমাদের কথা বিশ্বাসই করবে না। আর বিশ্বাস করলেও কিছুতেই মাজিদের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। আমি কালকে নিজের মনের ব্যথা চেপে রাখতে না পেরে তোমাদের সাথে বলেছি। আমার কথায় তোমরা কিছু মনে কোরো না। সব ভুলে যাও। কিছুদিন পরেই তোমাদের ঘর চলে আসবে। এখন আর কিইবা করা যাবে।'

তাজিম এবার মাথ নাড়লো, 'না বাবা, এগিয়ে এসে মাঠে নেমে আবার আমাদেরকে নামিয়ে এখন তো তুমি আর পেছনে যেতে পারবে না। তোমাকে আমাদের সাথে থাকতে হবে। মাজিদকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবো আমরা।'

'কিন্তু কীভাবে? মাজিদের পক্ষেই আছে সবাই। আর মাজিদকে গুপ্তহত্যা করা সম্ভব না। সে তো সব সময় সুরক্ষা নিয়ে থাকে।'

'শোনো, এত বছর জাহাজে জাহাজে ঘুরছ, বলি বিদ্রোহ বলেও তো একটা ব্যাপার জাহাজে ঘটে তাই না?'

আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করলো রাহ্, 'তোমরা বিদ্রোহ করবে? বিদ্রোহ করার শাস্তি তো মৃত্যুদণ্ড। এটা থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই।'

'আরে রাখো। স্বর্ণ একবার হাতে পেয়ে গেলে বড়োলোক হয়ে যাবো। আর বড়োলোকদের জন্য ওসব বিচার হারাম হয়ে যায়।'

রাহ্ এবার যেন একটু আগ্রহ দেখালো, 'কিন্তু, এই বিদ্রোহ তোমরা দুজন কেমন করে করবে?'

'আমরা দুজনে করবো এটা তোমাকে কে বলেছে? দুজনে কি এতজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায়?'

'তাহলে' রাহ্ যেন কিছুই ধরতে পারছে না।

'আরে তো ভাবছো কেন? আমরা তো জানি কে মাজিদের জন্য জান দিতে পারে আবার কে সুযোগ পেলে মাজিদের জান নিয়েও নিতে পারে। এখন কেবল সঠিক লোকজন জায়গা মতো জড়ো করতে হবে।'

'আফ্রিকার শিং আসতে তো বেশি দেরি নেই। কবে জড়ো করবে। আহ, বাসিলের মতো ভালো লোকের খুনের যদি একটা বিচার চোখের সামনে দেখতে পেতাম।' রাহু আবার ফুঁপিয়ে ওঠে।

শরিফ রাহুকে সান্ত্বনা দেয়, 'আবার কান্না শুরু করলে কেন? আফ্রিকার শিং চলে আসছে সেটা আমরাও জানি। আমাদের হাতে সময় খুব বেশি নেই আজকেই দল সাজাবো। এরই মধ্যে সবার কাছে খবর চলে গেছে। আমরা বেছে বেছে লোক নিয়েছি। কেবল এখন সবাই এক জায়গায় হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া বাকি চলো।'

'কোথায়?' এবার আসলেই ঘাবড়ে গেছে রাহু। সবকিছু এত তাড়াতাড়ি হবে তা সে চিন্তাও করেনি।

'জাহাজের পেছনে ডেকের নিচের খোলে। সেখানেই আজকে আমরা সভা করবো। আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে। কিছু নাবিক হয়তো এখনো ঘুমায়নি চাঁদটা মাথার আরেকটু ওপরে উঠে এলেই রওনা দেবো আমরা।'

ঘরের ছাদের ভাঙা অংশ দিয়ে চাঁদের আলো আর অবস্থান দুটোই দেখা যাচ্ছে। সময় আসতে বেশি দেরি হলো না। আলোর মধ্যে অন্ধকারকে অনুসরণ করে ওরা চলে এলো গোপন সাক্ষাতের স্থানে। ছোটো একটা ঘর, তাতে গাদা গাদা মানুষ। মনে হচ্ছে জাহাজের সবাই এখানে এসে জুটেছে। সেই মালিক হতভাগ্য যাকে তার কর্মচারীরা পছন্দ করে না। সেই হিসেবে মাজিদ খুবই দুর্ভাগা মালিক।

শরিফ এরই মধ্যে নেতা বনে গেছে। নাবিকদের মনোভাব বোঝার এ স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতা তার আছে বলে তাজিম বাধা দেয়নি।

এতগুলো মানুষ এক জায়গায় আছে কিন্তু কোনো শব্দ হচ্ছে না। সবাই যেন নিঃশ্বাসও ফেলছে হিসেব করে। শরিফ সবার সামনে অবস্থান নিলো, 'আমরা সবাই জানি আমাদের জাহাজে খুব দুঃখজনক একটা ঘটনা ঘটে গেছে। আমাদের সাথের একজন মারা গেছে। আরও সঠিক করে বললে সে খুন হয়েছে।'

এই কথা সবাই জানে। পুরানো কাসুন্দি আবার ঘাঁটা হচ্ছে কেন? কেউ কেউ অস্থির হয়ে উঠেছে। তখনই শরিফ সামনের দিকে টান দিলো রাহুকে, 'এই লোকটাকে আমরা সবাই চিনি। এই লোক জানে কে খুন করেছে বাসিলকে।'

এবার উপস্থিত জনতা একটু নড়েচড়ে বসেছে। নতুন একটা তথ্য শোনা যাবে। শরিফ রাহুর দিকে তাকিয়ে দৃপ্ত গলায় বললো, 'এই লোক বাসিলকে একেবারে নিজের চোখের সামনে খুন হতে দেখেছে। আর কেউ নয়, মাজিদ আমাদের প্রধান নাবিক খুন করেছে বাসিলকে, একেবারে নিজের হাতে।'

এই গোপন সাক্ষাতে শব্দ করা যে অনেক বড়ো বিপদ ডেকে আনতে পারে তা যেন কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেল তারা। গুঞ্জন উঠতে গিয়েও উঠলো না, থামিয়ে দিয়েছে তাজিন, 'চুপ, আস্তে। ওদের দলের কেউ খোঁজ পেলে আর রক্ষা নাই।'

গুঞ্জন থেমে গেল। একজন ভরাট কিন্তু নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'প্রমাণ কী? এই ভিনদেশি লোকের কথা আমরা বিশ্বাস করবো কেন? মাজিদের ব্যাপারে তো সে মিথ্যেও বলতে পারে।'

রাহু বুঝতে পারে, এই কথা উত্তর তাকেই দিতে হবে। সে একটু সামনে এগিয়ে ভিড়ের মাঝে দাঁড়ায়, 'আমার এখানে মিথ্যে বলে কী লাভ হবে তা তো জানি না। আপনারা কেউ কি জানেন?'

প্রশ্নের জবাবে ছুটে আসে প্রশ্ন, 'কিন্তু বাসিলকে মেরে মাজিদেরই বা কী লাভ হবে? বাসিল তো মাজিদের বেশ অনুগত ছিল।'

শরিফের চোখ চকচক করে উঠলো, 'এখানেই তো আসল কথা। বাসিলের কাছে লুকানো স্বর্ণ, ধনরত্নের একটা মানচিত্র ছিল। সে চেয়েছিল আমাদের সবাইকে নিয়ে গিয়ে সেগুলো উদ্ধার করবে। আমরাও কিছু কিছু ভাগ পাবো। কিন্তু একা সেই ধনরত্ন ভোগ করার জন্যই বাসিলকে মেরে ফেলেছে মাজিদ। ওদের কথা রাহু শুনতে পেয়েছিল। স্পষ্ট।'

স্বর্ণের লোভ নাবিকদের মধ্যে শীতল বাতাস বইয়ে দিলো। স্বর্ণের খোঁজ পেলেই সারা জীবনের সব পরিশ্রম, দুঃখ, পরিবার ছেড়ে বিদেশে ঘোরা এসবের অন্ত হবে। নিজের জায়গায় রাজা হয়ে থাকা যাবে। রাহু মিথ্যে বলছে কি না, বাসিলের হত্যার প্রতিশোধ নেবে কীভাবে এসবের চিন্তা আর কারো মাথাতেই এলো না। সবার চোখেই শরিফের চোখের চকচকে অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে।

'সেই মানচিত্র এখন কোথায় আছে?' একজন ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে।

নিশ্চিত ভঙ্গিতে উত্তরটা বলে মাজিদ, 'কোথায় আর থাকবে, নিশ্চয়ই মাজিদের কাছে।'

'আহা, সেই মানচিত্র যদি একবার হাতে পাওয়া যেতো?' লোভ এবারে কল্পনায় আশ্রয় নিয়েছে।

সেই কল্পনাকে দৃঢ় সংকল্পে পরিণত করার চেষ্টা করলো শরিফ, 'সেই কারণেই আজকে আমরা এখানে এক সাথে হয়েছি। আমাদের সারা জীবনের সব কষ্ট মুছে যাবে ঐ গুপ্তধন পেলে। আর আমাদেরকে যা করতে হবে তা এই জাহাজ আফ্রিকার শিঙয়ে পৌঁছানোর আগেই করতে হবে।'

এবার সবার মধ্যেই চিন্তার ছায়া দেখা গেল। এতক্ষণ কেবল ছাড়া ছাড়া কথা হচ্ছিল। এবার আলাপ সরাসরি বিদ্রোহের দিকে যাচ্ছে। বিদ্রোহ হলেই হাতে রক্ত লাগাতে হবে। এখানে সফলতা-অসফলতার ব্যাপার আছে, নিজের প্রাণের ভয়

আছে, সমুদ্রের অভিশাপেরও ব্যাপার আছে। চট করে কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। চকচকে চোখ ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেললো।

একজন বলে বসলো, 'যে নাবিক প্রধান নাবিকের সাথে বিদ্রোহ করে তার ভাগ্যে আজীবনের দুর্দশা লেখা হয়ে যায়।'

শরিফ খেঁকিয়ে ওঠে, 'বলেছে তোমাকে। সমুদ্র যদি আসলেই অভিশাপ দিতো তাহলে সেই অভিশাপের বলি হতো ঐ মাজিদ। সে একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে। কই, সমুদ্র তো তাকে কিছুই বলেনি। আমরা আমাদের ভাইয়ের বিচার চাইলে সমুদ্র কী বলবে? তোমরা কি প্রতিশোধ চাও না?'

সবাই সাড়া দিলো। সবাই প্রতিশোধ চায়। সেই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সোনা যদি উপরি হিসেবে পাওয়া যায় তাহলে মন্দ হয় না।

এরপর আর কারো কোনো আপত্তি ধোপে টিকলো না। ওদের দলই ভারী। তবে মাজিদের পক্ষের লোকজনকে ছোটো করে দেখলে চলবে না। তাদেরকে সামলানোর পরিকল্পনা বানাতে হবে। এবার দলের সবার মাথাগুলো আরও কাছে চলে এলো। শরিফ আর তাজিম আগেই পরিকল্পনা সাজিয়ে রেখেছিল। এবার সবাইকে যার যার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হলো। পরশু দিন রাতের খাবারের পরে কাজটা করতে হবে।

পরের দিন সবার মধ্যে একটা চাপা উৎকণ্ঠা কাজ করছে। এই অবস্থাতে দিন কেটে গেল। বারুদে আগুন লাগার অপেক্ষা কেবল। তার পরের দিন সূ নিয়ম মতোই উঠলো। মাজিদ নাবিকদের আরও তাড়াতাড়ি কাজ করতে উৎসাহ দিলো। নাবিকেরা কাজ করলো তার কথা মতো।

তারপর সূর্যের অন্তর্ধান হলো। রাত নেমে এলো অভিশাপ নিয়ে। একজন নাবিকের হাতেই সব ভাঁড়ারের দায়িত্ব দেওয়া আছে। সেই একটু আগে সবার মধ্যে খাবার ভাগ করে দিয়েছিল। নিজের ভাগের খাবার শেষ করে হাত ধুতেই দেখতে পেলো দুজন নাবিক এগিয়ে আসছে তার দিকে। অবাক হয়ে গেল সে। এই সময়ে নাবিকদের ডেকের এই দিকে আসার কোনো প্রয়োজন নেই।

এগিয়ে গেল সে। এই জাহাজে সে ভাঁড়ারের দায়িত্বে থাকাতে একটা আলাদ প্রতিপত্তি নিয়ে চলাচল করে। কর্তৃত্বের সুর তার গলায়, 'তোমরা এখন এখানে কী করছো? যাও, নিজের ঘরে যাও। এখন আর ভাঁড়ার থেকে কিছুই দেওয়া হবে না।'

শরিফ কথার জবাবে কিছুই বললো না। শরীরের পেছনে লুকিয়ে রাখা হাতটা সামনে নিয়ে এলো সে। হাতে থাকা হাতুড়িটা দিয়ে মোক্ষম আঘাত করলো ভাঁড়ারের প্রহরীর মাথা লক্ষ্য করে। সেই সাথে তাজিম চেপে ধরলো প্রহরীর মুখ। টুঁ শব্দ না করে ডেকে পড়ে গেল প্রহরী। মারা গেছে নিশ্চিত। খুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

অন্য বিদ্রোহী নাবিকেরা লুকিয়ে ছিল আশেপাশেই। প্রথম পদক্ষেপ সফল হতেই তারা বেরিয়ে এলো। প্রহরীকে মারতেই হতো, অন্য ভাঁড়ারের মতো অস্ত্রের ভান্ডারও তার দায়িত্বে আছে। এবার সেই ঘরে ঢুকে পড়লো ওরা। যার যে অস্ত্র পছন্দ বেছে নিলো। এবার আসল কাজ শুরু হবে।

যাকে যেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, উদ্যত অস্ত্র হাতে সেদিকে রওনা দিলো তারা। একটু পরেই জাহাজের নানা জায়গা থেকে ভেসে এলো নানা রকমের ভোঁতা আওয়াজ। মাংসে ধাতুর বিঁধে যাবার সেই নৃশংস শব্দ। অন্য নাবিকদের এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। বেশির ভাগ নাবিক নিজের শেষ নিঃশ্বাসের শব্দ শোনার আগেই পরপারে পাড়ি দিলো। বাকিরাও জেগে উঠে দুই এক পলের বেশি সময় পেলো না।

রাহু সবদিকেই নজর রাখছে এক সাথে। তার একটা কাজ এখনো বাকি রয়ে গেছে। সেই কাজটা বেশ সাবধানে করতে হবে। নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে এখন আর বেশি বাকি নেই। হাতের থাকা অস্ত্রের হাতল শক্ত করে চেপে ধরে সে এগোলো মাজিদের ঘরের দিকে। ঘরের সামনে এসে স্পষ্ট গলায় ডাকলো, 'মাজিদ, উঠে পড়ো। একটা জরুরি কথা আছে।'

শরিফ আর তাজিম রাহুর দুই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের হাতেও শোভা পাচ্ছে ভয়ংকর রক্তমাখা দুই অস্ত্র। মাজিদ ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলল, 'কে এসেছ এত রাতে।' সামনে রাহুকে দেখতে পেলো সে, ' ওহ তুমি। এত রাতে কেন এসেছ?'

জবাবটা রাহু দিলো না। শরিফের হাতের এক জোরালো ধাক্কায় মাজিদ ঘরে থাকা নিজের বিছানায় গিয়ে পড়লো, শরিফ হুংকার ছাড়লো সেই সাথে, 'বাসিলকে কেন মেরেছিস বল হারামজাদা?'

প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না মাজিদ। সবে ঘুম থেকে উঠেছে সে। তবে এটা বুঝতে পারলো নিশ্চয়ই রাহু কিছু একটা করেছে। তোতলাতে লাগলো সে, 'কী বলছ তুমি? আমি মারিনি বাসিলকে। বাসিলকে মেরেছে ও।' মাজিদ আঙুল তুলল রাহুর দিকে।

রাহু এবার নিজের অস্ত্র নিয়ে সামনে এগিয়ে এলো, তার মধ্যে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই, 'পরম বিপদ উপস্থিত হলে মানুষ অনেক কথাই বলে। বাঁচতে চায়। কিন্তু আজ আর তোমার বাঁচার কোনো উপায় বেঁচে নেই মাজিদ। বাসিলকে তুমি আমার চোখের সামনে হত্যা করেছ। সেই বিচার আজকে হবে।'

শরিফ নিজের কাজে মন দিলো, বাসিলের প্রতিশোধ পরেও নেয়া যাবে, ' আগে বল, কোথায় রেখেছিস সেই মানচিত্র? স্বর্ণ কোথায় আছে?'

কথার মানে কিছুই বুঝতে পারছে না মাজিদ, কোনরকমে ভয়ার্ত স্বর বেরোলও তার গলা দিয়ে, 'তুমি কীসের কথা বলছো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি

না। তোমরা নিশ্চয়ই বিদ্রোহ করেছ। এটুকু বুঝতে পারছি এই লোকটা তোমাদের দিয়ে বিদ্রোহ করিয়েছে। আর...'

কথাটা শেষ করতে পারলো না সে। মাজিদের বুকে নিজের হাতের খ ফলা এক আঘাতে ঢুকিয়ে দিয়েছে রাহু। হায় হায় করে উঠলো শরিফ, 'এটা তু কী করলে, কথা ছিল ওকে মারার আগে আমরা মানচিত্র উদ্ধার করবো।'

রাহু আরেকটা আঘাত করলো মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য, ' সেই চিন্তা কো না। মানচিত্র নিশ্চয়ই সে এই ঘরেই রেখেছে। অন্য কোথাও রেখে তো শান্তি থাকতে পারতো না। এখানেই পাওয়া যাবে।'

'ঠিক বলেছ।' মানচিত্র খুঁজতে শুরু করলো শরিফ আর তাজিম। ঘরের স আসবাব তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলো তারা। বাইরে অপেক্ষায় আছে বাকি সবাই

রাহু যে সময়ের সন্ধান করছিল তা পাওয়া গেছে। তার দিকে এখন ক কারোই নজর নেই। অতি সন্তর্পণে নিজের হাত সাফাইয়ের খেলাটা দেখালো সে পোশাকের ভেতরে লুকিয়ে রাখা মানচিত্রটা হাতে নিয়ে এলো। তারপর মাজিদে পোশাক আর দেহ পরীক্ষা করার ভান করলো। একটু পরেই চিৎকার করে উঠ সে, 'পেয়েছি। এই যে।'

শরিফ আর তাজিম খোঁজা বন্ধ করে রাহুর হাত থেকে মানচিত্রটা নিল একটু ভয় পেলো রাহু। নিজের মানচিত্র সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ন মানচিত্র এঁকেছে সে। বাসিল ছিল দক্ষ নাবিক। সে মানচিত্র আঁকলে অনেক ভা হবার কথা। তবে কেউ কিছুই সন্দেহ করলো না। এসব গোপন মানচিত্র এ কাঁচা কাঁচা হাতেই আঁকা হয়। যাতে সহজে কেউ কিছু বুঝতে না পারে।

শরিফ মানচিত্র গুছিয়ে নিজের কাছে রাখে, 'খুঁজে বের করা কঠিন হবে অসম্ভব নয়। জায়গাটা আমি চিনি। ওদিকে আগেও একবার গিয়েছিলাম।'

সবাই শরিফকে এর মধ্যেই নেতা বলে মেনে নিয়েছে। উল্লাস ধ্বনি উঠে ওদের মধ্যে। রাহু একটু সরে এলো। ওর কাজ শেষ হয়েছে। মাজিদে পরিণতিতে একটা নিষ্ঠুর আনন্দ লাভ করছে সে। মাজিদ তার প্রাপ্য বু পেয়েছে।

বলতে গেলে, বাসিলের খুনের প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে। রাহুর হাতে মরলে মাজিদই যে বাসিলের আসল খুনি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রুদ্রদেব কিছুটা বিব্রত। সেই তিন হাজার বছর আগের পৃথিবী হলে কথা ছিল না, কিন্তু এই সময়ে সেই অস্ত্রগুলোর কথা কেউই জানে না। না, একটু ভুল হলো ভাবনায়। সবাইই জানে, কিন্তু সেসব অর্জন করার কৌশল এখন অজ্ঞাত। এগুলো গুরুমুখী বিদ্যা ছিল। আর সেই গুরুরা অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। তাই বলতে গেলে এই সময়ে ঐ জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী সেই। এখন অসিত জানতে পেরে গেছে সেই ক্ষমতার ব্যাপারে। সেদিন রাতেই অসিতের সাথে এই ব্যাপারে কথা হলো।

অসিত এখন আর মনের দিক দিয়ে বালক নেই। এই জগতের যে কোনো অপার্থিব ব্যাপার সামলে নেয়ার মতো ক্ষমতা তার হয়েছে। রুদ্রদেব যে স্বাভাবিক কেউ নয় এই ধারণা তার আগে থেকেই ছিল, 'আপনি কিন্তু আমাকে খোলাসা করে কিছুই বললেন না। আপনিই নিশ্চয়ই ঝড় আর জলের ঢেউ থামিয়েছেন। কিন্তু কীভাবে থামিয়েছেন সেটাই তো আমার মাথায় আসছে না।'

'তোমার সাথে তখন এই ব্যাপারে আলোচনা করা সম্ভব ছিল না। শেইরন চলে এসেছিল। কিন্তু, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই দেখেছ। আমিই শক্তি অস্ত্রের সাহায্যে ঐ ঝড় থামিয়েছি। ওরকম অস্ত্রেই থামিয়েছি ঢেউ। বাতাস আর ঢেউকে শান্ত করার অস্ত্র ছুঁড়েছিলাম ধনুক থেকে।'

অসিত বুঝতে পারে না, 'কিন্তু, সেটা কীভাবে সম্ভব। সামান্য একটা তীরের কি করে এতো শক্তি থাকতে পারে? এমন ঝড় মাত্র একটা তীরেই থেমে গেল?'

রুদ্রদেব কিছু বলে না। কেবল একটু হেসে মাথা নাড়ায়।

অসিতের জিজ্ঞাসা তখনো সম্পন্ন হয়নি, 'আর আপনার ভেতরে যদি এই ক্ষমতা থাকতোই তাহলে ঝড়ের সাথে আমরা এতক্ষণ যুদ্ধ করলাম কেন? আপনি তো প্রথমেই ঝড় থামিয়ে দিতে পারতেন।'

'তা পারতাম, কিন্তু নিজের ভেতরে কী শক্তি আছে তা নিয়ে আমি নিজেই নিশ্চিত ছিলাম না। তুমি তো জানোই, মানুষ বাইরে নিজের চোখে দেখতে পায়, তাই বাইরের সবকিছু তার পক্ষে বোঝা সহজ। কিন্তু ভেতরটা সে দেখতেও পায় না, সেখানে কী আছে তা বুঝতেও পারে না।'

'আচ্ছা। সেই কথা পরেও আলোচনা করা যাবে। কিন্তু, যুদ্ধবিদ্যার কোন জায়গায় এমন অস্ত্রের বর্ণনা আছে? আমি তো এমন কিছুর কথা কখনো শুনিনি।'

'শুনেছ অসিত, ভালো করেই শুনেছ। কেবল ধরতে পারছো না। ঐ যে বললাম, নিজের ভেতরে যা লুকিয়ে থাকে তা খুঁজে বের করাই সবচেয়ে শক্ত।'

হেয়ালিতে অসিতের মন ভরছে না, 'শুনেছি? কোথায় শুনেছি?'

'কেন, রামায়ণ, মহাভারত পড়োনি?'

'পড়েছি তো। রীতিমতো মারধোর করে পড়ানো হতো আমাদেরকে ছোটোবেলায়।'

'এজন্যই শিখতে পারোনি। মারধোর করে কি আর শেখানো যায়? বড়োজোর গেলানো যায়।'

'কী আছে রামায়ণ আর মহাভারতে?'

'অস্ত্রের কথা। নানা রকম অস্ত্র। সাধারণ অস্ত্রের সাথে সাথে দৈবিক অস্ত্রের কথাও ছিল।'

'হ্যাঁ, আরে ওসব তো জানি। কিন্তু ওসব তো রূপকথা। বাস্তবে তার কিছুই নেই।'

রুদ্রদেব ভাবতে লাগলো, এই কালের মানুষের কাছেই এখন সেসব রূপকথা। অথচ কত বছরই বা পেরিয়েছে। তিন হাজার বছর তো মহাকালের কাছে কিছুই না। সত্য থেকে দ্বাপরে এসব বিদ্যা লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রম করে গুরু শিষ্য পরম্পরায় বজায় ছিল। কিন্তু শুধু এই তিন হাজার বছরেই ভেঙ্গে গেল সব? কলির ক্ষমতা ভয়ানক হবে এটা সবাই জানতো, কিন্তু এতটা প্রভাব ফেলবে তা কেইবা ভাবতে পেরেছিল? এই কালে মানুষের মধ্য থেকে দেবত্ব হারিয়ে যাবে, সে নিজের জীবন আর তার যাপন সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারবে না।

রুদ্রদেবকে ভাবনায় ডুবে যেতে দেখে অসিত একটু অধৈর্য হয়ে উঠলো, 'মহাভারতের দৈবিক অস্ত্র নিয়ে কী যেন বলছিলেন?'

'মহাভারতে কয়েকটা বিশেষ অস্ত্রের কথা বলো তো?'

'আমার মনে আছে। সেগুলোর কথা শোনার সময় প্রাণ যেন শিউরে উঠতো। ব্রহ্মার ব্রহ্মাস্ত্র, নারায়ণী অস্ত্র, শিবের পাশুপাত তো ছিলই, এছাড়া আরও নানা অস্ত্র আছে।'

'হ্যাঁ, বায়ব্যাস্ত্র আছে, আগ্নেয়াস্ত্র আছে, ভার্গবাস্ত্র আছে। এখনো বলো, তোমার কি মনে হয় সেগুলো আসলে ছিল না? সেগুলো মানুষ কল্পনা দিয়ে তৈরি করেছে?'

'এতদিন তো আমার তাই মনে হতো। রাক্ষস যেমন রূপকথার গল্প তেমনি এগুলোও রূপকথার গল্প।'

'এতটা অবিশ্বাসী হওয়াও ভালো নয়। আমি যতটুকু জানি মহাভারতকে মানুষ এখনো ধর্মগ্রন্থ বলেই জানে। তাকে তুমি রূপকথা বলছো। আর যে রাক্ষস তোমার কাছে রূপকথা তাও সত্য। রাবণ তো রাক্ষসদের রাজা ছিল। এমনকি মহাভারতেও অলম্বুষ আর ঘটোৎকচ নামে দুই ভীষণ রাক্ষসের উল্লেখ আছে।'

' তারা তাহলে এখন কোথায়?'

'কে জানে। হয়তো আছে কোথাও। এই বিশাল পৃথিবীর কতটুকুই বা আমরা জানি।'

'আচ্ছা, রাক্ষসদের সন্ধান পরে করবো। আগে আপনি সেই সব দিব্য অস্ত্র নিয়ে বলুন। সেগুলোর সাথে আপনার ঝড় থামিয়ে দেওয়ার সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্ক আছে। আচ্ছা বলো তো, অস্ত্র মানে কী?'

'মানে আবার কী? যা দিয়ে যুদ্ধ করা হয় তাই অস্ত্র।'

'কিন্তু তুমি যদি অস্ত্র অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করো, তাহলে কি আর সেটা অস্ত্র থাকবে না। ধরো, তুমি একটা তলোয়ার দিয়ে আম কেটে খেলে, তখন কী হবে?'

হেসে উঠলো অসিত, 'তখন কী হবে সেটা বলতে পারবো না। কিন্তু তলোয়ার দিয়ে আম কাটার চিন্তাটা মাথায় আসতেই হাসি আটকে রাখা যাচ্ছে না।'

'আচ্ছা হেসে নাও। তারপরে প্রশ্নের উত্তর দাও। তখন তলোয়ারকে তুমি কী বলবে? এই প্রশ্নের জবাব কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

এবার অসিত একটু চিন্তায় পরে যায়, তলোয়ার দিয়ে আম কাটলে তো সেটা তলোয়ারই থাকবে, ' কী আবার বলবো। তলোয়ারই বলবো।'

'এইতো ঠিক কথা বললে। কিন্তু তুমি তো তখন আর তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করছো না। তলোয়ার তলোয়ারের জায়গাতেই আছে। শুধু কাজটা বদলে গেছে। পৃথিবীর সব অস্ত্রের কাহিনি একই রকম। অস্ত্র মানে শক্তি। তোমার অঙ্গের একটা ক্ষমতা বাড়ানোই অস্ত্রের কাজ। তুমি তো তোমার আঙ্গুল দিয়ে একটা গাছের কাণ্ডে ছিদ্র করতে পারবে না। এজন্যই তুমি বর্শা বানালে। অথবা অন্যান্য ধারালো কিছু বানালে। এই কথা দিব্য এবং পার্থিব সব অস্ত্রের বেলাতেই সত্য।'

'কিন্তু অতো শক্তি কি মানুষের অর্জন করা সম্ভব? অর্জুন যখন ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়লেন তখন দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা ছুঁড়লেন ব্রহ্মশির। এই দুই অস্ত্রের প্রভাবে নাকি পৃথিবী ধ্বংস হতে বসেছিল। এই শক্তি তারা কোথায় পেলো? তারা তো সাধারণ মানুষই ছিল।'

রুদ্রদেব একটু হাসলো, 'তাই না-কি। মহাভারতে কিন্তু আছে, অর্জুন স্বয়ং ইন্দ্রের পুত্র আর অশ্বত্থামা হচ্ছে শিবের অবতার। তবু এখানে তুমি ঠিকই বলেছ। তারা দেবতা থেকে এলেও জন্ম তাদের মনুষ্য যোনিতেই হয়েছিল। মানুষের ক্ষমতাকে এত ছোটো করে দেখছ কেন তুমি?'

'কারণ মানুষের সীমা আছে। আপনাকে বললেই তো আপনি একটা তাল গাছ তুলে ফেলতে পারবেন না।'

'গুরুর একটা কথা মাথায় ভালো করে ঢুকিয়ে নাও অসিত, মানুষের ক্ষমতার কোনো সীমা নেই। মানুষ স্বয়ং পরম ব্রহ্ম থেকে এসেছে। তার ভেতরে ব্রহ্মের ক্ষমতা বহন করার সামর্থ্য আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তুমি সেই সামর্থ্যের কতটুকু ব্যবহার করতে পারবে। সেটা তোমার প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করবে, কিন্তু মনে রেখো, সামর্থ্যের ব্যাপারে আজকের পর থেকে কখনো সন্দেহ করবে না। না নিজের, না অন্য কারো।'

কথাটা বুঝতে পেরেছে অসিত, কিন্তু মনের ভেতর থেকে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। একটা প্রশ্ন এসেছিল তার মাথার ভেতর, সেটাই করে বসলো, 'তাহলে আমি যদি কারো দিকে ব্রহ্মাস্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করি, আর সে যদি আমার দিকে সেই ব্রহ্মাস্ত্রের শক্তিই প্রয়োগ করে তাহলে কে জিতবে?'

অসিতের মুখে গুরুকে বিপদে ফেলে দেবার মুচকি হাসি, রুদ্রদেব একটু হাসলো, অসিত তো আর জানে না, সে কে। সে কার কাছ থেকে সব শক্তি আর অস্ত্রের বিদ্যা শিখেছে। প্রশ্নের উত্তরে একটা প্রশ্ন করলো সে, 'আচ্ছা, সেটা নিয়ে পরে চিন্তা কোরো। আগে উত্তর দাও, যদি একই রকম দুটো তলোয়ার দিয়ে তুমি আর আমি দুজনে দুজনের সাথে লড়াই করি, তাহলে কে জিতবে?'

'এটা আবার কেমন প্রশ্ন হলো। আমি তো আপনার কাছে দাঁড়াতেই পারবো না।'

'কিন্তু আমরা তো দুজনে একই তলোয়ার দিয়ে লড়েছি। তাহলে আমি কেন জিতে যাবো?'

আচমকা পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারলো অসিত, 'আপনি জিতে যাবেন কারণ আপনার সামর্থ্য আমার চেয়ে বেশি।'

'ঠিক বুঝেছ। যুদ্ধ কখনোই তলোয়ার জেতে না। যোদ্ধা জেতে। আর দুই ব্রহ্মাস্ত্র একে অপরের সাথে লাগলে যার অস্ত্রে জোর বেশি থাকবে সেই জিতবে।'

'তাহলে অর্জুন আর অশ্বত্থামার মধ্যে কে জিততো বলে মনে হয় আপনার?'

'সেটা জানার অনেক ইচ্ছে আমারও ছিল। কিন্তু সেটা তো আর হয়নি। ব্যাসদেব মাঝখানে চলে এসেছিলেন। নইলে সেদিন একটা কিছু হয়েই যেতো।'

'আচ্ছা। তার মানে সোজা কথা হচ্ছে আপনি ঝড় থামাতে সেই দিব্য অস্ত্রগুলোর একটা প্রয়োগ করেছিলেন, তাই না?'

'সহজ কথা বলে বিষয়টা নিয়ে ভাবলে তো হবে না অসিত। তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে। এক ধাপ এড়িয়ে এখানে আরেক ধাপে যাবার কোনো সুযোগ নেই। আমি শক্তি প্রয়োগ করেছিলাম। শক্তি শক্তিই। এর কোনো দিব্যতা অথবা পার্থিব গুণ নেই। মহামায়া, আদিশক্তি যেমন নির্গুণ তেমনি শক্তিও নির্গুণ। না একে সৃষ্টি করা যায়, না ধ্বংস করা যায়, শুধু প্রয়োগ করা যায়। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, আমি ঝড় থামাতে শক্তি প্রয়োগ করেছিলাম। যা তোমার কাছে মানে সাধারণ মানুষের জন্য অজ্ঞাত দিব্য শক্তি।'

'আপনি ঐ জ্ঞান কোত্থেকে পেলেন? এই যুগে তো সেসব আর কেউ জানে বলে শুনিনি। এখনকার যুদ্ধ আলাদা হয়ে গেছে।'

'বিদ্যা হয়তো পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। আসলে কোনোকিছুই পুরোপুরি হারিয়ে যায় না। বিশেষ করে জ্ঞান। কেবল লুকিয়ে থাকে। যে সন্ধান করতে পারে সে একসময় সেটা খুঁজে পায়। আঠারো দিনের মহাভারতের যুদ্ধে চল্লিশ লক্ষ মানুষ

মারা গিয়েছিল। কেউ পেয়েছিল শাস্তি, আবার কেউ দিয়েছিল বলিদান। তোমার কী মনে হয়? এত মানুষ মারতে পারার মতো অস্ত্র মানুষের হাতে এখন আছে? নারায়ণী অস্ত্র প্রয়োগ করার পর পঞ্চাশ সহস্র সেনা নিমেষে জ্বলে পুড়ে গিয়েছিল।'

' না, এখন অমন অস্ত্র তো কারো কাছে নেই।'

'কে জানে, হয়তো ভবিষ্যতে মানুষ আবার এই জ্ঞান পুনরুদ্ধার করতে পারবে। তখন হয়তো আবার তারা এক ইশারায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে ফেলতে পারবে।'

'সেটা না হলেই ভালো।' অসিত মন্তব্য করে। কিন্তু পরক্ষণেই যা না হলে ভালো, তা হবার ইচ্ছে জেগে ওঠে তার মনে, 'কিন্তু, আপনি তো এসব শক্তি অস্ত্র সম্পর্কে জানেন। এখন আপনার উচিত না, গুরু হিসেবে আমাকে এসব বিদ্যা প্রদান করা। আপনার গুরুও নিশ্চয়ই আপনাকে যত্ন করে এসব বিদ্যা শিখিয়েছিলেন।'

'একটু আগেই না বললে, এসব যাতে মানুষ আর না শিখতে পারে, তাতেই সবার মঙ্গল হবে। এখন তুমি নিজে শিখতে চাও কেন?'

'আরে খারাপ মানুষ ওসব শিখলে সমস্যা হবে। আমি তো ভালো মানুষ।'

'এই ব্যাপারে কি তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ। এখন আপনি আমাকে শেখানো শুরু করুন।'

'শোনো অসিত। শুধু দিলেই হয় না, গ্রহীতার নেবারও সামর্থ্য থাকতে হয়। ধনুকে তোমার হাত এখনো পাকেনি। এই অবস্থায় শক্তি অস্ত্রের সাধনা আর অনুশীলন করতে গেলে তুমি শক্তি সামলে রাখতে পারবে না। তোমার ধনুক থেকে বেরিয়ে পড়বে অনিয়ন্ত্রিত শক্তি, আর সামনে যা আছে ছাড়খার করে দেবে।'

'আচ্ছা, আমি না হয় পরে অনুশীলন করবো। কিন্তু কীভাবে শুরু করতে হবে, কীভাবে ঐ সামর্থ্য পর্যন্ত নিজেকে নিয়ে যেতে পারি সেটা তো বলবেন।'

'তুমি আমাকে দেখে ফেলেছ বলে আমি আটকে গেছি। তবে তোমাকে এই জ্ঞান দেবার ইচ্ছে আমার ছিল। ভালো করে ভেবে দেখো, আমি তোমাকে অনেক আগে একটা জিনিস শিখিয়েছিলাম। রং দিয়ে তোমার হাতের আঙুলে লিখে দিয়েছিলাম প্রকৃতির নানা উপাদানের নাম। একেক আঙুলে একেকটা। মনে আছে?'

'আছে। সেটা আবার ভোলা যায় না-কি। সাত দিন হাতের আঙুলে ঐ বিশ্রী কালি নিয়ে চলেছিলাম। রাতদিন শুধু ঐ পাঁচটা উপাদানের নামই আমার চোখের সামনে ছিল।'

'আচ্ছা, তাহলে বলো তো, দেখি মনে আছে কি না, কোন আঙুলে কোন উপাদানের নাম লিখেছিলাম?'

'বৃদ্ধাঙ্গুলে ছিল অগ্নি, তর্জনীতে বায়ু, মধ্যমায় ছিল আকাশ, অনামিকায় ভূমি আর কনিষ্ঠায় ছিল জল।'

'বাহ, ভালোই তো মনে আছে। আমি তো ভেবেছিলাম পুরোটাই খেয়ে ফেলেছ। এখানে এই পাঁচ উপাদানের কথা বলা হয়েছে। আর এই পাঁচ উপাদান হচ্ছে আমাদের দেহ গঠনের প্রধান পাঁচ উপাদান, এক সাথে বললে পঞ্চভূত।

এখন আমি যা বলছি তা মনে ভালো করে ঢুকিয়ে নাও। এই পাঁচ উপাদান দিয়ে আমাদের দেহ গঠিত। এবং দিব্য অস্ত্রের প্রথম ব্যবহার শুরু হয় এই পাঁচ অস্ত্র দিয়েই। ভালো করে খেয়াল করো? এই অগ্নি দিয়েই যোদ্ধা আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করে। বাতাস দিয়ে ছোঁড়া হয় বায়ব্যাস্ত্র। জল দিয়ে বরুনাস্ত্র। এভাবে পৃথিবীর ভূমি আর আকাশকেও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। এখন বলো তো, যোদ্ধারা দিব্য অস্ত্রের বিদ্যা এই অস্ত্রগুলো দিয়েই শুরু করে কেন?'

অসিত তন্ময় হয়ে গেছ শুনতে শুনতে, 'জানি না। কেন এগুলো শেখে? প্রথমেই তো ব্রহ্মাস্ত্র, নারায়ণ অস্ত্র আর পাশুপত শিখতে পারতো।'

'তা পারতো। যোদ্ধারা প্রথমে এই দিব্য অস্ত্র শেখে কারণ এই শক্তির জন্য তাকে বাইরে যেতে হয় না। এগুলো তার দেহের মধ্যেই আছে। তাকে কেবল সেই শক্তি দেহের ভেতর থেকে বের করে এনে প্রয়োগ করার কৌশল শিখলেই হলো।'

'কৌশলটা কী?'

'একটু জটিল ব্যাপার, কিন্তু তুমি শুনলেই বুঝতে পারবে। যে কোনো পূজা অথবা যজ্ঞে অগ্নি লাগে এটা তো জানো?'

'হ্যাঁ, অগ্নি দিয়ে দেবতাদের আহবান করা হয়।'

'ঠিক। এখন এখানেও অগ্নি দিয়ে অস্ত্র আহবান করতে হয়। এজন্যই বুড়ো আঙ্গুল অগ্নি শক্তি প্রকাশ করে। তুমি যেভাবেই তীর ছুঁড়তে যাও না কেন বুড়ো আঙ্গুল ঐ তীর ছোঁড়ার জন্য তোমাকে ব্যবহার করতেই হবে। অগ্নি মন্ত্রে ঐ শক্তির দেবতাকে নিজের ভেতর থেকে প্রকট হবার আহবান করা হয়।

এখন আঙ্গুলের সাথে শক্তির সম্পর্কের কথাটা আরেক বার ভাবো। তুমি যদি প্রথমে অগ্নি মন্ত্র পড়ে তারপর বরুণ মন্ত্র পড়ো আর সেই সাথে তীর আকর্ষণ করো বুড়ো আঙ্গুল আর কনিষ্ঠা দিয়ে তাহলে তোমার ধনুকে বারুনাস্ত্র প্রকট হবে।'

অসিত উত্তেজিত হয়ে উঠলো, 'এবার আমি বেশ পরিষ্কার বুঝেছি। তার মানে যদি প্রথমে অগ্নি মন্ত্র পড়ে বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনী দিয়ে শরাকর্ষণ করি সঠিক মন্ত্র দিয়ে, তাহলে বায়ব্যাস্ত্র প্রকট হবে ধনুকে।'

'একেবারে ঠিক বুঝেছ। এটাই দিব্য অস্ত্রের প্রথম পাঠ। এখন তুমি বুঝতে পারলে কীভাবে শরীরের অভ্যন্তরের শক্তি বাইরে ব্যবহার করতে হয়।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম না। আগ্নেয়াস্ত্র তাহলে কীভাবে ছুঁড়বো। শুধু বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে তো আর তীর ছোঁড়া যাবে না।'

রুদ্রদেব মাথা নাড়লো, 'সেই কৌশলও আছে। বুড়ো আঙ্গুলকে তালুর ওপর চেপে ধরে আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধান করতে হয়। তোমাকে যে নাচ শেখানোর সময় অতো গুলো হস্ত মুদ্রা শেখালাম সেগুলো আর কখন কাজে লাগবে শুনি।'

অসিত এবার পুরোটাই বুঝতে পেরেছে, 'তাহলে এবার আমাকে মন্ত্র শিখিয়ে দিন। কাজে নেমে পড়ি।'

'তা তো করা যাবে না। তোমার এখনো যোগ্যতা হয়নি সেই মন্ত্র ধারণের। বেশ কিছু অভ্যাসের ব্যাপার আছে। মনঃসংযোগ আরও ওপরে নিয়ে যেতে হবে। তারপর তোমাকে দিয়ে আমি মন্ত্রের সাধনা করাবো। এখন মন্ত্র পড়লে তোমার দেহের শক্তি তোমাকেই ভস্ম করে দিতে পারে।'

'আচ্ছা, আমাকে তাহলে অভ্যাস দেখিয়ে দিন।'

'এখন না। কাল একেবারে ব্রাহ্ম মুহূর্তে দেখাবো। এখন কার না কার চোখে পড়ে যাবে।'

'একটু দিব্যাস্ত্রের দর্শন তো করা যায়। মন্ত্র আপনি মনে মনে পড়বেন। আমি তো আর শুনতে পাবো না।'

রুদ্রদেব শিষ্যের এই অনুরোধ ফেললো না। ধনুক তুলে নিলো হাতে। শুধু ঠোঁট নড়ে উঠলো মন্ত্রের প্রয়োজনে। দেখতে দেখতে অদৃশ্য থেকে এক উজ্জ্বল তীর প্রকট হলো ধনুকের মাঝে। আলোটা পূর্ণ তীরের আকার পেতেই শক্তি সংবরণ করে নিলো রুদ্রদেব। অদৃশ্য হয়ে গেল তীর, 'এবার তোমার সকল সন্দেহ ঘুচেছে তো?'

অসিতের মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই, 'এইবার রাহুর খবর আছে। দেখা হলে ব্যাটাকে একেবারে অগ্নি অস্ত্রে ভস্ম করে দেবো।'

রুদ্রদেব ধনুক গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললো, 'না অসিত। দিব্য অস্ত্রের প্রথম নিয়ম ভালো করে মনে গেঁথে নাও। যার কাছে দিব্য অস্ত্রের জ্ঞান অথবা প্রয়োগ করার ক্ষমতা নেই তার ওপর দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করা মারাত্মক অধর্ম। এটা ক্ষত্রিয় ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ।'

আজকেই সেই দিন। হ্যাঁ, মানুষ যখন অসমর্থ হয়, দুর্বল হয় তখনই সে সাহায্য চায় আকাশের দিকে। সেই সাহায্য চাওয়া সবসময় এক কাপুরুষের লক্ষণই মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু মাঝে মাঝে অপরের দিকে মুখ তোলা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করবারও থাকে না।

নির্জন পাহাড়ের গা বেয়ে যেই পথটা উঠে গেছে সেই পথেই উঠে যাচ্ছে দলটা। রাতে এই পথে চলাচল করা খুবই বিপজ্জনক। সাপের ভয় তো আছেই, সেই সাথে পৃথিবী যদি নিজের দিকে নিজের সন্তানকে টেনে নেয় তবেও যাত্রা সাঙ্গ হয়ে যাবে এই যাত্রা। তবে এই দলের লোকেরা এই রাস্তা নিজের হাতের তালুর মতোই চেনে। তাদের গোপন সভার অনেকগুলো এই পাহাড়ের সেই বিশেষ গুহায় হয়েছে।

অ্যালেস্টর এখানে সবার আগে যাচ্ছেন। তার এই কাজে ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু সম্মিলিত চাওয়ার কাছে মাঝে মাঝে নেতাকেও একটু ঝুঁকতে হয়। অবশ্য এখনো তার মনে না'র দিকেই হেলে আছে বেশির ভাগ, তবে মনের কোণে একটু হলেও আশার আলো উঁকি দিচ্ছে, যদি আসলেই এমনটা হয়? যদি আবার আসলেই গ্রীকের নাগরিকেরা দেবতাদের আশীর্বাদ, শক্তি আর সাহায্য লাভ করে? তাহলে এই রোমানদের সাধ্য কি তাদের আটকে রাখে।

হ্যাঁ, এটাই সেই পাহাড়, যেখানে একদা সব দেবতাদের নিয়মিত পূজা করা হতো। মানুষের মনের নানা পরিবর্তনের সাথে সাথে দেবতারাও এখন নিজেদের ক্ষমতা হারিয়ে সুপ্ত হয়ে গেছেন। এখানেই পূজা করা হতো এথেনার, হেরার আর আফ্রোদিতির। তাদের অকুতোভয় পূর্বপুরুষরা এখানেই পূজা করে যুদ্ধের দেবতা এরিসকে শেকল দিয়ে বন্দি করে রেখেছিলেন, যাতে যুদ্ধের দেবতা কখনোই এই নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যেতে না পারে। তাতে যে তেমন কোনো লাভ হয়নি তা তো এখন বোঝাই যাচ্ছে। যুদ্ধের দেবতা দীর্ঘকাল বন্দি থাকতে থাকতে এখন একেবারেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। একদা যাকে বন্দি করার জন্য সাধ্য সাধনা করতে হয়েছিল, এখন একই কাজ করতে হচ্ছে তাকে জাগানোর জন্য।

এই অনুষ্ঠানের জন্য বিস্তর জিনিসের দরকার পড়েছে। জিনিস জোগাড় করা সমস্যা না, মূল সমস্যা হচ্ছে লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে জিনিস জোগাড় করা। এসব জিনিস একমাত্র গুপ্ত আর শক্তিশালী পূজাতেই লাগে। কেউ যদি দেখে ফেলে সেই বুঝে যাবে। তখন সব হবে পণ্ড। এজন্যই পথ দুর্গম জেনেও এই রাতই বেছে নিতে হয়েছে। পুরোহিত এখানে বাঁচিয়ে দিয়েছে। যদি বলতো ডেলফির পুরোহিতেরা বলেছেন, এই পূজা দিনেই করতে হবে, তাহলেই হয়েছিল।

সবাই পূজার প্রয়োজনীয় সামগ্রী এক এক করে নিয়ে যাচ্ছে। দাসদাসী নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। সবাইকেই হাতে হাতে কাজ করতে হচ্ছে। বলি দেবার জন্য ধবধবে সাদা এক ভেড়া যোগাড় করা হয়েছে। সেই ভেড়া রীতিমতো অস্বাভাবিক নাদুসনুদুস। সেই ভেড়া ওপরে ওঠানোর দায়িত্ব পড়েছে অ্যালেস্টরের ওপর। ভেড়া কিছুতেই পাহাড়ের ওপরে খাড়ায় উঠতে চাইছে না। মনে হয় নিজের পরিণতি এরই মধ্যে বুঝে ফেলেছে সে। কিন্তু অ্যালেস্টরের হাতের তীব্র টানে কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তরতর করে, পা একিয়ে বেকিয়ে উঠে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

পাহাড়ের মাঝ বরাবর উঠে এসেছে দলটা। ওপরে আবছা ভাবে ভগ্ন মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। এমন সময় পুরোহিত দাঁড়িয়ে পড়লো, 'সবাই একটু থামুন।'

অ্যালেস্টর বিরক্ত হলেন, 'আবার কী হলো? তুমিই না বললে সঠিক সময়ে সবকিছুর ব্যবস্থা করে পূজা দিতে হবে। সময় পেরিয়ে গেলে পূজা করে আর লাভ নেই। এখন আবার আমাদেরকে দাঁড় করিয়েছ কেন?'

'কারণ আছে। ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমি আপনাদের মতো যোদ্ধা নই, আমাকে ছোটোবেলা থেকে কঠিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। মন্দিরে মন্দিরে দেবতাদের পূজা সময় কাটিয়েছি।'

'তোমার এসব আমি ভালো করেই জানি। পুরোহিতদের যে এর তার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই, সেটা সবাই জানে। এখন তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, তাই তো?'

'হ্যাঁ, একটু বিশ্রাম না নিলে আর চলছে না।'

'বিশ্রাম নেবার সুযোগ নেই এখন। আমাদের কাজ শেষ করে আবার আঁধার থাকতে থাকতে নগরে ফিরে যেত হবে। সবার অলক্ষ্যে।'

পুরোহিত ততক্ষণে বসে পড়েছে। সরু দেহের সরু বুক দারুণ বেগে ওঠানামা করছে, 'আরে আপনাদের তো আমি বললামই, আমি নিজে ডেলফির পুরোহিতদের সাথে কথা বলে এসেছি। ওনারা এই দৈব বাণী পেয়েছেন। এই পথে গেলে দেবতা এরিস জেগে উঠতে বাধ্য। আর একবার যদি এরিস জেগে ওঠে, তাহলে আপনার কী মনে হয় আমাদেরকে আর ভয়ে ভয়ে নগরে ঢুকতে হবে? হবে না। আমরা দেবতা এরিসকে সাথে নিয়ে বীর বেশে নগরে প্রবেশ করবো। এরিসের সামনে পৃথিবীর কোনো শক্তিই খাটবে না। আপনি কেবল আমার ওপর ভরসা রাখুন।'

'আচ্ছা। রাখলাম। কিন্তু তুমি আর এখানে কতক্ষণ বিশ্রাম নেবে?'

'মাত্র তো বসলাম। আরেকটু বসি। তারপর রওনা দেই।'

যার শক্তি থাকে, হাতে উপায় থাকে তার ধৈর্য একটু কমই থাকে। অ্যালেস্টর হাতের ভেড়ার দড়ি খুলে নিলেন, 'আচ্ছা, তোমার বিশ্রামের পূর্ণ ব্যবস্থা করছি।'

তারপর তাকালেন দলের আরেক সদস্যের দিকে, 'তুমি এক হাতে এ দড়িটা ধরো। ভেড়াটাকে টেনে তোলো। আমি ঐ ভেড়াটাকে তুলছি।'

পুরহিতকে অবাক করে দিয়ে এক আচমকা হ্যাঁচকা টানে তাকে ঘাড়ে তু নিলেন অ্যালেস্টর। সাড়া জীবন মন্দিরে দেবতার নৈবদ্য খেয়ে খে পুরোহিতের তেমন একটা লাভ হয়নি। গায়ে গত্তি লাগেনি। অ্যালেস্টর এই বু বয়সেও অনায়াসে তাকে কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তারপর হাঁটতে লাগলেন তিনি।

দলটা অবশেষে পৌঁছে গেল মন্দিরের চাতালে। এখানে কেউ নেই। পূজারী এসব নিঃসঙ্গ মন্দিরে দেবতাদের সেবা করতে থাকেন না। তারা যেখানে কোলাহ আছে, জনসমাগম আছে, মানুষকে উপদেশ দিয়ে, আশীর্বাদ করে দুই কা কামানো যায় সেখানে থাকতেই বেশি পছন্দ করেন।

পুরোহিতকে মাটিতে নামালেন আলেস্টর, 'দেখলে তো। তোমার বিশ্রাম হলো, আবার আমরা মন্দিরেও পৌঁছে গেছি।'

পুরোহিতের অনেক কষ্ট বেঁচে গেছে তাতেই সে খুশি, এত লোকের সামনে তাকে ঘাড়ে চড়ে আসতে হয়েছে এই অপমান সে গায়ে মাখলো না, 'চ ভেতরে। তাড়াতাড়ি মশাল জ্বেলে কাজ শুরু করি।'

মশাল জ্বেলে দিলেই চলবে না। আগে সবগুলো ফাঁকফোকর বন্ধ করে দি হবে। এই জায়গার প্রত্যেক জানালা সবার চেনা। অভ্যস্ত হাতে সবগুলো জান আর মন্দিরের দেওয়ালের ভাঙা অংশ ঢেকে দিতে লাগলো তারা। বাইরে থে এত রাতে এই মন্দিরের আলো কারো চোখে পড়ে গেলে সমস্যা হবে।

মশালগুলো জ্বলে উঠলো সুগন্ধি তেল উপজীব্য করে। ঘরের গুমোট ব বাতাস যেন নিমেষে বদলে যেতে লাগলো সুগন্ধে। পুরোহিত এবার নিজের বে পাল্টে ফেললো। একটা সাদা সেলাই বিহীন কাপড়ে মুড়ে নিলো তার আপাদম একটু আগের অপ্রস্তুত দুর্বল ভাবটা এখন আর তার মধ্যে নেই। সবাই নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিতে লাগলো। জুতো আর পরিধেয় ছেড়ে সব নিজেকে জড়িয়ে নিতে লাগলো সাদা কাপড়ে।

পুরোহিত হাতে একটা প্রদীপ তুলে নিলো। এরিসের ভয়াল দর্শন ধুলো প মূর্তির গায়ে বহু দিনের সাক্ষী জড়ানো শেকলে ছোঁয়াল সেই প্রদীপ, গমগমে হয় উঠলো তার কণ্ঠ, 'হে মহান প্রভু, হে যুদ্ধক্ষেত্রের অধীশ্বর, হে বারো অলিম্পিয় দেবতার অন্যতম, হে জিউসের প্রিয় পুত্র, আজ আপনার পুনঃজাগরনের সম উপস্থিত। নিজের শক্তি আজ আপনি ফিরে পাবেন। আমাদের জীবনী শক্তি সমর্পণের শক্তি আজ আপনাকে আবার আমাদের মাঝ ফিরিয়ে নিয়ে আসবে আপনি হবেন মুক্ত।'

নিজের হাতের ডানদিকে একটা পাত্রে ছাইয়ের মতো কি একটা রাখা ছি সাধারণ ছাই নয়, জলপাইয়ের শুকনো ডাল পুড়িয়ে এই ছাই তৈরি করা হয়েছে

সেই ছাই এক মুঠো নিয়ে ছড়িয়ে দিলো পুরোহিত। অ্যালেস্টর নির্বাক সব দেখছেন। সেই ছাই এরিসের মূর্তির ধুলোর ওপর আরেকটা পরত বিছিয়ে দিলো, এছাড়া অন্য কোনো পার্থক্য তার চোখে পড়লো না।

দেখতে দেখতে এরিসের সামনে বেশ বড়ো একটা আগুন জ্বেলে ফেললো পুরোহিত। যজ্ঞবেদি আগে থেকেই তৈরি ছিল। সেই যজ্ঞে আহুতি হতে লাগলো নানা রকমের জিনিস। কখনো মধু মেশানো ফুল, কখনো ঘি মেশানো কাঠ, কখনো সুগন্ধি তেল, আবার কখনো যজ্ঞের আগুনে ছুঁড়ে দেওয়া হলো ডেলফি থেকে আনা পবিত্র জল। বেশ কিছুক্ষণ এই দৃশ্য চলতে লাগলো। একমাত্র অ্যালেস্টর ছাড়া আর সবাই বেশ আগ্রহী হয়ে পুরোহিতের কর্মকাণ্ড দেখছে। এসব কর্মকাণ্ডের মানুষকে সম্মোহিত করার একটা ক্ষমতা আছে। সবাই তন্ময় হয়ে দেখছে।

আরও কিছুক্ষণ এই কর্মকাণ্ড চললো। পুরোহিতের গলা আস্তে আস্তে আরও চড়তে লাগলো। শেষ দিকে দেখা গেল এতক্ষণ দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তি ভরে নানা কথা বললেও এখন আর গলায় সেই ভক্তি ভাব নেই, বরং সেখানে কিছু হুমকির সুর, 'আপনাকে আসতেই হবে এই নগরে। এই নগরকে একদিন আপনি অলিম্পাস থেকেও বেশি পছন্দ করতেন। এখন আপনাকে পুনরুজ্জীবিত হতে হলে এখানে আসতেই হবে। নয়তো চিরকাল কাটাতে হবে অন্ধকারে, অচেতন হয়ে, জাগুন, জেগে উঠুন।'

চিরকাল অন্ধকারে কাটানোর হুমকি দেওয়ার পরেও এরিসের মূর্তির কোনো হেলদোল হলো না। সে ঠিক ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো অদ্ভুত ভঙ্গিতে।

পুরোহিতের এখনো দমে যাবার সময় আসেনি। সে তার পরের কাজ শুরু করলো, 'এবার আপনার শেকল সরিয়ে নেবার সময়। আমাদের পূর্বপুরুষরা একদিন আপনাকে বন্দি করেছিল। তাদের বংশধর হয়ে আমি আপনার এই শেকল খুলে দিচ্ছি। সেই সাথে আপনাকে আহবান করছি এই নগরের প্রভু হবার জন্য। সপ্তাহে সপ্তাহে আপনার পূজা হবে। আপনার নামের যজ্ঞের আগুন কখনো নিভবে না। আপনি আমাদের ভক্তি পেয়ে জিউসের থেকেও অধিক শক্তিশালী হবেন।'

এই কথাগুলো বলতে বলতে শেকলের জট খুলতে লাগলো পুরোহিত। তার সরু শরীরের শক্তিতে ভারী শেকল সামলানো সহজ হলো না। অনেক কষ্টে শেকল ছাড়িয়ে মাটিতে ফেললো সে।

ভয়ের পর লোভ দেখাতেও এরিসের মূর্তি যেই অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই থাকলো। এবার মনে হয় নিজের ক্ষমতা আর জ্ঞানের ওপর পুরোহিতের একটু সন্দেহ হলো। ডেলফি থেকে নিয়ে আসা টোটকা কাজ করেনি। তবে তারা যে উপায় বলে দিয়েছেন সেখানে আরও কিছু বাকি আছে। এখনো প্রধান বলিই দেওয়া হয়নি।

বাকি সব অর্ঘ্য দিয়ে দিলো পুরোহিত। তারপর বলি দিতে উদ্যত হলো, 'কোথায় সেই শ্বেত শুভ্র ভেড়া? এখানে নিয়ে আসা হোক।'

একজন ভেড়াটা সাবধানে নিয়ে এলো বেদী স্থলে। একটা ধারালো ছুরি পবিত্র জল দিয়ে ধুয়ে নিলো পুরোহিত। অবশ্যই জীবনের আহবান করলে দেবতা জেগে উঠবেন। ডেলফির প্রধান পুরোহিত এটাই বলে দিয়েছেন। জীবনের আহবান কোনো দেবতাই না-কি ফেলতে পারবেন না।

ভেড়াটাকে শুইয়ে দিয়ে এক চাপে পুরো ছুরি প্রবেশ করালো পুরোহিত ভেড়ার পাজরের একটু নিচে। ছোটবেলা থেকে বলি দিয়ে দিয়ে এসব ভালোই রপ্ত করেছে সে। নিখুঁত হলো সে হিসেব। ভেড়াটা মারা গেল সাথে সাথে। নিখুঁত শল্যবিদের মতো পেটের উপরের অংশের চামড়া কেটে ভেড়ার হৃদপিণ্ড বের করে নিয়ে এলো পুরোহিত, 'এই নিন। আমি আপনার জন্য খাদ্য নিয়ে এসেছি। এখানে সবাই আপনাকে এই খাবার উৎসর্গ করছে। এই জীবন্ত প্রাণীর তাজা হৃদপিণ্ডের মাংসে আপনার জীবন ফিরে আসুক।'

ছুরি দিয়ে সেই হৃদপিণ্ড দুই টুকরো করে ফেললো সে। এক টুকরো ফেলে দিলো যজ্ঞের আগুনে। রক্ত আর থেঁতলানো মাংস পোড়ার একটা উৎকট গন্ধ একটু পরেই ছড়িয়ে পড়লো ঘরে।

আরেক টুকরো এরিসের মূর্তির গায়ে ছুঁড়ে দিলো পুরোহিত, 'গ্রহণ করুন আমাদের এই উৎসর্গ। আপনি খেয়ে নিন। তারপর ফিরে আসুন নিজের আসল রূপে। যেই রূপে এক সময় আপনি রাজত্ব করে বেরিয়েছেন এই পৃথিবীতে। আসুন, আসুন, আসুন।'

দর্শকদের মধ্যেও উন্মাদনা একটু ছড়িয়ে পড়েছে। পুরোহিতের শেষ বাক্যের সাথে তাল মিলিয়ে তারাও বলে উঠলো, 'আসুন, আসুন, আসুন।'

অ্যালেস্টর চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'একটু আস্তে। এক উন্মাদে রক্ষা হচ্ছে না, আরও কতগুলো জুটেছে। সারা নগরের মানুষ তোমাদের চিৎকার শুনতে পাবে তো।'

তার আশেপাশের দুই একজন চুপ করে গেল। তবে সেই কথা পুরোহিতের কানে যায়নি, গেলেও সে শুনত কি না সন্দেহ। সে এখন উন্মাদনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে গেছে। এবার সে একটা পাত্র দিয়ে ভেড়ার পেট থেকে বের করে আনলো এক পাত্র রক্ত, 'এই নাও। এই নাও জীবন রস। এই রস তোমার মধ্য থেকে জীবনকে জাগিয়ে তুলবে। তুমি আর শায়িত থাকতে পারবে না। এই নাও।'

অর্ধেকের মতো রক্ত সে ঢেলে দিলো যজ্ঞের আগুনে। বাকি অর্ধেক ছুঁড়ে দিলো এরিসের মূর্তিতে। তারপর দুই হাত প্রসারিত করে চেয়ে রইলো মূর্তির দিকে, 'জেগে ওঠো। জেগে ওঠো। ভক্তদের ডাকে সাড়া দাও। জেগে ওঠো।'

কিন্তু এরিসের মূর্তির কোনো হেলদোল নেই। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না পুরোহিত। এতদিন ধরে তার ডেলফির পুরোহিতের সাথে ছদ্মবেশে থাকা, গোপন পূজার সবকিছু শিখে আসা, এতো ঝুঁকি নিয়ে জিনিসপত্র জোগাড় করা, পূজা, উপাসনা সব শেষ পর্যন্ত বৃথাই গেল।

হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো পুরোহিত। এরিসের পাথরের অনড় মূর্তি যেন তাকে উপহাস করছে। পুরোহিত জানে, এখন শুধু এই মূর্তি করছে, একটু পরে সবাই উপহাস করবে। তার চেষ্টার কথা কেউ মনেই রাখবে না।

অ্যালেস্টর এগিয়ে এলেন, 'কী হলো? পূজা শেষ হয়েছে?'

পুরোহিত মাথা নাড়ে।

'তাহলে এখনও এরিস জাগছেন না কেন? এখনো কি কিছু করা বাকি আছে?'

'আর কিছুই বাকি নেই। আমি ব্যর্থ হয়েছি। আপনারা সবাই শেষ আশা হিসেবে আমাকে ধরে রেখেছিলেন। আমি কাজটা করতে পারলাম না।'

অ্যালেস্টর নিজের কথা আবার বললেন, 'আমি তো আগেই বলেছি, এসব করে কোনো লাভ হবে না। এসব পুরনো দিনের কথা। কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু তোমাদের সবার জিদ ছিল। এখন শুধু শুধু আমরা বেশ কিছু মুদ্রা আর সময় হারালাম। দৈহিক শ্রমের কথা না হয় নাই বললাম।'

পুরোহিত ভেবেছিল তার সমর্থন কেউ করবে না। কিন্তু একজন বয়স্ক সদস্য এগিয়ে এলেন, 'কিন্তু আমাদের এটা স্বীকার করতে হবে, পুরোহিত চেষ্টা করেছে। ডেলফি থেকে এই উপায় জেনে আসা সে ছাড়া আমাদের দলের আর কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না। আমাদের কপাল খারাপ, তাই এরিস জাগলেন না।'

'এসব করে কি দেবতাকে জাগানো যায়? নিশ্চয়ই এই পৃথিবী ছেড়ে দেবতারা এখন অন্য কোথাও রাজ্য স্থাপন করেছেন।'

'নাহ', পুরোহিত গলায় একটু শক্তি পেলেন, 'দেবতারা এই পৃথিবী ত্যাগ করেননি। মানুষ তাদের ত্যাগ করতে পারে স্বার্থের জন্য, অজ্ঞানতার জন্য, কিন্তু তারা কিছুতেই মানুষকে ত্যাগ করতে পারেন না।'

'তাহলে এরিস জাগলেন না কেন?'

পুরোহিতের হয়ে অ্যালেস্টরের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন ঐ সদস্য, 'শুনুন। আমরা তো প্রথম থেকেই জানি, টিয়ার অভ এপোলো ছাড়া কোনো দেবতাকে জাগানো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র সেটাই পারে এরিসকে জাগাতে। আমরা কেবল একটা চেষ্টা করেছি। কেবল একটা সুযোগ নিয়েছি এরিসকে জাগানোর। আর কিছুই নয়। এখন মানুষ চেষ্টা করলে ব্যর্থও হয় আবার সফলও হয়। সমান সমান সম্ভাবনা।'

'আচ্ছা' অ্যালেস্টর এত কথা মধ্যে যেতে চাচ্ছেন না, 'তার মানে আমাদের কাছে টিয়ার অভ এপোলো নেই, তাই আমরা এরিসকে জাগাতে পারবো না।

আমাদের কাছে যে বিকল্প উপায় ছিল তাতেও আজকে আমরা ব্যর্থ হলাম। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখন আমরা কী করবো?'

বয়স্ক অভিজাত দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের আবদার রাখার জন্য ধন্যবাদ। আমরা আপনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে আজকের এই পূজা করেছি। ব্যর্থ হয়েছি। এখন আমাদের হাতে একটাই উপায় আছে। আপনার কথা মতো কাজ করা। এরপরে আপনি যে পরিকল্পনা করবেন সেটাই এই সভার সবাই বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেবে। কী বলেন আপনারা?'

সবাই এক সাথে নিজেদের হাত ওপরে ওঠালো, শোনা গেল সমস্বর 'ঠিক।'

পরিস্থিতি তখন কী চাচ্ছিল সেটা বোঝার মতো অবস্থায় ছিল না ওরা দুজন। সময়ের চাপে পড়ে ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলেছে। তারপরেও চিন্তা করার মতো সময় হাতে ছিল না। ইভান কেবল একটা ব্যাপারই বুঝতে পেরেছিল, পালাতে হবে।

নিকোলাস সবাইকে ওদের পথ থেকে সরে যেতে বলেছিল, কিন্তু সৈনিকদেরকে ওদের পিছু নিতে নিষেধ করেনি। ওরা ঘর থেকে ছুটে বের হতেই প্রহরীরাও যার যার অস্ত্র বাগিয়ে ধরে ওদের পিছু নিলো। বাইরে থাকা প্রহরীরাও তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। দেখা গেল এই মুহূর্তে ওদের পেছনে প্রায় বারো জন প্রহরীর একটা দল ছুটছে।

দৌড়াতে দৌড়াতে দলটার দিকে একবার ফিরে তাকালো ইভান। সাথে সাথে বুঝতে পারলো, ঝোঁকের মাথায় ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেও ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী। এখন প্রথমে এই এক ডজন প্রহরীকে সামলে কোথাও লুকিয়ে পড়তে হবে। হরিণের মতো গতিতে ছুটছে দুজনে। ক্রমশ প্রহরীদের সাথে ওদের ব্যবধান বেড়ে আসছে।

আরেকটু এগোলেই নগরের প্রধান সড়কগুলোর একটাই উঠে যাবে ওরা। হঠাৎ ইভান ছোটার দিক পাল্টে ফেললো, 'ওরিয়ন, নগরে যাওয়া উচিত হবে না। কেউ না কেউ আমাদের দেখে ফেলবে, ওরা খবর নিতে নগরে এলে বুঝতে পারবে আমরা এখানেই আছি।'

ওরিয়ন ইভানের পাশেই ছুটছে, তার সাড়া শরীর কাঁপছে, ভয়ে না উত্তেজনায় সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না, 'তাহলে? এখন কোথায় যাবো?'

'কারো চোখে পড়া চলবে না। নগরের পাশ কাটিয়ে সরাসরি জঙ্গলে চলে যেতে হবে।'

এদিকে পেছনের প্রহরীরা ওদের সাথে গতিতে পারেনি। তবে ওদেরকে এদিকে ছুটতে দেখেই বুঝেছিল, ওরা নগরেই আসবে। তারা ছুটতে ছুটতে নগরে এসে উপস্থিত হলো। মানুষের মধ্যে ঐ দুজনকে অবশ্য দেখা গেল না। সেটা হবার কথাও না। তবে খবরটা ছড়িয়ে দেবার গুরু দায়িত্ব পালন করতে লাগলো তারা যথেষ্ট দ্রুত। কিছুক্ষণের মধ্যে নগরের রাস্তার লোকেরা জেনে গেল, একটা বীভৎস ঘটনা ঘটে গেছে। তিনজন প্রহরী নিহত হয়েছে। দুজন তৃতীয় শ্রেণির অভিজাত জড়িত ছিল এই কাজে। শুধু সেটুকু হলেও মানা যেতো। ঐ তৃতীয় শ্রেণীর অভিজাতদের হাতে একজন প্রথম শ্রেণির অভিজাত গুরুতর আহত হয়েছেন। জনগণ শিউরে উঠলো, শোরগোল শুরু হতে দেরী হলো না। নগরের আইনের শাসন কি তাহলে পুরোই ভেঙ্গে পড়লো। বলতে গেলে সবাই মিলে তখন খোঁজ করতে লাগলো ইভান আর ওরিয়নের।

ওদিকে নগরে প্রবেশ না করে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে দুজনে। এখন তারা নগর থেকে খুব একটা দূরে নেই। সেখানের কোলাহল আবছা কানে আসছে। একটা বড়ো বাগানের নিচের ঝোপের মধ্যে বসে আছে দুজনে। কম দূরত্ব ছুটে আসেনি, কিন্তু দুজনের শরীরে ছোটার সামান্য লক্ষণও নেই, শ্বাস সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

দুজনেই বুঝতে পারছে, মহা বিপদে পড়ে গেছে তারা। ওরিয়ন মাথা নাড়লো, 'তোমার জন্য আমাকে একবার বিপদে পড়তে হয়েছিল। আর আজকে আমার ভুলের জন্য তোমাকে বিপদে পড়তে হলো। তবে আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ। ঐ সৈনিক যে আমাকে মারার জন্য পেছন থেকে আঘাত করতে যাচ্ছে সেটা আমি খেয়াল করিনি।'

'ভুল!' ইভান একটু অবাক হলো, 'তুমি আবার ভুল কোথায় করলে? একটু আগে যে ঘটনা ঘটে গেছে তাতে আমাদের কারোই ভুল ছিল না।'

'আমার নিজের মেজাজ আরেকটু ঠান্ডা রাখা উচিত ছিল। ভাগ্যের ফেরে হোক আর নিজের ভুলে হোক, সমাজের কাছে আমরা এখন তৃতীয় শ্রেণির অভিজাত। আর সমাজে থাকতে গেলে তো সমাজের নিয়ম মেনে চলতেই হবে। মরিস এক প্রথম শ্রেণির অভিজাত, আর নিকোলাস তো মহা অভিজাত। ওদের যে-কোনো আদেশ আমাদেরকে বিনা দ্বিধায় পালন করতে হবে। সমাজ তো তাই বলে।'

'আমি তোমার কথায় একমত। সমাজ আমাকে তাদের আদেশ পালন করার আইন করেছে। ঠিক আছে। কিন্তু এখানে তো মরিস সমাজের কোনো কাজে আদেশ করেনি তোমাকে। নিকোলাস আর মরিস আমাদের সাথে পূর্ব শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে আমাদেরকে অপমান করতে চেয়েছে। আর বিনা কারণে অপমান সহ্য করা পিঠে মেরুদণ্ড থাকতে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখন তো মনে হচ্ছে ঐ নরকের কীট মরিসকে শুধু আহত করার জন্য আঘাত না করে মেরে ফেললেই হতো। পৃথিবী থেকে একটা ঝামেলা কমতো।'

'না, ভালোই করেছ। মেরে ফেলোনি। এখন আমাদের বিচারে শাস্তি দেওয়া হলেও প্রাণদণ্ড নিশ্চয়ই দেওয়া হবে না। প্রাণটা বেঁচে গেল।'

ইভান একমত হতে পারলো না, 'ভুল ভাবছো তুমি বন্ধু। আমি এই নগরের আইন সম্পর্কে জানি। এই নগরের কোনো সদস্য যদি কোনো কারণে প্রথম শ্রেণি অথবা তার ওপরের শ্রেণির কোনো অভিজাতের গায়ে হাত ওঠায়, আঘাত করে তাহলে সেই আঘাতকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই বিধান। এবং সেটা যেনতেন মৃত্যুদণ্ড নয়, একেবারে নগরের চৌরাস্তায় সবার সামনে ঝুলিয়ে দেবে।'

'তাই না-কি!' আঁতকে ওঠে ওরিয়ন, 'এটাই আইন? না-কি তুমি মশকরা করছো আমার সাথে?'

'মশকরা করতে পারলে খুশিই হতাম। কিন্তু, এখানে মশকরা করার মতো কিছুই নেই।'

'আমাদের দুজনের ঘরের কী হবে?'

'যেখানে প্রাণই থাকবে না, তুমি আছো ঘর নিয়ে। দাঁড়াও এখন কথা না বলে একটু ভাবি।' আচমকা ইনোনের কথা মনে পড়লো ইভানের। শরীরে বয়ে যাওয়া সুখের স্পর্শানুভূতি টের পেলো সে। ইনোন নিশ্চয়ই তার এই ঘটনা শুনতে পাবে। কেমন লাগবে তার? যাক, যাই লাগুক, ইভান এখন আর কিছুই পরোয়া করে না। শুধু ওরিয়নের জন্য খারাপ লাগছে। বেচারা কিছুদিন ধরে তার সাথে থেকে থেকে কেবল ফেঁসে যাচ্ছে।

অনেকটা জোর করে নিজের চিন্তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো ইভান। সেদিনের সেই হেলট দম্পতিকে ক্ষমা করে দিলেও প্রশিক্ষণের শেখানো নিষ্ঠুরতা যে এখনো তাদের দুজনের রক্তে ভালো করেই আছে, তার প্রমাণ একটু আগেই দিয়ে এসেছে তারা।

এক মনে নগরের দিকে তাকিয়ে আছে ইভান আর ওরিয়ন। ওরা আজ থেকে আর এই নগরের কেউ না। ধরা পড়লে ফাঁসি, আর নইলে পলাতক হয়েই তাদেরকে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। আপাতত ওদের দুজনের কারোই ফাঁসিতে ঝোলার কোন ইচ্ছে নেই।

ওদিকে নিকোলাসের মাথায় অন্য চিন্তা চলছে। সে ভালো করেই জানে ইভানই ছিল তার বর্তমান পদের আসল হকদার। নিজের একটা অদ্ভুত ভুলের জন্য সেই পদ হারিয়েছে সে। নিশ্চয়ই ইভান এখন আর তাকে ভালো চোখে দেখছে না। মরিস ঘটনার গুরুত্ব না বুঝতে পেরেই নিজের ক্ষমতার বড়াই করতে গিয়েছিল। সমুচিত শাস্তি পেয়েছে।

মহা অভিজাত হবার পর থেকে একটা ভয়ই কেবল তার মধ্যে আছে। সত্য মাঝে মাঝে সমাজ চাপা দিয়ে দিতে পারলেও গুজব কখনো চাপা থাকে না। এরই মধ্যে সমাজে একটা গুজব ছড়াচ্ছে তার বিরুদ্ধে। সে না-কি তাদের দলের সেরা যোদ্ধা ছিল না। আরেকজনের ভুল তাকে এই পদ পাইয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতে তার জন্য ইভান ভালো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো।

মাথা ঠান্ডা রেখে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ইভান আর ওরিয়নকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। ভাগ্য কিছুদিন ধরেই তার সহায় আছে। নইলে ইভান এমন একটা ছেলেমানুষি ভুল কীভাবে করে। ওকে জব্দ করার কৌশল যখন খুঁজছিল তখন ভাগ্য তাকে আরেকটা উপায় দিয়েছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

ততক্ষণে চিকিৎসক চলে এসেছে। মরিসের শরীর অন্য লোকের মতো না। মজবুত শরীরে সঠিক ওষুধ আর যত্নের প্রভাবে ব্যথা কমে এলো অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই। রোগীকে বেদনা নাশক খাইয়ে দিয়ে চিকিৎসক এবার ক্ষতের পরিচর্যায় লাগলেন। মোটামুটি গভীর ক্ষত। সেলাই করতে হবে।

সেলাই করতে হবে এটা নিকোলাস আগেই বুঝতে পেরেছিল, 'আচ্ছা, সেলাই কখন শুরু করবেন?'

চিকিৎসক হাত ধুয়ে মুছে নিচ্ছে, 'আমি ওষুধ দিয়ে দিয়েছি। রক্ত পড়া একটু পরেই একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। আর বেদনা নাশকও শুরু করবে তার কাজ। তখন সেলাই শুরু করতে হবে।'

'মরিসের সুস্থ হতে কতদিন লাগতে পারে?'

'খুব বেশি লাগবে না। দুর্বল অপুষ্ট শরীর হলে সারতে সময় লাগতো। এক্ষন পনের দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে।'

মরিসের সারতে কয়দিন লাগবে সে কথা বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা থেকে জিজ্ঞেস করেনি নিকোলাস। তার হাতে এখন অনেক কাজ। ইভানের ব্যাপারটা গরম গরম ফয়সালা করে ফেলতে হবে। এখন মরিসকে তার দরকার ছিল। পনের দিন অপেক্ষা করার সম্ভব না। তার মানে যা করার মরিসকে বাদ দিয়েই করতে হবে।

মরিসের ব্যথা এখন সহনীয় পর্যায়ে, তার মুখের লালসা আর ক্রোধ দুটোই পুরোদমে ফিরে এসেছে, 'তুমি ওদেরকে চলে যেতে দিয়ে ভুল করেছ। এখানেই ওদের একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলে ভালো হতো। এখন রাগে আমার মাথা জ্বলে যাচ্ছে। আমার গায়ে যদি এখন আঘাত না থাকতো, তাহলে এখনই দুটোরে খুঁজে বের করে শেষ করে দিতাম।'

'এখন আর তোমাকে অতো কথা বলতে হবে না। চিকিৎসা এখনো শেষ হয় তোমার। চিকিৎসক আমাকে বলেছেন, সেলাই করতে হবে।'

ক্রোধ চলে গিয়ে আতঙ্ক এসে সাথে সাথে অবস্থান নিলো মরিসের কণ্ঠে, 'কী বলছো? সেলাই করতে হবে মানে? এমনিতে শুধু পট্টি বেঁধে দিলে হবে না?'

'না, তোমার জন্য সূচ তৈরি করতে গিয়েছে সে। সেলাই না করলে তোমার এই চামড়া জোড়া লাগবে না।'

আসন্ন সেলাই করার সময় যে কষ্ট হবে তার কথা চিন্তা করেই অভিভূত হয়ে পড়লো মরিস। ইভান আর ওরিয়নের প্রতি প্রতিশোধ চরিতার্থ করার মানস এক্ষন স্থগিত রইলো। কিছুই বলল না মরিস।

নিকোলাসের এখানে থাকার আর দরকার নেই। মরিসের বেদনার ভার চিকিৎসকের ওপর। এই বাড়ির কিছু সেনা নাকি ইভান আর ওরিয়নের পিছু নিয়েছিল। সেই খবরটা নিয়ে আসা যাক।

বাইরে বেরিয়ে এলো সে। অভিজাত আর বাকি সেনারাও সেখানে আছে। তাকে কুর্নিশ করলো সবাই। যে সেনারা গিয়েছিল তারা এখনো আসেনি। ওরাও তাদের অপেক্ষাই করছে।

একটু বাদেই ওদিকে সেনাদেরকে ফিরে আসতে দেখা গেল। ওদের দলপতি এগিয়ে এলো, 'ওদেরকে পেলাম না। কীভাবে যেন উধাও হয়ে গেছে। আমরা

ভেবেছি নগরে গেছে ওরা। কিন্তু নগরে কেউ ওদেরকে দেখেনি। আমরা অবশ্য নগরের সবাইকে ওদের অপরাধ সম্পর্কে জানিয়ে এসেছি। ওদেরকে দেখতে পেলে নগরবাসীই আটকে রাখবে।'

নিকোলাস মন্তব্য করলো, 'বেশ করেছ। আচ্ছা তোমাদের কীভাবে মনে হলো ওরা নগরে গেছে? এই কাজ করে কোন বুদ্ধিমান লোক নগরে যাবে? অবশ্য তাদের মাথার ঘিলুর অবস্থা তোমাদের মতো হলে আলাদা কথা।'

অভিজাতের দিকে ফিরল নিকোলাস, 'শুনুন, আপনি মরিসের চিকিৎসার ব্যাপারটা দেখুন। আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি। আপনার এখানে কোনো চিহ্ন সন্ধানকারী আছে?'

'আমি মহামান্য মরিসের প্রতি দৃষ্টি রাখবো। আর হ্যাঁ, একজন চিহ্ন অনুসরণকারী আছে। তবে সে কেবল শিকারের কাজ করে। মানুষ অনুসন্ধানে কখনো কাজ করেনি। নাম লিজি।'

'মানুষ অনুসন্ধান করেনি তাতে কী হয়েছে, এবার করবে। পশুকে কেমন অনুসন্ধান করতে পারে?'

'সেটা বেশ ভালো পারে। দুই দিনের পুরানো পায়ের ছাপও খুঁজে বের করতে পারে ও।'

'ঠিক আছে। আমি এখন আমার সেনাদের আনতে যাচ্ছি। আপনি লিজিকে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।'

নিকোলাস রওনা দিলো তার প্রাসাদের উদ্দেশ্যে। এর মধ্যেই তার প্রাসাদেও খবর পৌঁছে গেছে। প্রহরী আর সেনারা সব তৈরিই হয়ে ছিল। তাদেরকে কিছু বলতে হলো না নিকোলাসের। নিজের ঘরে গিয়ে কেবল যুদ্ধ সজ্জা পরলো সে। তারপর সেনাদের নিয়ে বেরিয়ে গেল অভিজাতের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

ততক্ষণে মরিসের সেলাই কাজ শেষ হয়েছে। তীব্র যন্ত্রণা কাতর মরিস নিকোলাসকে দেখে আর্তনাদ করে উঠলো, 'দেখো, ঐ শয়তান আমার কী অবস্থা করেছে। তুমি এখন এই বেশে কেন? কোথায় যাবে?'

'ওদের দুজনকে ধরতে হবে না? তুমি বিশ্রাম নাও। এখানেই আপাতত বাড়ি যাবার দরকার নেই।'

সেটা মরিসও বুঝতে পারছে। নড়াচড়া করলেই এখন ক্ষতের সমস্যা হবে। নিকোলাসের সাথে ওদেরকে খুঁজতে যেতে পারছে না সে। তবে তারচেয়েও নিজের বাড়িতে না যেতে পারা তাকে পোড়াচ্ছে বেশি। বাড়িতে আজকে বেশ সুন্দরী এক গণিকার আসার কথা। শহরে নতুন এসেছে এই মেয়ে। মেসিডন থেকে। একবার চোখে দেখেছিল মরিস। এই সৌন্দর্যের কোনো তুলনা নেই। কিন্তু আপাতত পনের দিন তাকে ছোঁয়া যাবে না। চোখ বন্ধ করলো মরিস। সাথে সাথে তার গলা দিয়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। সেটা ঠিক কীসের দুঃখে তা বোঝা গেল না।

লিজি ততক্ষণে চলে এসেছে। এসব অভিজাতদের কাজ করে দিয়ে মোটা পুরস্কার লাভই তার আয়ের উৎস। প্রচণ্ড চতুর আর কুশলী এই বেঁটে লোক। হাতে একটা পোষা গিরগিটি আছে। এটাকে কখনো কাছছাড়া করে না সে। নিকোলাস তার সামনে এসে দাঁড়ালো, 'সব নিশ্চয়ই শুনেছ?'

'আজ্ঞে হুজুর। ওরা ঘরের যেখান দিয়ে বেরিয়েছে সেখান থেকে দুজনের চিহ্ন খুঁজে বের করেছি। এবার খালি অনুসরণ করলেই হবে।'

'তবে আর দেরি কেন? এই সৈনিকেরা আমাদের সাথে যাবে। কোথায় ওদের শেষ দেখা গেছে সেটা বলে দেবে। আর সাথে আমার সেনারা তো আছেই। ওদেরকে আজ সন্ধ্যার আগেই খুঁজে বের করতে হবে।'

'আশা করি আমি তার আগেই আপনাকে ওদের কাছে নিয়ে যাবো।'

দলটা যাত্রা করলো। এবার সংখ্যায় তারা মোটামুটি ভারী। একটু পরে যেখানে ইভান আর ওরিয়নকে শেষ বারের মতো দেখা গিয়েছিল সেখানে এসে হাজির হলো ওরা।

লিজি তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ মাটি আর ঘাস পরীক্ষা করে রায় দিলো, 'ওরা নগরের দিকে যায়নি। প্রথমে নগরের দিকে গেলেও শেষে নগরের পাশ দিয়ে চলে গেছে ঐ পাহাড়ের দিকে।' নিজের আঙুল তুলে ধরে লিজি।

ওদিকে এক জায়গায় বসে আছে ইভান আর ওরিয়ন। নিশ্চয়ই ওদের বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর যাই করা হোক না কেন, এই নগরের সাথে সেই পদক্ষেপের একটা সম্পর্ক থাকবে। সেজন্যই এখানে বসে আছে দুজনে। এই জায়গা থেকে নগরের বাইরের অংশটা রাস্তা-সহ দেখা যায়।

ওদের পিছু নিয়ে আসা সৈনিকের দলটা ফেরত চলে গেছে। এখন নিশ্চয়ই ওরা বসে থাকবে না। নিকোলাসকে চেনে ইভান। ওর সাথে সবসময় একটা শত্রুতা পোষণ করতো সে। এখনো তার মানসিকতা নিশ্চয়ই বদলায়নি। তার ওপর আজকে আহত হয়েছে মরিস। নিকোলাস কিছু একটা করবেই, এবং সেটা খুব তাড়াতাড়ি।

ইভানের ধারণা একেবারে সত্যি। সৈনিকেরা চলে যাবার পরে ওদেরকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। আরেকটা বড়ো দলকে রাস্তা ধরে নগরের দিকে আসতে দেখা গেল। তাদের সাথে নিকোলাস আছে। সাথে আরও প্রহরী আর সেনা আছে যুদ্ধসাজে। যুদ্ধ সাজ বাদে আরেকজনকেও দেখা যাচ্ছে ওদের সাথে। লোকটা বেঁটে, এই লোককে কেন নিয়ে এসেছে নিকোলাস তা বোঝা যাচ্ছে না।

তবে একটু পরেই বুঝতে পারলো। বেঁটে লোকটা নগরের আরেকটু আগেই দলটাকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিলো। ঠিক সেই জায়গাতেই নিজেদের পথ

বদলে নিয়েছিল ইভান আর ওরিয়ন। তারা দুজন এই ঝোপের আড়াল থেকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে।

সেই বেঁটে লোকটা কী যেন খুঁজতে লাগলো। এদিক সেদিক দেখে নিয়ে তারপর ওরা যেদিকে এসেছে সেদিকে আঙুল তুলে কী যেন বলল নিকোলাসের দিকে তাকিয়ে। সাথে সাথে নিকোলাস মাথা ঝাঁকিয়ে দলের দিকে কি একটা নির্দেশ দিলো। পুরো দলটাই এখন ওরা যেদিকে আছে সেদিকে আসছে।

বিপদের গন্ধ পেয়ে গেল ইভান, 'ওরিয়ন, মহা বিপদ ঘনিয়ে আসছে।'

'হ্যাঁ, ওরা আমাদের দিকেই আসছে। কিন্তু বুঝল কীভাবে আমরা এদিকে এসেছি?'

'আরে এটাও বুঝতে পারছো না। ঐ যে বেঁটে লোকটা, ওকে প্রথম বার দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। ও আসলে একজন চিহ্ন অনুসরণকারী। মূলত শিকারে গেলে ওরা পশুর চিহ্ন অনুসরণ করে, তবে আজ আমাদের খুঁজে বের করার কাজে নিকোলাস ওকে কাজে লাগিয়েছে।'

ওরিয়ন একটু ঘাবড়ে গেল, 'এখন মনে পড়েছে ওদের কথা। ওরা সব চিহ্ন বুঝতে পারে। এমনকি পাথরের ওপর দিয়ে কোন সাপ চলে গেলে সেই সাপের চিহ্ন ধরতে পারে। এখন তো আমরা ধরা পড়ে যাবো।'

'উপায় যে একেবারে নেই তা নয়। উপায় আছে। সাধারণ জীবনে প্রবেশ করার পর এত তাড়াতাড়ি এসব জ্ঞান কাজে লাগাতে হবে তা অবশ্য ভাবতে পারিনি।'

'কী উপায়?' ওরিয়ন প্রশ্ন করে।

'তুমি এত বড়ো শিকারি। তোমার তো উপায়টা জানার কথা।'

'কিছুই মাথায় আসছে না।'

'শোনো, এই চিহ্ন অনুসরণকারীরা অনেক দক্ষ হয় নিজের কাজে। তবে তা শুধুই মাটিতে। আমরা যদি মাটিতে না হাঁটি তাহলেই ও আর আমাদের খুঁজে পাবে না।'

'মাটিতে না হেঁটে কীভাবে চলাফেরা করবো? উড়ে যাবো না-কি?'

দলটা ওদের কাছাকাছি চলে এসেছে। এখান থেকে সবাইকে মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এখন বড়ো জোর পাঁচশো পেস দূরে আছে তারা। ইভান ওরিয়নকে টেনে তুলল, 'আমাদেরকে জঙ্গলের ভেতর চলে যেতে হবে। ওখানে এই চিহ্ন অনুসরণকারীকে ধোঁকা দিতে পারবো বলেই আমার বিশ্বাস।'

ওদিকে দলটা প্রতি মুহূর্তে আরও কাছে চলে আসছে। আর দেরি করা যাবে না। ইভান আর ওরিয়ন পূর্ণ বেগে দৌড়াতে লাগলো জঙ্গলের দিকে। বনবাসই এখন তাদের জন্য নিরাপদ।

জাহাজের চারিদিকে রক্ত আর লাশ ছড়িয়ে আছে। এবার সেদিকে নজর দিতে হবে। রক্তের দাগ কোথাও একবার শুকিয়ে বসে গেলে ওঠানো অনেক শক্ত কাজ। লাশগুলোরও একটা গতি করতে হবে। যদিও সবার এখন ঐ মানচিত্রটা ভালো করে দেখার তীব্র ইচ্ছে তবে নাবিকদের কাজ ফেলে রাখার অভ্যাস নেই। মানচিত্র দেখার তীব্র ইচ্ছে চেপে রেখে তারা সবাই কাজে লেগে পড়লো।

কাজটা করতে ওদের খারাপ লাগছে না। যাদেরকে তারা আজকে সন্ধ্যায় মেরেছে তাদের সাথে বিকেল পর্যন্ত বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। হাসি মুখে কথা হয়েছে তাদের মাঝে। এখন অবশ্য এসবের কোনো মূল্য নেই। মানুষকে অবশ্যই সে যুদ্ধের যে পাশে থাকে সেই পাশের জন্য বরাদ্দ মূল্য চুকাতে হয়। মাঝে মাঝে অন্যায় অপরাধ না করেও পেতে হয় চরম শাস্তি।

কাজটা শেষ করতে নাবিকদের বেশি সময় লাগলো না। শরিফ ঘুরে ঘুরে সব তদারক করছে। এই জাহাজের দায়িত্বে এখন তারা আছে। সে এরই মধ্যে নিজেকে প্রধান নাবিক হিসেবে ঘোষণা করেছে। কেউই আপত্তি করেনি।

দায়িত্ব পেলে মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসে। শরিফকে এর আগে এতো কর্মতৎপর কখনোই দেখা যায়নি। সে এখন সবাইকে উপদেশ দিচ্ছে কাউকে রক্তে আরও জল ঢালার উপদেশ, কাউকে আবার বলছে মৃতদেহ সমুদ্রে ফেলার নানা রকম কৌশল।

কাজ শেষ হতে সবার ক্ষিধে পেলো। রাতের খাবার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। দলের সবাইকে অবশ্য ভাঁড়ারের মুক্ত ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হলো না। দুদিন আগেই যে শরিফ ভাবতো, প্রধান নাবিক মাজিদ কিপটে, সে নিজেই এখন ভাঁড়ারের হিসেব করছে, তাজিম সাহায্য করছে তাকে। হিসেব করে না চললে ঠিকমতো বন্দরে পৌছানো যাবে না। নাবিকদের সবাইকেই সেটা বোঝানো হলো। সাধারণ দিনের থেকে অবশ্য ভালো হয়েছে খাওয়া। নাবিকের সবাই একটু করে মদও চেখে দেখার সুযোগ পেয়েছে। এক নাবিক অবশ্য শরিফকে অভয় দিয়েছে, অশ্লীল এবং নিষ্ঠুর হাসির একটা মিশ্রণ নিজের ঠোঁটে ফুটিয়ে সে বলেছে, 'চিন্তা করছো কেন? এখানে তো সব নাবিকদের জন্য হিসেব করে মালামাল আর খাবার রাখা ছিল। অর্ধেকের মতো নাবিক তো এখন সাগরের নিচে চলে গেছে। তাহলে আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করলেও এখন তেমন কোনো ক্ষতি হবে না।'

নাবিকের এই হিসেবটা শরিফের মনে ধরেছে। তারপরেই মাংস আর মদ ভাগ্যে জুটেছে নাবিকদের। আনন্দের আতিশায্য দেখে রাহ্‌ বুঝতে পারলো, এই রাতের এই জলসা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে না। না হোক, চলুক, তাতে তার কী

তার কাজ শেষ। শরিফ আর তাজিমকে ফাঁকি দিয়ে জাহাজ থেকে নেমে পড়তে হবে এখন। সেই উপায়ও ভাবা আছে। দুই বেকুব কিছুই বুঝতে পারবে না।

যথেষ্ট মাতামাতির পর এবারে এলো কাজের পালা। কাল সকালের জন্য কেউই অপেক্ষা করতে চাচ্ছে না। এখনই দেখতে হবে মানচিত্র। জাহাজের ডেকের ওপর এসে জড়ো হলো সবাই। গোল হয়ে বসেছে। দুটো বাতি জ্বলছে মাঝখানে।

সবার চোখের সামনে সেই মানচিত্র খুলে ধরলো শরিফ। নাবিকেরা যার যার মতো করে পরীক্ষা করতে শুরু করলো সেটা। এক নাবিক প্রথম মন্তব্য করলো, 'কাগজটা খুব একটা পুরানো মনে হচ্ছে না কিন্তু। নতুন কাগজ। কালিটাও পুরানো হলে একটু ম্লান হয়ে যেতো। এখনো তাজা আছে। তার মানে খুব বেশি দিন হয়নি মানচিত্র আঁকা হয়েছে। পুরানো কোনো স্বর্ণ ভান্ডারের এমন নতুন মানচিত্র তো হবার কথা না।' নাবিকের গলায় স্পষ্ট সন্দেহ।

রাহুর বুকের ভেতরটা ধরাস করে উঠলো, এখন যদি এই দল কোনোভাবে তার চাল ধরে ফেলতে পারে, তবে তার কপালে খারাপি আছে। এমন মৃত্যু তার কপালে জুটবে, তা কল্পনা করতেও এখন ভয় লাগছে তার।

শরিফ উত্তরটা দিলো, 'আরে এটা তো কোনো পুরনো গুপ্তধন নয়। বাসিল যেই দলের হয়ে ডাকাতি করতো, সেই ডাকাত দলের স্বর্ণ এখানে জমিয়ে রাখতো।'

'সেই ডাকাত দলের বাকি সদস্যেরা কোথায়? তারাও তো এই স্বর্ণের অংশিদার?' আরেক নাবিক বিষয়টা তুলল। এটাও চিন্তা করে দেখতে হবে।

যখন কেউ কোনো লক্ষ্য অন্ধ ভাবে বেছে নেয় তখন সেই পথের দিকে যুক্তি খুঁজতে হয় না, আপনিই চলে আসে। এই সমাধান দিলো তাজিম, 'আচ্ছা, এই প্রশ্নের উত্তর আসলেও খোঁজা প্রয়োজন। আমি মনে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি।'

সবাই তার দিকে তাকায়। তাজিম এবার বলে ওঠে, 'বাসিল আগে কিন্তু জাহাজে আমাদের সাথে ছিল না। এই সফরে নতুন করে মাজিদ তাকে নিয়ে এসেছিল। এখন আমার কথা হচ্ছে, যদি বাসিল ডাকাত দলের সদস্য হয়েই থাকে তাহলে সে কেন ডাকাতি বাদ দিয়ে জাহাজে কাজ করতে এলো? সে তো ডাকাতি করলেই পারতো। ডাকাতির থেকে নিশ্চয়ই জাহাজ চালানো কঠিন।'

এই কথায় সবাই একমত হয়েছে। নাবিকদের কাজই এই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ। তস্করের কাজে অতো ঝামেলা নেই।

আরেক নাবিক কথা বলে উঠলো, সবার পেটেই দ্রব্য পড়েছে, সবাই আলোচনায় শামিল হতে চাচ্ছে, 'আমার মনে হয় কোনোভাবে বাসিলের দলটা ভেঙ্গে গেছে। তখন ডাকাতি করার আর উপায় ছিল না। এমনও হতে পারে

কোনো ঘটনায় দলের সবাই মারা গেছে। সেই শুধু বেঁচে গেছে। এজন্যই ডাকাতি করার আর কোনো উপায় ছিল না তার।'

এটা হতে পারে। নিশ্চিত হবার কোনো উপায় নেই। তবে এখানেই আলোচনা শেষ হলো না। আরেক নাবিক মত দিলো, 'কিন্তু তাহলে সে এই জাহাজে আসবে কেন? সে তো জানেই ঐ স্বর্ণ কোথায় আছে। সে মাজিদকে ভাগ দেবে কেন? শুধু মাজিদ কেন, তার তো কাউকেই ভাগ দেবার কোনো দরকার ছিল না। সে নিজেই এই মানচিত্র দিয়ে স্বর্ণ উদ্ধার করে রাজার হালে জীবন কাটাতে পারতো।'

রাহু বুঝতে পারছে পরিস্থিতি আস্তে আস্তে খারাপ দিকে যাচ্ছে। একবার যদি এই দল বুঝতে পারে এই মানচিত্র দিয়ে তেমন কোনো কাজ হবে না, তখনই তাদের মধ্যে কৃতকর্মের অনুশোচনা হবে। আর মানুষ অনুশোচনার সময় অনেক ভারী সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু নাবিকেরা যে আলোচনা এতদূর নিয়ে আসবে এটা তার ধারণাতেও ছিল না। এখন কীভাবে কী হবে দেখা যাক। তার এখন কিছুই করা উচিত হবে না। নাবিকেরা কতটুকু কী করে দেখা যাক।

তবে রাহুকে চুপ থাকতে দিলো না শরিফ, 'আমাদের মনে বেশ কিছু প্রশ্নের উদয় আছে। এই প্রশ্নগুলো আমাদের সমাধান করতে হবে। বিন্দুমাত্র অনিশ্চয়তা নিয়ে আমদের কিছুতেই যাত্রা করা উচিত হবে না।' রাহুর দিকে তাকালো সে, 'তুমিই ওদেরকে শেষ বার কথা বলতে শুনেছ। এমন কিছু কি তারা বলেছে, আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? মাজিদকে কেন এই গুপ্তধনের ব্যাপারে জড়াবে বাসিল?'

একটু বোকার ভান ধরলো রাহু, ' আমি আসলে ওদেরকে মানচিত্র আর গুপ্তধন নিয়ে ঝগড়া করতে দেখেছি। বাসিল বার বার বলছিল, এই কাজ আমাদের সব নাবিককে নিয়েই করতে হবে, কিন্তু মাজিদ রাজি হচ্ছিল না। এটুকুই। তারপরে তো বাসিল খুন হয়ে গেল।'

এবার এক নাবিক সবচেয়ে মূল্যবান প্রশ্নটা করলো, 'কিন্তু মাজিদ না হয় আমাদেরকে স্বর্ণের ভাগ দিতে চাইছিল না, ঠিক আছে, কিন্তু বাসিল কেন আমাদের সবাইকে স্বর্ণের ভাগ দিতে চাইবে। আমাদেরকে দিলে তার স্বার্থ কী?'

রাহু বুঝতে পারে, পরিস্থিতি আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। চরম গতিতে চলতে শুরু করলো তার মস্তিষ্ক। কিছু একটা বের করতেই হবে।

রাহু এবার বলে উঠলো, 'আমার অবশ্য একটা কথা মনে পড়েছে। ওদের মধ্যে যখন কথা হচ্ছিল, তখন মাজিদ একটা কথা বলেছিল।'

সবাই তাকালো রাহুর দিকে।

'বলেছিল, আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি, তোমার অবশ্যই আমার কথা শোনা উচিত। জবাবে বাসিল বলেছিল, নাবিকদের দলকে আমাদের সাথে নিতেই হবে।

একা একা আমরা ঐ সম্পদ উদ্ধার করতে পারবো না। আর আমি কেবল একটা মানচিত্রই তোমাকে দিতে পারি। সেই জায়গা তো আর আমি চিনি না।'

এবার সন্দেহ হলো শরিফের, 'নিজের দলের স্বর্ণ রাখার জায়গা বাসিল কেন চিনবে না?'

এক নাবিক এটার সমাধান দিলো, 'নাই চিনতে পারে। ডাকাত দলের সবাই তো আর সম্পদ রাখার জায়গা চিনবে না। সর্দার আর বড়োজোর দুই এক জন জানে। সবাই জানলে কখন কার মধ্যে লোভ জেগে উঠবে বলা মুশকিল।'

শরিফ এবার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে, 'তার মানে বাসিল জায়গাটা চিনতো না। আর কাছে ছিল একটা মানচিত্র। আর বাসিলকে কোনো একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল মাজিদ। তাই বাসিলের একটা ভরসা চলে আসে মাজিদের ওপর। একে তো মাজিদ তাকে বাঁচিয়েছে, আর মাজিদ অনেক দক্ষ নাবিক, মানচিত্র ভালো বোঝে। তাই মাজিদকে সে এই মানচিত্র দেখায়। আর আমার মনে হয়, বাসিল আমাদের সবাইকে সাথে রাখতে চেয়েছিল অন্য ব্যাপারে। এই স্বর্ণ সে আমাদেরকে ভাগ করে দিতো না, বরং, এই স্বর্ণ ব্যবহার করে সে হতে চেয়েছিল বড় এক সওদাগর, সম্মানী ব্যবসায়ী। তাই নাবিক হিসেবে আমাদের দলটাকে হাতে রাখতে চেয়েছিল। ওদিকে মাজিদ তো নিজেই বলতো, তার আর সমুদ্র ভালো লাগে না। এটা নিয়েই ওদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। আর তখন মাজিদ ভাবলো, মানচিত্র তো পাওয়াই গেছে। আমার মনে হয় এটা বাসিলের মানচিত্র না। মাজিদ আসলটা থেকে দেখে দেখে এঁকেছে। এজন্যই এটা এতো নতুন দেখতে। আর যখন একবার মানচিত্র আঁকা হয়ে গেছে, তখন বাসিলকে আর বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী। বাসিলের মানচিত্র নিশ্চয়ই বাসিল নিজের কাছেই রাখতো। সেটা মনে হয় বাসিলের মৃতদেহের সাথে কবরে চলে গেছে। সে যাই হোক, মানচিত্র তৈরি হতেই অকুলাস বন্দরে সুযোগ বুঝে বাসিলকে মেরে ফেললো সে।'

মানুষের মনে ঘটনার ডালপালা কীভাবে ছড়ায় তা প্রত্যক্ষ করে অবাক হয়ে গেল রাহ্। শরিফ মনে হচ্ছে এসব ঘটনা একেকবারে নিজের চোখের সামনে দেখেছে। এত নিশ্চিত হয়ে বলল সে।

নাবিকেরা প্রায় সবাই মেনে নিলো ঘটনা। মানচিত্র নতুন হবার এই ব্যাখ্যা তাদের মনে ধরেছে। রাহ্ হাঁফ ছাড়লো, অবশ্য সেই সাথে মনে মনে ধন্যবাদ দিলো শরিফকে। সে যেই ভাবে সম্ভাবনা খতিয়ে কাহিনি নাবিকদের বুঝিয়ে দিয়েছে, অতোটা ভাবনা তার মধ্যেও আসতো কি না সন্দেহ।

নাবিকদের মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। এবার যে যার মতো ঘুমাতে চললো। কাল সকালে উঠে কোনদিকে যাওয়া হবে, মালামাল লাগলে কোনো বন্দর থেকে সংগ্রহ করা হবে সেসব ঠিক করা হবে। নিজের ঘরে চলে এলো রাহ্। এবার জাহাজ থেকে সটকে পড়ার সময় এসেছে।

পরদিন সকালে সূর্যের সাথে সাথে সবাই উঠে পড়েছে। আজ যাত্রার দিক আর পথ বাছাই হবে, অনেক কাজ। কয়েকজন নাবিক মিলে ভাঁড়ার ঘরে কোথায় কী আছে সেই হিসেব করতে বসলো। শরিফ আর তাজিম তদারক করছে সেখানে।

রাহু গিয়ে দাঁড়ালো শরিফের সামনে, 'আমার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ তোমরা? আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি তো আর তোমাদের একজন নই।'

শরিফ রাহুর কথার ধরনে একটু অবাক হলো, 'তোমার ব্যাপারে আবার কী সিদ্ধান্ত নেবো? তুমি তো আমাদেরই একজন এখন। আমরা যেখানে যাবো তুমি আমাদের সাথে যাবে। এই স্বর্ণের ভাগ তো তুমিও পাবে। দেখবে আমাদের আর কোনো অভাব থাকবে না।'

রাহু এবার নিজের গলা একটু নামিয়ে আনলো, 'আরে না। ব্যাপারটা তেমন না। কাল রাতে একটা অদ্ভুত দুঃস্বপ্ন দেখেছি। তারপর আর ঘুম আসেনি। সারা রাত চিন্তা করেছি সেটা নিয়ে।'

'কী দুঃস্বপ্ন?' শরিফ জানতে চায়।

'এই গুপ্তধন অভিশপ্ত। যেই তার কাছে যাবার চেষ্টা করেছে সেই মরেছে। ভেবে দেখো, প্রথমে এই সম্পদ অর্জন করেও সেই ডাকাত দল ভোগ করতে পারলো না। কোনোভাবে সবাই মারা পড়লো। তারপর এই সম্পদ হাতাবার চেষ্টা করেছিল বাসিল আর মাজিদ। দেখলেই তো ওদের পরিণতি। আমি কাল তোমাদের কথা অনেক ভেবেছি। তোমরা বাসিলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে অনেক ভালো কাজ করেছ। আমাকে শান্তি দিয়েছ। কিন্তু এই গুপ্তধনের পেছনে ছুটে নিজেদের সর্বনাশ কোরো না। এই গুপ্তধন অভিশপ্ত।'

শরিফ এবার গলা নামিয়ে বলল, 'খবরদার, এই কথা আমাদের কাছে বলেছ বলেছ, আর কারো কাছে ভুলেও বলবে না।'

রাহু মরিয়া হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি তো তোমাদের ভালোই চাই। আমাদের দেশের এক দেবী আছেন। মহাকালী নাম। তিনি কাল আমাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। বললেন, এই গুপ্তধনের পেছনে যে যাবে সেই মারা যাবে। আমি বন্ধু হয়ে তোমাদের এত বড়ো বিপদে কীভাবে যেতে দেই। তোমরা তো এখন একটা জাহাজের মালিক হয়েছ। এই জাহাজ দিয়ে বাণিজ্য করলেও ভালোই লাভ করতে পারবে।'

শরিফের কণ্ঠস্বর এবার নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো, 'এই জাহাজে জাহাজে করে জায়গায় জায়গায় ঘোরা আমাদের আর পোষাবে না। ঐ গুপ্তধন আমাদের চাই। তুমি তোমার মুখ বন্ধ রাখো।'

রাহু অসহায় মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো। সে বুঝেশুনেই এই কাজ করেছে। মনে মনে খুব খুশি হয়ে উঠছে সে। এই নাবিকেরা এসব কুসংস্কার মন থেকে বিশ্বাস করে। এই গুপ্তধনে অভিশাপ আছে এমন কথা সবাই এক বারেই লুফে নেবে। অর্ধেকের বেশি সঙ্গী হারিয়ে ফেলবে তারা। এই ঝুঁকি নিশ্চয়ই ওরা নেবে না।

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল রাহুর গলা, 'তোমরা তাহলে ওখানে যাবে বলেই ঠিক করেছ?'

'হ্যাঁ।' শরিফ বলল, ' আর কিছুতেই তুমি এই কথা কারো কাছে বলবে না।'

'কিন্তু যে ঐ স্বর্ণের পেছনে যাবে সেই তো মারা যাবে।'

'তোমার যদি মরতে এত ভয় লাগে তাহলে তোমার আমাদের সাথে যাবার দরকার নেই।'

রাহু দেখতে পেলো, তার কাজ সারা। সে শেষবারের মতো বললো, 'আমি শুধু আমার জীবন নিয়ে চিন্তা করছি না। তোমরা এই জাহাজের সবাই ভালো মানুষ। বিশেষ করে তোমরা দুজন। আমি তোমাদেরকে বিপদের দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছি না।'

শরিফ একটু চুপ থেকে কী যেন চিন্তা করলো। রাহুকে ওদের সাথে এখন নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। যে-কোনো সময় সে এসব কথা নাবিকদের বলে দিতে পারে। এসব কুসংস্কার সেও বিশ্বাস করে, কিন্তু এখানে লোভের কাছে বিশ্বাস অনেক আগেই হেরে বসে আছে।

'শোনো রাহু।' শরিফ একবার তাজিমের দিকে তাকিয়ে রাহুকে বলে, 'তুমি ইচ্ছে করলে জাহাজ থেকে নেমে যেতে পারো। সেটা তোমার ইচ্ছে। তবে এই সম্পর্কে কাউকে কিছু বলা চলবে না।'

রাহু নিজের বুকে হাত দিলো, 'সত্যি বলছি, ঈশ্বরের শপথ, আমার মনে অতো সাহস নেই। তোমাদের মতো আমি দুঃসাহসী নই। মৃত্যুর ভয় আমার আছে, ভালো রকমই আছে। তোমরা আমাকে নামিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। আরেক বার কি আমার কথা ভেবে দেখবে?'

শরিফ আর তাজিম আর ভেবে দেখতে রাজি নয়, 'তোমাকে নামিয়ে দেবো। এখনই।'

'কিন্তু আমাকে নামিয়ে দেবার সময় নাবিকেরা নানা কথা জিজ্ঞেস করবে। তাদেরকে কী বলবে?'

'চিন্তা কোরো না। নাবিকেরা কিছুই বলবে না। সেটা আমরা সামলে নেবো।'

একটু পরেই জাহাজের সব নাবিকেরা জেনে গেল রাহু তাদের জাহাজ থেকে নেমে যাচ্ছে। আসল কথাটা বলার প্রশ্নই ওঠে না। রটিয়ে দেওয়া হলো, রাহুর শরীরে বাসা বেঁধেছে মারাত্মক এক সামুদ্রিক জ্বর। মারাত্মক ছোঁয়াচে। তাকে

নেমে যেতেই হবে। নাবিকেরা কেউই তেমন কোনো আপত্তি করলো না। শুধু একজন বললো, 'সেও তো এই মানচিত্র দেখেছে। যদি কাউকে বলে অন্য কোনো দল নিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান বের করতে যায়?'

নাবিকের এই আশংকা এক নিমেষে উড়িয়ে দিলো শরিফ, 'আরে, মানচিত্রটা তুমিও তো দেখেছ। অনেক জটিল। সেই মানচিত্র কারো হাতে না থাকলে, হিসেব ঠিকমতো না কষলে কিছুতেই ঐ জায়গার সন্ধান বের করা যাবে না। সেই দিক থেকে আমাদের কোনো চিন্তা নেই।'

আরেকটু পরেই জাহাজ কিনারে ভেড়ালো নাবিকেরা। নিজের কিছু জিনিস আর অঙ্গদের খাঁচাটা নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এলো রাহু। শরিফ নেমেছে তার সাথে, 'তুমি এই ফালতু অভিশাপের কথা না বিশ্বাস করলেও পারতে। এসব বলে কিছু হয় না।'

'আমার অতো সাহস নেই বন্ধু। আমাকে নিরাপদে নামিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আচ্ছা, এখানে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না, আমি কীভাবে লোকালয়ে পৌঁছবো?'

'একটু সামনে এগিয়ে গেলেই একটা রাস্তা পাবে। হেঁটে বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাবে এক শহরে। আর যদি তার আগেই কোনো দলের সাথে দেখা হয়ে যায়, তাহলে তো বলতে হবে তোমার কপাল ভালো।'

রাহুকে রেখে জাহাজ নোঙ্গর তুলল। জাহাজ একটু দূরে যেতেই হাঁটতে শুরু করলো রাহু। পুরো জাহাজকে ধোঁকা দিয়েছে সে। অর্ধেক নাবিক মরে গেছে, বাকি অর্ধেক এখন মরীচিকার পেছনে ঘুরে মরবে। তাকে এখন যেতে হবে বেরেনিকে বন্দরে। হাতে মৃদু দুলতে থাকা অঙ্গদের খাঁচার দিকে একবার তাকালো সে।

আসল গুপ্তধন তো সে জাহাজ থেকে নিয়েই নেমেছে।

বড়ো সেই ঝড় সামলে জাহাজ এগিয়েছে ভালোই। নাবিকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে আরব সাগর পেরিয়ে নিজেদের ভূখণ্ডে আসার। মৃত্যু থেকে ফিরে এসে নিজের পরিবারে কথাই এখন মনে পড়ছে সবার। আজ সকালে প্রধান নাবিক ঘোষণা করলো, 'আমরা অকুলাসের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। আমার মনে হয় কাল বিকেল নাগাদ সেখানে পৌঁছে যাবো।'

ঘোষণাটা শুনে সবার মধ্যেই আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। অসিতের হলো মিশ্র অনুভূতি। এতদিন ধরে আসল উত্তেজনার কথা ভুলে ছিল সে। একটা ঝড় সামলাতে হয়েছে যেমনটা কখনো দেখেনি সে। আবার শিখতে হয়েছে দিব্য অস্ত্রের নানা নিয়ম। এখনো রুদ্রদেব অসিতকে মন্ত্র শেখায়নি, শুধু দিব্য অস্ত্রের জন্য ঠিকমতো ধনুক ধরা আর ধনুকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কথা বলেছে। মন্ত্র আরও কয়েকদিন পরে শেখানো হবে। তবে আজ সকালে প্রধান নাবিকের অকুলাস বন্দরে ভেড়ানোর কথা শুনে নিজের লক্ষ্যের কথা মনে পড়ে গেল তার। রাহুর ঐ বন্দরে নামার সম্ভাবনা আছে। তার মানে অঙ্গদ অথবা অঙ্গদের খবর পাওয়া যাবে সেখানে।

নাবিকেরা আবার যার যার কাজে ফিরে গেল। এখন রুদ্রদেব আর অসিতও সব কাজই মোটামুটি শিখেছে। ওরাও সাহায্য করতে লাগলো সবাইকে। দুপুরের খাবার সময় এই বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় পাওয়া গেল।

অসিত, রুদ্রদেব আর শেইরন এক সাথে খেতে বসেছে। অসিতই তুলল কথাটা, 'অকুলাস বন্দরে যদি রাহু নেমেও থাকে তাহলে আমরা খোঁজখবর কীভাবে করবো?'

রুদ্রদেব ব্যাপারটা নিয়ে আগেই ভেবেছে, 'রাহুর জন্য নিজেকে লুকিয়ে রাখা অনেক কঠিন হবে। আর জাহাজ যেহেতু অকুলাসে ভিড়বেই, তাতে রাহুকে খুঁজে পাওয়া আমাদের জন্য কঠিন হবে না। কেবল একটু ভালো করে খোঁজখবর করতে হবে। রাহুর গালে আছে কাটা দাগ। সে ভারতীয়দের মতো দেখতে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, তার কাছে আছে অঙ্গদ আর অঙ্গদকে অথবা অঙ্গদের গল্পকে মানুষের থেকে লুকানো এক কথায় অসম্ভব।'

শেইরন এরই মধ্যে সবকিছুই জেনেছেন, 'রাহু যদি অকুলাসে নেমে থাকে তাহলে তার সংবাদ অবশ্যই পাওয়া যাবে। খবর নেয়ার উপায় আছে। কেবল সঠিক জায়গায় খুঁজলেই চলবে। আর যেহেতু সব জাহাজকেই বিনা প্রস্তুতিতে বারিগাজা ছাড়তে হয়েছিল তাই সব জাহাজই অকুলাসে থামবে।'

অসিত আর তেমন কথা বললো না। সে ঐ বন্দরের কিছুই চেনে না। তাই কোনো পরিকল্পনা ঠিক করা সম্ভব নয়। কেবল কাল বিকেলের অপেক্ষা করতে হবে।

খেতে খেতে এবার অন্য আলোচনায় ঢুকে গেল তারা। শেইরন বেশ কিছু গ্রীক শব্দ আর তার ভারতীয় মানে শেখালেন। তারপর খাওয়া শেষ করে বিশ্রাম।

বিশ্রামের সময় খুব একটা বেশি পাওয়া যাবে না। অসিত দিব্য অস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় আসন অনুশীলন করার সিদ্ধান্ত নিলো। বীর ভদ্রাসনে যেতেই রুদ্রদেব ঢুকে পড়লো ঘরে, 'এটা আবার এখন কী করছো?'

'কেন? আসন অনুশীলন করছি। দিব্য অস্ত্রের মন্ত্র তো নইলে আপনি দেবেন না।'

'সে ঠিক আছে। কিন্তু নিয়মকানুন কি সব খেয়ে বসে আছো না-কি? বলেছি না, সর্বদৈহিক আসন কিছুতেই খাওয়ার চার মুহূর্তের মধ্যে করা যাবে না। এখন যদি কিছু করতে ইচ্ছে করে তাহলে হাতের আর আঙ্গুলের মুদ্রা চর্চা করো। যোগাভ্যাসের একটা নিয়ম আছে। নিয়মের ব্যতিক্রম করলে শরীরের হাড়গোড় নড়ে যাবে। হিতে হবে বিপরীত।'

হিতে বিপরীতের অনুষঙ্গ হবার কোনো ইচ্ছে অসিতের নেই। সে বীর ভদ্রাসন থেকে নিজেকে সাধারণ অবস্থায় নিয়ে এলো। শুয়ে শুয়ে চর্চা করতে লাগলো আঙ্গুলের মুদ্রা। শক্তি আঙ্গুল দিয়ে আকর্ষণ আর নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আঙ্গুলে বল এবং নিয়ন্ত্রণ দুইই লাগবে। আর এই মুদ্রাগুলো সেই দুটোরই যোগান দেবে।

দুপুরের বিশ্রামের পর আবার কাজ শুরু হলো। ঝড়ে পালের অবস্থা ধ্বংসপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। তাই সর্বক্ষণ দাঁড় বাইতে হয়েছে। রুদ্রদেব আর অসিত এক দাঁড় বাইবার দায়িত্ব পেয়েছে। আগে কষ্ট হলেও এখন তেমন একটা গায়ে লাগে না কাজটা। ওদের শরীর এখন ছন্দটা ধরে ফেলেছে।

ক্লান্ত শরীরে ওদের ছুটি মিললো সন্ধ্যের একটু আগে। নাবিকেরা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে। আজকে চাঁদের আলো থাকবে। রাতেও দাঁড় বাওয়া হবে আজকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে।

রুদ্রদেব আর অসিত আবার নিজেদের ঘরে গিয়ে বসলো। অসিত অনুযোগ করলো, 'পরিশ্রম করতে করতে তো হাড় মাংস খুলে যাবে মনে হচ্ছে। জাহাজে এত পরিশ্রম আগে তো জানতাম না।'

'কোন জায়গায় কত পরিশ্রম তা তো তুমি এখনো জানো না। তুমি সারা জীবন কেবল বানরের খেলা দেখিয়েছ। আর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিশ্রম কিছু করেছ। তবে সেটা তোমার গায়ে লাগেনি। তুমি ওখানে পরিশ্রমের জন্য শরীরকে তৈরি করার কৌশল জানতে। কিন্তু এখন তোমার শরীর যেভাবে তৈরি হয়েছে সেটা দাঁড় বাওয়ার জন্য নয়। কষ্ট তো একটু হবেই।'

'আপনার কষ্ট হচ্ছে না?'

'হবে না কেন? আমার শরীরও তো কখনো দাঁড় বায়নি।'

'তাহলে শরীরকে দাঁড় বাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল আমাকে শিখিয়ে দিন।'

'যা আমি নিজেই জানি না, তা তোমাকে কীভাবে শেখাবো? বাদ দাও, তোমাকে একটা ব্যাপারে সাবধান করা হয়নি। আমি জানি শেইরন অনেক ভালো মানুষ। তুমি তাকে অনেক পছন্দ করো। কিন্তু ভুলেও এই দিব্য অস্ত্রের জ্ঞানের কথা শেইরনকে বলতে যাবে না। বুড়ো ব্যাপারটা স্বাভাবিক ভাবে নাও নিতে পারেন। তিনি জীবনে অনেক কিছু দেখলেও হয়তো এই সব শক্তির ব্যাপারে কিছুই জানেন না। সেটাই স্বাভাবিক। এসব শক্তির ব্যাপারে এই পৃথিবীর এখন কেউই কিছু জানে না।'

'না, শেইরনকে কেন বলতে যাবো? কিন্তু আমাকে মন্ত্র দেবেন কখন। কখন আমি দিব্য অস্ত্রের আহবান করবো।'

'তুমি হাতের মুদ্রায় পাকা হয়েছ। ধনুক ধরার কৌশলও ভালোই আয়ত্ত করেছ। কিন্তু সব ধাপ তো এখনো শেষ হয়নি। তোমাকে এখন সবচেয়ে কঠিন ধাপ পার করতে হবে।'

'সেটা কী?'

'তোমার দেহের ভেতরে পঞ্চ শক্তিই আছে। এখন দেহের ভেতর থেকে সেই শক্তি এনে তোমার আঙ্গুলে জড়ো করতে হবে। পাঁচটা শক্তি থেকে একটা শক্তি বেছে এনে জড়ো করা মন্ত্রের কাজ। কিন্তু শুধু মন্ত্রে তো হবে না। তোমাকে মনঃসংযোগ করতে হবে। একটা পথ তৈরি করতে হবে ভেতরে ভেতরে। মন্ত্রের গুণে সেই বিশেষ শক্তি পঞ্চশক্তির মিশ্রণ থেকে আলাদা হবে, তারপর সেই পথ বেয়ে এসে জড়ো হবে তোমার আঙ্গুলে, যে আঙ্গুলে যেই শক্তি আছে, সেই আঙ্গুলে।'

'আচ্ছা, মনঃসংযোগ করার উপায় কী?'

'যোগে অথবা যুদ্ধে মনঃসংযোগ করার একটা উপায়ই আছে। আর তা হচ্ছে ধ্যান। তুমি ধ্যানে বসো। কৌশল যা শিখিয়েছি তাই। শুধু নিজের মধ্যে ডুবে দেখে নাও দেহের ভেতরে কোনো পথ খুঁজে পাও কি না। যতক্ষণ না পাবে ততক্ষণ খুঁজতে থাকো। আর এই ক্লান্ত শরীরে ধ্যান করলে তোমার ভালোই লাগবে।'

অসিত পদ্মাসনে বসলো। রুদ্রদেব বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়েছে, 'ও আচ্ছা, ধ্যানে ডুবে যাবার আগে একটা কথা মনে রেখো, রাতের খাবারের সময় আমাকে একটু ডেকে নিও, যা পরিশ্রম হয়েছে, না খেলে কাল আর পঞ্চ শক্তির কিছুই শরীরে অবশিষ্ট থাকবে না।'

অসিত ধ্যানে বসলো। চোখ বন্ধ করে নিজের ভেতরে খোঁজার চেষ্টা করলো। যা তার মনকে নাড়া দিতে পারে, সেসব একে একে আসতে শুরু করলো সামনে।

রাধা এলো, অঙ্গদ এলো, পিসি এলেন, তাদের গ্রাম এলো। প্রত্যেকটা জিনিসকে একটা একটা পর্দার মতো করে সরিয়ে দিয়ে আরও ভেতরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো অসিত। এখন গভীর ধ্যানে ডুবে গেছে সে। বাহ্যিক জগতের সাথে নাড়ি বন্ধন ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক এখন নেই তার। সে জানে এই পথে শেষ দরজা কোথায় আছে। সব পার্থিব বস্তু পেরিয়ে যেতে হবে সেই শেষ দরজার সামনে। অসিত এগিয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হচ্ছে পথের আলো। একটু দূরে বোধহয় দেখা যাচ্ছে দরজাটা।

ঠিক সেই সময়ে শেইরন ধাক্কা দিলেন অসিতকে, 'কী বসে বসে ঘুমিয়ে পড়লে না-কি?'

চোখ খুলল অসিত, তার এখন শেইরনের ওপর রেগে যাওয়া উচিত, তবে শেইরনের যে কোনো দোষ নেই তা অসিত জানে, হাসি মুখে বলল সে, 'না, বসে বসে ঘুমাচ্ছি না। একটু ধ্যান করছি।'

'হ্যাঁ, শুনেছি তোমাদের ওদিকের লোকজন এসব করে। আমি তোমাদের খেতে ডাকতে আসলাম। জানোই তো খাবারের ভাঁড়ার এখন প্রায় শেষ হবার পথে। আর আজ নাবিকেরা যে পরিমাণ পরিশ্রম করেছে তাতে কেউ অনুপস্থিত থাকলে তারা খাবার রেখে দেবে বলে মনে হচ্ছে না।'

অসিত অবাক হলো। খাবারের সময় হয়ে গেছে না-কি। সে এত লম্বা সময় ধরে ধ্যান করেছে? কই মনে হলো মাত্র কয়েক পল সে বসে ছিল। রুদ্রদেবকে ডেকে তুলল সে। তিনজনে মিলে রাতের খাবারের বণ্টনে যোগ দিলো। শেইরনের কথাই ঠিক। আজ খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি একটু বেশিই।

সারারাত কঠিন পরিশ্রম করে দাঁড় বাওয়ার ফল সকালেই পাওয়া গেল হাতে নাতে। আকাশ খুবই পরিষ্কার। সকালের সূর্য একটু ওপরে উঠতেই দূরে দেখা গেল বন্দরের অবয়ব। অকুলাস বন্দর চিনতে নাবিকদের অসুবিধা হলো না। সবাই নিজেদের কাজ রেখে ডেকের ওপর চেঁচামেচিতে যোগ দিলো। অসিত অবাক হয়ে দেখলো, রুদ্রদেব সবার সাথে মিলে লাফাচ্ছে, চিৎকার করছে। তখন তার মনে পড়লো যোগীর বৈশিষ্ট্য। যখন যেমন তখন তেমন। বাসনা নেই কিন্তু উপভোগ আছে। অসিতও যোগ দিতে দেরি করলো না।

দুপুর নাগাদ বন্দরে ভিড়ে গেল জাহাজ। নাবিকেরা আগে থেকেই তৈরি ছিল। কোনোমতে নোঙ্গরের দড়িদড়া বেঁধেই নেমে পড়লো মাটিতে। সবাই এই বন্দর বেশ ভালো করেই চেনে। যে যার মতো রওনা দিলো নিজেদের পছন্দের জায়গার উদ্দেশ্যে। প্রধান নাবিক আগেই হাত খুলেছেন। সবাই কিছু কিছু মুদ্রা আগাম পারিশ্রমিক পেয়েছে এই বন্দরে খরচ করার জন্য। বাকিটা হিসেব করে শেষ বন্দরে গেলে পাওয়া যাবে।

রুদ্রদেব আর অসিতও নেমে এসেছে। এমনকি ওরাও মুদ্রা পেয়েছে কিছু। শেইরন আস্তে আস্তে নেমে এলেন। মাটিতে নেমেই শরীর ঝাড়া দিলেন তিনি, 'আহ, অনেক দিন পর নামলাম।'

রুদ্রদেব জিজ্ঞেস করে, 'এখন কোথায় যাবো?'

'তোমাদের কাজের কথা আমার মাথায় আছে। সেটাই একটু পরেই হাত দেবো। তবে এখন আর আমাকে কিছু বলে বাঁধা দিও না। আমার এখন প্রথমে একটা জায়গাতেই যেতে হবে।'

'কোথায়', রুদ্রদেব আর অসিত এক সাথে প্রশ্নটা করে।

'চলো, দেখাচ্ছি।'

এক সাথে হাঁটতে থাকে তিনজনে। একটু পরেই এসে উপস্থিত হয় অকুলাসের সবচেয়ে বড়ো পানশালায়। একবার দেখেই রুদ্রদেব হতাশার নিঃশ্বাস ছাড়ে, গলা নামিয়ে আনে অসিতের উদ্দেশ্যে, 'বুড়োর এবার মাতাল হবার শখ হয়েছে।'

দেখা গেল এই পানশালার বুড়ো মালিক শেইরনকে বেশ ভালো করেই চেনে। দেখেই নানা খাতির শুরু করলো। দুই বুড়োর অনেক দিন পর দেখা হয়েছে। শেইরনের সঙ্গী হিসেবে ওদের জন্যও দুটো বড়ো বড়ো পাত্র ভর্তি করে উৎকট গন্ধের তরল এলো।

সামনে দুটো পাত্র নিয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছে। একটু দূরেই শেইরন তার প্রথম পাত্র শেষ করে এনেছেন। বন্ধু পেয়ে করছে নানা গল্প। বয়স যেন কম করে হলেও বিশ বছর কমে গেছে তার।

অসিত ভয়ে ভয়ে তাকালো রুদ্রদেবের দিকে, 'এখন কী করবো?'

'কী আর করবে? মদমত্ত হয়ে যাও।'

' এসব খাওয়া কি উচিত হবে? শাস্ত্রে তো স্পষ্ট বারণ।'

'আরে তুমি সেই চিন্তা কোরো না। তুমি তো ক্ষত্রিয়। তোমাদের ক্ষেত্রে তো এত বিধিনিষেধ নেই। একটু খেয়ে দেখো।'

সন্দেহ দেখা দিলো অসিতের মুখে, 'আমি তো ক্ষত্রিয়। কিন্তু আপনি কী? আপনি কি ক্ষত্রিয় নন।'

নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেবার কোনো ইচ্ছে নেই রুদ্রদেবের, মিথ্যেও বলল না, কেবল এড়িয়ে গেল, 'আচ্ছা, এই বুড়োর পান করা কখন শেষ হবে বলতে পারো। আমাদেরকে তো আমাদের কাজ শুরু করতে হবে।'

শেইরনের মধ্যে ওঠার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। রুদ্রদেব তার দিকে এগিয়ে গেল, 'আপনার এখানে আর কতক্ষণ লাগবে? অনেকক্ষণ তো হলো।'

শেইরনের তৃষ্ণা তখনো বাকি আছে, 'দাঁড়াও আরেকটু।' বলেই অসিত আর রুদ্রদেবের জন্য রাখা দুটো পাত্র চুমুকে খালি করে তারপর তিনি উঠলেন। চলো, এবার যাওয়া যাক।'

পানশালা থেকে বেরিয়ে এলো তারা। শেইরন বন্ধুর কাছে উষ্ণ বিদায় নিলেন। রুদ্রদেব নিজেদের জাহাজের অনেককেই দেখতে পাচ্ছে এখানে, সেই বুদ্ধিটা বাতলালো, 'আচ্ছা, এই পানশালাতেই তো অনেক লোক দেখা যাচ্ছে। এখানে নিশ্চয়ই আপনার মতো অনেকে জাহাজ থামার পরপরই চলে আসে।'

'আমার মতো অনেকে মানে?' চোখ একটু গরম হয়ে উঠলো শেইরনের।

শুদ্ধ সংস্কৃতের একটু ব্যবহার করলো রুদ্রদেব, 'মানে হচ্ছে, আপনার মতো যারা বহুদিনের সুরাবঞ্চিত লোকজন, সেই চাতক তৃষ্ণা নিয়ে তারা নিশ্চয়ই জাহাজ ভেড়া মাত্র এই জায়গায় চলে আসে। এই জায়গাতে খোঁজখবর করলে আমরা হয়তো রাহু আর অঙ্গদের খবর পেতাম।'

পুরোটা বুঝতে পারলেন না শেইরন, 'তোমার যা অভিজ্ঞতা সেটুকুই তো দেখাবে। কথা ঠিক, এখানে খবর আছে। কিন্তু সেই খবর তোমাকে দেবে কে? এখানে সবাই অশ্লীল আর হালকা রসিকতা করার জন্য মুখিয়ে আছে, খবরের কথা বললে কেউ পাত্তাই দেবে না। তবে ভুলে যেও না, নাবিকেরা জাহাজ থেকে নামার পর গণহারে যেমন এখানে আসে তেমনি আরেক জায়গায়ও যায়।'

ভয়ে ভয়ে অসিতের দিকে তাকালো রুদ্রদেব, 'একটা বাচ্চা ছেলের সামনে সেসবের কথা না বললেই নয়?'

শেইরন এতো সুরা পান করেও এখনো পুরোপুরি ঠিক আছেন, হাঁ হাঁ করে হেসে উঠলেন তিনি, 'ঠিক ধরেছ, নাবিকেরা সেখানে গণহারে যায়, তবে সেখানে গেলে তোমার অন্য অনেক কিছু জুটতে পারে কিন্তু খবর কিছুতেই জুটবে না।'

ইতস্তত করলো রুদ্রদেব, 'আচ্ছা, সেই জায়গার কথা আর বলতে হবে না। এখন বলুন আমরা কোথায় যাবো।'

'তুমি ধারণা ঠিকই করেছিলে। তবে আমরা সেখানে যাবো না। আমরা এক ধাপ আগেই থামবো। এখন কথা না বলে চলো।'

একটু পরেই বন্দরের আরেক প্রান্তে এসে উপস্থিত হলো। এখানেও মোটামুটি অনেক লোকের ভিড়। সবাই সারিতে দাঁড়িয়েছে। প্রায় সবাইই ওদের জাহাজ থেকে নেমেছে।

'এখানে কী হচ্ছে? সবাই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন?'

'শোনো, সবাই গণিকাদের কাছে যেতে চায় বন্দরে এসে। অনেকদিন বৌ তো দূর কেউ কোনো মেয়ে মানুষের মুখই দেখেনি। এই ব্যবসা সব বন্দরের প্রধান ব্যবসার মধ্যে একটা। আর পুরুষ তা সে যতই শক্ত হোক না কেন, যতই ঝড়ের সাথে লড়াই করে আসুক না কেন, হোক সে যাচ্ছে মুদ্রা দিয়ে নারীর সান্নিধ্যে, তা

সে চায় নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতে। এখানে সেই কাজটাই করা হয়। এতদিনের পুরানো চুল-দাড়ি-গোঁফ কাটা হয় এখানে। এটা নাপিতের দোকান। এখানেও সব খবরই পাওয়া যায়।'

ওরা ভিড় কমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। নাপিতের হাতের গতি দেখার মতো। একেক জন করে নাবিক তার কাঁচির নিচে গিয়ে বসছে আর ঝড়ের গতিতে হাত চলছে নাপিতের। দেখতে দেখতে শেষ নাবিকের চুল কাটাও শেষ হলো।

প্রথমে শেইরন ঢুকলো ঘরে, 'কী অবস্থা তোমার?'

নাপিত শেইরনকে দেখে হেসে উঠলেন, 'আরে তুমি দেখছি এখনো জীবিত আছো।'

'হ্যাঁ, কারণ তোমার কাঁচির নিচে এখনো বসিনি। যেভাবে হাত চালাও কবে গলা কেটে ফেলতে কে জানে।'

রুদ্রদেব বুঝতে পারলো এই নাপিতও শেইরনের বন্ধু। শেইরন আসন গ্রহণ করলেও ওরা দাঁড়িয়েই আছে। ঘরে বসার আর কোনো জায়গা নেই।

'তোমার কাছে আমি একটা খবরের জন্য এসেছি।'

'খবর পাওয়া যাবে। আমার কাছে সব খবরই থাকে। তবে নিয়মটা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। বন্দর, রক্ষী, ডাকাত আর রাজাকে নিয়ে কোনো তথ্য তুমি দেবে না।'

'একদম ঠিক।'

'আমার খবর এর বাইরে, তাই তোমার দিতে কোনো সমস্যা হবে না। আমি একজন লোককে খুঁজছি। সে একটা রঙ্গিন অদ্ভুত বানর নিয়ে ঘোরে। সেই বানরের খেলা দেখায়। গালে একটা কাটা দাগ আছে।'

একটু অবাক হয়ে গেল নাপিতের চেহারা, 'কিছুদিন আগেই তো বন্দরে এমন এক লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। ওর জাহাজের লোকজন আমার এখানেই চুল কাটাতে এসেছিল, সেই নাবিকদের কথা শুনে বুঝলাম ওর কাছে এক সুন্দর বানর আছে। তুমি যেমন বলছিলে ঠিক তেমন। গালে কাটা দাগের কথা খেয়াল নেই, তবে রঙ্গিন বানরের কথা যে বলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

অসিত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, রুদ্রদেব তাকে ধরে ফেললো, নিচু গলায় বলল, 'না, শেইরনকে কথা বলতে দাও।'

'আচ্ছা, সেই লোকটাকেই খুঁজছি আমি। কোথায় আছে এখন সেই খবরটা বলতে পারবে?'

'না, সেটা বলতে পারবো না। ঐ জাহাজের এক নাবিক নাকি বন্দরে নেমেই খুন হয়েছিল। মনে হয় ডাকাতের কাজ। তারপর ঐ জাহাজ আর থাকেনি। নানা ঝামেলা করছিল রক্ষীরা। সেই জাহাজ চলে গেছে। নাবিকদের সাথে এর আগেই

কথা বলে যতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, ওরা এখান থেকে বেরেনিকে যাবে। ওরকম বেশির ভাগ জাহাজ ঐ বন্দরেই যায়।'

'রঙিন বানর তুমি দেখেছ?'

'না, সেটা তো বন্দরে নামানো হয়নি। হলেও আমি দেখতে পারতাম না। তবে শুনেছি সেই বানরের সারা গায়ে নানা রকমের রং। কেউ রং করেনি। তার চামড়ার রঙই এমন।'

'আচ্ছা, বন্ধু, তোমার মনে হয় এখন বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। এই বয়সে আর কত পরিশ্রম করবে?'

'তোমার মতো বুড়ো ভাম আমাকে পরিশ্রমের ভয় দেখিও না। তুমি তো এই বয়সে দিব্যি জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়াচ্ছো।'

নাপিতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। শেইরন জিজ্ঞেস করলেন, ' কী বুঝলে?'

উত্তরটা দিলো রুদ্রদেব, 'দুটো জিনিস। এখন আমাদের বেরেনিকে যেতে হবে।'

'আর আরেকটা?' জিজ্ঞেস করে অসিত।

'রাহুর জাহাজের এক নাবিক বন্দরে খুন হয়েছে। কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, সাধারণ ডাকাতির খুন নয় এটা। রাহু আর অঙ্গদ জড়িত থাকলেও থাকতে পারে।'

লিজি এগিয়ে যাচ্ছে শিকারি কুকুরের মতো ভঙ্গি করে। বেঁটে হবার কারণে তার মাথা এমনিতেই সাধারণ মানুষের চেয়ে ভূমির বেশি কাছে থাকে। সেই মাথা সে আরও নুইয়ে এনেছে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে ওদের চলাচলের নানা রকম চিহ্ন। সেগুলো দেখতে দেখতে একরকম ছুটেই চলছে সে। একবার পিছন ফিরে তাকালো সে নিকোলাসের দিকে। নিকোলাসের চোখে প্রশ্ন। চোখ দিয়েই যেন উত্তর দিলো লিজি, 'চিন্তা করবেন না। ঐ তো, আমি ওদের ছায়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার পেছনে আসুন কেবল।'

লিজির পাশে পাশে লিজির বেজিও ছুটছে। এই প্রাণীটাকে সবসময় কাছে কাছে রাখে সে। কোনো দরকারে লাগে না কিন্তু সঙ্গীর অভাব পূরণ হয়। লিজির দেহাবয়বের কারণে তার কপালে এই পর্যন্ত বউ জোটেনি। এই বেজিই তার সর্বক্ষণ সঙ্গী।

আরেকটু এগোতেই ঝোপটার কাছে এসে দাঁড়ালো দলটা। লিজি একবার ভালো করে দেখে নিয়ে ঢুকে পড়লো ঝোপের মধ্যে। পেছন থেকে নিকোলাস বেশ সতর্ক। ইশারায় তার সেনাদের সতর্ক হতে বলেছে। এই ঝোপের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে ঐ দুজন।

কিন্তু, না, এখানে শুধু ঐ দুজনের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে, দুজনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। লিজি কিছুক্ষণ ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো। নিকোলাস এবার সরাসরি জিজ্ঞস করলো, ' কী হয়েছে? ঝোপের ভেতরে কি দেখলে?'

'মহামান্য, এই ঝোপের ভেতরেই ওরা ছিল। অনেকক্ষণ ওদের বসে থাকার লক্ষণ দেখেছি আমি। আমার মনে হচ্ছে এখানে বসে থেকেই ওরা নজর রেখেছিল নগরের দিকে। তবে একটু আগেই এখান থেকে চলে গেছে ওরা।'

'তার মানে আমাদেরকে আসতে দেখেছে। আর সেটা দেখেই ওরা পালিয়েছে।'

'নিঃসন্দেহে। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়?' লিজির কণ্ঠে জমে এলো নিষ্ঠুরতা, 'ওরা তো আর ওদের চিহ্ন লুকিয়ে পালাতে পারেনি। আমাদের দেখে যেহেতু পালিয়েছে তাই ওদেরকে খুঁজতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'চলো তাহলে, ওরা কোনদিকে গেছে?'

'আসুন আমার পেছনে। ওরা ঐ জঙ্গলের দিকে গেছে।'

'চলো তাড়াতাড়ি। জঙ্গলের ভেতরে একবার ঢুকে পড়লে ওদেরকে ধরতে সময় লাগবে।'

দলটা আবার চলতে শুরু করলো। জঙ্গলের দিকে একেবারে স্পষ্ট চিহ্ন রেখে গেছে ওরা। সেগুলো খুঁজতে তেমন একটা কষ্ট হচ্ছে না লিজির। চলতে চলতে

নানা কথা ভাবতে লাগলো সে। এতদিনে দেবতারা মনে হয় মুখ তুলে চাইলেন স্বয়ং এক মহা অভিজাতের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দিচ্ছে সে। এই কাজ শে হলে মোহর আর সম্মান দুটোই বেশ পরিমাণে মিলবে। অনেক দিন ধরে এক বিয়ে করার শখ তার। হেলট ঘরের মেয়ে হলেও চলবে। ভালো ঘরের মেয়ে তো আর কেউ তার কাছে বিয়ে দেবে না। তবে টাকার অভাবে হেলট মেয়ে হয়ে ওঠেনি। তবে এবার মনে হচ্ছে হবে। যেভাবেই হোক সমাধা করতে হ কাজটা।

হঠাৎ তার চিন্তায় বাঁধা পড়লো। সে আশ্চর্য হয়ে দেখলো, একটু আগে ত সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠতে থাকা চিহ্নগুলো আচমকা কোনদিকে যেন মিলিয়ে গেছে ভালো করে চোখ নামিয়ে খুঁজতে লাগলো সে। কিন্তু কিছুতেই কিছু খুঁজে পেলে না।

লিজির এভাবে আচমকা থেমে যাওয়া দেখে কিছু একটা আন্দাজ করেছি নিকোলাস, 'কী হলো? মনে হচ্ছে ওদেরকে হারিয়ে ফেলেছ তুমি।'

লিজি তাকালো নিকোলাসের দিকে, চোখে অবিশ্বাসীর দৃষ্টি, 'আচমকা উধাও হয়ে গেল ওরা দুজন। এখানেই শেষবারের মতো ওদের পায়ের চি পেলাম।'

'খোঁজো ভালো করে।'

'খুঁজেছি। কিন্তু কোনো চিহ্ন নেই। জঙ্গলের ভেতর নিশ্চয়ই ঢুকেছে, না এদিকে আসতো না। কিন্তু কীভাবে ঢুকলো? চিহ্নটা মুছলো কী করে?'

নিকোলাস বুঝতে পারলো, তার সাথে আনা চিহ্ন বিশেষজ্ঞ ব্যর্থ হয়েছে 'তাহলে তুমি হার স্বীকার করে নিলে?'

লিজি মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো। একটু আগে নিজের ভাগ্যের বদলে কথা চিন্তা করেছে সে। এবার তো দেখা যাচ্ছে কপালে শাস্তির খাড়া ঝুলছে নিজের সম্মান এবং নিজেকে বাঁচাতে আবার মাটির দিকে নজর দিলো সে, কি আবার সেই আগের দশা, কিছুতেই ইভান আর ওরিয়নের কোনো চিহ্ন সে খুঁজে পেলো না।

মত দিলো সে, 'না, ওরা আর যাই হোক, মাটি দিয়ে যায়নি। মাটিতে ওদে চিহ্ন থাকলে আমি খুঁজে পেতামই। কিন্তু কোনো বাহন ব্যবহার করেছে বলেও মনে হচ্ছে না। কোন বাহন তো আর তাদের উড়িয়ে নেবে না। বাহন থাকলে তো আমি ধরে ফেলতাম।'

'আমারই ভুল হয়েছে লিজি। তুমি নির্ভয়ে থাকো। আমি তোমাকে অহে কোনো শাস্তি দেবো না। তুমি নিজের কাজ করার চেষ্টা করেছ। শুধু আমা একজন পশুর চিহ্ন অনুসরণকারীকে মানুষের পেছনে লাগিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি তার ওপর ঐ দুজন আবার যেনতেন কেউ নয়, একই সাথে কুশলী আর বুদ্ধিমান

লিজি এবার চিন্তায় পড়লো, সবকিছু ছাপিয়ে এখন তার মাথায় ব্যর্থ হবার জ্বালা। সামনের ঐ দুজন তার এত বছরের অভিজ্ঞতার ওপর কাল লেপে দিয়েছে, আচমকা বুঝে ফেললো সে। চিহ্নটা যেখানে শেষ হয়েছে সেই গাছের দিকে ভালো করে খেয়াল করলো। তারপর চিৎকার করে উঠলো, 'পেয়েছি, পেয়েছি।'

নিকোলাস ঘোড়া এগিয়ে আনলো, 'কী পেয়েছ আবার?'

'ওরা কীভাবে জঙ্গলের ভেতরে গেছে সেটা খুঁজে পেয়েছি। ওরা এই গাছে উঠে গেছে। এই গাছগুলো জঙ্গলে একটার সাথে আরেকটা নিজেদের ডাল দিয়ে যুক্ত। সেই এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফিয়ে লাফিয় ওরা পেরিয়ে গেছে। এভাবেই জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেছে মনে হচ্ছে। অনেক আগে একজনের কাছে এমন একটা কৌশলের কথা শুনেছিলাম। এরা বেশ একটা সহজ মানুষ নয়।'

এবারে নিকোলাসেরও মনে পড়লো কৌশলটা। হ্যাঁ, ওদেরকেও শেখানো হয়েছিল। কোথায় কাজে লাগবে তখন বোঝা না গেলেও এখন ইভান ঠিকই কাজে লাগিয়ে দেখিয়েছে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে মন চাইলো না নিকোলাসের, 'ঠিক আছে। আমি বুঝতে পারছি, তোমার এলেম আছে। ভালোই বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা। কিন্তু, এখানে তো শুধু বুঝলেই হবে না। কাজটা করতে হবে। ওদেরকে খুঁজে বের করার কোনো উপায় বলতে পারো?'

মাথা নোয়ালো লিজি, 'আজ্ঞে না। আমি যেই বিদ্যে শিখেছি, তাতে মাটি, ঘাস আর বালুর ওপর যে-কোনো চিহ্ন চিনতে পারি, কিন্তু গাছের ওপর উঠে চিহ্ন বুঝতে পারবো না। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

লিজি হাত উঠিয়ে নিয়েছে। সামনের জঙ্গলের দিকে তাকালো নিকোলাস। এই বিশাল জঙ্গলের ভেতর এই কজন সৈন্য নিয়ে প্রবেশ করার কোনো মানেই হয় না। খড়ের গাঁদায় সূচ হয়তো ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে, কিন্তু এখানে কিছুতেই ইভান আর ওরিয়নকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বৃথা কষ্ট করতে গিয়ে শেষে পড়তে হবে বিপদে।

ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো সে, 'আচ্ছা, অন্ধকার হতে আর বেশি বাকি নেই। এখন আর জঙ্গলের ভেতর ঢোকা যাবে না। আমাদের সাথে কোনো আলো নেই। আমাদেরকে আরও লোকজন আর আলো নিয়ে আসতে হবে। জঙ্গলে দিনের বেলাও রাতের অন্ধকার থাকে।'

এতক্ষণ নিকোলাসের একজন সৈনিকও কোনো কথা বলেনি। এবার তাদের মধ্যে সর্দার এগিয়ে এলো ঘোড়া নিয়ে। মাথা নামিয়ে বলল, 'মহামান্য অভিজাত নিকোলাস। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। কিন্তু একটা কথা না বলেও পারছি না।'

'বলে ফেলো। এখন অতি ভণিতার সময় নয়।'

'মহামান্য। আমাদের সব সৈনিককেই আমরা এখানে নিয়ে এসেছি। আপ ঠিকই বলেছেন। এই সৈনিক নিয়ে জঙ্গলে অভিযান পরিচালনা করা যাবে ন বিপদের ভয় আছে। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, এই জঙ্গলের গভীরে কি হেলট বিদ্রোহীরা আস্তানা গেড়েছে। তারাও যথেষ্ট ঝামেলাবাজ।'

'হু। কিন্তু আমাদের সব সৈনিককেই যদি আমরা এখানে নিয়ে এসে থা তাহলে বাড়তি সৈন্য আনবো কোত্থেকে?'

'মহামান্য, আপনি দেরি না করে মহামান্য গভর্নর পায়াসের সাথে দে করুন। তাকে আজকের ঘটনা খুলে বলে তার কাছ থেকে সৈন্য আর অস্ত্র সাহা চান। তিনি আপনাকে না করবেন না। নগরের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তিনি আপনা সাহায্য করবেন। আর আপনি মহা অভিজাত হবার পরে ওনার সাথে এখন সাক্ষাৎ করেননি। তাই এটাই সুযোগ। এই দেখা করার সুযোগের সদ্ব্যবহার ক উচিত আপনার।'

কথাটা নিকোলাসের মনে ধরেছে। গভর্নরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের এ সুযোগ হারানো উচিত হবে না। দলকে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলো সে।

গভর্নরের প্রাসাদে সরাসরি চলে এলো নিকোলাস। তার বাহিনী একটু দূ অবস্থান করছে। এই প্রাসাদে সেনা নিয়ে ঢোকা যাবে না। প্রহরীরা স নিকোলাসকে চেনে। স্পার্টার মহা অভিজাতকে সম্মান প্রদর্শন করাই নি যথাযথ সম্মান পেলো নিকোলাস। তাকে প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে এলো প্রহরী। ভেতরের পরিচারক দিয়ে খবর পাঠানো হয়েছে পায়াসকে।

নতুন মহা অভিজাত তার সাথে দেখা করতে এসেছে শুনে একটু স্বস্তি অনু করলেন পায়াস। এই স্পার্টার অভিজাতদের নিয়ে হয়েছে সমস্যা। তারা এখন মনে করে তারা স্বাধীন রাজ্যেই আছে, এই রাজ্য শাসনও করছে তারা। তারা আসলে এখন রোমানদের দয়ায় বেঁচে আছে সেটা বারবার ভুলে যায়। তার সা কেমন যেন ঠান্ডা সম্পর্ক তাদের। নিজেদের একটা আভিজাত্য নিয়ে চলে তার কোনো সমস্যা এখনো করেনি, কিন্তু ওদের এই ঠান্ডা ব্যবহার মনে একটা কাঁটা খোঁচা দেয় সবসময়। তাই এবারের মহা অভিজাত তার কাছে এসেছে শুনে তিনি খুশিই হলেন। যাক, একে তো আর ডেকে পাঠাতে হয়নি। তার ওপর মেয়ের জ পাত্র খুঁজছেন তিনি। সে হিসেবে মহা অভিজাতের চেয়ে ভালো কাউকে এই নগ পাওয়া যাবে না। প্রথমে ভেবেছিলেন, রোমান কোনো সেনাপতির সাথে বি দেবেন কিন্তু তার এই একটাই সন্তান। তাকে দূরে না পাঠানোর সিদ্ধান্তই নিয়েছে তিনি। তার জামাতা হবে এই নগরের গভর্নর।

নিকোলাস পায়াসকে দেখে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখালো। খুব সাবধান থাক সে। একই সাথে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, আবার নিজের আভিজাত্য ধরে রাখতে হবে। দুটো কাজ একসাথে সঠিক ভারসাম্যে করা বড়োই কঠিন।

'আপনি বসুন। আমি আপনার ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। মহা অভিজাত হবার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাকে আমিই আমন্ত্রণ জানাতাম আমার প্রাসাদে। তবে তার আগেই আপনি চলে এসেছেন, আমার আমন্ত্রণের অপেক্ষা করেননি দেখে আপনাকে সাধুবাদ।'

কথাটা নিজের ওপর খোঁচা হিসেবেই নিলো নিকোলাস, সে আগে থেকেই জানে, এই গভর্নর অভিজাত সম্প্রদায় আর স্পার্টার এই নিয়ম ঠিক পছন্দ করেন না। তবে সেটা নিয়ে এখন চিন্তা করে লাভ নেই, পরে দেখা যাবে, 'মহামান্য গভর্নর, আপনার আমন্ত্রণ পেলে সেটা আমার জন্য পরম পাওয়া হতো। আপনাকে এই অসময়ে বিরক্ত করার কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না। নেহাত পরিস্থিতির চাপে পড়ে আসতে হলো।'

'পরিস্থিতির চাপে পড়ে মানে? আমার লোকেরা নগরে কোনো ঝামেলা করেছে না-কি' পায়াস জানেন, রোমান সেনারা এই কাজে বেশ ওস্তাদ।

'নগরে একটা ঝামেলা হয়েছে, তবে সেটা আপনার লোকেরা করেনি। আমাদের এক তৃতীয় শ্রেণির অভিজাত করেছে। এক অভিজাতের বাড়িতে সেই ঘৃণ্য কাজটা করেছে সে।'

পায়াস মাথা নাড়লেন, 'আমি ঘটনা পুরোপুরি জানি না, কিন্তু শুনেছি নগরে এক বাড়িতে না-কি তিনজন সৈনিক হত্যা করে দুজন পালিয়ে গেছে।'

'আপনি ঠিকই শুনেছেন। আপনি এই নগরের শাসক। ওরকম দুজন অপরাধীকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা আপনার দায়িত্ব। সেই ঘটনাস্থলে আমিও ছিলাম। সেখানে ওরা একজন প্রথম শ্রেণির অভিজাতকেও মারাত্মক জখম করা হয়েছে। এই অপরাধের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।'

'মাত্র দুজন এত ঘটনা ঘটিয়ে ফেললো, তার ওপর আপনার মতো একজন যোদ্ধা সেখানে ছিলেন।'

নিকোলাস নিজের অক্ষমতা ঢাকলো, 'আমি শস্ত্রহীন ছিলাম। আর ঐ দুই যোদ্ধা সাধারণ কেউ নয়। অনুষ্ঠানের দিন শেষে দুজনকে তৃতীয় শ্রেণির অভিজাতের পদে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, সেটা আপনার মনে আছে?'

'হ্যাঁ আছে। আর ওরা হচ্ছে ঐ দুজন।'

'হুম। তার মানে ওরা আপনাদের মতোই প্রশিক্ষণ পেয়েছে। চিন্তার কথা।'

'আমি আমার সেনা নিয়ে ওদের পেছনে গিয়েছিলাম। কিন্তু দুজনে এখন জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েছে। আর জঙ্গলে ঢুকে পুরো জঙ্গল তন্নতন্ন করে খোঁজার মতো লোকবল আমার নেই। ওরা যে-কোনো সময় নগরে এসে ঝামেলা করতে পারে। ওদেরকে খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে পারলে আপনার ওপর জনগণের আস্থা আরও বাড়তো।'

কথাটাতে ভুল কিছু নেই, পায়াস জানতে চাইলেন, 'তাহলে এখন আপনি আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছেন?'

'জি। আপনি পঞ্চাশ জন সুদক্ষ সেনা আমাকে দিন। আমিই ওদেরকে পরিচালনা করবো। তারপর জঙ্গলের ভেতর থেকে ওদের ধরে এনে শাস্তি দেবো।'

'ব্যাপারটায় আপনার খুব বড়ো কোনো স্বার্থ আছে বলেই মনে হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, আমিও আমার নগরে এমন দুটো অপরাধীকে ছেড়ে রাখতে পারি না।'

'আমার স্বার্থ থাকা স্বাভাবিক। আমার প্রিয় বন্ধুকে আহত করেছে ওরা। আমি ওদের প্রাণহীন দেহ দেখতে চাই।'

'ঠিক আছে। আজ রাতে আমি পঞ্চাশ জন সেনা তৈরি করছি। আপনি কাল সকালেই ওদের নিয়ে জঙ্গলে ঢুকতে পারবেন। এখন আমার প্রাসাদকে আপনার খেদমত করার একটু সুযোগ দিন।'

নিকোলাস এবার নীরব রইলো। পায়াসের কেন যেন নিকোলাসকে পছন্দ হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন তিনি, নিক্সের সাথে নিকোলাসকে দেখা করিয়ে দেওয়া যাক।

উঠে দাঁড়ালেন পায়াস, 'আপনি বসুন। আমি সেনার ব্যবস্থা করে আসি। রাতের খাবার এক সাথে খাওয়া যাবে।'

নিকোলাস একটু হাসলো। পায়াস চলে গেলেন ভেতরে। নিক্সের কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে বাবার সামনে এসে দাঁড়ালো নিক্স। পোশাক আলুথালু। পায়াস চোখ একটু নামিয়ে নিলেন, 'শোনো, স্পার্টার অভিজাত নিকোলাস আমাদের প্রাসাদে এসেছেন। যাও, ওনার সাথে একটু কথা বলে এসো। বুঝতেই পারছো, তিনি সম্মানিত অথিতি।'

'হ্যাঁ, বাবা, সাথে এটাও বুঝতে পারছি, তিনি আমার গলায় ঝুলে পড়তে যাচ্ছেন। নাকি আমি তার গলায় ঝুলে পড়তে যাচ্ছি?'

'আমার সাথে এভাবে কথা বলবে না নিক্স। তোমাকে যে-কোনো রোমান সেনাপতির সাথে আমি বিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমার মেয়ে বলে তোমাকে এ সুযোগ দিচ্ছি। তুমি এই নগরের শাসন সামলাতে পারবে। আমার চোখের সামনে থাকতে পারবে। তুমি গিয়ে তার সাথে দেখা করো। বাবা হিসেবে তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করবো না। এটুকু কথা আমি দিচ্ছি।'

'আচ্ছা, বাবা, আমি যাচ্ছি।'

'পোশাক একটু ঠিক করে নিও। এভাবে নিশ্চয়ই কোনো অভিজাতের সামনে তুমি যাবে না?'

'প্রশ্নই ওঠে না। আমি অবশ্যই সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটা পরে যাবো।'

পায়াস এবার আসলেই সেনার খোঁজে গেলেন। নিক্স ভেতরে চলে এ... বাবা নিজের কথা খুব তাড়াতাড়ি রেখেছেন। এখনই চলে এসেছে তার পাত্র।

নিকোলাস বসে আছে বৈঠকে। একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছে সে। ইভানের কোনো বিশ্বাস নেই। আজ রাতেই জঙ্গলে সেনা নিয়ে যেতে পারলে ভালো হতো। সে আবার কী চাল চেলে ফেলে কে জানে। মারাত্মক ধুরন্ধর ঐ ছেলে। এদিকে মরিসের খবরও নেয়া হয়নি। ক্ষত কি শুকাতে শুরু করেছে?

এত সব ভাবনায় ডুবে ছিল নিকোলাসের মন। পাশের দরজা দিয়ে যখন নিক্স প্রবেশ করলো ঘরে তখন প্রথমে সেদিকে তার চোখ পড়েনি। নিক্স ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলো যুবককে। সেদিনও দেখেছিল। অনুষ্ঠানের দিন। তেমন একটা নজরে না পড়লেও আজ যুবককে ভালো করে দেখার সুযোগ পাওয়া গেছে।

পোশাকের নানা উপাদানের মৃদু ঘর্ষণের শব্দে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য হলো নিকোলাস। সাথে সাথে তার চোখ যেন আটকে গেল সদ্য আগত তরুণীর ওপর। নারী দেহ নিয়ে তার ভাবনা এবং কল্পনা কখনোই উঁচু মাত্রায় ছিল না। নিজেকে সকসময় যোগ্য এবং ক্ষমতাধর করার দিকেই মন ছিল তার। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের মনের সব নিয়ন্ত্রণ তার কাছে যেন তুচ্ছ মনে হতে লাগলো। ঝলমলে পোশাকে নিক্সকে স্বর্গের কোনো দেবী থেকে কম মনে হচ্ছে না।

নিকোলাস উঠে দাঁড়ালো, কী বলবে ভেবে পেলো না, কোনো বড়ো ঘরের কোনো সুন্দরী মেয়ের সামনে এভাবে কখনো আসেনি সে। এবারই প্রথম।

নিকোলাসের বাক্য বন্ধ হয়ে গেছে বুঝতে পারলো নিক্স। সে একটু হেসে উঠলো, 'আপনি দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? বসুন। আপনি আমাদের প্রাসাদের অথিতি। আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি।'

নিকোলাস বসে পড়লো। ইভান, মরিস, জঙ্গল, খোঁজাখুঁজি এসব তার মাথা থেকে উধাও হয়ে গেছে। নিক্স ওর পাশে রাখা আসনেই বসলো, 'আমি নিক্স। গভর্নর পায়াস আমার বাবা।'

এবার কথা বেরোলো নিকোলাসের গলা দিয়ে, 'আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।'

হেসে উঠলো নিক্স, মুক্তা ছড়িয়ে গেল যেন ঘরে, 'আপনি আমার সাথে এভাবে কথা বলছেন কেন? সম্মানে আমরা দুজনে একই। আপনি মহা অভিজাত।'

অপ্রস্তুত হাসলো নিকোলাস, সত্যিটাই বলল সে, তবে শোনালো তোষামোদের মতো, 'আসলে এভাবে আপনার মতো কাউকে এত কাছ থেকে কখনো দেখিনি আমি। তাই কী বলতে হবে বুঝতে পারছি না।'

'আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলছি। আপনি আমার রূপের প্রশংসা করতে পারেন। আপনি নিশ্চয়ই অনেক বুদ্ধিমান এবং আমার এই ঘরে এই বেশে আসার কারণটা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন।'

মাথা নাড়লো নিকোলাস, 'না, আমি ধরতে পারিনি।'

নিক্সা সোজাসুজি তাকালো নিকোলাসের দিকে, 'বাবা আপনার সাথে আ বিয়ের কথা চিন্তা করছেন। আমাদের একজন আরেকজনকে পছন্দ করলেই বি হয়ে যাবে। এখন বলুন, আমাকে কি আপনার পছন্দ হয়েছে?'

'প্রশ্নটা যদি উল্টো হয়?'

'না, সে সুযোগ নেই। আগের প্রশ্নের উত্তর আগে।'

'আপনাকে পছন্দ না করার কোনো কারণ নেই। এত বড়ো মিথ্যে প সবচেয়ে বড়ো তস্করও বলতে পারবে না।'

এমন গুছিয়ে কথা বলতে পেরে নিকোলাস নিজেও অবাক হয়েছে। এই এতদিন তার ভেতরে কোথায় লুকিয়ে ছিল। না-কি অভিভূত মানুষ এসব ভুলভাল ক

নিক্সা এবার একটু এগিয়ে এলো নিকোলাসের দিকে, 'এভাবেই আমাকে প করে ফেললেন? এখনো তো আমরা কাছাকাছি আসিনি। চিনতে পারিনি এক আরেকজনকে। তাহলে কীভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন?'

'কাছাকাছি কীভাবে আসবো। আমরা তো যথেষ্ট কাছেই আছি।'

'না', মাদক হয়ে উঠলো নিক্সের স্বর, 'আরও কাছে আসতে হয়, আরও ক আসা যায়। আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।' আলতো করে নিজের পদ্ম ঠোঁট নিকোল ঠোঁটে রেখে হালকা চাপ দিলো।

নিকোলাস বুঝতে পারলো, সবকিছু তাকে ঐ প্রশিক্ষণ শিবির শে পারেনি। তার সারা দুনিয়া যেন কেঁপে উঠলো। যেন তার শরীরের কোনো নেই, দম বন্ধ করা সেই অনুভূতি, শরীরের শক্তি যেন ঐ হালকা চাপের স্পর্শ নিয়েছে। এই অনুভূতির সাথে একটুও পরিচিত নয় সে। ইচ্ছের সাথে প্রাণপণ করে ঠোঁট সরিয়ে নিলো সে। হাঁফাতে লাগলো ভীষণ বেগে।

'কী হয়েছে আপনার', নিক্সা নিজেও কম অবাক হয়নি। এই পর্যন্ত এই ক অনেকের সাথে অনেক বার করেছে সে। কিন্তু কেউ তো এমন কেঁপে ওঠেনি, কে তো এমন করে নিঃশ্বাসের অভাবে ভোগেনি।

কী হয়েছে এটা নিকোলাসও বুঝতে পারছে না। হাঁফানো একটু বাদেই ক এলো। তারপর সে বুঝতে পারলো, এখনই তার ফুসফুস কিছু একটা চাইছে, ত সেটা বাতাস নয়। নিজের ঠোঁট তার সামনেই ছিল। তরুণীর চুলে হাত দি আকর্ষণ করলো সে। নিক্সা বাঁধা দিলো না। চুম্বনে যেন ফুসফুস বাঁচলো।

নিকোলাস রাতের খাবার সেরে প্রাসাদ থেকে বিদায় নিয়েছে। নিজের ঘ বারান্দায় দাঁড়িয়েছে নিক্সা। তার চোখ কখনো এমন স্বপ্নালু হয়নি। কই, অনে চরম মুহূর্ত সে এই পর্যন্ত অনুভব করেছে। কিন্তু আজকের ঐ ক্ষণিকের চুম্বনে আকর্ষণ ছিল তা কি আগে সে অনুভব করেছে? নিকোলাসের দেহ এভাবে কে কেঁপে উঠেছিল? নিকোলাস কেন এভাবে হাফাচ্ছিল? সেও তো একটু কেঁপেছিল

একেই কি তবে প্রেম বলে?

এরিসের আশা শেষ। কোনো সুদূর অতীতে মহাকালের গর্ভে ডুবে গেছে যে শক্তি সে আবার জাগ্রত হয়ে মানুষের সেবা করবে এই আশা করাই বোধহয় ভুল ছিল। এই ব্যর্থতার পর সেদিন অনেকক্ষণ সবাই অপেক্ষা করেছিল সেখানে। মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে গায়ে জ্বেলে দেওয়া আলো গুলো আস্তে আস্তে নিভে যেতে শুরু করল। ভোরের আভাস দিতে যখন পাহাড়ের পাখিরা নিজেদের গান শুরু করেছে তখন তাদের সম্বিত ফিরেছে। পুরোহিতকে দোষ দিলে হয়তো দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে লাভ কী?

অ্যালেস্টরকে নির্ঘুম রাতের ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেহের চেয়েও শক্তিশালী কণ্ঠস্বরে বলেছেন, 'তোমরা সবাই কি এখন থেকে এখানেই থাকবে না-কি? ভোর তো হয়ে এসেছে। আমরা যে ব্যর্থ হয়েছি তাতে কি এখনো তোমাদের সন্দেহ আছে?'

আসলে তাতে সবারই একটু সন্দেহ ছিল। সবাই আরেকটু অপেক্ষা করতে চেয়েছিল। পুরোহিত যদিও পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে আগেই, তবু সবাই ভেবেছিল, হয়তো সব আচার মানার পরে দেবতা জাগতে সময় নেবেন। সবকিছুই তো আর হুট করে হয় না। ধৈর্য আর আশা বুকে ধরে তারা অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু না, সময় পেরিয়ে গেছে নিজের নিয়মে, দেবতা পাতালের বন্দি দশা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

একে একে সবাই ফেরার পথ ধরতে লাগলো। পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে নামার কাজটা অতো শক্ত নয়। অ্যালেস্টর সবার প্রথমে নেমে এলেন। নিজের রথে ওঠার আগে ঘোষণা করলেন, 'এবার তো আমাদের হাতে আর একটাই পথ খোলা আছে। যতদিন কাজে না নেমে কেবল ভেবে যাবো, ততদিন কিছুই হবে না। একবার নেমে পড়লে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। তখন নতুন নতুন উপায় বেরিয়ে পড়বে। তাই এখন থেকে আমার পথেই চলবে এই দল।'

সবাই সায় দিলো। এত বড়ো ব্যর্থতার পরেও যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে অ্যালেস্টর কথাগুলো বললেন তা সবাইকে কমবেশি অবাক করেছে। একটু হলেও উদ্যম ছড়িয়ে পড়েছে সবার মাঝে। নগরে যার যার বাড়িতে চলে গেলেন তারা অতি সাবধানে। এরই মধ্যে খবর চলে এসেছে তাদের কাছে। পায়াস না-কি অভিজাতদের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছেন। গুপ্তচরদের গতিবিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য এসবে তারা সেই প্রথম থেকেই অভ্যস্ত। গুপ্তচরদের চোখ এড়িয়েই এতদিন এতদূর পথ অতিক্রম করেছেন সবাই।

বৃদ্ধ অভিজাত অনেক কষ্ট সহ্য করেই এসেছিলেন দলের সাথে। সারারাতের ক্লান্তি আর হতাশা তার দেহে ভালো ভাবেই জেঁকে বসেছে। অ্যালেস্টরের রথে

চড়েছেন তিনি, 'আপনার মনে কী চলছে তা হয়তো আমি জানি মহামান্য অ্যালেস্টর। কিন্তু আত্মহননের সেই পথ বেছে নেয়া কি উচিত হবে?'

'আপনি এখনো আমার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে চাচ্ছেন? আমি তো শুরু থেকেই এই পথে চলতে আগ্রহী। আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা একটা উদ্দেশ্য রেখে যাবো, সেটা ঠিক। একটা আদর্শ রেখে যাবো, সেটাও ঠিক। কিন্তু জানেন তো, আদর্শ আর উদ্দেশ্য নতুন প্রজন্মকে উদ্বেলিত করতে পারবে না, তাদেরকে উজ্জীবিত করতে পারবে না, যতক্ষণ না একটা বলিদান তাদের সামনে উদাহরণ হিসেবে রাখা হয়। সেই বলিদান দরকার হলে আমিই দেবো।'

'তার মানে আপনি ধরেই নিয়েছেন আপনার পথে শুধু বলিদান দেওয়া হবে, কাজের কাজ মানে সফলতা বলে কিছুই থাকবে না।'

'আমি অতো বোকা নই যে শূন্য সফলতার সম্ভাবনা যুক্ত পথ বেছে নেবো। সফলতা অবশ্যই আসবে। ক্ষণিকের জন্য হলেও আসবে। তবে আমার কথা হচ্ছে পরাজয়েও যেন আমরা জয়ী হই, সেই উপায় করে রেখে যাবো। আমরা সফল হলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম স্বাধীনতা পাবে, আর হেরে গেলে অথবা মারা গেলে আমাদের বলিদান তাদের কাছে আদর্শ হয়ে ধরা দেবে। কিছুতেই আমাদের হারাবার কিছু নেই।'

'আপনার কথার সাথে আজ সকালে একমত না হয়ে আর কোনো উপায় নেই। তবে বুকে সাহসের অভাব অনুভব করছি। মনে হচ্ছে বয়সের দোষ।'

'সাহস তো বয়সের ওপর নির্ভর করে না, তবে আপনার সাহস না থাকলেও চলবে। আপনি থাকবেন এই পরিকল্পনায় কেবল পাকা মাথা হয়ে, আমরা ধরা পড়লেও আপনাকে কেউ ছুঁতে পারবে না, আপনি নিরাপদ।'

'যুদ্ধ শুরু হবার আগেই আমাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দেবেন?'

'শুধু চিন্তা না করে যুদ্ধ যুদ্ধ করেই আজ আমাদের এই অবস্থা। এই নতুন পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে শুধু বল দিয়ে হবে না, বুদ্ধিও চাই।'

নগরের সামান্য একটু দূরে থাকতেই বৃদ্ধ নেমে পড়লেন রথ থেকে। এখানে তার ঘোড়া লুকিয়ে রাখা আছে। এখান থেকে তিনি একাই যাবেন। রথ চালিয়ে নগরের প্রবেশের দিকে এগিয়ে গেলেন অ্যালেস্টর। এখন তাকে দেখলে সবাই ভাববে, তিনি হয়তো সকালের হাওয়া খাওয়া শেষ করে ফিরে এসেছেন।

বাড়ি ফিরে অ্যালেস্টরের মন শান্ত হলো না। এখন সবাই তার ওপর ভরসা করছে। শুধু তাই নয়, সেটা আগেও করতো, এখন সবাই তাকে মান্য করছে। এই সুযোগটা নিতে হবে। তিনি আরও আগে থেকেই জানতেন, সসস্ত্র বিপ্লব ছাড়া এই পরিস্থিতিতে কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। এতদিন সহজ পথের খোঁজে ছিল সবাই। এবার নামতে হবে চরম পন্থায়।

ডোরা তার ঘরে এলো, 'আপনার কাল রাতের শিকার কেমন হলো?'

আনমনে জবাব দিলেন অ্যালেস্টর, 'ভালোই হয়েছে?'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। একটা খরগোশও মারতে পারেননি।'

'এই বয়সে শিকারে প্রাণীর পেছনে ছুটলেই শিকার পূর্ণ হয়ে যায় রে। আলাদা করে আর প্রাণী হত্যা করতে হয় না।'

'আচ্ছা হয়েছে। এখন বিশ্রাম করবেন তো? কিছু খেয়ে ঘুমালে ভালো হতো না?'

'হ্যাঁ, খুব ক্ষিধে পেয়েছে। এখন খাবো। তবে খেয়ে ঘুমাবো না। একটু বেরোতে হবে।'

'আবার কোথায় যাবেন?'

'কাজ আছে। ইনোন কোথায়?'

'ঘুমাচ্ছিলেন। এখন উঠেছেন কিনা জানি না।'

'ওর শরীর কি ভালো নেই না-কি? কেমন কেমন যেন হয়ে গেছে ইদানীং। বিয়ের কথা বলাতে মনে হয় একটু চিন্তায় পড়েছে।' আজকে মেয়ের বিয়ে নিয়ে তেমন একটা উচ্ছ্বাস নেই অ্যালেস্টরের গলায়। সামনে কঠিন কাজ। মেয়ের বিয়ে দেওয়া এখন আনন্দপূর্ণ দায়িত্ব থেকে অবশ্য কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

ইনোনের মনের অবস্থা কী, আর তার ফলে তার শরীরে কী কী প্রভাব পড়েছে তার সবই জানে ডোরা, তবে সেগুলো বলার এখন আর কোনো মানে নেই, 'আমার মনে হয় ওসব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে আপনাকে অনেক ভালবাসেন ইনোন। ছেড়ে যাবার চিন্তায় একটু কাবু হয়ে পড়েছেন।'

অ্যালেস্টর আর কোনো কথা বললেন না। একটু পরে চলে গেলেন খাবার ঘরে। খাবার সেরে তিনি যখন বেরিয়ে গেলেন ইনোন তখনো ঘুমাচ্ছে।

সারারাত নির্ঘুম থেকে আবার রাস্তায় নেমে এলেন মহা অভিজাত অ্যালেস্টর। দেরী করার আর উপায় নেই। আজকেই সভা ডেকেছেন তিনি। তার আগে কিছু কাজ শেষ করতে হবে। তার নিজেরও কিছু গুছিয়ে নেয়া দরকার। এই পথে ভুল করা চলবে না। এটা তো আর কোনো পূজা নয়। এখানে ব্যর্থ হলে নির্বংশ হতে হবে।

নগরের রাস্তা পেরিয়ে একটা জংলা মতো জায়গায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। এখানে কেউ তেমন আসে না। তবু চারপাশে নজর বুলিয়ে এনে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় খুলে ফেললেন ঝোপের ভেতরে লুকানো একটা কাঠের পাল্লা। এখান দিয়ে সুরঙ্গে প্রবেশ করা যায়। তিনি ঢুকেই ভেতর থেকে লাগিয়ে দিলেন পাল্লাটা।

এই সুরঙ্গ চলে গেছে একটা গোপন ঘরে। এখানেই তাদের আজকের সভা বসবে। সবাই নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেছে খাবার আর বিশ্রামের জন্য। তিনি শুধু খেয়েই চলে এসেছেন। অনেকক্ষণ অন্ধকারে চোখ সইয়ে অবশেষে সেই ঘরে এসে দাঁড়ালেন। ঘরটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কম নয়, তবে বন্ধ থাকার কারণে একটু

স্যাঁতসেঁতে। বাতাস খেলার জায়গাটা বন্ধ আছে। সেটা খুলে দিতেই ঘরের গুমোট ভাবটা একটু কমতে শুরু করেছে।

আর সবার আসতে বেশ দেরি আছে। নিজের জায়গায় বসে মাটিতে আঁকিবুঁকি কাটতে লাগলেন তিনি। এভাবে চিন্তা করলে মাথা খোলে। নিজের মাথার ওপর চেপে বসা কন্যাদায়, এই জীবনের বাকি সব দেনা সবকিছু আস্তে আস্তে মুছে যেতে লাগলো তার মাথা থেকে। কেবল কীভাবে স্পার্টার আম নাগরিকেরা কীভাবে স্পার্টার ক্ষমতায় আসিন হবে এই চিন্তাই তার মাথায় উঁকি দিচ্ছে।

চিন্তায় হারিয়ে যেতে সময়ের বোধও কমে গেল তার। যখন দুয়েকজন করে লোকজন আসতে শুরু করলো তখন তিনি বুঝতে পারলেন সময় হয়ে গেছে। তিনি এখন নিশ্চিত। তার পরিকল্পনাও গোছানো হয়েছে।

কয়েকজন এসে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, 'জানো, নগরে তো ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে।'

অ্যালেস্টর যেই কাজ শুরু করতে চাচ্ছেন তাতে অবশ্যই পরিস্থিতি শান্ত থাকতে হবে। কোনো রকমের ঘোলাটে পরিস্থিতি তার কাজকেও ঘেঁটে দিতে পারে। তিনি মন্তব্যকারীর দিকে তাকালেন, 'কী ঝামেলা হয়েছে কাল নগরে?'

'আমরা তো কাল সারাদিন এরিসের পূজার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম নইলে কালকেই ঘটনা জানতে পারতাম। আমরা ঐদিন এক ছেলেকে নিয়ে কথা বলেছিলাম না। যার প্রথম শ্রেণির অভিজাত হবার কথা ছিল, কিন্তু ভাগ্যের ফেরে হয়ে গেছে তৃতীয় শ্রেণির অভিজাত। সেই ছেলেই মারাত্মক কাণ্ড ঘটিয়েছে।'

'এত কথা বলছো কেন? কী কাণ্ড ঘটিয়েছে সেটা বললেই তো পারো।'

অ্যালেস্টরের মৃদু ভৎসনায় নিজের রংচঙ মাখানোয় একটু বিরাম দিলো কথক, 'সে তিনজন সৈনিক হত্যা করেছে। সামান্য কারণে। শুনেছি সে গিয়েছিল এক দ্বিতীয় শ্রেণির অভিজাতের কাছে কাজ খুঁজতে। সেখানে কি একটা ঝামেলা হওয়াতে সে আর তার সঙ্গী তিনজন সৈনিক হত্যা করেছে। সেখানে আরও পনেরো জনের মতো প্রহরী ছিল। কিন্তু ওদের দুজনকে আটকানোর সাহস করেনি।'

'তার মানে ওরা এখনো ধরা পড়েনি। পলাতক আছে?' আরেকজন মন্তব্য করে।

'হ্যাঁ, ধরা পড়েনি। কিন্তু ঘটনা তো কেবল এখানেই শেষ নয়। সেখানে আরও দুজন লোক ছিল। একজন এই সেদিন মহা অভিজাত হয়েছে, আরেকজন প্র শ্রেণির অভিজাত।'

এবার অ্যালেস্টর অবাক না হয়ে পারলেন না, তিনি নিজেও একজন মহা অভিজাত, 'ঐ দুজন সেখানে থাকা অবস্থাতেও ঐ দুজনকে চলে যেতে দিলো? এটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেউই বুঝতে পারছে না মহামান্য অ্যালেস্টর। মহা অভিজাতের নাম হচ্ছে নিকোলাস।'

এটা অনেকেই জানে বলে সায় দিলো।

'সেই নিকোলাসের বন্ধু প্রথম শ্রেণির অভিজাত মরিস। আর সেই মরিসকেও আহত করেছে ওরা। আমি এক সৈনিকের সাথে গোপনে কথা বলেছি। ঐ ইভান নামের ছেলেটা না-কি মারাত্মক যোদ্ধা। তার সামনে ঐ মরিস টিকতেই পারেনি। তলোয়ারের গুঁতো খেয়ে পড়ে গেছে। নিকোলাস মহা অভিজাত হওয়া সত্ত্বেও নাকি যুদ্ধ করতে আগে বাড়েনি। অবশ্য সে নিরস্ত্র ছিল।'

এবার সেই বৃদ্ধ অভিজাত কথা বলে উঠলেন, 'মহামান্য অ্যালেস্টর, আমি আপনাকে সেদিন এই ছেলের কথাই বলেছিলাম। সে আমাদের জন্য তুরুপের তাশ হতে পারতো।'

'এখন আর এসব নিয়ে ভাবছি না। একজন পলাতক লোককে আমাদের দলে টানার কোনো মানেই নেই। আর আমরা যারা আছি তারাই এই কাজের জন্য উপযুক্ত। এখন আমাদের ঠিক করতে হবে, আমরা কি হাতে রক্ত মাখার জন্য প্রস্তুত কি না?'

সবাই একযোগে সায় দিলো, 'জি, প্রস্তুত।'

'আমি জানি। স্পার্টার সেনারা কখনো রক্ত ভয় পায় না। এখন আমাদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে একটা সুন্দর পরিকল্পনা। সেটা আমি এর মধ্যেই গুছিয়ে এনেছি। আমরা আগেই তালিকা করেছিলাম, কোন অভিজাতরা রোমানদের পা চাটে। সেই অভিজাতদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার এই নগরের মাটিতে নেই। তাদেরকে হত্যা করতে হবে।'

এতে সবাই সায় দিতে পারলো না। নিজেদের লোকদের হত্যা করে লাভ কী। এমনটাই কানাকানি হতে লাগলো।

বৃদ্ধ অভিজাত নিজের মত দিলেন, 'ওদের কথা ঠিকই আছে। শেষে দেখা যাবে আমরা নগরের বেশির ভাগ মানুষকেই নানাভাবে মেরে ফেলেছি। অভিজাতরা আসলে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নয়। স্পার্টার সেনারাও যথেষ্ট স্বদেশপ্রেমী। আমার তাই মনে হয়।'

অ্যালেস্টর রীতিমতো রেগে উঠলেন, 'তাহলে ওরা কেন ঐ রোমান সম্রাটের হয়ে কাজ করে? কেন রোমান গভর্নরের কথায় ওঠে আর বসে? যার নিজের আত্মমর্যাদা নেই সে কীভাবে স্বদেশের মর্যাদা রক্ষা করবে?'

'হয়তো তারা এই চিন্তাই মাথা থেকে দূর করে দিয়েছে। আমাদেরকে তাদের সঠিক চিন্তা করার একটা সুযোগ তো দিতে হবে। তারপরও যদি তারা বেঈমানি করে তখন তারা শাস্তি পাবে। তারা এখন হয়তো বিদেশের শাসনকেই নিজেদের শাসন বলে মনে করছে। আমি এমন অনেককেই জানি যে রোমানদের হয়ে লড়াই করে, কর আদায় করে এমনকি গুপ্তচরের কাজও করে, কিন্তু রোমানদের প্রতি মন থেকে অনুগত নয়। তারা হয় জীবিকার তাগিদে নতুবা ভয়ে এই পথ বেছে নিয়েছে।'

অ্যালেস্টর মাথা ঠান্ডা করতে বাধ্য হলেন, 'তার মানে প্রথমে ওদের মাথা থেকে এই ভয় দূর করতে হবে।'

'হ্যাঁ। সেই কাজটাই করতে হবে আমাদের।'

'আমি আপনাদের অনেক আগেই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। বেশ কিছু সময় এখানে বসে থেকে আমাদের পরিকল্পনা সাজিয়েছি। আমরা শুরুতেই যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবো না। তাহলে রোমানরা আমাদের লোক দিয়েই আমাদের দমন করার চেষ্টা করবে। এখন আমরা দস্যু বৃত্তি বেছে নেবো। আর এটাই হবে সঠিক উপায়।'

'দস্যু বৃত্তি!' উত্তেজিত হয়ে উঠলো দল।

'হ্যাঁ, রোমানদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করার চেয়ে ওদেরকে চেপে ধর‍তে হবে। ওদের দম আটকে এলেই ওরা ভাবতে বাধ্য হবে। তখন আমাদে‍র লোকেরাও বুঝতে পারবে রোমানরা সর্বশক্তিমান নয়, ওদেরকে সহজেই দমানো যায়। তখন তারা আমাদের দলে যোগ দেবে।'

'আমরা আসলে কী কী করবো?'

'আমরা রোমানদের কর লুট করবো, ওদের সেনাদের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা করবো, ওদের খাদ্য কেড়ে নেবো, অস্ত্র কেড়ে নেবো। একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করবো ওদের মনে। আমাদের জন্য এসব কাজ করা কোনো ব্যাপারই নয়।'

বৃদ্ধ অভিজাত মাথা নাড়লেন, 'নাহ, এতে কোনো লাভ হবে না। এসব করলে রোমানরা বুঝে যাবে এগুলো সাধারণ ডাকাতি না। কেউ রোমান সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দিতে চাইছে। তারা এটা সহ্য করবে না। অনেক সেনা পাঠাবে। তখন হবে হিতে বিপরীত। আমাদের নাগরিকেরা এখন ফ্রি সিটির সুবিধা পাচ্ছে, তখন পাবে না। আরও অত্যাচার, চাপ সহ্য করতে হবে আমাদের জনগণের। আমরা রোমানদের সাবধান হবার সুযোগ দেবো না। আঘাত হানতে হবে ক্ষিপ্রতার সাথে. মোক্ষম স্থানে করতে হবে সেই আঘাত।'

কথাগুলো বেশ লাগলো অ্যালেস্টরের, 'বাহ, এই কথাগুলোই তো আমি বলতে চাইছিলাম নিজেকে। ঠিক। ওসব ডাকাতি করে কোনো লাভ হবে না।

তাতে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে বিরূপ হবে। আমাদেরকে হানতে হবে মোক্ষম আঘাত। এক রাতেই স্পার্টার শাসনভার নিয়ে নেবো আমাদের হাতে।'

একজন একটু কম বয়সি সৈনিক জিজ্ঞেস করে, 'সেটা হয়তো আমরা অতর্কিত হামলা করে নগরের দখল নিতেই পারি। কিন্তু সেই খবর যখন রোমানদের কাছে যাবে তখন তো চুপ করে বসে থাকবে না। সেনা পাঠাবে। অতো বড়ো সেনার সাথে যুদ্ধ করবো কী করে?'

অ্যালেস্টর গম্ভীর গলায় বললেন, 'স্পার্টাকাস কীভাবে লড়েছিল?'

'সমস্ত দাসেরা তার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। আমাদের বাহিনী এত বড়ো নয়।'

'সমস্ত গ্রীস আমাদের সাথে যোগ দেবে। সব ফ্রি সিটির অধিপতি আর স্বাধীনতাকামীরা সঙ্গ দেবে আমাদের।'

'কিন্তু তাহলেও কি রোমানদের সাথে পারা যাবে? স্পার্টাকাস কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, কারণ শুধু সাহস থাকলেই হয় না, যোগ্যতাও থাকতে হয়। সে যোদ্ধা ছিল, কিন্তু তার বাহিনীতে যোদ্ধা ছিল কজন? দাসেরা যুদ্ধ করেই রোমানদের হিসেব আরেকটু হলেই নিকেশ করে দিচ্ছিল। আর গ্রীক যোদ্ধারা কি করতে পারে সেটা তো তোমরা জানোই। তিনশোর ঘটনা কি ভুলে গেছো। একবার আমরা স্পার্টার অধিকার নিয়ে রোমানদের তাড়িয়ে দিলে আর কিছুতেই রোমানদের এই নগরে প্রবেশ করতে দেবো না। আমাদের সব সৈনিক তৈরি করো। অস্ত্রের যোগান নিশ্চিত করো।'

বৃদ্ধ অভিজাত এতক্ষণে কথা বললেন, 'সব কাজ করার লোক আছে আমাদের। কিন্তু আসল কাজটা কে করবে?'

দৃঢ় হয়ে উঠলো অ্যালেস্টরের গলা, 'এই দায়িত্ব কাউকেই দেবো না। কাজটা আমিই করবো। নিজ হাতে।'

'আপনি কি নিশ্চিত। বয়সে কম কাউকে দায়িত্ব দিলে হতো না?'

সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন অ্যালেস্টর, 'না।' শেষ কথাটা বলার সময় কণ্ঠ আরও দৃঢ় হয়ে উঠলো তার, 'গভর্নর পায়াসকে আমার হাতেই মরতে হবে।'

আচ্ছা, ভাগ্য কি কখনো মানুষের পিছু ছাড়ে? প্রশ্নটাই ভুল, ভাগ্য কখনোই তার পিছে থাকে না। থাকে তার কপালে, একেবারে খোদাই করা। যে যাই করুক না কেন, সেটা একসময় নিজের রূপ প্রকাশ করে। মানুষের জন্য ভাগ্য পরিবর্তন করা জরুরি, না-কি নিজের ভাগ্যকে মেনে নেয়াই উচিত, সেই আলোচনা তর্কসাপেক্ষ।

বসে বসে এসব আলোচনাই করছে ওরিয়ন। তার অবশ্য কখনোই এসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করার দরকার অথবা অবসর ছিল না। এখন কিছু করার নেই তাই এসব করছে। এমন স্বাধীনতা তারা দুজনে কি কখনো পেয়েছে? না। শিবিরে থাকার সময় সর্বদা নানা রকম প্রশিক্ষণ আর চর্চার কঠিন নিয়মে বাঁধা থাকতে হতো তাদের। স্বাধীনতা শব্দের চিন্তাও কখনো তাদের মাথায় আসেনি। তারপর এলো সেই ক্ষণ। তারা তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করলো। যখন তাদের সময় এলো সমাজে সম্মান নিয়ে নিজের স্বাধীন ইচ্ছেমতো বাঁচার ঠিক তখনই ভাগ্যের আঘাত। তারা হয়ে উঠলো তৃতীয় শ্রেণির অভিজাত। সবার, এমনকি হেলটদের চোখেও তারা হয়ে উঠলো উপহাসের বস্তু। এই বর্তমান অবস্থাটা বেশ ভালো। শিবিরের ঝামেলা নেই, কেউ উপহাস অথবা করুণার দৃষ্টিতেও দেখছে না। নিজের মতো করে থাকা যাচ্ছে। এইতো পূর্ণ স্বাধীনতা।

ইভান তার থেকে একটু তফাতে বসে আছে। সেদিন এক গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে আরেক গাছের ডাল ধরে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে ঐ চিহ্ন অনুসরণকারীকে ভালোই ধোঁকা দেওয়া গেছে। তবে তাতে একটা ক্ষতিও হয়েছে। বাম পা একটু মচকে গেছে তার। এমন আঘাত অবশ্য শিবিরে অনেক পেয়েছে, আর কীভাবে এসব আঘাত সামলে চিকিৎসা করতে হয়, তা তার ভালোই জানা আছে। সেই কাজই এখন করছে সে। এখন পা প্রায় সেরে গেছে।

ইভানের মনে অবশ্য স্বাধীনতা নিয়ে কোনো চিন্তা আসছে না। যে প্রেমে পড়েছে সে কীভাবে স্বাধীন হয়? তার তো এই অরণ্য একটুও ভালো লাগছে না। মনে পড়ে আছে নগরে। যে নগরে তার জন্য একসাথে অপেক্ষা করে আছে বিভীষিকা আর ইনোন।

তবে প্রেমিকেরও ক্ষিধে লাগে, চিন্তিত ওরিয়নের দিকে হেঁকে উঠলো ইভান, 'এভাবে বসে কী চিন্তা করছ? তুমি তো দেখছি এথেন্সের দার্শনিকদেরও হার মানাবে। পেটে কি এখনো টান পড়েনি? কিছু একটা মেরে টেরে আনো।'

ইভানের কথা ওরিয়নের কানে ঢুকতেই সে বুঝতে পারলো, এসব স্বাধীনতার চিন্তার কোনো মূল্য নেই, যতক্ষণ পেটে ক্ষিধের তাড়না আছে, ততক্ষণ কেউই স্বাধীন না। আর মানুষের পেটের ক্ষিধে একেবারে দূর হয় একটা সময়। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সেই সময়েই মানুষ আসলে পূর্ণ স্বাধীনতা পায়।

ঐ ঘটনার পরে দশ দিন পেরিয়ে গেছে। এই দশ দিন সাধারণের জন্য এই ঘন জঙ্গলে বাস করা অসম্ভব ছিল, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে তা এই দুজনেরই বেশ ভালো করে জানা। ওরিয়ন শিকার করে আনে, আর দুজনে খুব সাবধানে আগুন জ্বেলে তা রান্না করে খায়।

তবে টানা মাংস আর কতদিন খাওয়া যায়, ওরিয়ন উঠে দাঁড়ালো, তার পুরো দেহে বিরক্তি, 'আমি আর মাংস খেতে পারবো না। এভাবে বাঁচা যায় না-কি? শস্য ছাড়া আর টিকে থাকা সম্ভব না।'

'শস্য কোথায় পাবে? বড়োজোর ফল খেতে পারো।'

'ফলের গাছও এদিকে তেমন একটা নেই। আর অচেনা ফল খেয়ে দেখা যাবে দুজনেই মরে পড়ে আছি।'

ইভানের মাথায় মতলব খেলে গেল, মুখে দেখা দিলো ধূর্ত হাসি, ' শোনো, আসলেই তো আমরা আর কতদিন এমন করে মাংস খেয়ে কাটাবো। আমাদের শস্য দরকার। এক কাজ করলেই পারি। শস্য নিয়ে আসি নগর থেকে। নগরের পাশের গ্রামে অনেক বাড়ি আছে, গোলা আছে। রাতে একটা গোলা থেকে কিছু শস্য নিয়ে এলেই চলবে।'

ওরিয়ন বিশ্বাস করতে পারছে না, 'তুমি এই কথা বলছো? এটা তো চুরি। তুমি স্পার্টার একজন নৈতিক সেনা হয়ে চুরি কীভাবে করতে পারো?'

'আমরা এখন আর স্পার্টার সৈনিক নই। আমাদেরকে এরই মধ্যে নিশ্চয়ই পলাতক ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের মাথার ওপর ঘোষণা করা হয়েছে পুরস্কার। যার ঘোড়াই নেই সে আর লাগামের চিন্তা করে কী করবে? আমরা এখন খুনের আসামী, এখন চুরিতে নৈতিক বাঁধার কথা চিন্তা করার কোনো মানে নেই।'

'শোনো ইভান, আমাকে এত বোকা মনে কোরো না। তুমি শস্যের জন্য নগরের দিকে যেতে চাইছো না। তুমি যেতে যাও ইনোনের জন্য। কিন্তু সেটা আমাদের দুজনের জন্যই বিপজ্জনক হতে পারে।'

'তুমি কি ভয় পাচ্ছো না-কি? ক্রিস্টেয়ারের সেনারা আবার কবে থেকে ভয় পাওয়া শুরু করলো? আমার মনে হয় তোমার তৃতীয় শ্রেণির অভিজাত হওয়াই ঠিক আছে। তুমি জঙ্গলেই থাকো। আমি এখন নগরের দিকে রওনা দিলাম। আসার সময় তোমার জন্য শস্য নিয়ে আসবো।'

'তুমি ভালো করেই জানো ইভান আমি ভয় পাইনি। আর এভাবে তোমাকে নগরের দিকে যেতে দিয়ে আমি এখানে বসে থাকবো না।'

'সেটাই ভাবছিলাম। তুমি আমার সাথে যাবে। কখন রওনা দেওয়া যায় বলো তো।'

'আগে কিছু খেয়ে নিই। মাংস খেতে এখন খারাপ লাগলেও শরীরে শক্তির জন্য মাংসের বিকল্প নেই। নগরে গেলে আমাদের প্রচুর শক্তির দরকার হতে

পারে। আমি কিছু একটা নিয়ে আসছি। তুমি চুপ করে বসে থাকো। কোনো আওয়াজ নয়।'

ওরিয়ন প্রথমে কম পরিশ্রমের দিকে গেল। কিছু ফাঁদ পেতে রেখেছে কাছাকাছি কিছু জায়গায়। শিকারের আর সব কৌশলের মতো ফাঁদ পাততেও সিদ্ধহস্ত। তার ফাঁদে ধরা পড়ার আগে পশুপাখি কিছুই টের পায় না।

প্রথম দুটো ফাঁদে কিছু না পড়লেও তিন নম্বর ফাঁদের কাছে গিয়েই মুখে হাসি চলে এলো তার। বেশ বড়োসড়ো একটা বন্য ইঁদুর ধরা পড়েছে সেই ফাঁদে। এমনিতে নগরের ভদ্র লোকেরা এই মাংস খায় না। নাক সিটকায়। সেও হয়তো সিটকাতো, কিন্তু ভদ্র লোকদের সেই ধারণা সম্পর্কে জানার আগেই এই ইঁদুরের মাংসের স্বাদ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল। ঠিকমতো পোড়াতে পারলে অসাধারণ স্বাদ হয়। ইভানেরও সমস্যা নেই। তার সাথে এই মাংস সেও আগে খেয়েছে।

ছোটো ছুরি হলে সুবিধা হতো। তবে সেই সব অস্ত্র কোনটাই এখন সাথে নেই। আছে কেবল ঐ দ্বিতীয় শ্রেণির অভিজাতের বাড়ি থেকে আসার সময় নিয়ে আসা একটা তলোয়ার। সেটাকেই ধার দিয়ে দিয়ে উপযুক্ত করে রাখা আছে। এক খোঁচায় এই যাত্রা ইঁদুরের ধড়ফড়ানি বন্ধ হয়ে গেল। দক্ষ হাতে চামড়া ছাড়াতে বেশি সময় লাগলো না।

ওদিকে ইভান আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করে বসে আছে। ওরিয়ন ইঁদুর হাতে ঝুলিয়ে উপস্থিত হলো। ইভান হেসে উঠলো, 'বাহ, বেশ ভালো খাবার পাওয়া গেছে দেখছি। তা নিজের বংশের কাউকে মারতে তোমার খারাপ লাগলো না?'

ওরিয়নও হাসলও, 'আমার বংশ বলছো কেন? মারা যাবার আগে তো দেখলাম দুবার তোমার নাম নিলো।'

পাথরে এক ঘষায় আগুন জ্বলে উঠলো উত্তপ্ত অরণীতে। দেখতে দেখতে জড়ো করা লাকড়িতে ছোটো একটা আগুনের কুণ্ডলী তৈরি হয়ে গেল। দুটো কাঠি পুঁতে তার সাথে আনুভূমিক আরে কাঁঠিতে ইঁদুর বেঁধে দেওয়া হলো পোড়ানোর জন্য।

এবার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এই অবসরে ইভান ভাবতে বসলো ইনোনের কথা। যেভাবে সেদিন শেষ দেখা, শেষ বিদায় জাতীয় কথা বলে এসেছে তাতে ইনোন কি কখনো তার অপেক্ষা করবে? করার কথা না, তবে ইভানের মন হয় করবে। তার মনের যে অবস্থা তার সিকি ভাগও কি ইনোনের মনে নেই।

ওরিয়ন পরীক্ষা করলো পুড়তে থাকা মাংস, 'আর অল্প হয়ে এসেছে। জমিয়ে খাওয়া হবে আজকে।'

ঠিক তখনই ঠোঁটের কাছে আঙুল নিয়ে এলো ইভান, গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে ফেললো, 'কোনো কথা বলবে না। আমার মনে হচ্ছে আমরা এখানে একা নই।'

ওরিয়নের শিকারি কান ব্যাপারটা আরও আগেই ধরে ফেলার কথা, কিন্তু ইঁদুরের মাংসের আসন্ন চেখে দেখার উত্তেজনা তাকে একটু অসাবধান করে দিয়েছিল। ইভানের কথায় মনোযোগ ফিরে আসতেই সেও বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। ওদের চার পাশে বেশ কিছু মৃদু নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে। সেগুলো কোনো বন্য প্রাণী করছে না। করছে মানুষ। একমাত্র মানুষই পারে এমন ভাবে প্রকৃতির ছন্দ কেটে দিতে।

চোখে চোখে কথা হলো দুজনের। অস্ত্র হাতে তুলে নিলো ওরা। ইভান ইশারা করতেই দুজনের শরীর এক সাথে নড়ে উঠলো। তলোয়ারের এক আঘাতে সামনে জ্বলতে থাকা আগুনের কুণ্ডলী ভেঙ্গে দিলো ইভান। ওরিয়ন কাছে থাকা ঝোপের আড়ালে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঠিক এক পল পরেই ওদের অবস্থানের দিকে ছুটে এলো বেশ কিছু বর্শা। একটু আগে ছুটে এলে ওরা মোরব্বা হয়ে যেতো।

আলো আঁধারির খেলা শুরু হয়ে গেল এবার। বেশ কিছু সৈনিক বেরিয়ে এলো আঁধারের আড়াল থেকে। একটু আগেও ওরা যে সুবিধা পেয়েছিল তা এখন আর নেই। ওরা তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ আলোর দিকে। একেবারে কালো হয়ে গেল এখন চোখের সামনে।

ওরিয়ন ওদিকে ঝোপের সাথে একেবারে মিশে আছে। টানটান হয়ে আছে তার সবগুলো স্নায়ু। এতদিন ধরে যত্ন করে শেখানো শিক্ষকদের যত্ন বৃথা যায়নি। এই মুহূর্তে তার মাথায় কোনো চিন্তা নেই, নগরে যাবার তাড়া নেই, ইঁদুরের মাংসের স্বাদ পাবার আশা নেই, আছে কেবল সামনে দাঁড়ানো কিছু সৈন্য। তাদের দুজনের জন্য যারা আততায়ী। তলোয়ারের হাতলে শক্ত হয়ে চেপে বসলো তার হাত।

ইভান ওদিকে সৈন্যদের সংখ্যা আর অবস্থান নির্ণয় করে ফেলেছে। ক্রিস্টেয়ারের সেনারা মারাত্মক এটা এই সেনারা জানে কিন্তু কতটুকু তা সম্পর্কে এদের কোনো ধারনাই নেই। মনে হয় ওদের খোঁজে আসা কোনো সেনা এরা। বাহবা অথবা পুরস্কারের লোভে এসেছে। এমন কাউকে অন্তত নিকোলাস ওদেরকে মারতে অথবা ধরতে পাঠাবে না।

না, সময় হয়ে গেছে। আর দেরি করে লাভ নেই। দুটো গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ইভান। অন্ধকারে দেখার একটা বিশেষ ক্ষমতার প্রশিক্ষণ দেওয়া ওদের। একেবারে ছোটোবেলা থেকে। ওদেরকে বেশির ভাগ কাজই করতে হয় রাতে। তীক্ষ্ণ একটা শব্দ গলায় তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে।

থতমত খেয়ে গেল সেনারা। ওরা ভেবেছিল, দুজন লোক ওদের এতজনকে দেখে লুকিয়ে পড়েছে, ওদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু বিধি পুরাই বাম, ওরা দুজনই হামলা করে বসেছে।

প্রথম আঘাত করলো ইভান। শরীরের ভেতরে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিলে বের করে আনতে কিছু সময় লাগবে, সেই সময়ে আরেক সৈন্য তার গায়ে তলোয়ার বসিয়ে দিতে পারে। তাই বিদ্ধ করছে না সে কাউকে, শুধু শরীরের মোক্ষম জায়গাগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছে তলোয়ার। সেই সামান্য আড়াআড়ি ছোঁয়াতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে সেনাদের শরীর থেকে। একেবারে শেষ মাথায় দাঁড়ানো দুজন সেনা একবার করে শ্বাস ফেলার আগেই ছয়জন সৈন্যের শেষ নিঃশ্বাস ফেলা সম্পন্ন হলো।

ওদিকে ইভানের তীক্ষ্ণ স্বরের ইশারা বুঝতে পেরেছে ওরিয়নও। ঝোপের মাঝ থেকে উঠে এসেছে সে। উঠেই একজনকে ধাক্কা দিয়ে কুপোকাত করলো, আরেকজনকে আঘাত করলো তলোয়ার দিয়ে। তারপর দেখতে পেলো, তার জন্য খুব বেশি দেহ অবশিষ্ট রাখেনি ইভান। বারোজনের দলটার নয়জন স্থির পড়ে আছে, আরেকজন শুয়ে আছে আহত হয়ে, বাকি দুজন এই অন্ধকারের ভেতরেই দিগবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে পালিয়েছে। এই অন্ধকারে বেচারারা কোনো গর্তে অথবা খাদে গিয়ে না পড়লেই হয়।

ছড়িয়ে দেওয়া আগুনটার কিছু কিছু অংশ এখনো জ্বলছে। সেগুলো আবার জড়ো করলো। আবার কুণ্ডলীর রূপ পেলো আগুন। ওরিয়ন বললো, 'ইঁদুরটা গেল কোথায়?' আশেপাশে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল সে, আবার বসিয়ে দিলো আগুনের ওপর, 'কেবল ধুলো লেগেছে, ওপরের মাংসটা ফেলে দিলেই দিব্যি খাওয়া যাবে।'

ইভান বসলো আহত সেনার পাশে, 'আগুনের তাপে ধুলোবালিও রান্না হয়ে যাবে। ফেলে দেবার দরকার নেই। এমনিতেই খাওয়া হয়ে যাবে।'

ইভানের তলোয়ার স্পর্শ করলো আহত সেনার গলা, ' এবার বলো তো ভাই, তোমরা কারা। আমাদের বিরক্ত করতে কেন এসেছিলে?'

এই জীবনে এত বড়ো বিভীষিকার সামনে কখনো পড়েনি এই সৈনিক। নগরের প্রাসাদে সবসময় নিরাপদ কর্মে রত থাকা সে বুঝতেও পারেনি জীবনে এই অবস্থাতেও পড়তে হতে পারে, গড়গড় করে সব বলে গেল সে, 'দুজন অপরাধী পালিয়ে এসেছিল এই জঙ্গলে। গভর্নর পায়াস তাদেরকে খুঁজতে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা বেশ কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে ঐ দুজনকে খুঁজছিলাম। তারপরে এখানে চলে এলাম।'

'এসে তো পড়েছ, এবার কোথায় যাবে ভাই?' ওরিয়ন জিজ্ঞেস করে।

'আমাকে প্রাণে মারবেন না। ছেড়ে দিন। আমি নগরে চলে যাবো। আর এই জঙ্গলে আসবো না।'

'হ্যাঁ', ইভান মৃদু স্বরে বলল, 'তোমাকে ছেড়ে দেবো। তুমি নিকোলাসকে চেনো?'

মাথা নাড়লো সৈনিক, 'আজ্ঞে।'

'তুমি নগরে গিয়ে তাকে বলবে, আমাদের মধ্যে যা হয়েছে তা একটা ক্ষণিকের দুর্ঘটনা। সবকিছু সে যাতে এখানেই শেষ করে দেয়। আমাদের পিছু যাতে আর কেউ না আসে। নয়তো ওর প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে আমি ওকে হত্যা করবো। যে সুখ ভাগ্যে পেয়েছে সেই সুখ ভালো করে ভোগ করতে বলবে ওকে, বুঝতে পেরেছ?'

'আজ্ঞে।'

'যাও এখন। বাকি দুজনের মতো ছুটে যেও না। মারা পড়বে। আস্তে ধীরে যাও।'

সৈনিককে এই কথা দ্বিতীয় বার বলার প্রয়োজন হলো না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

'কই' ইভান তাড়া দিলো, ' ইঁদুর মনে হচ্ছে রান্না হয়ে গেছে।'

মাংস ছাড়িয়ে এক টুকরো মুখে দিলো ওরিয়ন, 'হ্যাঁ, হয়ে গেছে। আচ্ছা আমাদের এখন এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত নয়? এরা নাকি কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে গেছে। আর কোনো দল যদি এদিকে চলে আসে?'

ইভানও মুখে দিলো এক টুকরো, ' না এখন আর কেউ এদিকে আসবে না। ওরা কয়েকটা দলে ভাগ হয়েছে মানে এক দল জঙ্গলের এক দিকে গেছে। ওদের আশেপাশে এখন কোনো দল নেই। আর এই বাকি তিনজন নগরে যাবার আগে নিজেদের দৌড় থামাবে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

নিশ্চিন্তে ইঁদুরের মাংস খেতে লাগলো দুজনে। কিন্তু আজ রাতে ঈশ্বর তাদের কপালে আরাম লিখে রেখেছেন বলে মনে হচ্ছে না। ইভানের কান আবার খাড়া হয়ে উঠলো, ওরিয়ন কিছু আচ করার চেষ্টা করলো, কিন্তু কানে কিছুই ধরা পড়লো না।

ইভানের স্বর আবার নেমে এলো নিচে, 'আমাদের আশেপাশে আরও কেউ আছে। তবে ওরা জঙ্গলের বাইরের কেউ নয় বলেই মনে হচ্ছে। জঙ্গলে চলাচলের অভ্যাস আছে। এজন্যই প্রায় নিঃশব্দে চলতে পারছে।'

তার কথার সমর্থন দিতেই বিভিন্ন গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো কতগুলো লোক। তাদের পরনে সাধারণ পোশাক হলেও হাতে শস্ত্র প্রকাশ পাচ্ছে। শস্ত্র-সহ ব্যক্তিকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই, এই জ্ঞানটা বেশ ভালোই জানা

আছে ইভান আর ওরিয়নের। দুজনেই আবার নিজেদের তলোয়ার হাতে নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

এই মাত্র আসা লোকগুলোর মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এলো, ভাবে মনে হচ্ছে সেই নেতা, 'বাহ, আমি কাদের দেখছি এখানে। ভুল করে না থাকলে তোমরাই নিশ্চয়ই ইভান আর ওরিয়ন। কয়েকদিন আগে ক্রিস্টেয়ারের সদস্য হিসেবে যারা অশেষ বদনামের ভাগী হয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা এখন ঐ নগরের কাছে পলাতক অপরাধী। আমাদের সাথে যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। আমরা সেই অভিলাষে আসিনি। আর আমরা এত বোকা নই যে, ক্রিস্টেয়ারের দুজন সেনার সাথে সম্মুখ সমরে নামবো।'

ইভানের হাত একটুও শিথিল হলো না, 'তোমরা কারা? এই জঙ্গলে কী করছো এত রাতে?'

নেতা হেসে উঠলো, 'আরে এই জঙ্গল তো আমাদের। আর ঐ দূরের নগর তোমাদের, অভিজাতদের, ভদ্রলোকেদের। এই প্রশ্ন তো আমার তোমাদের করা উচিত। উত্তরটা জানি দেখেই অবশ্য করিনি।'

'কী উত্তর জানো?' ওরিয়ন প্রশ্ন করে এবার।

'জানি, তোমরা এখন আর অভিজাত আর ভদ্রলোক নও। তোমরা এখন আমাদেরই দলে। সভ্য সমাজ থেকে দূরীকৃত দুজন মানুষ।'

'বকবক করতে এই রাতের বেলা হয়তো তোমার ভালো লাগছে, কিন্তু আমাদের লাগছে না।' ইভান সরাসরি প্রশ্ন করলো, 'তোমাদের পরিচয় দাও। আমাদের পরিচয় তো জানোই।'

'আমার নাম কলিন। এবার হয়তো একটু বুঝতে পারলে।'

দুজনেই বুঝতে পেরেছে। এই নাম স্পার্টায় ইদানীং বেশ পরিচিত। এই লোক হেলটদের ভুজুং ভাজুং দিয়ে ভাগিয়ে এনে একটা দল গঠন করেছে। জঙ্গলে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে আর সুযোগ বুঝে ছোটোখাটো কিছু চুরি ডাকাতি করে।

কলিন নিজের তলোয়ার কোমরে খাপে রাখলো, 'আমাকে লোকে স্পার্টাকাসের চেলা বলে ডাকে। অমন লোকের চেলা হতে পারাও অবশ্য সৌভাগ্য। বঞ্চিত মানুষদের জন্য আমার দরজা সবসময় খোলা। আজকে সেনাদের জঙ্গলে কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে কিছু খুঁজতে দেখলাম। ওরা তো আমাদেরকে পেলেও ছেড়ে কথা বলবে না। তাই আমরাই ওদের চোখে চোখে রাখতে লাগলাম। আর তাতেই দেখলাম তোমাদের অবিশ্বাস্য যুদ্ধ। আর সেজন্যই আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছি তোমাদেরকে আমার দলে যোগ দিতে বলার জন্য।'

ইভান হেসে উঠলো, 'আমাদেরকে বলছ হেলটদের দলে যোগ দেবার জন্য?'

'কেন', নিমেষে চোখ জ্বলে উঠলো কলিনের, 'হেলটরা কি এখনো তোমাদের কাছে নিচু জাত। যদি একটু চিন্তা করে দেখো, তাহলে বুঝবে তোমাদের জাতও চলে গেছে। এখন আর তোমাতে আমাতে কোনো পার্থক্য নেই।'

'আচ্ছা, তা মেনে নিচ্ছি।' ওরিয়ন বলে উঠলো, 'এখন কী বলছিলে বলো।'

'আমাদের দলে যোগ দাও। অভিজাতের সম্মান না দিলেও দক্ষ যোদ্ধার সম্মান অবশ্যই দেবো। একটা দলের সাথে থাকলে তোমরাও নিরাপদে থাকবে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে', ইঁদুরের অবশিষ্ট দেহটা নিজের হাতে তুলে নিলো কলিন, 'এরচেয়ে ঢের ভালো খাবার আমার আস্তানায় খেতে পারবে তোমরা।'

ইভান এবার আন্তরিক গলায় বলল, 'কয়েকদিন ধরে এসব খেয়ে মুখ পচে গেছে। এই আমন্ত্রণ ফেলতে পারলাম না। আগে খাওয়াও। তারপর দেখি তোমার দলে যোগ দেওয়া যায় কি না।'

'চলো তাহলে।'

আগুনটা এবার পুরোপুরি নিভিয়ে দিলো ওরিয়ন। তারপর ওদের দুজনকে নিয়ে দলটা চলতে লাগলো আরও গভীর জঙ্গলের দিকে।

জাহাজ থেকে নেমে একটু দূরে এসে দাঁড়ালো রাহু। এখানে কয়েকটা গাছ আছে। সেই গাছের আড়ালে চলে গেল সে। জাহাজটার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। ওকে নামিয়ে দিয়ে আর দেরি করেনি। ওকে নামানোর সময় নোঙ্গর করেনি, তাই সেটা তোলার প্রশ্নও ওঠে না। শুধু লগি দিয়ে জাহাজের মুখ ফিরিয়ে পালের সাহায্যে গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভেতরে চেপে রাখা দমটা বোধহয় এতক্ষণে ছাড়তে পারলো সে। পরিকল্পনা যখন থেকে সাজিয়েছে তখন থেকেই এই দমটা কোথায় যেন আটকে ছিল। নিজের ওপর বিশ্বাস তার প্রথম থেকেই ছিল। কাজটা সফল হয়েছে। অঙ্গদ এখন আছে তার হাতের খাঁচায়। ওরা কেউ কিছু সন্দেহ করেনি। শেষ দিকে কিছু নাবিক বলেছিল, রাহুর কাছে মানচিত্র থাকতে পারে। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল শরিফ। এই মানচিত্র রাহু ঠিকমতো দেখতেই পারেনি, সে এটার অনুলিপিও তৈরি করতে পারবে না। তখনকার জমে থাকা হাসিটা এবার হেসে নিলো সে। ওরা কেউই তো আর জানে না, এই মানচিত্র পুরোটাই তার মাথা থেকে বেরিয়েছে।

জাহাজ চলে যেতে স্বাধীনতার আর বিপদমুক্তির যে অনুভূতি রাহুর মনে বেঁধেছিল এবার পেছনের প্রান্তরের দিকে তাকাতেই সেটা উধাও হয়ে গেল। অতিরিক্ত স্বাধীনতা মানুষকে ভীত করে তোলে। এজন্যই মানুষ কখনো পূর্ণ মুক্ত থাকতে চায় না।

রাহুর পেছনের প্রান্তরে কিছুই নেই। কোনো নড়াচড়া চোখে পড়ছে না। একবারের জন্য সন্দেহ হলো রাহুর। শরিফ আর তাজিম কি তাকে ইচ্ছে করে এমন বিরান জায়গায় নামিয়ে দিয়েছে না-কি। না-কি ওরা যে বলেছে এখান থেকে বেরেনিকে যাওয়া যাবে তা আসলেই যাবে তো?

এই জায়গা তার কাছে অচেনা। এই সমুদ্র দিয়ে আগেও সে বেরিনিকেতে গেছে, মিয়োস হোমোসে গেছে এমনকি আর্সেনিতেও গেছে, কিন্তু সেসবই সমুদ্র পথে। কিন্তু কখনো সমুদ্রের পাড়ে ডাঙ্গায় নামা হয়নি। তাই এদিকের পথ আর লোকজনের চলাচল সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। তবে ঘাবড়ে গেল না সে। অকুলাস ছেড়ে আসার পড়ে জাহাজ কয়েকদিন ধরেই চলেছে। বেরেনিকে বন্দর বেশি দূরে হবার কথা নয়। তবে চলাচলের পথটা খুঁজে পাওয়া জরুরি।

সমুদ্র থেকে একটু ভেতরের দিকে হাঁটতে লাগলো রাহু। কেপ অব হর্ন প্রচুর জন্তু জানোয়ারের জন্য প্রখ্যাত। সেসবের কিছু কিছু যে রাত হয়ে গেলে তাকে

নিজেদের আহারে পরিণত করার জন্য জঙ্গল থেকে এই প্রান্তরে বেরিয়ে আসবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তার আগেই আশ্রয় অথবা লোকজনের সন্ধান করে ফেলতে হবে।

মস্তিষ্ক আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। দুই চোখ অনবরত খুঁজছে পথের চিহ্ন। কিন্তু এই বিরান প্রান্তরে কেউ আসে বলে তো মনে হয় না। তবে একটু পরেই ভুল ভাঙলো তার। শরিফ মিথ্যে কথা বলেনি। প্রান্তরে আরেকটু এগিয়ে যেতেই একটা পথের চিহ্ন দেখতে পেলো। অন্য জায়গার থেকে আলাদা কিছু না। শুধু কয়েকটা পশুতে টানা গাড়ির চাকার দাগ আছে, ঘোড়ার খুরেরও দাগ আছে।

পথ যখন পাওয়া গেছে মানুষও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই পথ ধরে বেরেনিকের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, আবার পথের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে কারো জন্য অপেক্ষাও করা যায়। বেরেনিকের দিকে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো সে। দাঁড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্তে একটু ধৈর্যের দরকার আছে, তাছাড়া একটু আগেই জাহাজ থেকে নেমেছে সে। শরীরে এখনো পর্যাপ্ত শক্তি আছে। একটু এগিয়েই দেখা যাক, সামনে কী আছে।

রাস্তার নিশানা বেশ পাকা। তা ধরেই এগোতে লাগলো সে। বোঝা যাচ্ছে, খুব বড়ো কোনো বণিকের দল এই রাস্তা ব্যবহার করে না, ছোটোখাটো দলই এখান দিয়ে নানা বন্দরে যায়। নানা কথা ভাবতে ভাবতে আর পথের চারপাশ দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে লাগলো সে।

পথের গায়ে যেসব নিশানা দেখা গিয়েছিল, তাতে এই পথকে বহুল ব্যবহৃত বলে মনে হলেও আদতে তা নয়। প্রায় দুপুর পর্যন্ত হাঁটলো সে, কিন্তু কোনো বাহন, মানুষ কিংবা যানের দেখা পেলো না। দুপুরের সূর্য মাথার ওপরে উঠে এসেছে। এবার তার শরীরে একটু শক্তির ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। পেটের মধ্য থেকে সদা জগ্রত পাকযন্ত্র মাঝে মাঝেই সংবাদ পাঠাচ্ছে ক্ষিধের। একটু পরে পা থামতে বাধ্য হলো।

কিছু গাছপালা দেখা গেল পথের পাশে। সেগুলোর লম্বালম্বি ছায়ার নিচে বসে পড়লো সে। জাহাজ থেকে নেমে যাবার সময় তাকে সামান্য কিছু খাবার পানি দিয়ে দিয়েছিল ওরা। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে লাগলো আস্তে আস্তে। মাথায় নানান চিন্তা আসছে। এই গাছের তলাটা রাতের আশ্রয় হিসেবে খুব একটা খারাপ হবে না। তবে দিন আর রাতের হিসেব আলাদা, একই জায়গার চেহারা দিন আর রাতে সম্পূর্ণ দ্বিমুখী ভাব ধারণ করে। তার ওপর রোমানরা এই জায়গার নিরাপত্তা অনেক দিন ধরে নিশ্চিত করলেও আগের ডাকাত দলগুলোর দুই একটা যে এখনো অবশিষ্ট নেই, সেই কথাও রাহু বিশ্বাস করে না।

বসে থাকার সিদ্ধান্ত বদল না করে উপায় নেই। সামনে হাঁটতে শুরু করলো আবার সে। এবার মনে হচ্ছে ভাগ্য একটু সুপ্রসন্ন হবে। একটু সামনে এগোতেই কিছু কোলাহল কানে এলো তার, সেগুলোর বেশির ভাগ মানুষের গলা থেকেই বেরোচ্ছে, কিছু পশুপাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে, সেসবও গৃহপালিত।

তার অনুমান সত্যি হলো। সামনে একটা বণিক দল। এমনি এমনিই যাত্রা পথে থামেনি তারা। একটা বেশ বড়ো আকারের সরাইখানা আছে এখানে। এই দিনে দ্বিতীয়বারের মতো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। দলটার কাছে যাবার আগে অঙ্গদের খাঁচা ভালো করে একবার দেখে নিলো, না বাইরে থেকে অঙ্গদকে দেখা যাচ্ছে না।

রাহু বণিকদলের দিকে ভালো করে খেয়াল করতে করতে এগোতে লাগলো। না, এরা দক্ষিণের কোনো মানুষ নয়, মনে হচ্ছে মিশরীয়, কালোদের কাছ থেকে নানা জিনিস কিনে বন্দরে নিয়ে যাচ্ছে। সওদা সেখানে গিয়েই হবে।

রাহুকে আসতে দেখে কারো মধ্যে তেমন কোনো হেলদোল হলো না। এই চেহারার লোকজন এখন এদিকে হরহামেশাই দেখা যায়। আগের সেই জাতিগত বিশুদ্ধতা ধীরে ধীরে উধাও হতে শুরু করেছে।

তবে কারো হেলদোল না হলেও সরাইখানার মালিক নড়েচড়ে উঠলো। এটা তার ব্যবসা, এই জায়গায় যে আসবে সেই তার লক্ষ্মী। রাহুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলো তাকে, মানুষের ব্যবহার তার সামনে দাঁড়ানো লোকের বেশভূষার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। রাহুর বেশ দেখে নিশ্চিত হলো সরাইয়ের মালিক, 'এসো এদিকে এসে বসো। ভেতরে এখন গরম, এখানে ভালো হাওয়া পাবে।'

রাহু হাসলো, সেই সাথে এটাও বুঝিয়ে দিলো সে এদিকের ভাষা জানে। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

ঘরের ভেতরে যেতে মানা করার কারণ আছে। ঘরে বণিকদলের লোকও আছে। কিছু মেয়ে মানুষের আওয়াজও শোনা গেল। এই সরাই নিরামিষ নয়, মাংস চেখে দেখার ব্যবস্থা আছে বলেই মনে হচ্ছে। রাহুর ওদিকে তেমন নেশা নেই। 'আমাকে পান করার জন্য কিছু দিতে পারেন?'

সরাইয়ের মালিক হাত পেতে ধরলো, রাহু দুটো মুদ্রা রাখলো সেখানে। এখানে ভ্রাম্যমান অপরিচিত লোকদের জন্য এটাই রীতি, আগে ফেলো কড়ি, পরে মাখো তেল।

দুটো মুদ্রা পরীক্ষা করে দেখল সরাই মালিক, 'এবার বলো, পান করার জন্য কী চাও? সাধারণ শরবত চাইলে সাথে কিছু খাবারও পাবে, তবে গলায় জ্বা

ধরানো শরবত চাইলে সাথে আর কোনো খাবার পাবে না। দুটো মুদ্রায় এরচেয়ে বেশি হবে না।'

একটু আগেই খেয়েছে রাহু, অনেকক্ষণ মদ পেটে পড়েনি, 'গলায় জ্বালা ধরানো শরবত নিয়ে আসুন।'

সরাইয়ের মালিক চলে গেল। রাহু একবার তাকালো ঘরের দিকে। ঠা রোদের মধ্যে বসে থেকে শরীরে অস্বস্তি হচ্ছে, সরাই মালিকের কথা অনুযায়ী কোথাও বাতাসের কোনো লক্ষণ নেই। ঘরের ভেতরে গিয়ে বসলে ভালো হতো, কিন্তু থাক, শুধু শুধু ঝামেলার দরকার কী।

মোটামুটি বড়ো পাত্রেই এলো সেই শরবত। নিজের দুটো মুদ্রা খরচের দুঃখ সাথে সাথে ভুলে গেল সে। বেশ সময় নিয়ে শেষ করলো পাত্র। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই বসে রইলো। সন্ধ্যার বাতাস গায়ে লাগতেই তার দিকে আবার এগিয়ে এলো সরাইয়ের মালিক, 'তুমি তো দেখছি এখানেই আছো এখনো। তার মানে রাতে থাকবে। আগেই বলে দিচ্ছি ঘরের ভেতরে জায়গা নেই। তোমাকে থাকতে হবে এখানে। এখানে থাকার খরচ বেশ কম, এক মুদ্রা দিলেই হবে। সাথে রাতের খাবারের মুদ্রাও দিয়ে দাও।

খেয়েদেয়ে খোলা আকাশের নিচে অঙ্গদের খাঁচা নিয়ে শুয়ে পড়লো সে। অঙ্গদকে কৌশলে কিছু খাবার দিয়েছে, নয়তো চেঁচামেচি শুরু করবে। সকাল হতেই বণিকের দলের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কালকেই রাহু শুনে নিয়েছিল এরা বেরেনিকে যাবে, এই রাস্তায় সবাই সেখানেই যায়। দলের সাথে না ভিড়লেও চলবে, ওদের সাথে রওনা দিয়ে একটু ব্যবধান রাখলেই হবে।

মেয়েগুলো দলের সাথেই আছে। ওরাই রাতে বণিকদের মনোরঞ্জন করেছে। বোঝাই যাচ্ছে এরা বণিকদলের সম্পত্তি, এই সরাইয়ের নয়। সকালের খাবার খেয়ে বাকি খাবার বেঁধে বেরিয়ে পড়লো রাহু। তার অনুমান ঠিক, বণিকদলের সাথে সে যখন চলতে শুরু করেছে তখন কেউই কিছু মনে করলো না।

বেরেনিকের দূরত্ব সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না। কেবল এটুকু মনে হচ্ছিল আর বেশি দূরে নয়, তার অনুমান মাঝামাঝি সত্য হলো। অবশ্য যখন বণিক দল কোথাও দুপুরের খাবারের জন্য থামলনা তখনই বোঝা গেল, বন্দর বেশি দূরে না।

দুপুরের একেবারে শেষ ভাগে বড়ো বন্দর নগরী ভেসে উঠলো ওদের সামনে। এক পাশে তার সমুদ্র আরেক পাশে পাহাড় শ্রেণি। এই পাহাড় শ্রেণি বেয়ে একটা পথ চলে গেছে কপ্টস বন্দরের দিকে। সেই নীল নদের বন্দর দিয়েই

আলেকজান্দ্রিয়া যাওয়া যায়। এই পথে সে কখনো যায়নি। বেরেনিকে ঐশ্বর্যে অতুলনীয়। এই পর্যন্ত তিন বার এই নগর দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তার। তিনবারেই একই রকম অবাক হয়েছে।

নগরের ভেতরে প্রবেশের আগেই সাবধান হয়ে গেল রাহু। অঙ্গদের দেহ খাঁচার ভেতরে চাদরে মোড়া আছে। ভেতরে ঢোকার সময় প্রহরী নিশ্চয়ই তল্লাশ করবে। সে এখনই বেরেনিকের সামনে অঙ্গদের রহস্য উন্মোচন করতে চাচ্ছে না। অঙ্গদের আসল রূপ দেখলে নিশ্চয়ই প্রহরী অনেক প্রশ্ন করবে। প্রথমে এই দল থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে। তাই করলো রাহু।

প্রহরী তাকে তেমন একটা গ্রাহ্য করলো না। তাদের মূল দৃষ্টি রাহুর সাথে আসা বণিকের দলের দিকে। ওদের থেকেই মোটা ঘুস পাওয়া যায়। রাহুকে একবার একটু হাত বুলিয়ে তল্লাশি করেই ভেতরে যাবার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হলো।

বেরেনিকেতে প্রবেশ করে রাহু আর দেরি করলো না। সে যে এখানে আসবে সেটা শরিফ আর তাজিম ভালো করেই জানে। তারা ঐ গুপ্তধন উদ্ধারে ব্যর্থ হলে এখানেই আসবে আর তখন রাহুকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছে না সে। তার চেয়ে কাজের কাজ সেরে নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়তে হবে।

পয়সা খরচ করে বিনোদন নেয়া বলতে রাহু সবসময় একটা জিনিসই বুঝেছে। মদের বোতল। তবে অন্য ক্ষেত্রে বিনোদন ভোগ না করলেও সেগুলোর খবর রাখতে কোনো অসুবিধা ছিল না। এই বন্দরে বিনোদনের ভালো ব্যবস্থা আছে। নানা রকম পতিতালয় আছে, পানশালা আছে, আছে শরীরের বিশেষ আরামের ব্যবস্থা। তবে ভূমধ্যসাগরের এই প্রান্তে যে জিনিস আগে ছিল না তাও এখানে রোমানদের বদৌলতে এসেছে। একটা আখড়া হয়েছে এখানে। মানুষও নতুন বিনোদনের মাধ্যম পেয়ে আগ্রহ ভরে যায় সেই আখড়ায়। সেখানে মূল খেলা হচ্ছে কুস্তি, মাঝে মাঝে নানা যোদ্ধাদের মরণপণ যুদ্ধও হয় রোমানদের অনুকরণে। সেসব যুদ্ধ দেখার খরচ অনেক। একজন যোদ্ধা মারা যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলে মাঝে মাঝে সমানে সমানে যুদ্ধ চললে দুজনেই মারা যায়। একজন মানুষের জীবনের একটা দাম আছে, আর সেই দাম চুকাতে হয় দর্শকদের। সেই আখড়াতে নানা রকম জানোয়ারের খেলাও দেখানো হয়। সেদিকেই এখন চলেছে রাহু। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস, একবার অঙ্গদকে সেখানে দেখানো গেলে অনেক মুদ্রা পাওয়া যাবে, চাই কি ঐ আখড়ার মালিকের কাছ থেকে নিয়মিত একটা কাজ জুটলেও জুটে যেতে পারে।

আগের বার সে আখড়ায় আসেনি। তবে আখড়া যেখানে হয়েছে সেই জায়গা সম্পর্কে বেশ ভালোই জানা আছে। সেই দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে বেশি সময় লাগলো না। শুনেছে এটা না-কি গ্রীসের আখড়াগুলোর তুলনায় কিছুই না। আকৃতিতে একরকম হলেও আকারে না-কি অনেক ছোটো। ছোটো আখড়ার সামনে দাঁড়িয়েই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল রাহুর। আসলের সামনে দাঁড়ালে কী হবে তা চিন্তা করতে চাইলো না সে।

দরজার আরেকটু কাছে যেতেই এক ষণ্ডা মার্কা লোক এগিয়ে এলো তার দিকে। এই লোক মিশরীয় নয়, নিশ্চয়ই ঐ দক্ষিণের কালো লোকদের দেশ থেকে একে নিয়ে আসা হয়েছে। দেখতেই পিলে চমকে গেল রাহুর। প্রায় সাত ফুট লম্বা লোকটা। হাতে কোনো অস্ত্র নেই, অবশ্য মনে হয় না এই লোকের অস্ত্রের কোনো দরকার আছে।

দানব তার সামনে এসে নৌকার বৈঠার মতো হাতের তালু বাড়িয়ে দিলো, গলা দিয়ে বেরোলো বজ্র, 'পাঁচ মুদ্রা দিতে হবে প্রবেশ করতে হলে। তাড়াতাড়ি দাও, একটু পরেই যোদ্ধারা ভেতরে মরণপণ যুদ্ধ শুরু করবে।'

রাহু একটু কমাতে চেষ্টা করলো, 'আমি তো শুনেছিলাম দুই মুদ্রা।'

'সেটা অন্যদিন। আজকে যোদ্ধাদের মরণ পর্যন্ত যুদ্ধের খেলা আছে। আজকে দাম বেশি দিতে হবে।'

রাহু আর বিশেষ বাক্য ব্যয় করলো না, পাঁচটা মুদ্রা বিনিয়োগ করে ফেললো সে। এছাড়া ভেতরে ঢোকার কোনো উপায় নেই।

ভেতরে ঢুকেই চমকে গেল সে। আর সাথে সাথে বুঝে গেল সঠিক জায়গায় চলে এসেছে। ভেতরে চক্রাকার বসার স্থানে লোকে গিজগিজ করছে। এখন এক লোক পাহাড়ি সিংহের সাথে নানা কসরত করছে, কখনো সিংহের গলায় হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে আবার কখনো নিজের মাথা পুরোটাই ঢুকিয়ে দিচ্ছে সিংহের মুখে। তাজ্জব হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই দর্শকদের।

রাহুর তাজ্জব হলে চলবে না। তার চোখ খুঁজতে লাগলো এই জায়গার মালিককে। দু'এক জনকে জিজ্ঞেস করতেই ধমক খেতে হলো। পাঁচ মুদ্রার খেলা দেখার সময় এসব ঝামেলা কার ভালো লাগে। তবে একজন দয়াপরবশত মালিককে দেখিয়ে দিলো। রাহু এগিয়ে গেল সেদিকে। মালিকের স্বভাবতই খেলার থেকে দর্শকদের সংখ্যার দিকেই নজর বেশি। সেদিকেই তাকিয়ে ছিলেন তিনি।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রাহু, 'দাসের শ্রদ্ধা জানবেন।'

মালিক ফিরে তাকালো তার অচেনা নতুন দাসের দিকে, 'কে তুমি? এখানে কী চাই? খেলা দেখতে এসেছ, খেলা দেখো।'

'মহাশয়, আমি খেলা দেখতে আসিনি। আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি।'

'আমার সাথে আবার কী কথা?'

'আমার সাথে এই খাঁচাতে একটা বানর আছে। আমি সেই বানরের খেলা দেখাতে চাই আপনার এই উঠানে। যদি আমাকে অনুমতি দেন।'

তাচ্ছিল্য ফুটে উঠলো মালিকে গলায়, 'পাগল হয়ে গেছো না-কি? এই আখড়া কুস্তির। শক্তির। এখানে বাঘের খেলা দেখানো হয়, সিংহের খেলা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছো। এখানে বানরের খেলা দেখানো যাবে না।'

এই জায়গা যে শক্তি প্রদর্শনের জায়গা তা বাইরে থেকেই পরিষ্কার বুঝে এসেছে রাহু, 'আপনি কেবল একবার অনুমতি দিন। দর্শক পছন্দ না করলে আমি আমার বানর নিয়ে চলে যাবো। আর যদি পছন্দ করে তাহলে আজকের দিনের সব বকশিশ পাওয়া মুদ্রা আপনার। কাল থেকে আমি আমার ভাগ নেবো।'

রাহুর গলার আত্মবিশ্বাসী স্বর মালিককে চিন্তায় ফেলে দিলো। সারা জীবন মানুষ চড়িয়ে খেয়েছে সে, লোক চেনে। বুঝতে পারলো এই লোক ফালতু কথা বলছে না, 'ঠিক আছে। শেষ খেলা হচ্ছে যোদ্ধাদের। সেই খেলার পরে তুমি তোমার বানর নিয়ে উঠানে যেও। এই খাঁচায় আছে বানর?'

'আজ্ঞে।'

'দেখি তো।'

'আমি বলি কি মহাশয়, একেবারে উঠানে নিয়ে গেলেই দেখবেন। তাতে আপনিও মজা পাবেন।'

' ঠিক আছে। এখন আর কথা বোলো না। এখন সত্যিকারের যুদ্ধ শুরু হবে।'

এবার রাহু তাকালো প্রাঙ্গনের দিকে। দুই যোদ্ধা নেমে পড়েছে। দর্শকদের হল্লোড়ে কান পাতা দায়। নিজের নিজের অস্ত্র বেছে নিলো যোদ্ধাদ্বয়। নিজেদের পোশাক খুলে ফেললো। দুজনের শরীরেই এখন একটা নেংটি ছাড়া আর কিছুই নেই। ঠিক যেন কোন ভাস্কর্য গড়ে দিয়েছে তাদের দুটো শরীর। ভয়ংকর সৌন্দর্য যেন বিমোহিত করে ফেললো দর্শকদের। সবাই জানে এবার সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ। কেউ আর এখন কোনো শব্দ করছে না।

দুই যোদ্ধা খোলা তলোয়ার আর ঢাল হাতে একে অপরকে মাপছে। প্রথমে এক যোদ্ধা আঘাত করলো আরেকজনের ঢালে। আগুনের ফুলকি দর্শকদের মনে আবার উল্লাসের সৃষ্টি করলো।

সবাই জানে কী এর পরিণতি। একের পর এক আঘাত করছে যোদ্ধাদ্বয় একে অপরকে। কিছু ঢালে আটকাচ্ছে, কিছু আবার আঘাত করছে শরীরে, দুজনের শরীরই রক্তের নানা রকম ধারায় সেজে উঠছে। অভিজ্ঞ দর্শকেরা জানে আর একটু

পরেই আসবে সেই ক্ষণ। দুই যোদ্ধাই এখন বিপক্ষের দুর্বলতা পড়ে ফেলেছে। এখন কেবল এক আঘাতের অবস্থা।

সেই আঘাতও চলে এলো। একজনের তলোয়ার হঠাৎ করেই বসে গেল আরেকজনের একেবারে কণ্ঠনালীতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোলো, ভিজিয়ে দিলো প্রাঙ্গনের বালি, অনিন্দ্য সুন্দর দেহটা আছড়ে পড়লো সেই বালির ওপরেই।

আরেক যোদ্ধা উল্লাস করছে, হয়তো নিয়ম মেনেই। দর্শকেরাও উল্লাস করছে, সেটাও হয়তো কোনো নিয়ম মেনেই হবে। এদিকে আখড়ার মালিক কেবলই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, যাক, একজন যোদ্ধাই মরেছে, দুজনেই মরে গেলে দ্বিগুণ ক্ষতি হয়ে যেতো।

এর মধ্যে কেবল রাহুই উত্তেজনা অনুভব করছে। একটু পরেই অঙ্গদকে প্রদর্শন করতে হবে। অঙ্গদের খাঁচার গায়ে তার হাত চেপে বসলো।

অকুলাস বন্দরে জাহাজ দুয়েকদিন থাকবে। এই কথা আগে থেকেই জানা ছিল ওদের। নাপিতের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে জাহাজের দিকে হাঁটছে তিনজনে। শেইরন এতক্ষণে একটু মাতাল হতে শুরু করেছেন, অভিজ্ঞতা থেকে না-কি এমন গুণ অর্জন করেছেন তিনি, মাতাল হওয়া তার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে।

'এমন অদ্ভুত কথা তো কোনোদিন শুনিনি', শুনে রুদ্রদেব একটু অবাকই হয়েছিল, 'দ্রব্য পেটে গেলে সেটা তো তার কাজ করবেই। আপনি নিয়ন্ত্রণ করবেন কীভাবে? এতক্ষণ ধরে এত মদ গিলে কীভাবে যে এখনো সোজা হাঁটছেন সেটাই বুঝতে পারছি না।'

শেইরন যেন একটু আনমনা হলেন, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তুমি তো আমার জীবন সম্পর্কে কিছুই জানো না। আমি অনেক কিছু দেখেছি জীবনে। অনেক কিছুই অর্জন করেছি, আবার অনেক কিছু হারিয়েছি। তার মধ্যে বলতে পারো এই গুণটাও একটা।'

'একটু বুঝিয়ে বলুন তো।'

'শোনো, নেশা বলতে আসলে আমরা কী বুঝি। যা আমাদেরকে স্বাভাবিক জ্ঞান ভুলিয়ে দেয়, যা আমাদের হিতাহিতের জ্ঞান লোপ করে। সেটা হল নিম্নমানের নেশা। আর এখানে আমি মদকে নিয়ন্ত্রণ করার জ্ঞান আয়ত্ত করে খেয়েছি, পেটে আছে, এখনো কাজ শুরু করেনি, আমি যখন বলবো তখনই নেশা দেবে সে।'

'বাহ, এই গুণ তো অনেক মজার। তা, এত মদ খেয়েছেন নিশ্চয়ই নেশা করার ইচ্ছে আছে।'

'তা তো আছেই। আগে তো তোমাদের বানরের খোঁজ বের করতে হতো। তাই নেশা হওয়াটা একটু পিছিয়ে দিলাম। এখন আর কোনো কাজ নেই। গিয়ে হালকা কিছু খাবার নেবো, তারপর গিয়ে বসব জাহাজের একেবারে সামনে ডেকে, ঢেউয়ে জাহাজ একটু করে দুলবে, তখন আমি নেশা উন্মুক্ত করে দেবো।'

অসিতের মাথায় অঙ্গদের চিন্তা, 'কিন্তু রাহু কি অঙ্গদকে বেরেনিকে নিয়ে যাবে? যদি অন্য কোথাও যায়?'

শেইরন আশ্বাস দিলেন, 'আরে না, রাহু যদি এই দিকে নতুন হতো তাহলে হয়তো অন্য কোথাও নিয়ে যেতো। কিন্তু সে এইদিক ভালো করেই চেনে। বেরেনিকে বন্দর সে কিছুতেই এড়িয়ে যাবে না।'

জাহাজে ফিরে নিজের কথা মতো জাহাজের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসলেন শেইরন। অসিত আর রুদ্রদেব দুজনেই বুঝতে পারলো, এখন আর তাকে ঘাঁটানো

উচিত হবে না। নিজেদের খাবার নিয়ে নিলো ওরা। এখনো জাহাজের বেশির ভাগ নাবিক ফেরেনি। মনে হয় না আজ রাতে ফিরবে। খাবার খেয়ে নিজেদের জায়গায় চলে গেল ওরা দুজনে।

অসিত বুঝতে পেরেছে এখন বেরেনিকে যাওয়ার আগ পর্যন্ত অঙ্গদকে খোঁজার আর কোনো পদক্ষেপ নেয়ার নেই। তাই সেই চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিলো। তার মাথায় সাথে সাথে চলে এলো দিব্য অস্ত্রের বিদ্যার কথা, 'আমার শিক্ষা কিন্তু শুরু হচ্ছে না। সময়ের অপচয় করছি না আমি?'

' নাঃ রুদ্রদেব বিছানায় পিঠ দিয়ে জবাব দেয়, 'সময়ের অপচয় করছো না, যা করতে চাচ্ছো তাকে বলে তাড়াহুড়া। চিন্তা কোরো না, এই জাহাজে গোপন জায়গা অথবা অবসর তেমন পাওয়া যাবে না। আমার মাথায় সেই চিন্তা আছে। তাছাড়া কিছু বিদ্যা আছে সম্পূর্ণ গুরুমুখী। এটা তেমন। হাতে কলমে দেখিয়ে না দিলে কিছুই বুঝতে পারবে না।'

'হাতে কলমে কখন দেখিয়ে দেবেন?'

'আজকে ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠবো ঘুম থেকে। তারপর দেখবো, তোমার অবস্থা কী। সেই অনুযায়ী কাজ শুরু হবে।'

অসিতও নিজের বিছানা গুছিয়ে ঘুমাতে উদ্যত হলো, রুদ্রদেব তাই দেখে কৃত্রিম হাহাকার করে উঠলো, ' হায় হায়, এটা কী করছো?'

অসিত অবাক হয়ে তাকালো, 'আপনি না বললেন ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে শুরু করবো। তাই তো ঘুমিয়ে পড়ছি।'

'এমন করলে তো তুমি দিব্য অস্ত্রের বিদ্যা শিখতে পারবে না। ঘুম, নিদ্রা, বিশ্রাম ভুলে যেতে হবে। জানো তো অর্জুন টানা এক মাস না ঘুমিয়ে থাকতে পারতো। তা তুমি সেই মহারথীদের বিদ্যা শেখার চিন্তা করে যদি বিছানা বালিশ নিয়ে টানাটানি করো, তাহলে তো চলবে না।'

অসিত উদাস মুখে বলল, 'তবে আমি এখন কী করবো?'

'ধ্যান করবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত পর্যন্ত। মনঃসংযোগের সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে যেতে হবে। নয়তো দিব্য অস্ত্রের জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়। আর সে জন্য দীর্ঘ ধ্যানের কোনো বিকল্প নেই। ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে ওঠার যে কথা বলেছিলাম তা আসলে আমার জন্য। তুমি ধ্যানে বসো। আমি ঘুমাতে গেলাম। ব্রাহ্ম মুহূর্তে কথা হবে।' কথাটা বলেই রুদ্রদেব চোখ বুজলো। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসতে তেমন একটা সময় লাগলো না।

অসিত হতবুদ্ধি হয়ে রইলো, এত দৌড় ঝাঁপের পর একটু না ঘুমালেই নয়। ওদিকে ধ্যান করার নির্দেশ পাওয়া গেছে। অমান্য করা যাবে না। পদ্মাসনে চলে গেল তার দুই পা, চোখ বুজে কূর্ম নাড়ির গতির দিকে নিজের মন নিবদ্ধ করলো। শরীরে শ্বাস প্রশ্বাস চলাচল করে যে রাস্তা দিয়ে সেই রাস্তায় শরীর ও প্রাণের সংযোগ

বিন্দু খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে সে। একটু পরেই ক্লান্তি আর অনুভূত হলো না, শরীরের অনুভূতি বিলোপ হয়েছে।

রুদ্রদেব ঘুমের মধ্যেও একটু সন্তুষ্ট হলো। না, শিষ্যের উন্নতিতে নয়, তিন হাজার বছর আগে তার পিতা তাকে যেভাবে কঠোর হাতে শিক্ষা দিতেন, সেই শিক্ষার ধারা সে এখনো ধরে রাখতে পেরেছে। অসিতের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে নিজের ছেলেবেলা।

ব্রাহ্ম মুহূর্তে নিজের দেহ সংকেত পেয়ে গেল। আস্তে করে চোখ খুলল রুদ্রদেব। অসিতের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো সে এখনো ধ্যানে আছে। পদ্মাসনে। অসিতকে জাগাতে হবে। এখন সবাই ঘুমে আছে। একটু পরেই উঠে যাবে। তবে ধ্যান মগ্ন ব্যক্তিকে ঝাঁকি দিয়ে জাগানো চলবে না। ধ্যান থেকে জাগানোর মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্র একটা নির্দিষ্ট ছন্দে কানের কাছে পাঠ করলে সমাধি দেহতে প্রাণ ফিরে আসে। অসিতের শ্বাসের গতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে গভীর ধ্যানের মধ্যে আছে।

ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে মন্ত্র পড়তে শুরু করল রুদ্রদেব। অসিতের শরীরে শ্বাস স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে কূর্ম নাড়ি আর শরীর আর প্রাণের সংযোগ করছে। একটু পরেই জেগে উঠলো অসিত।

'তুমি দেখি বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলে। ওদিকে ব্রাহ্ম মুহূর্ত পেরিয়ে সূর্য নমস্কারের সময় চলে এসেছে।'

'আপনি ভালো করেই জানেন আমি ঘুমাইনি।'

'হ্যাঁ, জানি। শরীরের জন্য ঘুম অত্যাবশ্যক না। তুমি যে গভীর ধ্যানে ছিলে তা ঘুমের থেকেও বেশি ক্লান্তি নাশক। যাক, এসব নিয়ে আলাপ করার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। এখন তাড়াতাড়ি শস্ত্র তুলে নাও।'

'শুধু ধনুক?'

'হ্যাঁ, ধনুক নিলেই চলবে।'

দুজনের ধনুক তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো অসিত। রাতের নক্ষত্রের আলো এখনো পুরোপুরি ম্লান হয়নি। জাহাজের ডান পাশ বন্দরের দিকে আছে। সেখানে দুইএকজন প্রহরী জেগে থাকতে পারে। ওরা অন্যপাশের একটা তক্তার আড়ালে বসলো।

সামনে অবারিত সমুদ্র। সেদিকে তাকালো রুদ্রদেব, 'তুমি তো ধনু ভালোভাবেই রপ্ত করতে পেরেছ। এবার তোমার দিব্য অস্ত্রের শিক্ষার পালা। তোমাকে মন্ত্র দেবো আমি। প্রথমে কোন অস্ত্রের শিক্ষা শুরু করতে হয় বলতে পারবে?'

'না, আমি কীভাবে বলবো?'

'সেই ঠিক। প্রথমে দেবতাদের আহ্বান করার পথ অগ্নিদেবকে প্রকট করার মন্ত্র দিচ্ছি তোমাকে।'

'প্রথমেই অগ্নি', ঢোঁক গিলল অসিত।

'ভয় পেয়ো না। কিছু উল্টাপাল্টা হলে তো আমি আছিই।'

'আপনি বলেছেন, আমাদের দেহের ভেতরে অগ্নি আছে। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? আগুন দেহের ভেতরে থাকলে আমরা পুড়ে যাবো না?'

'দেহতত্ত্বের তুমি কিছুই জানো না অসিত। এই যে আমরা খাবার খাই তা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হজম হয়ে যায়। আমাদের দেহের ভেতরে এমন উপাদান আছে, যা দেহের বাইরের চামড়ায় লাগলে তা হাওয়ার সাথে মিশে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের দেহ গরম হয়, তাপ থাকে চামড়ায়। এখন বলো তো, এই পৃথিবীতে আগুন ছাড়া আর কি তাপের জোগান দিতে পারে?'

অসিত এবার তত্ত্ব বুঝতে পেরেছে। তার মানে দেহের ভেতরে আগুন আসলেই আছে।

রুদ্রদেব তাড়া দিলো, 'নাও, এবার শুরু করো।'

রুদ্রদেব নিজেও হাতে ধনুক নিয়েছে, অসিতে ভেবেছিল তিনি দেখিয়ে দেবেন, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সে ধনুক হাতে তুলে নিলো। আরেক হাতে তীরের অভাব বোধ করছে। তবে দিব্য অস্ত্রে না-কি শারীরিক বাণের দরকার হয় না। মন্ত্রটা আরেক বার মনে মনে আউড়ে নিলো সে।

রুদ্রদেব উপদেশ দিয়েই চলেছে, 'ধনুককে শাস্ত্র অনুযায়ী হাতে আর শরীরে স্থাপন করো। তারপর বৃদ্ধাঙ্গুল স্থাপন করো জ্যা তে। তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এমন ভাবে জ্যা টানো যাতে মনে হয়, তোমার হাতে আসল তীর আছে, সাথে উচ্চারণ করতে থাকো মন্ত্র।'

অসিত ঠিক তাই করলো। মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে জ্যা টান দিলো। কিন্তু কিছুই হলো না। জ্যা পুরোটা টেনে ধরার পরেও অগ্নির শক্তি ধনুকে প্রকট হলো না। জ্যা আবার আগের অবস্থায় নিয়ে এলো অসিত।

রুদ্রদেব নিজেও তৈরি হয়ে বসে আছে। রুদ্রদেবের এই টানটান অবস্থার কারণ অসিত বুঝতে পারলো না। সে আবার চেষ্টায় রত হলো। কিছুদিনের এই যুদ্ধ বিদ্যা শেখার মধ্যে একটা জিনিস সে বুঝেছে, জগতে যুদ্ধ হোক আর যেই কাজই হোক, বারবার চেষ্টা করার কোনো বিকল্প নেই।

কয়েকবার এমন ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ আর জ্যা টেনে ধরা চললো। ব্রাহ্ম মুহূর্ত শেষ হয়ে আসছে। একটু পরেই সূর্য দেখা দেবে দিগন্তে। রুদ্রদেব খেয়াল রাখছে সময়ের দিকে। ঠিক তখনই একটা ক্ষীণ রশ্মি দেখা দিলো অসিতের হাতে, সেটা শুধু একটা দণ্ডের আকার নিয়েছে, তীরের নয়।

অবাক হয়ে গেল অসিত সেই রশ্মির দিকে তাকিয়ে। সাথে সাথে ভুলে গেল মন্ত্র উচ্চারণের কথা সামান্য সময়ের জন্য। তখনই অগ্নি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে নিজের রূপে আবির্ভূত হলো। অসিত লক্ষ্য করলো, তার আঙ্গুল হঠাৎ করে যেন পুড়ে যাচ্ছে। আগুনের সেই ভীষণ তাপ কিছুতেই ধরে রাখা সম্ভব হলো না তার দ্বারা। আঙ্গুল খুলে দিতেই সেই অস্পষ্ট রশ্মি তীর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। নগরের দিকে গেল না, গেল সমুদ্রের দিকে।

রুদ্রদেব কেন ধনুক হাতে বসে ছিল, তা এখন বোঝা গেল। প্রথম বার দিব্য অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কারো পক্ষেই পুরোপুরি সম্ভব না। আর এই শক্তি প্রকৃতিতে বিস্ফোরিত হলে ক্ষতি হতে পারে, সবচেয়ে বড়ো কথা কারো চোখে পড়ে যেতে পারে। সে এক পল সময়ও নষ্ট না করে নিজের ধনুক থেকে শক্তি ছুঁড়ল। অগ্নিকে প্রশমিত করার জন্য। সেই অস্ত্র ধনুক থেকে বেরিয়েই অসিতের ধনুক নিঃসৃত অগ্নি শক্তিকে যেন শুষে নিলো। রুদ্রদেবের কাজটা দেখে নিজের আঙ্গুলের জ্বলুনির কথা যেন ভুলে গেল অসিত।

'কী হয়েছে তোমার আঙ্গুলে? দেখি?' রুদ্রদেব এবার মনোযোগ দিল অসিতের পরিচর্যায়।

অসিতের বুড়ো আঙ্গুলের ডগায় পোড়া দাগ দেখা না গেলেও সেখানে লাল একটা আভা আবছা বোঝা যাচ্ছে, 'তোমার ভাগ্য ভালো, বেশিক্ষণ অগ্নি ধরে রাখতে চেষ্টা করোনি। তাহলে চামড়া একেবারে পুড়ে কয়লা হয়ে যেতো। এখন জলে ডুবিয়ে রাখো আঙ্গুল। আজকের মতো শিক্ষা শেষ।'

দুজনেই ধনুক আবার ঘরে রেখে এলো। সমুদ্রের নোনা জলে আঙ্গুল ডোবানো উচিত হবে কিনা, সেটা বুঝতে পারলো না অসিত, খাবার জল একটা পাত্রে নিয়ে সেখানেই ডুবিয়ে দিলো আঙ্গুল। জলের স্পর্শ পেতেই জ্বলুনি একটু কমতে শুরু করলো। তার আগ্রহ এখনো রুদ্রদেবের একটু আগে ছুঁড়ে দেওয়া শক্তির দিকে 'আচ্ছা, আপনি কী অস্ত্র ছুঁড়লেন একটু আগে?'

'শক্তি শোষক অস্ত্র। এটা দিয়ে শক্তি শুষে নিতে হয়। আমি জানতাম, তোমার ক্ষেত্রে এমন হবে। নিজেকে অক্ষম ভেবো না, সবাই-ই দিব্য অস্ত্রের প্রথম ভাগে এমন কাজ করে। তুমি কি ভুল করেছিলে?'

'মন্ত্র উচ্চারণ করতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, আর এজন্যই অগ্নি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে এসেছিল।'

'আচ্ছা, এই শক্তি শোষক অস্ত্র আবার কী? এটা তো আগে বলেননি।'

'তোমাকে এখনো বলতে গেলে কিছুই বলিনি। দিব্য অস্ত্রের প্রধান জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে তুমি এখনো কিছুই জানো না। শক্তি শোষক অস্ত্রে শক্তি শুষে নেয়া যায়। বিপক্ষের কেউ যদি শক্তির অস্ত্র ছোঁড়ে তখন সেটা প্রতিহত করার জন্য এটা ছোঁড়

হয়। একটা কথা মনে রাখবে, শক্তি কিন্তু আমি ধ্বংস করিনি, সেটা সম্ভব না, আমি কেবল শক্তি শুষে নিয়েছি।'

'আমি কি শক্তি প্রকট করতে পেরেছিলাম?'

'হ্যাঁ, অসিত, খুব ক্ষুদ্র শক্তি হলেও তুমি বের করতে পেরেছ। তোমার ভেতরের শক্তি বাইরে বের করার পথের সন্ধান পেয়ে গেছো তুমি।'

'আচ্ছা। কিন্তু আপনি বললেন, দিব্য অস্ত্রের জ্ঞান আমি এখনো কিছুই জানি না। আমাকে একটু বলুন।'

'সব কথা তো আর বলা যাবে না। মনে রেখো, জ্ঞান একটা অপরিহার্য জিনিস, মাঝে মাঝে ভীষণ দরকারি, মাঝে মাঝে মানুষের বেঁচে থাকার কারণ। কিন্তু যে জ্ঞান ধারণ করার ক্ষমতা তোমার হয়নি, তা যদি তোমাকে দেওয়া হয়, তবে অবস্থা হবে জল উপচে পড়ার মতো। এজন্য কঠোর চর্চার মাধ্যমে আগে নিজেকে জ্ঞানের উপযুক্ত করে নিতে হয়। তারপর জ্ঞানের সন্ধান করলে তা মনে এমনিতেই বসে পড়ে।'

এসব শুনতে এখন অসিতের মন চাচ্ছে না, এসব ভারী কথা পড়ে শুনলেও হবে, কৌতূহল নিবৃত করা যাক, 'আচ্ছা, যেটুকু শুনতে পারি সেটুকুই বলুন না।'

'আচ্ছা, তোমাকে কেবল একটা ধারণা দেই। তুমি কেবল জেনেছ আমাদের শরীরের ভেতরে থাকা শক্তি সম্পর্কে। এই পঞ্চভূতের মহিমা অপার। সমস্ত জগত এর দ্বারাই তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেই শক্তি শুধু মহামায়া মিশিয়ে দিয়েছেন জড়ে অথবা ভূতে। কিন্তু মানুষের জীবন তো শুধু জড়ে চলে না। সৃষ্টি করতে, মানে সৃষ্টির সব প্রজাতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য দান করতে তিন গুণের তৈরি হয়েছিল পরম ব্রহ্মের দ্বারা। সত্ত্ব, রজঃ, তম। আর সেই তিন গুণ থেকেই সৃষ্টির তিন প্রধান দেবতার আবির্ভাব হয়েছিল। সেই গুণ কিন্তু একেকটা শক্তির আকারে আছে। সেগুলো অর্জন করা যায়। তবে ত্রিদেবের সেসব অস্ত্রের শক্তির ব্যাপকতা অনেক। সেসব না শেখাই ভালো, ওসব শিখতে গেলেই আবার নানা চিন্তা মাথায় চলে আসে।' কেন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো রুদ্রদেবের গলা দিয়ে।

অসিত আর কিছু শোনার জন্য জোর করলো না। যা শুনেছে তাই হজম করতে লাগলো সে। ওদিকে জল তার কাজ করছে।

অসিতের পাশ থেকে উঠে এলো রুদ্রদেব। ভোরের আলোর আভা ফুটে গেছে। আশেপাশের পরিবেশ দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। নিজের শরীরের আড়মোড়া একটু করে ভেঙ্গে নিলো সে। তখনই তার নজর পড়লো জাহাজের ডেকের সামনের দিকের বসে থাকা মূর্তির দিকে।

একটু এগিয়ে যেতেই চিনতে পারা গেল। শেইরন বসে আছেন। কালকে রাত থেকে এখানে এভাবেই বসে আছেন।

রুদ্রদেব একটু ঘাবড়ে গেল, এই লোক সারা রাত এখানেই ছিলেন, কিছু আবার দেখে ফেলেননি তো, বাজিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

শেইরনের পাশে গিয়ে বসলো সে, 'কী খবর, আপনার নেশা কেটেছে? না-কি এখনো ধরে রেখেছেন?'

শেইরনের চোখ ঢুলুঢুলু, 'আরে না। এত কম সময়ে নেশাকে ছেড়ে দিলে চলবে কেন? সকালে একেবারে স্নান করে ছাড়বো। এবার নেশাটা খুব কড়া করেছি। সারারাত কত রঙের আলো দেখেছি, হাওয়ায় ভেসে বেরিয়েছি।'

রুদ্রদেব বুঝতে পারলো ভয়ের কিছু নেই, এই লোক কিছুই বুঝতে পারেনি।

তবে তার ধারণাটা একটু নাড়া খেয়ে গেল শেইরনের পরের কথায়, 'সারারাত নেশার ঘোরে অনেক কিছুই দেখেছি, যা জীবনে দেখিনি। কিন্তু একটা চিন্তা কিছুতেই মাথার ভেতর থেকে যায়নি জানো। সারারাত পোকাটা মাথায় কামড়ে গেছে।'

'কী চিন্তা?'

'সেদিনের ঝড়টা আচমকা থেমে গেল কেন? থামালো কে?'

নিকোলাস আজ বেশ তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। ইভানদের পেছনে লোক গেছে এক সপ্তাহের মতো হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার পায়াসের প্রাসাদে যাবার আগ্রহ জেগে উঠেছিল তার মনে। অনেক কষ্টে তা দমন করেছে। ঐ জঙ্গলে পুরো তল্লাশি চালাতে কম করে হলেও দশ দিন লাগবে। তাই দশ দিনের আগে খবর নিতে যাওয়া ভালো দেখায় না। সে তো আর যেনতেন অভিজাত না, একজন মহা অভিজাত।

পায়াসের প্রাসাদে যাবার কারণ কেবল ইভানের খবর পাওয়া গেছে কি না সেই খবর পাওয়ার জন্য না। বলতে গেলে পায়াসের প্রাসাদে সেদিন রাতের পর থেকে ইভান আর ওরিয়ন তার মাথা থেকে পুরোপুরি উধাও হয়ে গেছে। এমনকি পরের দুই দিন সে মরিসের খোঁজ নিতেও যায়নি। তবে তাতে মরিসের কোনো অসুবিধা হয়নি। সে সেবাযত্ন পেয়ে সেরে উঠছে। এখনো পুরোপুরি শুকায়নি ঘা। তবে চিকিৎসকের ওষুধ কাজ করছে ভালোই। বেশিদিন লাগবে না খাড়া হতে।

কাল রাতে পুরোটা সময় ঘুম দুই চোখের পাতায় আসতে পারেনি তার। কেবলই নিক্সের ঐ মোহনীয় মুখটা ভেসে উঠেছে। কি আকর্ষণ নিয়ে সে এসেছিল তার কাছাকাছি। ঠোঁটের ঐটুকু স্পর্শ, তাতেই নিকোলাসের বলশালী দেহ যেন একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, আরেকটু হলে বোধহয় মাটিতেই বসে পড়তে হতো। এই অনুভূতি কোত্থেকে এসেছে সে জানে না, নিক্সের ঐ কোমল শরীরে তাকে নাড়িয়ে দেওয়ার বল কোত্থেকে এলো তাও জানা নেই, কেবল জানা আছে, বার বার ঐ অনুভূতির কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিতে কোনো আপত্তি নেই তার।

কাল সারারাত ভেবে তাই পায়াসের প্রাসাদে যাবার কৌশল বের করেছে সে। পায়াস নিক্সের সাথে তার বিয়ের কথা বলবেন বলবেন করছেন। সেদিন সরাসরি কিছু বলেননি। তবে নিক্সকে একা তার কাছে এত সজ্জিত করে পাঠানোর মানে একটাই হতে পারে। কন্যা দেখানো।

অজুহাতটা তেমন একটা জোরালো নয়, তবে কাজ চলে যাবে। সাত দিন কেটে গেছে। এখন নিজের চিন্তা নিয়ে কিছু কথা বলা যেতেও পারে। ইভান এবং ওরিয়নের ধরা পড়া কেন জরুরি সেসব নিয়েও আলাপ করা যাবে, তবে অবশ্যই নিক্সের সাথে দেখা করতে হবে, একা।

গত সাতদিন ধরে সকালের শারীরিক চর্চা করা হয়নি। তাদের প্রশিক্ষণের সময় বারবার করে বলা হয়েছে, এই শরীর একটা যন্ত্র বই আর কিছু নয়, আর সব যন্ত্রের মতোই এই শরীর ফেলে রাখলে জং ধরে, ঘুণে ধরে নষ্ট হয়ে যাবে। অনেক আরামের উপলক্ষ সামনে আসবে কিন্তু শরীরের চলাচল ঠিক রাখতে হবে সবকিছু সামলে। নিজের গর্বে ধার দিতে এবার প্রাসাদের কুস্তির মাঠে এসে হাজির হলো সে।

বেশ কিছুক্ষণ চর্চা চললো। রণ প্রশিক্ষণে তাকে সাহায্য করার লোক আছে। তারা দাঁড়িয়ে আছে প্রাঙ্গনের চার পাশে। আনমনে কিছু কিছু ব্যায়ামের জিনিস নেড়েচেড়ে দেখলো সে। তারপর কয়েকজন দাসকে ডেকে নিয়ে তলোয়ারের অনুশীলন করলো। কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না, মন পড়ে আছে পায়াসের প্রাসাদের দিকে।

সকালের খাবার যৎকিঞ্চিত খেয়েই বেরোতে উদ্যত হলো সে। প্রাসাদের দরজায় রক্ষী বেষ্টিত হয়ে বেরোবে এমন সময় একটা ঘোড়া ছুটে আসতে দেখা গেল। ঘোড়ার সাজ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই লোক পায়াসের প্রাসাদ থেকে এসেছে।

নিজের বানানো কাল রাতের সকল অজুহাত এক ঢোঁকে গিলে নিলো সে। অজুহাত নিজেই চলে এসেছে।

লোকটা নিশ্চয়ই দূত। তার সামনে এসে ঘোড়া থেকে নেমে নত হয়ে দাঁড়ালো সে, 'মহামান্য মহা অভিজাত নিকোলাস, আমার অভিবাদন গ্রহন করবেন। আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন?'

পাশের প্রহরীকে ইশারায় চুপ করতে বলে নিকোলাস উত্তর দিলো, 'যাচ্ছিলাম আমার এক বন্ধুর বাড়ি। বলো, তুমি কী খবর নিয়ে এসেছ?'

'মহামান্য পায়াস আপনাকে একটা খবর দিতে আমাকে পাঠিয়েছে আপনাকে এখনই ওনার প্রাসাদে ডেকে পাঠিয়েছেন। যেই দলটা ঐ দু পলাতককে খুঁজতে গিয়েছিল তারা ফিরে এসেছে।'

গত সাতদিনের মধ্যে এই প্রথম বার যে ইভান আর ওরিয়নের ব্যাপারে মাথাটা একটু গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করলো তার, 'ফিরে এসেছে? ওদেরকে কি বন্দি করে এনেছে?'

'নাহ, আমি বিস্তারিত জানি না। তবে ওরা সফল হয়ে ফেরেনি এটুকু বলতে পারি।'

'আচ্ছা, আমার বন্ধুর বাড়িতে গভর্নর প্রাসাদ থেকে ফেরার পথেও যাওয়া যাবে। এখন পায়াসের প্রাসাদেই যাই।'

দূতও যোগ দিলো এই দলের সাথে। প্রাসাদে পৌঁছতে বেশি সময় লাগলো না। গভর্নর তৈরিই ছিলেন। নিকোলাসের সাথে সরাসরি দেখা করলেন। ওরা দুজন বসেছে একটা ঘরে, আশেপাশে কেউ নেই।

'আমার পঞ্চাশ জন দক্ষ লোক পাঠিয়েছিলাম। তা তো আপনিও জানেন। পরামর্শ তো সেভাবেই হয়েছিল।'

পায়াসের কথায় সায় জানালো নিকোলাস, 'হ্যাঁ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'তারা সারা জঙ্গল চিরুনি তল্লাশ করেছে। এক দলে পঞ্চাশ জন থাকেনি। পাঁচটা দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। তারই মধ্যে এক ভাগের সাথে দেখা হয়েছিল সেই দুজনের। আমার তাই ধারণা।'

কথাটায় কেমন যেন একটা গন্ধ পাচ্ছে নিকোলাস, 'ধারণা বলছেন কেন? ঐ সৈনিকরা কি সেই দুজনকে দেখেনি। দেখলে তো চিনতে পারার কথা।'

পায়াস চিন্তিত মুখে কথাটা বললেন, 'সেটাই তো হবার কথা। কিন্তু ওরা না-কি ওদেরকে দেখেছিল রাতে। কিন্তু ওরা যখন আক্রমণ করতে যাবে তখন না-কি শিকার শিকারি হয়ে উঠেছিল। আর আমার সেই খণ্ডিত দশ জনের দলের সাত জনই মারা গেছে, দুজন পালিয়েছে। একজন আহত হয়ে পড়েছিল। তাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে। সে এতই আতঙ্কে আছে যে, কিছুই ঠিকমতো বলতে পারছে না। কেবল আপনার নাম করছে, আপনাকে কী যেন বলার আছে। উন্মাদ হয়ে গেছে।'

'আমার সাথে কী কথা?' অবাক হলো নিকোলাস।

'সেটা বুঝতে পারছি না।'

'যেই দুজন পালিয়ে এসেছে তাদের কী অবস্থা? তারা কিছুই বলতে পারেনি?'

'তারা ঐ দুজন পলাতকের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। কিন্তু এটুকু বলেছে, এমন করে যে মানুষ মেরে ফেলা যায়, সাতটা প্রাণ যে এক পলকের মধ্যে হরণ করা যায়, তা তারা দেখা তো দূরের কথা শোনেওনি।'

এবার নিকোলাস নিশ্চিত হলো, ঐ দুজন ইভানের ব্যাপারেই কথা বলছে, 'আচ্ছা, যে আমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে, সে এখন কোথায়? আমি একটু দেখা করবো।'

'সেই কারণেই আপনাকে ডেকে এনেছি। ব্যাপারটা নিয়ে আমার ভাবনা হচ্ছে। পঞ্চাশ জন সৈন্য ওদেরকে কাবু করতে পারলো না।'

'এক পথে না হলে আরেক পথে হবে। আমাদের, মানে স্পার্টানদের হাতে তো উপায়ের কোনো অভাব নেই। আগে ওর সাথে কথা বলে দেখি।'

'আচ্ছা' এক প্রহরীকে ভেতরে ডাকলেন পায়াস, 'ওনাকে ঐ সৈনিকের কাছে নিয়ে যাও। এখন কী অবস্থা?'

'একটু শান্ত আছে।' প্রহরী উত্তর দিলো।

নিকোলাস হাঁটতে লাগলো প্রহরীর পিছু পিছু। সৈনিকের সামনে গিয়ে বুঝলো অবস্থা বেগতিক। এখনো চোখমুখ অশান্ত তার। নিকোলাসের দিকে তাকিয়ে আছে অদ্ভুত চোখে। নির্ঘাত উন্মাদের দৃষ্টি।

সময় নষ্ট করতে মন চাইলো না নিকোলাসের, 'আমার নামই নিকোলাস। শুনলাম তুমি না-কি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছো।'

উন্মাদের মতো হেসে উঠলো সৈনিক, হাততালি দিয়ে উঠলো বাচ্চা ছেলেদের মতো, 'তোমাকেই তো খুঁজছি আমি।'

তার সাথে কোনো ধরনের সম্মান প্রদর্শন ছাড়াই কথা বলছে চিন্তা করলে রাগ হবার কথা, কিন্তু নিকোলাস জানে উন্মাদের সাথে রাগ করে লাভ নেই।

সৈনিক তার কথা বলে চলেছে, 'ঐ দুজন আমাকে মারেনি, ছেড়ে দিয়েছে, কি ভালো ঐ দুজন। তবে বলে দিয়েছে, তোমাকে বলে দিতে, ওরা তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে, তুমিও যাতে আর ওদের সাথে কোনো ঝামেলা না করো। নইলে, নইলে ওরা...'

'কী করবে ওরা?' নিকোলাসের স্বর মৃদু।

'ওরা তোমার প্রাসাদে ঢুকে তোমাকে মেরে রেখে যাবে। কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। রোমান সম্রাটও বাঁচাতে পারবে না, ঈশ্বরও মনে হয় পারবে না।' কথা বলা শেষ হয়েছে সৈনিকের, উন্মাদের মতো হাসি চলতেই লাগলো।

নিকোলাস বুঝতে পারলো, ইভান তাকে খবর পাঠানোর জন্যই একে না মেরে পাঠিয়ে দিয়েছে, আর কোনো কথা বলার দরকার নেই। এই সৈন্যকে পাগলা গারদেই পাঠাতে হবে।

বেরিয়ে এলো সে। পায়াস ওদিকে অপেক্ষা করছেন। সেই ঘরে আবার এসে বসে পড়লো সে, 'ঐ দলের সাথে ঐ দুজনেরই দেখা হয়েছিল। ওরাই আপনার সাত জন সেনা হত্যা করেছে।' পায়াসের সেনা হত্যা করার কথাটা নিকোলাস একটু জোর দিয়ে উচ্চারণ করলো।

পায়াস নিজেও বেশ চিন্তিত, 'ঠিক। সাতজন সেনা হত্যা করার ব্যাপারটা সহজ নয়। সম্রাটের কাছে খবরটা গেলে তিনি নিশ্চয়ই আমার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে না।' ইঙ্গিত পূর্ণ দৃষ্টি পায়াসের চোখে।

নিকোলাস বুঝতে পারলো, 'আপনি কিছুই ভাববেন না মহামান্য পায়াস। এই কথা এই ঘরের বাইরে যাবে না। আপনার সেনাদলের কাছ থেকেও যাতে খবরটা না ছড়ায় সেই দিকে কেবল দৃষ্টি রাখবেন।'

'সেই ব্যবস্থা এরই মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। তবে এর তো একটা সমাধান করা উচিত। আমাদের বেশ বড়ো একটা ভুল হয়েছে।'

'ভুলটা আসলে আমার দ্বারাই হয়েছে, আপনার নয়। আমি ওদের দুজন সম্পর্কে সবকিছুই জানি। তাই সাধারণ পঞ্চাশ জন সেনা পাঠানোর কথা আপনাকে বলা উচিত হয়নি। ওদের জন্য শুরুতেই কড়া ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত ছিল।'

'কড়া ওষুধ?'

'হ্যাঁ, গভর্নর। ওদেরকে এখন যেভাবেই হোক আমাদের মেরে ফেলতেই হবে। এখন আমার সাথে সাথে আপনার সম্মানও জড়িয়ে গেছে। আপনি ব্যর্থ হয়েছেন এই কথা নগরবাসীর মনে বেশিদিন জিইয়ে রাখা উচিত হবে না।'

'তাহলে আপনি এখন আমাকে কী করতে বলছেন?'

'আপনার সেনাদল পারবে না। কিন্তু আমাদের নগরের এক বাহিনী আছে। সেই গুপ্তঘাতক বিশেষ প্রশিক্ষিত বাহিনীকে নিযুক্ত করুন। গভর্নর হিসেবে সেই বাহিনী এখন আপনার আজ্ঞবহ।'

'কিন্তু শুরুতেই কি সেই রাস্তা বেছে নেয়া উচিত হবে? রোমান সেনাদের পাঠিয়ে দেখি।'

'রোমান সেনাদের এই কাজে ব্যবহার না করলেই ভালো হবে। আর গুপ্তঘাতকদের পাঠালে তারা যেভাবেই হোক কাজ শেষ করবে। কাকপক্ষীতেও কিছুই জানতে পারবে না।'

পায়াস একটু চিন্তিত হলেন। এই গুপ্তঘাতকেরা স্পার্টার প্রথম শ্রেণির অভিজাত সবাই। এদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এদেরকে সেই গোপন বিদ্যালয়ে সারা জীবন গুপ্ত হত্যার নানা কৌশল শেখানো হয়। সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রে এরা কৌশলে তেমন পাকা না হলেও কোনো সুরক্ষিত জায়গায় লুকিয়ে থাকা অথবা কোনো বিশেষ ক্ষমতাবান শত্রুকে হত্যা করতে এদের জুড়ি নেই। এখন গভর্নরের অধীনেই আছে এই বাহিনী। 'ঠিক আছে নিকোলাস, আমি দেখছি ব্যাপারটা। আপনি কেবল আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারটা দেখবেন।'

'জি। আমার মনে হয় নগরে আমাদের ঐ দুজন থেকে কোনো ভয় নেই। এদিকে এসে উৎপাত করার সাহস পাবে না তারা।'

নিক্সের বিয়ের কথাটা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েও বদলে ফেললেন পায়াস, আরও একবার দেখা হওয়া কথা হওয়া জরুরি। নিক্সকে পছন্দ করার পর কথাটা বললে এই মহা অভিজাত সাত পাঁচ ভাবার সময় পাবে না, 'আপনি তাহলে একটু অপেক্ষা করুন। আমার একটু দাপ্তরিক কাজ আছে। শরীর আর মনে এই সকালেই অনেকটা ধকল গেল। একটু বিশ্রাম নিয়ে যাবেন।'

পায়াস বেরিয়ে যেতেই নিকোলাসের মাথায় আবার নিক্সের চিন্তা চেপে বসলো। সে পায়াসের উদ্দেশ্য ভালোই বুঝতে পারছে। নিক্সকে আজও দেখতে পাওয়া যাবে নিশ্চিত। তবে মন মানছে না, যদি কোনো অজুহাতে নিক্স দেখা না করে?

তবে তার ভাবনা অমূলক। নিক্স নিকোলাসের আসার খবর অনেক আগেই পেয়েছে। তারপরেই শরীর আর মনে কেমন যেন একটা অনুভূতি হচ্ছে তার। কিছুদিন ধরেই যে অনুভূতির তার মৃদু কম্পনে বাজছিল, তা যেন একেবারে সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। তাই পায়াস নিকোলাসকে একা রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে তার দাসী আর দেরি করলো না। খবর পৌঁছে গেল নিক্সের কাছে।

শেষবারের মতো আয়নার সামনে দাঁড়ালো নিক্স। না, কোথাও কোনো খুঁত নেই। ত্রস্ত পায়ে সে চলে গেল নিকোলাসের বসার ঘরে।

দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো ভেতরে, 'আজকেও দেখি আপনাকে একা রেখে বাবা চলে গেছেন।'

নিক্সের আগমনে আরেকবার চোখ ঝলসে গেল নিকোলাসের। এতদিনের ভেবে রাখা কথাগুলোর একটাও তার মুখ থেকে বেরোলো না, 'মনে হচ্ছে, একা থাকাই আমার নিয়তি।'

'আমার তা মনে হচ্ছে না। তবে আজকে আর আপনাকে এখানে বসিয়ে রাখবো না। আপনি তো আগে আমাদের প্রাসাদ ঘুরে দেখেননি। হাঁটতে আপত্তি আছে?'

'আপনি যদি পাশে থাকেন তাহলে কিছুতেই আপত্তি নেই।'

স্মিত হাসিতে ভরে উঠলো নিক্সের মুখ, 'তাহলে আর বসে আছেন কেন? চলুন।'

সুখ স্বপ্নের শুরু হয়ে গেছে। নিকোলাস হাঁটতে শুরু করলো নিক্সের পাশে। নিক্স ওকে প্রাসাদের নিজের সবচেয়ে পছন্দের জায়গায় নিয়ে এলো, 'আমার মনে হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা দেখে আপনি খুব মজা পাবেন।' চিড়িয়াখানায় ঢুকেই সব প্রহরীকে স্থান ত্যাগ করতে ইশারায় নির্দেশ দিলো সে।

সবাই বেরিয়ে গেল। নিকোলাস আসলেই অবাক হয়েছে। পৃথিবীতে আসলেও কত অদ্ভুত জন্তু আছে। নিক্স পাশে আস্তে আস্তে হাঁটছে, 'এই চিড়িয়াখানায় সব প্রাণীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তারা অনন্য। এদের কোনো জোড়া পৃথিবীতে নেই।'

'দেখতে অদ্ভুত ভালো লাগছে', স্বীকার করতে বাধ্য হলো নিকোলাস, 'তবে এতে একটা অমানবিক ব্যাপার জড়িয়ে আছে সেটা কি আপনি খেয়াল করেছেন?'

নিক্সের ভ্রু একটু কুঁচকে এলো, 'অমানবিক ব্যাপার? জানেন, এদেরকে বিশেষ ভাবে যত্ন করা হয়।'

' তা হয়। কিন্তু এখানে বিশেষ হবার কারণে সবাইকেই একা একা থাকতে হচ্ছে। আর আমি একটা কথা বেশ বুঝেছি, একা থাকা এই পৃথিবীতে সবচেয়ে কষ্টের কাজ। তাই এই প্রাণীগুলোর কষ্ট মন থেকে অনুভব করতে পারছি।'

নিক্স একটু এগিয়ে এলো নিকোলাসের দিকে, 'একা থাকতে কি সত্যিই অনেক কষ্ট?'

' হ্যাঁ।'

একটু ক্ষণ দুজনেই আর কোনো কথা বলতে পারলো না। নিকোলাসের ইচ্ছে করছে সব অর্গল ভেঙ্গে দিতে, কিছুতেই নিজেকে বেঁধে রাখতে পারলো না সে. মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'আমি কি তোমাকে একটু স্পর্শ করতে পারি? সেদিনের মতো?'

নিক্স কিছু বললো না, কেবল বাড়িয়ে দিলো স্ফুরিত ঠোঁট, দুটো মানুষেরই এখন আর কথা বলার কোনো উপায় থাকলো না।

নিক্সের শরীরে যেন বান এসেছে। আজ আর তার চুমুতে আটকে থাকতে ইচ্ছে করছে না। ওদিকে নিকোলাসের শরীর সেই অনন্ত রহস্যের খোঁজ তো সেদিন থেকেই করছে। দুজনের ইচ্ছে যখন এক বিন্দুতে মিলে গেল তখন আর কেউই নিজেকে আটকে রাখলো না। দুজনেই বস্ত্রের বাঁধা পেরিয়ে রহস্যের সন্ধানে

ব্যস্ত হয়ে পড়লো। প্রাণীগুলো এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেছে। ওরা সঙ্গীর অভাবে খাঁচার মধ্যে বন্দি থেকে যে একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটা করতে পারছে না, সেটাই করছে দুই মানব সন্তান।

সঙ্গম শেষে এমন অনুভূতি কখনো হয়নি নিক্সের। সারা শরীর যেন ঝনঝন করে উঠলো তার লজ্জায়। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিলো সে। তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল চিড়িয়াখানা থেকে। হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো নিকোলাস। সে কি ভুল কিছু করে ফেলেছে?

সেই ভাবনা নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নিকোলাস। মনে হয় এতটা বেপরোয়া হয়ে ওঠা উচিত হয়নি। ধীর পায়ে সে হাঁটতে লাগলো এলোমেলো। প্রাসাদের এই অংশ তার অচেনা। একটা থামের কাছে আসতেই সে একটা স্বর শুনতে পেলো। সেই স্বরের মালিক যে কথাগুলো বলছে তাতে কয়েকবার নিক্সের নাম উচ্চারিত হলো।

সম্বিত ফিরে এলো যেন নিকোলাসের, থামের আড়ালে নিজের অবিন্যস্ত বস্ত্র সাজিয়ে নিতে উদ্যত হলো সে। আর সেই অবসরে সে শুনতে পেলো ঐ পাশের কথা,'আজকে প্রাসাদে যে এসেছে, তাকে তো চিনিস। নিকোলাস। স্পার্টার এরের মহা অভিজাত। আমাদের রাজকুমারী তো এই লোককে ছেড়ে দেবে না।'

'কুমারী আবার কাকে বললি? কুমারী উপাধি সে বহু আগেই ফেলে দিয়েছে। এখন এই নিকোলাসের মাথাটা চিবিয়ে খাবে। সত্যি বাবা, ভাগ্য করে এসেছে। যেই পুরুষ ইচ্ছে তার সাথেই বিছানায় যায়, ফুর্তি করে। সংখ্যাটা গুণতে গেলে ধারাপাতের বইয়ের পাতা শেষ হয়ে যেতে পারে।'

আরেক দাসী সাবধান করে দিলো, 'আস্তে বল, ভুলেও যদি কারো কানে যায় তবে আমরা শেষ। আমাদের এত চিন্তা করে লাভ কী। সেই একঘেয়ে এক পুরুষ নিয়েই আমাদের একঘেয়ে জীবন কাটিয়ে যেতে হবে। মহা অভিজাতের সোহাগ পাবার ভাগ্য তো আর ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়ে পাঠাননি।'

'পাঠালে ভালোই হতো। আমি উঁকি দিয়ে একটু আগে চিড়িয়াখানায় দেখলাম। ঠিক যেন একটা সিংহ।'

দুই হেলট দাসী কথা বলতে বলতে চলে গেল। ওদেরকে অবাধ্যতার শাস্তি দেবার কথাও মাথায় এলো না নিকোলাসের। তাকে যেন একেবারে গেঁথে দেওয়া হয়েছে মেঝেতে। একটু আগের জীবনের প্রথম মিলন সে কি তবে এক দুশ্চরিত্রা মেয়ের সাথেই করেছে?

কামরার বেশির ভাগ লোক কথাটা শোনা মাত্র একটু ভড়কে গেল। কারো কারো মুখ থেকে একটু বিস্ময়সূচক ধ্বনিও বেরিয়ে এলো ক্ষুদ্র স্বরে। এমন নয় যে ব্যাপারটা কেউ আঁচ করতে পারছিল না, সবাই বুঝতে পারছিল এই আলোচনা কোনদিকে এগোচ্ছে। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার প্রসঙ্গ আসতেই সবাই একটু না চমকে পারলো না।

কথাটা আরেকবার বললেন অ্যালেস্টর, 'পায়াসকে আমিই হত্যা করবো। না, অবশ্যই কোনো সম্মুখ যুদ্ধে নয়।'

'তার মানে গুপ্তহত্যা।' একজন অস্ফুটে বলে উঠলো।

'হ্যাঁ', দৃঢ় কন্ঠে বললেন অ্যালেস্টর, 'আমার পুরানো জ্ঞানে একটু ধার দেওয়ার প্রয়োজন এসেছে।'

সবাই জানে একসময় এই স্পার্টার সকল গুপ্তঘাতকদের নেতা ছিলেন ইনি। এখনো তার ঐ দলের লোকদের কথা মনে পড়লে বিদ্রোহীদের কলজে শুকিয়ে যায়। আর আজকে সময়ের ফেরে তারাই বিদ্রোহী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গভর্নর তাদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারলে নিশ্চিত গুপ্তঘাতকের দল পেছে লেলিয়ে দেবে।

'আর সবাই কী করবে?'

শুধু গভর্নরকে মেরে ফেললেই তো আর প্রক্রিয়া শেষ হবে না। ব্যাপারটা সেখানে বলা যায় শুরু হবে। এই দাবা খেলায় অবশ্য কোনো গুটি চলার আগেই রাজা ধরাশায়ী হবে। তারপরে সেনারা কাকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ করবে?

অ্যালেস্টর স্পষ্ট গলায় বললেন, 'সব পরিকল্পনা আমি সাজিয়ে ফেলেছি। প্রাসাদের ভেতরে আমাদের গুপ্তচর আছে সেটা তো সবাই জানেন। তারা কিছুদিনের মধ্যেই রোমান সেনাদের পূর্ণ হিসেব দেবে। যেসব গ্রীক সেনা পায়াসের হয়ে কাজ করছে এখন তাদেরকে আমাদের দলে আনার কাজ ভালোই এগোচ্ছে। এরই মধ্যে কিছু সেনা আর অভিজাত আমাদের দলে আসতে চায়নি, তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ পায়াসের কাছে গিয়ে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাবধানও করে দিতে চেয়েছিল, তবে প্রমাণ নেই বলে কিছুই করতে পারিনি। তাদের তালিকা তৈরি করছি। প্রথমে সেইসব অভিজাতদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে সেনা সংখ্যা খুব একটা কম নেই। আর একবার পায়াস মরে গেলে স্পার্টার সেনা পুরোটাই আমার হয়ে কথা বলবে। যেদিন পায়াসকে আমি হত্যা করবো, তার পরদিন আমরা বীরদর্পে স্পার্টার শাসনভার নিজেদের কাঁধে তুলে নেবো। একেবারে দিনের আলোয়, সবার চোখের সামনে।'

আপনি তো অন্য শহরের লোকদের কথাও বলেছিলেন। সেসব জায়গা থেকে অভিজাতরা তাদের সেনা নিয়ে এসে যদি আমাদের সাথে যোগ দেয়? তার কি কোনো ব্যবস্থা হয়েছে?'

'সেখানের কাজেও আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি। ডেলফির পুরোহিতদের সেনা আমাদেরকে সাহায্য করতে তৈরি। যা অলৌকিকভাবে হয়নি তা এবার তারা বাস্তবেই করবে। আমরা খুব সাবধানে আমাদের লোক পাঠিয়ে দিয়েছি সব নগরে। থিবস, এথেন্স, মেসিডন সব জায়গায় লোক চলে গেছে। বিদ্রোহীদের সাথে কথা হচ্ছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন, তারা সবাই স্পার্টাকে এই গ্রীসের সর্বব্যাপী বিদ্রোহের কেন্দ্র হিসেবে স্বীকার করে নিতে তৈরি আছে। তারা খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের সম্পূর্ণ সৈন্য শক্তি নিয়ে স্পার্টার দিকে যাত্রা করবে। এই স্পার্টা পুরো গ্রীককে স্বাধীন করবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

'আমাদেরও', সমস্বরে দৃপ্ত ধ্বনি ধ্বনিত হলো।

এমন ধ্বনির পর কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকার কথা ছিল না, তবু একজন ইতস্তত করতে লাগলো। সেটা চোখ এড়ালো না অ্যালেস্টরের, 'তুমি মনে হয় কিছু একটা বলতে চাচ্ছো? বলে ফেলো। এখন আলোচনার সময়, এরপরে আর কারো পরামর্শ নেয়া হবে না, কেবল কাজ হবে।'

ভয়ে ভয়ে বললো যুবক, 'আমার একটা প্রস্তাব ছিল। যেই পথে আমরা এগোচ্ছি, সেই পথে আমাদের শক্তির একটা প্রভাব থাকবে। যত শক্তি বেশি হবে তত আমরা সফলতা পাবো। সব নগর থেকে বিদ্রোহীরা আমাদের নগরে এসে আমাদের সাথে যোগ দেবে। সেটা অনেক ভালো কথা। কিন্তু এরই মধ্যে আমরা শক্তি বাড়াবার জন্য আরেকটা কাজ করতে পারি।'

'বলে ফেলো।' অ্যালেস্টর উদাসীন গলায় বললেন। অন্য সকলেও সেই উপায় শুনতে উদগ্রীব।

'আমাদের দলে আরও অনেক সেনা আমরা পেতে পারি। আমরা সকলেই জানি যে হেলটেরা এরই মধ্যে বেশ কয়েক নগরের আশেপাশে নিজেদের বাহিনী গড়ে তুলেছে। স্পার্টাকাসের মৃত্যুর পর একটা বিদ্রোহ দমলেও সেই যেই আদর্শ দাসেদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল সেটা মরেনি। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দাসেরা হাতে তুলে নিয়েছে অস্ত্র। তাদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে আমরা আমাদের সাথে শামিল করে নিতে পারি।'

'অনেক হয়েছে।' হাত তুললেন অ্যালেস্টর, 'তোমার ভাষণ বন্ধ করো। এরকম ভাষণ দেওয়া কোথায় শিখেছ? এই এথেন্সের লোকগুলোর জন্য এটা হয়েছে। ওরা সমাজের নানা বৈষম্যের কথা বলে, শ্রেণির কথা বলে, এথেন্সের সেই কথাগুলো সারা গ্রীসেই দেখছি ছড়িয়ে পড়েছে। কাজের কাজ কিছুই নেই,

কেবল ভাষণ। এই যে পাঁচশো বছর ধরে এত মারধোর সহ্য করে ওরা এসবের বিরুদ্ধে কথা বলে গেছে তাতে কি কিছু পরিবর্তন এসেছে?'

যুবক অ্যালেস্টরের বলিষ্ঠ স্বরের সামনে হকচকিয়ে যায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই তার ভেতরের লালন করা সাম্যবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, 'তারা তো ভুল কিছুই বলেননি। পৃথিবী কিছুতেই আর আগের মতো থাকবে না। সাম্রাজ্যবাদ বলতে কিছু থাকবে না, রাজা বলতে কিছু থাকবে না, আপনি নিচু, আমি উঁচু এমন কোনো কথাও এই জগতে থাকবে না। সেদিন আর বেশি দূরে নয়।'

'কথা যে একেবারে অর্বাচীনের মতো বলছো তা কি তুমি বুঝতে পারছো? কিছু হলে এই পাঁচশ বছরেই হয়ে যেতো। তোমরা কেন বুঝতে চাও না, এই সমাজ যে দেবতারা সৃষ্টি করেছেন তারা নিজেরাই তো শ্রেণি বৈষম্য তৈরি করেছেন। পুরোহিত, রাজা, অর্ধ দেবতা- এসব কি শ্রেণি নয়?'

যুবক এবার উত্তর দিতে ভয় পেলো না, 'কিন্তু আপনি তো এসবে বিশ্বাস করেন না, এখন আবার এসব থেকেই উদাহরণ টানছেন?'

'হ্যাঁ, টানছি। আমি এসব বিশ্বাস করি না, কিন্তু এসব বিশ্বাস থেকেই তো সমাজের উৎপত্তি হয়েছে। তোমরা যারা ইদানীং এসব সাম্যবাদের বুলি বলছো, তারা ভুলে যেও না, এই সমাজ সাম্যবাদ দিয়ে তৈরি হয়নি, তাই এই সমাজে সাম্যবাদের স্থান নেই। আবার যখন নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হবে তখন তোমার এ অবাস্তব কথা সেখানে ফলিও।'

পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে এটা বুঝতে পারলেন অ্যালেস্টর, 'আমি জানি তোমার মনে হেলটদের জন্য একটা নরম জায়গা আছে। থাকতেই পারে। আমরা সবাই কঠোর হলে তো হবে না। কিন্তু সত্যকে স্বীকার করে নেবার মতো কঠোর আমাদেরকে হতেই হবে। হেলটদের দলে নিয়ে আসতে আমাদের কোনো লাভ হবে না। ওরা যুদ্ধ করতে পারবে না। ডাকাতি করা আর যুদ্ধ করা এক কথা নয়।'

যুবক আর কোনো কথা বলে না, হেলট বিদ্রোহীদের যে যুদ্ধ কৌশল অনেক খারাপ এই কথা তো সত্যি, 'কিন্তু ওদেরকে দলে নিলে তো ওরা অন্য কাজেও লাগবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধা ছাড়াও অনেক লোক লাগে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেই ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। একদিন আমরা এই স্পার্টার ক্ষমতায় বসবো। আবার শাসন করবো গ্রীস। তখন এই হেলটেরাই বলবে, আমরা আপনাদের সাহায্য করেছিলাম, আপনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিলাম। এখন আমরা আপানদের দাসের কাজ করতে পারবো না, আপনাদের রান্না করতে পারবো না, জমিতে কাজ করতে পারবো না, অভিজাত সভায় আপনাদের সাথে বসবো। তখন আমরা কীভাবে সামলাবো? তোমার এই প্রস্তাব বিবেচনা করতে পারলাম না। ছোটো সুবিধা নেবার জন্য সর্বস্ব হারাতে আমি রাজি নই। আশা

করি, এই বিষয় নিয়ে আর কোনো আলোচনার দরকার নেই। গ্রীসের মাটিতে রোমান সেনা আটকে দেবার মতো লোকবল জোগাড় করার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

যুবক আর কোনো কথা বলল না। সে অবশ্যই ঐ সক্রেটিস, প্লেটোর মতবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু সে নিজেও একজন স্পার্টান, স্বজাতির বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয়। সবকিছু ভালোই ভালোই মিটে যাক, রোমান বহিরাগতরা দূর হোক, এই গ্রীসের মাটিতে শেষ পর্যন্ত সাম্যবাদের পতাকা উড়বেই।

অ্যালেস্টর এবার সবাইকে যার যার কাজ বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। এখন বাণিজ্যের ভরা মৌসুম। বাইরে গেলে কেউই সন্দেহ করবে না। বণিকের বেশে দূর কাজে গেলেই চলবে। যারা স্পার্টার বাইরে যাবার দায়িত্ব পেয়েছে তারা আর দেরি করলো না, যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে তত তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নেয়া যাবে, পরিবারের সাথে আরেকটু বেশি সময় থাকা যাবে। যেই পথে নেমেছে তাতে পরিবারের মুখ আর কয়দিন দেখা যাবে তা নিয়ে ঘোর সন্দেহ আছে।

ভিড়টা কমে এলো আস্তে আস্তে। বৃদ্ধ অভিজাত এই স্পার্টাতেই থাকবেন। তিনি স্থান ত্যাগ করছেন না, অ্যালেস্টর তার পাশে গিয়ে বসলেন, 'আপনি দেখি বাড়ির পথ ধরলেন না এখনো? প্রস্তুত হতে হবে না।'

'তা তো হবেই। কিন্তু আপনার সাথে কিছু কথা বলার জন্যই বসে আছি। আপনি গুপ্তহত্যা কীভাবে করবেন বলে ঠিক করেছেন? পায়াসকে কি প্রাসাদে মারবেন না-কি বাইরে বের হলে হত্যা করবেন?'

হেসে উঠলেন অ্যালেস্টর, 'আপনি এত অভিজ্ঞ হয়ে এই প্রশ্ন কীভাবে করলেন? যে ব্যক্তি গুপ্তহত্যা করবে, সে ছাড়া আর কেউই এই পরিকল্পনার কথা জানতে পারবে না। এটাই তো মূল নিয়ম। সফল হলেও আমি একাই হবো, আর ব্যর্থ হলেও আমি একাই হবো।'

'হ্যাঁ, এই নিয়মের কথা আমার জানা। কিন্তু আমি এটা জানতে আসলে প্রশ্নটা করিনি। আসল কথা হচ্ছে, আমি আপনার ব্যাপারে চিন্তিত, এই কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন।'

'হ্যাঁ, শুধু আমি না, আপনি এই দলের সবার কথাই ভাবেন।'

'হ্যাঁ, আর সেই ভাবনা থেকেই বলছি, আপনি যেই কাজ হাতে নিয়েছেন সেটা যেভাবেই করেন না কেন, তাতে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে, আর সেই সম্ভাবনা কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই আপনাকে আপনার চরম পরিণতির জন্য তৈরি থাকতে হবে।'

'আমি সবসময় আমার চরম পরিণতির জন্য তৈরি আছি।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'মানে?' ভ্রূ কুঁচকে গেল অ্যালেস্টরের, 'আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি কাজটা করতে ভয় পাচ্ছি, আমার ভেতরে কোনো সংশয় কাজ করছে?'

'না, আপনার মনে কোনো সংশয় কাজ করছে না। তবে করবে, আপনি প্রস্তুতি শুরু করলেই করবে। আর সেটা আপনার নিজের জন্য করবে না, করবে আপনার মেয়ের জন্য। সন্তান স্নেহ দেবতাদেরও দুর্বল করে দিয়েছে সময়ে সময়ে, আপনার কিছু হলে, আপনি যদি শাসকের রোষানলে পড়ে যান, তাহলে আপনার সন্তানও সেই অনলে পুড়ে মরবে, এই চিন্তাই আপনাকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেবে।'

স্বীকার করতে বাধ্য হলেন অ্যালেস্টর, 'হ্যাঁ, আমিও যে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবিনি তা নয়, এমনকি এরই মধ্যে মেয়েকে তৈরি থাকতে বলেছি বিয়ের জন্য। পাত্র খুঁজছি। কিন্তু, এখনো তেমন একটা আগে বাড়তে পারিনি।'

'আপনাকে আগে এই ব্যাপারটার সমাধান করতে হবে। আপনি গুপ্তহত্যার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে থাকুন, কিন্তু একই সাথে আপনাকে অবশ্যই মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজে বের করতে হবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যে কথা বললেন, সেই আশঙ্কা তো বিয়ের পরেও আমার মেয়ের ব্যাপারে থেকে যাবে। আমি যদি রাজদ্রোহী হিসেবে ধরা পড়ি অথবা মরে যাই, তবেও তো ঐ পায়াস আমার মেয়ের ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। আমি এটাই চাই যাতে আমার মেয়ে এসবের বাইরে থাকে।'

মেয়ের প্রতি ভালোবাসা যেন অ্যালেস্টরের কণ্ঠ থেকে ঝড়ে পড়ছে, শক্ত মানুষটাকে একটু নরম হতে দেখার বিরল অভিজ্ঞতা হলো বৃদ্ধ অভিজাতের, 'ঠিক এই কথা ভেবেই আমি আপনার জন্য একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আপনি এমন একটা ঘরে মেয়েকে বিয়ে দেবেন, যাতে আপনার খারাপ কিছু হয়ে গেলে কেউই সেই ঘর আর আপনার মেয়ের স্বামীর দিকে আঙুল তুলে কথা না বলতে পারে।'

'আপনি কার কথা বলছেন?'

'সহজ হিসেব। যেই যুবক এবার মহা অভিজাত হয়েছে। নিকোলাস। তার সাথেই আপনি ইনোনের বিয়ে দিয়ে দিন। তাতে আপনি যদি ঐ পায়াসকে হত্যা করতে গিয়ে ধরাও পড়েন, তাতে পায়াস স্পার্টার মহা অভিজাতকে ঘাঁটাবার আগে দুবার চিন্তা করবেন। আর সেখানে বাপের দোষ তো আর মেয়ের ওপর দেওয়া যায় না। আপনার পরাজয়ের ফলে লজ্জার গ্লানি বয়ে বেড়াতে হবে ইনোনকে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার শারীরিক কোনো ক্ষতি হবে না।'

'মন্দ নয় আপনার উপদেশ। আমি এই কাজই করবো।'

'হ্যাঁ, আর তাতে আরও সুবিধা পাওয়া যাবে। ভেবে দেখুন, এতক্ষণ যে আপনি কেবল নিজের ব্যর্থতা নিয়েই কথা বলেছেন। কিন্তু যদি আপনি সফল হন তাহলে কী হবে? তখন এই মহা অভিজাত আপনার জামাতা। আর যত সব অভিজাত আছে তারা সবাই তার বন্ধুবান্ধব। তাতে সেই দলের সমর্থন আপনি

পুরোই পাবেন। সম্পূর্ণ অভিজাত দলের সমর্থন আর সেনা মিলিয়ে আমাদের লাভ খুব একটা কম হবে না।'

'তাহলে আর দেরি করা কেন? আজকে থেকেই শুরু করা যাক।'

'হ্যাঁ, মহামান্য অ্যালেস্টর, আপনি তাহলে গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা করার জন্য যা তথ্য লাগে জোগাড় করা শুরু করুন, আর আমি এদিকে মহা অভিজাত নিকোলাসের ব্যাপারটা দেখছি।'

দুজনেই এবার বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। এতক্ষণে সবাই কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেছে। তারাও এবার বাইরে যাবার সুরঙ্গে ঢুকে পড়লেন।

নিকোলাস ওদিকে মরিসের কাছে কিছুক্ষণ বসেছিল। সকালের পরে নিজেকে বেশ অশুচি লাগছে তার। মনে হচ্ছে পুরো শরীরে গা ঘিনঘিন করা কিছু একটা মাখানো আছে। মরিসের সাথেও তার কথা হলো বেশ আনমনে। মরিস সুস্থ হয়ে উঠছে যতই ততই তার পুরানো খিকখিক স্বভাব ফিরে আসছে। আজ আর নিকোলাস ওর সাথে তাল মেলাতে পারছে না। বেশ কিছুক্ষণ পরে অনেকটা বাধ্য হয়েই জোর করে নিজের প্রাসাদে ফিরে এলো সে।

মনের এমন অবস্থার সাথে সে পরিচিত না। এতো ক্লেদ কখনো তার মনে আর শরীরে লাগেনি। প্রাসাদে পৌঁছে আর দেরি করলো না সে, স্নান ঘরে প্রবেশ করলো। অনেকক্ষণ ধরে নিজের শরীর রগড়ে যেন নিক্সের সমস্ত সুবাস, স্পর্শ, অনুভূতি মুছে দিতে চাইছে সে। কিন্তু তাতেও সফল হচ্ছে না মন। মনে হচ্ছে, হারকিউলিসের সেই সেন্টরের রক্তে ভেজানো পোশাকের মতো এই অভিশাপ তার সারা শরীরে চেপে বসেছে। একমাত্র নিজের শরীরের চামড়া খুলে নিলেই এই যন্ত্রণার অন্ত হবে।

তবে মনের ঘিনঘিনে অনুভূতি দূর না হলেও, জলের স্পর্শে সারাদিনের চিন্তার ক্লেদ একটু হলেও ধুয়ে গেল তার। স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে, একটা কাপড় গায়ে জড়ানো। তার ঘরের দরজায় একজন পরিচারককে অপেক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইলো নিকোলাস।

'একজন বৃদ্ধ অভিজাত আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন।'

কারো সাথে দেখা করতে ইচ্ছে করছে না, তবে নিজের পদ আর দায়িত্ববোধের কারণে মানুষ অনেক কিছু করতেই বাধ্য হয়। একজন বৃদ্ধ অভিজাতকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। পোশাক পরে বেরিয়ে এলো নিকোলাস।

বৃদ্ধ অভিজাত ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন, নিকোলাস ত্রস্ত হাতে ইশারা করলো, 'আরে বসুন, বসুন, আপনাকে দাঁড়াতে হবে না।'

দুই জনের মধ্যেই নানা রকম সৌজন্যের কথা বিনিময়ের পর কাজের কথা শুরু হলো। বৃদ্ধ অভিজাত সহজ গলায় বললেন, 'আমি কিন্তু আপনার জন্য একজনের তরফ থেকে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।'

'বলুন।'

'আপনি অবশ্যই মহামান্য অভিজাত অ্যালেস্টরের নাম শুনে থাকবেন। উনিও আপনারই মতো একজন মহা অভিজাত। তবে এই স্পার্টার সকল মহা অভিজাতের মধ্যেও উনি ওনার কর্মের জন্য বিশেষ সম্মান পেয়ে থাকেন। ওনার একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। সেই কন্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়েই আমি এসেছি। তিনি নিজ কন্যাকে আপনার হাতে অর্পণ করতে চান। এতে আপনার গৌরব আরও বাড়বে বলেই আমি বিশ্বাস করি। সেই হিসেবে আপনি এযাত্রা আমাকে ঘটক হিসেবে ধরে নিতে পারেন।

নিকোলাস দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়েও ফেললো না। জগতের সমস্ত মেয়ে জাতির ওপরেই তার বিদ্বেষ ভাব চলে এসেছে। এখন আবার বিয়ের কথা শুনতে ইচ্ছা করছে না তার। তবে ভদ্রতাও বজায় রাখতে হবে, 'আমি এই প্রস্তাব পেয়ে খুশি। তবে জানেন তো, এসব ব্যাপারে একটু ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আপনাকে আর কী বোঝাবো। আমি একটু ভেবে দেখি। দুয়েকদিনের মধ্যে আমি আপনার কাছে সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।'

'হ্যাঁ, ভেবে নিন। তবে আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আপনার জন্য সোনায় সোহাগা। আমি তাহলে উঠি এখন। শুভ রাত্রি।'

নিকোলাস অথিতিকে বিদায় দিয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়লো। রাতের খাবারে আজ আর তার কোনো আগ্রহ নেই।

অতিথি সৎকার নেহাত মন্দ হলো না। অনেক দিন পরে অন্য কিছু পেটে পড়ে তাদের ভালোই লাগলো। শস্য সেদ্ধর মতো নেহাত সাধারণ একটা জিনিসকেই মনে হতে লাগলো অমৃত। ওরিয়ন তো বেশ কয়েক পাত্র এর মধ্যেই শেষ করে দিয়েছে। ওদিকে সর্দার কলিন ওরিয়নের ক্ষুধা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে কথার তোড়ে, 'খাও, এই শস্য স্পার্টার সাধারণ লোকে চোখে দেখে না। এক প্রথম শ্রেণির অভিজাতের বাড়িতে যাচ্ছিল এই বস্তা। অভিজাত আগাম টাকা খরচ করে দাসেদের দিয়ে এটা চাষ করায় প্রতিবার। এইবার আমি তক্কে তক্কে ছিলাম। শস্যের চালান রাস্তায় আসতেই টুপ করে সাবড়ে দিয়েছি।'

এরই মধ্যে ইভানদের নগরের আইন ভাঙার ঘটনা শুনে ফেলেছে কলিন আর তার লোকেরা। ওরিয়ন আরেকটু বিস্তারিত গল্প করেছে পথে আসতে আসতে। শুনে কলিন হেসে ফেলেছিল, 'তোমাদের ভাগ্যের ঘুরে যাওয়া দেখে আমি আসলে হাসি আটকে রাখতে পারছি না।'

'কী রকম?' জানতে চেয়েছিল ওরিয়ন।

'শোনো, বলছি', কলিন ব্যাখ্যা করে, 'তোমরা ঐ দ্বিতীয় শ্রেণির অভিজাতের কাছে গিয়েছিলে কাজের জন্য তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'যদি কোনো ঝামেলা না হতো, তাহলে এতক্ষণে তোমরা সেই মালামাল রক্ষা করার দায়িত্ব পেতে। আর আমাদের কাজই হচ্ছে নগরে যেতে থাকা মালামাল সুযোগ বুঝে ডাকাতি করা। তখন তোমরা আমাদের বাঁধা দিতে। তবে সেটা তো আর হয়নি, ঘটনা ঘটে গেছে। এখন তোমরা আমাদের দলে যোগ দিয়েছ। এখন ঐ অভিজাতের মালামাল লুট করেই তোমাদের এই পথে যাত্রা শুরু হোক। আমার কাছে খবর আছে, দুই দিন পরেই তার মাল নগরের পথে রওনা দেবে।'

ইভান কেবল বলেছিল, 'এখনো তোমার দলে আমরা যোগ দেইনি। আগে খেয়ে নিই, তারপর সিদ্ধান্ত নেবো।'

তারপরেই শুরু হয়েছে এই খাবার-দাবারের পালা। আর এই ব্যাপারে ওরিয়নের আগ্রহই বেশি। ক্ষিধে আর রুচির তাগিদে ইভান কিছুক্ষণ চালিয়েছিল, কিন্তু মনের অস্থিরতা কিছুক্ষণের মধ্যেই কেড়ে নিলো সেই রুচি। ব্যাপারটা খেয়াল করেছে কলিন।

খেয়েদেয়ে নিজেদের মতো করে বসেছে সবাই। কলিন ইভানের কাছে একটু অনুযোগ করলো, 'তুমি তো দেখি কিছুই খেলে না। আমি তো ভেবেছিলাম কারো মধ্যেই এই অপূর্ব খাবার এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা নেই। ভুল প্রমাণিত হলাম।'

ইভান ভদ্রতা বজায় রাখল, 'না, আমার পেট ভরে গেছে।'

'আচ্ছা, সে যাক। বলো এবার, কী ঠিক করলে তোমরা। আমাদের দলে যোগ দিচ্ছো?'

ওরিয়ন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। একবার মনে হচ্ছে ওদের সাথে থাকলেই ভালো হবে, আবার মনে হচ্ছে, ধুর এসব কী চিন্তা করছে সে। উত্তরের জন্য ইভানের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

ইভান ভেবে নিয়েছে, 'তোমাদের দলে যোগ দিতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। তুমি ঠিকই বলেছ, আমাদের এখন আর সমাজ-জাত বলে কিছু নেই। আমাদের জন্য এখন সূর্য যে কথা চন্দ্রও একই কথা। আমি তোমাদের দলে যোগ দেবো, তবে এখন না। আমার এখনো একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। সেটা শেষ করেই আবার তোমাদের দলে চলে আসবো।'

'কী এমন কাজ বাকি রয়েছে তোমার?'

ইভান ইতস্তত করলো, ওরিয়ন অস্ফুটে বলে উঠলো, 'সবচেয়ে ঝামেলার কাজটাই আছে। প্রেম।'

হো হো করে হেসে উঠলো কলিন, 'প্রেম আবার কোনো সমস্যা না-কি? সে রাজি থাকলে সাথে করে নিয়ে এসো, আর রাজি না থাকলে জোর করে নিয়ে এসো। এটাই তো যোদ্ধার রীতি।'

'এখানে ব্যাপারটা এত সহজ না' ইভান উঠে দাঁড়ালো, 'আমাকে যেতে হবে।'

'নিশ্চয়ই তোমার প্রেমিকার কাছে যাবে। এবং আমি যদি ভুল না করে থাকি' কলিন নিজেও উঠে দাঁড়িয়েছে, 'তোমার প্রেমিকা ঐ নগরেই থাকে। তাই নগরের বাইরে যে তোমার কোনো দুনিয়া নেই সেটা সবাই জানে।'

'ঠিক ধরেছ তুমি' ইভানের গলায় দৃঢ়তা, 'আমি এখন নগরেই যাবো।'

'এই অবস্থায়? তোমাকে ওরা পেলে আস্ত রাখবে? তোমার খোঁজে ওরা এই জঙ্গলে চলে এসেছে, আরেকটু হলে সফলও হয়ে যেতো। বোকার মতো কাজ করে উল্টো মারা পড়বে, তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না।'

ওরিয়ন এতক্ষণে সঠিক সঙ্গী পেয়েছে, কলিনের কথায় সঙ্গত দিলো, 'আমিও তাই বলছিলাম। এখন যাবার কোনো দরকার নেই।'

'না গেলে চলবে না' ইভান নিজের ধৈর্য হারিয়ে ফেললো, 'আমার জন্য ও বসে আছে, আমি নিশ্চিত। আমার পথের দিকে চেয়ে চোখের জল ফেলছে সে। আমি তো তার ঠিকানা জানি, কিন্তু সে তো আর আমার ঠিকানা জানে না, কি জানি. এতদিনে নিশ্চয়ই আমার পলাতক হবার ঘটনাও শুনে ফেলেছে। আমাকে যত তাড়াতাড়ি হোক, ওর সাথে দেখা করতেই হবে। আর দেরি করা যাবে না।'

কলিন এবার ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে, এই প্রেম সাধারণ পর্যায়ে নেই। এখানে ঠাট্টা করা যাবে না, 'ঘটনা তো তাহলে অনেক সঙ্গিন। বন্ধু হিসেবে এখন কিছুতেই তোমাকে ঐ নগরে যেতে দিতে পারি না, কিন্তু আবার তোমার প্রেমকেও অস্বীকার করতে পারছি না। তবে আমার কাছে তোমার এই সমস্যার সাময়িক সমাধান আছে। তুমি চিন্তা কোরো না। তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো।'

ইভান অনড় দাঁড়িয়ে থাকে, কলিনের হাতে কী উপায় আছে তা শোনার কোনো আগ্রহ বোধ করছে না সে। যা করার নিজেরই করতে হবে।

কলিন আবারো বোঝায়, 'তুমি কেবল একবার বলো, তুমি আমাদের দলে যোগ দিয়েছ। আমি তোমার সম্পর্কে অনেক শুনেছি, আজ তো নিজের চোখেই দেখলাম। তুমি দলে থাকলে আমার সেনারা অনেক কৌশল শিখতে পারবে, সাহস পাবে মনে। আমি তোমার কাজে সবরকম সহায়তা করবো, তুমি আমাকে করবে।'

ওরিয়ন রাজি হয়ে যায়, 'ঠিক আছে। আমরা আছি তোমাদের সাথে। এখন বলো, তোমার কী উপায় আছে হাতে?'

কলিন এবার হাসে, 'আমার হাতে খুব ভালো গুপ্তচর ব্যবস্থা আছে। আমি কোনো অভিজাতকে দলে পাবো না জানি, তা আমার দরকারও নেই, আমার চরেরা ছড়িয়ে আছে হেলটদের মাঝে। স্পার্টায় কোন অভিজাতের কী মতলব, কে কী করছে সব খবরই আমি পাই, অথবা যে খবর ইচ্ছে সে খবরই আমি সংগ্রহ করতে পারি। এখন বলো, ঐ মেয়ের ঠিকানা কী? বাবা কে? আমি আজ রাতেই ঐ মেয়ের কাছে তোমার খবর পৌঁছে দেবো, সাথে ঐ মেয়ের সংবাদ আর বার্তা নিয়ে আসারও ব্যবস্থা করবো।'

ইভান এবার আগ্রহী হয়, 'তুমি সত্যিই এই কাজ করতে পারবে?'

'আমাকে যেনতেন ডাকাত মনে করো না। আমরা দস্যু নই, বিপ্লবী। আর বিপ্লবীদের এমন অনেক সংবাদের দরকার হয়। আমি পারবো।'

ওরিয়ন বলে শুরু করে, 'তাহলে শোনো, স্পার্টা সম্পর্কে যখন জানো, তখন তো নিশ্চয়ই মহা অভিজাত অ্যালেস্টরকে চেনো?'

'অবশ্যই।'

'মেয়েটা হচ্ছে ঐ অ্যালেস্টরের মেয়ে ইনোন।'

আচমকা কলিনের মুখে জ্বলতে থাকা আলোর উজ্জ্বলতা কমে এলো কথাটা শুনে। মহা অভিজাতের মেয়ে! এত ওপরে লোক পাঠানো তো তার জন্য বেশ কঠিন।

ওরিয়ন সমস্যাটা বুঝতে পারলো, ঠাট্টা করে উঠলো সে, 'কী, নামটা শুনেই ভেতরের সব হাওয়া বেরিয়ে গেল?'

'না, আমার ভেতরের হাওয়া বেরোয়নি, তবে একটা সন্দেহ হচ্ছে।'

'কী সন্দেহ?' এবার প্রশ্ন করে ইভান।

'অমন একটা মেয়ে তোমার সাথে প্রেম করে কী করে? না, আমি তোমার প্রেমে সন্দেহ করছি না। কিন্তু এমন প্রেম তো আমিও করেছি। আমার হাওয়া বেরিয়ে যাবার কথা বলছিলে না, আমি কিন্তু যে সে লোক না। আমি কোন জায়গায় হেলট হিসেবে কাজ করেছি তা জানো?'

'আমরা কীভাবে জানবো? তোমাকে কি সেরা হেলটের পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল?' টিটকিরি চলতে থাকে ওরিয়নের।

'শোনো, আমি ছিলাম পায়াসের প্রাসাদে। তার বৌয়ের নাম তো তোমরা জানো। টায়রা। এই বয়সেও যার রূপের খ্যাতি স্পার্টায় প্রসিদ্ধ। আর, আমি যে সময় কাজ করতাম তখন তো সে পূর্ণ যুবতী। সেই রানী টায়রার প্রতি অনুরক্ত ছিলাম আমি।'

ভিড় থেকে একজন বলে ওঠে, 'সর্দার, আপনি পায়াসের প্রাসাদে কোথায় কাজ করতেন সেটাও ওদেরকে একবার বলে দিন।'

সবার মধ্যে হাসির রোল উঠলো, কলিন অপ্রস্তুত বোধ করলো না, সেও হাসছে, 'এতে এত হাসির কী আছে। আমি ছিলাম রানীর স্নানঘরের দায়িত্বে। ঐ দেবদুর্লভ সৌন্দর্য অনেকবার সম্পূর্ণ দেখেছি আমি, কোনো আবরণ ছাড়া। কি তাতে তো আমাদের পরিণয় হয়নি, আমিই একদিক থেকে ভালোবাসা আর প্রে দুটোই করে গেছি। বলছি কী, এই অ্যালেস্টর কন্যা ইনোনের সাথে কি ইভানে ভালোবাসা ওরকম কিছু?'

ওরিয়ন এবার একটু রেগে উঠলো, 'ইভান তোমার স্বভাবের না। তার সাথে ইনোনের ভালোবাসার নদী দুই দিক থেকেই বইছে। এখন তুমি আমাদের সাহায্য করলে করো, উল্টোপাল্টা বকার আর দরকার নেই।'

'রেগে যাচ্ছ কেন? সব সমস্যার সমাধান আছে। আমাদের দলের হেলট মেয়েরা দাসীর ছদ্মবেশে সব খবরই আনতে সক্ষম। কিন্তু ইনোনের সাথে তো ওরা কথা বলতে পারবে না। সেটা অসম্ভব। ঐ প্রাসাদের কোনো দাসীর খোঁজ কি তোমাদের কাছে আছে? যে কিনা ইনোনের সব খবর দিতে পারবে।'

আগ্রহ দানা বেঁধে উঠলো ওরিয়নের চোখেমুখে, সাথে সাথে বলে উঠলো সে, ' আছে তো। ইনোনের একান্ত সহচরী, নাম ডোরা। সে যদিও দাসী, তবু সবসময় ইনোনের সাথে সাথে লেগে থাকে। তার কাছেই সব জানতে পারা যাবে। তাকে দিয়ে আমাদের খবরও ইনোনের কাছে পাঠানো যাবে।'

'আচ্ছা, শোনো, কাল যে মেয়েটা নগর থেকে এসেছে ওর বিশ্রাম নেয়া মনে হয় এতক্ষণে হয়ে গেছে।'

ভিড়ের যার উদ্দেশ্যে কলিন প্রশ্নটা করেছে সে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, সর্দার, হয়ে গেছে।'

'আমি আবার ওকেই পাঠাবো। ওর মতো অজুহাত দিতে আর অভিনয় করতে কেউ পারে না। ভদ্রলোকের মেয়ে হলে ওকে এথেন্সে পাঠিয়ে সেরা অভিনেত্রী বানানো যেতো।'

কলিন ওদেরকে আশ্বাস দিয়ে আস্তানার অন্যদিকে চলে গেল। ইভানের কাছেও ব্যাপারটা পছন্দ হয়েছে। কোনো হেলট মেয়ের পক্ষে নগরে আর প্রাসাদে যাওয়া অনেক বেশি নিরাপদ। ডোরার কাছে যাবার একটা বুদ্ধি নিশ্চয়ই সে বের করে ফেলবে। কলিনকে এর মধ্যেই বলে দিয়েছে, আগে ইনোনের কাছে একটা খবর পৌঁছাতে হবে, ইভান সুস্থ আছে, ভালো আছে। তারপর অন্য কথা।

ওদের সামনে দিয়েই মেয়েটা বেরিয়ে গেল। সাথে দলের আরও দুজন, এরা মেয়েটার রক্ষক হিসেবে গেছে। অনেকটা রাত হয়ে গেছে। এই সময়ে অ্যালেস্টরের প্রাসাদে ঢুকতে গেলে অবশ্যই রক্ষীদের সন্দেহ হবে। নানা রকমের দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আর সেসব দুশ্চিন্তা দূর করার কোনো উপায় নেই। অপেক্ষা করতে হবে মেয়েটার ফিরে আসা পর্যন্ত।

অ্যালেস্টরের প্রাসাদ থেকে একটু আগেই ঘুরে গেছেন বৃদ্ধ অভিজাত। নিকোলাসকে প্রস্তাব দেওয়ার কথা বলে গেছেন। নিকোলাসের ভেবে উত্তর দেওয়ার কথাটাও জানিয়ে গেছেন। বৃদ্ধ বিচক্ষণ, তিনি নিকোলাসকে একদিন প্রাসাদে ডেকে আনার বুদ্ধি দিয়ে গেছেন, ইনোনের সাথে সামনাসামনি দেখা হলে নিকোলাসের নিশ্চয়ই সুবিধা হবে। অ্যালেস্টরও মত দিয়েছেন। নিজের মেয়ের ঘরে গিয়ে কথাটা জানিয়ে এসে এখন তিনি আছেন নিজের কামরায়। খোলা জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখছেন। মেয়ের এতদিনে তিনি বাদেও একটা আশ্রয় হতে যাচ্ছে, আর সামনে সময় খুবই কঠিন, দুটো মিলিয়ে খেলা করছে তার ভাবনা। তবে আপাতত তার আর কোনো পিছুটান রইলো না। এবার পায়াসের ওপরে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া যায়। একটা বড়ো আকারের ভারী কাগজ টেনে নিয়ে টেবিলে বিছালেন তিনি। হাতে কালি। একটু পরেই ডুবে গেলেন কাজের মাঝে। কালি দিয়ে মাঝে মাঝেই কাগজের ওপর নানা রেখা টানছেন। নানা মাপ টেনে নিচ্ছেন সোজা দণ্ডের দ্বারা।

তখনই প্রধান ফটকের দিকে একটু আওয়াজ শোনা গেল। প্রহরীরা কারো সাথে কথা বলছে, তিনি অতো একটা গা করলেন না। কিন্তু একটু পরে করতেই

হলো, এক প্রহরী এসে দাঁড়িয়েছে, 'মহামান্য, ডোরার কাছে এক হেলট মেয়ে এসেছে। তার বাবা না-কি খুব অসুস্থ। ডোরার কাছে এসেছে ওষুধ নিতে।'

স্পার্টার চিকিৎসকেরা হেলটদের চিকিৎসা করেন না, তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা, অ্যালেস্টর ডোরার এই গুণের কথা আগে জানতেন না, 'ডোরা ওষুধ বিদ্যা জানে না-কি? আগে তো কখনো শুনিনি।'

সম্ভ্রমের সাথে জবাব দিলো প্রহরী, 'মনে হয় জানে। ডোরার বাবাও তো টোটকা জানতো।'

'আচ্ছা, ডোরাকে বলো, ঐ মেয়ের সাথে গিয়ে কথা বলতে। মেয়েটাকে বাড়িতে ঢোকানোর দরকার নেই। ওষুধ যদি দেবার হয় বাইরে থেকে দিয়েই যাতে বিদায় করে।'

'আচ্ছা।' প্রহরী চললো ডোরার ঘরের দিকে, দাসীদের ঘরে তাদের যাওয়া নিষেধ, সেখানে এক পরিচারিকা দিয়ে খবর পাঠাতে ডোরা সদ্য ঘুম ভেঙ্গে এসে হাজির হলো, 'কী হয়েছে?' ঘুম জড়ানো গলায় বললো সে।

'তোমার কাছে এক মেয়ে এসেছে। তার বাবা নাকি খুবই অসুস্থ। তোমার কাছে কি ওষুধ নিতে এসেছে।'

ঘুম উড়ে যেতে সময় লাগলো না ডোরার, তড়িৎ তার মাথা চিন্তা করতে শুরু করেছে, এই সময়ে তার কাছে কোনো মেয়ের নিজের বাবার চিকিৎসার জন্য ওষুধ নিতে আসার কথা না, সে ওষুধ বিদ্যার কিছুই জানে না। এখানে অন্য কিছুর গন্ধ পাচ্ছে সে, প্রহরীর সন্দেহ জাগানো চলবে না, 'আচ্ছা, হতচ্ছাড়াগুলো ওষুধ নিতে আসার আর সময় পায় না, এত রাতে এসেছে।'

প্রহরী অচেনা রোগীর প্রতি একটু সহানুভূতি দেখায়, 'রাগ কোরো না, মানুষের অসুখ তো আর বলে কয়ে আসে না।'

'আচ্ছা, চলো, দেখছি, মেয়েটা কোথায়?'

'সদর দরজার বাইরে।'

বাইরে এসে মেয়েটার সাথে দেখা করলো ডোরা, প্রহরী নিজের জায়গায় পাহারা দিচ্ছে, ওদের থেকে বেশ খানিকটা দূরে, 'তুমি কে?'

হেলট মেয়েটা আসলেই মারাত্মক অভিনেত্রী, তার মুখ আর কথার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে আসলেই অনেক বিপদে আছে, আসলে বলছে, 'শোনো, বেশি কথা বলার সময় নেই। তুমি নিশ্চয়ই ডোরা। আমি জেনেছি তোমার বাবা ওষুধ বিদ্যা জানতেন, তাই এই কথা বলেছি যাতে কারো সন্দেহ না হয়। আমাকে এখানে পাঠিয়েছে ইভান। সে ভালো আছে।'

ডোরা নিজেও শান্ত ভঙ্গি রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করছে, 'আর ওর সঙ্গী?'

'হ্যাঁ, সেও ভালো আছে। ওরা এখন জঙ্গলে আমাদের আস্তানায় আছে। ইভান ইনোনের খবর নিয়ে যেতে বলেছে।'

'খবর আমি এখনই তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু আমাকে একটু ইনোনের সাথে কথা বলতে হবে। এই ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আমাদের আসতেই হবে। আমি এখন ওষুধ আনতে ভেতরে যাবো। তুমি একটু অপেক্ষা করো।'

প্রহরীকে বলে ওষুধ আনতে ভেতরে চলে গেল ডোরা। সোজা সবার অলক্ষ্যে চলে গেল সে ইনোনের কামরায়। সে জানে, ইনোন ইদানীং রাতে ঘুমাতে পারে না। কামরায় এসে দেখল, ঠিকই, জেগে জানালার পাশে বসে আছে সে।

ডোরা ইনোনের হাত ধরলো, 'ইভান খবর পাঠিয়েছে।'

এই একটা বাক্যই যেন ইনোনের পুরো শরীরের স্থিতি জড়তা কাটিয়ে দিলো, জীবনের উচ্ছ্বাস ফিরে এলো সাথে সাথে, 'ইভান এসেছে?'

'না, কিন্তু সে ভালো আছে। একজনকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে। আপনার খবর জানতে চেয়েছে।'

'আমার মনে হয় সেটা তুমি বেশ ভালো করেই জানো। আমি আসলে ইভানকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না। শুধু মহা অভিজাত নিকোলাস কেন, রোমান সম্রাটের সাথে বিয়ে ঠিক হলেও আমি পরোয়া করি না। আমি ইভানকেই বিয়ে করবো। ইভানের কাছে এই খবরটাই পৌঁছানোর ব্যবস্থা করো। শুধু বলবে, আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি, সে যখন যেভাবে বলবে আমি বেরিয়ে আসবো, আমি এই প্রাসাদ ছেড়ে, এই নগর ছেড়ে, এই দেশ ছেড়ে যে-কোনো জায়গায় যেতে রাজি আছি। আমি শুধু তার সাথে থাকতে চাই।' প্রেম আর বিরহের মিলিত উচ্ছ্বাসের বাষ্প বেরিয়ে এলো ইনোনের দুই চোখ দিয়ে।

ডোরা তার হাত এখনো ছাড়েনি, 'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি ইভানের কাছে এই সংবাদ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি। ইভানের ক্ষমতা সম্পর্কে এরই মধ্যে আমরা জেনেছি। পায়াসের বাহিনীর সাত সৈন্য সে একা হাতে মেরেছে। পুরো নগর ওলটপালট করে দিয়ে হলেও সে আপনাকে নিয়ে যাবে। এখন একটু ঘুমানোর চেষ্টা করুন।'

ডোরা একটা খালি পুঁটুলি দলা পাকিয়ে নিয়ে এসেছে, প্রহরীরা মনে করবে এর মধ্যেই আছে ওষুধ। হেলট মেয়েটার কাছে এসে পুঁটুলিটা তার হাতে দিলো, সাথে নিচু গলায় বলল, যেন ওষুধ খাওয়ানোর নিয়ম বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'ইভানকে বলবে, ইনোন তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে যাতে এখানে এসে ওকে নিয়ে যায়।'

'এটুকু বললেই চলবে?'

'হ্যাঁ।'

হেলট মেয়েটা প্রস্থান করলো। ডোরা চলে এলো নিজের কামরায়। বুঝতে পারছে একটা কালো মেঘে পূর্ণ সময় এগিয়ে আসছে। প্রেমের সমুদ্রে নেমেছে যখন তখন ঝড় তো একটু সামলাতেই হবে।

হেলট মেয়েটা দ্রুত পায়ে হেঁটে প্রাসাদ থেকে দূরে চলে এলো। তারপর হাতের পুঁটুলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো জঙ্গলের ভেতর। সেই সাথে নিজেও ঢুকে পড়লো জঙ্গলে। অন্ধকারের ছায়ার সাথে মিশে থাকা দুই ছায়ামূর্তি উদয় হলো তার দুই পাশে, এক গতিতে চলতে লাগলো তিনজন।

জনতা এতক্ষণ যে খেলা দেখেছে তাতে যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছে। এখনো মৃত যোদ্ধার রক্ত জ্বলজ্বল করছে রঙ্গভূমিতে। মূলত এটাই হয় এই খেলা দেখানোর শেষ অংশ। দর্শকেরাও যেতে উদ্যত হয়েছিল। তখনই এসেছে এই আখড়ার মালিকের ঘোষণা, 'আপনারা সবাই আমার কথা শুনুন।' যথেষ্ট গলা উঁচিয়ে কথাটা বলছেন মালিক। হাতে একটা চোং থাকার কারণে শব্দ মোটামুটি সবার কাছেই পৌঁছে যাচ্ছে, 'আপনাদের সবার জন্য আজকে একটা বিশেষ খেলা রাখা হয়েছে শেষে। আপনারা সবাই দয়া করে দেখে যাবেন। এই খেলার জন্য আপনাদেরকে কোন আলাদা মূল্য দিতে হবে না।' মালিকের কথার পরে ধারা বর্ণনাকারী কোনো কিছু না জানা সত্ত্বেও সেই খেলা সম্পর্কে নানা কথা বলতে লাগলো দর্শকদের উদ্দেশ্য করে।

একবার কোনো ভিড়ময় এলাকা থেকে গাত্রোত্থান করলে পুনরায় ঐ জায়গায় আবার বসে পড়াটা একটু কঠিন। তার ওপরে এখানে সবচেয়ে মজার খেলাটা শেষ। কিন্তু প্রত্যেক দর্শকেই বাড়তি মুদ্রা দিয়ে আজকে প্রবেশ করেছে এখানে। সেই মুদ্রা উসুল করার লোভে কেউ কেউ আবার নেহাত কৌতূহলের বশবর্তী হয়েও বসে পড়লো। মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা ফিরে আসতেই রাহুর দিকে ইশারা করলেন আখড়ার মালিক।

রাহু জোরে একটা দম নিলো। এবার মঞ্চে প্রবেশ করতে হবে। আগে বারিগাজায় অনেক খেলা দেখালেও এমন বড়ো ভিড়ের সামনে জীবনে কখনো খেলা দেখায়নি সে। খেলা দেখানো তো দূরে থাক, জীবনে কখনো এত বড়ো ভিড়ের মধ্যমণি হয়ে ওঠার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য তার হয়নি। এমন সময়ে পা কাঁপতে থাকা স্বাভাবিক।

আস্তে আস্তে হেঁটে প্রবেশ দরজা পেরোলো সে। তারপর একেবারে প্রাঙ্গনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। দর্শকেরা অবশ্য তার চেহারা দেখে তেমন একটা ভরসা পেলো না। এমন চেহারার এক লোক আর কিইবা দেখাবে। তার ওপর হাতের খাঁচা যেটা আছে সেটা একটু বেশিই ছোটো। এমন খাঁচায় কোনো ভয়ংকর প্রাণী তো আর থাকতে পারে না। হয়তো আছে কোনো বিষধর সাপ, যা দেখে একটু আমোদ পাবে তারা। কিছু কিছু দর্শকের কাছ থেকে ঠাট্টা মশকরা ভেসে আসতে লাগলো।

সেসবে গা করলো না রাহু। নিজের হাতে থাকা সম্পদের প্রতি তার পূর্ণ আত্মবিশ্বাস আছে। খাঁচাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ওপরের চাদরের ঢাকনাটা এক টানে সরিয়ে ফেললো সে। সাথে সাথে দর্শকদের মাঝে যেন পিনপতন নীরবতা নেমে এলো।

এই প্রাঙ্গনে এর আগেও কম বিস্ময়কর বস্তু প্রতক্ষ্য করেনি তারা। তবে এবারেরটা যেন সবকিছু ছাড়িয়ে গেছে। কোনো প্রাণীর দেহে এত রং এক সাথে থাকতে পারে তা একবার চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। অঙ্গদকে বের হবার ইশারা দিলো রাহু, গলার শেকলে টান পড়াতে বেরিয়ে এলো অঙ্গদ। বাইরে বেরিয়ে এসে সে তাকাচ্ছে চারপাশে। গত কিছুদিন রাহু অনেক ঝামেলায় ছিল। অঙ্গদকে এই খাঁচায় থাকতে হয়েছিল টানা বেশ কয়েকদিন। তার মতো একটা স্বভাব চঞ্চল প্রাণীর ক্ষেত্রে এটা খুবই কষ্টকর একটা বিষয়, বাইরে বেরোবার সুযোগ পেয়েই সে স্বভাবসিদ্ধ লাফালাফি করে শরীরের জড়তা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো।

রাহু এটা বুঝতে পেরেছিল আগেই। এজন্যই বেরেনিকে এসেই অঙ্গদকে বের করেনি। এবার নিজের শরীরের তাগিদেই অঙ্গদ শরীর ঝাঁকাবে, নাচাবে, আর দর্শকেরা একেই ধরে নেবে অঙ্গদের খেলা হিসেবে।

রাহুর হিসেব একেবারে ঠিক আছে। অঙ্গদের বিচিত্র লাফ দেখে দর্শকেরা ভীষণ আমোদ পেলো। তারা চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে বানর আর বানরের মালিক উভয়কেই। ঘুরে ঘুরে দর্শকদের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে রাহু আর দর্শকেরাও খেলা দেখানোর বকশিশ দিতে কার্পণ্য করছে না। সবাই নিজেদের মুগ্ধতা প্রকাশ করছে মুদ্রা দিয়ে।

অঙ্গদ অনেকদিন পরে সামনে মানুষের এত উচ্ছ্বাস দেখছে। সে যখন অসিতের সাথে ছিল তখনকার স্মৃতি ফিরে এলো যেন তার মনে। বার বার লাফিয়ে সে অসিতের শেখানো খেলাগুলো দেখাতে লাগলো সামনের দর্শকদের। তারপর হঠাৎ মনে হলো, না অসিত তো আর এখন তার সাথে নেই। আবার অঙ্গদের মনে ফিরে এলো বিষণ্নতা, অঙ্গদ প্রাঙ্গনের এক কোণায় গিয়ে আনমনে বসে পড়লো, মাটির দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজছে।

রাহু বুঝতে পারলো, স্বাগত ভঙ্গিগুলো অঙ্গদ শেষ করে ফেলেছে। এখানে আর খেলা ভালো করে দেখানো হবে না। সে তো অঙ্গদের একটা নড়াচড়াও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তবে দর্শকেরা এত কিছু বুঝতে পারলো না। তারা অঙ্গদকে দেখেই অনেক খুশি। কয়েকটা মুদ্রা কুড়িয়ে নেবার লোভ ঝলকে উঠলো রাহুর মনে। তবে নিজেকে সংবরণ করলো সে। বড়ো প্রাপ্তির জন্য সব কাজেই প্রথমে ছোটো কিছু প্রাপ্তিকে অগ্রাহ্য করতে হয়।

খেলা শেষ করে অঙ্গদকে নিয়ে দাঁড়িয়ে দর্শকের কুর্নিশ করলো রাহু। এদিকের এই প্রথাটা তার জানা আছে। দর্শকেরা তুমুল করতালিতে রাহু আর অঙ্গদকে ভাসিয়ে স্থান ত্যাগ করতে শুরু করলো।

রতনে রতন চেনে আর কষ্টি পাথর চেনে সোনা। দর্শকেরা চলে যাচ্ছে, হাততালি দিচ্ছে কিন্তু আখড়ার মালিকের সেদিকে খেয়াল নেই। এমনিতে এসব

প্রদর্শনীতে নানা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। তিনি নিজেও নানা কৌশল অবলম্বন করে নানা অদ্ভুত প্রাণী দর্শকদের সামনে প্রদর্শন করিয়েছেন। কিন্তু এতো একেবারে প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল। তিনি নিজের সমস্ত অভিজ্ঞতা আর ব্যবসায়ীক বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারলেন, এই প্রাণী অসাধারণেরও অনেকটা ওপরে। আকারে ভারতীয় বানরের মতো হলেও এমন একটা কখনো কেউই চোখে দেখেনি। তিনি বুঝতে পারছেন, তার এই আখড়ার নাম ছড়িয়ে যাবে এই প্রাণীর বদৌলতে। না, লোক চিনতে ভুল করেননি তিনি। রাহুর আত্মবিশ্বাস আসলেই ছিল, এবং তা ফাঁকা না, যথেষ্ট ভরাট।

রাহু এখনো মাঝ প্রাঙ্গনেই দাঁড়িয়ে আছে। অঙ্গদ এখন আর নড়াচড়া করছে না। অপেক্ষা করছে কখন আবার রাহু তাকে খাঁচায় ঢুকতে বলবে।

শেষ দর্শকও বেরিয়ে গেল আসন ছেড়ে। এবার মালিক চলে এলেন প্রাঙ্গনে, তিনি নিজেও অঙ্গদকে দেখে বিস্মিত, অঙ্গদের গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন তিনি, 'এই জিনিস তুমি কোথায় পেয়েছ? বানরের আকার আর গঠন দেখে তো মনে হচ্ছে ভারতের। কিন্তু এমন কোনো বানর তো এই পৃথিবীতে আছে বলে জানতাম না।'

'আমি ভারত থেকেই এনেছি। আমার নিজের রাজ্য থেকে। ঠিকই বলেছেন, এই বানর সাধারণ নয়। সমস্ত পৃথিবীতে এই একটাই আছে। আমারও এই বানর খুঁজে বের করতে খুব কষ্ট হয়েছে।'

'আর আমাদের এদিকের ভাষাও তো ভালোই জানো দেখছি। আমার এখানেই থাকো তুমি। আমার এই আখড়ায় খেলা দেখাও। এরকম জমজমাট আখড়া রোমান সাম্রাজ্যের কোথাও নেই।'

রাহু এই কথার সাথে একমত হতে পারলো না, 'আমি তো শুনেছি গ্রীসে আর রোমে আরও অনেক বড়ো বড়ো আখড়া আছে।'

'সেটা ঠিকই শুনেছ। সেগুলো অনেক বড়ো। কিন্তু সেখানে তো আর আমি-তুমি যেতে পারবো না। ওরা বাইরের জাতির লোক নিজেদের নগরে পছন্দ করে না। তুমি ওদিকে গিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

রাহু বুঝতে পারলো তার এই মন্তব্যে আখড়ার মালিক অঙ্গদকে হারিয়ে ফেলার ভয় পাচ্ছে, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'আরে না না, আমি এই বেরেনিকেতেই থাকবো। আপনি যেহেতু রাজি হয়েছেন থাকতে দিতে তাই এখানেই এখন থেকে খেলা দেখাবো।'

'আমাদের অনেক পরিকল্পনা করতে হবে। এই বানর প্রতিদিন প্রদর্শন করা যাবে না। সপ্তাহে বড়োজোর একবার। আর দেখবে সেদিনই মুদ্রায় ভেসে যাবো আমরা। প্রতিদিন প্রদর্শন করলে আকর্ষণ কমে যাবে।'

রাহুও একমত হলো, এরই মধ্যে আখড়ার এক দাস দর্শকদের ছুঁড়ে দেওয়া সবগুলো মুদ্রা কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে, সেগুলো রাহুর দিকে বাড়িয়ে দেওয়া হলো, রাহু একবার তাকালো মুদ্রার পরিমাণের দিকে, নেহাত কম নয় সংখ্যাটা। তবে সে তো আর এটা নেবে না, 'আমি এই মুদ্রা আজকে নেবো না। আজকের এই সব মুদ্রা আপনারই থাক। আজকে আপনি আমাকে কোনো চুক্তি ছাড়াই শুধু বিশ্বাস করে সুযোগ দিয়েছেন। বলতে পারেন আমার ওপর আপনার রাখা ভরসার এটা একটা ক্ষুদ্র প্রতিদান দেবার চেষ্টা।'

'ঠিক আছে। তবে এই কথায় রইলো। তাহলে ভাগের কথাটা পাকা করে ফেলি। যেদিন এই বানর প্রদর্শন করা হবে সেদিন প্রদর্শনী মুদ্রার অর্ধেক পাবে তুমি, অর্ধেক আমি। আর দর্শকেরা যা পুরষ্কার দেবে সেটাও একই রকম ভাগ হবে। রাজি?'

প্রস্তাবটা যথেষ্ট সম্মানজনক, 'জি, আমি রাজি।' আপাতত রাজি হয়ে গেল রাহু। পরে দেখা যাবে। এই ছেড়ে দেওয়া অর্ধেকও সে নিয়ে নেবে। আগে নিজের পায়ের নিচে মাটি, কিছু জমানো মুদ্রা আর অঙ্গদের একটু পরিচিতি দরকার।

'আচ্ছা, আজকে সারাদিন অনেক পরিশ্রম হয়েছে। তোমার চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে অনেক দিন ধরেই তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত। আমার এখানে ক্লান্তি দূর করার সব রকমের ব্যবস্থাই আছে।' আখড়ার মালিক বিশ্রীভাবে চোখ টিপলেন।

মৃদু হাসলো শুধু রাহু, 'আমার কেবল এখন একটু খাবার দরকার আর বিশ্রামের স্থান। আমার এবং আমার বানর, দুজনের জন্যই।'

'হ্যাঁ, তা এখনই পেয়ে যাবে', একজনকে ইশারায় ডাকলেন তিনি, 'ওদেরকে ভেতরের ঘরে নিয়ে যাও। একটা ভালো দেখে খালি ঘরে থাকতে দেবে। আর তোমার খাবার আমি সেখানেই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি। তুমি তো আমাদের এদিকের খাবার খেতে পারো? তোমাদের ভারতে তো শুনেছি মানুষ মাংস কম খায়।'

'আমার মদ-মাংসে কোনো আপত্তি নেই।'

'ঠিক আছে, খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঘরে জলের ব্যবস্থা আছে। তুমি স্নান করতে চাইলে করে ফেলো। আর তোমার বানর কী খায়?'

'ফল, বাদাম এসবই খায় বেশি।'

'আচ্ছা, ওর জন্য এসবের ব্যবস্থাও থাকবে।'

মালিকের ঠিক করে দেওয়া লোকের পেছনে পেছনে রাহু অঙ্গদকে নিয়ে একটা ঘরে উপস্থিত হলো। আখড়ার আস্তানার ঘর ঠিক যেমন হবার কথা তেমনই। শুধু একটা দরজা, কোনো জানালা নেই। সাধারণ আবাসের স্থান হিসেবে তেমন সুবিধার নয়। কিন্তু যে গত বেশ কিছুদিন জাহাজের খুপরি ঘরে কাটিয়েছে

তার কাছে এটা স্বর্গসম। অঙ্গদের খাঁচা একদিকে রেখে সে বিছানার ওপর বসলো, না, যথেষ্ট নরম গদি।

ভেতরের এক কোণে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইচ্ছে করলে সেখানে গোসল সেরে ফেলা যায়। গত দুই দিনের স্নান না করা শরীর থেকে ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলতে স্নানের বিকল্প নেই। তবে, রাহু সেই পথে গেল না। পেটে ক্ষিধে লেগেছে ভীষণ। অঙ্গদও ওদিকে চিচি করতে শুরু করেছে।

মালিক তার কথা রেখেছে। একটু পরেই খাবার চলে এলো তার ঘরে। একটা বড়ো থালা ভর্তি মাংস আর শস্য। মাংস এদিকের মতো করে মসলা দিয়ে ভাজা। রাহু এমন মাংস আগেও খেয়েছে। দেখেই জিভে জল চলে এলো ওর। অঙ্গদের সামনে কলা আর কিছু শস্য ফেলে দিয়ে হাত ধুতে চলে গেল সে। ওদিকে পরিচারক খাবার রেখে বিদায় নিয়েছে।

খাবারের ঘ্রাণ এসে ধাক্কা মারলো রাহুর নাকে। মাংসের একটা বড়ো টুকরো হাতে নিয়ে যেই না কামড় বসাতে যাবে ঠিক তখনই তার ঘরের এক কোণ থেকে একটা স্বর ভেসে এলো, 'যদি তুমি না চাও এটাই তোমার জীবনের শেষ খাওয়া হোক, তাহলে কামড়টা দিও না।'

থমকে গেল রাহু, এটা আবার কে?, 'তুমি কে? এই ঘরে ঢুকেছ কখন?'

এবার চেহারাটা অন্ধকার কোণ থেকে সামনে বেরিয়ে এলো। এদিকের মানুষ নয়, চেহারা ভূমধ্যসাগরের ওপারের লোকেদের মতো। মনে হয় গ্রীক অথবা রোমান। চেহারা ভীষণ কুটিলতায় ভরা। দেখলেই মনে হয়, ভালো কোনো চিন্তা বহুদিন এই চেহারার মালিক মানুষটা করেনি। রাহু আস্তে করে মাংসের টুকরা নামিয়ে রাখলো থালায়।

আগন্তুক এবার এসে বসলো ওর পাশে, তার আগে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলো, 'ভয় পেও না। আমার নাম জেইস। আমি গ্রীসের বাসিন্দা। এই ঘরে আমি কোনো বদ মতলবে আসিনি। তোমার উপকার করার জন্যই এসেছি।'

এই চেহারার মানুষ কখনো কারো উপকার করতে পারে বলে মনে হয় না, 'কীসের উপকার?' রাহু এখনো যে-কোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে সর্বদা প্রস্তুত।

'তুমি এখানে ভীষণ বিপদে আছো। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি, এই বানর দেখিয়ে আধা বখরা নেয়া তোমার লক্ষ্য নয়। তুমি পুরো বখরা চাও। আর তোমার কী মনে হয়? এই আখড়ার মালিক আধা বখরায় খুশি হবে? না, সেও পুরো বখরাই চায়। কিন্তু একই জিনিস তো আর দুই পক্ষই পুরো পেতে পারে না। গণিতের দিক দিয়ে সম্ভব নয়। তাই গণিত সরল করার জন্য সে খুব সোজা একটা রাস্তা বেছে নিয়েছে। তোমার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।'

হাতে নেয়া মাংসের কিছুটা এখনো আঙ্গুলের ফাঁকে লেগে আছে। ভয়ে ভয়ে রাহু তাকালো সেটার দিকে, আরেকটু হলেই বড়োসড়ো এক কামড় বসিয়ে দিয়েছিল সে, 'কিন্তু প্রমাণ কী? আমার তো তাকে খারাপ লোক বলে মনে হয়নি।'

একটু চিন্তা করলো জেইস, তারপর কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখা একটা বেড়ালের বাচ্চা বের করে আনলো, 'তোমাকে বিশ্বাস তো আমার করাতেই হবে, আর সেজন্য এখন উৎসর্গ করতে হবে এই বেড়ালের বাচ্চা। আমি বেড়াল অনেক পছন্দ করি। তোমার জন্য আমাকে এখন একটা অপছন্দের কাজ করতে হবে।'

মাংসের একটা টুকরো তুলে নিয়ে বেড়ালের সামনে রাখলো জেইস। বেড়ালটা খেয়ে নিলো কয়েক কামড়ে, তারপর থাবা চাটতে চাটতে কাত হয়ে পড়লো, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটু লালা রস, সাথে জীবন বায়ু।

চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে রাহুর আতঙ্ক চরমে উঠলো, 'তুমি দেখি ঠিক কথাই বলেছ। আসলেই তো খাবারে বিষ মেশানো ছিল। এখন আমি কী করবো?'

' শোনো, আমাদের হাতে সময় খুব বেশি নেই। তবে যেটুকু আছে তাতেই তোমাকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই বানর হচ্ছে তোমার সম্পত্তি, তুমিই এর মালিক। তবে আমি যতটুকু বুঝতে পারছি, এই বানরের কারণেই তোমাকে মরতে হবে। এবং তা খুব শীঘ্রই। মানুষের নানা ধরনের লোভ এই বানরের কারণে জন্মাবে। তুমি তো আর একে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। সেই লোভের বলি হবে তুমি।'

জেইস কথাটা মিথ্যে বলেনি। এই বানরের জন্য এখন পর্যন্ত দুই বার মৃত্যুর একেবারে সামনে এসে পড়েছিল সে। বাসিলকে হত্যা না করলে বাসিলই তাকে মেরে রাস্তায় ফেলে রাখতো। আর এখানে এই লোক সাহায্য করতে না এলে তো এখনই তার এই বেড়ালের দশা হতো। এভাবে আর কদিন বেঁচে থাকা যায়?

ভয়ে রাহুর গলা করুণ হয়ে উঠলো, 'কিন্তু আমি এখন কী করবো? এই বানর ফেলে রেখে চলে যাবো। তাহলে তো আর কোনো লাভই হলো না। এমন সম্পদ কীভাবে ফেলে রেখে যাবো?'

জেইস বুঝতে পারলো রাহু তার কথার জালে আটকাচ্ছে, তবে জেইসের মনে রাহুকে দেবার মতো প্রস্তাব আছে। তাকে না ঠকিয়েও সে এখান থেকে ভালো লাভ করতে পারবে, 'শোনো বুদ্ধিমান লোক এমন জিনিস নিজের কাছে রাখে না। আমি এই রোমান সাম্রাজ্যে জন্তু সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করি। নানা জায়গা থেকে প্রদর্শনের জন্য নানা বিচিত্র জন্তু জোগাড় করে দেই আমি। তাই জানি, তোমার কাছে যা আছে তার আসলে অনেক দাম। কিন্তু, সেই দাম তুলে নেবার মতো ক্ষমতা আমাদের মধ্যে নেই। আমরা এখানে একটা কাজই করতে পারি।'

'কী?' জানতে চায় রাহু।

'তুমি এই বানর বিক্রি করে দাও। তাহলে তোমার ঝামেলা শেষ।'

'কোথায় বিক্রি করবো এই বানর? কে কিনবে? যার কাছে বেচতে যাবো সেও তো ছলনা করতে চেষ্টা করবে।'

'আরে এখানেই তো আমি আছি। যখনই এই আখড়ার মালিককে এই খাবারে বিষ মেশাতে দেখেছি তখনই এই ভাবনা ভেবে ফেলেছি আমি। তুমি এই বানর নিয়ে আমার সাথে গ্রীসে যাবে। সেখানে আমার নগরের নাম স্পার্টা। স্পার্টা এখন যেই গভর্নর শাসন করছেন তার নাম পায়াস। তার ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানায় অনেক অদ্ভুত পশু আছে, সেসব পশু সংগ্রহ করার বাতিক আছে তার মেয়ের। বলতে পারো, তারা সেখানে তোমার বানর লুফে নেবে। এই বানরের জন্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাবে তুমি আমার হিসেবে। আরও বেশিও পেতে পারো।'

'কিন্তু আমি তোমাকে বিশ্বাস করি কী করে? তুমিও তো আমার সাথে গাদ্দারি করতে পারো।'

'তা পারি। কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করে ঋণমুক্ত হতে পারবে।'

'কী ঋণ?'

'একটু আগে আমি তোমার জীবন বাঁচিয়েছি। আর সেজন্যই তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে। আর এতে আমার স্বার্থ আছে। তুমি বানর যত বিক্রি করবে তার অর্ধেক আমি পাবো। এটাই চুক্তি। তুমি পাঁচশ স্বর্ণমুদ্রা পাবে। বাকি জীবন তোমার আর আমার বেশ আরামেই কাটবে মনে হচ্ছে।'

রাহু তবুও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। জেইস উঠে দাঁড়ালো, 'আচ্ছা, আমার সাথে যাও অথবা না যাও সেটা পরের কথা। কিন্তু এখনই এখান থেকে বানর নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। তুমি মরেছ কি না সেটা যাচাইয়ের জন্য ওরা এখনই এখানে আসবে। যদি দেখে তুমি বেঁচে আছো, তবে আমার মনে হয় না ওরা আর কোনো অন্য উপায়ের ধার ধারবে, সরাসরি তোমার মাথায় বাড়ি মেরেই মেরে ফেলবে। তার আগে এখান থেকে বের হও।'

'কোন দিক দিয়ে বের হবো?'

'এসো আমার সাথে।'

একটা গলি পথ ধরে আখড়া থেকে একেবারে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এলো ওরা। রাহুর হাতে অঙ্গদের খাঁচা। রাস্তা দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল ওরা। মোটামুটি দূরত্বে এসে দুজনেই দাঁড়ালো। 'এবার আর ওরা আমাদের খুঁজে পাবে না', জেইস নিশ্চিত হলো।

রাহু ওদিকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। আজকের ঘটনায় অঙ্গদকে ধরে রেখে ব্যবসা করে খাওয়ার পুরো চিন্তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তার। পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা নেহাত কম কিছু নয়। অনেক দামি জীবন যাপন করা যাবে। কিন্তু এটা নিশ্চিত, সে

সোনার ডিম পাড়া হাঁস বিক্রি করে দেবার ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, কিন্তু সেই গল্পে তো আর এটা লেখেনি, যার ঘরে সোনার ডিম পাড়া হাঁস পাওয়া যায়, ডাকাতেরা তার গলা কেটে সেই হাঁস পরের দিনই নিয়ে যায়। একটা একটা করে ডিম ভোগ করার সৌভাগ্য তার কখনো হয় না।

'নগরীর নাম যেন কী বললে?' জিজ্ঞেস করে রাহু।

' স্পার্টা।'

'চলো তাহলে। যেতে যেহেতু হবে দেরি করে লাভ কী?'

' না কোনো লাভ নেই। এখনই যাত্রা করতে পারি। নীল নদ হয়ে যাবো।'

বেরেনিকে বন্দরের পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়ে যাত্রা শুরু করলো ওরা। জেইস পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী, বুঝতে পারছে এই যাত্রায় ভালোই লাভ হবে। এসব রাস্তায় চলাচলের অভিজ্ঞতা তার অনেক আছে। নিরাপদেই পৌঁছানো যাবে।

ওদিকে রাহুও যাত্রা করেছে গ্রীসের এক অচেনা নগরের উদ্দেশ্যে। নতুন করে কোনো চিন্তা করার শক্তি পাচ্ছে না সে। অঙ্গদকে বিক্রি করে দেবে সে। তার প্রাণ বাঁচানোর প্রতিদান হিসেবে নিজের বিশ্বাস আর অঙ্গদকে বিক্রির অর্ধেক স্বর্ণমুদ্রা জেইসকে দিতে রাজি হয়েছে তার মন।

অকুলাস থেকে জাহাজ ছেড়েছে। ওরা যে কাজে এসেছে তাতে একটা তাড়া আছে, আর জাহাজের নাবিকদেরও ঘরে ফেরার জন্য মন আনচান করছে, কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট কাজ সারতে কিছু সময় তো লাগবেই। এখান থেকে শুধু যে বাকি পথের জন্য খাবার আর জলই নেয়া হলো তা নয়, কিছু সওদাও করা হলো এখানে। আরবের এখানে বিক্রির জন্য যেসব পণ্য আনা হয়েছে সেগুলো আবার মিশরের বাজারে চলবে না।

সবকিছু মিটে যেতেই জাহাজ ছেড়ে দিলো। এবার গন্তব্য একেবারে বেরিনিকে। সেই বন্দর অনেক বড়ো সেটা অনেক আগে থেকেই শুনে আসছে তারা। আসলেই বর্তমান রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো তিনটে বন্দরের মাঝে এটা একটা। সবরকমের ব্যবসা আর বিনোদনের ব্যবস্থা আছে এখানে। রাহু যে সেখানেই গেছে তা নিয়ে শেইরন অনেক আগে থেকেই নিশ্চিত।

লোহিত সাগরের কূলে অবস্থিত এই বন্দর। আরব সাগরের ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়ে জাহাজকে আর যেতে হবে না। ঐ সাগরের তুলনায় লোহিত সাগর শিশু। সেখানে এমন ঝড় ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। অকুলাসে জাহাজের কিছু অংশ তবু মেরামত করিয়ে নিয়েছিল প্রধান নাবিক। বাকি পথটুকু ধুঁকে ধুঁকে নয়, বরং বীরদর্পেই যাওয়া যাক।

নাবিকদের মনেও সেই একই ইচ্ছে। তারা সবাই কাজ করছে যথেষ্ট গতিতে, বীর দর্পে। ব্যবসা করে ভালো লাভ হয়েছে। নাবিকেরাও খরচ এবং নানা জিনিস কেনার মতো মুদ্রা পেয়েছে। অমন একটা ঝড়ের পর আক্ষরিক অর্থেই এই জাহাজের নাবিকদের আকাশ যেন একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

অকুলাসের পরে লোহিত সাগর হয়ে বেরেনিকে আসার সময় ছোটো ছোটো অনেকগুলো বন্দরের দেখা পাওয়া যায়। সেগুলো নিয়ে একটা ভাবনা ছিল শেইরনের। সেগুলোতে থামলে দেরি হয়ে যাবে। কিন্তু প্রধান নাবিকের সাথে কথা বলে জানা গেছে সেগুলোতে এই জাহাজ থামবে না। রুদ্রদেব আবার এদিকে একটু দুশ্চিন্তায় আছে। রাহু যদি বেরেনিকে না গিয়ে ঐ ছোটো বন্দরগুলোর কোনটায় নেমে থাকে, তাহলে তো একেবারে সর্বনাশ। ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যতগুলো বন্দর আছে সবগুলো ঘুরে যেতে পারলে ভালো হতো। তবে সেই চিন্তা তাকে বাদ দিতে বলেছেন শেইরন। সেটা করতে হলে নিজেদের মালিকানার জাহাজ লাগবে। অন্যের জাহাজে চড়ে এই আবদার করলে চলবে না।

পরের দিনই তারা পেরিয়ে গেল আফ্রিকার শিং, প্রবেশ করলো লোহিত সাগরে। নতুন হাল আর পালে জাহাজ বেশ ভালোই চলছে। অসিতের এরই মধ্যে বেশ কিছু নাবিকের সাথে ভালো খাতির হয়ে গেছে। তারা তাকে নানা গল্প

শোনায়, সাগরের নানা অদ্ভুত জীবের কথা বলে। বলে, এই সাগরই হচ্ছে পৃথিবীর ভাগকর্তা এবং ভাগ্যকর্তা। সব বড়ো বড়ো ভূখণ্ডগুলোকে এই সাগরই একটা থেকে আরেকটা আলাদা করে রেখেছে। এখন আবার মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করছে। যার সাগরের সাথে সম্পর্ক নেই তার ভাগ্যেরও তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

এই মানুষগুলোর অবস্থা দেখে ভালো লাগে অসিতের। কদিন পরে বাড়ি ফিরবে, তাই কি উচ্ছ্বাস তাদের চোখেমুখে। মাঝে মাঝে তার নিজের কথাও মনে হয়। সে বাড়ি ফিরবে কবে? রাঁধা কি এখনো আছে, পিসি কি পেরেছে রাঁধার মাকে আটকে রাখতে, নাকি রাঁধা তাদের গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে সবকিছু ভুলে গিয়ে, অপেক্ষার পালা কি ফুরিয়েছে তার?

এসব ভাবে অসিত অবসর সময়ে। তবে এসব ভাবনা এখন আর তার চিত্ত চঞ্চল করতে পারে না। মানুষের হাতে যে আসলে সময়কে মেনে নেয়া ছাড়া করার তেমন কিছু নেই, এটা সে এতদিনে বুঝে গেছে।

বেরেনিকের অপেক্ষা করতে থাকে ওরা। অবশেষে ওদের সামনে ধরা দেয় সেই বন্দর। আগের দিনই আশেপাশের প্রকৃতির চেহারা দেখে শেইরন বলেছিলেন, 'আর একদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবো।'

দুপুরের কড়া রোদ পড়েছে জলে। জলের মধ্যে প্রকাণ্ড সব জাহাজের ছায়া যেন নাচছে। এত বড়ো বন্দর দেখে হাঁ হয়ে গেল অসিতের মুখ। রুদ্রদেবও এবং অবাক হলো। নাবিকেরা খুব সাবধানে তাদের দড়ি কাছি নিয়ে তৈরি হয়ে গে বড়ো জাহাজের সাথে ধাক্কা লাগলে ঝামেলা হবে। ছোটোদের ওপর বড়োরা সবসময় খবরদারি করে। কেনো ঝামেলা হলে হাতাহাতিতে ছোটো জাহাজ কখনো পারে না, ওদের নাবিকের সংখ্যা কম। এই সমাজে ছোটোদের সবসময় মাথা নিচু করে সাবধানেই চলতে হয়।

প্রধান নাবিক আছেন একেবারে সামনে। বন্দরের লোকেদের নজরে এর মধ্যেই চলে এসেছে জাহাজ। তাদেরকে ইশারায় ভেড়ানোর জায়গা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুব সাবধানে নানা জাহাজের ফাঁক গলে সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে এখন জাহাজ। অবশেষে পূর্ণ মনোযোগ আর দক্ষতার সমন্বয়ে জাহাজ জায়গা মতো ভিড়লো।

এখনই ইচ্ছে করলে নামা যাবে না। জাহাজের মালামাল আর নাবিকদের সবার দেহ তল্লাশি হবে, তারপর সবাইকে জেরা করা হবে, তবে মিলবে বন্দরে নামার ছাড়পত্র। এসব আগে থেকেই ওদেরকে শিখিয়ে রেখেছিলেন শেইরন। কী জিজ্ঞেস করবে আর কী উত্তর দিতে হবে সেসবের অনুশীলন ভালোই হয়েছিল। বিনা বাঁধায় সেসব পেরিয়ে অবশেষে ওরা নেমে পড়লো বেরেনিকেতে।

নেমেই রসিকতার সুরে জানতে চাইলো রুদ্রদেব, 'এখন আবার কোথায় যাবেন? প্রথমে পানশালায় যাবেন নিশ্চয়ই?'

'না, রাতের এখনো অনেক দেরি। দুপুর বেলা পান করে আরাম নেই।'

'তাহলে নাপিতের দোকানে চলুন, খবর তো সব সেখানেই পাওয়া যায়।

'সব জায়গায় তো আর এক বুদ্ধি খাটানো যাবে না, তাতে লাভ নেই। অকুলাসে নাপিতের দোকান বলতে ঐ একটাই আছে। আরও কিছু আছে তবে লোকে বেশির ভাগ ওখানেই যায়। তাই সেখানে অকুলাসের খবর মিলেছিল।'

'এখানে কী সমস্যা?'

'এখানে নাপিতের দোকান অনেক। এই বন্দর নগরের চারি ধারে রীতিমতো দশ জন নাপিতের দোকান পাওয়া যাবে। কয়টায় যাবো আমরা?'

হতাশ শোনাল অসিতের গলা, 'তাহলে এখন আমরা খবর পাবো কোত্থেকে?'

'আরে সে উপায় আছে। এজন্যই তো আমি তোমাদের দলে ভিড়েছি। ভেব না, শুধু মজা দেখতেই এই বয়সে তোমাদের সাথে চলছি। হ্যাঁ, অস্বীকার করে লাভ নেই, মজা হবে কিছু সেখানে, তবে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারবো। আসলে তোমরা আমার মতো সাহায্যকারী এই কাজের জন্য এই এলাকায় আর দুজন পাবে না। তোমাদের বরাত ভালো।'

রুদ্রদেব হাত তুলল, ' ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ। এখন আমরা অঙ্গদকে খুঁজতে শুরু করলেই মনে হয় ভালো হবে।'

'সেদিকেই যাচ্ছি।'

ওরা তিনজনে হাঁটতে লাগলো নগরের মধ্য রাস্তা দিয়ে। চারপাশে অসহ্য এবং অসংখ্য কোলাহল। একটু পরেই বন্দরের কোলাহল যেন একটু হালকা হয়ে এলো। অসিত আর রুদ্রদেব নিজেদের আবিষ্কার করলো এক বড়ো স্থাপনার সামনে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা কোনো বাড়ি কিংবা প্রাসাদ নয়। বরং অন্য কিছু হবে।

'এটা কী?' প্রশ্ন করে রুদ্রদেব।

'এটাকে বলা হয় আখড়া', থেমে দাঁড়িয়ে জবাব দিলেন শেইরন, 'এখানে নানা ধরনের খেলা দেখানো হয় আর লোকে পয়সা দিয়ে এটার ভেতরে ঢুকে তা দেখে। চারিদিকে ঘেরা দেওয়া কয়েক তলা বসার জায়গা আছে, আর ঠিক মাঝখানে একটা প্রাঙ্গন। ওখানেই নানা ধরনের খেলা হয়।'

'আচ্ছা', রুদ্রদেব ধরে ফেলে ব্যাপারটা, 'তার মানে এটাই বেরেনিকের প্রদর্শনীর জায়গা।'

'বেরেনিকেতে অবস্থিত হলেও এসব ধারণা এসেছে আমাদের ওদিক থেকে। আমাদের ওদিকে এসব আখড়ার চল বেশি' শেইরন নিজের দেশের গুণগান করতে ছাড়ে না।

রুদ্রদেব কথা আর বেশি আগায় না। এখনকার রাজাদের কী অবস্থা জানা নেই, সাতকর্ণীর রাজ্যের এই দিকটা দেখা হয়নি, তবে তাদের সময়েও ভারতের রাজার এই জায়গার কয়েকগুণ বড়ো রঙ্গভূমি রাখতো নিজেদের মনোরঞ্জনের

জন্য। মাঝে মাঝে প্রজারা প্রবেশ করে সেখানে নানা অনুষ্ঠানের সাথে শক্তির প্রদর্শনও দেখত। জিনিসটা শেইরনের দেশের একার সম্পত্তি নয়।

সেই দিকে আর তর্ক করতে গেল না রুদ্রদেব, 'তার মানে রাহু এই জায়গার কথা আগে থেকেই জানতো।'

শেইরন নিশ্চিত, 'হ্যাঁ, অবশ্যই জানতো। যে একবার বেরেনিকেতে এসেছে সেই এই জায়গার কথা জানে। আর আমার ধারণা...'

শেষ করলো রুদ্রদেব, 'সে অঙ্গদকে এই জায়গায় নিয়ে আসার সুযোগ কিছুতেই ছাড়বে না। তাহলে আর দেরি কেন? আমরা তো প্রবেশ করলেই পারি। মালিকের সাথে কথা বললেই সব জানা যাবে। রাহুকে হয়তো এখন ভেতরেই পাওয়া যাবে।'

রুদ্রদেবের কথা শুনে অসিতের রক্তে যেন বান ডেকে উঠলো। সে অঙ্গদের কাছাকাছি চলে এসেছে। রাহুর সঙ্গেও একবার চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতে হবে। রাহু যে কাজ করেছে তাতে যে প্রাণদণ্ডই তার প্রাপ্য ক্ষত্রিয় নীতি অনুযায়ী, সেটা রুদ্রদেব এরই মধ্যে বলে দিয়েছে।

শেইরনের মধ্যে অবশ্য অতো উত্তেজনা নেই, 'ভেতরে যেতে হলে তো ঐ দরজার দিয়ে ঢুকতে হবে।'

ওরা দুজনেই তাকালো সেই দরজার দিকে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থা বিশালদেহী কালো লোকটাকে দরজার আগেই চোখে পড়লো।

এগিয়ে গেল তিনজনে, দরজার কাছাকাছি আসতেই দরজা আগলে দাঁড়ালো সেই বিশালদেহী, সামনে বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রকাণ্ড হাতের মুঠো।

'আমার কাছে কোনো মুদ্রা নেই' শেইরন আগেই আত্মসমর্পণ করেছেন।

রুদ্রদেব বোঝাতে চাইলো, 'আমরা খেলা দেখতে আসিনি। ভেতরে আমাদের অন্য কাজ আছে।'

প্রকান্ড বাহুর এক থাবা এসে পড়লো রুদ্রদেবের বুকে, সেই চাপে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো সে, তবে দুই পা পিছিয়েই গোড়ালি মাটিতে গেঁথে দাঁড়িয়ে পড়লো, ইচ্ছে করছে এই বিশালদেহীর শক্তির বাহাদুরি খতম করে দিতে, কিন্তু এখন তেমন কিছু করা উচিত হবে না।

শেইরন বললেন, 'ঝামেলা কোরো না, ওর সাথে কিছু করতে গেলে একেবারে কিমা বানিয়ে ফেলবে। মুদ্রা যদি না থাকে তাহলে অপেক্ষা করো, খেলার পরে মালিকের সাথে মনে হয় দেখা করতে যেতে দেবে।'

রুদ্রদেব নিজের পোশাকের ভেতরে হাত দিলো, কিছু মুদ্রা বারিগাজা থেকে নিয়ে এসেছে সে, একটা রুপার মুদ্রা বেরিয়ে এলো তার হাতে, দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন শেইরন, 'বাহ, তোমার কাছে দেখি রুপার মুদ্রা আছে। তুমি তো দেখা যাচ্ছে ধনী মানুষ।'

বিশালদেহী পাহারাদার মুদ্রাটা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো। একটা রুপার মুদ্রা দিয়েই ওরা তিনজনে ঢুকে পড়লো ভেতরে। ভেতরে তখন ষাঁড়ের প্রদর্শনী চলছে, ষাঁড়ের শিং ধরে শুইয়ে দিয়ে শক্তির পরিচয় দিচ্ছে অনেকে। দর্শকেরা চিৎকার করছে। বেশ মজার দৃশ্য হলেও এখন ওদের এসব দেখার সময় নেই। চারিদিকে রুদ্রদেব আর অসিতের চোখ খুঁজছে রাহু আর অঙ্গদকে। রাহুর চেহারা রুদ্রদেব জানে না, সে জিজ্ঞেস করলো অসিতকে, 'ওকে দেখতে পেয়েছ?'

অসিত বারবার এপাশ ওপাশ দেখছে, 'না, এখনো তো পাচ্ছি না।'

আরও কিছুক্ষণ তন্নতন্ন করে দেখে নিয়ে কোথাও রাহুর দেখা পাওয়া গেল না। শেইরন ওদেরকে নিয়ে গেলেন ভেতরের একটা জায়গায়। এখানে যারা খেলা দেখায় তারা প্রাঙ্গনে যাবার অপেক্ষায় আছে। সেখানেও রাহুর দেখা পাওয়া গেল না।

হতাশ হয়ে পড়লো অসিত, রুদ্রদেব নিজের ধারণার কথা আরেক বার স্মরণ করিয়ে দিলো শেইরনকে, 'আমি বলেছিলাম সবগুলো বন্দর ঘুরে আসতে। এখানে নেই রাহু।'

শেইরন মাথা চুলকালেন। তার এত বড়ো ভুল তো হবার কথা নয়। কিন্তু এখন নিজের যুক্তির সপক্ষে তিনি কিছু বলতেও পারছেন না।

ওরা আবার দর্শকদের আসন সারিতে উঠে এলো, আরেক বার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলো অসিত, কিন্তু না, বিধি বদলালো না।

রুদ্রদেব পা বাড়ালো, 'তাহলে আর এখানে থেকে কী লাভ? চলো, চলে যাই। বন্দরে গিয়ে আবার পেছনে যাবার জাহাজ ধরতে হবে।'

শেইরন ওদের আটকালো, 'একটু অপেক্ষা করো। এখনই গ্ল্যাডিয়েটর লড়াই শুরু হবে। ওহ, কতদিন দেখি না। ঐ যে, ঘোষক ঘোষণা করছে।'

'এখন খেলা দেখতে ইচ্ছে করছে না' রুদ্রদেব নিজের এবং অসিতের হয়ে এক সাথে বলল।

'আরে এটা খেলা না। দুই যোদ্ধা মরণপণ লড়াই করবে। একজনের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে, থামবে না।'

এবার রুদ্রদেব আগ্রহ বোধ করলো। শেইরন সোৎসাহে বললেন, 'আচ্ছা, একটু সময় থাকলে কী ক্ষতি হবে? তোমরা তো আর এখনই পেছনে যাবার মতো কোনো জাহাজ পাচ্ছো না। আর সেই জাহাজ তোমাদের আমিই জোগাড় করে দেবো। এখন একটু লড়াইটা দেখে যাই।'

ওরা শুকনো মুখে এক কোণায় খালি আসন দেখে বসে পড়লো। ততক্ষণে দুই যোদ্ধা মঞ্চে প্রবেশ করেছে। লড়াইয়ের আগে নিজেদের পেশি আর অস্ত্র দর্শকদের প্রদর্শন করে গা গরম করে নিচ্ছে দুজনেই।

লড়াই শুরু হতেই রুদ্রদেব আর অসিত মনোযোগ দিতে বাধ্য হলো। তারা দুজনেই যুদ্ধকলার প্রতি আগ্রহী, আর এখানে নতুন ধরনের কলার প্রদর্শন হচ্ছে। রুদ্রদেব দুই যোদ্ধার কৌশলের দিকেই নজর রাখছে, আর স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে, না, দুজনেরই দম আছে। কৌশল তাদের দিকের থেকে একটু আলাদা হলেও যোদ্ধার দম আর অধ্যবসায় একই জিনিস।

বেশ কিছুক্ষণ লড়াই চললো। দুজনেই বেশ কিছু আঘাত প্রতিপক্ষের শরীরে বসিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। তারপর একটা মোক্ষম আঘাত করলো একজন, প্রতিপক্ষ সেই আঘাতের বেগ সামলাতে পারলো না। শস্ত্র হাত থেকে ছুটে গে তার, নিজেও ভূপাতিত হলো।

চারিদিকে তাকালো রুদ্রদেব। নিশ্চয়ই এটাই এই যুদ্ধের পরিণতি, এক যোদ্ধা বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু দর্শকদের কাউকে উল্লাস করতে দেখা যাচ্ছে না। উল্টো পিনপতন নীরবতা। সবাই যেন কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছে। ভ্রূ কুঁচকে গেল রুদ্রদেবের। কীসের জন্য অপেক্ষা করছে সবাই?

জবাবটা পাওয়া গেল একটু পরেই। বিজয়ী যোদ্ধা এগিয়ে এলো ভূপাতিত যোদ্ধার দিকে। হাতের অস্ত্র তুলে দর্শকদের ওপর থেকে ঘুরিয়ে নিলো তার দৃষ্টি, তারপর একটা মোক্ষম আঘাত করলো গলা বরাবর। মাটিতে পড়ে থাকা যোদ্ধার মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেল।

সারা শরীর যেন কেঁপে উঠলো রুদ্রদেবের। তার হতবুদ্ধি ভাবকে ক্রো রূপান্তরিত করতে এবার সব দর্শক যেন উল্লাসে ফেটে পড়লো। সবাই জ যোদ্ধার গুণগান করছে। রুদ্রদেবের দাঁতে দাঁত চেপে বসেছে। এমন অস সংস্কৃতির চল আছে এদিকে। সে নিজে জীবনে এরচেয়েও খারাপ কাজ করেছে। কিন্তু তা তো ছিল গোপন ছল। সবার সামনে এমন একটা কাজ করে সবার বাহব পাওয়া, সত্যিই ভাবা যাচ্ছে না।

অসিতও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। সামনের যোদ্ধা এবার নিজের তলোয়ার তুলে ফেললো। তারপর সেই তলোয়ার নির্দেশ করতে লাগলো চারিদিকের দর্শকদে দিকে।

বুঝিয়ে দিতে লাগলেন শেইরন, 'এটাও এই গ্লাডিয়েটরদের রীতি। এখন সে দর্শকদের দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে দর্শকদের আহ্বান করছে তার সাথে লড়া জন্য। কেউ ইচ্ছে করলে লড়তে পারে। সাধারণত এদিকের দর্শকদের মাঝে দম নেই। আমাদের ওদিকে হলে আলাদা কথা।'

বিজয়ী যোদ্ধা যখনই তলোয়ার নামিয়ে ফেলবে ঠিক তখনই রুদ্রদেব উঠে দাঁড়ালো। সাথে সাথে নিজের হাতও উঁচু করে ফেললো সে, 'আমি লড়বো।'

পাক্কা মিশরীয় উচ্চারণ হলো না, হয়তো কথাটা শুদ্ধ করে বলতেও পারেনি সে, তবে প্রতিটা মানুষ বুঝতে পারলো এই ভিনদেশি লড়তে চাইছে। দর্শকদে

মাঝে আবার উল্লাসধ্বনি উঠলো। এমনটা সাধারণত হয় না। আজকে এক খরচে দুই লড়াই দেখা যাবে।

মালিক এগিয়ে এলো রুদ্রদেবের দিকে, চোখে তার স্পষ্ট অবিশ্বাস, 'তুমি লড়বে ওর সাথে? পাগল হয়েছ না-কি?'

রুদ্রদেব কিছু বলল না। শুধু নিজের উর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র খুলে অসিতের হাতে দিলো। মালিক বুঝতে পারলো এখন আর পেছনে হটার উপায় নেই, 'কী অস্ত্র নেবে তুমি।'

রুদ্রদেব কথাটা বুঝতে পেরেছে, ভাঙা ভাঙা বাক্যে বলল, 'আমার কোনো অস্ত্রের প্রয়োজন নেই।'

কোনো অস্ত্র হাতে না নিয়েই প্রাঙ্গনে দাঁড়ালো রুদ্রদেব। সামনের যোদ্ধা ওকে দেখে হেসে উঠলো ভীষণ স্বরে। এবার আর নিজের কসরত দেখিয়ে শরীর গরম করার প্রয়োজন নেই। শরীর গরমই আছে, সে এগিয়ে এলো রুদ্রদেবের দিকে, এই উদ্যত বিদেশীর ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করতে হবে। দর্শকদের মধ্যে আবার পিনপতন নীরবতা।

প্রথমে এসেই মোক্ষম তলোয়ারের আঘাত করলো যোদ্ধা। রুদ্রদেব শরীর পেছনে হেলিয়ে সেই আঘাত এড়িয়ে গেল। তার পিঠ স্পর্শ করলো মাটি, পরক্ষণেই আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে।

রুদ্রদেবের শরীরের খেলা দেখে এবার যোদ্ধা একটু হকচকিয়ে গেল। সতর্ক হয়ে এগোলো এবার সে। তবে রুদ্রদেব এখানে এই যোদ্ধা আর দর্শকদের মন মাতাতে আসেনি। তার উদ্দেশ্য আলাদা। সে এগিয়ে গেল এবার দুই হাত সামনে বাড়িয়ে, সামনের যোদ্ধার প্রত্যেকটা নড়াচড়া এবার যেন দেখতে পাচ্ছে সে। তলোয়ারটা এড়িয়ে যেতে একটুও কষ্ট হলো না তার। প্রতিপক্ষের দুই বাহু আর কাঁধের সংযোগস্থলে দুই হাতের মুষ্টি দিয়ে আঘাত করলো সে। বেশ জোরালো সেই আঘাতে প্রতিপক্ষের কাঁধ থেকে শুরু করে হাত পর্যন্ত অবশ হয়ে গেল। রুদ্রদেব দেরি করলো না। দুই হাঁটুতে আঘাত করলো পা দিয়ে। মোক্ষম লক্ষ্যভেদ হলো।

হাত আর পা অবশ হওয়াতে যোদ্ধা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। অস্ত্র তার হাত থেকে আগেই পড়ে গেছে। সেই তলোয়ার তুলে নিলো রুদ্রদেব। দর্শকদের মধ্যে আবার সেই খানিক আগের পিনপতন নীরবতা।

রুদ্রদেব তলোয়ার তুলে যোদ্ধার গলায় ছোঁয়াল, যোদ্ধা বুঝতে পারবে কি না তার তোয়াক্কা না করে বলল, 'জয়ী ব্যক্তি কখনো বিজিতের প্রাণের অধিকারী হয় না। তুমি একটু আগে বিনা কারণে ঐ সমর্থ যোদ্ধার প্রাণ নিয়েছ। কিন্তু আমি তোমাকে বাঁচতে দেবো। এরপরের প্রতি শ্বাস যেন তোমাকে দয়া করা শেখায়।'

এবার দর্শকদের দিকে ফিরল সে, 'কোনো সমাজ এমন বর্বর হতে পারে না। যুদ্ধের কলা ভালো, তার চর্চা ভালো, কিন্তু বিনা কারণে কোনো মানুষ হত্যা করা কিছুতেই ভালো হতে পারে না। এই বর্বরতা ত্যাগ করুন। অন্তত আজকে আর এখানে কোনো মানুষকে হত্যা করা হবে না। যদি আমার মতের বিপক্ষে কারো মত থেকে থাকে তাহলে সানন্দে এই প্রাঙ্গনে আসতে পারেন।' এবার রুদ্রদেব তলোয়ার তুলল। একটু আগের সেই জয়ী যোদ্ধার মতো ভঙ্গিতে সেই তলোয়ার নির্দেশ করলো দর্শকদের দিকে।

এবারে দর্শকেরা ঠিক আমোদ পেলো না। নীতি বাক্য শোনার জন্য এখানে আসেনি তারা। সবাই যে যার মতো হালকা হাততালি দিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো। রুদ্রদেব হাতের তলোয়ার নামিয়ে নিলো।

অসিত রুদ্রদেবের দিকে তাকিয়ে হাসলো। না, কাজটা ঠিক হয়েছে। অসিতের পাশে একজন মিশরীয় বসেছিলেন, নিজের ছেলেকে নিয়ে খেলা দেখতে এসেছেন তিনি। এই বয়সেই বর্বর রক্তপাত দেখেছ সে, তবে ছেলে বাড়ি ফিরতে চাইছে না, 'সেদিন না এই লড়াই খেলার পর আবার এক বানর দেখিয়েছিল, আজকে কি আর দেখাবে না।'

অসিতের কানে কথাটা যেন তীরের মতো এসে বিঁধলো। মিশরীয় ভাষা সে এতদিনে ভালোই আয়ত্ত করেছে। সে এসে বসলো ছেলেটার সামনে, 'কী বানর কথা বললে তুমি?'

'একটা রঙ্গিন বানর। কয়েকদিন আগেই এখানে দেখিয়েছিল। এমন বানর আগে কখনো কেউ দেখেনি। আজকেও ভেবেছিলাম সেই খেলা দেখবো, কিন্তু হলো না।'

বাকি দর্শকদের টানে ছেলে তার বাবার সাথে বেরোবার রাস্তায় এগিয়ে গেল। রুদ্রদেব ততক্ষণে চলে এসেছে অসিত আর শেইরনের কাছে। অসিত উত্তেজিত গলায় বলল, 'রাহু অঙ্গদকে নিয়ে এখানে এসেছিল।'

'বলেছিলাম না' বলে উঠলেন শেইরন।

'তাহলে আর দেরি কেন?' রুদ্রদেব সমাধান দেয়, 'মালিকের সাথে কথা বললেই সব জানা যাবে।'

আখড়ার মালিক ওদের সামনে বসে আছে। একটু আগে এই লম্বা লোকটা তার মস্ত উপকার করেছে। একজন যোদ্ধার দাম অনেক। যোদ্ধাকে বাঁচিয়ে রেখে তার অনেক মুদ্রা বাঁচিয়ে দিয়েছে সে।

রুদ্রদেব সরাসরি জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার এখানে এক রঙ্গিন বানরের খেলা দেখাতে এসেছিল একজন?'

'হ্যা।'

'লোকটার গালে কাটা দাগ ছিল?' এবার জিজ্ঞেস করে অসিত।

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন?' সেই বানরের প্রসঙ্গ আসাতে আবার মন একটু খারাপ হয়ে গেল আখড়ার মালিকের। বড়ো দান সেদিন হাতছাড়া হয়ে গেছে। ফুড়ুৎ করে কোথায় যেন উবে গেছে ব্যাটা।

'ঐ বানর আর তার মালিকের খোঁজ করছি আমরা। এখন ওদেরকে কোথায় পাওয়া যাবে?' শেইরন জিজ্ঞেস করেন।

'সে জানি না। আমার এখানে একদিন মাত্র খেলা দেখিয়েছিল। আমার সাথে চুক্তিও হয়েছিল। তারপর কিছু না বলে সেদিনই কোথায় যেন চলে গেছে। আমি ঘরে গিয়ে দেখি বানর আর বানরের মালিকের কোনো চিহ্নই নেই। এখানে আর কেন ঝামেলা কোরো না বাপু, আমি আর কিছুই জানি না।' ভয়ে ভয়ে রুদ্রদেবের দিকে তাকায় আখড়ার মালিক।

'কোথায় চলে গেছে?' রুদ্রদেব জিজ্ঞেস করে।

'বললাম তো তা আমি জানি না। এমনিতেই আমার মাথায় অনেক চিন্তা। সে তো চলেই গেছে। আবার সেদিন থেকেই আমাকে যে পশু-পাখি সরবরাহ করে সেও লাপাত্তা। এখন প্রদর্শন করার জন্য কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না।'

এবার এগিয়ে এলেন শেইরন, 'পশু পাখি কে সরবরাহ করতো এখানে?'

'একজন গ্রীক ব্যবসায়ী। নামটা আমার ঠিক খেয়াল নেই। গ্রীক নাম ছাই মনেও থাকে না।'

'দেখতে কেমন?' শেইরন আবার জিজ্ঞেস করেন।

'দেখতে দশজন গ্রীকের মতোই। একটু মোটাসোটা, এক কানে দুল পরে। আর, আর' মনে করতে চেষ্টা করে মালিক, ' হ্যাঁ, মুখটাও গোলগাল।'

'থাক, থাক' শেইরন বলে উঠলেন, 'আর বলতে হবে না।'

আখড়া থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। রুদ্রদেব জিজ্ঞেস করে, 'রাহু কার সাথে গেছে আপনি বুঝতে পেরেছেন?'

রহস্যময় গলায় বলে উঠলেন শেইরন, 'রাহু কার সাথে গেছে তা বুঝতে পেরেছি, আর কেন গেছে সেটাও অল্প অল্প বুঝতে পারছি।'

নিকোলাস কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। গরিবেরা পড়ে ভাত কাপড়ের ঝামেলায়, হেলটরা চিন্তা করে কীভাবে বেঁচে থাকবে আজকের দিনটা, যাতে কোনো মালিক তাদের ওপর রেগে গিয়ে তাদেরকে মেরে না ফেলে সেই চিন্তায়। তার মতো অভিজাতদের জন্য অভিজাত সমস্যা। তার সামনে এখন সুযোগ আছে এই স্পার্টার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী অভিজাত হবার, আর সবকিছু ঠিক থাকলে সে গভর্নরও হয়ে যেতে পারে। রোমানরা বর্তমানে জাতিগত বিশুদ্ধতা ত্যাগ করতে শুরু করেছে আসলে এত বড়ো সাম্রাজ্য চালাতে গিয়ে জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখা যায় না। এখনকার রোমান সম্রাটও রোমান নন। খুব ভালো যোদ্ধা বলেই তাকে এই পদে দেওয়া হয়েছে।

ক্রিস্টেয়ারে তাদের কেবল শস্ত্র শিখিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়নি। রাজনীতির ইতিহাস, রাজনৈতিক চাল, বর্তমান হালচাল সবই শেখানো হয়েছিল। একটা কথা সে অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল, এই পৃথিবীতে অস্ত্রধারী হয়ে সম্মান পাবার দিন শেষ হয়ে আসছে, এখন থেকে তারাই সম্মান পাবে যাদের কথায় মানুষ অস্ত্র ধরবে। এখন তার সময় এসেছে সেই সম্মানের জায়গায় যাবার।

সেই পথে পা সে বাড়িয়েই দিয়েছে। মরিসের আহত হবার ঘটনায় ইভান্দ শায়েস্তা করার জন্য পায়াসের সাথে সম্পর্ক করেছে সে। আর সেখানেই ভ তাকে দিয়েছে অযাচিত সুযোগ। পায়াস স্বয়ং তাকে দিয়েছেন নিজের জামা হবার সুযোগ। বুদ্ধিমান মাত্রই এই সুযোগ হাতছাড়া করবে না।

কিন্তু মানুষের জীবনে তো কেবল বুদ্ধিরই দখল থাকে না। বুদ্ধির বাইরেও অনেক কিছুই থাকে, আর সেগুলোই এখন ভোগাচ্ছে তাকে। নিক্সকে দেখার পর, তার সাথে মেলামেশা করার পর যে অনুভূতি হয়েছিল তা ঐ দুই দাসীর কথা শুনে এক মুহূর্তেই মিলিয়ে গেছে। সদ্য জন্মানো নেশামাখা ভালোবাসা বদলে গেছে ঘৃণায়। ওদিকে পায়াসের কথাও ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না। এখন তার এই সমাজে উঁচুতে ওঠার সময়, সদ্য পাওয়া স্থান দৃঢ় করার সময়, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকে ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে হবে, যা সে কিছুতেই করতে চাচ্ছে না। নিক্সকে এখন একটা সুন্দর ফুলের ভেতর লুকিয়ে থাকা বীভৎস পোকার মতো মনে হচ্ছে।

সাতপাঁচ ভাবছে সে। এক প্রহরীর আসার শব্দ শোনা গেল। ' ভেতরে এসো' মোটামুটি আনমনেই বললো সে।

প্রহরী ভেতরে এসেছে, সংবাদ দিতে দেরি করলো না, 'মহামান্য, আপনার বন্ধু মরিসের খবর নিয়ে এসেছি।'

মরিসের কথা পুরোপুরি মাথা থেকে বিদায় নিয়েছিল নিকোলাসের, 'আচ্ছা, সে এখন কেমন আছে?'

'এখন মোটামুটি সুস্থ। নিজের প্রাসাদে এঘর থেক ওঘর করতে পারছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাহনে চড়তে আরও সাতদিনের মতো লাগতে পারে। অভিজাত চিকিৎসক তাই জানিয়েছেন।'

'আচ্ছা, তুমি যাও।'

মরিসের কথা মনে পড়তে আবার ইভানের কথাও মাথায় চলে এলো। এই ঝুঁকি এখনো দূর করা গেল না। তার কোনো হিসেবই মিলছে না। মরিসের প্রতিও এক ধরণের ঘৃণা অনুভব করছে সে এখন। মরিসের ঐ মেয়ে দেখলেই ছুটে যাবার স্বভাব আগে থেকেই তার অপছন্দ ছিল, আর এখানে নিজের সাথে মরিসের অনেকটাই মিল আছে। অপছন্দ করার সেটাও একটা কারণ।

মহা অভিজাত অ্যালেস্টর তার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। সেখানেও সেই একই প্রস্তাব। আজকে তার অ্যালস্টরের প্রাসাদে যাবার কথা। এখন ওনাকেও মানা করে দিতে হবে। তবে এভাবে না। কাজটা করতে হবে সাবধানে। অ্যালস্টর অভিজাতদের মধ্যেও অনেকটা প্রভাব নিয়ে চলেন, শুরুতেই ওনার রাগভাজন হওয়া চলবে না।

সময় হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা বাতি জ্বলে উঠতে শুরু করেছে তার প্রাসাদে। এখনই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাকে। এটা আসলে রাতের খাবারের আমন্ত্রণ, প্রথমে একটু আলোচনা হবে, মেয়ে দেখা হবে, তারপর খাওয়া দাওয়া করে বিদায়। এখনই সে চিন্তা করতে শুরু করেছে কীভাবে অ্যালেস্টরকে না বলা যায়।

বেরিয়ে এলো সে ঘর থেকে। এতক্ষণ হাতে হাতে অভিজাত সাজে সেজে রয়েছে। পরিচারিকা এসে পোশাকের সূক্ষ্ম ভুলগুলো ঠিক করে দিলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেও দেখে নিচ্ছে একবার সে, 'আমার উপহারের ডালা তৈরি হয়েছে তো?'

পরিচারিকা জবাব দেয়, 'আজ্ঞে মহামান্য, আপনার উপহারের ডালা তৈরিই আছে। শেষবারের মতো আপনাকে দেখাবার জন্য অপেক্ষা করছে গাড়োয়ান। আপনি অনুমতি দিলেই রথে তুলে দেওয়া হবে।'

দুটো ঘর পেরিয়ে টেবিলে রাখা উপহারটার দিকে তাকালো সে। বেশ ভালো কিছু ফুল আর ফল সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজকীয় একটা স্বর্ণখচিত বালা স্থান পাচ্ছে সেসবের ঠিক মাঝে। সাজানো অনেক ভালো হয়েছে। সন্তুষ্ট হলো সে, 'গাড়োয়ানকে বলো, সাবধানে উপহার নিয়ে আমার রথে রাখতে। আর প্রহরীরাও নিশ্চয়ই তৈরি আছে?'

'আজ্ঞে মহামান্য।'

সময়ের অপচয়কারী হিসেবে অ্যালেস্টরের কাছে নিজের পরিচয় দিতে চাইলো না সে। আর দেরি না করে রথে চড়ে বসলো। তার রথ ঘিরে আটজনের

একটা প্রহরী দল যাচ্ছে। তার প্রাসাদ থেকে অ্যালেস্টরের প্রাসাদ মোটামুটি দূরে, পুরো নগরের ভেতর দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে যেতে হবে।

অ্যালেস্টরের প্রাসাদে যখন তার ছোটোখাটো বহর পৌঁছল ততক্ষণে রাতের আঁধার ঘন হয়েছে। সদর দরজায় আগেই নিকোলাসের আসার কথা বলে দেওয়া ছিল। বৃদ্ধ অভিজাত অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করছেন নিকোলাসকে বরণ করে নেবার জন্য। তারও মনে ভীষণ উত্তেজনা। নিকোলাসের সাথে ইনোনের বিয়েটা হয়ে গেলে সবদিক দিয়েই ভালো হয়। নিকোলাসের সামনে আজকে না করার কোনো উপায় খোলা রাখা যাবে না।

নিকোলাস রথ থেকে নামতেই এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ অভিজাত, 'আপনাকে স্বাগত মহামান্য নিকোলাস। এই প্রাসাদ এতক্ষণ আপনার অপেক্ষাতেই ছিল।'

মুখস্ত ভদ্রতার বিপরীতে একটা মুখস্ত হাসি হেসে বৃদ্ধ অভিজাতের সাথে হাঁটতে শুরু করলো নিকোলাস। সাথে উপহারের ডালা নিয়ে চলছে তার পরিচারক। এই একান্ত দাস সবকিছুই জানে। সে সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে হেঁটে যাচ্ছে।

নিকোলাসকে এনে বসানো হলো সুদৃশ্য একটা ঘরে। নানা রঙের মোম জ্বলছে ঘরটায়, কিছু কিছু জায়গায় জ্বলছে নানা রঙের বাহারি কাঁচে ঘেরা প্রদীপ। ঘরটার শোভা অনেকটাই বাড়িয়ে দিচ্ছে সেই আলো। নিকোলাস ধীর ভঙ্গিতে চোখ ঘুরিয়ে সবকিছু দেখছে। নাহ, এই প্রাসাদের জাঁকজমক কম নেই, তবে তা কিছুতেই গভর্নরের প্রাসাদের মতো না। সামনে মনে হচ্ছে আরও কিছু প্রাসাদে যেতে হবে। তার কাছে আরও কিছু প্রস্তাব অবশ্যই আসবে। সদ্য হওয়া অভিজাতরা সবাই এই ঝামেলার সম্মুখীন হচ্ছে বলেই শুনেছে সে। আপাতত নিজের চিন্তা জোর করে মাথা থেকে সরিয়ে দিয়েছে সে। কাজটা অনেক কঠিন, তবে অনেক কঠিন কাজ করার প্রশিক্ষণ তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

নিকোলাসের আসার খবর অ্যালেস্টরকে দিয়েছে বৃদ্ধ অভিজাত নিজে। অ্যালেস্টর জানালেন, 'ঠিক আছে, তাকে একা বসিয়ে রাখবেন না। আপনি যান, আমি ভেতরের সবকিছু তৈরি করে দিয়ে আসছি।'

'আচ্ছা', বৃদ্ধ অভিজাত চলে গেলেন নিকোলাসকে সঙ্গ দিতে।

ইনোনের কামরার সামনে এসে দাঁড়ালেন অ্যালেস্টর, মৃদু স্বরে একবার কেশে উঠলেন, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ডোরা, ' উনি কি চলে এসেছেন?'

' হ্যাঁ, একেবারে সময়মতো।'

'আমরাও তৈরি আছি। আপনি একবার বললেই আমি আর আরেক দাসী কুমারীকে নিয়ে অথিতি ঘরের দিকে যাবো।'

'আচ্ছা, আমি সেদিকে যাচ্ছি। প্রহরীর কাছে খবর পাঠাবো।'

অ্যালেস্টর প্রবেশ করলেন অথিতিঘরে। নিকোলাস ওনাকে আগে কখনো না দেখলেও চিনতে একটুও অসুবিধা হলো না। এই দীর্ঘদেহী ব্যক্তিই যে এই বাড়ির কর্তা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এই বয়সেও সেই ক্রিস্টেয়ারের শরীরের খাচ বেমালুম ধরে রেখেছেন তিনি। নিকোলাস উঠে দাঁড়ালো, 'আমার অভিবাদন গ্রহণ করবেন মহামান্য অ্যালেস্টর।'

'আরে বসুন আপনি। নগরের আভিজাত্যের হিসেবে আপনি আর আমার স্তর একই। তাই এভাবে সম্মান দেখানোর প্রয়োজন নেই।'

'নগরের স্তরের হিসেব আমি যেমন জানি, তেমনি সাধারণ কিছু হিসেবের কথাও যে একেবারে শুনিনি তা নয়। আপনি মহা অভিজাত হয়েও মহা অভিজাতদের থেকে উঁচুতে অবস্থান করেন। আপনার সাহসিকতা আর ব্যক্তিত্বের কোনো তুলনা হয় না।'

'সত্যি বলতে সাহসিকতা দেখাবার সুযোগ এই জীবনে পাইনি আমি। যে বীর সারা জীবন ছিল অন্যের অধীনস্থ সে কীভাবে সাহসিকতা দেখাবে?'

আলোচনা সেদিকে যাক এটা বৃদ্ধ অভিজাত চাইলেন না, 'রীতি অনুযায়ী মহামান্য নিকোলাস প্রথম বার অথিতি হয়ে আপনার বাড়ি এসেছেন। উপহার দেওয়া স্পার্টার পুরানো রীতি। উপহারের পর্বটা তাহলে শেষ করি?'

অ্যালেস্টর আগে থেকেই তৈরি ছিলেন, উপহার তুলে দেওয়া হলো নিকোলাসের হাতে, যোদ্ধার জন্য যোগ্য উপহার। একটা বেশ ধারালো তলোয়ার, স্পার্টার সবচেয়ে দক্ষ কারিগরের তৈরি। হাতলটা সোনার।

নিকোলাসের উপহার নিলেন না অ্যালেস্টর, নিকোলাস কন্যা দেখতে এসেছে, নিশ্চয়ই সে উপহার ইনোনের জন্যই নিয়ে এসেছে। এই পর্বটা একটু পরের জন্য তোলা রাখলেই ভালো হয়। এরপরে তিন অভিজাত মিলে একটু আঞ্চলিক রাজনীতির কথা আলোচনা করলেন। নিকোলাস প্রশ্ন করে করে বেশ কিছু উপদেশ বাগিয়ে নিলো। বৃদ্ধ অভিজাত ওদিকে নজর রাখছেন সময়ের গতির দিকে।

সময় হয়েছে। বৃদ্ধ ইশারা করলেন অ্যালেস্টরকে। ইশারা পেয়ে প্রহরী ছুটে গেল অন্দরে খবর দিতে।

ইনোন সবই শুনলো। তার কিছুতেই এই ঘর থেকে বেরোতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু বাবাকে অপমান করার সাহস বা ইচ্ছা কোনোটাই নেই তার। তাকে ঐ অভিজাতের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। ডোরা আজ তাকে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে। একবারও আয়না দেখার প্রয়োজন অনুভব করেনি সে।

ডোরা এক হাত ধরলো তার। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে ওরা প্রবেশ করলো অতিথি কক্ষে।

অ্যালেস্টর প্রহরীকে ইশারা করতেই নিকোলাস বুঝতে পেরেছিল, এবার মহা অভিজাতের কন্যার এই ঘরে আসার পালা। সে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে কী করবে। যে বস্তু দেখার আগেই ত্যাগ করার মানসিকতা থাকে, তা আর ভালো করে কেউ দেখে না। ইনোন যখন ঘরে ঢুকে তার সামনে বসলো তখনো নিকোলাস অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। ইনোন ঘরে ঢুকতেই ওরা ওদের আলোচনা থামিয়ে দিয়েছিল।

এবার মাথা না তুললে অভদ্রতা হবে। চোখ তুলে নিকোলাস তাকালো সামনের দিকে। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন উদাসী জোছনা ছড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে থাক বিরহী প্রকৃতির সাথে কথা বলে সেই দৃষ্টি নিয়ে নতমুখে বসে আছে ইনোন। সেই স্নিগ্ধ মূর্তি নিকোলাসকে যেন স্তব্ধ করে দিলো। নিক্স তাকে শিখিয়েছে নারী কি, কীভাবে নারীকে গ্রহণ করতে হয়, কীভাবে শরীর উঠতে পারে দৈহিক আবেগের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। কিন্তু আজকে সামনে কী দেখছে সে। অভিজাত হবার পর ছোটো বড়ো অনেক অভিজাতের বাড়িতেই গেছে সে। কিন্তু কোথায় আছে এই সবকিছু স্থির করে দেওয়া রূপের বাহার? অভিজাত মেয়েরা তার সাথে ভাব জমাবার চেষ্টা করতো, কিন্তু তার তেমন আগ্রহ কখনোই ছিল না। প্রথম বার নিক্সের সর্বগ্রাসী আহবান সে ফেলতে পারেনি। আর এখানে তো দেবী আফ্রোদিতি যেন স্বয়ং তার সব রূপ নিয়ে নেমে এসেছেন।

প্রেম নয়, না, প্রেম নয়, সেই ভুল আর সে করবে না, নিকোলাস কামের আঘাতে জর্জরিত হতে লাগলো। ইনোনের দেহের মধ্যে নিক্সের দেহের ভাজ খুঁজতে লাগলো তার চোখ। কিছুক্ষণ কেটে গেল এসব চিন্তা করতে করতে। বৃদ্ধ অভিজাত এবার কথা বলে উঠলেন, 'মহামান্য নিকোলাস, ইনি হচ্ছেন কুমারী ইনোন, মহামান্য অ্যালেস্টরের কন্যা। আর ইনি হচ্ছেন স্পার্টার মহা অভিজাত নিকোলাস।'

পরিচয় করিয়ে দেবার পরে চোখ না তুলে পারলো না ইনোন। এতক্ষণ ইনোনের মুখমণ্ডলের কেবল ঐ অংশটাই ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিল না নিকোলাস। এবার সেটাও দেখতে পেলো সে স্পষ্ট। সেই ডাগর চোখে যেন জল টলটল করছে। সেখানে ডুবে যাবার ইচ্ছে কোন পুরুষের না হবে।

বৃদ্ধ অভিজাত আর দেরি করতে চাইলেন না, 'মহামান্য অ্যালেস্টর, আপনার সাথে আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বাকি রয়ে গেছে। আমরা অথিতির কাছ থেকে একটু বিদায় নিয়ে নিই। ততক্ষণ কুমারী ইনোন এখানেই থাকুন।'

অ্যালেস্টর বুঝতে পারলেন, 'হ্যাঁ, চলুন।' দুজনের পিছু পিছু ডোরাও কক্ষ ত্যাগ করেছে। তাকে বুঝিয়ে দেবার দরকার হয়নি। কেবল যাওয়ার আগে ইনোনের কাঁধে হালকা করে একটু চাপ দিয়ে গেছে সে।

নিকোলাস কীভাবে শুরু করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তাকে বাঁচিয়ে দিলো সাথে আনা উপহার, ডালাটা বাড়িয়ে দিলো সে, 'কুমারী ইনোন, আমার এই উপহার গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞ করুন।'

হাত বাড়িয়ে উপহারটা গ্রহণ করলো ইনোন, 'আপনাকে ধন্যবাদ।'

নিকোলাসের খুব ইচ্ছে করছিল ঐ পেলব আঙ্গুলে একটা স্পর্শ করতে, কিন্তু নিজেকে সংযত করলো সে। ইনোনের পৃথিবী যেন দুলছে। অন্য কোনো পুরুষের সামনে সে নিজেকে এক দণ্ডও কল্পনা করতে পারছে না। শেষে না পেরে সে বলে উঠলো, 'আমি আসলে অনেক দুঃখিত। আজকে আমার শরীরটা খুব একটা ভালো নেই। আপনি অনুমতি দিলে আমি প্রস্থান করতে পারি?'

নিকোলাস কী বলবে ভেবে পেলো না। ইনোন অবশ্য তার কথার জন্য অপেক্ষাও করেনি। একটু বিরতি দিয়ে নিকোলাসের নীরবতার মধ্যেই ঘর ত্যাগ করেছে।

ইনোন বেরিয়ে যেতেই যেন নিকোলাসের চেতনা ফিরে এলো। তার মনে হলো আর সামনের পৃথিবী শূন্য হয়ে গেছে। সেও উঠে দাঁড়ালো। তার মতো একজন অথিতির জন্য যে কাজটা একেবারেই সমীচীন নয় সেই কাজটাই করলো সে। ঢুকে পড়লো অন্দরমহলে। ঠিক যেন কোনো এক সম্মোহিত আত্মা।

অচেনা প্রাসাদের অচেনা গলিগুলোই হোঁচট খেতে হচ্ছে তাকে। প্রহরীরা তাকে দেখে সম্মান জানাচ্ছে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছে না নিকোলাস। কেবল ঘরগুলোতে খুঁজে বেড়াচ্ছে ইনোনকে। কিন্তু না, অন্দরের কোনো ঘরে ইনোন নেই।

প্রাসাদের অন্দরে একটা প্রাঙ্গন আছে। সেই প্রাঙ্গনের লাগোয়া পথ দিয়ে হেঁটে দোতলায় উঠে এলো এবার সে। চারিদিকে তাকাচ্ছে, কোথায় গেল মেয়েটা। ভুল হয়েছে, কথার জোরে ঘরে আটকে রাখলেই ভালো হতো।

তবে অবশেষে সে দেখা পেলো ইনোনের। ইনোন ঘরে যায়নি। ঐ অতিথি ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এসেছে এই দোতলার বারান্দায়। রাতের নিঃসঙ্গতার মধ্যে মিলিয়ে দিচ্ছিলো নিজেকে। আর না জানা পথে চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল একজনের আশায়। পেছনে একটু শব্দ হতেই ঘুরে তাকালো সে, তারপর অবাক গলায় বলে উঠলো, 'আপনি এখানে কী করছেন?'

একটু এগিয়ে এলো নিকোলাস, 'আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এলাম। আপনি তো আমাকে কিছুই বলতে দিলেন না। তার আগেই চলে এলেন। আমাকে এতটাই অপছন্দ হয়েছে সেটা বুঝতে পারিনি। সে যাক, আমি আপনার জন্য একটা অলংকার উপহার এনেছি। আর সেটা নিজ হাতে আপনাকে দিতে চাই।'

স্বর্ণের বালা এক হাতে ধরে আরেক হাতে ইনোনের ডান হাত ধরলো সে। ইনোন যেন একেবারে কুঁকড়ে গেল। তার পুরো শরীর গুলিয়ে উঠতে লাগলো। সে বুঝতে পারলো এই স্পর্শ নোংরা কামের। নিকোলাস অদ্ভুতভাবে ধরেছে তার হাত। হ্যাঁ, স্পর্শেরও রকমফের হয়।

হাত ছুটিয়ে নিতে চেষ্টা করছে ইনোন, কিন্তু পারছে না। নিকোলাস তার হাতে বালাটা পরাতে চেষ্টা করছে। এই সময় পেছন থেকে একটা কণ্ঠ শোনা গেল, 'মহামান্য নিকোলাস। আপনার রাতের খাবারের সময় হয়ে গেছে। অভিজাতরা আপনার জন্য খাবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

কণ্ঠটা ডোরার। নিকোলাসের কানে যেন কেউ গরম ঘি ঢেলে দিয়েছে। ইনোনের হাতটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো সে। ডোরার দিকে একবার তাকিয়ে কঠিন মুখে সে ছাদ থেকে বেরিয়ে গেল।

ডোরা ছুটে এসে ধরল ইনোনকে। এত মানসিক চাপের আধিক্য আর নিতে পারলো না ইনোন। তার জলভরা চোখ থেকে এবার আসলেই জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো।

যেই পথে এসেছিল সেই প্রাঙ্গনের পাশ দিয়ে হেঁটে নিকোলাস আবার চলে গেল অথিতি ঘরে। না, এখনো সেখানে তাকে ডাকতে কেউ আসেনি। তার মা ঐ পরিচারিকা মিথ্যে বলেছে ইনোনকে বাঁচানোর জন্য। নিজেকে প্রবোধ দিল সে, একটু আগে সে একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল।

একটু পরেই ভোজের আয়োজন শুরু হলো। তাকে দুজন প্রহরী নিয়ে গেল সেখানে। খাবার টেবিলে ইনোনের থাকার কথা। কিন্তু ডোরা এসে জানিয়ে গেল ইনোন আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। এই অবস্থায় তাকে এখানে আনা যাবে না। ইনোনকে ছাড়াই সম্পন্ন হলো ভোজ সভা। নিকোলাস সবই বুঝতে পেরেছে।

ভোজের পরে প্রাসাদ ত্যাগ করলো নিকোলাস। রথে চড়ে ফিরতে ফিরতে সে বুঝতে পারলো এতদিন অনেক কঠিন জিনিস অনুশীলন করেছে, অনেক তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, কিন্তু এতটা দ্বিমুখী টানের মধ্যে তাকে এই জীবনে কখনো পড়তে হয়নি।

'কী বুঝতে পেরেছেন আপনি?'

অসিত প্রশ্নটা করলো শেইরনকে। শেইরন ঐ লোকের বর্ণনা শুনেই ওদেরকে বাইরে নিয়ে এসেছে। আর কিছু শোনার প্রয়োজন মনে করেননি। শেইরন প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তৈরি আছেন, তবে তার আগে তিনি বললেন, 'বলছি। কিন্তু আগে আমার কিছু ব্যাপার জানা দরকার। আমরা একই সাথে পথ চলছি, কিন্তু নিজেদের ব্যাপারে এত ধোঁয়াশা রাখলে তো চলবে না।'

'কী রকমের ধোঁয়াশা?' রুদ্রদেব জানতে চায়।

'প্রথম কথা হচ্ছে তোমার কাছে রূপার মুদ্রা এলো কী করে। আর ঐ রকম একটা দক্ষ গ্লাডিয়েটরের সাথে তুমি এত সহজে কীভাবে জিতলে? আসলে বলো তো কে তুমি? তোমার ব্যাপারে এতদিন যা জেনে এসেছি তা অনেক কম ছিল।'

'সে তো আপনার ব্যাপারেও আমরা অনেক কিছু জানি না। জানি কেবল আপনি একজন বৃদ্ধ যে কিনা নানা জায়গা ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আপনি যুবক বয়সে কী করেছেন, কেন আপনার জন্মভূমিতে থাকেন না, লুকিয়ে আছেন কি না কিছু থেকে সেসবও তো জানি না আমরা। আর আমার মনে হয় না কারো পাশে চলতে গেলে আর সম্পর্কে সবকিছু জানতেই হবে। সঙ্গীর গোপনীয়তা এক দিকে সরিয়ে রেখেও এক সাথে পথ চলা যায়।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। কিন্তু সেই গোপনীয়তা ধারণার বাইরে থাকলে চলে, কিন্তু তা যদি একেবারে সামনে চলে আসে তবে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেই ভালো হয়। আমি জানতে চাচ্ছি।'

'রূপার মুদ্রা থাকা এমন কোনো বড়ো ব্যাপার না। আমরা দুজনেই রাজার হয়ে যুদ্ধ করেছি। যেই যুদ্ধে বারিগাজা দখল করেছেন মহারাজ সাতকর্ণী। এদিকের অন্যান্য জাহাজ যেই যুদ্ধের ফলে বন্দর ছেড়ে চলে গেছে, সেই যুদ্ধ। তাই রাজার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মুদ্রাগুলো আমরা ভেট হিসেবে পেয়েছি।' মাঝে মাঝে কিছু মিথ্যা বলতে হয়।

শেইরন অবাক হলেন কিন্তু মেনেও নিলেন, 'তার মানে তুমি যোদ্ধা ছিলে রাজার দলে। এইবার আমার দ্বিতীয় কৌতূহলেরও একটা হিল্লে হলো।'

অসিত যোগ করে, 'হ্যাঁ, যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু যেনতেন যোদ্ধা নন, রাজার দলের সেনাপতি। এবং সব সেনাপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

'এত বড়ো যোদ্ধা এদিকে এসেছে বানর খুঁজতে? ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। সে যাক, এবার তাহলে আমাদের আসল কাজে ফিরি।'

'হ্যাঁ, সেটাই ভালো হবে', রুদ্রদেবও এখন আর পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটতে চাচ্ছে না।

'শোনো, ঐ গ্রীক লোকটার গোলগাল মুখ আর চেহারার বর্ণনা শুনেই আমি ধা ধরার ধরে ফেলেছি। আরেকটা তথ্য হচ্ছে সে জন্তু জানোয়ার সরবরাহের কাজ করে। এই দুটো মিলে একটা মানুষই মনে আসছে।'

'কে?' প্রশ্নটা দুজনেই করে এক সাথে।

'তার নাম জেইস। আমার নগরেই থাকে। স্পার্টায়। সে আর রাহু এক সাথে উধাও হয়েছে বেরেনিকে থেকে। তার মানে তাদের মধ্যে অবশ্যই একটা যোগসূ আছে।'

'কিন্তু' রুদ্রদেবের একটু সন্দেহ হয়, 'রাহু তো বেরেনিকেতে অঙ্গদকে প্রদ করতেই এসেছিল। এখানের সবচেয়ে বড়ো খেলা দেখানোর জায়গায় সে খে দেখিয়েছে মাত্র একদিন। তখন আরও লম্বা সময়ের জন্য আখড়ার মালিকের সাথে চুক্তিও হয়েছিল রাহুর। সেই চুক্তি ভেঙ্গে দিয়ে কাউকে কিছু না বলে সেদিনই সে ঐ লোকের সাথে কেন চলে যাবে? না, কোথাও যেন হিসেব মিলছে না।' রুদ্রদেব মাথা নাড়ে।

'হিসেব না মিললে মেলানোর চেষ্টা করতে হবে।' শেইরন এবার নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগালেন, 'চিন্তা করে দেখো, এই আখড়ার মালিক নিশ্চয়ই তোমাদের বানরের মতো একটা বিশেষ বানরের মূল্য বোঝে। সেটাকে এখানে কাজে লাগানো যাবে, আবার নানা ধনীদের বাড়ির অনুষ্ঠানেও মোটা মু বিনিময়ে পাঠানো হবে। এখন সেই আখড়ার মালিক কি চাইবে রাহু নিজের অমূল্য সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করুক?'

'ভালো মানুষ হলে চাইবে। আর মতলব বদ হলে চাইবে না।' রুদ্রদেব মত দেয়।

'আর এই লোককে আমার কোনো দিক থেকেই ভালো লোক বলে মনে হয়নি।'

'তার মানে বুঝতে পেরেছ তো কী হয়েছে। এই সময়ে কুটিল লোক গুপ্তহত্যার পথই বেছে নেবে। এই আখড়ার মালিক সেই পথই বেছে নিয়েছি বলেই আমার ধারণা। আর সেখানেই জেইস সেই পরিকল্পনার কথা কোনোভাবে জানতে পারে আর রাহুকে বাঁচিয়ে দেয়।'

'জেইসকে তো তাহলে বেশ ভালো লোক বলেই মনে হচ্ছে।' অসিত মন্তব্য করে।

'ভালো তো বটেই। একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে যতটুকু ভালো হওয়া সম্ভব ঠিক ততটুকুই ভালো সে। রাহুকে বাঁচানোর পেছনে তার নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য ছিল, আর এখন সেই উদ্দেশ্যই পূরণ করতে রাহুকে নিয়ে গেছে সে। এজন্যই আমি তোমাদেরকে বাইরে বের করে এনেছি। পুরো ব্যাপারটাই আসলে তখন শোনামাত্র ধরে ফেলেছিলাম আমি।'

'আচ্ছা, আমাদের যা জানতে হবে সেটা বলুন। রাহুকে নিয়ে জেইস কোথায় গেছে?' রুদ্রদেব ভূমিকার জালে আর থাকতে চাচ্ছে না।

'আমার নগরীর নাম গ্রীসের স্পার্টা। আগেই বলেছি জেইস সেই জায়গারই লোক। সেখানে এখন কোনো রাজা নেই, রাজার পরিবর্তে যা আছে তা হচ্ছে রোমান গভর্নর। সেই লোকের নাম পায়াস। এই পায়াসের মেয়ে মানে স্পার্টার ভবিষ্যৎ রাজকুমারীর একটা অদ্ভুত শখ আছে। তার একটা ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা আছে, সাধারণে যেতে পারে না। সেই চিড়িয়াখানায় অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রাণী। যেসব প্রাণী নিজেদের স্বজাতির থেকে আলাদা।'

চট করে ঘটনা ধরে ফেললো রুদ্রদেব, 'তার মানে জেইস রাহুকে নিয়ে যাচ্ছে এখন সেই গভর্নরের কাছে? অঙ্গদকে বিক্রি করার চেষ্টা করবে।'

'হ্যাঁ, জেইস অনেক আগে থেকেই ঐ চিড়িয়াখানার জন্য প্রাণী জোগাড় করে। গভর্নর অনেক দাম দেন একেকটা প্রাণীর জন্য। মেয়ের শখ বলে কথা।'

অসিত এবার বেশ চিন্তিত মুখে বলল, 'অঙ্গদকে রাহুর কাছ থেকে উদ্ধার করা তো সম্ভব ছিল। কিন্তু এমন একজন ক্ষমতাবান লোকের কাছ থেকে অঙ্গদকে উদ্ধার করবো কীভাবে?'

'অঙ্গদকে বিক্রি করার আগেই রাহুকে আমাদের ধরতে হবে।' রুদ্রদেব সমাধান দেয়।

বাঁধ সাধেন শেইরন, 'সেটা মনে হয় সম্ভব হবে না। ওরা অনেক দিন আগেই যাত্রা শুরু করেছে। আমরা উড়ে গেলেও ওদের আগে স্পার্টায় পৌঁছাতে পারবো না।'

'তাহলে এখন আমরা কী করবো?' প্রশ্নটা আপনা থেকেই যেন বেরিয়ে এসেছে অসিতের গলা দিয়ে।

শেইরন হাত ওলটালেন, 'সেটা তোমরা দুজনে চিন্তা করে দেখো। একবার গভর্নরের হাতে চলে গেলে সেই জিনিস আর ফিরে পাবে না। তবে যেতে পারো, বানর পাওয়া যাক আর না যাক, রাহু অন্তত তার প্রাপ্য শাস্তি অবশ্যই পাবে।'

রুদ্রদেবের গলা কঠিন হয়ে এলো, ' রাহুকে তার কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। অঙ্গদকেও আমরা ফিরিয়ে আনবো। হোক সে গভর্নরের কাছে থাকুক অথবা স্বয়ং রোমান সম্রাটের কাছে। আপনি শুধু আমাদেরকে সেই নগরীতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন।'

'আচ্ছা', শেইরন নড়চড়ে বসলেন, 'তোমাদের কারণে দেখা যায় অনেক দিন পরে আমি জন্মভূমিতে ফিরতে পারবো। রাস্তা আমার মুখস্ত। যাত্রা এখনই শুরু করা গেলেও আমরা যাত্রা করবো কাল সকালে।'

'এখন নয় কেন?' অসিত দেরি করতে রাজি নয়।

'কী বলো! বেরেনিকেতে এসেছি, এখনো গলাটা ঠিকমতো ভেজাইনি। আর তুমি বলছো এই শুকনো গলা নিয়ে আবার এক মাসের সফরে বেরিয়ে পড়তে। তা কিছুতেই সম্ভব নয়। আজকে রাতে ভালো করে পান করে, উপভোগ করে তারপর কাল সকালে যাত্রা করবো।'

'আপনি এখনই পান করুন। আমি রৌপ্যমুদ্রা দিচ্ছি। যত পারেন গলা ভিজিয়ে নিন। কিন্তু আজই আমরা যাত্রা করবো।'

রুদ্রদেবের কথায় শেইরন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, 'কিন্তু এই দুপুরে কেউ কি পান করে?'

'কেন আপনি না বলেছেন আপনি নেশা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তাহলে আপনার জন্য দুপুরই বা কি আর রাতই বা কী।'

অকাট্য যুক্তির পরে শেইরনকে চলতেই হলো পানশালার দিকে। রৌপ্যমুদ্রার বদৌলতে জুটল বেশ উৎকৃষ্ট মানের মদ। বেশ কয়েক পাত্রই গিলে নিলেন তিনি। তারপর বেরিয়ে পড়লো ওরা।

চলতে চলতে ওদেরকে পথের বর্ণনা দিয়ে দিচ্ছেন শেইরন। এখান থেকে স্পার্টা দুই পথে যাওয়া যায়। ওরা দুজনেও এই দুই পথের একটাতেই গেছে।

একটায় প্রথমে সমুদ্র পথে যেতে হবে। সমুদ্রে প্রথমে মিয়োস হোমোস, তারপরে আর্সেনি বন্দর। তারপর পায়ে হেঁটে আলেকজান্দ্রিয়া। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে স্পার্টা যাবার জাহাজ পাওয়া যাবে।

আর দ্বিতীয় পথে প্রথমেই পড়বে হাঁটা পথ। এখান থেকে কপ্টস বন্দর পর্যন্ত যেতে হবে হেঁটে। সেই বন্দর কোনো সমুদ্রে নয়, অবস্থিত নীল নদে। সেই নীল নদের বন্দর থেকে সরাসরি নৌকা অথবা বজরায় চলে যাওয়া যাবে আলেকজান্দ্রিয়া।

একটু ভাবনা চিন্তার পরে কপ্টস হয়ে যাবার সিদ্ধান্তই নেয়া হলো। এটাই সবচেয়ে সহজ রাস্তা। জাহাজে গেলে জাহাজ ওদের মর্জি মতো চলবে না। নিজেদের কাজ সেরে তারপর আর্সেনিতে পৌঁছবে। এজন্য যারা বেরেনিকে থেকে সরাসরি গ্রীসে যেতে চায় তারা কপ্টস হয়েই যায়।

রুদ্রদেব মত দেয়, 'তবে আমরাও কপ্টস হয়েই যাবো।'

শেইরন বলেন, 'এই পথটা জলদি পৌঁছানোর জন্য ভালো, কিন্তু মোটেও সহজ নয়। যাদের সাথে মালামাল আছে তারা কখনো এই পথে যায় না। তারা মিয়োস হোমোস থেকে কপ্টস হেঁটে যায়। কিন্তু আমরা যদি আড়াআড়ি পথে যাই তাহলে মোট রাস্তার চার ভাগের এক ভাগ কমে যাবে। কিন্তু এত রাস্তা তো আর বাহন ছাড়া যাওয়া যাবে না। পথে বিস্তীর্ণ মরুভূমি। সেখানে ডাকাত আর বেদুইনদের আনাগোনা আছে। আমি অনেক আগে একবারই গিয়েছি এই রাস্তায়।'

'তাহলে উপায় কী?'

'এই পথেই যাবো আমরা। তবে আগে বাহন জোগাড় করতে হবে।' শেইরন তাকালেন রুদ্রদেবের দিকে, 'সেটা তেমন একটা কঠিন কাজ হবে না। তোমার কাছে নিশ্চয়ই আরও রৌপ্যমুদ্রা আছে?'

রুদ্রদেব সেই সম্পর্কে কিছুই বলল না, 'ঘোড়া কিনতে কত লাগবে? তিনটে ঘোড়া কিনতে তো নেহাত কম লাগার কথা না।'

হেসে উঠলেন শেইরন, 'আরে নাহ, এখানে ঘোড়া দিয়ে কী করবে? মরুভূমিতে বেদুইনরা ঘোড়া অবশ্য ব্যবহার করে কিন্তু সেতো অল্প দূরত্বের জন্য। এত বড়ো পথে লাগবে উট।'

'সেটা আবার কী?' প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল অসিতের মুখ থেকে।

'দেখবে চলো।'

পশুর বাজারে সেই লম্বা গলার কুঁজওয়ালা উঁচু প্রাণীটাকে দেখে অবাক হয়ে গেল অসিত। পশু কেনার ব্যবস্থা বেশ ভালো। ওদের আরেক দল আছে ঐ কল্টস বন্দরে। সেখানে গেলে ওদের তো আর এই উট লাগবে না। তখন ঐ দল উট তিনটা কিনে নেবে। ওদের লোকসান তেমন একটা হবে না।

তিনটে উট কিনে রশি টেনে হাঁটিয়ে ওরা চলে এলো নগরের উপকণ্ঠে। এখান থেকেই যাত্রা শুরু করতে হবে। শেইরন একটা দলের সাথে রওনা দিতে বলেছেন। তিনিও রাস্তা অতোটা ভালো চেনেন না, একবারই যাওয়া হয়েছে। একটা দলের সাথে গেলে ডাকাতের হাত থেকেও বাঁচা যাবে। তবে দল পাওয়াই হচ্ছে সমস্যা।

ভাগ্যচক্রে একটা দল পেয়ে গেল ওরা। তেমন চৌকস না হলেও সঙ্গী হিসেবে চলে যাবে। একটা গ্রামের কিছু লোক যাচ্ছে ওদিকে। বেশির ভাগই মহিলা আর বাচ্চা। সমর্থ পুরুষের সংখ্যা কম। দলটা শেইরনের পছন্দ না হলেও কিছু করার নেই। ওদেরও হাতে নষ্ট করার মতো সময় নেই।

যাত্রা শুরু করলো ওরা দুপুরের শেষ প্রান্তে। উটে চড়তে শেইরনের কোনো অসুবিধা হল না। তার অভ্যাস আছে। রুদ্রদেব আর অসিতের ঘোড়া সামলানোর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতা উটের বেলায় পুরোপুরি খাটলো না। একটু অসুবিধা হতে লাগলো উটের অদ্ভুত ছন্দের সাথে নিজেদের দেহকে মিলিয়ে দিতে। তবে পড়ে গিয়ে কেউ হাসি তামাশার ব্যাপার ঘটালো না। দুজনের দেহই যোগাভ্যাসের কারণে যথেষ্ট ভারসাম্য পূর্ণ।

রাতে মরুভূমিতে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে। দিনের উত্তাপ যতক্ষণ ওদেরকে গরম রাখলো ততক্ষণই চলতে থাকলো ওরা। যখন বালি ঠান্ডা হয়ে গেল তখন উটেরা আস্তে আস্তে বিদ্রোহ করতে শুরু করলো। দলের অভিজ্ঞরা উটের এই ইশারা বোঝে। সেখানেই নেমে যায় তারা। আগুন জ্বালিয়ে, তাবু টানিয়ে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হয়।

শেইরন রাতের খাবার শেষ করে বিছানা পেতে শুয়ে পড়েন, 'আমাদেরকে তো রাতে পাহারা দিতে হবে। মরুভূমিতে তো আর বিপদের শেষ নেই। মানুষের মধ্যে বিপদ হিসেবে আছে বেদুইন ডাকাতেরা। ওরা ভয়ংকর। তার ওপর এক ধরনের সাপ আছে, চৌকোণা মাথার। বালির ওপর দিয়ে এমন ভাবে চলে যেন সাঁতার কাটছে। তারাও এখানে চলে আসতে পারে। তাই পালা করে পাহারা দাও দুজনে। এই অশক্ত বৃদ্ধকে নিশ্চয়ই পাহারা দেবার দায়িত্ব দেবে না তোমরা।'

'না, তা কী করে হয়।' রুদ্রদেব নিজের খাবারের শেষ গ্রাস মুখে পুরলো।

'হ্যাঁ, জানি দেবে না। তার ওপর দুপুরে খাওয়া মদকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। এবার ঘুমের মধ্যে নেশা করে বের করে দিতে হবে শরীর থেকে।'

শেইরন একটু পরেই নাক ডাকতে শুরু করলেন। ওরা পালা করে জেগে পাহারা দিতে লাগলো। ভোরের দিকে দুজনেই জেগে রইলো। অল্প ঘুমেই শরীর এখন অভ্যস্ত। ভোরবেলা সবাই জেগে উঠেছে। জিনিসপত্র আর তাবু গুটিয়ে নিচ্ছে তারা। আওয়াজ পেয়ে লম্বা ঘুম সেরে শেইরনও উঠে বসেছেন, 'সূর্য ওঠার সাথে সাথেই যাত্রা শুরু হবে। মধ্যদুপুরে আবার বিরতি। মরুভূমিতে সূর্য মাথার ওপরে উঠলে আর হাঁটার কোনো উপায় নেই।'

সূর্য উঠতেই দলটা যাত্রা শুরু করলো। উটেরা নিয়মিত ছন্দে হেঁটে যেতে লাগলো। একটু সামনেই একটা মরুদ্যান আছে। সেখানে জলেরও ব্যবস্থা আছে। এই দলের লোকেরা সেটা চেনে। সবাই যার যার জলের চামড়ার পাত্র ভরে নিলো সেখান থেকে। তারপর দুপুরের দিকে তাবু টানিয়ে বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করা। রাতের বেলা ঠান্ডা পড়ে গেলে আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে থাকা অথবা শুয়ে থাকা।

তিনদিন এই একই নিয়মে কেটে গেল। চারদিনের দিন পাহারা দিচ্ছে রুদ্রদেব। আজকে রাতের বাতাস যেন আরও বেশ কনকনে। হঠাৎ আশেপাশের বাতাসে একটা পরিবর্তন অনুভব করলো সে। একটু আগের পরিস্থিতি এখন আর নেই। বালিতে খুরের মৃদু আওয়াজ তার কানে আসছে। সতর্ক হয়ে উঠলো সে। এই রাতের বেলা নিশ্চয়ই অন্য কোনো পথিক দলের সাথে ওদের দেখা হবার সম্ভাবনা নেই।

মরুভূমিতে যারা থাকে তাদের ইন্দ্রিয় প্রাকৃতিকভাবেই অনেক সতর্ক থাকে। এই মৃদু পরিবর্তন দলের আরও অনেকেই ধরতে পেরেছে। রুদ্রদেব তাড়াতাড়ি অসিত আর শেইরনকে জাগালো। শেইরন একটু নড়ে উঠে বললেন, 'আমাকে জাগাচ্ছো কেন? বুড়ো মানুষকে দিয়ে পাহারা দেওয়াতে তোমার বিবেকের বাঁধা কি সরে গেছে না-কি?'

'আর পাহারা দিতে হবে না। যাদের জন্য পাহারা তারা এসে গেছে।'

'কী বলছো!' চট করে উঠে বসলেন শেইরন। অসিত ওদিকে অস্ত্রের খোঁজে হাত দিয়েছে পুঁটুলিতে, শেইরন হায় হায় করে উঠলেন, ' ঐ ভুলটা ভুল করেও কোরো না। এরা বেদুইন। এই মরুভূমির ঈশ্বর। তোমার হাতে অস্ত্র দেখলে মনে করবে তুমি ওদের প্রতিরোধ করতে চাও। তখন এই কাফেলার সবাইকেই মরতে হবে।'

রুদ্রদেব আর অসিত দুজনেই সংযত হলো। অস্ত্র পড়ে রইলো পুঁটুলিতে। আগুনের আলোয় এবার আগন্তুকদের স্পষ্ট দেখা গেল। সম্পূর্ণ আলো কাপড়ে শরীর ঢেকে তেজি ঘোড়ায় চড়ে ওদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে দলটা। দলের লোকদের দিকে নজর দিলো রুদ্রদেব, না কারো মধ্যে আত্মরক্ষা অথবা প্রতিরোধের কোনো চিহ্ন নেই। তার মানে এই ডাকাত দল সম্পর্কে সবারই কমবেশি অভিজ্ঞতা আছে।

সিংহের সামনে শিকার ফাঁদে পড়লে শিকারের আর কিছুই করার থাকে না, যা করার সিংহই করে। বেদুইন সর্দার ঘোড়া থেকে নেমে এলো, 'আমি কোন খুনের ঝামেলা চাই না', কথায় অন্যরকম এক টান, 'তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা দিয়ে দেবে। আমরা তোমাদের কোনো বাহন নিয়ে যাবো না। তাতে তোমরা মরুভূমিতে মারা যাবে। আমরা শুধু মুদ্রা, স্বর্ণ আর রুপা নেবো, যার কাছে যা আছে তাড়াতাড়ি বের করে গুছিয়ে নাও।'

নিজের দলের সদস্যদের দিকে ইশারা করলো সর্দার। ঘোড়া থেকে নেমে কয়েকজন কাজে লেগে পড়লো। এখনো ঘোড়ার পিঠে বেশ কয়েকজন সতর্ক অবস্থায় আছে। এক মহিলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো এক ডাকাত, 'তোমার গয়না আর মুদ্রা দিয়ে দাও।'

মহিলা কাঁদতে কাঁদতে অনুনয় করতে লাগলো, 'আমার কাছে খুব কমই আছে। কয়েকটা মাত্র মুদ্রা। এই কয়টা মুদ্রা ছেড়ে দিন, আমার সন্তান পালনের জন্য আর কোনো সম্পদ আমার কাছে নেই।'

ডাকাত অনুনয় শুনলো না। কেড়ে নিতে উদ্যত হলো। মহিলা যথাসম্ভব বাঁধা দিতে চেষ্টা করছে। ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে মহিলা আঘাত করে বসলো ডাকাতের মুখে। ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেল ডাকাত, নিজের হাতের তলোয়ার চালিয়ে দিলো মহিলার গলা বরাবর সাথে সাথে। রক্ত বেরিয়ে এলো জোয়ারের স্রোতের মতো। মহিলা পড়ে গেল মাটিতে, তখনো নিজের হাতে বাচ্চাকে ধরে রেখেছে।

কাফেলার সবাই আতংকে অনড় হয়ে গেল দৃশ্যটা দেখে। শেইরনের ঠোঁট শুধু নড়ে উঠলো, 'ওরা বেদুইন ডাকাত নয়। ওরা বেদুইনের ছদ্মবেশে ডাকাতি করতে এসেছে। আসল বেদুইন মরে গেলেও কখনো শিশু আর নারী হত্যা করবে না।'

রুদ্রদেবের স্বর মৃদু কিন্তু হিংস্র হয়ে উঠেছে, 'ওরা বেদুইন হোক আর না হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। ওদেরকে কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে।'

মহিলার মৃত্যুতে শুধু কাফেলার লোকজনই থমকে যায়নি ডাকাতের দলও একটু হকচকিয়ে গেছে। এটা তাদের পরিকল্পনায় ছিল না। সেই থমকে যাবার পূর্ণ সুযোগ নিলো রুদ্রদেব, এক ঝটকায় নিজের পুঁটুলিতে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলো নিজের তলোয়ার, সাথে সাথে লাফ দিলো আর মুখে অসিতকে দিলো নির্দেশ, ' অস্ত্র হাতে নাও অসিত।' ডাকাতের দল বেদুইন না হলেও একেবারে অদক্ষ যোদ্ধা তাও বলা যাবে না। একজন রুদ্রদেবকে লক্ষ্য করে ভীম বেগে ব ছুঁড়ল। রুদ্রদেব একটু না থেমে ধরে ফেললো সেই বর্শা। তার সামনে এক একটাই লক্ষ্য। মহিলার আততায়ী। শত্রুর ছুঁড়ে দেওয়া বর্শা হাতে সে পৌঁছে গেল সেই খুনির সামনে, দম ফেলার সুযোগ পেলো না খুনি, তার আগেই তার বুক এফোঁড়ওফোঁড় করে দিল রুদ্রদেবের বর্শা।

ডাকাতের দল বুঝতে পারলো এবার আর শান্তিপূর্ণ উপায়ে কিছু করার উপায় নেই। তারাও এবার অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো রুদ্রদেবের ওপর। ওদিকে অসিত পৌঁছে গেছে ততক্ষণে রুদ্রদেবের কাছে, তার হাতেও খোলা তলোয়ার।

দুজন আক্রমণকারীকে তার দিকে আসতে দেখলো অসিত, সেও এগিয়ে গেল তাদের দিকে। দুজনে এক সঙ্গে আক্রমণ করলো তাকে। বিদ্যুৎ বেগে তার আঘাত এড়িয়ে গেল সে। বুঝতে পারছে না কীভাবে, কিন্তু শরীর যেন অন থেকেই শিবের পশুপতিনাথ ভঙ্গিমায় চলে গেল। দুই আক্রমণকারীর মাথাই খ পড়লো মাটিতে।

ওদিকে রুদ্রদেব রুদ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছে। চারিদিক থেকে তাকে কা করার জন্য আক্রমণ করেছিল শত্রুরা। নিজের তলোয়ার হাতে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করতে লাগলো সে। শরীরের গতি যেন বিদ্যুৎ হার মানিয়ে দেবে। দেখতে দেখতে তলোয়ারের ঘায়ে দশজনের মতো ডাকাত ভূপাতিত হলো। অসিত ওদিকে আরও দুজনকে পাপ থেকে মুক্ত করেছে।

শেইরন দেখতে পেলেন একজন তার দিকেও এগিয়ে আসছে। তিনিও কখন যেন হাতে একটা ছুরি তুলে নিয়েছেন। ডাকাত আসতে দেখে একটুও ঘাবড়ে গেলেন না তিনি। নিজের লাঠির ওপর ভর করে এক পাক শূন্যে ঘুরেই ছুঁড়ে দিলেন ছুরিটা, ডাকাতের বুকে একেবারে মোক্ষম জায়গায় বিঁধল সেটা।

অল্প সময়ের এই লড়াইয়েই ডাকাত সর্দার যা বোঝার বুঝে গেল। সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্তই নিলো সে। ঘোড়া ঘুরিয়ে ছুটিয়ে দিলো, আর চিৎকার করে উঠলো, 'পালাও।'

যারা জীবিত ছিল তারা কেউ ঘোড়ার পিঠে, কেউ দৌড়ে মরুভূমির অন্ধকারে হারিয়ে যেতে লাগলো। অনেক দূর পর্যন্ত তাদের ঘোড়ার খুরের ধ্বনি শোনা গেল।

মহিলার বাচ্চাটাকে আরেক মহিলা কোলে নিয়েছে। সৎকারের ব্যবস্থা করতে লাগলো কাফেলার লোকজন। ওদের তিনজনের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সবাই। ডাকাতদের মৃতদেহও এভাবে ফেলে রাখা যাবে না। সৎকার করতে হবে। কাজ নেহাত কম নয়। অনেকগুলো গর্ত খুঁড়তে হবে।

শেইরনের পাশে এসে বসলো রুদ্রদেব, 'আপনিও তো কম দেখালেন না। ছুরি ছোঁড়ার বিদ্যায় তো আপনি মারাত্মক পারদর্শী।'

শেইরন অসিত আর রুদ্রদেবের দিকে তাকিয়ে যেই হাসিটা হাসলেন তার একটাই মানে হয়।

ওদের ভবিষ্যৎ অনেক উত্তর নিয়ে অপেক্ষা করছে।

'দুজনকে এক সাথে পেলে ভালো হতো, আমি হলে ছাড়তাম না কিছুতেই। দেখা গেল এক বিছানায় দুজনকে দুই পাশে রেখে দিতাম। আমি হতাম তখন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পুরুষ।'

মরিসের কথাটা খুবই অশ্লীল আর অরুচিকর মনে হলেও নিকোলাসের খারাপ লাগলো না ভাবনাটা ভাবতে। আসলেই কোনো পুরুষ সেই কাজটা করতে পারলে সুখী হয়ে যাবে।

সেদিন অ্যালেস্টরের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর রাতে অনেকক্ষণ জেগে থেকেছে সে। মনের দ্বিধার কোনো উত্তর পায়নি। শেষ রাতে একটু ঘুম এলেও তার মধ্যেই সে বারবার নিজের মনের দ্বিধা স্পষ্ট টের পেয়েছে। কারো সাথে এসব নিয়ে কোনো কথা বলা যায় না। এখানে তার পরিবারের সদস্য বলতে কেউ নেই। সারা প্রাসাদে অনেক লোক, সবাই হলো তার অনুগত হেলট অথবা প্রহরী। তাদের সাথে তো আর পরামর্শ করা চলে না। নিজের ভেতরেই চিন্তাটা দাবিয়ে রেখেছে সে।

কাকে বেছে নেবে সে? নিক্সকে নাকি ইনোনকে? নিক্সের ক্ষেত্রে যদি রুচি আর মননের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যায়, তাহলে নিক্সই সবচেয়ে ভালো বাছাই হবে কিন্তু ওদিকে ইনোনের সেই স্নিগ্ধ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া রূপ তো কিছুতেই ভে যাচ্ছে না।

সেদিনের পরে পাঁচ দিন কেটে গেছে। এই পাঁচ দিনে কোথাও বেরোয়নি সে। এমনকি প্রাসাদের ভেতরেও নিজের ঘর ছাড়া খুব একটা হাঁটাচলা করেনি। ভেবে ভেবে একটা পথ বের করার চেষ্টা করেছে তার মন। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। স্পার্টার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পুরুষ হতে পারবে সে। কে জানে, একদিন হয়তো নিজের সেই প্রভাব আর যোগ্যতা দিয়ে হয়ে যাবে রোমানদের সেনাপতি অথবা আরেকটু ওপরে গিয়ে সিনেটের সদস্য। কিন্তু নিক্সকে বিয়ে না করতে পারলে তো আর সেটা সম্ভব নয়।

কারো সাথে একটু যুক্তি করতে পারলে ভালো হতো। তার তোষামোদকারী খুঁজলে এখন অনেক পাওয়া যাবে। অনেকেই আশেপাশে ঘুর ঘুর করে, কিন্তু সঠিক লোক পাওয়া যাবে কী করে? সব অভিজাতরাই নিজেদের এক কিংবা একাধিক মন্ত্রণাদাতা খুঁজে নেয়। কিন্তু সে এখনো নিতে পারেনি। এটা তার ব্যর্থতা নয়, এখনো সময় হয়ে ওঠেনি।

তাকে এই কথা না বলে বুক ফেটে মরা থেকে বাঁচাতে ছয় দিনের দিন তার প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলো মরিস। তাকে চিকিৎসক আরও এক সপ্তাহ বিছানায় থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু সেই কথা আর মানা সম্ভব হয়নি মরিসের পক্ষে। তার

মতো আমোদ প্রিয় লোক কীভাবে আর ঘরের ভেতরে বন্দি থাকে। যখন সে বুঝতে পারলো তার শরীরের ক্ষত আর মেয়েদেরকে জড়িয়ে ধরতে তাকে বাঁধা দিতে পারবে না, তখনই সে বেরিয়ে পড়েছে প্রাসাদ থেকে। আর অবশ্যই প্রথমেই তার গন্তব্য হয়ে উঠেছে বন্ধু নিকোলাসের প্রাসাদ।

মরিসকে দেখে বেশ একটা শান্তি পেলো নিকোলাস। মানুষ হিসেবে তাকে তেমন একটা পছন্দ করে না সে। কিন্তু মরিসের একটা গুণ আছে, সেটা তার ভালো না লেগে পারে না। সেই প্রথম থেকে মরিস তাকে ভরসা করে আর তার প্রতি তার পূর্ণ সমর্পণ আছে। আর এই কিছুদিন ধরে কাউকে কথাগুলো বলার জন্য হাঁসফাঁস করতে থাকা মন স্বাভাবিকভাবেই মরিসকে দেখে একটু শান্তি পেয়েছিল। তবে প্রথমেই কথাটা বলল না নিকোলাস, 'স্বাগত বন্ধু। কিন্তু আমি যতটুকু জানি তোমার তো আরও কিছুদিন বিশ্রামে থাকার কথা। আমি যতটুকু খবর পেয়েছি।'

'আরে রাখো। তুমি তো আমার কোনো খবরই রাখো না। আমি অসুস্থ হয়ে বাড়ি পড়ে আছি। আর তুমি সপ্তাহে একদিনও আমার খোঁজ নিতে পারো না। কী হয়েছে বলো তো।'

আমতা আমতা করলো নিকোলাস, 'আসলে অনেক ব্যস্ত ছিলাম। জানোই তো, যারা তোমার এই অবস্থার জন্য দায়ী তাদেরকে শাস্তিতে রেখে আমার কিছুতেই শান্তি হবে না। তাদের খোঁজে আমি প্রথমে নিজেই গিয়েছিলাম, কিন্তু জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল তারা। তারপর বাড়তি শক্তি যোগাড়ের জন্য গিয়েছি পায়াসের প্রাসাদে। সেখান থেকে সেনা নিয়ে জঙ্গলে পাঠানো হয়েছে।'

হাত তুলল মরিস, 'এসব আমাকে বলতে হবে না। ঐ দুজনের লাশ আমি দেখবো বলেই ওরা এখনো ধরা পড়েনি। আমি ওদেরকে নিজের হাতেই মারবো। আমি অচেতন শয্যাশায়ী থাকার সময় ওরা মারা পড়লে আমি তো আর সেই সুযোগ পেতাম না। তুমি কী করছ, নগরে কী হচ্ছে সেসব আমি প্রতিদিনই শুনেছি। ওরা পায়াসের সাতজনের লাশ জঙ্গল থেকে ফেরত পাঠিয়েছে, সেটাও জানি। কিন্তু তারপরও প্রায় সাতদিন কেটে গেছে। তুমি তো এই সাতদিনে আর কিছুই করলে না। আমি এই ব্যাপারটাই বুঝতে পারছি না।'

মরিসকে ভুলভাল কিছুই এখানে বোঝানো যাবে না। মরিস একটু বোকা হতে পারে কিন্তু এখানে সবকিছু দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার, আর সে পেঁচা নয়। ঠিকই তো এই সাতদিনে তো তার ঐ দুজনের খোঁজে জঙ্গল তন্নতন্ন করে ফেলা দরকার ছিল। কিন্তু সে ঘরে বসে আছে পাঁচদিন ধরে। এমনকি ঐ দুজনের কথা এই পাঁচ দিনে তার মাথাতেও আসেনি। মরিসকে তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা খুলে বলার সিদ্ধান্ত নিলো সে। আস্তে আস্তে সবই খুলে বলল। দুটো বিয়ের প্রস্তাব,

নিক্সের সাথে ঘনিষ্ঠতা, ইনোনের বাড়িতে যাওয়া, ইনোনের রূপের বর্ণনা কিছুই বাদ গেল না।

মরিস সব শুনে হেসে উঠলো, 'তুমিও শেষ পর্যন্ত মেয়ে মানুষের পেছনে লেগে পড়লে বাপু।'

'তোমার এসব কথাগুলো এখন একটু বাদ দাও। মাথায় কোনো বুদ্ধি থাকলে বলতে পারো।'

বুদ্ধি কিছুই মরিসের মাথায় আসার কথা নয়, তবে তখনই সে ঐ কথাগুলো বলেছে। মরিসের বলা কথাটা নিকোলাসকে যেন গদা দিয়ে আঘাত করলো, 'দুজনকে এক সাথে পেলে ভালো হতো, আমি হলে ছাড়তাম না কিছুতেই।' চিন্তাটা একবার তার মাথায় এসেই আবার মিলিয়ে গেল, 'তোমাকে আমি সমাধান দিতে বলেছি, আর তুমি অশ্লীল পরিণতির কথা বলছো।'

মরিস নিজের বলা পরিণতির প্রতি আরও আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলো নিকোলাসকে, 'আমি এসব ব্যাপারে সাফ কথা বলি। তোমার এই সময়ে এই একটা কাজই করার আছে। দুজনকেই নিজের করে ফেলো। নিক্সকে বিয়ে করলে তুমি ক্ষমতা পাবে, আর ইনোনকে বিয়ে করলে পাবে স্পার্টার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। এই দুজনের থেকে একজন বেছে নেয়া কারোই কম্ম নয়। দুজনকেই বিয়ে করে ফেলতে পারো। এমন তো না যে স্পার্টাতে দুই বিয়ে অনুমোদিত নয়।' কথাটা বলেই একটু হেসে উঠলো মরিস।

'হঠাৎ আবার এমন করে হাসছো কেন?'

'তোমাকে দুই বিয়ে করার কথা বলতে বলে আমারই একটা কথা মনে পড়ে গেল। আসলে দেবতারা আমার প্রতি খুবই সদয়। তাই অসুস্থ অবস্থাতেও নারীসঙ্গের অভাব হয়নি। সেখানেও অবশ্য সেই দুই বিয়ের ব্যাপার।'

'কেমন?' নিকোলাস একটু আগ্রহ বোধ করে।

'শোনো, যেই অভিজাতের বাড়িতে আমাদের সাথে ইভান আর ওরিয়নের লড়াই হয়েছিল সেখানেই তো আমি প্রথমে চিকিৎসা নিয়েছি। প্রথম কয়েকদিন তো ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিজাত বাড়িতেই ছিল, পরে কী একটা ব্যবসার কাজে যেন দুই দিনের জন্য বাড়ির বাইরে যায়। আমার তখন একটু ভালো অবস্থা। বিছানা ছেড়ে উঠে এদিকওদিক যেতে পারি। তখনই এক রাতে ঐ অভিজাতের দুই বউকেই পটিয়ে নিজের বিছানায় নিয়ে আসি। দুজনেই প্রথমে সম্মত হতে চাচ্ছিল না। ওদের স্বামীও না-কি কোনোদিন ওদের সাথে এমন কিছু করেনি। কিন্তু আমি তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি এই কাজটায় কত মজা। যদিও শরীর অসুস্থ না হলে খেলাটা আরেকটু জমতো। তবে আমি নিশ্চিত ওরা এখন ঐ দ্বিতীয় শ্রেণির অভিজাতকে এই কাজটা করতে বলবে। আরে, তাই তো তোমাকে এক বিছানায়

দুজনকে নিয়ে শুয়ে পড়ার কথা বলেছি। ব্যাপারটা আমার অনুমান নয়, রীতিমতো অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

'কী বলছ! পিঠের এত বড়ো ঘা নিয়ে তুমি এই কাজ করতে পারলে। তাও দুজনের সাথে?'

'হ্যাঁ, অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে না।'

'কিন্তু এখানে তো আর ব্যাপারটা এত সহজ নয়। দ্বিতীয় শ্রেণির অভিজাতের দুই বউ আর পায়াস আর অ্যালেস্টরের দুই কন্যার মধ্যে পার্থক্য আছে। এখানে একজনকে বিয়ে করলে আরেকজনকে বিয়ে করার কথা ভুলে যেতে হবে। দুটো কখনোই এক সাথে হবে না। আর সেই চিন্তাই আমি করছি পাঁচ দিন ধরে।'

হাল ছেড়ে দিলো মরিস, 'হয়েছে। যেখানে তুমিই হালে পানি পাচ্ছো না, সেখানে আমি আর কী করবো। সারা জীবন তোমার কাছ থেকে বুদ্ধি ধার নিয়ে গেলাম। যদিও এটাকে কথায় কথায় ধার নেয়া বলে কিন্তু তুমি এখন আমাকে সেই বুদ্ধি ফিরিয়ে দিতে বললে আমি পারবো না।'

রীতিমতো মরিয়া হয়ে পড়লো নিকোলাস, 'তোমার সাথে কথাগুলো বলতে পেরে অনেকটাই ভালো লাগছে মরিস। কিন্তু, কে দেবে আমাকে এই সমাধান?'

নিকোলাসের বুকের দিকে ইশারা করলো মরিস, 'এই লোক। তুমিই তোমাকে সমাধান দিতে পারো। আমি যতটুকু বুঝতে পারছি, এক যুবতী নারীর যৌবনের সর্বোচ্চ স্পর্শ পেয়ে তোমার বুদ্ধি বিলোপ হয়েছে। তাই তুমি যে কথাটা অনেক বার আমাকে বলেছ, সেই কথাটা তুমি নিজেই ভুলে গেছো।'

হ্যাঁ, সেই কথাটা মনে পড়লো নিকোলাসের, বিড়বিড় করে আবার সে উচ্চারণ করলো সেই স্বরচিত বাণী, 'কোনো তালাই যেমন চাবি ছাড়া তৈরি করা হয়নি, তেমনি কোন সমস্যাই সমাধান ছাড়া জীবনে আসে না।'

'একেবারে ঠিক। এবার সেই সমাধানটা তোমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। আর ঐ দুজনের কী করবে?'

'আপাতত এই সমস্যা যাক। একবার সামলে উঠতে পারলে ওদেরকে গর্ত থেকে ঠিক বের করে আনতে পারবো।'

'ঠিক আছে বন্ধু। আমাকে এখন যেতে হচ্ছে। তোমার মাথায় কোনো সমধান এলে সেই সমাধানের জন্য কাজ করার সময় আমাকে ডেকে নিও। তুমি নিশ্চয়ই জানো আগামী কয়েকদিন আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

'কোথায় পাওয়া যাবে?'

'আরে বন্ধু, তুমি তো এখনো হুঁশ ফিরে পাওনি। তাহলে বুঝে যেতে আমি এখন কোথায় যাবো। এতদিন অসুস্থ ছিলাম। শরীর আমার এখন হাঁসফাঁস করছে। এই কদিনে ঐ দুই বুড়ি ছাড়া আর কোনো মেয়ের স্পর্শ পাইনি। এখন আমি থাকবো মেয়েদের কাছে।'

'দেখো আবার, প্রশিক্ষণের সময়ে যেসব জায়গায় গিয়ে পড়ে থাকতে সেগুলোতে আবার যেও না। তুমি এখন আর ছাত্র নও, তুমি এখন প্রথম শ্রেণির অভিজাত।'

'ঠিক বলেছ। সেটা আমার মনে আছে। আমি এবার যাবোও অভিজাত জায়গায়।'

মরিস বেরিয়ে যেতেই নিকোলাসের মাথায় আবার ভাবনা খেলে যাচ্ছে তবে এবার আর তার দিশেহারা লাগছে না। মরিসের সাথে কথা বলে বুক হালকা হয়েছে, সাথে মাথাও যেন একটু হালকা হয়েছে। নতুন করে চিন্তা করার শক্তি যেন আবার এসেছে তার মধ্যে।

মন স্বাভাবিক হয়ে আসতেই তার শরীরও স্বাভাবিক হয়ে এলো। এই কদিন খাওয়া নিয়ে একটু অনিয়ম হয়েছে। তা করা যাবে না। শরীর সন্তুষ্ট করে সুস্থ মন নিয়ে ভাবনায় বসতে হবে। মরিস কখনো তার এত বড়ো উপকার করেনি। আজকে হয়তো নিজের অজান্তেই করে গেছে।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে এসে উপস্থিত হলো সে। রান্নাঘরের প্রধান বাবুর্চি হেলট আর বাকি দাসেরা সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়লো। তটস্থ হয়ে গেল তারা। নিকোলাস একবার পুরো রান্নাঘরের দিকেই নজর বোলালো, 'তেমন কিছুই নেই দেখছি। আজ রাতের খাবারের জন্য ভালো মাংস আর মাছের ব্যবস্থা করো। সমুদ্রের বড়ো মাছ। ভালো করে মশলা দিয়ে ভাজবে মাছটা।'

প্রধান বাবুর্চি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'মহামান্য, যদি দয়া করে বলতেন কীসের মাংসের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'অবশ্যই কচি ছাগলের মাংস। আজ রাতে আমার একলা ভোজ হবে। সবকিছুর স্বাদ যাতে মুখে লেগে থাকার মতো হয়।'

আদেশ দিয়ে বেরিয়ে এলো নিকোলাস। নিজের ঘরে চলে গেল। সবসময় সে দেখেছে, কোনো পরিকল্পনা করার সময় হয় লিখে না হয় এঁকে করলে বেশ ভালো ফল মেলে। একটা কাগজের টুকরো টেবিলে নিলো সে। তারপর পুরো ব্যাপারটা সাজাতে লাগলো একে একে।

নিজের বাবা মহামান্য পায়াস। তার আহবান অবজ্ঞা করা যাবে না। তাহলে শুরুতেই তার অনেক বড়ো ক্ষতি হয়ে যাবে। ওদিকে ইনোনকে বিয়ে না করলে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। অ্যালেস্টরকে নিজের অপারগতা বুঝিয়ে বললেই হবে। আর প্রস্তাব তো পায়াসের কাছ থেকেই আগে এসেছে।

নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এখন। ইনোনের রূপ আছে, কিন্তু সেই রূপ যাতে তাকে গ্রাস করতে না পারে সেটা ভাবতে হবে। সুখ ভোগ করার সময় আবেগের ব্যবহার করলে পূর্ণ তৃপ্তি আসে কিন্তু সেই সুখ ভোগের বস্তু অর্জন করার সময় আবেগের সাহায্য নেয়া বড়োই মারাত্মক ফলাফল এনে দেয়। নিজের মনের

আবেশ একপাশে সরিয়ে রেখে আবার কাগজে লেখা নানা শব্দগুলোর দিকে নজর দিলো সে। এবার তার মনে হলো আসলেই পরিকল্পনা করছে সে। সফল পরিকল্পনা সাজানোর আগে সে থামবে না।

কাজ করতে করতে অনেকক্ষণ কেটে গেল। এরই মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচারক এসে জানালো, খাবার তৈরি। খাবার ঘরে গিয়ে টেবিলের দিকে তাকালো সে। খাবারের সুঘ্রাণে পেট মোচড় দিয়ে উঠলো, ছাগলের মাংসের তৈরি পদটার ওপর থেকে ধোঁয়া উড়ছে এখনো।

বেশ মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করে খাবার শেষ করলো নিকোলাস। খাবারের তৃপ্তির অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো সারা দেহে। নিজের ঘরে গিয়ে বসলো আবার বিছানায়। ততক্ষণে তার পানের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

সুস্বাদু মদে চুমুক দিয়ে আজকের মতো আর কাজ না করার সিদ্ধান্ত নিলো সে। আরও কিছুক্ষণ মদ পান করতেই শরীরে ঝিম ধরা নেশার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো। সে বুঝতে পারলো এখনই সময় বিছানায় যাবার। মদের যে উপকারিতা আছে, তা আজকে পুরোপুরি বোঝা গেল। নিমেষে তার মন থেকে সব দোটানা যেন উধাও হয়ে যেতে লাগলো। বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো সে।

নেশার ঘোর কেটে ঘুম হয়তো তার একেবারে সকালেই ভাঙতো, কিন্তু মাঝরাতে নেশার ঘোরেই একটা স্বপ্ন দেখতে লাগলো নিকোলাস। দুই নারীই স্বপ্নে দেখা দিয়েছে। প্রথমে এলো নিক্স। অভিজ্ঞ হাতে তাকে নিয়ে গেল নিজের সুখের দুনিয়ায়। সুখের স্পর্শে তাকে যেন একেবারে ভরিয়ে দিতে লাগলো। সাথে সাথে তার অভিব্যক্তিতে যেন জিতিয়ে দিচ্ছে কামকে, একেবারে নিংড়ে নিচ্ছে নিকোলাসের পৌরুষ। নিকোলাস স্বপ্নের মধ্যেও যেন বুঝত পারলো এটা স্বপ্ন নয়। আসলেই সেদিন নিক্সের ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানায় ঘটনাটা ঘটেছিল। ঘুমের মধ্যেই যেন সে টের পেলো এই অনুভূতি তার আবার চাই। আবার এমন করে ভেসে যেতেই হবে তাকে, তবে এবার কিছুতেই নিক্সকে জিততে দেওয়া চলবে না। আবার যেন দৃশ্যটা ভেসে উঠতে লাগলো তার সামনে। চারিদিকে নানা ধরনের বিশেষ চিহ্নের প্রাণী খাঁচায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের সামনে দুই নরনারী একে অপরের সাথে কাম যুদ্ধে লিপ্ত।

স্বপ্নের ভেতর ঘটতে থাকা ঘটনাগুলো কখন কোন মোড় নেয় তা বলা যায় না। চকিতে সেই ঘর যেন বদলে গেল অ্যালেস্টরের অথিতি ঘরে। ইনোন বসে আছে তার সামনে। সে ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে আছে সেই রূপের দিকে। ইনোন উঠে চলে যাচ্ছে, এইতো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। নাহ, কিছুতেই তাকে হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না। নিকোলাস ছুটে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ঐ তো ইনোন, তাকে দেখে অন্য একটা গলিতে ঢুকে পড়েছে। সে ও ছুটে গেল সেই গলির

দিকে, কই ইনোন। নেই তো কোথাও। খুঁজতে লাগলো তাকে নিকোলাস, পাগলের মতো।

ঐ তো, ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে ইনোন। অ্যালেস্টরের প্রাসাদের প্রশিক্ষণ প্রাঙ্গনের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল সে। তার পরেই দোতলায় যাবার সিঁড়ি। দোতলায় গেলেই দেখা মিলবে ইনোনের। কিন্তু, কই ইনোন? শূন্য বারান্দায় কেবল চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে। একটা কণ্ঠস্বর তাকে ফিসফিস করে বলছে, 'আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে। মহা অভিজাত অ্যালেস্টর আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

না, সে যাবে না। সে এখানেই থাকবে। ইনোন এখানেই আসবে। কিন্তু সে এখানে থাকতে পারছে না। নিজের অজান্তেই সে পিছিয়ে যাচ্ছে। নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে, প্রশিক্ষণ প্রাঙ্গনের পাশ দিয়ে হেঁটে আবার গিয়ে বসে পড়লো সেই অথিতিঘরের আসনে।

ঠিক তখনই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল নিকোলাসের। মদের নেশা এখন একেবারে কেটে গেছে, ঘেমে উঠেছে তার পুরো শরীর। উঠে বসে বিছানার পাশ থেকে পাত্র তুলে জল খেলো সে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো প্রচণ্ডভাবে। কাজ সেরে এসে আবার বিছানায় একেবারে চিত হয়ে শুয়ে পড়লো।

ঠিক তখনই যেন উপায়টা চলে এলো তার মাথায়। আবেগে ভেসে যাওয়া তার উচিত হয়নি। তার মাথার কুটিলতাই তার শক্তি। আর নিজের শক্তির কাছে যখন সে ফিরে গেছে তখন সেই শক্তিই তাকে পথ দেখিয়েছে।

এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার সূক্ষ্ম উপায় সে পেয়ে গেছে। ভাগ্যে হোক অথবা চিন্তায়, সুতোটা এসে ধরা দিয়েছে তার হাতে। সকালের অপেক্ষা আর করলো না সে। টেবিলের ওপর রাখা আলোটার তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়ে আবার কাগজে কালি বোলাতে লাগলো সে। পথ খুঁজে পাওয়াতে গন্তব্যে পৌঁছতে এবার আর বেশি দেরি হলো না।

সেদিনের দূত তার কাজ ঠিকমতোই সম্পন্ন করেছিল। ঠিকমতো দুজন রক্ষী নিয়ে মেয়েটা ফিরে এসেছিল জঙ্গলে। ইভানের চোখে সারারাত ঘুম আসেনি। আসার কথাও নয়। ভালো করে খাবার খাওয়ার ফল হিসেবে ওরিয়ন কিছু একটার ওপর মাথা রেখে তার পাশে ভোঁসভোঁস করে ঘুমিয়েছে। মেয়েটা এসে পৌঁছেছে একেবারে ভোর রাতে।

ইভানই প্রথমে দেখতে পেয়েছিল ওদের তিনজনকে। এগিয়ে গিয়েছিল সে, 'ইনোনের দেখা পেয়েছ?'

ওরা এখনো ইভানের সাথে সহজ হতে পারছে না। যদিও ওদের সর্দার কলিন এই দুজনকে বন্ধু হিসেবে এরই মধ্যে দলে ঢুকিয়ে ফেলেছে। তবু আজন্ম লালন করে রাখা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা যখন একবার ঘৃণায় রূপ নেয়, তা থেকে নিস্তার পাওয়া সহজ কাজ নয়। এই অভিজাত সমাজের প্রতি ওদের ঘৃণা অপরিসীম। যে যাই বলুক, ইভান তো সেই অভিজাতের দলেরই অংশ। এখন ভাগ্য দোষে বিপদে পড়ে তাদের সাথে এসে যোগ দিয়েছে। নয়তো এতদিনে হয়তো তাদেরই মতো কারো ওপর ছড়ি ঘোরাত আর নানা অত্যাচার করতো। মেয়েটার পাশের দুজন রক্ষীর একজন ঘোঁতঘোঁত মতো শব্দ করে উঠলো।

ব্যাপারটা খেয়াল করলে ইভানের অবশ্যই রাগ হতো। তবে তার সম্পূর্ণ মনোযোগ এখনো মেয়েটার দিকে। মেয়েটা ওর দিকে ঠিকমতো না তাকিয়েই জবাব দিলো, 'আমাকে সর্দার পাঠিয়েছিল কাজে। ওনার উপস্থিতিতে কথা বললেই ভালো হবে। এক সাথে কথাটা সবাইকে জানানো উচিত।'

'তুমি নিজেও জানো এই কাজের সাথে সর্দারের কোনো সম্পর্ক নেই। কলিন আমার কাজের জন্যই তোমাকে পাঠিয়েছে। ব্যাপারটা আর জটিল কোরো না। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। ইনোনের সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

এবার হেলট মেয়েটা একটু ভয় পেয়ে গেল। সেদিন রাতের ইভানের হাতের কাজ সে নিজ হাতে দেখেছে। এক সাথে ঐ সাত সেনাকে যেন খড়ের মতো উড়িয়ে দিয়েছিল সে। ব্যাপারটা আর জটিল না করার সিদ্ধান্ত সেও নিলো, 'না, ইনোনের সাথে আমি দেখা করতে পারিনি।'

ইভানের মুখের আগ্রহের আলো যেন দপ করে নিভে গেল, তবে পরক্ষণেই জ্বলে উঠলো মেয়েটার পরের কথাটা শুনে, 'কিন্তু, ইনোনের যে দাসীর কথা বলেছিলেন সেই দাসীর সাথে দেখা করেছি।'

'ডোরার সাথে?'

'হ্যাঁ।'

এতক্ষণ ওদের কথাবার্তার মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে ওরিয়নও যোগ দিয়েছে। সে ডোরার নাম শুনে চোখ কচলাতে কচলাতে বললো, 'আচ্ছা, কী বলেছে ডোরা?'

ঠিক সেই প্রশ্নটাই বেরোলো ইভানের মুখ দিয়েও।

প্রথমে নিজের কৌশল একটু করে বর্ণনা করলো মেয়েটা। কীভাবে বুদ্ধি করে ডোরার পরিবারের ইতিহাস বের করেছে। তারপর ওর বাবার চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে ওষুধ নেয়ার ছুতোয় ইনোনের মতামতও নিয়ে এসেছে।

ইভান শেষে প্রশ করলো, 'ইনোন কী বলেছে?'

দূতের কাজ ভালো ভাবেই করেছে মেয়েটা। ইনোনের বলা কথাগুলো ডোর তাকে যেভাবে বলেছে সেভাবেই বলল সে, 'উনি আপনার সাথে যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো পরিস্থিতিতে গিয়ে থাকতে রাজি আছেন। আপনি যেন কোনোরকম ব্যবস্থা করে তাকে নিয়ে আসেন ঐ প্রাসাদ থেকে।'

ইভানের বুক থেকে যেন ভারী পাথরটা ভোরের রোদের শিশিরের মতো উবে গেল। ইনোন তাকে শুধু ভালোবাসেনি, সেই ভালোবাসার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতেও তৈরি হয়েছে। সেদিনের সেই নির্ঘুম সকালেই ইভানের দাঁতে দাঁত চাপা পড়েছিল। যেভাবেই হোক ইনোনকে বের করে নিয়ে আসবে সে।

তারপরে সাত দিন কেটে গেছে। কলিন পরে সবকিছুই শুনেছে। নিজে ইভানের কাজ করে দিয়েছে সে। এবার ইভানকে সাহায্য করে ঋণ শোধ করে বলল, 'বুঝলে তো। তোমাকে সাহায্য করেছি, এও বলছি সামনে আরও করবে। কিন্তু তুমি তো আমার চেয়ে শক্তিশালী। আর শক্তিশালী হয়েও তুমি যদি আমার কাছে ঋণী থাকো তাহলে তোমার বন্ধু হিসেবে আমারই খারাপ লাগবে।'

ওরিয়ন ইভানের হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ঋণ শোধ করতে হলে কী করতে হবে?'

'সেদিনই তো বলেছি। ভুলে যাবার তো কথা না। আমার দলে যোগ দিতে হবে। সব ধরনের জাতিভেদ ভুলে।'

'আচ্ছা, যাও দিলাম তোমার দলে যোগ।' ইভান আর কথা বাড়াতে চায় না।

'না', কলিন ব্যাপারটা মিটে দিতে চায় না, 'এভাবে বললে তো হবে না। আমিও তো বলতে পারতাম তোমাকে সাহায্য করবো, কিন্তু আমি তো তা না করে সাহায্য করে দেখিয়েছি। তোমরা দুজনও আমার দলে যোগ দিয়ে দেখাও।'

আশ্চর্য হয়ে গেল ইভান, ' উল্টোপাল্টা কথা বলছো কেন? তোমার দলে তো বললাম যোগ দিয়েছি। এটা চোখে দেখাবো কী করে?'

প্রসন্ন হাসি হেসে বলল কলিন, 'তোমাদের ঐ দ্বিতীয় শ্রেণির অভিজাতের মালামাল আজ যাবে বন্দর থেকে নগরীতে। এমনিতে সে ঘুর পথে জঙ্গলের রাস্তা এড়িয়ে চলে, তবে এবার না-কি বেশ কয়েকজন ভালো সেনা ভাড়া করেছে, আর

সেই সাথে সাহস পেয়েছে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাবার। আমার দলে যোগ দেবার প্রমাণ আজকেই তোমরা দিতে পারবে।'

ইভান এতক্ষণে বুঝতে পারলো, 'আমাদের তাহলে ডাকাতি করতে বলছো?'

'আমার দলে ঢুকলে তো তাই করতে হবে। আমরা তো মঞ্চে নাটক করি না, আমরা বেঁচে থাকার জন্য ডাকাতিই করি।'

অগত্যা রাজি হতেই হলো ওদেরকে। আর সেই রাজি হবার কারণেই এখন ইভান আর ওরিয়ন দুজনেই বসে আছে জংগলের পথের পাশের ঝোপের আড়ালে। আরও চারজন সেনা দিয়েছে কলিন, তবে তারা কেবলই সাহায্যকারী। কলিন ব্যাখ্যা দিয়েছে, ' যদি এই ছোটো ডাকাতির জন্য এরচেয়ে বড়ো দলই পাঠাতে হয় তাহলে আর তোমাদের দুজনকে দলে ভিড়িয়ে কী লাভ হয়েছে?'

ইভান প্রথমেই রাস্তার অবস্থা মেপে নিয়েছে। এখানে একটা ডাল পড়ে আছে রাস্তার ওপর। সেই ডাল টেনে একটা নিক্ষেপ ফাঁদ বানিয়েছে ওরিয়ন। সে আবার এসব কাজে ওস্তাদ। পার্থক্য হচ্ছে, সে ফাঁদ পাতা শিখেছিল পশুপাখি কাবু করার জন্য। অবশ্য মোটা দাগে দেখতে গেলে মানুষ তো প্রাণীই।

ফাঁদের লতার যে জায়গাটা কেটে দিলে ডালটা দুর্বার গতিতে লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাবে সেটার কাছেই ছুরিটা নাড়াচাড়া করছে ওরিয়ন। ওদেরকে বেশকিছু অস্ত্র দিয়েছে কলিন। সেসব অস্ত্রের মান তেমন ভালো নয়। অনেকদিনের ব্যবহার আর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ব্যবহারের প্রায় অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

ওরিয়ন ছুরির বাট একটু সোজা করতে করতে বলল, 'আর কতক্ষণ এভাবে বসে থাকতে হবে বলো তো। কারো তো কোনো খবরই পাচ্ছি না।'

'খবর পাচ্ছি না বলছো কেন? এরই মধ্যে তিনটা পথিক দল গেল।'

'আমার তো অপেক্ষা করতে করতে এতই অধৈর্য লাগছে মন চেয়েছিল ওদেরকে দিয়েই ডাকাতি শুরু করি।'

'তুমি এতো অধৈর্য হও কীভাবে? তুমি না এক নম্বর শিকারি।'

'এতদিন তো তাই জানতাম। তবে জানো কি, প্রাণীর জন্য অপেক্ষা করতে আমার ভালো লাগে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে কেন যেন সেই ভালো লাগাটা কাজ করছে না। তার ওপর জীবনের প্রথম ডাকাতি করতে এসেছি। তোমার অপেক্ষা করতে খারাপ লাগছে না?'

'আমার অপেক্ষা অন্য জায়গায়। সেই অপেক্ষা মন্দ না।'

'ওহ হো বুঝেছি। কিন্তু সেই পরিকল্পনা কি করে ফেলেছ?'

'আসলে ইনোনকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা এত কঠিন কিছু হবে না। ওকে খবর পাঠালেই ও চলে আসবে ওদের প্রাসাদের পেছনের সেই গোপন জায়গায়। তারপর ওকে নিয়ে শুধু চলে আসবো। পরিকল্পনার প্রধান বিষয় হচ্ছে,

ওকে এনে তারপর কী করবো? সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না বলেই এখনো ওদিকে এগোতে পারছি না।'

'আরে সত্যিই তো', ওরিয়ন এই কথা চিন্তাও করেনি কখনো, 'আমরা তো আছি আরেকজনের আশ্রয়ে। ইনোনকে এনে তুমি রাখবে কোথায়?'

'সেটাই। ভালোবাসার আবেগে তো সে বলে দিয়েছে আমার সাথে এসে থাকবে, হয়তো থাকবে, সকল কষ্ট সহ্য করবে মুখ বুজে, কিন্তু আমি তো আর ওকে মুখ বুজে কষ্ট সহ্য করতে দিতে পারি না।'

'ঠিক। তাহলে এখন কী করবে তুমি? অবশ্য তুমি যা করবে সেই কাজ তো আমাকেও করতে হবে। তাহলে এখন আমরা কী করছি?'

'আমি চিন্তা করেছি মিশর চলে যাবো। সেখানে রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো ব্যবসা ক্ষেত্র। বন্দরগুলোর পথে অনেক সেনা শিবির আছে। সেই সেনারা পথে পথে টহল দিয়ে বেড়ায়, কেউ যেন বণিকদের ডাকাতি করে বিরক্ত করতে না পারে। শুনেছি রোমান সম্রাট সেই সেনা শিবিরের সেনাদের ভালো বেতন দেন। তাদের থাকার ব্যবস্থাও অসাধারণ। সেখানেই যাবো ভাবছি। রোমের সৈন্যরা না-কি এসব দস্যু দমনে কাজ করতে পছন্দ করে না। তাদের মর্যাদার হানি হয়।'

'আমরা মিশরে গিয়ে ডাকাত তাড়াবো, আর আজকে এখানে বসে আছি ডাকাতি করার জন্য। ব্যাপারটা আমার ঠিক মাথায় ঢুকছে না।'

'এটা সময়ের খেলা বন্ধু। যখন যেমন করে সময় আসবে তখন ঠিক তেমন করেই চলতে হবে।'

'কিন্তু, রোমান সেনারা কেন এই কাজে মর্যাদা খুঁজে পায় না?'

'সেটা বলতে পারবো না। আমি যার কাছে থেকে শুনেছি সে ওটা বলেনি।'

'আমি মনে হয় কারণটা জানি।'

'তাই না-কি?' ইভান অবাক হয়।

'হ্যাঁ', ওরিয়নের গলা সহজ, 'আমার মনে হয় ওরা স্বদেশ ছেড়ে ঐ বিদেশে থাকতে যেতে রাজি নয়। আর আমাদের এদিকের মতো তো আর সুন্দর নয় ঐ দেশ। জানো তো বেশির ভাগই মরুভূমি। গাছ নেই, জল নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা জঙ্গল নেই। আমি শিকার করবো কীভাবে?'

এটা অবশ্যই একটা গম্ভীর সমস্যা। মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো ইভান, 'তাহলে কী করবো? কোথায় যাবো?'

ওরিয়ন সহজ পথটাই দেখে, 'কোথাও যে যেতেই হবে সেটাই বা তোমার কেন মনে হচ্ছে। বেশ কিছুদিন ধরেই তো জঙ্গলে এই হেলটদের সাথে আছি। আমার তো খারাপ লাগছে না। জঙ্গলে সবাই কি সুন্দর দুঃখ কষ্ট মিলিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, অভিজাত না হয়ে ভালোই হয়েছে। ঐ মেকি জীবনে আমার অন্তত ভালো লাগতো না। এই বেশ ভালো আছি। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে

বেড়াচ্ছি। সমাজের অদৃশ্য চোখ রাঙ্গানোর ভয়ে সব সময় তটস্থ হয়ে থাকতে হচ্ছে না। মানুষের ওপর অকারণে নিজের প্রভাব বজায় রাখার জন্য হম্বিতম্বি করতে হচ্ছে না। যারা এই জঙ্গলে আছে তাদের কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। ওরা যে ঐ নগরের বেড়াজাল কাটিয়ে স্বাধীন থাকতে পারছে এতেই ওরা খুশি। কয় বেলা খেলো আর কয় বেলা না খেলো তাতে কারোই কিছু আসছে যাচ্ছে না।'

ইভান আরেকটু চমৎকৃত হলো। তার সবসময় মনে হয়েছে সব মানুষের ভেতরেই একটা বিশেষ সত্তা লুকানো থাকে। সেটা মানুষের একান্ত আলাদা। সে নিজেও প্রভাবিত হলো ওরিয়নের কথায়, হয়তো জীবনে প্রথমবারের মতো। সত্যিই তো, মিশর অথবা অন্য কোথাও গিয়ে জীবনকে এত জটিল করে লাভ কী? এখানে হেলটরা কত সুন্দর করে বেঁচে আছে। আরাম নেই, কিন্তু সমাজের অমিত ঝামেলাও তো নেই। এই জঙ্গলে সে আর ইনোন কত সুন্দর জীবন কাটাতে পারবে। ওদেরকে মিস্ত্রির কাজও শিখতে হয়েছিল ছোটোবেলায়। দুজনে মিলে ইনোনের জন্য এটা সুন্দর ঘর তৈরি করে দেবে। স্নানঘরের সুগন্ধি জলের অভাব পূরণ করবে ঝর্ণার নির্মল জল, শয্যার কোমলতা ভুলিয়ে দেবে বুনো ফুল, দামি তেলের প্রদীপের বদলে রাতে নক্ষত্র আলো দেবে। জঙ্গলে থাকা তো মন্দ হয় না।

ওরিয়নের সাথে কথাটা বলতে যাবে ঠিক সেই সময়েই রাস্তার ওপর শব্দ শোনা যেতে লাগলো। ভালো করে কান পাতলো ওরা। না, সামান্য কোনো ছোটো পথিকের দল বলে তো মনে হচ্ছে না। ধাতব ঝনঝন শব্দ অবশ্যই ঘোড়ার গাড়ির। কিছু খুরের শব্দও শোনা যাচ্ছে।

ইভান ঝোপের মধ্য দিয়ে নীরবে এগিয়ে গেল, ওরিয়ন ওদিকে ছুরি হাতে নিয়ে তৈরি। পথের উঁচু কোণ থেকে বাঁকের ওদিকে তাকালো সে। দলটাকে দেখতে পেলো স্পষ্ট। দুটো ঘোড়ার গাড়িতে জমা করা মালামাল। ভারের চোটে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। আটজন সেনা পাহারা দিচ্ছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। যথেষ্ট সতর্ক। কলিন তার বাহিনী নিয়ে এরই মধ্যে এলাকায় যথেষ্ট আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।

ইভান একবার পরিকল্পনা মেপে নিলো। সমস্যা হচ্ছে পেছনের চারজন নিয়ে। ওদেরকে আক্রমণ করতে হবে সামনের দিক থেকে। পেছনের সেনারা হতচকিত হবে না। আর পেছন থেকে ঘিরে আক্রমণ করার লোকবল নেই। আর সবচেয়ে বড়ো কথা ওরা আছে ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়ার পিঠে থাকলেই যোদ্ধারা একটা বিশেষ সুবিধা পায়। স্পার্টার যোদ্ধারা আগেও তেমন ঘোড়া ব্যবহার করতো না, রোমানরা তো সেই সুবিধা নিয়েই গ্রীকদের হারিয়েছিল। আর এখন স্পার্টার সেনারাও ব্যবহার করছে সেই ঘোড়া।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ইভান। আটজন সেনার সাথে যুদ্ধ করেই কাজটা হাসিল করতে হবে। ওরিয়নের দিকে ইশারা করলো সে। ডান হাতের দুটো আঙুল দেখাল সে, ওরিয়ন পাল্টা ইশারা করলো। সে বুঝতে পেরেছে।

ওদের কাছাকাছি এসে পড়লো প্রথম গাড়িটা। সেটাকে যেতে দিলো ওরিয়ন। বাকি হেলট সৈন্যরা কী করতে হবে এখনো বুঝতে পারছে না। তারা কেবল একটা নির্দেশই পেয়েছে আর সেটাই মেনে চলছে, ' আমরা দুজনে কিছু করার আগে তোমরা কিছু করবে না। একবার আমরা আক্রমণ শুরু করলে এরপর আর আমাদের দিকে তাকাবে না। যা ইচ্ছে করতে পারো।'

ওরিয়নের হিসেবের মধ্যে প্রবেশ করলো দ্বিতীয় গাড়িটা। ছুরির একটা আলতো ছোঁয়ায় লতাটা কেটে দিলো সে। নিখুঁত হিসেব। বাঁকা করে রাখা ডালটা সবেগে লতাপাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে ঘোড়া দুটোর ওপর দিয়ে আঘাত করলো চালককে, সাথে গাড়ির দুপাশে থাকা দুজন ঘোড়সওয়ারকেও ভূপাতিত করলো।

ঠিক একই সাথে ইভান লাফিয়ে পড়লো সামনের দুজন সৈন্যের সামনে। মানুষ মেরে ফেলার ইচ্ছে নেই তার। প্রথম আঘাতে একজনের হাতের বর্শা ফেলে দিলো, আরেকজনকে এক মুষ্টিতে ফেলে দিলো ঘোড়া থেকে। হেলটদের দলটা নিজেরাও থ মেরে গেছে। ওরা দেখলো, কেউ কিছু করার আগেই চারজন অকেজো হয়ে গেছে।

বাকি চারজন সৈন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। আক্রমণ করবে নাকি পি হটবে সেই ভাবনার মাঝখানে ইভানের শান্ত গলা শোনা গেল, ' আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে চাই না। আমার দরকার শুধু এই দুটো গাড়িতে থাকা জিনিসপত্র। তোমরা যেতে পারো নিজেদের পথে। তোমাদের ঘোড়াও আমি নেবো না। তোমরা আরামেই নগরে চলে যেতে পারবে। আর যদি ভেবে থাকো লড়াই করবে তাহলে তাতেও আমার কোনো অসুবিধা নেই। স্বাগত।'

ইভানের শান্ত স্বর ঘোড়ার ওপর বসে থাকা সেনাদের কাঁপিয়ে দিলেও তারা আসলে ইভানের পরিচয় জানে না। তাই ঘোড়াকে ইশারা দিয়ে সামনে বাড়িয়ে আক্রমণ করারই সিদ্ধান্ত নিলো। সেটা যে একই সাথে বাজে এবং তাদের জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত ছিল সেটা বোঝা গেল একটু পরেই।

ওরিয়ন এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। তার দিকে দুই ঘোড়সওয়ার এগিয়ে গেল। বাকি দুজন এগিয়ে এলো ইভানের দিকে। প্রথম ঘোড়সওয়ারের তলোয়ারের আঘাত সহজেই এড়িয়ে গেল ইভান, সেই সাথে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে ফেলে দিলো ঘোড়ার পিঠ থেকে। যেন বাচ্চা ছেলের সাথে খেলা করছে সে। আরেক সেনাকেও একই কায়দায় পেড়ে ফেললো মাটিতে। মাটিতে পড়ে যাওয়া দুজন মরিয়া হয়ে এবার আক্রমণ করলো ইভানকে। এক সাথে। কিন্তু নিজের হাতের অস্ত্রে দুজনকেই ঘায়েল করলো ইভান। এবার আর আহত করার জন্য আঘাত

করেনি, দুজনেই নিহত হলো। ওদিকে ওরিয়নও তার দিকে এগিয়ে যাওয়া দুজনকে চিরনের নৌকা দেখিয়ে দিয়েছে।

যারা প্রথমে আঘাত পেয়ে আহত হয়েছিল শেষে দেখা গেল তাদের ভাগ্যই ভালো ছিল। ওদেরকে যার যার ঘোড়ার পিঠে তুলে দেওয়া হলো। বসে থাকতে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে। এই অবস্থায়ই রওনা দিলো নগরের দিকে। ঘোড়া চালাতে পারবে না। ঘোড়া নিজের থেকে চলে যেটুকু যেতে পারে। ভাগ্য ভালো হলে ওরা নগরে পৌঁছতে পারবে। লাশগুলোকেও বেঁধে দেওয়া হয়েছে ঘোড়ার পিঠে।

দুটো ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে ওরা হাজির হলো কলিনের আড্ডায়। গাড়ি দুটো দেখে সবার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। কলিন গুণে দেখল যারা গিয়েছে সবাই ফিরে এসেছে, 'এমন ঘটনা আগে আর ঘটেনি। এই ডাকাতি করতে হলে আমাদের দলের কম করে হলেও চারজনের প্রাণ বিসর্জন দিতে হতো। তোমরা বাঁচিয়ে দিলে চারজন।'

দুটো ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই মালামাল কম কথা নয়। সবাই সেদিকে হাত লাগাল। দেখতে লাগলো কী কী আছে।

ইভান আর ওরিয়ন নিজেদের যুদ্ধসাজ ফেলে বসলো। আসার সময় ভালো দেখে নিহত সেনাদের অস্ত্রগুলো নিয়ে এসেছে তারা। সেগুলো একটু পরীক্ষা করতে করতে ইভান বলল, 'তোমার কথাই ঠিক আছে ওরিয়ন।'

'কোন কথাটা?'

'আমরা মিশর অথবা কোথাও যাচ্ছি না। ইনোনকে নিয়ে এই জঙ্গলেই সংসার গড়বো আমি। আর ইনোনকে নগর থেকে বের করার মোক্ষম উপায় পেয়ে গেছি।'

আলো আর অন্ধকার মাঝে মাঝে ধোঁকা দেয়। আলো মানেই ভালো, আর অন্ধকার মানেই বিকার, এই চিন্তা সবসময় ঠিক নয়। কোনো অন্ধকার ঘরে টিমটিমে আলোর মধ্যেও ভালোবাসার নিদর্শন থাকতে পারে, আবার কোনো জায়গায় আলোর প্রাচুর্য আর ঝলমল ভাব কেবল বিলাসিতার কলুষতাই প্রকাশ করে। চকচক করলেই যেমন স্বর্ণ হয় না, তেমনি সব আলোও আলোকবর্তিকা বহন করে না।

স্পার্টার এই পাশটা এমনই। প্রচুর আলোর ঝলকানি এখানে। পুরোটাই যদিও মানুষের নজর ঝলসে দেবার জন্য। এদিকে চরিত্রের কোনো জায়গা নেই। দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হতেই মানুষ এদিকে আসে আর ফিরে যাবার সময় বুক ভরা আঁধার নিয়েই ফিরে যায়।

নিকোলাস কিছুক্ষণ ধরেই এই রাস্তার মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল। এই রাস্তা ধরে এগোলেই শুরু হয়ে যাবে সুখের হাতছানি। ঘরবাড়ির সদর দরজা থেকে, ঝুল বারান্দা থেকে এমনকি ছাদের ওপর থেকেও সুখের হাতছানি নিয়ে তৈরি আছে গণিকারা। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন পশরা নিয়ে তৈরি তারা।

এমন একটা জায়গায় স্পার্টার সদ্য হওয়া মহা অভিজাতের যাওয়া কিছুটা শোভন নয়। এমন না যে তার এসব চাহিদা নেই অথবা সমাজ মনে করে থাকতে পারে না, তবে তার জন্য তো বিশেষ ব্যবস্থা আছেই। মহা অভিজাত ইচ্ছে করলেই এখান থেকে গণিকাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে তার প্রাসাদে। তাহলে তিনি কেন এখানে এসে মানুষকে একটু মুখরোচক কাহিনি বলা সুযোগ করে দেবেন?

এই চিন্তাটা নিকোলাস এতক্ষণ ধরে করেছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চার জন দেহরক্ষীও এখানে এসে একটু উসখুস করছিল। নেহাত ভয়ের চোটে মালিককে কিছুই বলতে পারছে না। তবে নিকোলাস সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। মরিসের এখন এখানেই থাকার কথা। আর তাকে এই সময় খুবই দরকার। কাউকে দিয়ে খবর পাঠানো যেত হয়তো তবে সেখানেও এই জায়গার সাথে তার সম্পর্ক মানুষে জেনে যেত। তাই যা করার সামনাসামনি নিজেই করবে। আর মানুষকে জানিয়েই করবে।

রাস্তার একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো পাঁচটা ঘোড়া। এতক্ষণ সেই ঘরের সামনে দুই রমণী যথেষ্ট উগ্র সাজকে নিজেদের মুখের অভিব্যক্তিতে আরও উগ্র করে এদিকওদিক তাকাচ্ছিল, নিকোলাসকে দেখে তাদের মুখের উগ্র ভাব স্বাভাবিক হয়ে এলো। নিকোলাসকে তারা চেনে। আর প্রতি রাতে অভিজাতদের

সঙ্গিনী হয়ে উঠলেও এই গণিকারা এটা জানে, তারা হেলটদের থেকে একটুই উঁচু, বেশি নয়।

নিকোলাসের ইশারায় এক রক্ষী এগিয়ে গেল, 'তোমাদের দুজনের একজন একটু এদিকে এসো। মহামান্য নিকোলাস কথা বলবেন।'

নিকোলাসের আবার তাদের মতো লোকের সাথে কী কথা। একই সাথে ভয় ও আগ্রহ পেয়ে বসে ওদের। নিকোলাস যদি নিজের ঘরের জন্য কোনো রক্ষিতা নিয়ে যান তাহলে এই আলো সমৃদ্ধ অন্ধকার গলির ঘৃণ্য জীবন থেকে মুক্তি মিলবে।

একজন এগিয়ে আসে। নতমুখ হয়ে দাঁড়ায় নিকোলাসের সামনে। নিকোলাস মেয়েটার দিকে ঠিকমতো তাকালো না, 'এখানে মরিস নামে কেউ এসেছে আজকে? সে প্রথম শ্রেণির অভিজাত।'

মেয়েটা মরিসকে চেনে, প্রথম শ্রেণির অভিজাতও খুব বেশি আসে না এখানে, মরিস চরিত্রগুণে এখানে নিয়মিত আসে, 'আজ্ঞে। ওনাকে আমি চিনি। উনি আজকে এসেছেন। তবে উনি এই বাড়িতে আসেননি। আর দুটো বাড়ি পরে যেই বাড়ি ওখানে আছেন।'

মেয়েটাকে আর কিছুই বলল না নিকোলাস, এসব মেয়েদের সাথে কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। সঙ্গী-সহ সে আগে বাড়লো। এসে দাঁড়ালো দুটো বাড়ির পরের বাড়ির সামনে। এখানে অবশ্য ব্যবস্থা একটু ভালো। তাকে দেখে কোনো মেয়ে এগিয়ে এলো না। এক দাস আছে এই বাড়ির মালিকের, সেই এগিয়ে এসেছে।

তাকেও একই প্রশ্ন করলো নিকোলাস। সে মরিসের এখানে থাকার কথা নিশ্চিত করলো। নিকোলাস উদাস মুখে আদেশ করলো, 'যাও, ওকে ডেকে নিয়ে এসো। আমার নাম বলবে।'

ভয়ের ছায়া দেখা দিলো দাসের মুখে, 'আজ্ঞে, উনি আমাকে বলেছেন যাতে আজকে রাতে তাকে কিছুতেই বিরক্ত না করি। উনি কাজে ভুল হলে অনেক রেগে যান। আমি এখন ডাকতে গেলে তিনি নিশ্চয়ই অনেক বিরক্ত হবেন।'

নিকোলাস মরিসের প্রভাব বুঝতে পারলো। ওর রাগের প্রভাবে একজন দাস মহা অভিজাতের আদেশ অমান্য করছে। ঘোড়া থেকে নেমে গেল সে। সাথে সাথে তার চার রক্ষীও নেমে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

দাসকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো নিকোলাস, ইশারায় জানতে চাইলো মরিসের অবস্থান। দাস কাঁপছে রীতিমতো, 'উনি দোতলায় আছেন। ওখানে একটা ঘরই আছে। বিশেষ অথিতিদের জন্য।'

দোতলায় উঠে এলো নিকোলাস। সেই বিশেষ অথিতিদের জন্য বরাদ্দ ঘর থেকে বিশেষ শব্দ ভেসে আসছে। মরিস পুরো দমে চালাচ্ছে আর কাজ।

নিকোলাস ইশারায় তার রক্ষীদের থামতে বলে নিজে এগিয়ে গেল। দরজা পুরোপুরি আটকানো হয়নি। মরিস নিশ্চয়ই নিশ্চিত এই অভিসারে অভিযোগ করতে কেউই আসবে না। কিন্তু সে এসে গেছে।

দরজায় বেশ জোরে করাঘাত করলো নিকোলাস। বেশ কয়েকবার। ভেতরের বিশেষ শব্দ থেমে গেল। একটু পরেই শোনা গেল মরিসের জোরালো স্বর, 'কে ওখানে। আমি কি বলেছি তা কি ভুলে গেছো? এই রাতের জন্য এই কক্ষ আমার।'

নিকোলাস বাইরে থেকে জবাব দিলো, 'না বন্ধু। কথাটা একটু বদলে যাবে। আজকে রাতের জন্য তুমি আমার। এখন একটু ভদ্র হয়ে নাও। জরুরি কাজ আছে।'

মরিস একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেললো। অবশ্য সেই নিকোলাসকে বলে এসেছে তাকে খুঁজতে গেলে কোথায় যেতে হবে। একেবারে মোক্ষম সময়েই এসেছে ব্যাটা। সুখের সর্বোচ্চ অবস্থানে যেতে আর বেশি সময় লাগতো না। কিন্তু তাল কেটে গেছে। এখন আর হবে না।

শরীরের ওপর থেকে মেয়েটাকে সরিয়ে দিলো সে। তারপর বড়ো গলায় উত্তর দিলো, 'আসছি। একটু সময় দাও।'

মেয়েটা মরিসের হাতের ধাক্কায় বিছানা থেকে পড়ে গিয়েছিল। সেদিকে মরিস একবারও ফিরে তাকায়নি। মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়ে নিজের নির্বসনে স্বল্প কাপড় জড়িয়ে নিতে লাগলো। তার সুখের সর্বোচ্চ শিখরে ওঠা নিয়ে অবশ্য ভাবনা নেই। এখানের মেয়েরা কেবল সুখ বিলিয়ে যায়। শরীর রস তাদের শরীর থেকে সুখের আবেশে জেগে ওঠে না, বরং খদ্দেরের আহবানে তারা ঐ রস নিয়ন্ত্রণ করার বিদ্যা অনেক আগেই আয়ত্ত করে ফেলেছে।

মরিস পোশাক জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। নিকোলাস একবার তার দিকে তাকিয়েই বলল, 'এভাবে হবে না?'

'কেন?'

'আমরা এখন গভর্নর পায়াসের বাড়ি যাবো। সেখানে তোমাকে এভাবে কীভাবে নিয়ে যাই? তুমি তো সেখানে প্রথম বার যাচ্ছো।'

গলা নামিয়ে একটা রসিকতা করলো মরিস, 'আরে সেটা তো তোমার শ্বশুরবাড়ি, আমার আবার এত সাজগোজের দরকার কী? দেখা যাবে পরে নিজের বিয়ের জন্য আমাকে প্রস্তাব দিয়ে বসেছে।'

নিকোলাস মরিসের রসিকতা খুব ভালো ভাবে নিলো তা বলা যাবে না, তবে সে তাড়া দিলো, 'ভেতরে নিশ্চয়ই তোমার ভালো পোশাক আছে। সেগুলো জলদি পরে নাও।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মরিসকে আবার ভেতরে যেতে হলো। মেয়েটা এতক্ষণে পোশাক পরে ফেলেছে, মরিস ঢুকেই আদেশ দিলো, 'তুমি এখনো এখানে কী করছো? তোমার এখানে আর প্রয়োজন নেই। নিচে যাও।'

মেয়েটা বেরিয়ে যেতেই ঢুকলো নিকোলাস। মরিসের রাজকীয় আঁটসাঁট পোশাক পরতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। ঘা শুকানো জায়গাটায় এখনো চিনচিনে ব্যথা করে, 'এত রাতে তুমি হঠাৎ করে পায়াসের প্রাসাদে যাবে কেন? কাল সকালে নিরিবিলি কাজ শেষ করে গেলে হতো না?'

'না। কারণ পায়াস আমাকে আজকেই ডেকে পাঠিয়েছেন। আর স্পার্টার গভর্নরের নেক নজরে থাকা যে কতটা ভালো সেটা নিশ্চয়ই তোমাকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।'

পোশাক পরা শেষ করে মরিস। চোখেমুখের এলোমেলো ভাবও মোটামুটি দূর করে নেয়। নিজেদের ঘোড়ার সঙ্গে আরেকটা ঘোড়া বাড়িয়ে রওনা দেয় দলটা পায়াসের প্রাসাদের দিকে।

এত রাতেও প্রাসাদের সামনে ওদের তেমন কোনো সমস্যা হলো না। পায়াস আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন সদর দরজায়। আর কয়েকদিন আনাগোনার ফলে নিকোলাসকে এখন সদর দরজার সকলেই চেনে। ওরা বিনা বাঁধায় প্রবেশ করলো প্রাসাদের ভেতরে।

মরিস এই জীবনে কয়েকবার বাইরে থেকে এই প্রাসাদ দেখেছে, এই প্রথম ভেতরে ঢুকল সে। চক্ষু চড়ক গাছ হতে সময় লাগলো না, 'এই হলো প্রাসাদ। আমার প্রথম শ্রেণির অভিজাতের প্রাসাদ এখন একেবারে জঘন্য মনে হচ্ছে।'

'নিজের যা আছে তাই নিয়েই খুশি থাকো।' হালকা স্বরে বলল নিকোলাস।

অশ্লীল হাসলো মরিস, 'তাই আছি।'

আর কোনো কথা হলো না। রক্ষী চারজন দাঁড়িয়ে রইলো বাইরে। ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো অথিতি কামরায়। অবশ্যই সব অস্ত্র বাইরে রেখে যেতে হলো।

পায়াস আগে থেকেই সেই অথিতি ঘরে ছিলেন। ওরা দুজনেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলো। একটা ব্যাপার নিকোলাস খেয়াল করেছে, যথেষ্ট চিন্তায় ভরে আছে যেন পায়াসের মুখটা। এই কদিনের সাক্ষাতে তার এমন অবস্থা সে কখনো দেখেনি।

পায়াস ওদেরকে বসতে বললেন। নিকোলাস মরিসকে পরিচয় করিয়ে দিলো, 'মহামান্য পায়াস, ও আমার বন্ধু মরিস।'

'আচ্ছা, আপনার ব্যাপারে শুনেছি। আপনিই সেই প্রথম শ্রেণির অভিজাত যাকে আঘাত করে ঐ দুই অপরাধী নগর ছেড়ে পালিয়েছে।'

'আজ্ঞে মহামান্য।' মরিস নিজের মুখে শ্রদ্ধার মুখোশ পরে।

'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এখনো ঐ দুই অপরাধীকে আমরা আটক করতে পারিনি। আপনার শরীর এখন সুস্থ হয়েছে?'

'জি, আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'শুনে খুশি হলাম।' নিজের পানপাত্রে চুমুক দিলেন তিনি। বাকি দুজনও এতক্ষণ এই অপেক্ষাতেই ছিল। তারাও নিজেদের পাত্রে ঠোঁট ছোঁয়াল।

'মহামান্য পায়াস।' নিকোলাস আর অপেক্ষা করতে চাইলো না, এমনিতেই রাত অনেক হয়েছে, 'আপনাকে অনেক চিন্তাযুক্ত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কিছু নিয়ে আমি ভাবনায় আছেন। আমাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছেন এত রাতে। নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে।'

'ঠিক ধরেছেন। গুরুতর কিছুই ঘটেছে। আমি এই নগরে গভর্নর হয়ে এসেছি আজ কত বছর কেটে গেল। সেই প্রথম যৌবনে এসেছিলাম, তারপর এখানে বিয়ে করে সংসার করেছি। স্পার্টাকে দেখতে শুরু করেছি নিজের ঘরের মতো। ছোটোখাটো দুই একটা ঝামেলা যে হয়নি তা নয়। হেলটরা ডাকাত দল গঠন করেছে, ছোটোখাটো ডাকাতিও করছে, কিন্তু আজকে যা ঘটে গেছে তা তো আগে কখনো ঘটেনি।'

' কী হয়েছে?' প্রশ্নটা আবার করলো নিকোলাস।

'ওনার সামনে বললে অসুবিধা নেই তো। আমি কথাটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চাচ্ছি।'

মরিসের দিকেই ইশারা পায়াসের। সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিলো নিকোলাস, 'আপনি নির্ভাবনায় বলতে পারেন। মরিস মরে গেলেও কাউকে কিছুই বলবে না।'

'আচ্ছা, এই নিন।' একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন পায়াস নিকোলাসের দিকে। নিকোলাস সেই কাগজ হাতে তুলে নিলো। কালিটা নতুন। খুব বেশি হলে একদিন অথবা দুই দিন আগে লেখাটা লেখা হয়েছে। আর এই কালি স্পার্টার লোকেই ব্যবহার করে। তবে সবচেয়ে আতঙ্কের হলো কাগজের লেখাটা, 'অত্যাচারী পায়াস, তোমার জীবনের শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে। ঈশ্বরকে ডেকে যদিও কোনো লাভ নেই তবুও সান্ত্বনার জন্য একটু ডেকে নিতে পারো।'

নিকোলাস তিন বার পড়লো লেখাটা। এতক্ষণে পায়াসের চিন্তার কারণ ধরা গেল। প্রথম যৌবন থেকে এখন পর্যন্ত কখনোই তিনি এমন কোনো ঝামেলায় পড়েননি। এবারই পড়লেন। কিন্তু তাতে একটা ব্যাপার বোঝা গেল না। নিকোলাস সেই ব্যাপারটাই জানতে চাইলো, 'কিন্তু তাতে আপনি আমাকে এত রাতে খবর দিয়ে আনালেন কেন সেটা বুঝতে পারলাম না মহামান্য। আপনাকে যে-কোনো সাহায্য করতে পারলে আমি বেশ খুশিই হবো। কিন্তু এখানে বিষয়টা আমি এখনো বুঝতে পারছি না।'

'আজ সন্ধ্যায় আমি বসেছিলাম বসার ঘরে। সেখান থেকে আমার ব্যক্তিগত পড়ার ঘরের পরিচারক এসে জানালো ভয়ংকর এক কাণ্ড ঘটে গেছে। গিয়ে দেখি সেখানে দেওয়ালের কাঠে ছুরি দিয়ে গাঁথা আছে এই কাগজ। সাথে সাথে আমি আমার সেনাপতিদের ডেকে এনেছি। সেই সাথে আমার বিশ্বস্ত এক মহা অভিজাতকেও খবর দিয়েছিলাম। সেই যেই কথাটা বলেছে সেই কথার ভিত্তিতেই আপনাকে ডেকে এনেছি।'

'কী কথা?' নিকোলাস আবার তাকায় কাগজের দিকে। সাথে সাথে ধরে ফেলে সে ব্যাপারটা। আর ঠিক সে সময়েই পায়াস মহা অভিজাতের ধারণা জানালেন, 'সেই মহা অভিজাত বললেন, এটা না-কি স্পার্টার গোপন গুপ্তঘাতকদের একটা কৌশল। তারা যাকে মারবে বলে ঠিক করে তাকে এভাবে খবর পাঠিয়ে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়। এটা যে নিজেদের গর্ব থেকে করে তা নয়, এটা একটা কৌশল। এতে না-কি শিকার মনের দিকে থেকে উন্মাদ হয়ে নানা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে।'

'হ্যাঁ', উত্তেজিত কণ্ঠে বলল নিকোলাস, ' এই স্পার্টার বিশেষ গুপ্তঘাতকরাই এরকম কাজ করে। কিন্তু তাদের মধ্যে আপনাকে হত্যা করতে চাইবে কে? আমি যতটুকু জানি সব গুপ্তচর আর গুপ্তঘাতকই তো রোমান সাম্রাজ্যের মানে আপনার নিয়ন্ত্রণে আছে।'

'হ্যাঁ, এতদিন আমিও তাই জানতাম। কিন্তু এখন তো বোঝাই যাচ্ছে নেই। আর কারা নেই সেটাও বুঝতে পেরেছি। আপনাদের সেই দুই পলাতক সাথি আছে সব ঘটনার পেছনে।'

বিশ্বাস করতে পারছে না নিকোলাস, 'কী বলছেন! ওরা কীভাবে থাকবে। ওরা এখন নিজেদের জীবন বাঁচিয়েই সময় পাচ্ছে না।'

'না, ব্যাপারটা আর অতো সাধারণ নয়। আমি খবর নিয়েছি। ওরা যথেষ্ট দক্ষ যোদ্ধা। কেবল ভাগ্যের ফেরে নিজেদের পদ হারিয়েছে। আর আমি ওদের পেছনে সেনা লেলিয়ে দিয়েছিলাম। আর ঠিক এজন্যই ওরা আমাকে হত্যা করবে। তার আগে আমাকে সতর্ক করে দিলো।'

মাথায় হাত দিলো মরিস, 'কোথায় আমরা চিন্তা করছি ওদেরকে খুঁজে বের করে হত্যা করবো, সেখানে ওরা এখন নিজেরাই আপনাকে হত্যা করার জন্য ঘোঁট পাকাচ্ছে।'

নিকোলাসের মুখে চিন্তা, 'এটা তো বেশ চিন্তার কথা। আপনি ভুল শোনেননি। আসলেও ঐ দুজন অনেক ভালো যোদ্ধা। আর আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, যদি ওরা আপনাকে গুপ্ত হত্যা করবে বলে ঠিক করে থাকে তাহলে আপনার এখন সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকতে হবে।'

'হ্যাঁ' স্বীকার করলেন পায়াস, 'আর সেই সতর্কতার ধাপ হিসেবেই আপনাকে এখানে ডেকেছি।'

'আমাদের কী করতে হবে?'

'আপনাদের এই স্পার্টার বিশেষ সেনাদলের কথা সবাই জানে। এরা কত ভয়ানক সেটাও সবাই জানে। সময়ের সাথে সাথে এই ক্রিস্টেয়ার নিজেদের পরিবর্তন করে। তাই আগের অভিজাত সেনারা কিছুতেই ঐ দুজনের কৌশল বুঝতে পারবে না। সেটা বুঝতে পারবেন আপনারা। কারণ তো জানেনই, আপনারা তো একই গুরুর শিষ্য ছিলেন।'

নিকোলাস ধীর স্বরে বলে, 'তার মানে আপনি চান আমরা যেন আপনাকে রক্ষার জন্য কাজ করি।'

'অবশ্যই। আমার সেনাদলের সাথে থেকে পরিকল্পনা ঠিক করে এই কাজ আপনাকেই করতে হবে। ওরা দুজন যে কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তা আপনারা আন্দাজ করতে পারছেন না। আজকে সকালেই স্পার্টার জঙ্গল দিয়ে চারটে লাশ নিয়ে কয়েকটা ঘোড়া এসেছে। বণিকদের ঘোড়া সেগুলো। লাশগুলো সব সেনাদের।'

মরিস কিছু কিছু খবর শুনেছে এতদিনে, সে বলে উঠলো, 'হেলটদের কাজ

'না' নিকোলাস বাঁধা দেয়। হেলটেরা ঘোড়সওয়ার সেনাদের সাথে লড়াই করতে সাহস পাবে না।'

পায়াস বলে ওঠেন, 'ঠিক। আমি আহত সেনাদের সাথে কথা বলেছি। ওরা দুজনই ওখানে ছিল। সেনাদেরকে ওরাই মেরেছে। এই দুই বিপদ থেকে এখন আমাদেরকে মুক্তি পেতে হবে।'

'হ্যাঁ' চিন্তিত মুখে বলল নিকোলাস, 'তার আগে আপনার জীবন রক্ষা করতে হবে। সেটাই এখন প্রথম কর্তব্য।'

নৌকাটা বেশ ছোটো ছিল। প্রথমে সে ভেবেছিল এই নৌকা তো আর সাগরে চলবে না, চলবে নদীতে। এখানে হয়তো তেমন সমস্যা হবে না। তবে নীল নদ সম্পর্কে আগে কোনো ধারণাই ছিল না তার। এখন হয়েছে। মাঝে মাঝে বেশ ভীতিকর হয়েছিল নৌকার দুলুনি। তেমন কোনো ঝড় বাদলার মুখে পড়তে হয়নি।

এই নদীর নাম নীল নদ। এই নদী সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতো না রাহু। ভারতের সব কয়টা বড়ো নদী তার দেখা। এই মরুভূমির দেশে নদী তেমন নেই। যাওবা আছে তাও বেশ ছোটো। তবে এই নীল নদ একেবারে আলাদা। মিশরের শুকনো খটখটে জমিতে বিধাতার আশীর্বাদের মতো বয়ে চলেছে এই নদ। বেশ বড়ো আকৃতি। সে আন্দাজ করতে পারেনি, তবে জেইস বলেছে সবেচেয়ে চওড়া জায়গাটা দুই রোমান মাইলের মতো হবে। সেটা যে কত তা রাহু আন্দাজ করতে পারেনি।

নৌকাটা ছোটো হলেও যথেষ্ট আরামদায়ক ছিল তাতে সন্দেহ নেই। রাহুর আর জেইসের জন্য যথেষ্ট খাবারের ব্যবস্থা ছিল। এমনকি যখনই খাবারের দরকার হয়েছিল তখনই তারা নেমেছিল তীরের কোনো গ্রাম অথবা নগরে। খাবার জোগাড় করে আবার যাত্রা শুরু। আরামের দিক থেকে কোনো অসুবিধা ছিল না, শুধু এই ছোটো হওয়াটা বাদে।

নৌকা ছোটো হবার ব্যাখ্যা দিয়েছিল অবশ্য জেইস, 'শোনো, ছোটো নৌকা নেয়ার সুবিধা আছে। একে তো তাড়াতাড়ি যেতে পারবো, দুইয়ে কারো সাথেই ভাড়া ভাগ করতে হবে না। নিজেদের মতো করে যেতে পারবো। আমাদের সাথে এখন অন্য কেউ যাক তা আমি চাই না। বোঝোই তো, এর মধ্যেই এই সম্পদের জন্য তোমার জীবনের ওপর আক্রমণ হয়েছে।'

রাহু তা ভালোই বোঝে। সে জেইসের কথা মেনে নিয়েছে। নিজের যত হুঁশিয়ারি, চিন্তা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এরই মধ্যে সে বাদ দিয়েছে। তারও এখন একটাই লক্ষ্য। অঙ্গদকে বিক্রি করে একটা মোটা অংকের মুদ্রা লাভ করা আর সেটা দিয়ে জীবনটাকে যতটুকু পারা যায় সাজিয়ে নেয়া। সেই চিন্তাতেই নীল নদের সৌন্দর্য অবলোকন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়েছিল তাকে।

ছোটো নৌকা যে জোরে চলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাহু জেইসের কাছে শুনেছিল কপ্টস থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার দূরত্ব। সেই হিসেবে তার বারো দিন লাগার কথা। দশ দিনের মাথায়ই সেই নৌকা পৌঁছে গেল আলেকজান্দ্রিয়া। অবশ্য রাতেও চলেছে নৌকা। রাতে থেমে থাকলে রাহুর হিসেব মনে হয় মিলেই যেত।

আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে ব্যবসা যেমন আছে তেমনি জীবনও আছে। দিগ্বিজয়ী অ্যালেকজান্ডারের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই নগর। এখানে জ্ঞানের চর্চা হয়,

বিজ্ঞানের চর্চা হয়, নানা রকম দর্শন মানে জ্ঞানের কথাও লোকে দল বেঁধে আলোচনা করে। নগরের নতুন শোভা দেখতে পেলো রাহু এখানে। তবে বলাই বাহুল্য সেদিকেও সে নজর দিতে পারলো না। উল্টো অঙ্গদকে কীভাবে লুকিয়ে রাখবে সেই চেষ্টাতেই আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠ চুকালো জেইস আর সে। জেইসের এদিকে অনেক জানাশোনা। একদিনও দেরি করতে হলো না। জেইস একটা জাহাজের খোঁজ পেলো যা গ্রীসের দিকে যাবে। গন্তব্য আর্গস কিন্তু যাবার পথে স্পার্টার বন্দর হয়ে যাবে। সেই জাহাজেই চড়ে বসলো দুজনে। এই ধাপ পার হলেই ঝামেলা বিদায়, আর ভাগ্য হাতে।

রাহুদের জাহাজ ছাড়তে ছাড়তে বিকেল হয়ে গেল। ঠিক সেই সময়েই সেদিনের যাত্রা শেষ করে কন্টস বন্দরে এসে পৌঁছল রুদ্রদেবেরা। সেদিন রাতের ঐ ঘটনার পর থেকে দলের সবাই ওদেরকে বেশ সমীহ করেছে। এতে লাভ হয়েছে বেশ। আগের কিছুদিন নিজেদের মতো করেই খাওয়া দাওয়া করতে হয়েছিল। ওদের নেক নজরে পড়ে নানা রকমের সুস্বাদু খাওয়া জুটেছে। সবচেয়ে লাভ হয়েছে শেইরনের। ঐ দলের পুরুষেরা সবাই নিয়মিত ভিন্ন মাত্রায় মদ খায়। তাদের কাছে খাবারের চেয়ে মদের জোগাড় বেশি ছিল। একদিনও শেইরনকে তৃষ্ণার্ত থাকতে হয়নি।

কন্টস বন্দরের একটু আগে থাকতেই দলটা ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ওরা বন্দরে যাবে না। আগেই একটা গ্রাম আছে। সেখানে গিয়েই আপাতত আস্তানা বসাবে। যাবার আগে উষ্ণতার বিনিময় হলো ওদের সাথে।

কন্টস বন্দরে পৌঁছে জরুরি কাজটা সেরে ফেললো ওরা। উট বিক্রেতা ঠিকই বলেছিল। এখানে উট কিনে নেবার লোক আছে। পুরোপুরি মুদ্রা না পাওয়া গেলেও ন্যায্য দামই পাওয়া গেল।

মুদ্রাগুলো থলির ভেতরে ঢোকাতে যাবে রুদ্রদেব, এমন সময় শেইরন বলে উঠলেন, 'সবগুলো ঢুকিও না। কিছু বাইরে রেখো। দরকার আছে।'

মুদ্রার দরকার তো থাকবেই। রুদ্রদেব আর না করলো না। কয়েকটা বাইরেই নিজের হাতে রাখলো।

শেইরন এবার বসলেন নিজের পরিকল্পনায়, 'এবার আমাদের যেতে হবে আলেকজান্দ্রিয়া। তার আগে দেখতে হবে আমার ধারণা ঠিক ছিল কি না।'

'কোন ধারণা?' রুদ্রদেব আর অসিত দুজনেই প্রশ্ন করে।

'ধারণা করেছিলাম না, রাহু এখন জেইসের সাথে আছে।'

রুদ্রদেব রীতিমতো অভিযোগ করলো, 'ধারণা করলেন কোথায়? আপনি তো নিশ্চিত হয়েই বলেছিলেন জেইসের সাথেই গেছে রাহু।'

নিজের কথা গিলে ফেললেন শেইরন, 'নিশ্চিত জিনিস আরেকটু বেশি করে নিশ্চিত হতে তো দোষ নেই। জেইস পাকা লোক। সে এখান থেকে

আলেকজান্দ্রিয়া যাবার সময় কোনো ঝামেলা চাইবে না, আর সেই সাথে চাইবে যাতে সবচেয়ে দ্রুত পৌঁছাতে। এজন্য এক পালের ছোটো নৌকা ছাড়া উপায় নেই। তিনজন মাঝি আর ওরা দুই জন। কর্ম কাবার।'

সেই ছোটো নৌকার ঘাটেই এবার গেল ওরা। এই প্রথম নীল নদের সামনে এসে দাঁড়ালো রুদ্রদেব আর অসিত। অসিত নিজের গ্রামের নদী দেখেছে, কাবেরি দেখেছে। কিন্তু এই নদী কেমন যেন। তবে একটা জায়গায় মিল আছে। বাহ্যিক রূপে পার্থক্য থাকলেও সব নদীরই অন্তর শীতল করে দেবার ক্ষমতা থাকে, সেটা এই নীল নদেরও আছে।

ছোটো নৌকার ঘাটে গিয়ে খবর পাওয়া গেল। হ্যাঁ, জেইসের মতো দেখতে একজন লোককে এই জায়গায় দেখা গিয়েছিল। এক বিদেশি লোককে সে নিয়ে গিয়েছিল সে নিজের সাথে। সেই লোক মিশরীয় না, আবার সাগরের ঐ ধারেরও না। ভারতীয় হবে।

খবর নিয়ে ফিরে এলেন শেইরন, 'আমি তো বলি বিধাতা তোমাদের কথা ভালো করে ভেবেই আমার সাথে তোমাদের দেখা করিয়ে দিয়েছিলেন। আমি না থাকলে না তোমরা খুঁজে বের করতে রাস্তা, না তোমরা পেতে কোন জায়গায় কোন খবর। এখানে আমার পরিচিত এক গ্রীক কারবারি আছে। যে কিনা নৌকাও ভাড়া দেয়। আমি জানতাম জেইস এলে তার কাছেই আসবে। গিয়ে বলতেই সুড়সুড় করে খবর বেরিয়ে এলো।'

রুদ্রদেব একটু টিপ্পনী দিলো, 'আমার তো মনে হয় বিধাতা আপনার কথা চিন্তা করেই আমাদের সাথে আপনার দেখা করিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সাথে আসার পরেই আপনার আরামের অভাব হচ্ছে না। সবচেয়ে বড়ো কথা যে জায়গায় যাচ্ছেন সেখানেই সুরার ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে।'

'তোমার বাজে কথা বন্ধ করো।' নিজের প্রিয় শিষ্যের দিকে তাকালেন তিনি, 'বুঝলে অসিত, ওরা দশ দিনের মতো হবে রওনা দিয়েছে। ছোটো নৌকায় করে গেছে যখন তখন ভালো ভাবেই গেছে। যদি মাঝে মাঝে রাতেও চলে তাহলে এতদিনে পৌঁছে যাবার কথা আলেকজান্দ্রিয়া। এদিকের মাঝিরা আবার নৌকা চালনায় বেশ পাকা।'

অসিত তাড়া দিলো, 'তাহলে তো আমাদেরও এখন নৌকা ঠিক করে নিতে হবে। আমরা কি নৌকা ঠিক করবো?'

'কেন? ছোটো নৌকা। আমাদেরও তো তাড়াতাড়ি যেতে হবে, তাই না। চিন্তা কোরো না, আমি ঐ লোকের কাছ থেকে নৌকা ঠিক করেই এসেছি। কাল সকালেই যাত্রা করবো। মাঝিদেরও বলে দিয়েছি খাবার আর বাকি জোগান নিয়ে নিতে।'

রুদ্রদেব জিজ্ঞেস করে, 'আজকে বিকালে রওনা দিতে কী সমস্যা ছিল?'

'আজ রাতে পারবো না। ঐ বিদঘুটে জন্তুগুলো কখনোই আমার পছন্দ ছিল না। কি অদ্ভুত ছন্দে চলাফেরা করে। এই কদিন ওগুলোর পিঠে টানা চড়ে আমার সাড়া শরীরের কলকজা নড়ে গেছে। আজ রাতে হবে শরীরের পূর্ণ বিশ্রাম।'

রুদ্রদেব আর কিছুই বলল না। এই এলাকা বৃদ্ধের চেনা। এখানের সিদ্ধান্তগুলো বৃদ্ধকে নিতে দিলেই ভালো হবে।

পরদিন সকালেই রওনা হয়ে গেল ওরা। রুদ্রদেব আর অসিতের নদীতে নেমে বেশ ভালো লাগতে লাগলো। সমুদ্রের অস্থিরতা নদের মধ্যে নেই। এক ধরনের স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়েছে যে ওদের দেহ মনে। রাহু আর অঙ্গদকে ধরতে হবে এ দুশ্চিন্তাও এখন আর কাজ করছে না অসিতের মনে। যোগাভ্যাস করে জীবন ভালোই শিখেছে সে। লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি না রেখে কেবল কাজ করতে হবে। আর কাজের মধ্যে পাওয়া উপভোগের উপলক্ষ কখন ছেড়ে দিলে চলবে না। সেই মন্ত্র মেনেই চলতে লাগলো তারা।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। নৌকা সারাদিন চলে। যখন বাতাস থাকে তখন বাতাসের গতি পালে লাগিয়ে ছুটে যায় সে নীলের বুক চিরে। কখনো বাতাস কমে যায়, তখন মাঝিরা দাঁড় বায়। তবে এখানে তাদের যাত্রীরাও তাদের সঙ্গী হয়। অসিত আর রুদ্রদেব দুজনেই এখন দাঁড় বাওয়ায় দক্ষ। সমুদ্রে শেখা বিদ্যাটা এখন নদীতে কাজে লাগাচ্ছে তারা। মোটামুটি বেশ খানিকটা রাস্তা এগিয়ে গেছে। শেইরন সবকিছু হিসেব করে বলেছেন দশ দিনের আগেই আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছানো যাবে। মাঝিরাও একমত হয়েছে।

আট দিনের দিন সকাল বেলায় শেইরন রহস্যময় গলায় বললেন, 'একটু পরেই তোমরা একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাবে। সেই দৃশ্য জীবনে কখনো দেখোনি তাতে আমি নিশ্চিত।'

অসিত আগ্রহী হয়, 'কী দৃশ্য?'

'আরে বলে দিলে তো মজাই শেষ। দৃশ্যটা দেখে হাঁ হয়ে যাবে দুজনেই। এজন্যই আগে থেকে বলতে হয় না। তাহলে তো আর হাঁ হবার বিষয়টা থাকলো না।

জিনিসটা দেখে আসলেই ওদেরকে হাঁ হয়ে যেতে হলো। হিসেবে নদী এখানে একটু সরু হয়ে এসেছে। নদীর মাঝ বরাবর এখন চলছে নৌকা। নৌকা থেকে স্পষ্ট দেখা গেল সেই দৃশ্য। প্রায় পাঁচ রোমান মাইল দূরের সেই জিনিস এতোটাই স্পষ্ট দেখা গেল মনে হলো যেন একটু এগোলেই ছোঁয়া যাবে।

তিনটে ত্রিকোণাকার বিশালাকৃতির ঘনবস্তু আকাশের দিকে মুখ করে উঠে গেছে, যেন একেবারে আকাশ ছুঁয়ে ফেলবে। মোট তিনটেকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে,

একটার পর একটা। এমন কিছু রুদ্রদেব আর অসিত কখনো দেখেনি, এবং আক্ষরিক অর্থেই তারা হাঁ হয়ে গেল।

অসিত বলে উঠলো, 'এটা কী?'

শেইরনও সেদিকে তাকিয়ে আছেন, 'জানি না। হাজার বছর আগে এগুলো তৈরি হয়েছিল। কেউ জানে না এগুলো কে তৈরি করেছে, কীভাবেই বা এখানে তৈরি হয়েছে। তবে একটা জিনিস সবাই জানে, এগুলোকে ভয় করতে হবে। মিশরীয়রা বলে আগে না-কি দেবতারা এই পৃথিবীতে থাকতেন, আর এগুলো তাদের ঘরবাড়ি ছিল।'

'এত অদ্ভুত ঘরবাড়ি কেন বানালেন তারা।' রুদ্রদেব প্রাচীন মিশরীয়দের ধারণা উড়িয়ে দিলো না। ভারতে এমন আকৃতির কোনো স্থাপনা নেই। আসলেই রহস্যময়তার এক নিদর্শন যেন।

ওদের হতবুদ্ধি ভাবকে আরেকটু জটিল করে তুলতে কিছু তথ্যের সম্ভার যেন খুলে বসলেন শেইরন, 'ওরা বলে এই জিনিসের ভেতরে কেউ গেলে সে আর জীবিত ফিরে আসে না। আর ভেতরে যাবার কোনো দরজাও নেই। এখন সবকিছুই রোমানদের দখলে। ওরা প্রথমে চেষ্টা করেছিল ভেতরে ঢোকার। কেউ কেউ হয়তো কিছু খুঁজেও পেয়েছিল। কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই ধেয়ে এসেছিল নির্মম মৃত্যু। তাই এখন ওরাও এটাকে দেবতার বাড়ি হিসেবেই মেনে নিয়েছে।'

রুদ্রদেব নিজের ইচ্ছের কথা প্রকাশ করলো, 'নৌকা থামিয়ে একটু দেখে আসতে ইচ্ছে করছে।'

'না, সেটি পারবে না। রোমানরা বেশ কড়া পাহারার ব্যবস্থা রেখেছে সেখানে। কারোই ওটার ভেতরে ঢোকা দূরে থাক, কাছাকাছি যাবারই নিয়ম নেই।'

অগত্যা ওদেরকে নিয়ে নৌকা এগিয়ে চললো। যতক্ষণ দেখা যায় সেদিকে তাকিয়ে রইলো ওরা। মাঝিরা নৌকা বেয়েই যাচ্ছে। এবার নদী জনবহুল জায়গার মধ্যে প্রবেশ করলো। এখানে লোকালয়ের ঘনত্ব আস্তে আস্তে বাড়ছে। ঘোষণা করলেন যেন শেইরন, 'হ্যাঁ, বলেছিলাম না দশ দিন লাগবে না, আগেই পৌঁছে যাবো। আলেকজান্দ্রিয়া আর বেশি দূরে নেই।'

নদীর আশেপাশের চেহারা এখন অনেকটাই পাল্টে গেছে। একটু আগের সেই খোলামেলা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ব্যাপারটা আর নেই। দুই পাশেই মানুষের সরব উপস্থিতি আর কর্মকাণ্ড চোখে পড়ছে ওদের। এদিকের নদীতে প্রচুর নৌকা চলছে। মাঝিরাও এখন নৌকা বাইছে সতর্ক হয়ে। অন্য নৌকার সাথে সংঘর্ষের প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

আলেকজান্দ্রিয়ায় যেতে হলে একটু পথ সমুদ্রের পার ধরে যেতে হয়। সেদিকটা গিয়ে পড়লো ওরা পরদিন দুপুরে। এই সমুদ্রের চারিদিকেই না-কি ভূমি। সেজন্য নাম ভূমধ্যসাগর। তবে তা যেমনই হোক সাগরের ঢেউ তো থাকবেই আর

সেই ঢেউই ওদের ছোটো নৌকাকে নিয়ে খেলতে শুরু করলো। মাঝিরা এবার যথেষ্ট শক্তি খরচ করছে। এই পুরো রাস্তার কষ্ট যতটা এটুকু পথের কষ্ট ঠিক ততটাই হবে। রুদ্রদেব আর অসিতও হাল আর পালের কাজে একটু একটু করে হাত লাগাচ্ছে।

তবে নৌকা খেলুক আর যাই করুক থামছে না। ওদেরকে দিয়ে সংগ্রাম করিয়ে ঠিকই এগিয়ে যাচ্ছে। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের কাছাকাছি এসে ওরা এবার দেখতে পেলো আরেকটা আশ্চর্য দৃশ্য। একটা বিশাল মিনার যেন উঠে গেছে আকাশের দিকে। এত উঁচু কোনো কিছু আগে কখনো দেখেনি। একটু আগে দেখা সেই পিরামিডের চেয়েও বিশাল মনে হতে লাগলো এখন এই দানবের মতো স্তম্ভকে।

নির্মাণ খুবই সুন্দর হয়েছে। বেশ চওড়া একটা চারকোণা জায়গার ওপর চওড়া স্থাপনা। তারপর যত উঁচুতে উঠেছে ততই যেন সরু হয়ে এসেছে সেই স্থাপনা। একেবারে শেষ মাথায় একবারে সরু।

এবারও ওদের বিস্মিত দৃষ্টি উপভোগ করলেন শেইরন, 'এটাকে বলে আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত আলোঘর। দূরের সমুদ্রের নাবিকদের আলো দেখানোর জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে। এটার মাথায় আলো জ্বলে আর তাও একটা বিশেষ কৌশলে। কৌশলটা জানতে চেও না। আমিও অনেক ভেবেও কোনো কিনারা পাইনি। কে ওখানে উঠে আলো জ্বালায় কে জানে।'

'এই নগরে আর কী কী বাকি আছে কে জানে। একের পর এক জিনিস দেখে কেবল ঘাবড়ে যাচ্ছি', অসিত স্বীকার করে নেয় নিজের হতবাক হবার কথা।

বন্দরে ভেড়ার পরে নৌকা বিদায় করতে হয়। আগেই রুদ্রদেবের কাছ থেকে নেয়া মুদ্রা দিয়ে আগাম দিয়েছিলেন শেইরন, এবার বাকি টাকা মিটিয়ে দিলেন।

আলেকজান্দ্রিয়া অনেক বড়ো বন্দর। ভারত, পারশ্য, আফ্রিকা সব জায়গা থেকেই মানুষ আর মাল দুটোই ছুটছে রাজধানীর দিকে। সেখানেই পৌঁছে যাচ্ছে সম্পদ আবার খরচও হচ্ছে সেখান থেকে। স্পার্টার দিকের জাহাজ পেতে বেশি কাঠখড় পোড়াতে হলো না।

জাহাজ ছাড়তে দেরি আছে। শেইরন বললেন, 'দানে দানে তিন দান, দুটো যখন দেখেছ, আরেকটাই বা বাকি থাকবে কেন। চলো আমার সাথে।'

একটা বিশাল ভবনের মধ্যে প্রবেশ করলো ওরা। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই বিশাল ভবনের প্রতিটা কোণে পুঁথি আর নানা প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে ভরা। কিছু কিছু বইও আছে। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সেই পুঁথি। অনুমান করলো রুদ্রদেব, কয়েক লক্ষের কম হবে না।

শেইরন দেখছেন সন্তুষ্ট মুখে, 'এই জায়গায় এলেই মন ভালো হয়ে যায়। সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞান যেন এক জায়গায় এসে জমা হয়েছে।'

'এই জায়গার নাম কী?'

'আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার।'

রুদ্রদেব আবার চারিদিকে দেখতে লাগলো অদ্ভুত চোখে। ভারতে এমন এক পুস্তক ভান্ডার আছে বলে শুনেছিল সে। সেখানে না-কি লক্ষ লক্ষ পুঁথি, শাস্ত্র। দেখার ইচ্ছে থাকলেও সেই তক্ষশীলা কখনো চোখে দেখার সুযোগ হয়নি।

রুদ্রদেব ভাবে, আহা, এই দুই গ্রন্থাগারের মধ্যে যদি যোগাযোগ থাকতো। যদি একই বিদ্যান দুটো গ্রন্থাগারই ব্যবহারের সুযোগ পেতো তাহলে তার জ্ঞান হতো অপরিসীম। কে জানে, একদিন হয়তো এই দূরত্বও ঘুচে যাবে।

সফল ডাকাতি শেষ করে দলের সবাই বাহবা পেয়েছে ওরা দুজন। সবাই মিলে দুই গাড়ির জিনিস নামিয়ে এনেছে। দুটো গাড়িই বিলাস বস্তুতে ভরা। তবে মূল্যবান রত্ন অথবা স্বর্ণ পাওয়া গেল না। কলিন একটু আফসোস করলো, ' এত ভালো ভালো জিনিসের মধ্যে একটু স্বর্ণ থাকলে কী হতো। একটু স্বর্ণ থাকবে আশা করেছিলাম।'

'তুমি তো দেখছি ব্যবসার কিছুই বোঝো না। ব্যবসায়ীরা স্বর্ণ নিয়ে যায় সাগরের ওপারে, আর সেসব দিয়ে জিনিস কিনে আনে। স্বর্ণ নিয়ে ফিরবে কেন? এগুলা বিক্রি করলে আবার সোনা আসবে তাদের পকেটে।'

ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝতে পারলো কলিন, ব্যবসা অথবা অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যাপার সবসময় হেলটদের মগজ সীমানার বাইরেই ছিল। এবার ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করে ইভান, 'স্বর্ণের জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? স্বর্ণ লাগে সভ্য সমাজে। এই জঙ্গলে স্বর্ণ দিয়ে কী করবে তুমি?'

'কী যে বলো না। এখানে এখন দলবল নিয়ে পরে আছি তাই বলে কি এই জঙ্গলে সারা জীবন কাটাবো না-কি? আমার লোকেরা কি সুখের মুখ দেখবে না? একদিন আমাদেরও গ্রাম হবে, শহর হবে, বন্দর হবে। সেখানে আমরাই হবে অভিজাত।'

'বেশ ভালো কথা। কিন্তু তাহলে হেলট হবে কারা?'

'কেউ না। আমরাই অভিজাত, আমরাই হেলট। সবাই সমান। সবাই সমান খাবে। সবার বাড়ির আকার সমান হবে। কেউ সুখে থাকবে আর কেউ থাকবে অন্ধকারে, সেই গ্রামে এসব চলবে না।'

'তোমার কথা শুনে তো ভালোই লাগছে। তার মানে সেই নগরে কোন সেবাদানকারী থাকবে না। তাহলে নর্দমা পরিষ্কার করবে কে? জুতো সেলাবে কে? কামারের কাজই বা কে করবে?'

ওরিয়ন আরও বড়ো সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করে, 'এরচেয়েও বড়ো সমস্যা আছে বন্ধু। মনে করো তোমাদের এখানের মেয়েদের মধ্যেও অনেক মেয়ে আছে একটু বেশি সুন্দরী, আবার কেউ কেউ চলনসই। সবাই যদি সমান হয় তাহলে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে করবে কে? সবচেয়ে কুৎসিত মেয়েই বা কার কপালে যাবে?'

কলিন আর ইভান দুজনেই এক সাথে তাকালো ওরিয়নের দিকে। ওরা ভাবতেও পারেনি এমন উদ্ভট একটা কথার ভেতরেও এমন সত্য লুকিয়ে থাকতে পারে। ওরিয়ন ওদেরকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবার বলল, 'কী, আমার কথাটা পছন্দ হলো না? কথাটা খুবই সোজা। যদি সবাই সমান হয়, তাহলে নগরের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটাকে বিয়ে করবে কে? কী কলিন, এই প্রশ্নের উত্তর তোমার কাছে আছে?'

কলিন এবার একটু ধন্দে পড়লো। সে নিজেও কি আসলে বিশ্বাস করে যে সকলে সমান হবে। সত্যিই যদি কখনো অমন কোনো গ্রাম অথবা নগর নির্মাণ করা সম্ভব হয় তাহলে এখন যে পরিস্থিতি তাতে কি সে নিজেই সেখানের রাজা হয়ে বসবে না? সেখানের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে তো তারই রাণী হবে। এখানেও তো হেলটদের মধ্যে সবচেয়ে ধারালো শরীর আর চেহারার মেয়ে রাতে তার শয্যায় থাকে। সত্যিই তো এত গভীর করে তো ভেবে দেখা হয়নি।

কলিন উত্তর দেয় না, একটু ফাঁক দিয়ে এড়িয়ে যায়, 'স্বর্ণের সাথে তো আর সেগুলোর সম্পর্ক নেই। স্বর্ণ আসলে চেয়েছিলাম আমাদের দলের জন্য কিছু ভালো অস্ত্র কিনবো বলে। এরকম ভাঙা অস্ত্রসস্ত্র দিয়ে তো আর যুদ্ধ করা চলে না। ছোটোখাটো ডাকাতি করতেই দম বেরিয়ে যায়। এটাই আসল কারণ।'

'না' ইভান একমত হতে পারলো না, 'তোমার কথা এত তাড়াতাড়ি এড়িয়ে গেলে চলবে না কলিন। ওরিয়ন তো নিজের কথার জবাব পেলো না। সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটা বিয়ে করবে কাকে?'

মাথা চুলকাতে লাগলো কলিন, 'আমি কী করে বলবো। এটা তো আসলেই সাম্যবাদের জন্য একটা বড়ো সমস্যা।'

'হ্যাঁ কলিন। শুধু সাম্যবাদ সম্পর্কে শুনলেই হয় না, জানতেও হয়। বুঝতে হয় হৃদয় দিয়ে। আমি এতদিন গ্রীসের বড়ো বড়ো দার্শনিকদের কথা কেবল পড়েছি আর শুনেছি। মন থেকে হয়তো উপলব্ধি করতে পারছি এখন। আর আমার হিসেবে সাম্যবাদে এই সমস্যারও সমাধান আছে।'

ওরিয়ন আগ্রহী হয়ে তাকালো ইভানের দিকে, 'তাই না-কি? প্রশ্নটা চট করে আমার মাথায় চলে এসেছিল। উত্তরটা তাহলে কী হবে?'

'সহজ। সাম্যবাদ মানে সবাই সমান তা কিন্তু না। মানুষ বৈচিত্রময়। সবাই সমান হোক এটা প্রকৃতি অথবা দেবতা কেউই আসলে মানুষকে সৃষ্টি করার সময় চাননি। তাহলে তো সবাই হতো একই উচ্চতার, একই রকম মোটা, সবার শরীরে থাকতো একই রকম শক্তি।'

'ঠিক' কলিন বলল, 'তাহলে গ্রীসের বড়ো বড়ো জ্ঞানীরা যে সাম্যবাদ, সাম্য সমাজ বলে চেঁচিয়ে কলোসিয়াম মাথায় করে সেটা কি ভুল না-কি? তোমার কথা শুনে তো সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'না মোটেও না। তারা আসলেও জ্ঞানী। কিন্তু আমরাই ব্যাপারটা বুঝতে ভুল করেছি। আসলে সাম্য সমাজের মানে হচ্ছে, ঐ সমাজে সবার ইচ্ছের গুরুত্ব দেওয়া হবে। নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করার অধিকার সবার সমান থাকবে। কেউ কারো ইচ্ছেকে দাবিয়ে দিতে পারবে না।'

'তাহলে তো আরও ঝামেলা হলো' এবার ওরিয়ন রীতিমতো বিতর্ক শুরু করলো, 'আচ্ছা, প্রশ্নে ফিরে আসি। তোমার কথা হিসেবে তো একজন মেয়েকে

যদি পঞ্চাশ জন বিয়ে করতে চায় তাহলে তো মেয়েটাকে শেষ পর্যন্ত তাই করতে হবে। পঞ্চাশ জনকে বিয়ে করতে হবে।'

'ভুল বললে বন্ধু', হেসে উঠলো ইভান, ' ইচ্ছে তো শুধু ঐ পঞ্চাশ জনের অধিকারেই নেই। মেয়েটার অধিকারেও আছে। ঐ পঞ্চাশ জন নিজেদের ইচ্ছে মেয়েটার ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। মেয়েটা যে ছেলেকে পছন্দ করবে, সেই ছেলের সাথে তার ইচ্ছে মিলে যাবে, তখন দুজনের বিয়ে হবে। সেখানে ছেলেটাই শুধু মেয়েটাকে পাবে না বরং মেয়েটাও ছেলেটাকে পাবে। ভালো করে হিসেব করে দেখো, এটাই সাম্যবাদ। এভাবে একজনের ইচ্ছের সাথে আরেকজনের ইচ্ছে যে সমাজে মিলে যাবে সেখানেই বইবে নতুন এই সমাজের বাতাস।'

'বাহ' ওরিয়ন হাততালি দিয়ে উঠলো, 'বেশ বলেছ। আমি তর্কে হার স্বীকার করে নিলাম। প্রেমে পড়লে তো শুনেছি মানুষের বুদ্ধি কমে যায়, কথাটা ঠিক না। তোমারটা এখনো আগের মতোই আছে।'

কলিনও নিজের মতের পক্ষে শক্ত যুক্তি পেয়ে বেশ খুশি হলো, 'বেশ। সবাই নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী নিজের জিনিস জিতে নাও।'

'হ্যাঁ। আর কোনো মেয়েকে জিতে নিতে হলে সবচেয়ে বড়ো যোগ্যতা হচ্ছে ভালবাসতে পারার ক্ষমতা।' প্রেম শব্দটা উচ্চারণ করতেই ইভান একটু হারিয়ে গেল। চট করে কোত্থেকে যেন ইনোনের মুখটা ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। না, এখনো কিছুই করা হলো না। ডাকাতি করে এই দলে জায়গা পাকা হয়েছে। এবার ইনোনকে নিয়ে আসতে হবে।

উঠে দাঁড়ালো ইভান, 'তোমরা দুজনে চালিয়ে যাও। আমি একটু ওদিকে যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছো আবার?' জিজ্ঞেস করে ওরিয়ন।

'নগরে যাবো বলে ঠিক করেছি। কাজটা শুরু করতে হবে। সেদিনের মেয়েটার কাছে খবর নিতে হবে।'

ওদিকে ডাকাতির জিনিসগুলোর দিকে মেয়েদের আগ্রহই বেশি। ওরা সবাই এই জিনিসগুলোর সাথে কমবেশি পরিচিত। এগুলো ওরা সবাই ছোটোবেলা থেকে নিজের চোখের সামনে দেখেছে, মাঝে মাঝে অপরিষ্কার হয়ে গেলে পরিষ্কার করেছে, কিন্তু আজ সবই যেন তাদের চোখে নতুন হয়ে ধরা দিলো। স্পর্শ করলেই তো আর অধিকারে নিয়ে আসা যায় না। এগুলো আজ তাদের অধিকারে চলে এসেছে। এই অনুভূতির সাথে রীতিমতো ভেসে যাচ্ছে মেয়েগুলো।

ইভান মেয়েদের দলটার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওদের উচ্ছ্বাস দেখছে। মেয়েরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন হেলট পুরুষ। জিনিসগুলো থেকে ভালো জিনিস বাছাই করে চোরাই বাজারে নিয়ে যাবার জন্য। তারাও মেয়েদের এই উচ্ছ্বাসে বাঁধা দেবার সাহস বা ইচ্ছেশক্তি কোনোটাই পাচ্ছে না।

আরেকটু দাঁড়িয়ে থাকতেই ইভানের দিকে তাকালো হেলট মেয়েটা, ইভান ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। একটু আগেই ওদেরকে এত বড়ো সুখের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ইভান এরই মধ্যে সম্মান আদায় করে নিয়েছে, মেয়েটা নিজের উচ্ছ্বাস একটু বিরত রেখে এগিয়ে এলো, 'আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন মহামান্য?'

'মহামান্য বলার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ বলবো। তবে একটু পরে হলেও সমস্যা নেই। তুমি ওদের সাথে সময় কাটাও।'

'না, আপনি বলুন। যথেষ্ট দেখে ফেলেছি।'

'আচ্ছা, তুমি এমনিতেই আমার জন্য অনেক বড়ো কাজ করেছ। আজ তোমাকে আমার জন্য আরেকটা কাজ করতে হবে। তুমি ছাড়া এখন ভরসা করার মতো যোগ্য আর কেউ নেই।'

'বুঝতে পেরেছি। আমাকে আবার নগরে যেতে হবে, তাই তো?'

'হ্যাঁ। আমি আজ রাতে ইনোনের সাথে দেখা করতে চাই। তুমি শুধু ডোরার কাছে এই খবরটা পৌঁছে দেবে। বলবে, ইনোন যাতে চাঁদ মাথার ওপরে উঠলে সেই জায়গাতে চলে আসে। আমি যেভাবেই হোক থাকবো।'

'আচ্ছা। আমি এখনই যাচ্ছি।'

মেয়েটা আস্তানা থেকে বেরিয়ে যায়। তার সাথের ঐ দুই পুরুষকে কিছুই বলতে হয় না। মেয়েটা বেরিয়ে যেতেই তারাও তার পেছন পেছন রওনা দেয়।

ইভান ফিরে আসে আবার কলিন আর ওরিয়নের কাছে। কলিন বুঝতে পেরেছে, 'আবার ওকে নগরে পাঠালে না-কি?'

'হ্যা।'

'এতো ঘন ঘন নগরে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। গ্রীসের লোকজন তো আর বোকা না। একজন পলাতক হেলট যদি ধরা পড়ে তাহলে শাস্তি কী তা নিশ্চয়ই জানা আছে তোমাদের।'

'হ্যাঁ। মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু এছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই। আমাদেরকে জীবনে মাঝে মাঝে স্বার্থপর হয়ে যেতে হয়। তবে এই মেয়ের ওপর আমার ভরসা আছে। নিশ্চয়ই খবর নিয়েই আসবে সে।'

নিজেদের মধ্যে নানা কথা বলতে বলতে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল। মেয়েটা নগর থেকে কখন ফিরবে ঠিক নেই। সময়মতো সে ফিরে এলে ওদেরকে আবার যেতে হবে নগরে। এখন পুরুষেরা ওসব জিনিস থেকে প্রয়োজনীয় বিক্রির উপযুক্ত জিনিস বাছাই করে ফেলেছে। কিছু জিনিস কয়েকজন মহিলা নিজেদের কাছে রেখেছে। ওগুলো কিছুতেই দেবে না। কলিন হস্তক্ষেপ করলো না। থাক, একটু শখ অন্তত পূরণ হোক।

বিকেলের দিকে ফিরে এলো মেয়েটা। দিনের বেলা জঙ্গলের ভেতরে হাঁটতে রাতের মতো কষ্টও হয় না, সময়ও লাগে না। ভালো খবর নিয়েই ফিরেছে সে।

ডোরার সাথে সহজেই দেখা করতে পেরেছে। প্রহরীদের মিথ্যে কথা বলতে হয়নি। কী একটা কাজে যেন ডোরা বাড়ির বাইরে এসেছিল। ওকে দেখে যেন হাতে চাঁদ পেয়েছিল সে। ইভান যাবে শুনে একটু স্বস্তি পেয়েছে মনে হলো।

সন্ধ্যার পরেই জঙ্গলের পথ ধরলো ইভান আর ওরিয়ন। জঙ্গলের রাস্তায় এখন আর অতো সতর্ক থাকার প্রয়োজন নেই। ওদের উদ্দেশ্যে যেসব সৈন্যরা এসেছিল ওরা সবাই ফিরে গেছে। চরম সতর্ক থাকতে হবে নগরে ঢোকার পরে।

শিক্ষা আর অভিজ্ঞতার একটা গুরুত্ব আছে। কখন যে কোন অভিজ্ঞতা কাজে দেবে তা বলা যায় না। প্রশিক্ষণে থাকার সময় এই নগরে দুজনেই অনেকবার সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ঢুকেছে আবার বেরিয়েও গেছে। সেই জ্ঞানই এখন কাজে লাগলো।

নগরের প্রবেশ পথের প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে নানা গলি ঘুরে ইনোনের প্রাসাদের সামনে চলে এলো ওরা মোটামুটি রাতের দ্বিতীয় প্রহরে। পেছনের দেওয়াল টপকে অনায়াসে দুজনেই চলে গেল সেই গোপন প্রাঙ্গনে।

চাঁদ এখনো মাথার ওপরে ওঠেনি। একটু অপেক্ষা করতে হবে। ইভান অপেক্ষা করতে চাচ্ছে না। ইনোনকে যে বহুকাল দেখেনি সে।

ইনোন নিজেও অপেক্ষা সহ্য করতে পারছিল না। সেও একটু আগেই চলে এসেছে সেখানে। সাথে ডোরাও আছে। ওদের দুজনকে কথা বলতে দিয়ে ডোরা বসলো ওরিয়নের সাথে, 'তোমার শরীর তো শুকিয়ে গেছে।'

ওরিয়ন নিজের শরীরের দিকে তাকালো, 'নাহ, কোথায়, জঙ্গলে খেয়েদেয়ে তো দিনদিন তাগড়া হচ্ছি।'

ইনোন দাঁড়িয়ে আছে ইভানের সামনে। ওর এখন চরম খুশি হবার সময়, কিন্তু ওর সারা শরীর ভেঙ্গে কোত্থেকে যেন অশ্রুদল ছুটে আসছে। আলতো করে ইভানের বাহুতে নিজেকে সঁপে দিলো সে। গালে গড়াচ্ছে তপ্ত অশ্রু।

ইভান ইনোনের পিঠে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিয়েছে, 'আমি এসে গেছি তো। এখন দেখবে, আর কিছুই হবে না। আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবো।'

'কোথায় নিয়ে যাবে? আমি তো শুনেছি তোমাদের এই নগরের সম্পত্তি গভর্নর বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। তোমাদের মাথার ওপর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এখন আমরা কোথায় যাবো?'

'আমরা যাবো আমাদের রাজ্যে। সেখানে তুমি হবে আমার রানী।'

'আমাকে আজকেই নিয়ে চলো। আমার এখানে থাকতে এক মুহূর্তও ভালো লাগছে না। আমি নিঃশ্বাস ছাড়া আর বেঁচে থাকতে পারছি না। প্রতিটা নিঃশ্বাস নিতে দম যেন আটকে আসে।'

'একটু সবুর যে করতে হবে। এখনো যে আমাদের রাজ্যের রাজপ্রাসাদ তৈরি হয়নি। প্রাসাদ তৈরি না করে রানীকে কীভাবে নিয়ে যাই।'

'তুমি এভাবে আর হালকা কথা বোলো না। জানো কী হয়েছে?'

' কী?'

'বাবা এবার আমার বিয়ে দিয়েই দেবেন। আমার জন্য পাত্র ঠিক করা হয়ে গেছে। সেই পাত্র আমাকে দেখতে এসেছিল।'

'কে সেই পাত্র?'

'এবার তোমাদের মধ্যে যেই যোদ্ধা মহা অভিজাত হয়েছে, সে। নিকোলাস নাম। তুমি তো অবশ্যই চেনো। তার সাথেই তো তোমার ঝামেলা হয়েছিল।'

নিজেকে সামলে নিয়ে এতক্ষণ হালকা মেজাজে কথা বলে ইনোনকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল সে। এবার মনে হয় তা আর হলো না। নিকোলাস ইনোনকে বিয়ে করতে চায়, এটা চিন্তা করেই ওর রাগ যেন ব্রহ্মতালুতে উঠে গেল, জড়িয়ে ধরলো সে ইনোনকে বেশ শক্ত করে, আচমকা শক্ত করে ধরাতে ইনোন উফ করে উঠলো, 'তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। নিকোলাস তোমাকে ছুঁতে পারবে না। তুমি শুধু আমার রানী হবে।'

'তাহলে আমাকে কবে নিয়ে যাবে?'

'আরেকটু অপেক্ষা করো। সামনের চাঁদের এই দিনে আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। তার মধ্যেই আমি আমাদের ঘর বানিয়ে ফেলবো। ভেবো না।'

ইনোন আস্তে করে চুম্বন করলো, 'আমাকে যেতে হবে। বাবাও এখন কেমন জানি বদলে গেছেন। রাতদিনের ঠিক নেই, কিছুক্ষণ পরেই আমার ঘরে আসেন, আমার সাথে কথা বলেন, মাঝে মাঝে আদর করে দেন। এখন যদি আমার ঘরে এসে আমাকে খুঁজে না পান তাহলে তুলকালাম হবে।'

ওরা দুজন চলে যেতেই ইভান আর ওরিয়নও বেরিয়ে পড়লো। এরই মধ্যে ভ্রাতার কাছ থেকে সব শুনেছে ওরিয়ন, 'এই নিকোলাস তো দেখছি আমাদের জীবন থেকে দূর হবে না। এখন চলে এসেছে তোমার প্রেমিকাকে বিয়ে করতে।'

'ওর তো এখানে কোনো দোষ নেই। তবে ইনোনকে আমি শীঘ্রই এখান থেকে নিয়ে যাবো। আমাদের এখন একটাই কাজ। একটা ভালো দেখে সুন্দর ঘর বানাতে হবে কলিনের আস্তানায়। আর ইনোনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস জোগাড় করতে হবে।'

'কীভাবে করবো? আমাদের কাছে তো আর কেউ কিছু বিক্রি করবে না। আমাদেরকে দেখলেই না-কি পুরস্কারের লোভে ধরিয়ে দেবে।'

'বিক্রি করলেও তো আর কেনার উপায় নেই। আমাদের কাছে তো কোনো মুদ্রাই নেই।'

'তাও ঠিক। তাহলে উপায় কী?'

'উপায় তো একটা আছে। যখন মুদ্রা নেই, কেউ তোমাকে সাহায্য করবে না, তখন কী করবে তুমি?'

ওরিয়ন হতাশ হয়ে দুই হাত ছড়িয়ে বলল, 'দেখা যাচ্ছে এখন আমাদের অনেক ছোটোবেলায় শেখা চৌর্যবৃত্তির বিদ্যাটা আবার কাজে লাগাতে হবে।'

'এখন তো আপনি বুঝতে পারছেন, আপনাকে কেন এই অবেলায় খবর দিয়ে এনেছি?'

নিকোলাস অবশ্যই বুঝতে পারছে, তবে এখানে সাবধানে খেলতে হবে। তার নিজস্ব একটা পরিকল্পনা আছে, আর সেটাও এখন কাজে লাগানোর সময় চলে এসেছে, 'সত্যি কথা বলতে কি আমি এখনো পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। আপনি আমার সাহায্য চাইছেন, কিন্তু এটা এখনো পরিষ্কার করেননি, সেই সাহায্য কোন পর্যায়ের চান। আমি এখানে কী করবো? আপনার নিজস্ব একদল সেনা আছে, রোমান সেনাপতি আছে। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে আপনাকে রক্ষা করা। এখানে আমার হাতে দায়িত্ব দিয়ে দিলে তারাই বা মানবে কেন?'

'তারা মানবে। তারা আমার আজ্ঞাবহ। আমি যা বলি তাই শুনবে। এখন কেবল আপনি বলুন, এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধারে আপনি আমাকে সর্বাত্মক সাহায্য করবেন কি না?'

'অবশ্যই করবো। আমি আর মরিস আপনার সাথে আছি। আমরা রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত। সেই সমর্পণ যে কেবল মুখে মুখে না, তা আমি বুঝিয়ে দেবো ভালো করে।'

মরিস একটু যোগ করলো, 'ওরা দুজনে কিছুতেই আপনার কাছে আসতে পারবে না। যেই পথে আসবে সেই পথ আমরা আগেই বন্ধ করে দেবো। ওদের জন্য পাতা হবে ফাঁদ। আর সেই ফাঁদে এসে পড়বে ওরা দুজন। সব প্রতিশোধ একবারে নেয়ার সময় চলে এসেছে।'

পায়াস একটু আশ্বস্ত হলেন মনে হলো, 'আপনারা যে রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি সমর্পিত তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে আপনার সাথে তো আর আমার শুধু এই সম্পর্কই নেই। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। বয়স কম হলেও সেদিন আপনাকে আমার প্রাসাদে ডাকা এবং নিক্সের সাথে দেখা করানোর ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পেরেছেন। আমি যদিও সরাসরি কিছুই বলিনি, তবে এখন বলছি, আমি আমার মেয়ের হাত আপনার হাতে তুলে দিতে চাই।'

নিকোলাস মাথা নিচু করে ফেললো। বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। প্রত্যাশিত এই প্রস্তাব, তবু হবু জামাইয়ের লজ্জা তো একটু দেখাতেই হবে, 'আপনার এই প্রস্তাবে আমি সম্মানিত বোধ করছি।'

এবার নিজের চাল আরেক ঘর বাড়ালেন পায়াস, তিনি জানেন তার মেয়ের সাথে বিয়ে হবার প্রস্তাব এই স্পার্টার যে কারো জন্যই অনেক লোভনীয় প্রস্তাব, তা সে যত মহা অভিজাতই হোক না কেন, 'আপনি আমার আত্মীয় হতে যাচ্ছেন। আমি প্রবলভাবে মনে করি আপনার এতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। আপনি

হতে পারেন এই স্পার্টার আমার পরের রোমান প্রতিনিধি। এই পর্যন্ত গ্রীসের কোনো লোকের যে সৌভাগ্য হয়নি তা কিন্তু হাতছানি দিয়ে ডাকছে আপনাকে।'

'আমি সত্যি সত্যি ধন্য বোধ করছি। এবং আপনার এই প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ রাজি।' নিজের ঠিক করে রাখা পরিকল্পনার প্রথম চালটা দিলো নিকোলাস।

'কিন্তু', আচমকা চিন্তা ছেয়ে গেল পায়াসের মুখে, 'একজন বাবার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত হচ্ছে তার মেয়ের হাত কোনো সুপাত্রের হাতে তুলে দেওয়া। সেই সৌভাগ্যের জন্য আমি আপনাকেই নির্বাচিত করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা কোন পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এই অবস্থায় কোনো অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার মনে হয় তুমিও এই মতে সমর্থন দেবেন।'

'অবশ্যই। এই সময়ে আমাদের একমাত্র কাজ আপনার জীবন রক্ষা। ওই দুজনকে চিরতরে এই পৃথিবী থেকে দূর করে দেওয়া। আর এজন্য আমাকে আপনি যা করতে বলবেন আমি তাই করবো।'

দুই জনেই চাচ্ছেন মাছকে খেলিয়ে নিজের বড়শি গেলাতে, কিন্তু এখনো কে মাছ আর কে জেলে তা ঠিক করা যাচ্ছে না। পায়াস এবার টোপ ছুঁড়ে দিলেন নিকোলাসের সামনে, 'অবশ্য আমি মনে করি ভাগ্য আমাকে সবসময় সাহায্যই করে এসেছে। আর এখানেও ভাগ্য আমাকে সেই সংকেতই দিচ্ছে।'

'কী রকম?' মরিস একটু অবাক হয়েছে। তাকে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুর হুমকি আর তাতে কিনা ভাগ্য তাকে সাহায্য করেছে।

'বলছি। আমি জানি আমি যাকে আমার মেয়ের জন্য নির্বাচিত করেছি সে অনেক বড়ো যোদ্ধা, কঠিন পুরুষ বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। কিন্তু তা তো পরীক্ষা করে দেখিনি। ভাগ্য আমাকে সেই পরীক্ষা নেবার উপায় করে দিয়েছে। আমাকে ওই দুই জনের মৃত্যু টোপ থেকে যদি মুক্ত করতে পারেন তাহলেই আমার মেয়ে আপনার ঘরে যাবে। এমনিতেও আমি মরে গেলে আপনার কোনো লাভ হবে না। তখন রোমান সম্রাট হয়তো এখানে আরেকজন রোমান গভর্নর পাঠাবেন।'

নিকোলাস মনে মনে হাসলো, এই লোকটা যে কত বড়ো রাজনীতিবিদ তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সে। তবে সেই ভাব লুকিয়ে মুখ কঠিন করে ফেললো সে, 'আপনি যথার্থ বলেছেন। আমিও এখানে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। সে আমাকে এখানে নিজেকে প্রমাণ করার একটা সুযোগ দিয়েছে। আপনি ওদের হাতে নিহত হলে অবশ্য আপনার মেয়ের বিয়ে আমার সাথে এমনিতেও হওয়া সম্ভব নয়।'

এবার বুঝতে পারলেন না পায়াস, 'সম্ভব নয় কেন?'

'আমি আপনার সামনেই থাকবো। আমাকে হত্যা না করে ওরা কীভাবে আপনাকে হত্যা করবে? আপনার আগেই আমি মারা যাবো। আর যদি

কোনোভাবে ওরা আমাকে না মেরে আপনাকে মারতে সফল হয় তবে আমি অগ্নি কুণ্ডে জীবন ত্যাগ করবো।'

নিকোলাসের কঠিন মুখ দেখে ভালোই আশ্বস্ত হলেন পায়াস, না এই ছেলে যা বলছে সেটা একেবারে মন থেকেই করবে, 'তাহলে এবার আমাদের কাজ শুরু করি?'

' হ্যাঁ, প্রথমেই আপনি আমাকে আপনার এই প্রাসাদে সেনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেবেন। আমি নিজেই এখন থেকে প্রাসাদ রক্ষার সব সিদ্ধান্ত নেবো।'

'তা করার চিন্তা আমি অনেক আগেই করে ফেলেছি। আমি এখন আমার রোমান সেনাপতিকে ডাকছি।'

এক প্রহরীকে কী যেন বললেন পায়াস। সে সাথে সাথে চলে গেল প্রাসাদের অন্য দিকে। খুব বেশি দেরি হলো না। রোমান সেনাপতি এসে উপস্থিত হলেন মন্ত্রনাকক্ষে। এই রাতেও একেবারে পূর্ণ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত আছেন।

পায়াস জানেন, এখন একটু সাবধানে খেলতে হবে। ভালো যোদ্ধা মাত্রেরই ভেতরে আত্মমর্যাদা থাকে একেবারে পাতলা তেলের মতো। একটু আগুন পেলেই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

'বসুন। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, আজ সন্ধ্যার পরে আমাদের প্রাসাদে কী হয়েছে?'

সেনাপতি শুনেছেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু ঘটনা এখনো আমার কাছে পরিষ্কার না। আপনি যদি একটু খোলাসা করতেন তবে ভালো হতো।'

আবার সব কিছুর পুনরাবৃত্তি করতে হলো পায়াসকে। সেনাপতি সব শুনে প্রথমে রেগে উঠলেন, 'কী! এত বড়ো সাহস! আমি এখনই আমার লোক পাঠাচ্ছি রোমে। সম্রাটের কাছ থেকে একটা বড়ো সেনাদলের সাহায্য চাইবো। ওই দুজনকে একেবারে জঙ্গল পাহাড়ে চিরুনি চালিয়ে খুঁজে বের করবো। আপনাকে কোনো ধরনের হুমকি দেওয়ার মানে তো একেবারে রোমান সাম্রাজ্যকে হুমকি দেওয়া।'

'কথাটা আপনি খুব একটা খারাপ বলেননি। আমাকে হুমকি দেওয়া মানে সমস্ত রোমান সাম্রাজ্যই এখন হুমকির সম্মুখীন। আপনার কাছ থেকে খবর পেয়ে রোমান সম্রাট নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবেন। এবং আমাদের অবশ্যই সম্রাটকে খবর দেওয়া উচিত।'

পায়াসের এই কথা শুনে প্রমাদ গুনলো নিকোলাস, তার পরিকল্পনা বুঝি এবার ফেঁসে যায়। কিন্তু পায়াসের পরের কথাতেই নিকোলাসের মনে স্বস্তি ফিরে এলো।

'শুনুন। রোমান সম্রাট যদি জানতে পারেন, তার এক সেনাপতি আর এক গভর্নর মাত্র দুজন বিতাড়িত এবং পলাতক আইন লঙ্ঘনকারীর দুর্বিনীত হুমকিতে

ভয় পেয়ে গেছে, তার সাহায্য চাইতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছে সাথে সাথে, তখন তিনি কী করবেন বলে আপনার মনে হয়?'

সেনাপতি এই জিনিসটা ভেবে দেখেননি, 'সত্যিই তো। আমরা তো ধারণা করছি, কয়েকজন হেলট আর দুজন প্রশিক্ষিত যোদ্ধা এসবের পেছনে আছে। এজন্য তো সম্রাটের সাহায্য চাইলে সম্রাটের বিরক্তি অবশ্যই উৎপাদিত হবে।'

'হ্যাঁ। এজন্য আমরা এখানে সম্রাটের সাহায্য তো চাইবোই না, এমনকি এই খবর এখান থেকে রোমে কোনোভাবে যাতে না যায় সেটাও আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।'

কথাটা বলেই ঘরে উপস্থিত সবার দিকে একবার করে তাকালেন পায়াস। সবাই নিজেদের চোখের ভাষা দিয়ে বুঝিয়ে দিলো, এই ঘরের বাইরে তাদের মুখের দরজা এই কথা বলার জন্য কখনোই খুলবে না।

এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ আর গোপনীয় ব্যাপারে বাইরের লোক কেন উপস্থিত সেই ব্যাপারে রোমান সেনাপতি একটু সন্দেহ প্রকাশ করলেন, 'আমার মনে হচ্ছে ওনাদের এখানে উপস্থিত না থাকলেও চলতো।'

আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগার ব্যাপারটা চলে এসেছে, পায়াস একটু সাবধান হলেন, 'আপনি তো জানেনই, যুদ্ধের সময় শত্রুর তথ্য জানতে হয়। কৌশল আর পরিকল্পনা জানতে হয়। আপনি অবশ্যই যোগ্যতম সেনাপতিদের একজন। কিন্তু এটা তো সম্মুখ যুদ্ধ নয়। এখানে আততায়ী আসবে গোপনে। যার নাম গুপ্তঘাতক।'

সেনাপতি মানতে নারাজ, 'গুপ্তঘাতক সামলানোর ব্যবস্থা যে আমার জানা নেই তাই কি বলতে চাচ্ছেন? আমার তা ভালোই জানা আছে।'

'জানি। কিন্তু সেটা মিশরে। কিছু বেপরোয়া বেদুইনকে সামলেছেন। তাদেরকে সামলানো আর এই স্পার্টার ক্রিপ্টেয়ার গুপ্তঘাতক সামলানো তো এক কথা নয়। ওরা বেদুইনদের মতো অশিক্ষিত নয়। ওদেরকে অনেক যত্ন করে এসব শেখানো হয়েছে। সেখানে আপনার জ্ঞান কাজে লাগানো একটু কঠিন হবে।'

এই ভীষণ দল সম্পর্কে শুনেছেন সেনাপতি, তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, 'হ্যাঁ, ওদের ব্যাপারে আমি শুনেছি। বলা হয়, গুপ্ত হামলার সময় ওরা ছায়ায় লুকায় না বরং ছায়া এসে ওদের মাঝে লুকিয়ে থাকে।'

'হ্যাঁ, এমন অনেক কথা আমিও শুনেছি। আর সেসব কথার সিকি ভাগও যদি সত্যি হয় তাহলে বলতেই হচ্ছে আমার কপালে দুঃখ আছে। তাই আমি সময়ের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্তই নিয়েছি। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়। পাখিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে পাখি শিকার করা সবচেয়ে সহজ।'

'তার মানে এরা দুজনও সেই ক্রিপ্টেয়ারের সদস্য?' সেনাপতি এবার ভালো করে তাকালেন ওদের দুজনের দিকে।

'হ্যাঁ। আর এখন থেকে আমি ওদেরকে এই প্রাসাদের প্রতিরক্ষার সমস্ত দায়িত্ব দিচ্ছি। আপনি কেবল ওদেরকে সাহায্য করবেন। এই প্রাসাদের বাইরে যেখানে যেখানে সেনা মোতায়েন করা আছে, সেখানে অবশ্য আগের মতোই আপনার নিয়ন্ত্রণ চলবে। বলতে পারেন শুধু আমার প্রতিরক্ষার ব্যাপারটা আমি কিছুদিনের জন্য আপনার হাত থেকে নিয়ে ওদের হাতে দিয়েছি।'

সেনাপতি প্রতিবাদ করতে চাইলেন, কিন্তু পেরে উঠলেন না। অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে তর্ক করার আসলে একটাই উপায় আছে। অন্ধ আত্মবিশ্বাস। আর সেই বিশ্বাস সেনাপতি হারিয়ে ফেললেন। সেই ক্রিস্টেয়ার যোদ্ধা আসলেই অনেক ভয়ংকর। যদিও অনেক দিন স্পার্টা তাদের কাজের সাক্ষী হয়নি, তবু কিংবদন্তি মনে ভয় ধরাতে যথেষ্ট। মনে মনে একটু খুশিই হলেন অবশ্য সেনাপতি। এতে তার মানহানি অতোটা হয়নি, কিন্তু এই দুজনের ওপর পড়েছে সকল দায়িত্ব। যদি কোনোমতে ওই ঘাতকেরা সফলও হয়, তবু এখন আর তার কোনো দায় থাকলো না।

সেনাপতি তাকালেন সরাসরি নিকোলাসের দিকে, তিনি বুঝে নিয়েছেন এই দুজনের মধ্যে আসল লোক কে, 'মহামান্য পায়াসের আদেশ মতে এই প্রাসাদের ক্ষেত্রে এখন আমি আপনাদের আজ্ঞাবহ। বলুন, আপনারা কোন জায়গা থেকে শুরু করতে চাচ্ছেন?'

'ছি ছি', বলে উঠে নিকোলাস, 'আজ্ঞাবহ বলে আমাদেরকে লজ্জিত করবেন না। আপনি রোমান সেনার সেনাধ্যক্ষ। আপনাদের যুদ্ধ কৌশল জগত জয় করেছে। আমি শুধু আপনার সাহায্য চাই। এই কাজ আপনার সাহায্য আর বুদ্ধি ছাড়া করা কোনোভাবেই সম্ভব না।'

পায়াস একটু মরিয়া হয়ে বললেন, 'আমি কেবল একটাই অনুরোধ করছি, আপনারা কেবল আমার জীবন রক্ষা করুন। আমি সারা জীবন আপনারদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।'

জীবনে প্রথম কোনো কঠিন পরীক্ষায় পড়েছেন পায়াস ক্ষমতা হাতে নেবার পর থেকে। এমনকি সেনা দলে থাকার সময়েও তাকে তেমন একটা কঠিন যুদ্ধ করতে হয়নি। কেবল বুদ্ধি বলেই উঠে এসেছেন ওপরে।

নিকোলাস নিজের কাজ শুরু করে দিলো, 'আমি আপনার এই প্রাসাদ দেখেছি। বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায় আরকি। কিন্তু এখন এই প্রাসাদের পুরো মানচিত্র আমার লাগবে। সবচেয়ে ভালো হয়, যে কারিগর দল এই প্রাসাদ তৈরি করেছে তাদের সাথে কথা বললে। এমন প্রাসাদে এমন অনেক গুপ্ত জায়গা থাকে, যেগুলো অনেক সময় প্রাসাদের মালিকও জানেন না। মাঝে মাঝে কারিগরেরা এসব গুপ্ত জায়গা বানিয়ে মালিকের কাছেও গুপ্ত রাখে। যাতে পরে কোনো ঝামেলা

হলে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া জল বের হবার রাস্তা আছে, হাওয়া চলার রাস্তা আছে। সেগুলো সম্পর্কে একেবারে সঠিক তথ্য পেতে হবে। সঠিক এবং সম্পূর্ণ।'

এই তথ্য চট করে দিতে পারলেন না পায়াস, 'আমি এই কারিগর দলের কাউকেই তেমন চিনি না। সেই অনেক আগে ওরা এই প্রাসাদ বানিয়ে দিয়ে চলে গেছে। ওদেরকে প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

সন্দেহ হলো নিকোলাসের, 'এই প্রাসাদের কারিগরেরা কি রোমের ছিল?'

'কী যে বলেন। না, এই স্পার্টার কারিগরেরাই এটা বানিয়েছে। আমার কাছে না থাকলেও এই প্রাসাদের প্রধান তদারককারীর কাছে একটা মানচিত্র থাকতে পারে।'

'সেটা আমার লাগবে। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি সেই মানচিত্র অনুযায়ী এই প্রাসাদ পরীক্ষা করবো। গ্রীক স্থাপত্যের ওপর আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমি সেই মানচিত্র পেলে এই প্রাসাদের সব গোপন প্রবেশ আর বেরোবার জায়গা বের করে ফেলতে পারবো।'

মরিস যোগ করে, 'যেসব জায়গা সেই মানচিত্রে নেই সেগুলোও আমরা বের করে ফেলবো।'

'হ্যাঁ', নিকোলাস সায় দেয়, 'তারপরে বাইরের দেওয়ালের প্রতিটা অংশ পরীক্ষা করতে হবে। বিপজ্জনক সব গাছের ডাল কেটে ফেলতে হবে। আর এখন থেকে এই প্রাসাদে ঢোকা আর বের হবার ক্ষেত্রে বিনা পরীক্ষায় কাউকে কোনো অনুমতি দেওয়া হবে না। কোনো দর্শনার্থী, কোনো সরবরাহকারী, এখন থেকে এই প্রাসাদে ঢুকবে না।'

'তাহলে প্রাসাদের দৈনন্দিন কাজ চলবে কী করে?' সেনাপতি প্রশ্ন করেন।

'একটু কষ্ট হবে। কিন্তু আমাদেরকে চালিয়ে নিতে হবে' নিকোলাস সমাধান দেয়, 'এক কথায় যারা প্রাসাদের ভেতরে কাজ করবে তারা ভেতরেই থাকবে, তারাই সবকিছু সামলাবে। কালকেই যার যার বাইরে যেতে হবে তাদের বের করে দিয়ে প্রাসাদ আটকে দেবো।'

নিকোলাসের প্রস্তাবগুলো বেশ মনে ধরছে পায়াসের, 'বেশ, একটু কঠিন পরিস্থিতি হলেও মনে হচ্ছে এতে কাজ হবে।'

নিকোলাস নিজের প্রশংসা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো না। শুধু চলে গেল পরের কথায়, 'আমার আরেকটা সাহায্য অতি শীঘ্র লাগবে মহামান্য পায়াস।'

' বলুন।'

'আমার কয়েকজন গুপ্তচর লাগবে। শুনেছি আপনাদের রোমান গুপ্তচরেরা নিজেদের কাজ বেশ ভালোই করতে পারে।'

সেনাপতি উত্তর দিলেন এই কথার, 'নিঃসন্দেহে জগতের সবচেয়ে তুখোড় গুপ্তচর এরা।'

'আমিও তাই জেনেছি। আমার কয়েকজন গুপ্তচর লাগবে।'

'কয় জন?' সেনাপতির তত্ত্বাবধানে কাজ করে সব চরেরা। তাই এই প্রশ্নও সেনাপতিই করলেন।

'দশ জন হলেই হবে।'

'মনে হয় দিতে পারবো' মাথার ভেতরে হিসেব কষছেন সেনাপতি।

'ধন্যবাদ। তবে দুটো ব্যাপার মাথায় রাখবেন। এক, সবচেয়ে ভালো দশজনকেই দেবেন আশা করি।'

'অবশ্যই' সেনাপতি আশ্বস্ত করলেন নিকোলাসকে, 'আর দ্বিতীয় শর্ত।'

'প্রত্যেক গুপ্তচরের ওপর আদেশ থাকবে, একবার তাদেরকে আমার তত্ত্বাবধানে দেবার পর তারা যেন আমি বাদে এই পৃথিবীর আর কারো সাথে কথা না বলে, দেখা না করে, এমনকি মহামান্য পায়াসের সাথেও না। ঠিক আছে?'

গুপ্তচরদের নিয়ন্ত্রণের এই কৌশলের কথা আগেই জানতেন সেনাপতি। তিনি রাজি হলেন। পায়াস অনেক আগেই নিকোলাসের ওপর পুরো ভরসা স্থাপন করেছেন। তার রাজি না হবার কোনো কারণ নেই।

2024/01/15 17:42

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে স্পার্টায় আসা ওদের হাতে ছিল না। গতি নির্ধারণ করছে জাহাজের প্রধান নাবিক। ওরা নীল নদ পেরিয়ে এসেছিল নিজেদের ভাড়া করা ছোটো নৌকায়। কিন্তু তাতে তো আর ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়া যাবে না।

জেইস রাহুর জন্য কোনো বন্দোবস্তের কমতি রাখেনি। এই জাহাজ মাল আর যাত্রী দুটোই বহন করে। এখানে নানা রকমের ঘরের জন্য নানা দাম। একটা দামি ঘরই সে ভাড়া নিয়েছে নিজের আর রাহুর জন্য। খাবার দাবার ছিল বেশ দামি। আর মদের কথা তো বলাই বাহুল্য। পানের ব্যাপারে জেইসের আগ্রহ রাহুর চেয়েও এক কাঠি সরেস। প্রতি রাতে দামি মদ না হলে তার ঘুম আসতে চায় না। রাহু প্রথম ভয়ে ছিল, এসব করে তো আর কম খরচ হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত এসবের দাম যদি আবার তার অংশের মোহর থেকে কাটা যায় তাহলে তো লাভের গুঁড় পিঁপড়ের পেটে চলে যাবে। কিন্তু, তার সেই সন্দেহের নিরসন হয়ে গেছে। জেইস সকাল তাকে বলেছে নির্দ্বিধায় এসব সুখ ভোগ করতে। এসবের কোনো খরচ রাহুকে দিতে হবে না।

'বুঝলে, তুমি আসলে আমার কোনো বাড়তি খরচ করাচ্ছো না। আমি এমনিতেও স্পার্টায় গেলে জাহাজের সবচেয়ে ভালো ঘরই ভাড়া করি। খাই সবচেয়ে ভালো খাওয়া। পান করি সেরা মদ। জীবন একটু বিলাসিভাবে যাপন করতে না পারলে বেঁচে থেকে লাভ কী? তুমি আমার সাথে না থাকলেও আমার এসব খরচ হতো। তাই, তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। তুমি যাচ্ছো আমার সাথে অতিথি হিসেবে।'

রাহু এই মিষ্টি কথা শুনে একটু হেসে সায় দিয়েছিল। কিন্তু সে যে ঘর পোড়া গরু। এমন বিশ্বাসের বাণী মাজিদও শুনিয়েছিল তাকে। পরে মেরে ফেলার জন্য লোকও পাঠিয়েছিল। এসবে আর সে মজবে না। খাবার দাবার সে খেয়েছে খুবই সাবধানে। বিষের উপস্থিতির ব্যাপার পুরো নিশ্চিত হয়েই খাবার মুখে ঢুকিয়েছে সে। আর আরেকটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছে, এভাবে সর্বক্ষণ সতর্ক হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে কারাগারে থাকা ভালো। একবার অঙ্গদকে ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেললে আর কোনো চিন্তা নেই।

এই আঠারো দিনের মধ্যে একবারও অঙ্গদকে সে নিজের ঘর থেকে বের করেনি। অঙ্গদের চলাফেরা, খাওয়া সব ঘরেই হয়েছে। কে আবার অঙ্গদকে দেখে শত্রু হয়ে যায়, জানা নেই। জাহাজ অনেক বিজ্জনক জায়গা। এখানে কোনো প্রহরী নেই, সমুদ্রের মাঝে কোনো রাজা-সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ চলে না। কেউ যদি তাকে মেরে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয় তবে কারো কিছু জানারও নেই, বলারও নেই।

আঠারো দিনের দিন দুপুর বেলা স্পার্টার উপকূল নজরে পড়লো। দূর থেকে নতুন দেশ দেখার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। বিস্ময় চোখে মেখে নিয়ে রাহু দেখছে নতুন ভূমি। গ্রীস। পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হতে চলেছে যে জায়গা থেকে। অবশ্য জ্ঞানে রাহুর কোনো আগ্রহ নেই। সে দেখছে বন্দরের রকমসকম। এই বন্দরের গঠন আলাদা। পাহাড়, গাছ, মানুষ সবই একই রকম, আবার কেন যেন ভিন্ন। দেখেই মনে হচ্ছে, এই জায়গা তাদের জায়গার চেয়ে আলাদা।

তবে জাহাজ যখন স্পার্টার বন্দরে নোঙরের দড়ি বেঁধে ফেললো তখন রাহু মনে মনে একটু উল্লসিত হয়ে উঠলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সবকিছু আলাদা হলেও এই দুনিয়ার সব জায়গায় স্বর্ণের বৈশিষ্ট্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। খাঁটি স্বর্ণই আজকে তার হাতে আসবে।

লোকের ভিড় ঠেলে নামতে ওকে নিষেধ করলো জেইস। এমন না যে এই ভিড়ের মধ্যে নামলে অঙ্গদকে কেউ দেখে ফেলবে। সবাই এতদিন পরে নিজের শহরে ফিরেছে, কেউ এসেছে ব্যবসা করার জন্য। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আসলে জেইসের নরম কোমল আরামপ্রিয় শরীরে এই ভিড় ঠেলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যমের ঘাটতি আছে।

ভিড় একেবারে পাতলা হয়ে এলে ওরা নেমে এলো জাহাজ থেকে। বন্দর যথেষ্ট পোক্ত কাঠের তৈরি। জায়গায় জায়গায় যুদ্ধ সাজ পরা প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে। এমন সেনা ভারতেও দেখেছে রাহু। মহারাজ নাহাপনার বাহিনীতে এমন সেনা ছিল। তার মানে ওদের আদি বাড়ি এদিকে। তবে সাজের ব্যাপারে এদিকের সেনাদের বৈশিষ্ট্য একটু আলাদা। এই বিশেষ শিরস্ত্রাণ আর বর্মে এই সেনাদের যেন আরও বেশি মানিয়েছে।

বন্দরে তল্লাশির একটা ব্যাপার আছে। এই কাজে যে নিয়োজিত সে জেইসকে ভালো করেই চেনে। জেইসের ওপর চোখ পড়তেই সে হেঁকে উঠলো, 'আরে, ফিরে এলে দেখছি আবার। এবার কি চিরিয়া নিয়ে এলে?'

জেইসের কাজ সম্পর্কে এরা সবাই জানে। জেইস এগিয়ে এসে আহ্বানকারীর দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপল, 'এবার খুবই বিশেষ একটা জিনিস এনেছি। এত চিৎকার করে বলতে পারবো না। দেখাতেও পারবো না। তুমি যদি দেখতে চাও তাহলে গোপনে দেখতে পারো।'

'আমাকে তো দেখাতেই হবে বন্ধু। আমি তো আর এই বন্দর থেকে কোনো কিছু না দেখে ছেড়ে দিতে পারি না।'

'সে আমি জানি। কেমন করে পাহারা দাও তোমরা। কত কিছু তোমাদের চোখের ফাঁক গলে বের হয়ে যায়।'

'চোখের নয়, বলো যে অনিয়মের। সবার সাথে তো আর নিয়ম মেনে চলা যায় না। এখন বলো তুমি কী এনেছ?'

'আমার সাথে একজন ভিনদেশি আছে।'

'আচ্ছা, দুটো মোহর লাগবে প্রবেশের জন্য।'

'কী বলো! গতবারও তো দেখলাম বিদেশির জন্য স্পার্টায় যেতে এক মোহর লাগছে।'

'এবার বেড়ে গেছে। রোমান সম্রাট সব জায়গাতেই আদায় বাড়িয়ে দিচ্ছেন। জানোই তো, সাম্রাজ্যের খরচ বেড়ে গেছে।'

'তোমাদের রোমান সাম্রাজ্যের হিসেব আমার সাথে করবে না। খরচ আর বাড়লো কই? সব জায়গা থেকে তো দেখি সমানে আসছে।'

'বন্ধু, জানো তো, হাতি খায় বেশি, নাদেও বেশি। আচ্ছা, এবার বলো, মালামাল কী এনেছ?'

'একটা বানর। আর কিছু না।'

'মাত্র একটা বানর! এই সফরে কি কিছু লাভ করতে পারবে?'

'আমার তো মনে হয়, এই সফরেই আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো লাভ করবো।'

'তাহলে তো তোমাদের তল্লাসি নিতেই হচ্ছে। অমন বিশেষ একটা জিনিস তো আর একবার চোখের দেখা না দেখে ছেড়ে দিতে পারি না।'

'সেটাই ভালো। তারপরে জিনিসটা চলে যাবে গভর্নরের প্রাসাদের ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানায়। সেখানে যে কারো প্রবেশাধিকার নেই তা তো জানোই।'

রাহুকে ইশারায় ডেকে নিয়ে তল্লাশির জন্য নির্ধারিত ঘরে প্রবেশ করলো তিনজনে। দরজা আর পর্দা দুটোই টেনে দিলো তল্লাসি কর্মকর্তা। তারপর আবছা আলো আবছা অন্ধকারের মধ্যে অঙ্গদের খাঁচার ওপরের চাদর সরালো রাহু। অঙ্গদকে দেখে বেশ কিছুক্ষণ মুখে কোনো কথা সরল না তল্লাশি কর্মকর্তার, 'আরে এটা কী এনেছ? এমন জিনিস তো আগে কখনো দেখিনি। এটা কোন জাতের বানর?'

'এটা কোনো জাতের না। বরং বিজাতীয় বলতে পারো। তোমাকে এই বানর দেখার সৌভাগ্য দিলাম। এখন আমাদেরকে ছাড়ের অনুমতিপত্র দিয়ে দাও।'

'এই বানরের জন্য কত দেবে?'

'কেন? এক মোহর দেবো। বিশেষ বানরের জন্য যে অতিরিক্ত মোহর দিতে হবে সেটা কোথায় লেখা আছে শুনি।'

এবার কর্মকর্তা একটু ধন্ধে পড়লো। নিজের আইনের ফাঁদে এবার সে নিজেই পড়েছে। বানরের জন্য এক মোহর ধার্য করা আছে, 'ঠিক আছে, তা না হয় সম্রাটের জন্য এক মোহরই দিও। আমাকে কিছু দিয়ে যাও না।'

'ঘুস চাইছো না-কি?'

' ছি ছি, কী যে বলো, ঘুস চাইবো কেন? তুমি নিশ্চয়ই এই বানর বিক্রি করে অনেক লাভ করবে। বন্ধু হিসেবে একটু পানাহারের আবদার কি করতে পারি না?'

না, তা পারে। রাহুর দুই বানরের এক আর পানাহারের পাঁচ- মোট আট মোহর দিয়ে তবে বন্দর থেকে বেরোবার অনুমতি পাওয়া গেল। বন্দর থেকে বেরিয়ে আর দেরি করলো না জেইস। একটা ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করে ফেললো সাথে সাথে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটু ঘুর পথে যাবে। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাওয়া যাবে প্রাসাদে। তবে আজকে মনে হয় গভর্নরের সাথে দেখা হবে না। তবু, দেখা যাক।

আজ প্রাসাদে নিকোলাস নিজের সুবিধা মতো সব সাজিয়ে নিচ্ছে। পায়াস নিজের কামরায় বসে আছেন। নিকোলাস এত মন দিয়ে কাজ করছে তাতে তিনি নিজের দুশ্চিন্তা একটু হলেও কমাতে পেরেছেন। নিজেও তিনি কিছু গুপ্তচরকে কাজে লাগিয়েছেন। এই কদিন তিনি ঘর থেকে বের হতে পারবেন না। নগরের খবর তো পেতে হবে। এই প্রাসাদের সবাই বুঝতে পারছে কিছু একটা হচ্ছে ভেতরে ভেতরে কিন্তু ঘটনা আঁচ করা যাচ্ছে না।

ঘরের বাইরে একটা মৃদু শব্দ হতেই আঁতকে উঠলেন পায়াস। পরক্ষণেই তার ভয় কেটে গেল। প্রহরী এসেছে।

'কী হয়েছে?'

'মহামান্য, জেইস এসেছে। সে না-কি আপনার জন্য অনেক সুন্দর এক জিনিস নিয়ে এসেছে।'

প্রথমবার তার মনে হলো জেইসকে এই ঝামেলার মাঝে দূর করে দেওয়াই ভালো। তবে জেইস যথেষ্ট বিশ্বস্ত। সবসময় নিজের জীবন আর আরাম নিয়ে থাকে। এমন মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র করা সম্ভব নয়। তার ওপর যতদিন না এসব মিটে যায় ততদিন প্রাসাদে আনন্দের কোনো আয়োজন হবে না। এই সময় জেইসের আনা উপহার কাজে লাগবে। নিক্সেরও নিশ্চয়ই জেইসের আনা নতুন জিনিস ভালোই পছন্দ হবে।

' কী নিয়ে এসেছে?'

'সেটা জানি না মহামান্য। তার সাথে আরেকজন লোক আছে। ভিনদেশি। মনে হয় ভারতীয় হবে। তার হাতে একটা খাঁচার মতো জিনিস আছে। জিনিসটা ওতেই আছে।'

কৌতূহল নিবারণ করতে পারলেন না পায়াস। নির্দেশ দিলেন, 'ঠিক আছে। খুব সাবধানে ওকে ভেতরে নিয়ে এসো। সাথের লোকটাকে সহ। সোজা এখানে নিয়ে আসবে।'

প্রহরী চলে যেতেই নিজের একজন দাসীকে ডাকলেন তিনি, ' শোনো, নিক্সের কক্ষে যাও। বলবে আমি ডাকছি। সাথে করে নিয়ে আসবে। একা যাতে না আসে।'

প্রহরী জেইসকে ভেতরে আনতে বেশি সময় নিলো না। রাহু এই প্রথম গ্রীসের এমন প্রাসাদ দেখছে। তার অবাক হবার মাত্রা বাড়ছেই। সবচেয়ে অবাক হচ্ছে অবশ্য সে এখানকার মেয়েদের দেখে। কেমন উন্নত ভঙ্গি ওদের চলাফেরায়। জেইসের কাছে শুনল ওরা না-কি এই প্রাসাদের দাসী। দাসীই যদি এমন হবে তাহলে রানীর অবস্থা জানি কি। ওদের দেশের মেয়েরা এই দেশের মেয়েদের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। ওদের সৌন্দর্য অন্য রকম, আর সেই অন্য রকম সৌন্দর্যের প্রতি রাহু যথেষ্ট আকৃষ্ট হলো।

প্রহরী যথেষ্ট তাড়াতাড়ি ওদেরকে নিয়ে এলো পায়াসের সামনে। জেইস যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলো, কুর্নিশ করলো এদিকের ভঙ্গিতে, 'মহামান্য। অনেক দিন পরে আপনাকে দর্শন করার সৌভাগ্য হলো। এমনিতে তো আর আজেবাজে জিনিস নিয়ে আপনার সামনে আসা যায় না। এবার হাতে মোক্ষম জিনিস এসেছে, তাই আপনাকে ভেট দিতে চলে এসেছি।'

পায়াস জেইসের একটু পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা রাহুর দিকে তাকালেন, 'তুমিই কি এই জিনিসের মালিক?'

রাহুও জেইসের ভঙ্গিতেই কুর্নিশ করলো, 'আজ্ঞে।'

'আচ্ছা। জিনিসটা দেখবো। তবে তার আগে আমার মেয়ে আসুক। আগে থেকে দেখে ফেললে তো আর বাবা মেয়ে মিলে আনন্দটা ভাগ করে নিতে পারবো না।'

নিক্স আসতে বেশি সময় নিলো না। বাবা কেন ডেকেছে তা সে প্রথমে বুঝতে পারেনি। মনে একটা ক্ষুদ্র আশা ছিল, হয়তো নিকোলাসের সাথে দেখা হবে, তবে এখানে এসে জেইসকে দেখে সে কম খুশি হলো না। পশু পাখি তার অনেক ভালো লাগে। আর জেইস কেন এসেছে তা সে জানে।

'বাবা, এবার ও কী নিয়ে এসেছে?'

' তা তো জানি না মা। তোমার সামনে খুলবো বলেই বসে আছি। দেখছ না, ওরা ঢেকে রেখেছে।'

'খুলতে বলো।'

আদেশ দিলে পায়াস। রাহু ওপর থেকে চাদরটা সরালো। সাথে সাথে নিজের শরীরের সব রং নিয়ে ওদের সামনে চলে এলো অঙ্গদের শরীর। পায়াসের মুখ একেবারে হাঁ হয়ে গেল। এই পর্যন্ত তো জীবনে কম প্রাণী তিনি সংগ্রহ করেননি। তবে এমনটা কখনো দেখা হয়নি।

নিক্সও কম বিস্মিত হয়নি, তবে সে পায়াসের মতো হাঁ হয়ে গেল না, বালিকা সুলভ উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো, 'এটা কী?'

রাহু উদ্ভাসিত মুখে বলল, 'এটা বানর। এমন বানর এই পৃথিবীতে একটাই আছে।'

'আমি ওকে ধরবো', আদুরে গলায় বলল নিক্স, 'এই ওকে এভাবে খাঁচায় আটকে রেখেছ কেন? ও কি বাঘ না ভালুক? খুলে দাও খাঁচা।'

খাঁচা খুলে অঙ্গদকে বের করে আনলো রাহু। অঙ্গদ সেই সকালে জাহাজে একটু খাবার পেয়েছিল। এখন খাঁচা খোলা হতে মনে করেছিল খাবার দেওয়া হবে। উৎসুক চোখে সে তাকাচ্ছে আশেপাশে। এমন প্রাসাদ আর আলো সে আগে কখনো দেখেনি।

নিক্স এগিয়ে গেল ওর দিকে। পায়াস পেছন থেকে সতর্ক করলেন, 'সাবধানে, তোমাকে চেনে না। কামড়ে দেবে না তো আবার?'

'না।' নিক্স কোলে তুলে নিলো অঙ্গদকে, 'কামড়াবে না' আদর করতে শুরু করলো সে অঙ্গদকে, 'বাহ, বেশ শান্ত বানর।'

অঙ্গদের হয়তো এই আদর আর অযাচিত সম্ভাষণ খুব একটা পছন্দ হলো না। কিচকিচ শব্দ করে উঠলো সে। শরীর মুচড়িয়ে লাফিয়ে নেমে গেল নিক্সের কোল থেকে। গলার শেকলে টান পড়তে থামতে বাধ্য হলো। আরেক প্রান্ত রাহু ধরে রেখেছে।

নামার সময় নিক্সের হাতে অঙ্গদ একটু আঁচড় কেটেছিল। নিক্স মজা পেয়ে হেসে উঠলো, 'বাবা, এই বানর আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

তখনই ঘরে ঢুকল নিকোলাস, তার ভঙ্গিতে ত্রস্ততা, 'শুনলাম প্রাসাদে কারা নাকি ঢুকেছে।' নিক্সকে দেখে আচমকা থেমে গেল সে।

নিক্সও তাকে দেখে একটু থমকে গেল, 'হ্যাঁ, ওরা এসেছে। আমাদেরকে ওরা প্রাণী সরবরাহ করে। দেখুন, কত সুন্দর একটা বানর এনেছে।'

নিকোলাস তাকালো এবার অঙ্গদের দিকে। তার মাথার হাজারো চিন্তা আর কর্মব্যস্ততা এক মুহূর্তের জন্য হলেও দূর হলো। ভ্রু কুঁচকে তাকালো সে অঙ্গদের দিকে। ঐ ভারত থেকে আরও কত কিছু আসা বাকি আছে কে জানে। একটু পরেই ফিরে পেলো সে নিজের দায়িত্ববোধ, পায়াসের কাছে গিয়ে নিচু স্বরে বলল, 'মহামান্য, এখন এভাবে বাইরের লোককে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া কিছুতেই উচিত হচ্ছে না। সাবধান থাকতে হবে। ওদেরকে তাড়াতাড়ি বিদায় করুন।'

কাজের কথায় ফিরে এলেন পায়াস, 'আচ্ছা জেইস। এবার তোমার দামটা বলো।'

'কী যে বলেন মহামান্য। আপনার থেকে কি কোনো দাম নেয়া যায়। আপনার জন্য তো উপহার নিয়ে এসেছি। তবে পুরষ্কার হিসেবে আপনি যা দেবেন তাতেই চলবে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে', হেসে বললেন পায়াস, 'পুরষ্কার কত চাও?'

'আজ্ঞে মহামান্য, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।'

পায়াস একটু দোনোমনা করলেন, 'দামটা তো অনেক বেশি মনে হচ্ছে।'

'মোটেও না মহামান্য', নিজের ব্যবসায়ী সত্ত্বা এবার বের করে আনলো জেইস, 'গতবার ওই অজগরের জন্য দিয়েছিলেন ছ'শো স্বর্ণমুদ্রা। সেই অজগর খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু বুঝতেই পারছেন এই বানর খুঁজলে কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই দামটা কিছুতেই বেশি হচ্ছে না। আমি কখনো ভুল বলি না। এই বানরের মালিক বেরেনিকেতে এই বানর প্রদর্শন করিয়ে অনেক মুদ্রা কামাচ্ছিল, আমি ওকে বুঝিয়ে নিয়ে এসেছি। পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা সে পাবে বাকিটা আমি পাবো।'

মনে মনে একটু হিসেব করে নিলেন পায়াস, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এমন কোনো ব্যাপার না। এমনিতেও সহসা তাকে কোনো অনুষ্ঠান করতে হবে না। একটা ভালো রকমের অনুষ্ঠান করতেই কয়েক হাজার স্বর্ণমুদ্রা বেরিয়ে যায়, 'ঠিক আছে। তোমাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রাই দেওয়া হবে। এখনই মুদ্রা নিয়ে যাও তোমরা।'

নিক্স বাঁধ সাধল, 'দাঁড়াও বাবা, জানো তো এই ভারতীয় বানরেরা কত রকমের খেলা দেখাতে পারে। এই মালিক নিশ্চয়ই খেলা দেখাতে শিখিয়েছে তার বানরকে। আমি এই বানরের মালিকের কাছ থেকে খেলাগুলো শিখতে চাই। ওকে তুমি প্রাসাদে রেখে দাও।'

নিক্সের মুখে এমন কথা শুনে রাহু যেন ধন্য হয়ে গেল। এতক্ষণ সে কিছুই ভাবেনি। নিক্সের মতো একটা প্রায় রাজকুমারী মেয়ে তাকে থেকে যেতে বলছে এটাই যথেষ্ট। মেয়ে জাতির প্রতি এর আগে কখনোই এতটা টান অনুভব করেনি সে। এখানে আসার পরে হলোটা কী।

নিকোলাস এবার কথা বলে উঠলো, 'ঠিক আছে। এই ভারতীয় প্রাসাদেই থাকবে।' রাহুর সামনে এসে সে নিজের বিশাল দেহ নিয়ে দাঁড়ালো, রাহুকে মনে হতে লাগলো একটা পাতলা কাঠির মতো, 'শোনো, তুমি আজ থেকে এই প্রাসাদেই থাকবে, কুমারীকে বানরের খেলা শেখাবে। আমার অনুমতি ছাড়া বেরোতে পারবে না।' ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই ভালো। জেইস বিদায় হোক। ভারতীয় থাকলে কোনো সমস্যা নেই।

রাহু মাথা নাড়লো, এখানে থাকতে তার কোনো সমস্যা নেই।

জেইস নিজের পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে হাসি মুখে বিদায় নিলো। নিকোলাস নিক্সের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। নিকোলাসের এই আড়

চোখে দেখা নিক্সের চোখ এড়ালো না। সেও মুচকি হেসে সঙ্গত দিলো প্রথম প্রেমের সঙ্গীতে। তারপর রাহুকে নিয়ে চলল চিড়িয়াখানার দিকে।

চিড়িয়াখানার কর্মচারীরা যেখানে থাকে সেখানে রাহুর থাকার ব্যবস্থা হলো। তারপরে অঙ্গদের জন্য স্থান ঠিক হলো। এবার চিরিয়াখানার ভেতরে রাহুকে নিয়ে গেল নিক্স, 'কই, এবার কয়েকটা খেলা দেখাও তো।'

এই বিপদে পড়তে হবে তা অবশ্য ভাবেনি রাহু। সে তো খেলা দেখাতে জানে না। কেবল শেকল টানলে অঙ্গদ একটু লাফালাফি করে, আর তাই দেখে মানুষ একটু মজা পায়। সেই কৌশলই আবার কাজে লাগালো সে। এই মেয়ে হয়তো এটাই খেলা হিসেবে মেনে নেবে।

কিন্তু নিক্স বোকা নয়। সে আগেও বানরের খেলা দেখেছে। রাহুর সামনে এসে দাঁড়ালো সে, 'থাক, বানরকে আর কষ্ট দিতে হবে না। তুমি এই বানরের মালিক নও। বানর তার মালিকের সব কথা শোনে। এই বানরের মালিক কে?'

'আমি। তবে খেলা আমি দেখাতে পারি না। আসল মালিকের কাছ থেকে একে আমি কিনেছি।' একটু আমতা করে হলেও কথাটা বলে দিলো রাহু।

নিক্স পুরোপুরি বিশ্বাস করলো না, 'ঠিক আছে। তবে তোমাকে এখনই দূর করে দেবো না। তুমি বানরের মালিক না হলেও ভারতীয় তো। এই বানরের দেখাশোনা প্রথম কয়েকদিন তোমাকেই করতে হবে। যখন আমার চিড়িয়াখানার প্রধান কর্মচারী সব শিখে নেবে তখন তুমি যেতে পারবে প্রাসাদ থেকে।'

'আজ্ঞে কুমারী।' যাবার তেমন তাড়া রাহুরও নেই।

অঙ্গদের খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। নিজ হাতে অঙ্গদকে কলা খাওয়াচ্ছে নিক্স। খাবার দেখে রাহুর মনে পড়লো অনেকক্ষণ তারও কিছু খাওয়া হয়নি।

2024/01/15 18:04

অ্যালেস্টর আজ সবটা গুছিয়ে আনতে পেরেছেন। তার পরিকল্পনা অব্যর্থ। অনেকদিনের চর্চাহীনতায় প্রথমে মনে হয়েছিল, তার ক্ষমতায় একটু মরচে পড়ে গেছে। কিন্তু, যেই অমোঘ শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন সেই ছোটোবেলায় আর প্রথম যৌবনে সেটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া যায় না। এই জন্যই তিনি সেরাদের সেরা। তার ধাতু অনেক শক্ত। একটু নাড়া দিতেই মরচের হালকা আস্তর খসে পড়েছে সেই ধাতুর ওপর থেকে। ভেতর থেকে চকচক করে উঠেছে আসল রং।

পায়াসের প্রাসাদ অনেক আগে থেকেই তার গবেষণার বস্তু ছিল। আর আসল কাজ অনেক আগেই সেরে রেখেছিলেন তিনি। নিজের দলে এমন একজনকে জড়িয়েছেন, যার বাবা ছিল ওই প্রাসাদ বানানোর প্রধান কারিগরদের একজন। সেই লোকের কাছ থেকেই জোগাড় করে রেখেছিলেন ওই প্রাসাদের মূল নকশা। তার মতো গুপ্ত হত্যাকারীদের অতো সব জোগাড় না করলেও চলে, সেখানে তার হাতে তো এসে গেছে সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। তিনি এখন এই নগরের যে কারো চেয়ে এই পায়াসের প্রাসাদ ভালো করে চেনেন। আর বাকিটা হচ্ছে প্রাসাদে প্রহরীদের বিন্যাস। এখানেই একটু সমস্যা ছিল। তবে সেসব এখন আর নেই। সেই বস্তুও তিনি সমাধান করে ফেলেছেন।

সবকিছু শেষ করে কয়েকবার আবার দেহ আর মনে ঝালিয়ে নিলেন প্রস্তুতি। নাহ, বয়স তার শরীরকে একটুও ছুঁতে পারেনি। এখনো তার মধ্যে আছে চিতার ক্ষিপ্রতা। সহজেই এই কাজটা করা যাবে। তারপর স্পার্টা প্রবেশ করবে নতুন যুগে।

অনেকটা ঘেমেছেন তিনি। তবু শ্বাসের গতি একটুও অস্বাভাবিক হচ্ছে না। চৌবাচ্চায় অনেকক্ষণ শরীর ডুবিয়ে রেখে আরেকটু সতেজ হয়ে নিতে লাগলেন।

স্নানঘরের দরজায় এই সময় কারো আসা বারণ। একান্ত বেসামরিক পরিচারক তার কিছু লাগলে তা এগিয়ে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। সে তার বিশেষ সংকেত হিসেবে দরজায় তিনটা টোকা দিলো।

চোখ বুজে ছিলেন অ্যালেস্টর, টোকার আওয়াজ শুনেও খুললেন না, ' কী হয়েছে? কিছু তো লাগবে বলিনি।'

'মহামান্য, আপনার সাথে দেখা করতে একজন এসেছেন।'

'ভালো কথা। তাকে বসতে বলো। কে এসেছে?'

বৃদ্ধ অভিজাতের নাম নিলো পরিচারক, 'তিনি প্রহরী দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন। আপনার বিশ্রামের সময় বিরক্ত করতে হয়েছে বলে তিনি দুঃখিত, কিন্তু ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।'

বৃদ্ধ অভিজাতের নাম শুনে এবার চোখ খুললেন অ্যালেস্টর। এই লোক ফালতু কাজে সময় নষ্ট করে না। নিশ্চয়ই জরুরি কোনো দরকার। আর এই সময়ে জরুরি দরকারে দেরি না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

চৌবাচ্চা ত্যাগ করলেন তিনি। সারা গায়ের ক্লান্তি ধুয়ে গেছে। স্ফিত পেশীর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ফোঁটা। পোশাক গায়ে জড়িয়ে নিতে বেশি সময় লাগলো না।

ঘরে অথিতি হিসেবে ওই বৃদ্ধ অভিজাত একা ছিলেন না। প্রহরী তাকে এই খবর দিতে ভুলে গেছে। নিকোলাস আর আরেকজন আছে বৃদ্ধ অভিজাতের সাথে। আরেকজনের নাম মনে না আসলেও চেহারাটা চিনতে পারলেন অ্যালেস্টর। সেদিনের অনুষ্ঠানে এই ছেলেও উপস্থিত ছিল। প্রথম শ্রেণির অভিজাত হয়েছে। নিশ্চয়ই নিকোলাসের বন্ধু।

অ্যালেস্টর কামরায় ঢুকতেই নিকোলাস আর মরিস দুজনেই দাঁড়িয়ে গেল। মরিস বুঝতে পারছে কেন এই লোককে অভিজাতের মধ্যেও বিশেষ হিসেবে গণ্য করা হয়। সে নিজেও অভিজাত, কিন্তু অ্যালেস্টরের ব্যক্তিত্বের দ্যুতিতে নিজেকে কেঁচো মনে হচ্ছে তার।

'আপনারা বসুন। এখন আমরা আমাদের সম্পর্ক একটু সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি। ব্যবহারের মুখোশ একটু আলগা করলে এখন অসুবিধা হবে না।'

বৃদ্ধ অভিজাত সায় দিলেন, 'সেটাই। আমি আজ সকালেই ওনার খবর পেয়েছি। উনি না-কি আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন। আমিও আর দেরি না করে নিয়ে এলাম।'

'হ্যাঁ, এসব কাজে দেরি করলে অমঙ্গল হয়।' অ্যালেস্টর বললেন, তারপর সরাসরি তাকালেন নিকোলাসের দিকে, 'তারপর বলুন, আমার প্রস্তাবে আপনার কী উত্তর? আগেই বলে নিচ্ছি, আপনি সরাসরি বলতে পারেন। আমি সরাসরি কথা পছন্দ করি। আমি কখনো ঘুর পথে ঘোড়া ছোটাই না, ঘুর পথে কথা পছন্দও করি না।'

নিকোলাস অস্ফুটে মুখ খুলল, ' আসলে আমি সেই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি। আসলে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।'

'একজন মহা অভিজাতের তো এভাবে কথা বলা শোভা পায় না' অ্যালেস্টর একটু ব্যঙ্গ করলেন, 'এখানে তো ভাবার কিছু নেই। হ্যাঁ অথবা না, দুটো সিদ্ধান্তের একটা নিলেই গোল মিটে গেল।'

বৃদ্ধ অভিজাত একটু ভয়ে ভয়ে অ্যালেস্টরের দিকে তাকাচ্ছেন। মেয়ের বাপের এতো ঔদ্ধত্য শোভন নয়। তবে এমন ক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই পারেন এমন ব্যবহার করতে।

নিকোলাস প্রায় মরিয়া হলো, 'আসলে পরিস্থিতি আমাকে এমনটা করতে বাধ্য করেছে। আপনি তো জানেনেই আমার অবস্থা।'

নিজের চিন্তা নিয়েই গত কয়েকদিন কেটেছে অ্যালেস্টরের, 'আসলে আমি আপনার পরিস্থিতি সম্পর্কে বুঝতে পারছি না। খোলাসা করুন। আমার মেয়েকে কি আপনার পছন্দ হয়নি? তাহলে সরাসরি বলে দিতে পারেন। পদমর্যাদায় আপনি আর আমি সমান। আমাকে আপনার ভয় পাওয়ার তো কিছু নেই।'

নিকোলাস এবার মাথা তুলল, 'না, ছি ছি, এটা কী বলছেন আপনি। আপনি ভালো করেই জানেন, আপনার মেয়েকে যেই যুবক একবার দেখবে সে পছন্দ না করে পারবে না। বলতে গেলে এই স্পার্টায় এত সুন্দরী মেয়ে আমি আর দেখিনি। যে কেউই ইনোনকে স্ত্রী হিসেবে পেলে ভাগ্যবান হবে। আর আমিও সেই ভাগ্যের স্পর্শ পেতে চাই। বলতে গেলে এটাই এখন এই পৃথিবীতে আমার একমাত্র চাওয়া।'

'তাহলে আর এত আমতা আমতা করার কী আছে? এবার জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ অভিজাত।

'দেখুন', নিকোলাস এবার বোঝাতে সচেষ্ট হয়, 'আপনারা তো নগরে আমার সাথে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাই জানেন। আমি আসলে নিজের যোগ্যতায় এই পদ পেয়েছি, সেটা আপনারা জানেন। কিন্তু সেই প্রশিক্ষণ শিবিরের বিভীষিকা তো আর সাধারণ মানুষ জানে না। তাই আমি মনে করি এখনো তাদের কাছে আমার যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়া বাকি।'

অ্যালেস্টর এবার মন দিয়ে শুনতে শুরু করলেন। নিকোলাস বলে চলেছে, একটা ভয়ানক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলাম আমরা। দুজন তৃতীয় শ্রেণির অভিজাত আমাদেরকে হারিয়ে পালিয়ে গেছে। এই আমার বন্ধু আহত হয়েছিল মারাত্মকভাবে।' মরিসের দিকে ইশারা করে নিকোলাস।

'হ্যাঁ, সেসব অতো ভালো করে না শুনলেও কিছু কিছু শুনেছি।'

'আপনি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন তো? মানুষ এখন আমার দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকায়। একজন মহা অভিজাত হয়ে কিনা আমি হেরে গেছি তৃতীয় শ্রেণির অভিজাতের কাছে। এই হার আমাকে রাতে ঘুমাতে দেয় না। এই অবস্থায় আমি ইনোনকেও হারাতে চাই না। তার মতো মেয়েকে বিয়ে করা আমার কাছে স্বপ্ন পূরণের মতো। যে-কোনো পুরুষের কাছেই তা। এই দোটানায় আমি কী করবো বুঝতে পারছি না। এখন বিয়ে করলে বড়ো উৎসব হবে। নানা আলো হবে, সব অভিজাত আসবেন, প্রজারা আসবে, কিন্তু সেই প্রজারা কি আমাকে নিয়ে বিদ্রুপ করবে না? তারা কি বলবে না, আমি এই বিপদের সময় নিজের সম্মান উদ্ধার করার চেষ্টা না করে বিয়ে করে নিরাপদে জীবন অতিবাহিত করছি। আমি

ইনোনকে বিয়ে করতে চাই, কিন্তু এই অপমান তো কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। আর এখানেই আমি ভুগছি দোটানায়।'

মরিসের মুখ কঠিন হয়ে উঠলো, 'প্রতিশোধ আমাদেরকে নিতেই হবে।'

অ্যালেস্টর সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর মাথা ঝাঁকালেন, 'কথাটা একেবারে যুক্তিযুক্ত। আপনার এখন নিজের সম্মান রক্ষা করাই প্রথম কর্তব্য। সারা জীবনের অর্জন একটা ঘটনাতেই শেষ হয়ে যেতে পারে। ঐ দুজনকে ধরে এনে নগরে সবার সামনে বিচার করো। তাহলেই মহা অভিজাত হিসেবে মানুষ আপনাকে সম্মান দেবে।'

'আজ্ঞে। আমার অনুরোধ, সেই পর্যন্ত আপনি আমাকে একটু সময় দিন। আমি সেই কাজটা করে ফেললেই ইনোনকে বিয়ে করে আমার প্রাসাদে নিয়ে যাবো।'

এবার আর চট করে উত্তর দিতে পারলেন না অ্যালেস্টর। ইনোনের বিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিতে হবে। তার সব প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেছে। ইনোনের বিয়ে না দিয়ে এই পথে তিনি নামতে পারবেন না। নিজের জীবনের সম্পূর্ণ মায়া ত্যাগ করে, সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে তাকে নামতে হবে সে রাতে। কিন্তু এখানে তো নিকোলাসের প্রস্তাব যথেষ্ট সম্মানের এবং গ্রহণযোগ্য। এমন প্রস্তাব কেমন করে মানা করবেন তিনি?

চিন্তায় পড়ে গেছেন অ্যালেস্টর। চিন্তার কারণ জানেন বৃদ্ধ অভিজাত। সাবধানী প্রশ্ন করলেন এবার তিনি, 'আচ্ছা, ঐ দুজনকে ধরে নগরে নিয়ে আসতে আপনাদের কয়দিন লাগতে পারে? আমি যতটুকু শুনেছি ওরা না-কি জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। আর একবার ক্রিস্টেয়ার সেনারা জঙ্গলে পালিয়ে গেলে তাদের ধরা যথেষ্ট সময়ের ব্যাপার।'

নিকোলাস এখানে চট করে জবাব দিতে পারলো না, মাথা নিচু হয়ে এলো তার, 'আমি জানি না। শুধু এতটুকু জানি আমার সম্মান বাঁচাতে আমি রক্তের শেষ বিন্দু দিয়ে দেবো। মৃত্যুর আগে চেষ্টা থামাবো না।'

'কিন্তু এই রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে তো আমরা আমাদের মেয়েকে ছেড়ে দিতে পারি না', বৃদ্ধ অভিজাত অ্যালেস্টরের দিকে তাকালেন, 'আপনি কী বলেন?'

অ্যালেস্টর এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। বৃদ্ধ অভিজাত চট করে ধরে ফেললেন ব্যাপারটা। অ্যালেস্টর এখন এই যুবককে না করতে পারছেন না। যে নিজের সম্মান রক্ষার জন্য লড়ছে, তাকে অ্যালেস্টর অনেক শ্রদ্ধা করেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন তিনি, 'ঠিক আছে। আপনারা একটু বসুন। আমি আপনাদেরকে শরবত দিতে বলছি। আমরা একটু ভেতর থেকে আসছি।'

নিকোলাস বুঝতে পারলো ওনারা দুজন এখন আলোচনা করার জন্য ভেতরে যাবেন। ইনোনকে বিয়ে করা হবে কি না, সেটা একটু পরেই বোঝা যাবে। দেখাই যাক না, আলোচনার ফলাফল কী হয়।

ভেতরের কক্ষে গিয়ে বসলেন বৃদ্ধ অভিজাত আর অ্যালেস্টর। বৃদ্ধ অভিজাত এই জনহীন কক্ষেও কথা বলছেন গলা নামিয়ে, 'এই যুবককে আপনি না করে দিন। আমি অন্য পাত্র খুঁজে বের করবো।'

'না।' দ্বিমত করলেন অ্যালেস্টর, 'আমি বিনা অপরাধে এই যুবককে না করবো কী করে? আমার মেয়ের জন্য এমন ছেলে আর পাওয়া যাবে না। শুধু পদমর্যাদার কথা চিন্তা করছি না, এমন নির্লোভ, আত্মসম্মান পূর্ণ ছেলে আমি ছেড়ে দেবো না। ইনোনের বিয়ে তার সাথেই হবে।'

'কিন্তু তার শর্ত মানতে গেলে তো আমাদেরকে কত দিন অপেক্ষা করতে হবে তার কোনো ঠিক নেই। আমাদের এদিকে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। আপনার প্রস্তুতি শেষ। সব দেশের বিদ্রোহী সেনারা স্পার্টার কাছে এসে পড়লো বলে। শেষ পর্যন্ত কি আপনি নিজের ব্যক্তিগত কারণে পুরো দলকে ডোবাবেন?'

জ্বলে উঠলো অ্যালেস্টরের চোখ, 'কার সাথে কথা বলছেন ভুলে যাবেন না। আমি আমার লক্ষ্যের জন্য প্রয়োজন হলে মেয়েকেও বলি দিতে পারি। আমি যে ইনোনকে বিয়ে দিতে চাচ্ছি এটাও শুধু নিজেকে পিছুটানহীন করার জন্য। যাতে পূর্ণ মনোযোগে কাজে নামতে পারি।'

'সেটা আমি জানি।'

'হ্যাঁ। এখানে আপনাকেই একটা সমাধান বের করতে হবে। এমন জটিল সময়ে কূটনীতি খেলাই তো আপনার সামর্থ্য। আপনিই একটা উপায় বের করুন।'

বৃদ্ধ অভিজাত কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর কিছু কথা বললেন অ্যালেস্টরকে, 'এটাই একমাত্র উপায় হতে পারে। তাতে আপনার আর নিকোলাসের দুজনের কথাই রক্ষা হবে।'

অ্যালেস্টর সমাধান স্বীকার করে নিলেন, 'আচ্ছা, কী মনে হয়? যুবক রাজি হবে?'

'অবশ্যই হবে। চলুন, আমি কথা বলছি।'

আবার অথিতি ঘরে ফিরে এলেন তারা। বৃদ্ধ অভিজাত বসেই মুখ খুললেন, 'আমরা একটা সমাধান হয়তো বের করে ফেলতে পেরেছি।'

নিকোলাস উৎসুক হলো, সাথে মরিসও। বৃদ্ধ অভিজাত বললেন, 'আপনি আজকেই ইনোনকে বিয়ে করে ফেলুন।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালো নিকোলাস, 'এটাই আপনার সমাধান? কিন্তু তাতে তো আমার ক্ষতিই হবে।'

' আরে পুরোটা শুনুন। বিয়েটা হবে পুরোপুরি ঘরোয়া আয়োজনে। এই প্রাসাদের সেনারাও জানবে না। শুধু দাস-দাসীরা জানবে, আর কিছু সেনা জানলেও কোনো সমস্যা নেই। এই বিয়ের কথা বাইরে যাবে না। ভেবে দেখুন, এতে আমাদের সবার লক্ষ্যই পূরণ হবে। আপনি প্রজাদের কাছে মান হারাবেন

না। আর আমরাও আমাদের মেয়েকে সুপাত্রে দিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবো। ভালো করে ভেবে দেখুন।'

ঠিকই তো। নিকোলাস তো এভাবে চিন্তা করেনি। বিয়ে করতে হলে অনুষ্ঠান করতে হবে, উল্লাস আর উৎসবে সবাইকে মাতিয়ে দিতে হবে, এটা তো আসলে একটা সামাজিক রীতি, কিন্তু এসব ছাড়াই তো বিয়ে হয়। কেবল নগর দেবতা আর একজন পুরোহিত হলেই হলো। এবার তার চেহারায় একটু আলো ফিরে এসেছে, 'আপনাদের প্রস্তাব আমার কাছে খুবই ভালো মনে হচ্ছে। কিন্তু এতকিছুর পরেও যদি প্রজারা এই বিয়ের কথা জানতে পেরে যায়?'

এবার কথা বললেন অ্যালেস্টর, 'এই ব্যাপারে আপনি আমার দেওয়া নিশ্চয়তা নিতে পারেন। এই প্রাসাদের বাইরে একটা কথাও যাবে না।'

'আপনি প্রতিজ্ঞা করলে আর কোনো কথা থাকতে পারে না।'

মরিস এবার একটা সমস্যার দিকে আঙুল তুলল, 'আচ্ছা, সব ব্যবস্থা তো না হয় প্রাসাদেই করা যাবে। কিন্তু পুরোহিত তো আর প্রাসাদে নেই। পুরোহিত বাইরে থেকে আনলে তো খবর আবার বাইরে চলে যাবে।'

এবার হেসে উঠলেন বৃদ্ধ অভিজাত, 'আমি শুধু একজন যোদ্ধাই নই। স্বয়ং ডেলফি থেকে আমার পুরোহিতের কাজ করার অনুমতি নেয়া আছে। তারা আমাকে শিক্ষাও দিয়েছে। এই স্পার্টায় আমার চেয়ে ভালোভাবে চার হাত এক করতে খুব কম পুরোহিতেই পারবে।'

সব সমস্যারই সমাধান পাওয়া গেল। অ্যালেস্টর ভেতরে চলে গেলেন। এই সময়ে সবার আগে দরকার ডোরাকে। সেই সবকিছুর ব্যবস্থা খুব সহজেই করতে পারবে। ওহ হ্যাঁ, ইনোনকে তৈরি করার কাজটাও তাকেই দিতে হবে।

ইনোনের জীবনে এখন একটু রং ফিরে এসেছে। সেদিন ইভানের সাথে দেখা হবার পর থেকে নতুন উত্তেজনার কল্লোল এসেছে জীবনে। সেই সময়ের অপেক্ষা করছে সে এখন। একটা ঘর বাঁধার অপেক্ষা। যেখানে কোনো টানাপোড়েন নেই, অদৃশ্য কোনো সুতো যেখানে কাউকে বেঁধে রাখে না।

এখন নিজের ঘরে বসে সেসবই চিন্তা করছিল সে। এমন সময় ডোরা ঘরে ঢুকল। ইনোন খুশিই হলো ডোরাকে দেখে, তার অনিন্দ্য সুন্দর মুখটা স্মিত হাসিতে ভরে উঠলো, 'কিরে, এই সময় তো তোর রান্নাঘরে থাকার কথা।'

ডোরা পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুতেই একটু আগে পড়া বাজের কথা বলে এই স্মিত হাসি মুছে দিতে চাচ্ছে না।

ইনোন এসে এবার ধরলো ডোরাকে, 'কিরে, তুই এভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কী হয়েছে? তোর মুখ এমন দেখাচ্ছে কেন?'

কাঁপা স্বর বেরোলো ডোরার গলা দিয়ে, 'আপনার বাবা খবর পাঠিয়েছেন। আজকে একটু আগে প্রাসাদে নিকোলাস এসেছিল। আজকেই আপনার সা

2024/01/15 18:05

নিকোলাসের বিয়ে হবে। কাউকে কিছু না জানিয়ে। শুধু আমরাই জানবো। আর বাইরে এই কথাটা প্রকাশ করতে সবাইকে নিষেধ করেছেন আপনার বাবা।'

ইনোনের মাথা ঘুরে উঠলো, ডোরাকে ধরে টাল সামলালো সে, ' এত তাড়াতাড়ি কীভাবে সবকিছু ঠিক হয়ে গেল? কীভাবে কোনো আয়োজন ছাড়াই বাবা আমার বিয়ে দিতে পারেন? আমি কিছুতেই এই বিয়ে করবো না।'

ডোরা এবার কেঁদে ফেললো, 'আপনার সামনে আর কোনো উপায় নেই কুমারী। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এখন আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যেন আপনাকে বধূ সাজে বিবাহ বাসরে উপস্থিত করি।'

ইনোন হঠাৎ বুঝতে পারলো তার জগত শূন্য হয়ে গেছে। ডোরা ইনোনের স্তব্ধ ভাব কাটানোর চেষ্টা করলো না। বিছানায় অনড় বসে থাকা ইনোনকে সে সাজাতে লাগলো। যত্ন করে। নিষ্প্রাণ ইনোনের দেহ সেজে উঠতে লাগলো নানা উপচারে। অ্যালেস্টর যে সময় বেঁধে দিয়েছিলেন তার আগেই ইনোনকে বিবাহ বাসরে উপস্থিত করলো ডোরা।

এসব কাজে বেশি দেরি করতে হয় না। পুরোহিতের পোশাক আর আচার আগেই পালন করে তৈরি হয়ে ছিলেন বৃদ্ধ অভিজাত। এক এক করে বিয়ের সব নিয়ম পালিত হতে লাগলো। দেবতাকে সাক্ষী করে সবাই এই বিয়ের সাক্ষী হলেন। শপথ বাক্য পাঠ করলো নিকোলাস। খুব তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ হলো। যদিও উৎসব হলে একেকটা আচারেই হইচই করতে করতে অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়। পুরো সময়টাতে ইনোন অনড় হয়ে বসে রইলো। কোন অভিব্যক্তি দেখালো না তার মুখ।

বিবাহ বাসরে মরিস ইনোনের ওপর থেকে অনেক কষ্ট করে চোখ সরিয়ে নিলো। হাজার হলেও নিকোলাসের স্ত্রী। বেচাল হলে তাকে মরতে হবে। তবে পাশের মেয়েটাকেও খারাপ লাগছে না। বেশ সুন্দর গঠন।

মরিসের দিকে একবার চোখ পড়লো ডোরার। সেই নির্লজ্জ দৃষ্টির সামনে নিজেকে নগ্ন মনে হতে লাগলো তার। চোখ ফিরিয়ে নিলো সে।

বিয়ে শেষ হতে নিকোলাসকে আশীর্বাদ করলেন অ্যালেস্টর, সাথে বললেন একটা দরকারি কথা, 'এখন আপনি আমার জামাতা। তবে এখনই ইনোনকে আপনার প্রাসাদে নিয়ে যেতে পারবেন না। তাতে তো আর ব্যাপারটা গোপন থাকবে না। শীঘ্রই আমরা খুব বড়ো একটা অনুষ্ঠান করে ইনোনকে সমাজের সামনে আপনার হাতে তুলে দেবো।'

এবার একটু বেকায়দায় পড়লো নিকোলাস, সে ইনোনকে আজকেই নিজের প্রাসাদে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তখন রাজি হবার সময় এই ব্যাপারটা তার মাথায়

আসেনি, 'জি, ঠিকই বলেছেন আপনি। আমি ইনোনকে পরেই আমার প্রাসাদে নিয়ে যাবো।'

সেদিন রাতের খাবার সারার পর দুই বন্ধু রওনা দিলো নিজেদের প্রাসাদের দিকে। মরিস নিকোলাসের সাথে এখানে এসেছে, সবকিছু মুখ বুজে দেখেছে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি, 'আচ্ছা, তুমি তো ইনোনকে বিয়ে করে ফেললে, এখন যদি পায়াস তার মেয়ের বিয়ে তোমার সাথে না দেন? তাহলে তো রাজত্ব আর রাজকন্যা একসাথে যাবে।'

নিকোলাস হাসলো, 'আমি এত কাঁচা কাজ করি না। রাজি না হবার ব্যাপারটা অ্যালেস্টরের ক্ষেত্রে বেশি ছিল। তাই এখানে সুযোগ পেয়ে ইনোনকে বিয়ে করে নিলাম। আর প্রাসাদের ঐ গুপ্তঘাতক মারার কাজে আমি নিশ্চয়ই সফল হবো। তখন নিজের কথা রাখতে পায়াসকে আমার কাছেই নিক্সকে বিয়ে দিতে হবে। বুঝলে তো ব্যাপারটা?'

'তুমি বলছো, পায়াস রাজি হয়ে যাবেন নিজের মেয়েকে সতীনের ঘরে দিতে?'

'না, এখানে তুমি ঠিক বলেছ। দিতে চাইবেন না। তবে সেখানে অবশ্যই আমার হাতে একটা চাল বাকি আছে।'

জানতে উৎসুক হলো মরিস, ' কী?'

'রোমান সম্রাটের কাছে খবর পাঠিয়ে দেওয়া।'

' কী খবর?'

'একজন গভর্নর আর সেনাপতি মিলে দুজন গুপ্তঘাতককে কাবু করতে পারেননি। শেষে স্পার্টার একজন নাগরিকের সাহায্য তাদের নিতে হয়েছে। আর এখানেই আটকে যাবেন পায়াস। অবশ্য পরিস্থিতি যেই দিকে এগোচ্ছে তাতে এরচেয়েও ভালো উপায় আমার হাতে এসে যেতে পারে।'

'যেমন', নিকোলাসের কোনো চিন্তাই মাথায় ঢুকছে না মরিসের।

' তুমি তো জানো ইভান কেমন যোদ্ধা। সে যে সফল হবে না তাই বা কে বলতে পারে?'

'মানে', হতভম্ব হয়ে ঘোড়া থামিয়ে ফেললো মরিস।

'এমনও হতে পারে গুপ্তঘাতক নিজের কাজে সফল হলো, আর পায়াস মারা গেলেন।'

আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত পুস্তকাগারে বিস্ময় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্রদেব। শেইরন ওকে নিয়ে এসেছিলেন জায়গাটা এক নজর দেখানোর জন্য। কিন্তু রুদ্রদেব আসলেই যেন সবকিছু ভুলে গেছে। পুঁথির পর্বতের সামনে গিয়ে ঘাড় উঁচু করতে হচ্ছে। হাত বোলাচ্ছে না সে কিছুতেই। শেইরন আগেই মানা করে দিয়েছেন। পুঁথির ওপর থেকেই কিছু বিজাতীয় বর্ণ চোখে পড়ছে। নিশ্চয়ই গ্রিকের লেখা।

শেইরন পেছন থেকে হাসি মুখে বললেন, 'অনেকে বলে এই দিকের সবচেয়ে চমৎকার ব্যাপার ঐ নীল নদ থেকে দেখা যাওয়া পিরামিড। অনেকে আবার বলে ঐ আলোঘর চমৎকার। তবে আমার কাছে এই ঘরটাকেই এই আলেকজান্দ্রিয়ার সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় বলে মনে হয়।'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য, নিজের কীর্তি অমর করার জন্য বিশালতার দিকে ঝোঁকে, সবাই করে যেতে চায় বস্তুগত কিছু অর্জন করতে বা তৈরি করতে যা তাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে স্মরণীয় করে রাখবে। বেশির ভাগ মানুষই মনে করে একটা খুব বড়ো প্রাসাদ, একটা স্তম্ভ অথবা একটা বড়ো মূর্তি তৈরি করাই সবচেয়ে প্রশস্ত রাস্তা।'

'তোমার কী মনে হয়?' শেইরন জিজ্ঞেস করেন।

'আমার যে অন্যরকম মনে হয় তা তো না। আমাদের ভারতেও রাজারা তাই করেছেন। অশোক তৈরি করেছে অশোক স্তম্ভ, কেউ তৈরি করেছেন অনেক বড়ো মন্দির, বড়ো প্রাসাদ। কিন্তু ভেবে অবাক হয়ে যাই, এই ঘরের যে বিশালতা, তার কাছে পৃথিবীর সবগুলো প্রাসাদও মনে হয় আকারে ছোটো হয়ে যাবে। ঐ তোমাদের ওখানকার বস্তুগুলো কীভাবে তৈরি হয়েছে জানি না, হয়তো কোনো প্রাচীন রাজার বিচিত্র খেয়াল, কিন্তু হলফ করে বলতে পারি, এই ঘরের এই জ্ঞানের বিশাল সম্ভার এক দিনে অথবা এক জনের দ্বারা তৈরি হয়নি।'

'তা তো তুমি ঠিকই ধরেছ। এই বিশাল সংগ্রহ এক জায়গা থেকেও হয়নি। অনেক জ্ঞানীরা সারা জীবনের সঞ্চিত জ্ঞান এখানে রেখে গেছেন, কেউ হয়তো দূর দেশ থেকে পুঁথি সংগ্রহ করে এখানে এনে রেখেছেন। এখানে অনেক পড়ুয়া দেখতে পাবে যারা সারা জীবন পড়ে আর চিন্তা করে কাটিয়ে দিলো।'

'হ্যাঁ, এই মানুষেরা নিজেদেরকে মনে রাখার বস্তু বানাতে চান না, কিন্তু নিজেদের জ্ঞানকে ঠিকই ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য রেখে যাচ্ছেন। এটাই তো আসলে সঠিক চিহ্ন রেখে যাওয়া।'

'তবে মানুষ বোধহয় তোমার মতো করে চিন্তা করবে না।'

'করার কথা না। সবাই জ্ঞানযোগী হলে পৃথিবীতে অন্ধকারের যে বড্ড অভাব হবে। অধিকাংশ মানুষ অন্ধকারের মধ্যে একটু আলো নিয়ে বসে থাকতে পছন্দ করে। আর আলো একটু বেশি হয়ে গেলেই তাদের চোখ পিটপিট করে।'

'তোমার কথাগুলো মাঝে মাঝে একটু বেশিই ভারী হয়ে যায়।'

'আপনি তো বৃদ্ধ হয়েছেন। অল্প ওজনেই এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন।'

শেইরন এই কথার জবাবে পাল্টা কৌতুক করলেন না, 'এদিকের মানুষ সম্পর্কে এখন কেমন ধারণা হলো তোমার? তোমাদের ভারতের জ্ঞান আর দর্শনের চর্চার কথা অনেক শুনেছি। আমরাও কিন্তু কম যাই না।'

'এটা ঠিক। অবাক হবার মতো বৈপরীত্য। এই দেশেই একদল লোক দুজনের মানুষের মধ্যে একজন মানুষের মৃত্যু দেখে আনন্দ লাভ করে। নিজের ছেলেমেয়েকে এনে সেই দৃশ্য দেখায়। আবার সেই জাতিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো পুস্তকের সম্ভার নিয়ে বসে আছে। তবে এখানে মানুষের সংখ্যা অনেক কম দেখছি। ঐ আখড়ায় তো অনেক লোকজন ছিল। তার মানে এখানে জ্ঞান আছে কিন্তু সংগ্রহ করার মানুষের অভাব।'

'আমার মনে হয় পৃথিবীতে সত্যিকার জ্ঞানের অনুসন্ধান করা মানুষ সবসময় কমই থাকবে। আর জ্ঞান আসলে সবার জন্য না। তোমার আলো অন্ধকারের কথাই তো সত্যি বলে মনে হচ্ছে।'

'কি জানি, হতেও পারে। শুনেছি সম্রাট অশোক নিজের স্তম্ভ সবাইকে দেখানোর জন্য তৈরি করেছেন, কিন্তু নিজের জ্ঞানের চর্চা একটা গোপন সংগঠনের মধ্যেই সীমিত করে রেখেছেন। কি জানি, হয়তো জ্ঞান উন্মুক্ত করে দেওয়াও উচিত নয়।'

'তাহলে এত বড়ো পুস্তকাগার তৈরি করে আমাদের এদিকের লোকেরা কি ভুল করেছে?'

'তা তো একটু করেছেই। যখন কোনো জিনিস কারো জন্য সঠিক হয়, তখন তা অন্য পক্ষের জন্য হয়ে যায় ভুল। প্রজা বেশি জ্ঞানী হয়ে গেলে শাসকের জন্য কাজটা একটু কঠিন হয়ে যাবে না? তাই শাসকেরা সবসময় এই জ্ঞান প্রজার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। আপনাদের এদিকের রাজারা দেখছি অনেক ভালো, এটা এখনো অক্ষত আছে।'

'পুরোটা নেই। জুলিয়াস সিজার আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করার সময় এই পুস্তকাগারের একটা বড়ো অংশ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে এখনো যা আছে তা মন্দ নয়।'

রুদ্রদেব মাথা নাড়লো, 'এবার মিলেছে। একবার পোড়ানো হয়ে গেছে তাহলে? আরও দুই একবার কোনো রাজার হিসেবের মধ্যে পড়ে গেলে এই

পুস্তকাগার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেন জানি শাসকদের জ্ঞানের প্রতি একটা ক্ষোভ থাকে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। দেখা যাবে এই পৃথিবী ঐ পিরামিড আর এই আলোঘরকেই হাজার বছর পরে এই কালের চিহ্ন হিসেবে আশ্চর্য হিসেবে মনে রাখবে, কিন্তু এই পুস্তকাগার তেমন কোনো স্বীকৃতি পাবে না।'

ওদিকে অসিত এতক্ষণ সব ঘুরেফিরে দেখে এসেছে। এতক্ষণ তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে দুজনের আলাপ শুনছিল আর বোঝার চেষ্টা করছিল। ভবিষ্যৎ দুনিয়া কী মনে রাখবে আর কী রাখবে না সেসবের আলোচনায় বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করলো না সে। এই দুজনেই মনে হয় নিজেদের পরবর্তী পদক্ষেপের কথাটা ভুলে গেছে।

একটু বাঁধা দিলো অসিত, 'আমরা বন্দরে কখন যাবো? জাহাজ ঠিক করতে হবে না?'

শেইরনের যেন সম্বিত ফিরলো, 'জাহাজ তো ঠিক করতেই হবে। তবে এখন পর্যন্ত আমরা সফর নির্বিঘ্নভাবেই করেছি। সামনে এমনটা নাও হতে পারে।'

রুদ্রদেব একটু ভ্রুকুটি করলো, 'নির্বিঘ্ন ভাবে! আমাকে রণমঞ্চে লড়াই করতে হলো। ভয়ানক ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিলাম, আরেকটু হলে প্রাণ চলে যেতো। তারপরও আপনি বলতে চাইছেন নির্বিঘ্ন সময় পার করেছি?'

'হ্যাঁ। কারণ সামনে যে সমস্যা আছে তার কাছে ওগুলো কিছুই না। বেরেনিকে বন্দরে গেলেও এই সমস্যায় পড়তাম, তবে আমরা ঐ বন্দরে যাইনি। এখানে আর সেই সমস্যা এড়ানো যাবে না।'

'কী সমস্যা?'

'এই রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। রোমান। ওদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে এখন আলেকজান্দ্রিয়া। কারো হাতে এই বন্দরের কতৃত্ব ছাড়েনি। আর স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মানে গ্রীকদের ওরা একটু নিচু চোখে দেখে।'

'স্বাভাবিক', রুদ্রদেব সায় দেয়, 'পরাধীন তো এমনিতেই নিচু।'

'তাতে তোমাদের দুজনের খুশি হবার কোনো কারণ দেখছি না। পরাধীন হলেও আমরা প্রজা। আর তোমরা তো এই ভূখণ্ডের কেউ না। ভারত থেকে এসেছ। ওরা তোমাদের দেশ থেকে আসা মালামাল খুবই কদর করে, কিন্তু ওদিকের মানুষ দেখলে ঠিক ততটাই বিরক্ত হয়।'

এবার সমস্যা বুঝতে পারলো ওরা দুজন। শেইরনের কাছে অবশ্য সমাধান আছে, 'ভেবো না। আমি একটা উপায় বের করে ফেলবো। রাহুও তো এদিক দিয়েই গেছে। যে উপায় জেইস বের করেছিল, সেই উপায় আমার কাছেও আছে।'

আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। এবার নিজেদের আসল লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করলো। পুরো নগরে নানা কাজ হচ্ছে, মানুষ জীবনের নানা পশরা সাজিয়ে বসেছে। তবে কর্ম যজ্ঞে যে ঘি ছড়িয়ে দিচ্ছে ঐ বন্দর তাতে

কোনো সন্দেহ নেই। চারিদিকের অবস্থা দেখতে দেখতে চলছে ওরা। সবাই ওদের দিকে তাকাচ্ছে একটু তাচ্ছিল্য মাখা দৃষ্টিতে।

বন্দরের আসল স্থানে ভিড় আরও বেশি। এখানে জাহাজ থেকে মাল খালাস খুব কম হয়। জাহাজ এখানে ভূমধ্যসাগরের অপর পার থেকে খালিই আসে বলা চলে। যাবার সময় নিয়ে যায় ভারত, পারস্য আর মিশরের নানা সামগ্রী।

তবে সেই জাহাজগুলোতে যাত্রী হিসেবে উঠতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তাই শেইরন নিজের পরিচিত একটা জাহাজ খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু বিধি বাম, অনেক খুঁজেও একটা গ্রীক মালিকানাধীন জাহাজ পাওয়া গেল না। দুটো যদিও পাওয়া গেল সেগুলো আজকে ছাড়বে না, দুই তিন দিন লাগবে জাহাজ ভরতে।

শেইরন চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, 'নাহ, উপায় নেই। রোমান প্রধান নাবিকের কোনো জাহাজে করেই যেতে হবে মনে হচ্ছে।'

অসিত ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না, 'যেতে হলে যাবো। আমাদের তো রোমানদের সাথে ঝামেলা করতে হবে না। জাহাজে উঠে কেবল মুখ বুজে চলে যাবো।'

'রোমানদের সাথে আমাদের ঝামেলা করতে হবে না বাছা। ওরাই আমাদেরকে বাগে পেলে কৌতুকের ছলে ঝামেলা পাকিয়ে ফেলবে।'

রুদ্রদেব সিদ্ধান্ত জানালো, 'দেখাই যাক না কী ঝামেলা করে।'

অগত্যা শেইরন রোমান এক জাহাজের দিকেই গেলেন। জাহাজটা মালামালে পূর্ণ হয়ে আছে। নিশ্চয়ই ছেড়ে যাবার অপেক্ষা করছে।

জাহাজের সামনে আসতেই এক নাবিক রীতিমতো তেড়ে এলো, 'এখানে কী তোমাদের? কী মতলব?'

শেইরনের গলার স্বরে এখন আভিজাত্যের ছিটেও নেই, 'আমরা স্পার্টা যাবো। জাহাজে নিয়ে নিলে আমরা ভাড়া দেবো।'

নাবিক এবার ওদের তিনজনের ওপর নজর বোলালো, 'ভাড়া দেবে ভালো কথা। কিন্তু এটা তো ভাড়ার জাহাজ না। আর তোমাদের জাতিকে আমাদের জাহাজে প্রধান নাবিক উঠতে দেবে বলে তো মনে হয় না।'

'একটু ওনাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না' বিনীত অনুরোধ জানালেন শেইরন।

'দাঁড়াও এখানে। দেখছি।' এই কথা বলে নাবিক নিজের কাজ দেখতে শুরু করলো। রুদ্রদেব ভালোই বুঝতে পারছে রোমানরা আক্ষরিক অর্থেই শাসন করছে এই ভূমি। দেখাই যাক, কোথাকার জল কোথায় যায়।

ওদেরকে ভাগ্য খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলো না। একটু পরেই প্রধান নাবিক জাহাজের দিকে এগিয়ে গেলেন। কয়েকজন রোমান সেনা আছে তার সঙ্গে। জাহাজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজনের দলটার দিকে দেখেও না দেখার

2024/01/15 18:06

জান করলো সে, এগিয়ে গেল পাদানির দিকে। শেইরন পেছন থেকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'মহাশয়, একটু শুনবেন?'

ফিরে তাকালো রোমান প্রধান নাবিক, 'কী হয়েছে?'

'আমাদের তিনজনকে একটু সাহায্য করুন। আমরা স্পার্টায় যাবো। এখন কোনো গ্রীক জাহাজ পাচ্ছি না। আমাদের জলদি যাওয়া প্রয়োজন। যদি আপনার জাহাজে একটু তুলে নিতেন।'

রোমান সেনার দিকে তাকালো প্রধান নাবিক, 'তোমাদেরকে তো আগেই বলেছিলাম বন্ধু, এই গ্রীসের শহরগুলোকে এভাবে ফ্রি-টাউন করে রেখো না। ওরা এখন আর নিজেদেরকে রোমান সাম্রাজ্যের অধীন ভাবছে না, দেখছ না কি সুন্দর চলে এসেছে আমাদের জাহাজে চড়তে।'

'আমি কেবল একটু সাহয্য চাইছি', আবার বললেন শেইরন।

'থামো। তোমাকে কেউ কথা বলতে বলেনি বুড়ো। আমি আমার বন্ধুর সাথে কথা বলছি।'

রুদ্রদেব আর অসিতের সামনে লজ্জায় নত হয়ে গেল শেইরনের মুখ। রুদ্রদেব বুঝতে পেরেছে এখানে আসলে কাজের কাজ কিছুই হবে না, যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই অপমান। সে শেইরনের হাত ধরলো, 'চলে আসুন। আমরা ওদিকে জাহাজ খুঁজবো। যদি না পাই তাহলে দুদিন পরেই যাবো।'

শেইরনের আপত্তি করার পরিস্থিতি নেই। তিনি রওনা দিলেন। প্রধান নাবিকের বন্ধু রোমান সেনা এবার ডেকে উঠলো পেছন থেকে, ' কী হলো। তোমরা চলে যাচ্ছ কেন? যাবে না এই জাহাজে?'

ওরা দাঁড়িয়ে গেল। রোমান সেনার সাথে বেয়াদবি করলে ফল ভালো হবে না। ফিরে এলো আবার জাহাজের সামনে।

প্রধান নাবিক কিছু বলল না। রোমান সেনা এখন আর একা দাঁড়িয়ে নেই। রুদ্রদেব তাকিয়ে দেখল তার সাথে একই রকমের পোশাক পরা আরও দশ বারোজন আছে। ওদেরকে যে ডেকেছে সে বোধহয় দলের নেতা মানে উঁচু পদের সৈনিক। এই সেনা তাদেরকে পিছু ডাকলো কেন সেটা বোঝা গেল না।

একটু পরেই খোলাসা হলো। জাহাজ ছাড়তে একটু দেরি আছে। প্রধান নাবিকের আরেক বন্ধু আসবে। ততক্ষণ আসলে ওদের সাথে একটু মজা করার শখ হয়েছে রোমানদের। সেধে এসে ধরা দিয়েছে পরাধীন প্রজারা। এভাবে কীভাবে ছেড়ে দেয়।

'শোনো' রোমান উঁচু পদের সেনা বলে, 'গ্রীকরা দুর্বল জাতি। আর তোমাদের দুজনকে তো দেখে মনে হচ্ছে সমুদ্রের ওপারের। তোমাদের তো শক্তি আরও কম। আমাদের সাথে জাহাজে চড়তে হলে তোমাদেরকে শক্তির একটু প্রমাণ দিতে হবে।'

শেইরন বুঝতে পারলো ফাঁদ, উনি বিনীতভাবে মানা করতে যাবেন, এমন সময় রুদ্রদেব বলে বসলো, 'কী রকম?'

'সহজ। পাঞ্জা লড়তে হবে।' রুদ্রদেবের ওপর দৃষ্টি বোলাল সৈনিক, 'তোমাকে দেখে একটু তাগড়া মনে হচ্ছে। তোমাকে এক সেকুন্ডা লড়লে হবে না। তুমি আমার সাথে দুই সেকুন্ডা টিকে থাকতে হবে।'

সময়ের এই হিসেবের সাথে রুদ্রদেব পরিচিত নয়। শেইরন সময়ের হিসেব জানেন, 'বালু ঘড়ি দিয়ে সময় মাপবে। তোমাদের ওদিকের হিসেবে দুইশো পলের মতো হবে।'

কানে কানে বলা কথায় রুদ্রদেব সময়টা আন্দাজ করে নিলো। সেই সাথে মেপে নিলো রোমান সেনার বাহুর মাপ। হালকা হাসি ফুটে উঠলো তার মনের মুখে, 'আমি রাজি।'

'বেশ', হাততালি দিয়ে উঠলো সৈনিক, 'ব্যবস্থা করা হোক। শোনো, তোমার জিততে হবে না, তুমি যদি দুই সেকুন্ডা টিকে থাকতে পারো, তবেই তোমাকে আমি আমার বিশেষ মেহমান হিসেবে এই জাহাজে করে স্পার্টা নিয়ে যাবো।'

রুদ্রদেব রাজি হয়েছে। সাধারণ সেনারা বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে সব আয়োজন করছে। দেখতে দেখতে দুটো আসন আর একটা হাঁটু পর্যন্ত উঁচু টেবিল নিয়ে এলো তারা। দুই দিকের একদিকে বসলো রোমান সৈনিক। আরেক দিকে রুদ্রদেবকে বসতে আহ্বান জানালো।

দুজন দুজনের হাত ধরল শক্ত করে। ডানহাতের লড়াই হবে। কেউ কোনে শক্তি প্রয়োগ করছে না। দুই সেকুন্ডার বালু ঘড়ি তৈরি আছে। উল্টে দিলেই খেলা শুরু হয়ে যাবে।

এক সেনা দুজনের দিকে তাকিয়ে ঘড়ি উল্টে দিলো। সাথে সাথে রোমান সেনা রুদ্রদেবের হাতকে ঠেলে দেবার বদলে আঙ্গুলগুলোকে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরতে চাইলো।

রুদ্রদেব বুঝে গেছে রোমান সেনার মনের ভাব। সে ওকে নিয়ে আসলে একটু মজা করতে চাইছে। হাতের আঙ্গুল কুড়মুড় করে ভেঙ্গে তারপর ওদেরকে তাড়িয়ে দেবে। তবে এখানেই একটু ভুল করে ফেলেছে সৈনিক। রুদ্রদেব এখন এমন মজা করার মানসিকতায় নেই। সৈনিক চাপ বাড়াতেই সে পাঞ্জা একটু শিথিল করলো, তারপর বজ্র মুষ্টিতে চেপে ধরলো সৈনিকের হাত।

রোমান সেনার হাতে যেন বিছে কামড়ে দিয়েছে। এই পর্যন্ত শিবিরে কম পাঞ্জা লড়াই করেনি সে। কিন্তু এমন হাতের জোরের দেখা কখনোই পায়নি। তার হাত যেন অবশ হয়ে আসছে। মরিয়া হয়ে উঠেছে সে, কিন্তু নিজের মরিয়া অবস্থা প্রকাশ করতে পারছে না। এমন সাধারণ একজন মানুষের সাথে নিজের অধীনস্থ সেনার সামনে মরিয়া অবস্থা তো প্রকাশ করা যাবে না। নিজের কৌশলের পরিবর্তন

করলো সে। এবার আর রুদ্রদেবের সাথে খেলা করার ইচ্ছে নেই। যুদ্ধ জয়ে মন দিলো। সত্যিকার পাঞ্জার নিয়মে রুদ্রদেবের হাতকে ফেলে দিতে সচেষ্ট হলো সে।

কিন্তু সেখানেও বিড়ম্বনা কম নেই। একটু আগে সে যেই কাজটা করতে চাচ্ছিল, এবার তার সামনের জন তার হাত নিয়ে ঠিক তাই করছে। নিজের হাত একটুও নাড়াতে পারছে না সে। এবার সম্পূর্ণভাবে সামনের জনের হাতে নির্ভর করতে হচ্ছে।

রুদ্রদেব সেনার হাত পুরো নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসেছে। কিন্তু, একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে। একটু ভাবলো, আর চোখে তাকালো ঘড়ির দিকে। আর বেশি বালু ওপরে বাকি নেই।

রুদ্রদেব সামনের সেনার অবস্থা বুঝতে পেরেছে। এখন যদি সে হেরে যায় তবে তাদের জন্য সেটা খুব সুখকর হবে না। শাসক কোনোভাবেই অপমান মেনে নিতে পারে না। একটা উপায়ই হাতে আছে। সেনারা এদিকে চেয়ে আছে অবাক হয়ে। ওদিকে বালু ঘড়ির শেষ বালুর কণাও নিচে পড়লো।

রুদ্রদেব এবার সৈনিকের হাতে টান দিলো, তবে নিজেকে জেতানোর জন্য না, নিজের হাত রাখলো নিচে। সেনা অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে। রুদ্রদেব আস্তে আস্তে টেনে নিজের হাত টেবিলের গায়ে ঠেকিয়ে দিলো। তারপর ছেড়ে দিলো সৈনিকের হাত। জয়ীকে নিজের হাত ঠিকঠাক রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হচ্ছে।

রুদ্রদেব কী করেছে সেটা শেইরন আর অসিত দুজনেই বুঝতে পেরেছে। রুদ্রদেব সৈনিকের দিকে তাকিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'আমাকে সুযোগ দেবার জন্য ধন্যবাদ। আপনি আরেকটু শক্তি প্রয়োগ করলেই আমি সময় শেষ হবার আগেই হেরে যেতাম। তবে শেষ পর্যন্ত সময় পার করতে পেরেছি। এখন নিশ্চয়ই আমাদের জাহাজে ওঠার অনুমতি দেবেন?'

রোমান সেনা এখনো কিছুই বুঝতে পারছে না। তার সাথের সেনারাও হতবুদ্ধি। তাদের নেতা জিতেছে কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন ম্যাড়ম্যাড়ে হয়েছে। আগের বারের গুলোর মতো মজা হয়নি। সৈনিক নিজের সম্মান বাঁচাতে সচেষ্ট হলো, মুখটা একটু স্বাভাবিক করলো অনেক কষ্ট করে, ' ভালোই শক্তি আছে তোমার হাতে। তোমরা জাহাজে ওঠো।'

রুদ্রদেব মাথা ঝোঁকালো, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

নিজেদের যৎসামান্য জিনিসপত্র নিয়ে জাহাজে চেপে বসলো ওরা।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। কুলদেবতাকে সাক্ষী রেখে নিকোলাস বিয়ে করেছে ইনোনকে। নিজের মেয়ের হাত যে একটা যোগ্য হাতে দিতে পেরেছেন তাতে অ্যালেস্টরের কোনো সন্দেহ নেই। এখন আর তার কোনো পিছুটান নেই। কালই দলের সবার কাছে সংবাদ চলে গেছে। সবাই আজ রাতে তৈরি থাকবে। আজ রাতেই তিনি প্রবেশ করবেন পায়াসের প্রাসাদে। শেষবারের মতো নিজের পরিকল্পনা ঝালিয়ে নিয়েছেন। না, পায়াস আজকে কিছুতেই বাঁচতে পারবে না।

প্রাসাদ ত্যাগ করতে হবে তাকে কিছুক্ষণ পরেই। কিছু প্রস্তুতি আছে। অস্ত্রসস্ত্র আর সাজ এই প্রাসাদ থেকে নিয়ে বেরোনো যাবে না। সেসবের জন্য স্থান আগে থেকেই ঠিক করে রাখা আছে। এখন ইনোনের সাথে একবার ভালো করে কথা বলে যেতে হবে। প্রথমে ভেবেছিলেন ইনোনকে ডেকে পাঠাবেন। শেষে মত বদলেছেন তিনি। ইনোনের ঘরেই যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মেয়েটা হঠাৎ বিয়ে হয়ে যাওয়ায় নিশ্চয়ই একটু চমকের মধ্যে আছে। আর মেয়ের সাথে শেষ বার ভালো করে কথা না বলে ঐ কাজে যেতেও মন সায় দিচ্ছে না।

ওদিকে সেদিন রাতের পর থেকে ইনোন অন্নজল একেবারে ত্যাগ করেছে বলা যায়। যেটুকু খাচ্ছে সেটা নিজের ইচ্ছেয় না, খেতে হচ্ছে ডোরার ক্রমাগত জোরাজুরিতে। আজকে সকালেও খাবার নিয়ে এসেছে দাঁড়িয়ে আছে ডোরা।

সেদিকে তাকানোর ইচ্ছেও অনুভব করছে না ইনোন। তার তন্বী দেহ অনাহারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। একটু ধরলেই যেন পড়ে যাবে এমন হয়েছে শরীরের অবস্থা। কিছুতেই সেদিন রাতের সেই বিয়ের ঘটনা সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না।

ডোরা অনেকবার বলা কথাটা আরেকবার বলল, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আপনার তো আর কিছু করার নেই। এখন শুধু শুধু নিজের শরীরকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী?'

'আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না। বলেছি তো এখন আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। এসব নিয়ে যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

'আজ হোক, কাল হোক, আপনাকে তো ঐ অভিজাতের প্রাসাদে যেতেই হবে। আপনি তৈরি হয়ে নিন।' কথাটা বলতে ডোরার ভেতরে যেন কি একটা আটকে আসছে, কিন্তু এটাই তো নিয়তি।

'কিন্তু আমি তো কোন অভিজাতের প্রাসাদে যেতে চাইনি। তা তো তুমি জানো ডোরা। আমি তো যেতে চেয়েছিলাম জঙ্গলে। সেখানে ইভান আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু এখন আমি কোন মুখে ইভানের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো? আমাকে সমাজের পুরোহিত দেবতা সাক্ষী করে আরেকজনের অধিকারে দিয়ে দিয়েছেন।'

ডোরা জবাবে কিছু বলে না, কেবল একটু খাবার নিয়ে ইনোনের মুখের সামনে ধরে, 'খেয়ে নিন। দয়া করে নিজের ওপর এত অত্যাচার করবেন না।'

ইনোন আর না করতে পারে না। প্রতিরোধ অথবা প্রতিবাদ সবকিছুর ইচ্ছা আর শক্তিই যেন ভেতর থেকে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এখন সময় হয়তো নিজেকে নিয়তির হাতে তুলে দেবার। ডোরার হাত থেকে একটু খাবার মুখে তুলল সে।

কিন্তু, তার পাকযন্ত্র এই আদেশ মানতে পারলো না। খাবার মুখে যেতেই যেন পুরো শরীর গুলিয়ে উঠলো ইনোনের। ঘরের লাগোয়া স্নান ঘরে ছুটে গেল সে। পুরো দেহ কাঁপিয়ে বমি করলো সে। ক্লান্তিতে বসে পড়লো স্নান ঘরের মেঝেতে। ডোরা গিয়ে তার মাথা চেপে ধরলো।

সেদিন ঐ হেলট মেয়েটা কৌশল খাটিয়েছে ঠিক, কিন্তু সেই কৌশলে একটা সত্যিও ছিল। ডোরা আসলেও এক চিকিৎসকের মেয়ে। সে চিকিৎসার অনেক কিছুই শিখেছে ছোটোবেলায়। সে জানে, মানুষের সব রোগ দেহে থাকে না, বেশির ভাগই থাকে মনে। মন থেকে দেহতে সঞ্চারিত হয় আস্তে আস্তে। ইনোনকে এখন যেই রোগে ধরেছে, তাতে কোনো ধরনের ওষুধিতে কাজ হবে না। ছোটোবেলা থেকে যার সাথে আছে তার এমন অবস্থা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে। কিন্তু কী করার আছে? এখন তো আর কোনো সিদ্ধান্তই নেয়া যাবে না। দেবতা সাক্ষী করে তো বিয়ে হয়ে গেছে।

ইনোন হঠাৎ ডোরাকে জড়িয়ে ধরলো, তারপর কেঁদে উঠলো ফুঁপিয়ে, 'আমি ইভানের কাছে যাবো ডোরা। আর কোথাও না। আর কারো স্পর্শ পাবার আগে আমি পাতালে চলে যাবো। তুই তো ছোটোবেলা থেকে আমার সাথে থেকেছিস, এত উপকার করেছিস, আরেকটু উপকার কর। তোর কাছে তো নিশ্চয়ই বিষের সন্ধান আছে। একটু এনে দিবি আমাকে? এই যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না।

আচমকা দাঁতে দাঁত চেপে বসলো ডোরার, 'এসব কথা বলবেন না কুমারী।'

ইনোন ডোরার দিকে তাকালো, 'আমাকে কুমারী ডাকছো কেন?'

'কারণ এখনো আপনি কুমারীই আছেন। আপনার এমন অবস্থা আমি মেনে নিতে পারছি না। ভেবেছিলাম আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। এখন আর কিছুই করার নেই। মেনে নিতে হবে সব। কিন্তু আর কিছুই আমরা মেনে নেবো না। আপনাকে ইভানের কাছে পাঠাবার সব ব্যবস্থা আমি করবো।'

'কিন্তু, যেই অগ্নি আর দেবতা সাক্ষী করে বিয়ে করেছি, তারা যে শাপ দেবেন। এই জীবনে এমনকি হেডিসের কাছেও আমাকে অনন্ত আগুনে জ্বলতে হবে।'

'আমি ভালোবাসা অতো বুঝি না। কিছুটা হয়তো বুঝি। আপনার এখনকার যে অবস্থা তা কিছুতেই ঐ হেডিসের আগুনের চেয়ে কম না। বিয়ে মানে হচ্ছে কারো

ওপর আপনার মনের স্থাপন। আপনি তো আর সেই মন স্থাপন করেননি। এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে ইভানের কাছে চলে যাওয়া।'

সঙ্গী সহযোগ করলে অনেক অসম্ভব সম্ভব মনে হয়। কিছুক্ষণ আগেও নিজেকে বিয়ের বাধা বলে মনে হচ্ছিল, এখন বিয়েকে মনে হচ্ছে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আবার আশা ফিরে পেলো ইনোন, 'হ্যাঁ, আমি ইভানের কাছে চলে যাবো। সবকিছু গোল্লায় যাক।' প্রেমে পড়ে তার আগেও অনেকেই সবকিছু গোল্লায় নিয়ে গেছে। হেলেনের কথাই বলা যায় সবার আগে।

ডোরা তখনো ইনোনকে বোঝাচ্ছে, হয়তো নিজেকেও, 'দেবতাদের চিন্তা আর করবেন না। জানেন তো সব গল্প। তারা নিজেরাই তো নিজেদের সঙ্গীদের ধোঁকা দিয়ে এসেছেন সবসময়। জিউসের একেক ধোঁকার গল্পে তো এদিকের একেক কবির সারা জীবন খাওয়া পরা চলে যায়। আফ্রোদিতি নিজের স্বামী হেফাস্টাসকে লুকিয়ে এরিসের সাথে সম্পর্কে জড়াননি? আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। এই অসহ্য নরকের মধ্যে থাকার চেয়ে কিছুদিন আনন্দে থাকুন। মৃত্যুর পরে যা হবে দেখা যাবে।'

ইনোন সিদ্ধান্ত নিতেই আবার উঠে দাঁড়ানোর শক্তি ফিরে পেলো। স্নান ঘর থেকে প্রবেশ করলো নিজের ঘরে। ঠিক তখনই ঘরের বাইরে থেকে কথা বলে উঠলেন অ্যালেস্টর, 'ইনোন, মা, আছিস ঘরে?'

ইনোন আর ডোরা আঁতকে উঠলো, ইনোন নিচু গলায় বলে উঠলো, 'বাবা এখানে এসেছেন কেন?'

'ভয় পাবেন না। আমাদের পরিকল্পনা ওনার জানার কথা না। মনে হয় আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন।'

নিজের শরীরের ওপর একটা চাদর চাপা দিলো ইনোন। স্নান ঘরে মেঝেতে বসে থেকে জামা ভিজে গেছে। সেটা বাবাকে দেখাতে চাইলো না সে, 'হ্যাঁ, বাবা, আমি আর ডোরা ঘরে আছি।'

অ্যালেস্টর প্রবেশ করলেন ঘরে, ইনোনের ওপর দৃষ্টি পড়তেই তার মনের মধ্যে কেমন একটা কাঁটা যেন বিঁধে উঠলো। এক পলকে চেয়ে রইলেন মেয়ের দিকে।

'কী হয়েছে বাবা' ইনোনের গলার স্বর স্বাভাবিক।

'কিছু না। আমি একটু পরে বের হবো। আজ আমার খুব জরুরি একটা কাজ আছে। ভাবলাম তোর সাথে একটু দেখা করে যাই।'

ইনোন কিছু বলল না। হাত বাড়িয়ে ইনোনকে নিজের আলিঙ্গনে নিয়ে নিলেন অ্যালেস্টর, 'তোর শরীর যে দিনদিন শুকিয়ে যাচ্ছে। খাওয়া দাওয়া নিশ্চয়ই করছিস না। কদিন পরে প্রাসাদে যেতে হবে। একজন অভিজাতের স্ত্রীর কত কাজ থাকে। তোর মা কত সুন্দর করে সেসব করতো। আমাকে

কোনো চিন্তাই করতে হতো না। তুইও তোর মার মতোই পারবি। কিন্তু সেসব করতে হলে তো প্রচুর শক্তি থাকতে হবে শরীরে। ডোরা, ইনোন নিশ্চয়ই খাওয়া দাওয়া করছে না।'

ডোরা তাড়াতাড়ি জবাব দিলো, 'একটু সমস্যা ছিল। এখন থেকে আমি দেখছি।'

আরও কিছুক্ষণ অ্যালেস্টর জড়িয়ে ধরে থাকলেন ইনোনকে, তারপর বন্ধন মুক্ত হলো, 'তা হলে আমি যাই, তোরা সাবধানে থাকিস।'

অ্যালেস্টর বেরিয়ে যেতেই ইনোনের কেমন যেন খারাপ লাগতে লাগলো, 'বাবা আজকে কেমন আজব আচরণ করলো না রে ডোরা?'

'হ্যাঁ, উনি তো কখনো এমন করে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেন না।'

'কী আবার হয়েছে? রাতে বাইরে যাবেন সেজন্য এমন করে বিদায় তো কখনো নেন না।'

'মনে হয়, আপনি যে কয়েকদিন পরে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবেন, এজন্য ওনার মনটা খারাপ হয়ে আছে।'

ইনোন বাবার ব্যাপারটা মনের ভেতরে বেশিক্ষণ রাখতে পারলো না। প্রাসাদ ছেড়ে যাবার কথা উঠতেই এবার ইভানের ব্যাপারটা মাথায় চলে এলো, 'ইভানকে কখন খবর দিবি তুই?'

'এখনই ব্যবস্থা করছি। সেদিন যখন ওরা এসেছিল, তখন তো ঠিক হয়েছিল যে-কোনো সময় আপনি ইভানের সাথে চলে যাবেন। তার ওপর আপনার বিয়ের কথা চলছিল। তাই তারা নিজেদের একজন লোককে সবসময়ের জন্য নগরে রেখে গেছে। তার মাধ্যমে খবর পাঠানো যাবে। আপনার সাথে নিকোলাসের বিয়েটা এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, কিছুই করা যায়নি। তবে এবার করবো।'

ইনোনের মাথায় চলে এলো অন্য প্রশ্ন, ' ইভান কি আমাকে মেনে নেবে? আমি যদি ওকে বলে দেই আমার নিকোলাসের সাথে বিয়ে হয়েছে, তাহলে সে কি আমাকে আবার বিয়ে করতে রাজি হবে। কোনো নিয়মেই তো এই মিলন সম্ভব নয়।'

'আপনি চিন্তা করবেন না। বাহ্যিক সবকিছু আমি দেখছি। আপনি শুধু মনের দিক থেকে তৈরি থাকবেন। আজ আপনার বাবা প্রাসাদে থাকবেন না। আজকেই আপনার পালিয়ে যাবার রাত হিসেবে সবচেয়ে প্রশস্ত সময়। আমি সবকিছু আজকেই ব্যবস্থা করছি। আর এখান থেকে আপনি যাবেন জঙ্গলে। সেখানে সমাজ নেই, দেবতা নেই, আর মানুষের বানানো নিয়মও নেই। ইভান যদি আপনাকে ভালোবেসে থাকে তাহলে সে আপনার জন্য জিউসের সাথেও লড়বে। আর আমি যেটুকু বুঝেছি ইভান আপনাকে অনেক ভালোবাসে।'

ইনোনের এতক্ষণ কথাটা মাথায় আসেনি। হ্যাঁ, আজকের রাতটাই তো সবচেয়ে ভালো সময়। বাবা প্রাসাদে থাকবেন না। একটু আগে বাবার জড়িয়ে ধরাটা এবার পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারলো সে। এই জীবনে হয়তো আর কখনো বাবাকে দেখবে না সে। বাবা অবশ্যই ওকে খুঁজতে আকাশ পাতাল এক করে দেবেন। হয়তো কখনো খুঁজে পাবেন না, হয়তো পাবেন। তখন কি আর এভাবে আদর করে জড়িয়ে ধরবেন? মনে হয় না। তখন তিনি থাকবেন সমাজের পক্ষে। দেবেন শাস্তি।

ইনোনের অনুভূতির দিকে খেয়াল রাখার সময় এখন ডোরার নেই। তাকে অনেক কাজ করতে হবে। অ্যালেস্টরের একটু পরেই সে প্রাসাদ ত্যাগ করলো। গন্তব্য সে খুব ভালো করেই জানে। একটু নিশ্চিত হয়ে নিলো, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না।

নগরের এদিকটায় হেলটদের বস্তি। এখানেই ঐ লোকের থাকার কথা। ঘরের দরজায় এসে সে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো লোকটা, সে তার জন্যই অপেক্ষা করছিল, 'কোনো খবর আছে?'

ডোরা এতক্ষণ জোরে চলে একটু হাঁপাচ্ছিল, 'হ্যাঁ, ইভানকে আজ রাতেই আসতে হবে। আজকেই ইনোন ওনার জন্য অপেক্ষা করবেন প্রাসাদের পেছনের ঐ গোপন জায়গায়। আমাদের হাতে আর সময় নেই।'

'সময় নেই কেন?'

অল্প কথায় দূতকে সবকিছু বুঝিয়ে দিলো ডোরা। তারপর আবার প্রাসাদের দিকে রওনা দিলো। ওদিকে দূত জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে।

জঙ্গলে কলিনের আস্তানায় পুরো দমে কয়েক দিন ধরে কাজ করছে ইভান আর ওরিয়ন। এই কাজে দুজনেই সমান পাকা হলেও ওরিয়নের শিল্প মন আর নানা ফাঁদ তৈরিতে দক্ষতা বেশ কাজে দিচ্ছে। কলিন ওদেরকে বেশ সুন্দর একটা জায়গা দিয়েছে। একটু দূরেই সরু একটা ঝর্ণা আছে। লতানো ঝোপে মাঝে মাঝে খেলা করে সূর্যের আলো। পাখি ডাকে বেশ আয়েশ করে। সব মিলিয়ে এখানে ইনোনের সময় ভালোই কাটবে।

'আরেকটা বেড়া বাকি আছে। চলো তৈরি করে ফেলি।' ইভান ওরিয়নকে তাড়া দেয়। ঘরটা পুরো তৈরি হয়ে গেলে কেমন লাগবে তা দেখার জন্য তার আর তর সইছে না।

ওরিয়ন ওদিকে লতা পাকানোয় ব্যস্ত, 'তোমার কী মনে হয়? আমি এদিকে কী করছি? তোমার ঐ বেড়ায় একটা জানালা দিতে হবে। সেই জানালার কপাট হবে লতার নকশা দিয়ে। সেটাই তৈরি করছি।'

ইভান এবার তাকালো ওরিয়নের হাতের কাজের দিকে। বেশ হচ্ছে কাজটা। ওরিয়ন এক মনে কাজ করে যাচ্ছে।

বেড়ার গঠন আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল। দুজনে মিলে তুলে বেড়াটা এবার জায়গা মতো বসিয়ে দিলো। তারপর বেঁধে দিতে লাগলো। খুঁটি আর ঘরের অন্যান্য দাঁড়ানো অংশগুলোর সাথে। তারপর জানালার জায়গায় লতার নকশার কপাট বসিয়ে দিলো ওরিয়ন, 'এবার এদিক থেকে বেশ ভালো হাওয়া ঢুকবে ঘরে।'

ওরিয়নের মুখ সন্তুষ্ট। হাতের কাজ ভালো হয়েছে। ঘরের চারিদিকে একবার ঘুরে এলো ইভান। তারপর দাঁড়ালো দরজার সামনে, ' না, বলতেই হবে বেশ ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। চলো, এবার ঘরের ভেতরটা দেখি।'

ভেতরটা সাজানো হয়েছে ছিমছাম করে। গাছের কাঠ আর লতা ব্যবহার করে বিছানা তৈরি করা হয়েছে। এক অভিজাতের বাড়ির পুরানো জিনিসের গুদাম থেকে সহজেই চুরি করে আনা হয়েছে একটা পুরানো তোশক। একটু পরিষ্কার করে নিতেই ব্যবহার যোগ্য হয়েছে সেটা। ওরিয়ন বুদ্ধি দিয়েছিল একটা আয়না জোগাড় করার জন্য। মেয়েদের জন্য না-কি আয়নার কোনো বিকল্প নেই। একটা বড়ো আয়না চুরি করা বেশ শক্ত কাজ। সেই শক্ত কাজটাও করা হয়েছে। এখন ঘরে বিছানা আছে, আয়না আছে, খাবার পাত্র আছে। বাকিটা ইনোন নিজের মতো করে সাজিয়ে নেবে। যা লাগবে বলবে, ওরা জোগাড় করে আনবে।

ইভানের এত সব চিন্তার মাঝে বাইরে থেকে তাকে কে যেন ডাকলো, বেরিয়ে দেখা গেল সেই হেলট গুপ্তচর মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে, ' আমার এক সঙ্গী আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে। যাকে ইনোনের খবর আনার জন্য নগরে রেখে এসেছিলাম।'

'কোথায় সে?'

ইভানকে নিয়ে যাওয়া হলো সেই চরের সামনে। ইভান সামনে আসতেই গড়গড় করে সব বলে গেল চর, 'আমার কাছে ভোরা এসেছিল। বলেছে আপনারা যেই অবস্থাতেই থাকুন না কেন, আজ রাতেই যেন আপনি ইনোনকে আনতে যান। তাদের হাতে আর বেশি সময় নেই।'

'কেন? বেশি সময় নেই কেন?' এই প্রশ্নটা করলো ওরিয়ন।

'কুমারী ইনোনের বিয়ে হয়ে গেছে। নিকোলাসের সাথে। অনেক সমস্যা ছিল বলে বিয়েটা হয়েছে খুব গোপনে। ইনোন এই বিয়ে মেনে নেননি। তিনি আপনার কাছে চলে আসতে চান। আমাকে এটাও বলা হয়েছে, আপনি যদি এই বিয়ে হবার কারণে কুমারী ইনোনকে আনতে না যান, তাহলে সেটা আপনার ইচ্ছা। আজ রাতে ইনোন অপেক্ষা করবেন প্রাসাদের পেছনের গোপন জায়গায়। ঠিক রাতের ঐ সময়ে।'

ইনোনের বিয়ে হয়ে যাবার কথা শুনে ইভানের মাথায় আগুন ধরে গেল। নাহ, অনেকটা সময় এই ঘর তৈরি করতে গিয়ে নষ্ট করা হয়ে গেছে। এখন অবশ্য ঘর তৈরি হয়ে গেছে। আজকেই সে ইনোনকে আনতে যাবে। বিয়ে হয়েছে তো কী হয়েছে। ইনোনের মতে নিশ্চয়ই কিছু হয়নি। কিছুতেই সে ইনোনকে অন্য কারো হতে দেবে না।

ওরিয়নের দিকে তাকালো ইভান। চরের সাথে ওরিয়ন কথা বলছে। ইভান ডাকলো তাকে, 'আমরা ঠিক সন্ধ্যার পরেই বেরিয়ে পড়বো।'

'ঠিক আছে। আমাদের তো একটা বাড়তি ঘোড়া নিয়ে যেতে হবে।'

'দরকার নেই। ঘোড়া সামলানো ঝামেলার কাজ। ইনোনকে আমি আমার ঘোড়ায় তুলে নেবো।'

'বেশ ভালো বুদ্ধি।'

ইভান একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসলো। ইনোনের নিকোলাসের সাথে সমাজ সিদ্ধ বিয়ে হয়েছে, তাদেরকে সন্ধ্যার সময় বেশ কঠিন একটা কাজে যেতে হবে, আর সবকিছু ভালো করে সম্পাদন করে লাভ করতে হবে ইনোনকে।

হ্যাঁ, আজকেই সেই রাত। এই জঙ্গল আজ ভরে উঠবে স্পার্টার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের রূপের দ্যুতিতে।

রাতের অন্ধকার কি আজ একটু বেশিই ঘন? তা তো হবার কথা না। রাতের স্বভাব তো পরিবর্তন হয় না। প্রকৃতির নিয়মে আজকে রাত নেমেছে, তবে সেই রাত আজকে কারো কারো জন্য একটু বেশিই কালো হয়ে উঠবে। প্রদীপ গুলো নিভু নিভু হয়ে এসেছে প্রায়। কালো ছায়াগুলো আরও বড়ো হয়ে দেওয়ালের গা ঢেকে ফেলছে।

পায়াসের প্রাসাদের দেওয়ালের একেবারে পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যালেস্টর। সময় হয়ে গেছে। তার মাথায় এখন আর কোনো চিন্তা নেই। গোপন অস্ত্রখানা থেকে সব ধরনের প্রয়োজনীয় অস্ত্র আর সামগ্রী নিয়ে এসেছেন তিনি। সবকিছু আবার একটু হাত বুলিয়ে পরখ করে নিলেন।

এই প্রাসাদ নির্মাণের সময় বেশ কিছু গোপন চলাচলের পথ রাখা হয়েছিল। সেগুলোর খোঁজ আগেই পেয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকেই একটা বেছে নিয়েছেন। এবার সেই পথে ঢোকার পালা। তার সংবাদদাতা ভুল সংবাদ দেবার কথা না, নকশাটা একেবারে ভালো করে পরখ করেছেন তিনি, ঠিক আছে।

জোরে একটা দম নিলেন তিনি। এখন আর এসব চিন্তা করার সুযোগ নেই। গোপন দরজাটা যেদিকে থাকার সেদিকে থাকতেই হবে। দেওয়ালটা পেরোলেন তিনি একেবারে পেঁচার মতো। একটুও শব্দ হলো না। এখানে তার হিসেবে দুজন প্রহরী থাকার কথা। দুজনেই আছে। একেবারে যেখানে থাকবে বলে আন্দাজ করেছিলেন তিনি ঠিক সেখানে। অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে দুজনের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি।

প্রাসাদের মূল ভবনের দেওয়ালের গা বরাবর এগিয়ে চললেন তিনি। পায়ের হিসব রাখছেন বেশ সূক্ষ্ম মনোযোগে। নির্দিষ্ট পরিমাণ পা চলতেই দেওয়ালের গায়ে হাত রাখলেন তিনি। একটু বোলাতেই বুঝতে পারলেন এখানে দেওয়ালটা একটু উঁচু। নিশ্চিত হলেন তিনি। না, এখানেই আছে সেই দরজা।

পুরানো দরজা খোলার কিছু নিয়ম আছে। মাঝে মাঝে অনেক দিন পরে খোলা হয় বলে এগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ করে বসে। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু ব্যাপার কপালের ওপরেও নির্ভর করে।

দরজাটা কোনদিকে ধরে কোনদিকে খুলতে হবে সেটা আগেই ভালো করে পরখ করে এসেছেন। সেভাবে দরজার পাল্লায় নখ বসিয়ে দিলেন। তারপর যতটা সম্ভব আলগা করে দিলেন পাল্লা যাতে ভারটা তার হাতের ওপরেই থাকে, কিছুতেই শব্দ না হয়। আস্তে করে ঠেলে দিতেই এরপর মৃদু শব্দে খুলে গেল পাল্লা। নিশ্চিত হলেন তিনি। এই শব্দ বাতাসের শব্দের সাথেই মিলিয়ে গেছে।

গোপন রাস্তার ভেতরে ঢুকেই পাল্লাটা আবার ভেজিয়ে দিলেন তিনি। একেবারে খাপে খাপে বসে গেছে। যেটুকু পার্থক্য আছে সেটা কারো চোখে আজ রাতে ধরা পড়বে না। সকালে পড়লেও পড়তে পারে, ততক্ষণে এই প্রাসাদ তাদের দখলে চলে আসবে।

গোপন পথের ভেতরে কালিগোলা অন্ধকার। প্রস্তুতি আছে। মশাল ছাড়া কোনো গোপন পথে চলা যায় না। কোমরে গুঁজে রাখা মশালটা বের করে নিলেন তিনি। চকমকিতে আগুন জ্বালাতে বেগ পেতে হলো না। দেওয়াল বাওয়া, দরজা সরানো জাতীয় বেশ কিছু পরিশ্রমের কাজ করেও ক্লান্তির কোনো চিহ্ন তার মধ্যে দেখা গেল না। শ্বাস বেশ ধীরে পড়ছে। নিজের কাজে এখন পূর্ণ মনোযোগ তার। নকশা অনুযায়ী এই রাস্তা বেশিদূর না, তবে কিছু কিছু সরু জায়গা আছে। সেগুলো পেরোতে একটু কসরত করতে হবে।

সরু জায়গা পেরিয়ে সময় মতোই পথের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলেন তিনি। এবার এই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে হবে। এখানেই হিসেবের চূড়ান্ত ব্যবহার করতে হবে। এই দরজার ওপাশে নিশ্চয়ই প্রহরী টহল দিচ্ছে। তাকে কোনোমতেই আঁচ করতে দেওয়া যাবে না।

দরজা খুঁজে নিয়ে তার গায়ে কান পাতলেন তিনি। একটু পরেই ভেসে এলো মৃদু কাঙ্ক্ষিত আওয়াজ। প্রহরীদের জুতোর মৃদু চপচপ শব্দ। শব্দটা চলে যেতেই তিনি হিসেব করতে শুরু করলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এলো জুতোর শব্দ। তার মানে এই মধ্যের সময়টাই তার হাতে আছে। নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। সময়টা কম নয়। এর মধ্যেই দরজা খোলা এবং বন্ধ করা দুটো কাজই করতে পারবেন তিনি।

এবার জুতোর শব্দটা মিলিয়ে যেতেই তিনি দরজার পাল্লা ধরে টান দিলেন। পাল্লাটা আগেই আলগা করে রেখেছিলেন তিনি। দরজা সহজেই খুলে গেল। ওপাশে বেরিয়ে শরীর টানটান করে রাখলেন কয়েক পল। মশাল আগেই নিভিয়ে দিয়েছেন, এখন শুধু দেওয়ালের গায়ে লাগানো প্রদীপের আলোয় সবটা দেখতে হচ্ছে। সন্তর্পণে দরজাটা আবার জায়গা মতো বসিয়ে দিলেন। তারপর মিলিয়ে গেলেন দরজার অন্ধকারে। তিনি নিজেকে লুকোবার ঠিক পরেই এই দেওয়ালের কাছে আবার ফিরে এলো প্রহরীর দল। হিসেবটা একেবারে টায়টায় হয়েছে।

প্রহরীর দল চলে যেতে নিজের জমিয়ে রাখা শ্বাসটা ছেড়ে দিলেন তিনি। এবার নকশাটা মাথা থেকে চোখের সামনে নিয়ে এলেন। এবারের গন্তব্য পায়াসের কক্ষ। সেদিকেই রওনা দিলেন তিনি। প্রাসাদে সেনারা স্বাভাবিকভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বুঝতেও পারছে না, একজন সুনিপুন গুপ্তঘাতক এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রাসাদের ভেতর। আর একটু পরেই সে পৌঁছে যাবে প্রাসাদের মালিকের কক্ষে।

এদিক সেদিক ঘুরে এগিয়ে চললেন অ্যালেস্টর। এরই মধ্যে তাকে বেশ কয়েকবার নিজের পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে হয়েছে। যেই পথ দিয়ে পায়াসের ঘরে যাবেন ভেবেছিলেন, সেখানে প্রহরী ছিল। তবে পুরো প্রাসাদের নকশাই এতদিন ধরে শুধু আজ রাতের জন্য মুখস্থ করেছেন, সেটাই এখন কাজে লাগতে লাগলো।

নকশা অনুযায়ী পায়াসের কক্ষ আর খুব বেশি দূরে নেই। পায়াস নিশ্চয়ই এখন কামরায় নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। ভালোই হলো তার জন্য। এই ঘুম আর ভাঙবে না। যদি পরকাল বলে কিছু থেকে থাকে একেবারে সেখানে গিয়েই জাগবে সে।

সুরক্ষা নীতি অনুযায়ী পায়াসের ঘরের আশেপাশে পাহারা বেশ কড়া হবার কথা। দরজায় নিশ্চয়ই বেশ কয়েক জন প্রহরী সার্বক্ষণিক পাহারায় থাকবে। তাদের চোখ ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মাঝে মাঝে কাজের সবচেয়ে সহজ উপায়টাই বেছে নিতে হয়। পরিকল্পনা করার সময় সেটা আগেই করে রেখেছিলেন তিনি।

পায়াসের ঘরের কাছে এসে আচমকা পথ বদলালেন তিনি। বিপরীতের পথ ধরে পৌঁছে গেলেন একটা গুদাম ঘরের সামনে। প্রাসাদের নকশায় এই ঘরটা দেখানো আছে সেনাদের সামগ্রীর গুদাম হিসেবে। তিনি আশা করছেন এখনো সেই কাজেই ব্যবহার হয় সেটা।

ঘরটার সামনে এসে সাবধানে চারপাশ পরখ করে নিলেন তিনি। নাহ, ভেতরে কেউ নেই। এত রাতে কোনো প্রহরীর এখানে আসার কথাও না। চট করে ঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি। তার অনুমান সম্পূর্ণ সঠিক, এখানেই সামগ্রীর গুদাম। প্রহরীদের নানা পোশাক আর সাজ আছে এখানে।

যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। বেশ পটু হাতে তিনি বেছে নিলেন এই প্রসাদের প্রহরীর পোশাক। নিজের গায়ে পুরোপুরি হবে না, তবে আন্দাজে যেটুকু হয়া গেছে তাই যথেষ্ট। দ্রুত হাতে নিজের পোশাক বদলে নিলেন তিনি। শত্রুর বেশে নিজেকে সাজিয়ে নেয়া গুপ্তঘাতকের জন্য সবচেয়ে চর্চিত এক কৌশল। সেই বহুদিনের পুরানো কৌশলই তিনি আজকে ব্যবহার করবেন পায়াস নিধনে।

প্রহরীদের মতো সেজে গুদাম ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। এখন আর তাকে অন্ধকারে লুকিয়ে চলতে হচ্ছে না। প্রহরীরা তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে, কেউ হয়তো তাকিয়ে মাথা নিচু করছে, তিনিও সংকেত ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এবার সরাসরি চলে এলেন পায়াসের কামরার সামনে।

এবার সামনে সামান্য একটু সমস্যা আছে। তিনি তো আর পায়াসের দরজার সামনের প্রহরী নন। এখন পায়াসের দরজার সামনে যেতে চাইলে সেখানে থাকা প্রহরীরা সন্দেহ করবে। এটাও অবশ্য পরিকল্পনার অংশ। এখন কী করতে হবে তাও তিনি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন। পায়াসের কক্ষের দরজার অদূরে

খুঁজতেই পাওয়া গেল জিনিসটা। একটা পর্দা আছে দরজার ওপর। সেদিকেই আস্তে করে এগিয়ে গেলেন তিনি। পর্দার ওপর ঢেলে দিলেন পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে রাখা বোতলের তেল। তারপর চকমকিতে একটা ঘষা দিতেই জ্বলে উঠলো আগুন। তিনি পিছিয়ে এলেন নিরাপদ দূরত্বে। এখন তিনিই যে এই অগ্নিকাণ্ডের হোতা, তা আর বোঝার কোনো উপায় নেই।

যা ভেবেছেন ঠিক তা হয়েছে। আগুনটা প্রথমে ছোটো ছিল, তারপর তেলের ছোঁয়া পেতেই পুরো পর্দা যেন একসাথে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। প্রহরীরা সেদিকে তাকালো, আগুন মানেই মূর্তিমান বিভীষিকা, সাধারণ মানুষের চিন্তা কেড়ে নেবার সহজাত ক্ষমতা আছে তার, প্রহরীরাও নিজেদের সহজত প্রতিক্রিয়া দেখালো। সবাই দরজা ছেড়ে আগুনের কাছে চলে গেছে। পুরো জায়গাটা জুড়ে তখন ছড়িয়ে পড়েছে হই হট্টগোল। যে যেভাবে পারছে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু আগুনের ধারে কাছে কেউ যেতে পারছে না।

আগুন এরপর কী করলো, তা দেখার সময় অ্যালেস্টরের নেই। তিনি এবার ঘরে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত। পায়াসের কক্ষে এক ঝটকায় প্রবেশ করলেন তিনি।

এই রাতের বেলা এই আওয়াজে যে কারো ঘুম ভেঙ্গে যাবার কথা। পায়াসকে জাগ্রত অবস্থাই পাবেন ভেবে আগেই বের করে রেখেছিলেন ছুরি। কিন্তু না, পায়াস ঘরে নেই। এদিক সেদিক তাকালেন তিনি চকিতে, না পায়াস কেন, ঘরে কেউই নেই। হিসেবে তো এমন ভুল হবার কথা নয়।

আচমকা কথাটা তার মাথায় আঘাত করলো। নাহ, কিছু একটা ঠিক নেই। এখন সবার প্রথমে নিজের পরিচয় বাঁচিয়ে সরে পড়তে হবে। আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে এলেই সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। তখন তার কীর্তি ধরা পরে যাবে।

ঘুরে ঘর থেকে বেরোতে যাবেন, এমন সময় দেখতে পেলেন দরজা আগলে রেখেছে পাঁচটা বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা। পাঁচ জন প্রহরী বর্শা বাগিয়ে ধরে রেখেছে তার দিকে। নিজের হাতের ছুরির দিকে তাকালেন তিনি। তিনি খুব বাজে অবস্থায় আছেন। ধরা পড়ে গেছেন ফাঁদে। আর এই ফাঁদ থেকে বেরোনো সম্ভব নয়।

আস্তে করে একটু পিছিয়ে এলেন তিনি। দরজা দিয়ে বর্শাধারীরাও ভেতরে চলে এলো। এই ঘর থেকে বেরোবার আর কোনো উপায় নেই। নিজেকে কলে পড়া ইঁদুরের মতো মনে হচ্ছে তার। আচমকা সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। একবার শেষ চেষ্টা করতেই হবে। এভাবে বন্দি হবার কোনো মানে হয় না।

গুপ্তঘাতকেরা কোনো বড়ো অস্ত্র বহন করে না। এক, তাদের দরকার হয় না, দুই, বড়ো অস্ত্র নিয়ে গুপ্ত চলাচল করা সম্ভব নয়। কিন্তু আজ অ্যালেস্টরের মনে হচ্ছে একটা বড়ো অস্ত্র সঙ্গে থাকলে অনেক ভালো হতো। তার পরিকল্পনা যে একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে এভাবে কেঁচে যাবে তা তিনি ভাবতেও পারেননি।

2024/01/15 18:09

তবে যা নেই তার চিন্তা বেশিক্ষণ করলেন না তিনি। হাতের ছোটো ছুরিটা কোমরে গুঁজে নিলেন। অনায়াসে হাতে উঠে এলো কোমরে গোঁজা অপেক্ষাকৃত বড়ো ছুরিটা।

একটা বড়ো দম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন উনি সামনে বর্শা বাগিয়ে দাঁড়ানো পাঁচ জনের ওপর। পাঁচ জন বর্শাধারী সেনার সাথে একটা ছুরি দিয়ে লড়াই করা হাস্যকর, কিন্তু তিনি যদি মহা অভিজাত অ্যালেস্টর হন তবে ভিন্ন কথা। ছোটো জায়গায় সেনাদের মাঝের দুরত্ব তিনি চোখের পলকে পেরিয়ে এলেন। সেই সাথে হাতের ছুরি ফাঁক করে দিলো দুজনের গলা। একজন চেষ্টা করেছিল সরে গিয়ে তাকে বর্শায় বিঁধে ফেলতে, কিন্তু গতিতে পারলো না। তার বুকে ছুরি ছুঁড়ে বিঁধিয়ে দিলেন তিনি। নিহত এক সেনার হাতের বর্শা কেড়ে নিয়ে বসিয়ে দিলেন আরেকজনের বুকে।

পাঁচ নম্বর সেনাই বুদ্ধিমানের মতো কাজ করলো। সে ছিল দরজার কাছে। রকমসকম দেখে ছিটকে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। তার ঠিক পেছনেই বেরিয়ে এলেন অ্যালেস্টর। বাইরে এসে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তার আশার পাল ছিঁড়ে গেল। কম করে হলেও পঞ্চাশ জন সৈন্য অবস্থান নিয়েছে দরজার বাইরে। ফাঁক গলে যাবার কোনো উপায় নেই।

সৈন্যরা আদেশের অপেক্ষা করছে। অ্যালেস্টর বুঝতে পারলেন, একবার সবাই চারিদিক থেকে বর্শা একবারে ছুঁড়লে তার আর বাঁচার উপায় থাকবে না। ওদের কিছু করার আগে তাকেই শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে। চোখের দৃষ্টিতে ঐ সেনা বলয়ের একটা দুর্বল জায়গা বেছে নিয়ে সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। তার হাতের ছুরি চলতে লাগলো বিদ্যুৎ চমকের মতো। কিছু সেনা ঐ জায়গায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো ক্ষণিকের জন্য। আচমকা পেছন থেকে নিজের পিঠ ফুঁড়ে একটা ধারালো ফলার প্রবেশ টের পেলেন অ্যালেস্টর। একটা তলোয়ার তার পেছন দিয়ে ঢুকে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। পেছনে ফেরার চেষ্টা করলেন তিনি কিন্তু সফল হলেন না। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেনারা একসাথে কয়েকজন নিজেদের বর্শা বিঁধিয়ে দিয়েছে অ্যালেস্টরের শরীরে। মুহূর্তে যেন মাংসে ছুরি দিয়ে বানানো কিমার মতো হয়ে গেল তার দেহ। নিথর হয়ে যখন তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তখনো তার গায়ে দুটো বর্শা বিঁধে আছে।

পায়াস এতক্ষণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। এবার বুঝতে পারলেন, সব মিটে গেছে। চলে এলেন তিনি ঘটনাস্থলে। নিকোলাস নিজের তলোয়ারের রক্ত মুছছে। অ্যালেস্টরের পিঠে তলোয়ারের আঘাত সেই করেছিল। পায়াস আসতেই সে তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে ফেললো, 'আপনার গুপ্তঘাতক মারা গেছে। আমি আমার কথা রেখেছি।'

2024/01/15 18:0

পায়াস তাকালেন পড়ে থাকা দেহটার দিকে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে দেহটা। চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। পায়াস এক সৈন্যকে ইশারা করলেন, শরীরটা উল্টে দিলো সে। তারপর একটা আলো নিয়ে আসতেই মুখটা স্পষ্ট দেখা গেল। পায়াস আর নিকোলাস দুজনেই হাঁ করে গেলেন সেই চেহারা দেখে।

এ তো ইভান নয়, ওরিয়ন নয়, এটা তো মহা অভিজাত অ্যালেস্টর।

পায়াস বললেন, 'আমি এটা কী দেখছি? মহা অভিজাত অ্যালেস্টর আমাকে হত্যা করার জন্য এসেছিলেন? কিন্তু, কেন? আমার সাথে তো তার কোনো শত্রুতা ছিল না।'

রাজনীতির সহজ নিয়মটা বলে দিলো নিকোলাস, 'ইনি আপনাকে কেন আক্রমণ করেছেন তা জানি না। তবে রাজা অথবা শাসকের ক্ষেত্রে আমি একটা কথা জানি, কৃষক যেমন শস্যের চাষ করে কিন্তু গুণে বলতে পারে না, কতগুলো শস্য ফলিয়েছে, তা গোণা অসম্ভব, তেমনি রাজাও তা প্রজাদের মধ্যে কে শত্রু আর কে মিত্র তা গুণে বের করতে পারেন না। নিশ্চয়ই কোনো না কোনোভাবে আপনি তার পথের কাঁটা হয়ে গিয়েছিলেন।'

নিকোলাস মরিসের দিকে তাকালো, 'আমাদের কতজন লোক এখন তৈরি আছে?'

'আমাদের মানে?'

'মানে আমাদের ব্যক্তিগত সেনা।'

'চল্লিশ জনের মতো।'

'তাতেই হবে। আমাদেরকে এখনই একবার অ্যালেস্টরের বাড়িতে যেতে হবে। আমি বড়ো একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি।' নিকোলাসের গলায় যেন রাজ্যের শঙ্কা ভর করেছে।

পায়াস নিজের মত দিলেন, 'আমিও কিছু সৈন্য আপনাদের সৈন্যের সাথে দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের সুবিধা হবে।'

পায়াসের সৈন্য অ্যালেস্টরের বাড়িতে গেলে অসুবিধা হবে, এটুকু বুঝতে পারছে নিকোলাস। সাবধানে এড়িয়ে গেল সে, 'আমার ওপর ভরসা রাখুন। এখানে যেনতেন গুপ্তঘাতক আসেনি, এসেছেন মহা অভিজাত অ্যালেস্টর। তার মানে আরও অনেকেই আপনার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকতে পারে। কোনো বিকল্প পরিকল্পনা করে অন্যভাবে এই প্রাসাদ আক্রমণ করতে পারে কেউ। এখন কোনোভাবেই আপনার এই প্রাসাদের সেনা সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া উচিত নয়। পূর্ণ শক্তি নিয়ে তৈরি থাকুন। ওদিকে সামলানোর জন্য আমার আর মরিসের সেনাই যথেষ্ট।'

পায়াসের রোমান সেনাপতিও সায় দিলেন, 'হ্যাঁ, আমাদের সব সেনা প্রাসাদেই থাকুক।' নিজের বল তিনিও কমাতে চাচ্ছেন না।

'ঠিক আছে। অ্যালেস্টরের প্রাসাদের দিকে তাহলে আপনারা সেনা নিয়ে যান। আমাকে সব খবর পাঠাতে থাকবেন।'

'অবশ্যই।' মরিসকে নিয়ে স্থান ত্যাগ করলো নিকোলাস। ঐ বাড়িতে এখন ইনোন আছে। আজ রাতে এরই মধ্যে ঘটে গেছে অনেক বড়ো ঘটনা। নিকোলাস ভাবছে। তার শ্বশুর তার হাতেই মারা গেছেন।

তবে তার মন বলছে এই রাতের ঘটনা সবে শুরু হয়েছে। ভোরের আগে আরও অনেক কিছুই ঘটবে।

রাজ প্রাসাদে আরামের কোনো অভাব নেই। তবে একটু কুণ্ঠিত হয়ে থাকতে হয় এই যা। রাহুর তাতে একটু সমস্যা হচ্ছে। সারা জীবন অবশ্য সে থেকেছে অন্যের আশ্রয়ে। তবে সাগরের বুকে আর নানা বন্দরে আশ্রয়ে থাকা আর এই প্রাসাদে থাকার মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে নিজের চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে হয় না। এখানে করতে হয়, হাঁটতে গেলেও আদব নিয়ে হাঁটতে হয়। রাজরাজড়াদের ব্যাপার। কখন পান থেকে চুন খসবে আর সাথে সাথে ঘাড়ের ওপর থেকে মাথাটাও খসে পড়বে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

নিজের ভাগের পাঁচশো মোহর নিয়েও তার একটু দ্বিধা আছে। মোহরগুলো এখনো হাতে পায়নি সে। যদিও জেইস তার ভাগ বুঝে পেয়ে চলে যাবার সময় বলে গেছে মোহর নিয়ে চিন্তা না করতে। এই প্রাসাদের কাজ শেষ হলে যখন সে বিদায় নেবে তখন তার হাতে মোহর দিয়ে দেওয়া হবে। এদের কাছে পাঁচশ-হাজার মোহর কোনো ব্যাপারই না। তবু পরহস্তে ধন থাকলে মানুষের মনে একটু দ্বিধা থেকেই যায়।

রাতের বেলা খাবার ভালোই এসেছে। প্রাসাদের দাসেরা জানে তার মর্যাদা। তারা খুব একটা যে তাকে সম্মান দিচ্ছে তা নয়, তবে যেটুকু দিচ্ছে তাতে রাহুর চলে যাচ্ছে। এরচেয়ে বেশি সে আশাও করে না। শুধু পেট ভরে খাবার পর একটু মদিরার অভাব অনুভব করে সে। এখানে মদিরার ছড়াছড়ি, কিন্তু তাকে কেউ আমন্ত্রণ জানাচ্ছে না। নিজের থেকে বলতে দ্বিধা হচ্ছে তার, তবু আগামীকাল বলার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

যে কাজের জন্য তাকে রাখা হয়েছে সেই কাজের কোনো খবর নেই। রাজকুমারী তার আর অঙ্গদের ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন। এজন্যই মনে হয় তাকে অঙ্গদের ব্যাপারে ডাকছেন না তিনি। সেদিকেও একটা ভয় থেকে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত যদি তাকে চোর অপবাদ দিয়ে দেয়? তখন মোহরের বদলে জুটবে প্যাদানি।

আকাশ পাতাল চিন্তা আর মদিরার অভাব দুটোই এই মাঝরাতেও রাহুকে জাগিয়ে রেখেছে। এমন সময় তার ঘরের দরজায় শব্দ হলো। দরজা বন্ধ করার ব্যাবস্থা নেই। ওকে বিছানায় রেখেই ঘরে ঢুকল তাকে রক্ষণাবেক্ষণকারী দাস। উঠে বসলো রাহু, 'কী হয়েছে?' রাহুর গলা সতর্ক।

'কুমারী নিক্স আপনাকে এখনই একবার চিড়িয়াখানায় যেতে বলেছেন।'

আকাশ থেকে পড়ে বিছানা থেকে নামলো রাহু। এই আবার কোন বিচিত্র খেয়াল। এই রাতের বেলা কী কাজে আবার তার ডাক পড়লো। শত চিন্তা করে এখন অবশ্য কোনো লাভ নেই। তাকে যেতেই হবে।

ঘর দেখে বেরিয়ে দাসের দেখা পাওয়া গেল না। ব্যাটা সংবাদ পৌঁছে দিয়েই ভেগেছে। এই বিশাল প্রাসাদের গলিঘুপচি সম্পর্কে গত কয়দিনে একটু অভিজ্ঞতা হয়েছে কিন্তু এখনো হাতের তালুয় আসেনি ব্যাপারটা। এখন থেকে চিড়িয়াখানা পর্যন্ত যেতে মাথাকে কসরত করতে হবে। একটু থেমে পথটা মনে করার চেষ্টা করলো সে। ঠিকমতো মনে না পড়লেও একটা আন্দাজ মতো হলো। তার ওপর ভিত্তি করেই পথ চলতে শুরু করলো সে।

কিছুক্ষণ চলার পরে মনে হতে লাগলো পথ ভুল করেছে সে। ওদিকে আরেকটা রাস্তা আছে, সেটা দিয়ে গেলেই মনে হয় ভালো হতো। পিছিয়ে গিয়ে সেই পথ ধরবে কি না সেটা ভাবতেই সামনের দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো। কতগুলো পায়ের শব্দ আর অস্ত্রের ঝনঝন এক সাথে শোনা গেল। ভীষণ ভয় পেয়ে গেল রাহু। এখানেও কি আবার বারিগাজার মতো কেউ আক্রমণ করলো না-কি। পালানোর সিদ্ধান্ত নিতে গিয়েও নিজের পাগল কৌতূহলের কাছে হেরে গেল সে। অবশ্য পালানোর রাস্তাও তার ঠিক জানা নেই। কোন জায়গা থেকে পালিয়ে কোন জায়গায় গিয়ে পড়তে হবে তার ঠিক নেই।

একটু এগিয়ে একটা গলি দিয়ে ঢুকে পড়লো সে। সামনে থেকেই আওয়াজটা আসছে। গলির ঠিক ওপর মাথায় গিয়েই দৃশ্যটা দেখতে পেলো সে। অনেকগুলো সৈন্য একজনকে ঘিরে ধরেছে। আর সেই যোদ্ধাও এই প্রাসাদের সেনাদের মতোই কাপড় পরা। সেই যোদ্ধা প্রচণ্ড লড়াই করছে।

একটা বড়ো ফুলদানির ওপর উঠে দাঁড়ালো রাহু। এমন যুদ্ধের দৃশ্য জীবনে দেখেনি সে। এতগুলো যোদ্ধার সামনেও ঐ যোদ্ধা একটু ভয় পাচ্ছে না, একটুও থমকে যাচ্ছে না। তবে সেই বীরত্বের ইতি হলো। একজন পেছন থেকে তলোয়ার বিঁধিয়ে দিলো যোদ্ধার পিঠে। একটু পরেই কয়েকটা বর্শা একবারে বিঁধিয়ে দেওয়া হলো সেই নিঃসঙ্গ যোদ্ধার শরীরে।

যুদ্ধের দৃশ্যটা শেষ হতেই নিজের উত্তেজনা কমাতে পারলো রাহু। এখন কারো চোখে পরে গেলে সর্বনাশ হবে। যেই গলি দিয়ে সে এই দৃশ্য দেখেছে সেখান দিয়েই আবার পিছিয়ে এলো সে। এবার আবার আন্দাজ করে চলল চিড়িয়াখানার দিকে। বড়ো বাঁচা বেঁচেছে সে। ঐ ঝামেলার মধ্যে গিয়ে পড়লে প্রাণহানিও হতে পারতো।

এবার আর চিড়িয়াখানায় পৌঁছাতে দেরি হলো না। সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে সে। নিক্স বেশ কিছুক্ষণ ধরে এখানে অপেক্ষা করছে। রাহুকে দেখে বলল, 'তোমাকে কতক্ষণ আগে খবর দিয়েছি। এত দেরি হলো কেন?'

রাহু নিজের পেটে কথাটা ধরে রাখতে পারছে না। এখানে দেওয়া মতো কোন অজুহাতও নেই, নিক্সের রূপ আর কটাক্ষের আক্রমণে নিজেকে অসহায় মনে হলো

তার, 'কুমারী, আমি আসছিলাম, কিন্তু প্রাসাদে একটা ঝামেলা হয়েছে। মনে হয় চোর ঢুকেছে।'

'চোর! আমাদের প্রাসাদে! কী সব উল্টোপাল্টা বকছো।'

'হ্যাঁ। সেই চোরের সাথে প্রাসাদের যোদ্ধাদের কি ভীষণ যুদ্ধ হলো। সেই যোদ্ধাও এই প্রাসাদের সেনাদের মতোই পোশাক পরে ছিল।'

'চোর কী করে যুদ্ধ করবে?' তখনই কুডাক ডেকে উঠলো নিক্সের মনের মধ্যে। বাবা কিছুদিন ধরেই একটু অন্যমনস্ক আছেন। নিকোলাস আর সেনাপতিও বেশ কয়েকদিন ধরে নানা কাজে ব্যস্ত। নিকোলাসের তো তার কাছে একটু আসারও সময় হয় না। সে নিজে আন্দাজ করছিল কোনো ঝামেলা হয়েছে, কিন্তু কেউ তাকে কিছু জানায়নি। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো সে, 'ঐ যোদ্ধার সাথে আমাদের সেনাদের কোথায় যুদ্ধ হয়েছে?'

'আমি তো পুরো প্রাসাদ ভালো করে চিনি না। তবে জায়গাটা প্রাসাদের মধ্য ভাগে। একটা বড়ো দরজা আছে, সামনে অনেকগুলো মশাল। সেখানেই লড়াই হয়েছে।'

এবার আরও শঙ্কিত হয়ে পড়লো নিক্স, 'আরে ওটা তো বাবার ঘর। চলো আমার সাথে।'

'কী হয়েছে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে বসলো রাহু। নিক্সের পেছন পেছন হাঁটছে সে।

'আরে বোকা ওটা চোর নয়, গুপ্তঘাতক। নিশ্চয়ই বাবার ওপর হামলা করতে এসেছে।' কাঁদতে কাঁদতে হাঁটা থেকে দৌড়াতে শুরু করলো নিক্স। রাহুকেও ছুটতে হলো তার পেছনে। একটা গলি পেরিয়ে মোড় নিতেই নিক্স আছড়ে পড়লো একজন শক্ত দেহের যুদ্ধ পোশাক পরা যুবকের বুকে। পড়ে যেতে যেতেও আটকে গেল সে। যুবক তাকে ধরে ফেলেছে।

নিকোলাস আর মরিস অ্যালেস্টরের প্রাসাদের দিকে রওনা দেবার জন্য প্রাসাদ থেকে বেরোচ্ছিল। এমন সময় নিকোলাসের বুকে আছড়ে পড়েছে নিক্স।

নিকোলাস বুকের মধ্যে শক্ত করে ধরে রেখেছে নিক্সকে, 'কী হয়েছে? আপনি এভাবে ছুটে কোথায় যাচ্ছেন?'

নিক্স নিকোলাসকে পেয়ে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না, তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো, 'আমার বাবার ঘরে না-কি হামলা হয়েছে। বাবার কিছু হয়েছে?'

'নাহ' নিকোলাস ওর পিঠে হাত বোলায়, ' হামলা করবে কে? কে বলেছে?'

নিক্স রাহুকে দেখিয়ে দেয়। মরিস তাকায় রাহুর দিকে, যেন দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দেবে তাকে। রাহু গুটিয়ে যায়।

নিকোলাসের সান্ত্বনা দেওয়া চলছে, 'নাহ কুমারী, আপনার বাবার ওপর হামলা হয়নি। আপনার বাবা ভালো আছেন। একটা গুপ্তচর ঢুকেছিল প্রাসাদে। ওকে আমাদের সেনারা মেরে ফেলেছে।'

'আমি বাবার কাছে যাবো। আমাকে নিয়ে চলুন।'

তাড়াতাড়ি প্রাসাদ থেকে বেরোতে হবে। সময় এখন অনেক মূল্যবান। নিকোলাস রাহুর দিকে তাকালো, 'মহামান্য পায়াস এখন নিজের ঘরেই আছেন। কুমারীকে সেখানে নিয়ে যাও। খবরদার, উল্টোপাল্টা আর কোনো কথা বলবে না।'

শেষের হুমকিটা রাহুকে কাঁপিয়ে দিলো। নিকোলাস নিজের বাহুমুক্ত করলো নিক্সকে, 'যান, আপনার বাবা আপনাকে দেখলে খুশি হবেন। আর দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আছি তো।'

নিক্স চোখ মুছে রাহুর সাথে বাবার ঘরের দিকে গেল। নিকোলাস আর মরিস এবার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো। সময় অনেকটা নষ্ট হয়েছে।

প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে সৈন্য অথবা আয়োজন কিছুই দেখতে পেলো না মরিস, অবাক হয়ে গেল সে, 'আমাদের সৈন্য সব কোথায় গেল?'

'জায়গা মতো চলে গেছে।' উত্তর দিলো নিকোলাস।

'জায়গা মতো মানে?'

'অ্যালেস্টরের প্রাসাদে।' ধীরে সুস্থে জবাব দিলো নিকোলাস, 'এখন আমরাও সেখানে যাবো।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরাই তো একটু আগে আবিষ্কার করলাম, অ্যালেস্টর এই সবকিছুর পেছনে আছে। তারপর তুমি তো আমার সাথেই বেরিয়ে এলে। তাহলে আমাদের সৈন্যরা কীভাবে আগে থেকে খবর পেয়ে অ্যালেস্টরের প্রাসাদে গেল?'

নিকোলাস হাঁটতে লাগলো, মরিসের কথার জবাব দিলো না। মরিস কিছুই বুঝতে পারছে না, 'আমরা হাঁটছি কেন? ঘোড়া নেবো না?'

'নাহ, আমাদের সৈন্যরাও ঘোড়া অথবা রথ কিছুই নেয়নি। এই রাতের বেলা এসব নিয়ে প্রধান সড়ক ধরে গেলে নগরের সবাই জেনে যাবে। এই কাজটা সবাইকে জানিয়ে করা যাবে না।'

মাথা নাড়লো মরিস, 'এই ব্যাপারটা না হয় বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমাদের সৈন্যরা আগে কীভাবে খবর পেয়েছে সেটা তো বুঝতে পারলাম না।'

'এখানে দাঁড়িয়ে তোমাকে সব বোঝাতে গেলে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। চলো, আমাদেরও যখন হেঁটে যেতে হবে, হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলি।'

দুজনে পথের অন্ধকারে এগিয়ে যায়। নিকোলাস ধীর স্বরে বলতে শুরু করে, 'শোনো, এই নগরের রাজনীতিতে তোমার এখনো অভিষেক হয়নি। এখন হবে।

যা বলছি মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এই জীবনের মতো তোমাকে আমি নিজের কাছে রাখবো বলেই এই কথাগুলো বলছি।'

মরিসের শোনার জন্য তর সয় না, 'আরে তাড়াতাড়ি বলো। তুমি এটা ভালো করেই জানো, আমি কিছুতেই তোমার সাথে বেঈমানি করবো না।'

'সেটা আমি ভালো করেই জানি। এই একটাই মনে হয় ভালো গুণ আছে তোমার।'

'আচ্ছা, এখন খোঁচা দেওয়া বন্ধ করে আসল কথা বলো।'

'আমি যখন প্রথম ইনোনকে দেখতে অ্যালেস্টরের বাড়িতে আমন্ত্রণ পাই তখন তুমি সুস্থ হয়ে ওঠোনি। আমি সেদিন একাই গিয়েছিলাম। ইনোনকে প্রথম বার দেখেই আমার বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। যে কারোই তাই হবে। ইনোন আমার সাথে সাক্ষাৎ সেরে উঠে চলে যেতেই আমি যেন ঘোরের বশে তার পিছু নেই। তাকে খুঁজে বেড়াই প্রতিটা গলিতে। তারপরে তাকে খুঁজে পাই প্রাসাদের ছাদে।

সেখানে ইনোনের দাসী থাকায় আমি ফিরে আসি। তারপর এক সপ্তাহ পুরো নিজেকে দুই নৌকায় রাখার চেষ্টা করে যাই। কিন্তু আমার বোধবুদ্ধি ফিরে এলো না। ছিল শুধু আবেগ। এখানে তোমাকে একটু ধন্যবাদ দিতে হবে। তুমিই এক সাথে দুজনকে আয়ত্তে রাখার কথা আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলে। আর তখনই আমি বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করা শুরু করি। আর উপায় আমার মাথায় এসে যায়।'

'কী উপায়?'

'মনে আছে তোমাকে বলেছিলাম, আমি ইনোনের পিছু নেবার জন্য অ্যালেস্টরের প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলাম। তখন আমি দোতলার ছাদে যাবার জন্য তার প্রশিক্ষণের প্রাঙ্গনের পাশ দিয়েই গিয়েছিলাম। তখন মাথা অন্যদিকে কাজ করছিল বলে ঐ প্রাঙ্গনে থাকা জিনিসগুলো পাত্তা দিইনি, কিন্তু সেদিন রাতে তোমার সাথে দেখা করার পর আমি বুঝতে পারি, সেদিন কী দেখেছিলাম।'

'কী দেখেছিলে?'

'একটা প্রাসাদের মানচিত্র। ছোটো করে বানিয়ে রাখা হয়েছে। ঐ প্রাসাদের আদলে বানানো হয়েছে কিছু দেওয়াল। আর গলি। সেই নকল করে বানানো জিনিস ছিল অ্যালেস্টরের প্রশিক্ষণ প্রাঙ্গনে।'

এবার বুঝতে পারে মরিস, 'তার মানে উনি কোনো জায়গায় হামলা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আর সেটা অবশ্যই গুপ্ত হামলা। আর ঐ হামলার জন্য বারবার চর্চা করছিলেন তিনি প্রশিক্ষণ প্রাঙ্গনে।'

'একদম ঠিক। প্রথমে ধরতে না পারলেও আমি পরে ব্যাপারটা ধরে ফেলি। আর সাথে সাথে খুঁজতে থাকি কার ঘরে তিনি গুপ্ত হামলা চালাবেন। আর সেটা মনে করতে গিয়েই হাতে যেন চাঁদ পেয়ে গেলাম। ঐ প্রাসাদের ছোটো আকারের নকশা মনে করে দেখলাম তিনি আসলে আক্রমণ করবেন পায়াসের প্রাসাদ। সাথে

সাথে বুদ্ধি মাথায় যেন কিলবিল করতে থাকে। কিন্তু তখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না।'

'কী সিদ্ধান্ত?'

'আমার কোন শ্বশুরকে হত্যা করবো, আর কাকে বাঁচিয়ে রাখবো। ভালো করে ভেবে দেখলাম পায়াস মরে গেলে অনেক ঝামেলা হতে পারে। তখন নিজের স্বামী হিসেবে ক্ষমতা আমার কাছে না এসে রোমানদের তরফ থেকে অন্য কেউ চলে আসতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম অ্যালেস্টরকেই মরতে হবে।

আমার স্মৃতি থেকে তুলে আনলাম ঐ প্রশিক্ষণ প্রাঙ্গনের সম্পূর্ণ ছবি। বুঝে গেলাম, ঠিক কোন জায়গা দিয়ে আক্রমণ করবেন অ্যালেস্টর, কোন গুপ্ত দরজা দিয়ে ঢুকবেন।'

'তারপর' চমকে উঠে হাঁটা বন্ধ করে দিয়েছে প্রায় মরিস।

'হাঁটতে থাকো। সিদ্ধান্ত নেয়া শেষ, বুদ্ধি কাজ করছে। এবার কর্ম সম্পাদনের পালা। প্রথমে একটা হুমকির চিঠি লিখলাম পায়াসকে উদ্দেশ্য করে। কৌশলে পৌঁছে দিলাম সেই চিঠি, সেই সাথে সন্দেহটা যাতে ইভান আর ওরিয়নের ওপর পড়ে সেই ব্যবস্থাও করলাম। জানতাম ঐ দুজনের নাম এলেই আমার ডাক পড়বে। অবশ্যই ভয় পেয়ে যাবেন পায়াস। এদিকে তার মেয়ের সাথে আমার বিয়ের কথা চলছে। আবার ইভান এবং ওরিয়ন আমার চেনা শত্রু। আমাকে ডেকে বসলেন তিনি। আমি তাকে নিরাপত্তা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলাম। এবং পুরো প্রসাদের নিরাপত্তার ভার নিজের হাতে নিলাম। তবে আমি তো জানি ঠিক কোন গুপ্ত জায়গা দিয়ে অ্যালেস্টর আক্রমণ করবেন। সেই দরজা আমি খোলা রেখে দিলাম। তবে সেখানে সেনা রেখে দিয়েছিলাম যাতে গোপনে থেকে অ্যালেস্টরকে ফাঁদে আটকে ফেলে।'

'কিন্তু ইনোনকে বিয়ে করতে গেলে কেন তাহলে?'

'এখানেও কৌশল আছে বন্ধু। শুরু থেকেই অ্যালেস্টর আর ঐ বৃদ্ধ অভিজাতের বিয়ের প্রস্তাবে একটু তাড়াহুড়া ছিল। শুরুতে বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, আসলে পায়াসের বাড়িতে আক্রমণ করা তো আর সহজ কাজ না। ঐ কঠিন কাজে নামার জন্যই আগে নিজের একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছেন অ্যালেস্টর। সোজা হিসেব, মেয়ের বিয়ে না হলে তিনি কাজে নামবেন না। আর তিনি কাজে না নামলে তো আর আমার পরিকল্পনা পুরো হয় না। তাই নিজেই বিয়ের জন্য মরিয়া হয়ে গেলাম তার কাছে। এবার তুমিও সাথে গেলে। ভাগ্যক্রমে আমি যে প্রস্তাব ওদের দিবো ভেবেছিলাম সেই প্রস্তাব ওরাই আমাকে দিয়ে বসলো। গোপনে বিয়ে করে ফেললাম ইনোনকে। এবার অ্যালেস্টরের সামনে আক্রমণ করতে আর কোনো বাঁধা থাকলো না। ইনোন তার বাড়িতে

থাকলেও তিনি এবার নিশ্চিত হলেন আমি ইনোনের কোনো ক্ষতি হতে দেবো না।'

পুরো ব্যাপারটা শুনে মুখ হাঁ হয়ে গেল মরিসের, 'তার মানে অ্যালেস্টর নিশ্চিন্ত হয়ে আক্রমণ করলেন আজ রাতে। আর সরাসরি গিয়ে পড়লেন তোমার পাতা ফাঁদে। মারা পড়লেন। কিন্তু তাতে তো তোমার কী লাভ হলো বুঝতে পারছি না। তুমি এখন ইনোনের স্বামী। এই কথা পায়াস জানতে পারলে তোমার তো সুবিধা হবার কথা না।'

'হ্যাঁ। পায়াসের এখন বিপদ কেটে গেছে। এখন তিনি আমার এই বিয়ের কথা শুনলে আমাকে হত্যা করবেন। তারই হত্যার চেষ্টাকারী ব্যক্তির মেয়েকে আমি বিয়ে করেছি, এটা তো হজম করার মতো কোনো কথা না। তাই তো এই কথা তার কানে তোলাই যাবে না।'

'মানে? সেদিন প্রাসাদে এতজন মানুষের সামনে তুমি বিয়ে করলে। অ্যালেস্টরের মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র তারা ইনোন আর তোমার বিয়ের কথা নগরে রাষ্ট্র করে দেবে।'

'তা জানি। সেটা যাতে না করতে পারে সেজন্যই তো আমরা এখন অ্যালেস্টরের প্রাসাদে যাচ্ছি। আমাদের সেনারা এতক্ষণে সেখানে পৌঁছে জায়গাটা পুরো ঘিরে ফেলেছে।'

এতক্ষণে নাটকের শেষ অংকটা বুঝতে পারলো মরিস, চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো তার, 'তার মানে?'

কথাটা শেষ করলো নিকোলাস, 'আজকে রাতে ঐ প্রাসাদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। শুধু ইনোনকে বাদে।'

'সেটা তো জানি' একটু পরে কী হবে তা চিন্তা করেই রক্তে নাচন শুরু হয়ে গেছে মরিসের, 'তার মানে শুরু থেকেই ইনোনকে তুমি নিজের বউ করে রাখতে চাওনি। ইচ্ছে ছিল নিজের রক্ষিতা করে রাখার।'

'হ্যাঁ। এই ছাড়া তো আর দুটো মেয়েকে এক সাথে পাবার আর কোনো উপায় নেই। তোমাকে আরেক বার ধন্যবাদ।'

মরিস একটু হাসে। দুজনের মধ্যে আর কোনো কথা হয় না। অন্ধকারে সবকিছু মিলিয়ে যায়। আঁধার যেন ক্রমশ হয়ে উঠতে থাকে আরও কালো।

মায়া সবকিছুতেই মিশে থাকে। বোঝা যায় না। মায়া প্রকাশ পায় কেবল ছেড়ে যাবার সময়। আজ যেমন ইনোনের কাছে এই ছোটোবেলা থেকে পরিচিত প্রাসাদের প্রতিটা কোণা মায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বিকেল থেকে অনুভূতিটা একেবারে সবকিছু ছাপিয়ে উঠছে। এখন তো আর কিছু করার নেই। পিছিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। সবচেয়ে বেশি মায়া লাগছে যার জন্য সে এখন এই প্রাসাদে নেই। বাবাকে ছেড়ে যেতে হবে এই চিন্তাতেই বিকেল থেকে তার গলার মধ্যে কিছু একটা যেন দলা পাকিয়ে উঠছে। অনুভূতিটা কিছুতেই যেন যাচ্ছে না। বিকেলের পরের এই সন্ধ্যাটা যেন আরও কয়েকগুণ বিষণ্ণতা নিয়ে হাজির হয়েছে।

ডোরা অবশ্য সেই সকাল থেকেই ব্যস্ত ছিল। ইভানকে খবর পাঠানো আর খবর নিয়ে আসার কাজে বেশ কিছু সময় ব্যয় হয়েছে। এখনো তার কাজ শেষ হয়নি। নানা জিনিস সবার অলক্ষ্যে গুছিয়ে রাখছে সে। এত কিছু কীভাবে নিয়ে যাবে সেসব নিয়ে কোনো চিন্তাই করেনি ইনোন। তবে ডোরার চিন্তা হচ্ছে, ঐ জঙ্গলে তো কিছুই পাওয়া যাবে না। ইনোন সেখানে কীভাবে থাকবে।

সন্ধ্যের পরে প্রাসাদের সবগুলো বাতি জ্বলে উঠলো। ইনোনের মাঝে এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করতে লাগলো। কীভাবে প্রাসাদ ছেড়ে পালাবে সেই চিন্তা তো ছিলই, ভয়ও আছে, বাবা নিশ্চয়ই ওকে খুঁজে বের করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। কিন্তু সেসব চিন্তা তো আগেই ছিল। এটা এক নতুন ধরনের অস্থিরতা। বুঝতে পারছে না সে।

এরই মধ্যে ডোরা একবার ওর ঘরে ঢুকলো, ভঙ্গিতে ব্যস্ততা। ইনোন ডেকে থামালো ওকে, 'তুই এত ছটফট করছিস কেন? সবাই তো তোর ভঙ্গি দেখেই সন্দেহ করবে।'

ডোরা উড়িয়ে দিলো ভাবনাটা, 'আরে না। কেউ কিছুই বুঝতে পারবে না। আমাকে ধরা এত সহজ নয়। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি সবকিছু প্রায় গুছিয়ে নিয়েছি। আর অল্প কিছু জিনিস বাকি আছে। আপনি কয়দিন নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন সেখানে।'

'কিন্তু এত কিছু আমরা নিয়ে যাবো কীভাবে? আমাদের সাথে তো রথ অথবা লোকজন কিছুই থাকবে না।'

'তাতে কী হয়েছে। এজন্য কি আপনি কষ্ট করবেন? ইভান নিশ্চয়ই একা আসবে না। কাউকে নিয়ে না আসুক অন্তত তার ঐ উজবুক বন্ধুটাকে তো নিয়ে আসবে। দুজনে মিলে জিনিসগুলো সহজেই নিতে পারবে। এই সামান্য কিছু

জিনিসের ভার যদি না বইতে পারে তাহলে ওরা কীসের প্রশিক্ষণ নিলো এত দিন ধরে।'

'তুই যেভাবে সামান্য জিনিস বলছিস, ব্যাপারটা তো তেমন নয়। সারাদিন ছোটাছুটি করে তুই তো কম জিনিস জোগাড় করিসনি। এখন আর কোথাও যেতে হবে না। এখানে একটু বসে থাক।'

'আচ্ছা বসলাম। আর কিছু জোগাড় করবো না। তবে যা গুছিয়েছি সেসব কিন্তু নিয়ে যেতেই হবে। নইলে আমি মনে শান্তি পাবো না।'

'সবচেয়ে ভালো হতো তোকে নিয়ে যেতে পারলে। কিন্তু আমার সাথে সাথে তো আর তোকেও বিপদে ফেলতে পারি না। আমার ঘরের সামনে তো রাতের বেলা পাহারা থাকবে। ওদের সরানোর কোনো বুদ্ধি বের করেছিস?'

বিয়ে হয়ে যাবার পরে ইনোনের ঘরের চারপাশে পাহারা বাড়িয়ে দিয়েছেন অ্যালেস্টর। প্রাসাদ ত্যাগ করার আগেও ইনোনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন সৈনিকদের। ওর কর্তব্য ভালোই পালন করছে। ডোরা তবু নিশ্চিন্ত, 'ঐ চিন্তা আপনি করবেন না। ওটা আমার চিন্তা। পাহারাদারদের কীভাবে সরানো যায় সেই চিন্তা আমি এরই মধ্যে করে ফেলেছি।'

'কীভাবে সরাবি?'

'যখন সময় হবে তখন আমি পাহারাদারদের বলবো, আমি প্রাসাদে কাউকে ঢুকতে দেখেছি। অপরিচিত। আমার কথা তারা কিছুতেই অবিশ্বাস করবে না। তখন সেই লোককে খুঁজতে যাবে সবাই। সেই সুযোগে আপনি ঐ গোপন দরজায় ঢুকে পড়বেন।'

'ভালোই বুদ্ধি। কিন্তু পরে আমাকে খুঁজে না পেলে তোকে তো সন্দেহ করতে পারে।'

হেসে উঠলো ডোরা, 'আরে আপনাকে খুঁজে না পেলে আমাকে খুঁজে পাবে কী করে?'

'মানে?'

ইনোনের প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই ডোরা উঠে দাঁড়ালো, 'আরে একটা কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। ওটা ব্যবস্থা করতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

ডোরা বেরিয়ে যায়। ইনোন আবার একা হয়ে যায়। এতক্ষণ ডোরার সাথে কথা বলে নিজের মনের চাপ একটু হলেও কমিয়ে রেখেছিল সে। কিন্তু এখন আবার পর্বত সমান শঙ্কার বোঝা চেপে বসতে শুরু করলো তার বুকের ওপর।

সময় কিন্তু থেমে থাকে না। ইনোনকে অনন্ত কালের অনুভূতি প্রদান করেও আস্তে আস্তে সে এগিয়ে চলে। রাতের খাবার নিয়ে আসে দাসী। কোনোমতে একটু খেয়ে রেখে দেয় ইনোন, ভেতরে কিছুই যাচ্ছে না। ডোরাও রাতের খাবার শেষ করে তার ঘরে আসে। রাতের প্রহরীরা যে যার জায়গায় অবস্থান নিয়ে নিয়েছে।

2024/01/15 18:11

ডোরা আসাতে বুকটা একটু হালকা হয়েছে ইনোনের, 'আর কতক্ষণ বাকি আছে?'

'বেশিক্ষণ না। সময় হলেই আমি কাজ শুরু করে দেবো।'

আজ একটু বেশিই ভয় লাগছে ইনোনের। ঐ গোপন জায়গা দিয়ে অনেকবার অভিসারে গেছে সে। কই, একদিনও তো ভয়ের অনুভূতি হয়নি। আজকে কেমন যেন লাগছে। বার বার মন বলছে সে একটা ভুল করতে যাচ্ছে, কোথাও কিছু একটা সর্বনাশের ধ্বনি যেন বেজে উঠছে কিন্তু বুঝতে পারছে না সে।

'আমার ভালো লাগছে না ডোরা।'

'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন কুমারী? নিশ্চয়ই রাতে ভালো করে খাওয়া দাওয়া করেননি। দাসী দেখলাম আপনার ঘরে খাবার যা নিয়ে এসেছিল, তাই আবার ফেরত নিয়ে গেছে।'

'খাবারের ব্যাপার না। আমার মন ভালো লাগছে না। বাবার কথা হঠাৎ করে খুব মনে পড়ছে।'

ডোরা ইনোনের মনের অবস্থা বুঝতে পারে, 'চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। একদিন হয়তো আপনি আবার বাবার সাথে দেখা করতে পারবেন।'

'সেদিন কি বাবা আমাকে ক্ষমা করবেন? আমি যে তার মান-সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দিতে যাচ্ছি।'

'এখন এসব চিন্তা করবেন না কুমারী। মন দুর্বল হয়ে যাবে। তিলে তিলে মরার চেয়ে মায়া কাটানোর চেষ্টা করাই উত্তম। এই যুদ্ধে আপনি দুই দিকেই জিততে পারবেন না। একদিক আপনাকে ত্যাগ করতেই হবে।'

ডোরা এসব কথাবার্তার মধ্যেও যথেষ্ট নজর রেখেছে সময়ের দিকে। ইনোনের ঘরের জানালা খোলা আছে। এখান দিয়ে চাঁদটা স্পষ্ট দেখা যায়। কিছুক্ষণ পর পর সেদিকে তাকাচ্ছে সে। ইভান চাঁদ একেবারে মাথার ওপরে উঠলেই চলে আসবে। দেরি করা যাবে না।

দুজনের এক সাথে মাথা গরম হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এটা ডোরা জানে। সে হেলট হয়েই জীবন কাটিয়েছে। ইনোনের থেকে তার ধৈর্য আর সহ্য দুটোই বেশি। সে নিজেও ভেতরের উত্তেজনাকে দমন করে রেখেছে। আর তাকিয়ে দেখছে চাঁদের এগিয়ে আসা।

অবশেষে চাঁদ চলে এলো কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে। উঠে দাঁড়ালো ডোরা, 'আমি এবার কাজ শুরু করবো। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি সবকিছু এরই মধ্যে এই গোপন জায়গা দিয়ে প্রাসাদের পেছনের জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনি ঘরের দরজায় সতর্ক হয়ে দাঁড়ান। প্রহরীরা সরে গেলেই কোন রকম শব্দ না করে বেরিয়ে যাবেন।'

ইনোন এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো ডোরাকে, 'আমার অনেক ভয় করছে ডোরা।'

ডোরা সান্ত্বনা দিলো, 'আপনি ভয় পাবেন না। আমি সব ঠিক করে রেখেছি। শীঘ্রই আপনার সাথে আমার দেখা হবে। আপনি যাবার পরে আমিও ঐ পথ ধরে আসছি। আবারো বলছি, কিছুতেই আপনি দ্বিধা করবেন না। প্রহরীরা সরে গেলেই ঘর থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়বেন গোপন দরজা দিয়ে।'

বেরিয়ে গেল ডোরা। দরজার ঠিক কাছে আড়ালে দাঁড়ালো ইনোন। পরিকল্পনাটা অনেক সরল হয়ে গেছে। এত সরল পরিকল্পনা কাজ করবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে তার এখন। যদি সব প্রহরী না সরে? যদি তা ঘরের সামনে দুজন থেকে বাকিরা ডোরার কথা মতো অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজতে যায়? মানুষের মনের দুশ্চিন্তার কোনো শেষ নেই। ঘাসের চেয়েও সংখ্যায় তা বেশি।

ডোরা বেরিয়ে এসে প্রহরীদের দিকে তাকাতে লাগলো। কোন প্রহরীকে নকল খবরটা দিলে কাজ হবে তা বুঝে নিতে চাইছে। পরিকল্পনা করা আর কাজ করা এক জিনিস নয়। এখন নিজের বুকের ভেতরের ধুকপুকটা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে যেন।

একজন প্রহরীকে নির্বাচন করলো সে। এগিয়ে গেল তার দিকে। ডোরাকে এগিয়ে আসতে দেখে একটু সোজা হয়ে দাঁড়ালো প্রহরী, 'কিছু বলবেন?'

ডোরার চোখেমুখে সন্ত্রস্ত ভাব। সাজিয়ে রাখা কথাগুলো বলতে যাবে এমন সময় হঠাৎ করে যেন রাতটা অতিরিক্ত নীরব হয়ে গেল। প্রাসাদের চারপাশের ঝি ঝি শব্দ, বাতাসের ধ্বনি, পাখিদের নড়াচড়া, পাতার শব্দ সব যেন আচমকা কোন এক ভোজবাজিতে আচমকা থেমে গেল। প্রহরীদের নজর এড়ালো না সেটা। ডোরার সামনে থেকে প্রহরী এগিয়ে গেল বারান্দার শেষ মাথায়। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। সারা জীবন এভাবে শরীর টানটান করে সতর্ক হয়েই পাহারা দিয়েছে সে। এখন সেই সতর্ক চিত্তে কিছু একটা ধরা পড়েছে। কিন্তু এই রাতের বেলা কারা আসবে এই প্রাসাদে? কার এত বড়ো সাহস?

ডোরা নিজেও বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা, নিজের কথা ভুলে সে জিজ্ঞেস করে বসলো, 'কী হয়েছে?'

ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপ করতে বলল প্রহরী, 'আস্তে কথা বলুন। আমি এমনটা এই প্রাসাদের পরিবেশে কখনো অনুভব করিনি। যতটুকু মনে হচ্ছে প্রাসাদের চারিদিকে নিশ্চয়ই মানুষ এসেছে। তাদের উপস্থিতি টের পেয়েই প্রকৃতি এমন শান্ত হয়ে গেছে। আপনি তাড়াতাড়ি কুমারীর ঘরে যান। সবকিছু পরীক্ষা করে দেখি আমরা। তারপর খবর দেবো।'

কী করতে এসে কী হয়ে যাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না ডোরা। প্রহরীর কথা মেনে নিয়ে ফিরে চলল সে। এখন এই অবস্থায় প্রহরীরা কিছুতেই কুমারীকে একা ছাড়বে না।

ডোরা সরে যেতেই এবার নিজের অবস্থান থেকে একটু সরে গেল প্রহরী। সদর দরজার দিকে তাকালো।

দুজন প্রহরী অনড় পাহারা দিচ্ছে সদর দরজা। কিছু প্রহরী হাঁটছে। না, তেমন কোন অস্বাভাবিকতা তো নজরে পড়ছে না। একটু পরেই অবশ্য নজরে পড়লো।

সদর দরজায় দাঁড়ানো দুই প্রহরী একজনকে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে দেখলো। দরজা থেকে এগিয়ে গেল সে, ' কে তুমি? এত রাতে এখানে কী কাজ?'

জবাব এলো তলোয়ারের খোঁচায়। সামনের জন এত বিদ্যুতের গতিতে মোলায়েম করে তলোয়ার চালিয়ে দিলো। নিজের প্রতিক্রিয়া দেখাতে আরেক প্রহরী এগিয়ে এলো বল্লম বাগিয়ে। কিন্তু, অন্ধকারের ভেতর থেকে উড়ে এলো দুটো বর্শা, দুটোই প্রহরীকে একেবারে এফোঁড়ওফোঁড় করে দিয়েছে।

বারান্দায় দাঁড়ানো প্রহরী দৃশ্যটা দেখল প্রবল আতঙ্ক নিয়ে, সাথে সাথে চিৎকার করে উঠলো, 'সবাই সতর্ক হও। প্রাসাদে হামলা হয়েছে।'

প্রাসাদের প্রত্যেক প্রহরী শুনতে পেয়েছে সেই আওয়াজ। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। দেওয়ালের ওপর দিয়ে, গাছ বেয়ে, সদর দরজা দিয়ে আক্রমণকারী সৈন্যরা প্রবেশ করছে প্রাসাদে। কাউকে কিছুই জিজ্ঞেস করছে না। সামরিক বেসামরিক যাকে পাচ্ছে তাকেই হত্যা করা হচ্ছে। কাল সকালে সবাই জেনে যাবে এরা সবাই বিদ্রোহী। এই গণহত্যার জন্য উল্টো নিকোলাসকে সবাই ধন্য ধন্য করবে। নিকোলাস এই আদেশ আগেই দিয়ে রেখেছিল। যাতে তার আর ইনোনের বিয়ের কথা যাতে কিছুতেই বাইরে প্রকাশ না হয়। ঐ পুরোহিত বৃদ্ধ অভিজাতের ব্যবস্থাও এতক্ষণে হয়ে গেছে।

কিছু গুপ্তচর চেয়ে নিয়েছিল সে পায়াসের কাছ থেকে। তাদেরকে কাজে লাগিয়ে অ্যালেস্টর আর তার সাথিদের খবর এতদিন সংগ্রহ করেছে। আজ সবার ভবলীলা সাঙ্গ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুপ্তচরদের নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে খুবই সাবধানে। তারা কেউই বুঝতে পারেনি, নিকোলাস অ্যালেস্টরের পরিকল্পনার কথা আগে থেকেই জানতো।

প্রথম প্রহরীকে হত্যা করেই নিকোলাস প্রাসাদের ভেতর প্রবেশ করেছিল। প্রাসাদে খুব বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করা যাবে না। এসব প্রাসাদের অনেক গোপন দরজা থাকে। কেউ এই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাক, এটা সে হতে দেবে না। অবশ্য অ্যালেস্টরের প্রাসাদের নকশাও সে জোগাড় করে নিয়েছিল। আন্দাজ করে

ফেলেছে কোথায় হতে পারে সেই গোপন দরজাগুলো। সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেওয়া আছে, কেউ কেউ ওগুলোর কিছু কিছু প্রথম সুযোগেই আটকে দেবে।

ইনোন আর ডোরার কানে বাইরের এই হইচইয়ের আওয়াজ বেশ ভালো করে ঢুকল। এমনিতেই নিজেদের আতঙ্কে আর পরিকল্পনা নষ্ট হবার চিন্তায় অস্থির ছিল তারা, এখন এই শোরগোলে প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে গেল দুজনে। একটু পরে ডোরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, ইনোন আছে তার পেছনে, 'কী হয়েছে ডোরা? প্রহরীরা সবাই কোথায় গেল? এত চেঁচামেচি কেন হচ্ছে?'

জবাবটা পাওয়া গেল বারান্দা দিয়ে প্রাসাদের সামনের প্রাঙ্গনে দৃষ্টি দেবার পরেই। প্রাঙ্গনে রীতিমতো যুদ্ধ চলছে। প্রাসাদের সেনারা প্রাণপণে চেষ্টা করছে কিন্তু পেরে উঠছে না। অস্ত্রের আঘাতে লুটিয়ে পড়ছে। ডোরা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'কেউ একজন আক্রমণ করেছে প্রাসাদ। যাকে পাচ্ছে তাকেই মেরে ফেলছে। আমাদেরকে পালাতে হবে।'

প্রাসাদের দাসদাসীদের চিৎকার এবার অন্দর থেকে শোনা যাচ্ছে। আক্রমণকারীরা সেখানে ঢুকে পড়েছে। বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না এসব আর্তচিৎকার ঐ দাসদাসীদের মরণ চিৎকার ছাড়া আর কিছু নয়। প্রবল আতঙ্ক ভর করলো ডোরার গলায়, 'আপনি তাড়াতাড়ি গোপন দরজাটা খুলুন। আমি ওদিকটা একবার দেখে আসি।'

ওকে থামালো ইনোন, 'ওদিকে এখন তোর যাবার দরকার নেই।'

'না, কুমারী, আমাকে যেতেই হবে। ভুলে যাবেন না আপনার বাবা আমাকে ওদের দায়িত্ব দিয়েছেন। ওদের দেখাশোনা করা আমার দায়িত্ব। ওদের খবর না নিয়ে আমি যাবো না। চিন্তা করবেন না। আপনি দরজাটা খুলুন। আমি চলে আসবো।'

ইনোন তাড়াতাড়ি চলে গেল দরজার কাছে। ডোরা বলে গেলেও দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে ইতস্তত করছে সে। এরই মধ্যে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হলো। ইনোন একবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে, আরেকবার পেছন দিকে তাকিয়ে ডোরা আসছে কিনা দেখছে।

ওদিকে ডোরা দাসদাসীদের থাকার জায়গার কাছে গিয়ে দেখল এক বীভৎস দৃশ্য। নিজের প্রাণ যেন গলায় চলে এলো তার। রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, কেউ যে এখানে আর বেঁচে নেই তা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যায়, তবু সেই নিথর শরীরগুলোতে তলোয়ার চালিয়ে যাচ্ছে সৈনিকেরা।

আচমকা প্রচণ্ড বাতাসের অভাব অনুভব করলো ডোরা। এই দৃশ্য তার শরীর মেনে নিতে পারলো না। শ্বাস নিতে অস্বীকার করলো ফুসফুস। প্রাণপণে বসে পড়ে জোরে শ্বাস টানলো সে। বেশ জোরে শব্দ করে উঠলো শ্বাস টানতে গিয়ে।

ওদিকে দাসদাসীদের ওপর নিজের তলোয়ার চালাচ্ছিল মরিস। নিকোলাস একপাশে দাঁড়িয়ে সবাই মরেছে কিনা পরীক্ষা করে দেখছিল। ডোরার শ্বাস টানার শব্দ দুজনের কানেই গেল। এদিকে তাকিয়েই ডোরাকে দেখতে পেলো ওরা। মরিসের চোখ জ্বলে উঠলো সাথে সাথে।

ডোরার চোখও বুঝতে পেরেছ ওদের দেখে ফেলা। সে সাথে সাথে বুঝতে পারলো, এক মুহূর্ত সময় এখানে নষ্ট করা যাবে না, এখান থেকে পালাতে হবে। সামনে দাঁড়ানো লোকটা যে ইনোনের স্বামী, এই চিন্তাও তার মাথায় এলো না। কেবল মাথায় ঘুরতে লাগলো, ইনোনকে বাঁচাতে হবে, সাথে নিজেকেও।

উঠে দাঁড়িয়ে ছুট দিলো সে। নিকোলাস আর মরিস পেছন পেছন ছুটল। ডোরা দুই প্রশিক্ষিত সৈনিকের সাথে পাল্লা দিতে পারলো না। তাদের মধ্যে দূরত্ব কমতে লাগলো দ্রুত। গোপন দরজার গলির মুখে আসতেই ইনোনের ওপর নজর পড়লো তার। সাথে সাথে চিৎকার করে উঠলো সে, 'কুমারী, আপনি পালান। তাড়াতাড়ি। দৌড়ান।'

ডোরার পেছনে প্রথমে কাউকে না দেখতে পেলেও একটু পরেই ছুটন্ত নিকোলাস আর মরিসকে দেখতে পেলো ইনোন। বিভীষিকার মতো ছুটে আসছে ওরা। ডোরা এবার প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আপনি পালান কুমারী। দাঁড়িয়ে থাকবেন না, আমি আপনার পেছনে পেছনে আসছি।'

এবার আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না ইনোন। দরজা দিয়ে অন্ধকার গোপন পথে হারিয়ে গেল। ইনোন গোপন রাস্তায় প্রবেশ করতেই একটু উদ্যম যেন ফিরে পেলো ডোরা। ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিলো সে। আরেকটু পেরোতে পারলেই সে পৌঁছে যাবে গোপন রাস্তার দরজার মুখে।

ছুটতে ছুটতে বাঁধা চুল খেলে গেছে ডোরার। শেষ পর্যন্ত সেই চুলই কাল হয়ে দাঁড়ালো। দরজা দিয়ে ঢুকতে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে মরিস নাগালে পেয়ে গেল ডোরার চুল। পেছন থেকে জোরালো মুষ্টির এক হ্যাঁচকা টানে ডোরা একেবারে চিত হয়ে পড়লো। প্রবল ব্যথায় প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠলো সে। মাথায় আর পিঠে প্রবল আঘাত লেগেছে।

মরিস তখনো তার চুল ছাড়েনি। চুল ধরে রেখেই নিকোলাসকে বলল, 'তোমার পাখি তো উড়ে গেল। পিছু নেবে না?'

'অবশ্যই। উড়ে আর কোথায় যাবে? কিন্তু তুমি এখানে বসে গেলে কেন? তাড়াতাড়ি এই মেয়ের একটা ব্যাবস্থা করে আমার সাথে চলো।'

'তুমি যে কী বল না। তোমাদের দুজনের একান্ত ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয়ই আমার ঢোকা উচিত হবে না। তেমনি তুমিও আমার ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ো না। প্রাসাদে আর একজনও জীবিত নেই। শুধু এই মেয়েটা ছাড়া। তোমার বিয়ের রাতেই এই মেয়েটার ওপর দৃষ্টি পড়েছিল আমার। তখন থেকেই সারা

শরীর যেন চিড়বিড় করছে। সুযোগ তো পেয়েই গেছি। আমি ওর ব্যবস্থা করছি। ভেবো না। মৃত্যুর আগে ওকে একটু সুখের সময় উপহার দেবো শুধু।'

নিকোলাস বুঝতে পারলো মরিস এখন কিছুই বুঝতে চাইবে না। ওকে বোঝানোর সময়ও নেই। ইনোন ওদিকে কোথায় যাচ্ছে সেটা সে জানে না। ইনোনকে ধরতে হবে। দরজা দিয়ে প্রবেশের আগে সে কেবল বলল, 'যাই করো, বেঁচে যাতে না থাকে।'

ভেতরে ঢুকে পড়লো নিকোলাস। ডোরাকে এক ঝটকায় নিজের কোলে তুলে নিলো মরিস। কাছে যে ঘরটা পেলো সেটার ভেতরে ঢুকে বিছানায় ফেলে দিলো ডোরার অর্ধচেতন দেহ।

মশাল জ্বালানোর সময় পায়নি ইনোন। অন্ধকারে আন্দাজ করে হাতড়ে তাকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। ডোরা প্রবেশ করতে পেরেছে কি না জানা নেই। ভীষণ বিপদে ডোরাকে রেখে পালাতে তার ইচ্ছে করছে না, তবে এখন আর উপায় নেই। সে গিয়েও ঐ যোদ্ধাদের হাত থেকে ডোরাকে বাঁচাতে পারবে না।

তারপরও মাঝে মাঝে একটু থেমে পেছনে কান পেতে ডোরার পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু পেলো না, তার বদলে কানে ভেসে এলো জুতো পরা ভারী পায়ের শব্দ, তার দিকেই এগিয়ে আসছে। ডোরা খালি পায়ে ছিল, এই শব্দ কিছুতেই তার পায়ের না। তার মানে ডোরা ধরা পড়েছে, আর দরজাটা বন্ধ করারও সময় পায়নি।

ইনোনকে আচমকা তীব্র আতঙ্ক গ্রাস করলো এই অন্ধকার গহ্বরে। শ্বাস টানতে যেন রীতিমতো কষ্ট হতে লাগলো তার। আজকে রাতে তার উত্তেজনা চরমে ছিল, কিন্তু আচমকা কী থেকে কী হয়ে গেল কিছুই বোঝা গেল না। প্রাসাদের সবার কী অবস্থা কিছুই জানা নেই, এভাবে তো সে পালাতে চায়নি। এই নগরে তাদের প্রাসাদ কে আক্রমণ করবে? বসে পড়লো ইনোন। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

তখনই পথের প্রান্তের দিকে একটা আলো নজরে পড়লো তার। মোটামুটি বেগে তার দিকেই এগিয়ে আসছে সে আলো। যে তার খোঁজে এই পথে ঢুকেছে সে আলো জ্বেলে ফেলেছে। এখানে বসে থাকলে নিশ্চিত মৃত্যু। এই চিন্তাতেই এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো ইনোন। তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরোতে হবে। যদিও ইভানের এখনো আসার সময় হয়নি, তবু ইভান আসা পর্যন্ত যদি লুকিয়ে থাকা যায়, তবে হয়তো বেঁচে যেতে পারবে। ইভান এলে ডোরাকে উদ্ধারের একটা উপায়ও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে।

আশা সঞ্চারিত হলো ইনোনের মনে। পেছনের আলোর হালকা আভা এখন এই সুরঙ্গে ভালোই ছড়িয়ে পড়েছে। ইনোন দেওয়াল ঘেঁসে ছুটছে। আর একটু পরেই বেরিয়ে যেতে পারবে এখান থেকে।

তবে এখানেই একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। ছুটতে গিয়ে ইনোনের পাও শব্দ করে ফেলেছে। পেছনে মশাল হাতে আসতে থাকা নিকোলাসের কানে সেই শব্দ সহজেই ধরা পড়লো। একটা মুচকি হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে। শিকার তার খুব বেশি সামনে নেই। সামনে শিকারের অবস্থান একটু খোলাসা হতেই নিকোলাসের গতি বেড়ে গেল। ইনোনের সাথে তার দূরত্ব কমতে লাগলো ক্রমশ।

তবে দূরত্ব কমলেও ইনোন যতক্ষণে সুরঙ্গের অপাশের দরজা দিয়ে গোপন প্রাঙ্গনে বেরিয়ে এলো তখনো দূরত্ব শূন্য হয়ে যায়নি। ইনোন বাইরে এসেই

দরজাটা লাগিয়ে দিলো। তবে এতে নিশ্চিত হবার উপায় নেই। দরজা ওপাশ থেকে একটু চেষ্টা করলেই খোলা যাবে। তাকে লুকিয়ে পড়তে হবে। এই প্রাঙ্গনে আগে অনেকবার এসেছে সে। সে জানে, কোথায় লুকালে বেশিক্ষণ শিকারির চোখের আড়ালে থাকা যাবে।

মশাল হাতে সুরঙ্গের একেবারে শেষ মাথায় এসে উপস্থিত হলো নিকোলাস। এখানে দরজা বন্ধ। নিশ্চয়ই ইনোন বেরিয়ে যাবার সময় বন্ধ করে দিয়েছে। ভেতর থেকে দরজা খোলার ব্যবস্থা থাকার কথা। একটু খুঁজতেই সেই হাতলটা হাতে লাগলো তার। শক্ত করে একটা চাপ দিতেই দরজা আবার নড়ে উঠলো।

দরজা খুলে যেতেই বাইরে বেরিয়ে এলো নিকোলাস। এতক্ষণ এই সুরঙ্গের ভেতরের দম বন্ধ করা পরিবেশ থেকে খোলা বাতাসে এসে দাঁড়িয়েছে সে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো সে। একবার দেখেই বুঝতে পারলো এই জায়গা উঁচু দেওয়ালে ঘেরা। এখান থেকে বেরোবার কোনো রাস্তা নেই। বেরোতে হলে দেওয়াল টপকাতে হবে। ইনোন তেমন কিছু করেছে কি না দেখতে হবে।

ইনোন ওদিকে অন্ধকারে এক জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে পড়েছে। ইনোনের পদের চিহ্ন একটু একটু করে নজরে আসছে নিকোলাসের। এইতো একটা ছোটো কোমল খালি পায়ের ছাপ পড়েছে জমে থাকা বালুর ওপর। একটু পড়ে ঘাস একটু বুজে আছে। নিকোলাস হালকা গলায় বলল, 'ইনোন, আমি জানি, তুমি এখানেই আছো। তোমার কোনো ভয় নেই। আমি তোমার স্বামী। তোমার কোন ক্ষতি আমি করবো না। বেরিয়ে এসো। আমি তোমাকে নিয়ে আমার প্রাসাদে ফিরে যাবো।'

নিকোলাসের হালকা গলার কথাগুলো ইনোনের কানে স্পষ্ট ভাবেই এসেছে। সে যেন একেবারে কাঠ হয়ে গেল। এই লোককে বিশ্বাস করার কোনো কারণই নেই। নিশ্চিতভাবেই তাদের প্রাসাদে ঘটে যাওয়া রোমহর্ষক ঘটনার সাথে এই লোকের যোগসূত্র আছে।

নিকোলাস তাকে খুঁজেই চলেছে, সাথে কথা বলে যাচ্ছে, 'আমি এখনো রেগে যাইনি। জানি তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। ভুল বুঝে ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছ। বেরিয়ে এসো। নইলে আরেকটু পড়ে কিন্তু আমি রেগে যাবো। তখন কিন্তু তোমাকে একটু শাস্তি পেতে হবে।'

এখানে অনেক পুরানো একটা রথ রাখা আছে। একটা চাকা না থাকার কারণে সেই রথ একদিকে হেলে পড়ে আছে। রথের চাকা আর দেহের খাঁজের মধ্যে লুকিয়ে আছে ইনোন। নিজের অজান্তেই কাঁপছে থরথর করে। আতঙ্কিত চোখে দেখতে পাচ্ছে, নিকোলাস এদিক সেদিক দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তার দিকে। মুখ তুলে তাকালো সে চাঁদের দিকে, কিন্তু না, চাঁদ এখনো মাথার ওপরে পুরোপুরি উঠে আসেনি। ইভানের আসতে এখনো দেরি আছে।

ততক্ষণ টিকে থাকতে হবে। ওদিকে ডোরার অবস্থা চিন্তা করেও আতঙ্ক ক্ষণে ক্ষণে বেড়েই চলেছে।

নিকোলাস ইনোনকে খুঁজতে কোনো তাড়াহুড়া করছে না। সে কেবল নিয়ম মেনে কাজ করে চলেছে। প্রশিক্ষণের সময় এভাবে লুকানো সেনা খুঁজে বের করার অনেক কৌশল শেখানো হয়েছে তাদেরকে। প্রথমেই জায়গাটা ভালো করে দেখে নিয়েছে সে। এবার কেবল বৃত্তটা ছোটো করে আনলেই কাঙ্ক্ষিত ফল মিলে যাবে।

মশালের আলোয় দেখতে দেখতে দৃঢ় পদক্ষেপে বৃত্তটা ছোটো করে আনছে নিকোলাস। আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে ইনোনের দিকে। দম বন্ধ করে রাখতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে ইনোনের। ভালো মতোই বুঝতে পারছে, এভাবে এখানে লুকিয়ে থেকে লাভ নেই, ধরা পড়ে যেতে হবে। বাঁচতে চাইলে জায়গাটা বদলে ফেলতে হবে। নিকোলাস ওদিকে আরেকটু এগিয়ে এসেছে।

নিজের জায়গা থেকে আলগোছে বেরিয়ে এলো ইনোন। অন্ধকারে গা ঢেকে ছুটল অন্য একটা আড়ালের দিকে। এই সময়েরই অপেক্ষায় ছিল নিকোলাস। তাদেরকে প্রশিক্ষণে যা শেখানো হয়েছিল তা শতভাগ কার্যকরী। এভাবে খুঁজতে থাকলে প্রায় সব সময় পলাতককে খুঁজে বের করার দরকার পড়ে না, সে একসময় নিজের বিপদ বুঝতে পেরে আতঙ্কে লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে। ইনোনও আতঙ্কে বেরিয়ে এসেছে তার লুকানো জায়গা থেকে। আর বেরিয়েই ধরা পড়েছে নিকোলাসের সতর্ক চোখে।

নিকোলাস যে তাকে দেখে ফেলেছে এটা বুঝতে ইনোনের খুব বেশি সময় লাগলো না। সে অন্ধকারে গা ঢাকার চিন্তা না করে এবার প্রাঙ্গনের অন্য পাশের দিকে ছুট দিলো। পালানোর জন্য আগে থেকেই আঁটসাঁট পোশাক পরে ছিল সে। ছুটতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তবে পেছনে পেছনে নিকোলাসও ছুটে আসছে। ইনোন কিছুক্ষণ ইতস্তত ছুটল। এই প্রাঙ্গন থেকে বেরোনোর পথ নেই। একমাত্র দেওয়াল টপকাতে পারলে একটা উপায় হবে। একটা জায়গা আছে যেখান দিয়ে এই দেওয়াল টপকানো যাবে। সেদিকেই ছুটল এবার ইনোন।

পেছনে ছুটে আসছে নিকোলাস। সামনে যে ছুটে যায় সে সবসময় যে ভুলটা করে তাই করতে লাগলো ইনোন। মাঝে মাঝেই পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে সে। তা করতে গিয়েই অন্ধকার সয়ে আসা চোখে সামনের একটা বাঁধা চোখে পড়লো না তার। পা বেঁধে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়লো ইনোন। পতনের তোড়ে এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো পৃথিবী যেন অন্ধকার হয়ে আসছে, বুজে আসছে তার চোখ।

তবে শেষ পর্যন্ত ইনোন অজ্ঞান হলো না। কোনমতে উঠে বসতে পারলো। কিন্তু তারপরই সামনে যা দেখল তাতে মনে হলো বোধহয় অজ্ঞান হলেই ভালো হতো। তার ঠিক সামনেই বসে আছে নিকোলাস। মশালটা মাটিতে যত্ন করে

গেঁথে রেখেছে সে। এতক্ষণের দৌড়ঝাঁপের কোনো চিহ্ন নেই তার চোখেমুখে। কৌতুক মাখা হাসি মুখে তাকিয়ে আছে সে ইনোনের দিকে।

পালানোর আর উপায় নেই, এবার নিকোলাসের দিকে তাকিয়ে ক্রোধে চিৎকার করে উঠলো ইনোন, 'কোন সাহসে তুমি এসব করছো? বাবা তোমার সাথে কী করবেন তুমি জানো না? তোমার মৃতদেহ দেখে শিয়াল কুকুরও আঁতকে উঠবে।'

নিকোলাস মৃদু মাথা নাড়ল, 'তোমার বাবার চিন্তা তোমার করতে হবে না। সেটা আমি দেখবো। আমাদের তো বিয়ে হয়ে গেছে। আর জানোই তো, বিয়ের পরে মেয়েদের জন্য বাবা না, স্বামীই প্রধান। তুমি এখন আমার সাথে চলো। আজকে আমাদের প্রথম রাত হবে। উদযাপনের সব ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।'

'তোমার এত বড়ো সাহস' ক্রোধের আধিক্যে নিজের অবস্থান ভুলে গেল ইনোন, আঘাত করতে উদ্যত হলো নিকোলাসের মুখে।

ইনোনের হাত ধরে ফেলতে তেমন কষ্ট হলো না নিকোলাসের। সাথে সাথে সে সিদ্ধান্ত নিলো, যদিও এই মেয়েটার প্রতি তার একটা কোমল অনুভূতি কাজ করে তবু এখন একটু শক্ত হতে হবে। নয়তো মেয়েটা তার আনুগত্য স্বীকার করবে না। সিদ্ধান্ত নিতেই ইনোনের চুল মুঠো করে ধরলো সে। পেছনে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ইনোনকে চিত করে ফেললো সে। ইনোনের পিঠ মাটি স্পর্শ করলো না। ভূমি থেকে বিঘত খানেক উপরে তাকে ঝুলিয়ে রাখলো নিকোলাস।

আতঙ্কে আর ব্যথায় চোখ বড়োবড়ো হয়ে গেছে ইনোনের। সামনে যে আছে সে যে এক মূর্তিমান শয়তান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাকে মনে হয় মেরে ফেলবে। মৃত্যুর তীব্র আতঙ্ক এসে ভর করলো ইনোনের চোখেমুখে। মৃত্যুর এই সময়েও দুজন মানুষের জন্য মনটা কেমন যেন করে উঠলো তার। ইভান আর বাবার কথা এক সাথে মনে পড়ছে।

ইনোনকে শারীরিক শাস্তি দেবার ইচ্ছে ছিল নিকোলাসের। কিন্তু, ইনোনের এই বিস্ফোরিত চোখ আর মশালের কাঁপা আলোয় রাতের নির্জনতায় যুবতীর সম্মুখ অঙ্গের মুহুর্মুহু কাঁপন দেখে ইচ্ছে বদলে গেল তার। শাস্তি তো অন্য ভাবেও দেওয়া যায়।

ইনোন দেখতে পেলো নিকোলাস তার দিকে ঝুঁকে আসছে। একটা হাত ধরে রেখেছে তার চুল, আরেকটা হাত বিশ্রী ভাবে রাখা আছে তার কোমল গালে। নিকোলাসের ঠোঁট দ্বয় এগিয়ে আসছে তার মুখের দিকে। নিকোলাসের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে সে। প্রাণপণে নড়তে চেষ্টা করছে, কিন্তু নিকোলাসের হাতের চাপে একটুও নড়তে পারছে না।

নিকোলাস নিজের মধ্যে প্রবল কাম অনুভব করছে। তার আপাত সুন্দর মুখটা কাম তাড়নায় যেন ধারণ করেছে শৃগাল মুখশ্রী। শুকনো ঠোঁট একটু ভিজিয়ে নিলো সে, স্ফুরিত হয়ে উঠলো দুটো অংশ বিশ্রীভাবে।

ঠিক সে সময় নিজের চুলে হ্যাঁচকা একটা টান অনুভব করলো নিকোলাস। এই জায়গায় কে আসতে পারে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। কারোই আসার কথা নয়। কিন্তু সেই শক্তিশালী হাতের টান তাকে দাঁড় করিয়ে ফেললো। পরক্ষণেই নিজের মুখে সেই হাতের একটা জোরালো আঘাত অনুভব করলো সে। কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়লো তার শরীর।

আচমকা মুক্তি পেয়ে নিজের ভাগ্যকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ইনোন। সে আর নিকোলাস একই সাথে আগন্তুককে দেখতে পেলো। আগন্তুক তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নিকোলাসের দিকে।

সামনে ইভানকে দেখতে পেয়ে নিকোলাস বিশ্বাস করতে পারলো না। ইনোন ইভানকে আশা করেছিল, সে কেবল একবার ঢুকরে কেঁদে উঠলো। নিকোলাস মাথা ঝাঁকিয়ে আবার তাকালো, 'তুমি এখানে কী করছো?'

'সেটা তোমার না ভাবলেও চলবে। লড়াই করো, নয়তো বিনা লড়াইয়ে মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।' ইনোনের সাথে যে অবস্থায় ইভান নিকোলাসকে দেখেছে তাতে তার মাথায় এখন আগুন জ্বলছে। নিকোলাসের রক্ত ছাড়া সে এখন আর কিছুই ভাবতে পারছে না।

নিকোলাস কিছুই বুঝতে পারছে না, তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারছে ইনোন আর ইভানের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। আর ইভান সেই সূত্রেই এখানে এসেছে। ইভানের দিকে ইনোন যেভাবে তাকিয়ে আছে তাতেই সব বোঝা যাচ্ছে। নিজের হাতের গ্রাস কেউ এসে শেষ সময়ে নিয়ে যাবে, এটা মেনে নেয়া বেশ কষ্টের। নিকোলাসও মেনে নিতে পারলো না। উঠে দাঁড়িয়ে সে আক্রমণ করলো ইভানকে। আর তখনই তার নজরে পড়লো ইভান একা নয়। তার সাথে আছে ওরিয়ন।

ইভান এগিয়ে এলো দৃঢ় ভঙ্গিতে। নিকোলাসের আঘাত এড়িয়ে গিয়ে কাঁধের জোরালো আঘাত করলো নিকোলাসের বুকে। নিকোলাসের বুক ফাঁকা করে সবটুকু বাতাস যেন বেরিয়ে গেল। বিন্দুমাত্র সুযোগ প্রতিপক্ষকে দিলো না ইভান। মুখে জোরালো ঘুসি বসিয়ে দিলো দুটো।

পুরো শরীর যেন টলে উঠলো নিকোলাসের। নিজের হাতের গ্রাস চলে যাবার চিন্তা মন থেকে দূর হয়ে নিজের প্রাণ চলে যাবার চিন্তা সেখানে স্থান নিলো তার। ইভান কী করতে পারে তা সে বেশ ভালো করেই জানে। ইভানের মাথায় খুন চেপেছে, আর তাকে মেরেই এই চিন্তা দূর হবে। আর দুয়েকটা জোরালো আঘাত

শরীরে লাগলে এখান থেকে পালানোর আশাও দূর হয়ে যাবে। এখনই সময় পালিয়ে যাবার।

ইভানের দিকে না গিয়ে ঘুরে দেওয়ালের দিকে ছুট দিলো সে। এক লাফে উঠে গেল দেওয়ালের ওপর। ওপাশে লাফিয়ে পড়লো কোনো রকম চিন্তা না করেই।

নিকোলাসকে পালাতে দেখে ইভানের রাগ আরও বেড়ে গেছে। সেও পেছনে ধাওয়া করতে উদ্যত হলো, কিন্তু থামতে হলো ইনোনের হাতের টানে, 'থামো। এখন ওদিকে যাবার সময় নয়। প্রাসাদের ভেতরে ডোরা ভীষণ বিপদে আছে। ওকে বাঁচাতে হবে।'

ডোরার কথা শুনে এবার এগিয়ে এলো ওরিয়ন, 'কী বলছো তুমি! তোমাদের প্রাসাদে কী হয়েছে?'

'প্রাসাদে হঠাৎ করে আক্রমণ করেছে সেনারা। কোথেকে এসেছে ওরা আমি জানি না। তাদের মধ্যে এই নিকোলাসও ছিল। তাদের হাতেই ধরা পড়েছে ডোরা, আমি গোপন দরজা দিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এখানে চলে এসেছি, কিন্তু ডোরা আসতে পারেনি।'

এই কথা শোনার পর ইভান আর নিকোলাসের পেছনে গেল না। পড়ে থাকা মশালটা তুলে নিয়ে আবার গোপন পথে প্রবেশ করলো ওরা তিনজন। সবার সামনে মশাল হাতে আছে ওরিয়ন। সে রীতিমতো ছুটছে।

আলো হাতে এই পথ পেরোতে খুব বেশি সময় লাগলো না। দরজা খুলে আবার প্রাসাদে প্রবেশ করলো ইনোন। সামনে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। ডোরার খোঁজে এদিকওদিক তাকাতে লাগলো তিনজনে। প্রত্যেকটা ঘরেই ঢুকতে লাগলো ওরা। পাগলের মতো খুঁজে চলেছে কাঙ্ক্ষিত অবয়ব।

ডোরার দেখা প্রথমে পেলো ওরিয়ন। কামরায় ঢুকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে আবার বেরিয়ে এলো। বিছানার ওপরে পড়ে আছে ডোরার রক্তাক্ত দেহটা। সম্পূর্ণ উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, কোমরের নিচে যদিও কাপড়ের লেশ অবশিষ্ট আছে, তবু দেহটা সম্পূর্ণ অনাবৃতই বলা যায়। বিছানার শুভ্র চাদর রক্তে লাল হয়েছে, রক্তের উৎস যে ডোরারই দেহ তা আর কাউকে বলতে হবে না।

ওরিয়নের চেহারা দেখে ইভান যা বোঝার বুঝে গেল। সে প্রবেশ করতে চাইলো কামরায়, ওরিয়ন বিস্ফোরিত চোখে ওকে থামালো, 'তুমি যেও না। ইনোন যাক।'

দেওয়াল ঘেঁসে বসে পড়লো ওরিয়ন, ইভানও বসে পড়েছে তার সাথে। ইনোন প্রবেশ করলো ঘরে, সাথে সাথে আর্তনাদ করে উঠলো। ছুটে গেল ডোরার মাথার কাছে। অচেতন দেহটায় সাড়ের বিন্দুও অবশিষ্ট নেই। সেই অসাড় শরীরের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলো ইনোন। ডোরার নাম ধরে ডাকছে সে, প্রবল

ভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, কিন্তু ডোরা অনড়। কামরায় একটা জলের কুঁজো খুঁজে পেয়ে জল ছিটিয়ে দিলো সে ডোরার চোখেমুখে। একটু যেন নড়ে উঠলো ডোরার মাথা। কী যেন বলে উঠলো সে।

এক টানে জানালার পর্দা দিয়ে ডোরার দেহটা ঢেকে দিলো ইনোন। ওদেরকে ডাকলো ঠিক তার পরেই, 'এই, তোমরা ভেতরে এসো। ডোরা এখনো বেঁচে আছে।'

ইনোনের আর্তস্বরে সাড়া দিলো ওরা, তড়িৎ গতিতে প্রবেশ করলো ঘরে। ডোরার গায়ের ওপর কাপড় চাপা দেখতে পেয়ে একটু যেন স্বস্তি পেলো ওরিয়ন, সেই গিয়ে বসলো ডোরার মাথার পাশে, ডোরার মাথাটা টেনে নিলো নিজের কোলে, 'আমি এসেছি ডোরা। তোমার আর কোনো ভয় নেই। আমি তোমার কোনো ক্ষতি হতে দেবো না। তুমি সুস্থ হয়ে যাবে।'

ওরিয়নের স্পর্শ বুঝতে পারলো ডোরা, ওর গলার স্বরও হয়তো খানিকটা প্রবেশ করলো তার কানে। একটু নড়ে উঠলো তার ঠোঁট, ' আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি মনে হয় বাঁচবো না। তোমরা কুমারী ইনোনকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাও। এখানে থাকলে ওরা সবাইকে মেরে ফেলবে।'

ইনোন আর ইভান এই কথাগুলো শুনতে পেলো না। ওরিয়ন কানটা ডোরার একেবারে মুখের সামনে নিয়ে শুনেছে। এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার চোখ থেকে, 'কারা তোমার এই অবস্থা করেছে? কারা আক্রমণ করেছে এই প্রাসাদ?'

এই কথার জবাব দিলো ইনোন, 'নিকোলাস আর তার সৈন্যরা আক্রমণ করেছে আমাদের প্রাসাদ। নিকোলাস আমার পেছনে গুপ্ত পথে ধাওয়া করেছিল। ওরা তখন অন্য সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে।'

ডোরা কিছু একটা বলতে চাচ্ছে দেখে আবার ওরিয়ন কান নামালো, 'নিকোলাসের সাথে যেদিন ইনোনের বিয়ে হয়, সেই লোকটা সেদিন নিকোলাসের সাথে ছিল। নাম মরিস। আমার এই অবস্থার জন্য সেই দায়ী।'

মরিসকে ওরিয়ন ভালো করেই চেনে। ফুঁসে উঠলো সে ক্রোধে, ' মরিসের আর কিছুতেই কালকের সূর্য দেখার সৌভাগ্য হবে না।'

ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাসাদের ভেতরের দিকে যেতে উদ্যত হলো ওরিয়ন। এখনো নিশ্চয়ই মরিস আর তার সাথিরা প্রাসাদের ভেতরেই আছে। সবগুলোকে আজ যমের বাড়ি পাঠাতে হবে। পেছন থেকে ইভান এসে ধরল তাকে, 'মাথা ঠান্ডা করো ওরিয়ন। এখন প্রতিশোধ নেবার সময় নয়।'

একটা ঝটকা দিয়ে ইভানের হাত থেকে মুক্ত হলো ওরিয়ন, 'তুমি আর কোনো কথা বলবে না। আজকে আমি শুধু নিজের কথাই শুনবো। মরিসকে এখনই মরতে হবে।'

'মরিসকে মরতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু ভেবে দেখো, ডোরার শরীর অনেক খারাপ। এখনই ওকে চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে। মরিস তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আর এখন মরিস সৈন্যদের সাথে আছে। ওকে মারতে গেলে তুমি নিজেই অতজন সৈন্যের মধ্যে মারা পড়বে। ওকে আর নিকোলাসকে আমরা এত সহজ মৃত্যু দেবো না।

ডোরার কোথায় থামতে বাধ্য হলো ওরিয়ন, সত্যিই তো, শুশ্রূষা না পেলে তো ডোরা বাঁচবে না। তাড়াতাড়ি দুজনে ফিরে এলো ডোরার কাছে। কাপড় মোড়ানো ডোরার দেহটা এক টানে নিজের কাঁধে তুলে নিলো ওরিয়ন। গোপন দরজা দিয়ে ওরা বেরিয়ে এলো প্রাসাদের গোপন প্রাঙ্গণে। ইনোন এখান থেকে বেরোনোর সহজ রাস্তাটা জানে। সেখান দিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। ইভান বারবার চিন্তা করতে লাগলো নিকোলাসের কথা। সে যে-কোনো সময় সেনা নিয়ে এখানে চলে আসতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে দূরে সরে যেতে হবে।

কলিনের আস্তানার দিকে রওনা দিলো ওরা। এক মুহূর্তের জন্য গতি কমাল না ওরা। ডোরার শরীর ওরিয়নের পেছনে ঘোড়ার পিঠে ওরিয়নের শরীরের সাথে বেঁধে দিয়েছে ইভান। এই অন্ধকারে তরতর করে এগিয়ে গেল ওরা।

কলিন আর তার লোকজনেরা অপেক্ষাতেই ছিল। তারা কোনো বিপদের আশঙ্কা করছিল না, বরং নবদম্পতিকে বরণ করে নেবার সব আয়োজন সম্পন্ন করা হয়ে গেছে। এত শীঘ্র ওরা আসবে আর এই অবস্থায় আসবে তা তারা কেউই ধারণা করতে পারেনি। ডোরার রক্তমাখা দেহটা সবার মাঝখানে এনে আলগোছে নামিয়ে রাখল ওরিয়ন। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল কলিনের দলে থাকা চিকিৎসকের দিকে, 'তাড়াতাড়ি এই মেয়েটাকে একটু দেখুন।'

চিকিৎসক সময়ের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে সাথে সাথে। ডোরাকে পরীক্ষা করতে শুরু করলো সাথে সাথে। মেয়েটার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, অনেকটা রক্ত হারিয়েছে বোঝাই যাচ্ছে।

ডোরার শরীরে নাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল না। চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রাণের যতগুলো লক্ষণ জানা আছে সবগুলোই পরীক্ষা করে দেখলো চিকিৎসক, কয়েকবার ডোরার বুকে চাপ দিলো জোরে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

চিকিৎসক কিছুই বললো না, কেবল একবার নত চোখে তাকালো ওরিয়নের দিকে। এই দৃষ্টির মানে এই পৃথিবীর সবাই বোঝে। ওরিয়ন হাঁটু ভেঙ্গে মাটিতে বসে পড়লো। আর্তনাদ হয়তো কখনোই ক্রিস্টেয়ারের সেনাদের বুক চিরে বের হয় না। ইনোন দমকে আসা কান্না থামাতে মুখে হাত চাপা দিলো। কয়েকজন হেল্ট মেয়ে এসে ওকে সামলাতে লাগলো।

সবাই বুঝতে পেরেছে আজ রাতে আর কিছুই করার নেই। সবাই যে যার মতো বসে রইলো। ওরিয়নের সাথে বসে রইলো ইভান। ইভান মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস

করলো, 'একবারের জন্যও তো কখনো বলোনি, ডোরাকে তুমি এতটা ভালবাসতে?'

'আমরা দুজন দুজনকেই অনেক ভালবাসতে শুরু করেছিলাম। আমাদের ভালোবাসা তোমাদের মতো এত জটিল ছিল না। এত হিসেব কষতে হয়নি আমাদের। কিন্তু দেখো, কীভাবে ডোরা আজকে আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেল। সব হিসেব কীভাবে গুলিয়ে গেল দেখতে পেলে?'

দুজনের মধ্যে আর কোনো কথা হয় না। ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটতে শুরু করে। যারা শোকসন্তপ্ত তাদের ওপর তো আর নির্ভর করে লাভ নেই। ডোরার মৃতদেহ পরিচ্ছন্ন করে সমাহিত করার প্রক্রিয়া শুরু করলো কলিনের লোকেরা। দাহ করা সম্ভব নয়, অতো আগুন নিশ্চয়ই ওদের পরিচয় প্রকাশ করে দেবে।

সব ব্যবস্থা শেষ হতে কলিন এলো ইভানের কাছে, 'কোন জায়গায় সমাহিত করবো সেই সিদ্ধান্ত তো নিতে হবে। যত দেরি হবে মৃতের শরীরের ততই কষ্ট হবে।'

কথাটার উত্তর দিলো ওরিয়ন, আচমকা সে যেন একটা উৎসাহ পেয়েছে, দাঁড়িয়ে গেছে সে, 'ইভান, আমি জানি ওকে কোথায় সমাহিত করতে হবে। তুমি এসো আমার সাথে।'

ওরা সবাই গেল ওরিয়নের পিছু পিছু। জায়গাটা থেকে একটু দূরেই একটা ছোটো সরু পাহাড়ি ঝর্ণা আছে। সেই ঝর্ণার ধারেই তৈরি করা আছে একটা সুন্দর পর্ণকুটির। তার দরজার সামনে দাঁড়ালো ওরিয়ন, দৃষ্টি ইভানের দিকে, 'ইনোন যখন তোমার কাছে আসবে বলে ঠিক করেছিল, তখন ডোরাও ঠিক করেছিল আমার কাছে চলে আসবে। আমি তোমাকে কিছুই জানাইনি। একা একা আমাদের দুজনের জন্য এই কুটির নির্মাণ করেছিলাম। সুন্দর হয়েছে না বলো?'

ইভান মাথা নাড়লো, 'এত সুন্দর কুটির আমি কখনো দেখিনি।'

'ডোরা দেখতে পেলে খুব খুশি হতো। কিন্তু কী করবে, কপালে নেই। তবে এই ঘর আমি ডোরার জন্য বানিয়েছি। এখানেই সে থাকবে। এই ঘরের মেঝেতেই ডোরাকে সমাহিত করা হবে।'

কেউ আর কিছুই বলল না। ঘরের ভেতরের মেঝেতে মাটি খুঁড়তে শুরু করলো ওরা। ওরিয়ন ওদের সাথে কাজ করছে, যেন একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে সে। সকালের প্রথম প্রহরের আগেই নিজের জন্য বানানো কুটিরে এই জীবনের মতো ঘুমিয়ে পড়লো ডোরা। তার আগে এই পৃথিবীতে তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষের উষ্ণ স্পর্শ কপালে এঁকে নেবার সৌভাগ্য হলো তার।

পরিকল্পনা করা পর্যন্তই মানুষের ক্ষমতা। এরপরে ভাগ্য তার কাজ শুরু করে। নিকোলাস এই কথাটা ভালো করেই টের পাচ্ছে এখন। ইভানের দৃশ্যপটে আবির্ভূত হওয়াটা এখনো সে হজম করতে পারছে না। তবে এখন সে দেওয়াল পেরিয়ে এসেছে। ইভান এখন কী করবে তা বোঝা যাচ্ছে না। ইনোনের সাথে ইভানের সম্পর্ক কীভাবে হলো তাও বোঝা যাচ্ছে না। ইভান আর ওরিয়ন যদি ভেতরে থেকে থাকে তবে ওদেরকে সেনা নিয়ে আটক করাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

দেওয়ালের এপাশে এসে জায়গাটা চিনতে পারছে না সে। এখান থেকে প্রাসাদে ঢোকার একটা রাস্তা নিশ্চয়ই আছে। খুঁজতে খুঁজতে সেই রাস্তা না পাওয়া গেলেও একটা সময় প্রাসাদের সামনের দরজায় এসে সে উপস্থিত হলো। চেনা জায়গায় এসে এবার আর দেরি করলো না। ত্রস্ত পায়ে প্রবেশ করলো প্রাসাদে। দাসদের অন্তঃপুরে চলে এলো না থেমে। এখানেই পরিকল্পনা মতো সবার মৃতদেহ জড়ো করে রাখার কথা।

মরিস সেখানেই আছে। এই প্রাসাদের একটা প্রাণীও এখন আর জীবিত নেই। লাশগুলো জড়ো করে রাখা হয়েছে ঘরের একেবারে মাঝখানে। মরিস অন্যদের নিয়ে প্রাসাদের ভাঁড়ার খুলে ফেলেছে। মদ আর মাংসে এখন গণহত্যার পরিশ্রম মোচন করছে তারা।

এমন সময়েই সেই ঘরে প্রবেশ করলো নিকোলাস। মরিস নিকোলাসকে এখানে দেখতে পেয়ে একটু অবাক হলো। পরিকল্পনা অনুযায়ী এখন নিকোলাসের এখানে থাকার কথা নয়। ইনোনকে নিয়ে আগে থেকে ঠিক করে রাখা গোপন প্রাসাদে যাবার কথা। সাথে এখন আবার ইনোনকেও দেখা যাচ্ছে না। এগিয়ে গেল সে, 'কী হয়েছে? এই সময় তুমি এখানে?'

নিকোলাস তার কথার উত্তর দিলো না। লাশের স্তূপে ঘুরতে লাগলো তার চোখ, 'ঐ মেয়েটার লাশ কোথায়? এখানে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'ওটা এখনো আনা হয়নি। বোঝোই তো, ঐ কাজ করার পরে শরীরে কেমন একটা ক্লান্তির ভাব চলে আসে। মেয়েটাকে কাজ শেষে মেরে ফেলেছি, বিছানাতেই রেখে এসেছি লাশটা। একটু পরে গিয়ে নিয়ে আসবো।'

'তুমি বোকামি করবে না, তা তো আর হয় না। চলো আমার সাথে।'

মরিস হাঁটতে লাগলো নিকোলাসের পেছন পেছন, 'কী হয়েছে বলো তো আমাকে? ইনোন কোথায়?'

'ইনোন এখন আমার কাছে নেই। প্রাসাদের বাইরের সেই গোপন জায়গায় কোত্থেকে জানি ইভান এসে হাজির হয়েছে। ইনোন এখন তার সাথে সেখানেই আছে।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, এখানে আবার ইভান এলো কোত্থেকে?'

'সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না। শুধু ইভান নয় সেখানে ওরিয়নও ছিল।'

'এই দুটো ভাম কি আমাদের পিছু ছাড়বে না? এখন আমরা কী করবো? ইনোন যদি তোমার হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে তো পুরো পরিকল্পনাই মাঠে মারা যাবে।'

'হ্যাঁ, সেটা জানি। তবে ইভান নিজে পলাতক। আর যতটুকু মনে হয়েছে তার সাথে ইনোনের একটা প্রেমের সম্পর্ক আছে। আর ইনোনকে গোপনে নিয়ে যাবার জন্যই আজ রাতে এসেছিল সে। ইনোনের পোশাক দেখে তখন আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। ঘরে অভিজাত মেয়েরা এমন পোশাক পরে না।'

'এখন আমরা কী করবো?'

'ওদেরকে যেভাবেই হোক ধরতে হবে। আগে ওদিকে গিয়ে দেখি। ওরা এখানে আছে কি না। ডোরার দেহটা তো এদিকে আনতে হবে।'

ডোরার দেহটা বিছানার ওপর পাওয়া গেল না। নিকোলাস বুঝতে পেরেছে সাথে সাথে কী হয়েছে। মরিস অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিছানার দিকে, 'এই মেয়ে কোথায় গেল। মেয়েটা তো মরেই গিয়েছিল।'

'তুমি নিশ্চিত?'

নিকোলাসের গরম চোখের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলতে বাধ্য হলো মরিস, 'না, মানে আমি পরীক্ষা করে দেখিনি। তবে এই কাজে আমার তো ভুল হবার কথা নয়। মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু আঘাত করেছিলাম আমি। একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল মেয়েটা।'

'ওরা ঐ গোপন দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল। এখানে এসে মেয়েটাকে মনে হয় নিয়ে গেছে। কোনোমতে যদি মেয়েটা বেঁচে যায় তবে আমার বিরুদ্ধে দুটো সাক্ষী হয়ে গেল। অবশ্য এতে আমার তেমন সমস্যা হবে না। ওরা এখন পলাতক। আমার বিরুদ্ধে কিছু বললেও কেউ তা বিশ্বাস করবে না।'

মরিস এবার একটু স্বস্তি পেলো, 'যাক, তাহলে তো এত দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই।'

জ্বলে উঠলো নিকোলাসের চোখ সাথে সাথে, 'দুশ্চিন্তা করার দরকার আছে মরিস। ইনোনকে যেভাবেই হোক আমার চাই। পরিকল্পনা একেবারে শেষে এসে ব্যর্থ হয়ে যাবে তা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারবো না। যাও, দশজন সৈন্য প্রাসাদে রেখে বাকি সৈন্যদের ডেকে নিয়ে এসো।'

মরিস এই আদেশের পালনে দেরি করলো না। একটু আগে করা মিলনের সুখ তার মন থেকে দূর হয়ে গেছে। ইভান আবার চলে এসেছে তাদের সাথে সংঘাত করতে। এই ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় মিটিয়ে ফেলতে হবে।

সৈন্যদের নিয়ে মশাল জ্বালিয়ে গোপন দরজায় আবার ঢুকে পড়লো নিকোলাস। সুরঙ্গ পেরিয়ে গোপন প্রাঙ্গনে আসতে বেশি সময় লাগলো না। না, এখানে কেউ নেই। ওরা নিশ্চয়ই পালিয়েছে। দেওয়ালের ওপাশে সৈন্যদের নিয়ে চলে এলো নিকোলাস, চেঁচিয়ে আদেশ দিলো, 'সবাই খোঁজো, ওরা কোথায় গেছে। সামান্য একটা চিহ্ন হলেও খুঁজে বের করো। ওদেরকে কিছুতেই পালাতে দেওয়া চলবে না।'

প্রায় ভোর পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি চলল। কিন্তু যতই সময় যেতে লাগলো তত্র নিকোলাসের মাথা ঠান্ডা হতে লাগলো আর সে বুঝতে পারলো ওদেরকে এখন আর খুঁজে বের করা যাবে না। পরাজয়ের গ্লানি তাকে পেয়ে বসলো। কাজ এখনো বাকি রয়ে গেছে। সেদিকে মন দিতে হবে। অ্যালেস্টরের প্রাসাদে মৃতদেহগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সকাল হলেই এই বিদ্রোহের প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে জনগণের মনে বিদ্রোহীদের সম্পর্কে বিরূপ ভাব উৎপন্ন করার কাজও এখনো বাকি আছে। সেসব ঠিকমতো সামলাতে না পারলে শেষ পর্যন্ত তারই বিপদ।

ভোর হয়ে এলে সব সেনা নিয়ে আবার অ্যালেস্টরের প্রাসাদে ফিরে এলো নিকোলাস। মৃতদেহগুলো এক এক করে সরিয়ে ফেলা হলো। বেশ কিছু সৈনি আর দাসের লাশ নিয়ে যাওয়া হলো নগরের মিলনস্থলে।

স্পার্টার জনগণ অনেকদিন এমন কিছু দেখেনি। নগরের লোকজন সকাল বেলায় এখানে এসে ধীরে ধীরে জড়ো হতে লাগলো। নিজের সৈন্যদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত আছে নিকোলাস। যথেষ্ট লোকজন চলে এসেছে। এবার কেবল পায়াসের আসার অপেক্ষা।

আগেরদিনের কথা মতো পায়াস এসে উপস্থিত হলেন রক্ষীদের নিয়ে। মঞ্চের ওপরে উঠে এলো নিকোলাস। এবার তার সম্মান পাবার সময়। এই নগরের মানুষের মাঝে চিরদিনের মতো নিজের প্রভাব বিস্তার করতে হবে আজ সকালে রাতের ব্যর্থতা বুকে চেপে রেখে এগিয়ে এলো সে। দাঁড়ালো জনগণের সামনে. 'আপনারা নিশ্চয়ই এই দৃশ্য দেখে অবাক হচ্ছেন। ভাবছেন, কেন স্পার্টার এই সৈনিকদের মারা হলো। কী কারণে আমরা নিজেরা নিজেদের সেনাদের দিকে অস্ত্র প্রহার করেছি। স্পার্টার সম্মানিত অধিবাসী হিসেবে আপনাদের অবশ্যই এসব জানার অধিকার আছে। তাই রাতের আঁধারে আমি সব কাজ শেষ করতে চাইনি শেষ বিচার করবেন আপনারা, এটাই ছিল আমার চাওয়া।'

গুঞ্জন উঠলো জনগণের মধ্যে। সবাই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে।

'আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে এই সেনাদের চেনেন। এদের পোশাক চেনেন। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, এরা সবাই অ্যালেস্টরের সৈনিক। কাল রাতে শুধু এরাই নিহত হয়নি, এদের প্রভুও নিহত হয়েছে।'

একটু পিছিয়ে একটা দড়িতে টান দিলো নিকোলাস। এতক্ষণ মঞ্চের ওপরে একটা স্তম্ভে অ্যালেস্টরের মৃতদেহ গাঁথা অবস্থায় ছিল। দড়িতে টান পড়তেই সেই মৃতদেহের ওপর থেকে পর্দা সরে গেল। উপস্থিত জনগণের সামনে উন্মোচিত হলো অ্যালেস্টরের ক্ষতবিক্ষত লাশ। জনতার মধ্যে এবার জোর গুঞ্জন উঠলো। কেউই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না। অভিজাতের মধ্যে তিনি ছিলেন বিশেষ, তার শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা নেয়াহেত কম নয়।

নিকোলাস জনতার এমন ব্যবহারের কথা আগে থেকেই জানতো, সেই অনুযায়ী ভাষণ তৈরি করে রেখেছিল সে, 'আমি জানি, আপনারা সবাই অবাক হয়েছেন, কেউ কেউ হয়তো ব্যথিত হয়েছেন, আমি নিজেও অন্তঃকরণে অনেক দুখ পেয়েছি। তবে যেই যে খানেই থাকুক না কেন, এই নগরীর বিরুদ্ধে যে যাবে, যে নিজের স্বার্থের জন্য এই নগরীর মানুষের স্বার্থ নিয়ে খেলবে, সে যেই হোক না কেন, তার এই পরিণাম হবে।'

কথাটা শেষ করেই নিকোলাস আঙুল তুলল অ্যালেস্টরের ঝোলানো মৃতদেহের দিকে। এবার জনগণ আরও শোরগোল করে উঠলো। তারা জানতে চাইছে অ্যালেস্টরের অপরাধ। কেন তার এই পরিণতি হলো।

'আমি জানি, আপনারা সবকিছু জানতে চান। সেজন্যই আপনাদের আদালতে আমরা আজকে হাজির হয়েছি। আপনারাই বলুন, এই গভর্নর পায়াসের শাসনে আপনারা কি কখনো কোনো অশান্তি ভোগ করেছেন? কখনো কি কোনো অবিচার করেছেন পায়াস আমাদের ওপর?'

সাধারণ নাগরিকেরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, পায়াস শাসক হিসেবে বেশ সংযত এবং উদার। কখনো অন্যায় কিছু করেননি তিনি।

'ঠিক বলেছেন আপনারা। আর এই অভিজাত অ্যালেস্টর সেই পায়াসকে হত্যার এক ভীষণ নীল নকশা করেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল স্পার্টার শাসক হওয়া। কিন্তু তাতে তিনি সফল হতে পারেননি। তিনি সফল হতে পারলেও আপনাদের লাভ হতো না। তিনি সকল সম্পদ নিয়ে চলে যেতেন, কারণ স্পার্টায় থাকলে তো তাকে রোমানরা আক্রমণ করে মেরে ফেলতো। আমাদের কাছে সংবাদ আছে, তিনি এরই মধ্যে পারস্যে নিজের জন্য এক জায়গা ঠিক করে ফেলেছিলেন। এবার আপনারা চিন্তা করুন, যদি তিনি চলে যেতেন তাহলে রোমানদের ক্রোধের সামনে কারা পড়তো? আপনারা বুদ্ধিমান, নিশ্চয়ই এটা আপনাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। কাল রাতে অ্যালেস্টর পায়াসকে গুপ্তহত্যা করতে গিয়ে পায়াসের প্রাসাদে ধরা পড়েন। সেখানেই রক্ষীদের হাতে নিহত হন

তিনি। আমাকে নিজের বুকে অনেকটা কষ্ট নিয়ে স্পার্টার এক অভিজাতের বুকে তলোয়ার চালাতে হয়েছে। এবার আপনারাই বলুন, এটাই কি এই অপরাধের যোগ্য সাজা নয়?'

সম্মিলিত জনতা চিৎকার করে উঠলো, 'হ্যাঁ, এটাই যোগ্য শাস্তি।'

নিকোলাস কৌশলে সে যে অ্যালেস্টরকে হত্যা করেছে সেটাও বলে দিয়েছে। এতে তার প্রভাব আরও বাড়বে। এবার সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আপনারাই বলুন, এই লোকের মৃতদেহ কি নগরের সর্বোচ্চ সম্মান পাবার যোগ্য?'

আবারো সম্মিলিত চিৎকার, 'না।' কেউ কেউ বলল, 'শিয়াল কুকুরে খাওয়ার জন্য তার লাশ জঙ্গলে রেখে এসো' 'তার লাশ চিল শকুনের পেটে যাক।'

জনতার উত্তেজনা স্তিমিত হতে সময় দিলো নিকোলাস, তারপর হাত তুলল সে, 'আপনাদের সবার আবেগ আমি বুঝতে পারছি। আপনাদের সবার ক্রোধের কারণও আমি জানি। তবে ক্ষমা মহৎ ধর্ম। ক্ষমাকারীকে দেবতারাও পছন্দ করেন। আমরা অ্যালেস্টর আর বিদ্রোহী সেনাদের লাশ বিধি মেনেই সৎকার করবো। তবে আমি সাবধান করে দিতে চাই সেসব লোকদের, যারা নিজের মনে এই অভিজাত অ্যালেস্টরের মতো মানসিকতা পোষণ করে, যারা এই নগরে থেকেও এই নগরের, এই নগরের মানুষের সর্বনাশের কথা চিন্তা করে। আপনাদের উদ্দেশ্যে শেষে বলছি, এখন আর আমাদের কোনো ভয় নেই, সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে।'

একটা বিপদ ছিল, সেই বিপদ ভালোভাবেই কেটে গেছে আর এখন সবকিছু সম্পূর্ণ নিরাপদ এই কথার বাইরে সাধারণ জনগণের জানার আর বেশি কিছু নেই। সবাই হইহই করে উঠলো। ঘোড়ায় টানা গাড়িতে লাশগুলো তোলা হলো এক এক করে, উৎসাহী কিছু জনতা সৎকার স্থানের দিকে গেল। এটাও যেন উৎসবের উপলক্ষ। পায়াস নিজেও জনগণের সামনে কিছু কথা বললেন, যার বেশির ভাগই নিকোলাসের প্রশংসা আর স্পার্টার প্রতি তার ভালোবাসার কথাই ব্যক্ত করলো। দেবতাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন তিনি আপন জীবন রক্ষার জন্য।

সবকিছু পূর্ব চিন্তা মতোই মিটলো। মরিস নিজের প্রাসাদে গেছে। নিকোলাস রওনা দিয়েছে নিজের প্রাসাদের দিকে। ইনোনের চিন্তা তার মাথা থেকে দূর হয়নি। এখন সবকিছু মিটে যেতে সেই চিন্তা আবার তার মাথায় এসে জড়ো হলো। যদি ইভানের বাঁধা না আসতো তাহলে এতক্ষণে ইনোনের সাথে তার মধু যামিনী যাপন করা হয়ে যেতো। এখন সেই সৌভাগ্যের মালিক হবে ইভান। ইভানের সবকিছু তার হলেও, তার সবচেয়ে বড়ো সম্পদই ইভান কেড়ে নিয়েছে। কাম আর ঈর্ষা দুটোই মানুষের জন্য বেশ তীব্র হয়। আর এখানে দুটোই এক সাথে কাজ করছে নিকোলাসের মনে। তাকে একেবারে জ্বালিয়ে দিচ্ছে যেন। আজকের পর নগরের মানুষ তাকে ভিন্ন চোখে দেখবে ঠিক আছে, তাকে সবচেয়ে বড়ো

অভিজাতের মর্যাদা দেবে, পায়াস তার সাথে নিক্সের বিয়ে দেবেন, সেই হয়তো হবে ভবিষ্যৎ গভর্নর, কিন্তু সেসব সফলতা ছাপিয়ে তার মনে কেবল জায়গা করে আছে ইনোনের মতো পরমা সুন্দরীকে হারানোর ব্যথা।

নিজের প্রাসাদের সামনে চলে এলো সে। তখনো অজান্তে ভেবে চলেছে ইনোনের কথা। তার প্রাসাদের পরিচারক এসে তার ঘোড়া ধরল, নতমুখে বলল, 'মহামান্য, আপনার জন্য পায়াস কন্যা নিক্স অপেক্ষা করছেন। আমি তাকে অন্তঃপুরের অতিথি কক্ষে অপেক্ষা করার জন্য বলেছি।'

নিক্সের আগমনের কথা শুনে নিকোলাসের হতাশা যেন আরও একটু বাড়লো। রাজনৈতিক কারণে এখন তাকে বিয়ে করতে হবে এই বারো ভোগ্যা নিক্সকে। এই সময়ে সে একটু একা থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু এখানেও সেই ডাইনি তাকে জ্বালাতে চলে এসেছে।

নিজের অন্তঃপুরের অথিতি কক্ষে নিক্সকে দেখতে পেলো না নিকোলাস। গেল কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে নিজের শোবার ঘরে চলে এলো সে। নিক্স এখানেই ছিল। সে দেখতে পেলো না, নিক্সই আগে তাকে দেখতে পেয়েছে। এক ছুটে এসে নিকোলাসের বুকে মুখ লুকালো নিক্স, ফোঁপাচ্ছে, 'আমি সব শুনেছি। কাল রাতে কী হয়েছিল। তোমার জন্যই বাবা প্রাণে বেঁচে গেছেন। আমরা বেঁচে গেছি। ধন্যবাদ জানানোর জন্য আমি আসিনি।'

'তাহলে কেন এসেছ?' নিক্সের মুখটা নিজের দিকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো নিকোলাস। বিরক্তি টুকু যতটুকু পারা যায় লুকিয়ে রেখেছে সে।

'ভালোবাসা জানানোর জন্য। আমি তোমাকে ভালোবাসি। এরচেয়ে বড়ো কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই।'

পিত্তি জ্বলে গেল নিকোলাসের। নিক্সের মুখে ভালোবাসার কথা কেমন যেন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। নিক্সের বাঁধন থেকে নিজেকে সরিয়ে শরীরের বেশভূষা খোলার দিকে নজর দিলো সে। যুদ্ধের সাজগুলো অনেকক্ষণ ধরেই গায়ে আছে।

নিক্স কিশোরীর হাসি হেসে এগিয়ে এলো, 'তোমাকে সাহায্য করছি আমি। কদিন পরে বিয়ে হয়ে গেলে তো এসব আমাকেই করতে হবে। আগে থেকে একটু অভ্যেস হলো।'

নিক্সকে এখন কড়া ভাষায় চলে যেতে বলতে পারলে নিকোলাসের সবচেয়ে ভালো লাগতো। তবে সেই উপায় নেই। অগত্যা নিজের শরীরে নিক্সের হাতের স্পর্শ মেনে নিতে লাগলো সে। নিক্স অনভ্যস্ত হাতে খুলতে শুরু করেছে নিকোলাসের সাজপোশাক। বক্ষ বন্ধনী খোলার সময় নিক্সের মুখ এগিয়ে এলো নিকোলাসের মুখের একেবারে কাছাকাছি। কালো রাতের ইনোনের সাথে অসম্পূর্ণ চুম্বনের কথা মনে পড়লো নিকোলাসের। তার সারা শরীরে কাম জ্বলে উঠলো

যেন। নাহ, এই মেয়েটাকে এখনই শাস্তি দিতে হবে। তাকে শাস্তি দিতে হবে কামের অস্ত্রে।

ঝট করে নিজের ঠোঁট দিয়ে নিক্সের ঠোঁট আক্রমণ করলো নিকোলাস। নিক্স ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও পরের মুহূর্তেই সাড়া দিলো। কিন্তু পরের মুহূর্তেই নিজের অধরে নিকোলাসের দাঁতের শক্ত স্পর্শ পেলো সে। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়লো তার সাড়া শরীরে। সেই সাথে খেয়াল করলো তার উর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছে নিকোলাসের হাত।

ঠোঁট একটু ছাড়া পেয়ে শুধু এটুকুই বলতে পারলো নিক্স, 'আস্তে করো।'

আজকে সময়ের গতি ধীর করার কোন ইচ্ছে নেই নিকোলাসের। আজকেই নিক্সকে সে নিজের দাসী বানিয়ে ছাড়বে। ওর এই কামের তাড়না আজকেই পুরোপুরি মিটিয়ে দেবে সে। দেখতে দেখতে নিক্সের শরীরের সম্পূর্ণ বস্ত্রই উন্মুক্ত হলো। নিক্সের পিঠে নিজের বুক মিশিয়ে দিলো নিকোলাস। নির্দয় ভাবে আর নির্মম গতিতে নিক্সের রাজত্বে প্রবেশ করলো নিকোলাসের পৌরুষ।

পুরো সময়টুকু একটু দমের জন্য হাঁসফাঁস করতে লাগলো নিক্স। যখন ঝড় থেমেছে তখনই সে শ্বাস টানতে পারলো বুক ভরে। নিকোলাস বিছানায় শুয়ে আছে চিত হয়ে।

কিছুই বলল না নিক্স। ধীর হাতে নিজের কাপড় গায়ে গলিয়ে নিলো সে। নিকোলাসের দিকে একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। প্রাসাদের সামনে রাখা তার এক ঘোড়ার রথে উঠে বসতেই গাড়োয়ান রথ ছুটিয়ে দিলো।

সারা জীবন ঠিক এমন সঙ্গমেরই কামনা করেছিল নিক্স। যা সবকিছু তোলপাড় করে দেবে। তাকে ভুলিয়ে দেবে এই জগত। কিন্তু আজ সে তা চায়নি। আজ সে একটু ভালোবাসা চেয়েছিল। নিজেকে প্রথম বারের মতো আজকে প্রেমিকা মনে হয়েছিল তার, আর এখন মনে হচ্ছে এক ভোগ্যা, যার কোনো অনুভূতি নেই। আসলেই এই পৃথিবীতে সত্যিকারের ভালোবাসা, সত্যিকারের স্পর্শ দেব দুর্লভ।

শরীরের অসহ্য ব্যথা ছাড়িয়ে মনের এই দমকা অনুভূতিই তাকে সারাটা পথ আচ্ছন্ন করে রাখলো।

শেইরন ঠিকই বলেছিলেন। অভিজ্ঞতার ভারের সাথে সাথে ভাগ্যের কিছু যোগ থাকার ফলে এখন পর্যন্ত তার বলা কথার খুব কমই বিফল হয়েছে। সেদিন ওই সৈনিকের সাথে দ্বন্দ্বে ইচ্ছাকৃত হেরে যাওয়ায় রুদ্রদেবদের জায়গা হয়েছিল এই জাহাজে। এরপরে তাদেরকে আর কেউ ঘাটায়নি, বলতে গেলে ওই রোমান সৈনিকই ঘাঁটাতে দেয়নি। কে জানে, কোন জায়গা থেকে আবার আসল কথা বের হয়ে যায়।

রোমান জাহাজে খাবারদাবারের অবস্থা বেশ ভালো। অবস্থাসম্পন্ন মালিক হলে যা হয়। এমনিতেও বাণিজ্যে রোমানরা এই রাজ্যের বাজারে একটু বাড়তি সুবিধা পায়, তাদেরকে কর দিতে হয় খুব কম, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর পুরোপুরি মওকুফ করা আছে। তাই অন্যান্য জাতির জাহাজের মতো তাদেরকে খরচ চিপে লাভ বের করতে হয় না। লাভ এমনিতেই হবে। নাবিকেরা এখানে নানা ধরনের দামি খাবার, দামি মদ এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাহাজে ওঠানো গণিকাদের সান্নিধ্যে যাবার সুযোগও পায়।

সেসব সুবিধা রুদ্রদেবদের জন্যও ছিল। তবে গণিকাদের সুবিধা বাদে। অবশ্য সুবিধা থাকলেও তাদের তিনজনের কেউ সেই সুযোগের ব্যবহার করতো না। অপেক্ষা কেবল স্পার্টা পৌঁছানোর।

শেইরন বলেছিল ঠিক আঠারো দিন লাগবে। আঠারো দিন পেরোতেই রুদ্রদেব সকাল থেকে সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলো খানিক পরপর। শেইরন বুঝতে পারলেন রুদ্রদেবের মনের অবস্থা, 'চিন্তা কোরো না, স্পার্টা আমার ঠিক সময়েই সামনে আসবে। আর বেশি দূরে নেই। আমি জন্মভূমির গন্ধ পাচ্ছি।' বুক ভরে শ্বাস টেনে নিয়ে নিজের কথার প্রমাণ দিলেন তিনি।

রুদ্রদেব তাদের জন্য ঠিক করা কামরার ভেতরে চলে এলো। সকালের খাবার আজ এখনো আসেনি। নাবিকদের মধ্যে আজ বিরল ব্যস্ততার ছাপ। হয়তো আসলেই বন্দর এগিয়ে এসেছে। ভেতরে এসে অসিতকে দেখতে পেলো সে। অসিত এখন আর কিছুতেই সময় নষ্ট করে না। ধনুক নিয়ে রাতদিন বসে থাকে। তার নেশার মতো হয়ে গেছে। সেটাই ভালো। সফল ধনুর্ধর হতে হলে ধনুককে নিজের অঙ্গ বানিয়ে ফেলতে হয় প্রথমে।

রুদ্রদেব প্রবেশ করে বিছানায় বসে পড়লো, 'ভাবে মনে হচ্ছে বন্দর চলে এসেছে। আমাদের সবকিছু গুছিয়ে নিতে হবে।'

অসিত ধনুকের ছিলার বাঁধন পরীক্ষা করছিল, 'কী আর আছে আমাদের যে গুছিয়ে নেবো? আছি তো কেবল কিছু অস্ত্র আর টুকিটাকি। আমরা কি আর বাণিজ্য

করতে যাচ্ছি না-কি পসরা নিয়ে যে তালিকা মিলিয়ে জাহাজ থেকে জিনিস নামাতে হবে?'

'যার কাছে অনেক পসরা থাকে সে কিছু ফেলে গেলেও অসুবিধা নেই। বাকি জিনিসে তার কাজ চলে যাবে। আমাদের কাছে আছেই সবেধন নীলমণি। একটা জিনিসও যদি আমরা ফেলে যাই, তাহলে সেই জিনিসের অভাব আমাদেরকে অনেকদিন ভোগাবে।'

'আচ্ছা, সব গুছিয়ে নিচ্ছি।' মুখে এই কথা বললেও কাজের বেলায় ধনুকের ওপর থেকে অসিতের মন একটুও সরল না। রুদ্রদেব মনোযোগ দিয়ে দেখছে শিষ্যের কাজ, 'কী করছো এত মনোযোগ দিয়ে?'

'দেখছি। আপনি ধনুকের সুলক্ষণ সম্পর্কে যা যা শিখিয়েছেন সব ঠিক আছে কি না এই ধনুকের। আমার তো এখন মনে হচ্ছে এই ধনুকের কোনো সমস্যা আছে। এত বার চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই দিব্যাস্ত্র আমার আয়ত্তে আসছে না।'

'নাচতে না জানলে মঞ্চকে ঢালু বলে লাভ নেই। এত পরীক্ষা না করে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলেই পারতে। এই দেখো।' শিষ্যের হাত থেকে ধনুক নিলো রুদ্রদেব। তারপর তড়িৎ মন্ত্র আউড়ে নিয়ে ধনুকের ছিলায় টান দিলো, সাথে সাথে বায়বাস্ত্র প্রকট হলো বাণ রূপে। তাড়াতাড়ি সেই অস্ত্র আবার সংবরণ করলো রুদ্রদেব। কেউ দেখে ফেললে ঘোর সমস্যা হয়ে যাবে।

অসিত হতাশায় মুখ কালো করে ফেললো, 'আপনি কীভাবে করে ফেলেন? আর আমি এত চেষ্টা করেও অস্ত্র প্রকট করতেই পারি না ঠিকমতো। আচ্ছা, আমার সমস্যা কোথায়? আমি তো আপনাকে মন্ত্রটা অনেকবার পড়ে শুনিয়েছি, আপনি বলেছেন আমার উচ্চারণ আর মন্ত্রের শব্দে কোনো সমস্যা নেই। ছন্দেও একেবারে নির্ভুল। তাহলে এখন গুরু হিসেবে আপনি বলুন কেন আমার হাতে দিব্যাস্ত্র প্রকট হচ্ছে না?'

রুদ্রদেব কথার জবাব সোজাসুজি দিলো না, আসলে এই কথার সোজা কোনো জবাব হয়ও না। কৌশল শেখানো যায়, নিয়ম শেখানো যায়, কিন্তু কাউকে ইচ্ছে করলেই প্রতিভাধর করে তোলা যায় না। অধ্যবসায় বলেও একটা ব্যাপার আছে। কারো জন্য সময় কম লাগবে আবার কারো জন্য সময় বেশি লাগবে। একই কাজ হয়তো কারো জন্য জলবৎ তরলং আবার কারো জন্য দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত।

'শোনো অসিত, আমার যতটুকু শেখানো দরকার তোমাকে আমি শিখিয়ে দিয়েছি। উপাদান দিয়েছি, অনুশীলনের নিয়ম বলে দিয়েছি, সাথে বিধিও বলে দিয়েছি। আমি তোমাকে জ্ঞান দিতে পারবো, কিন্তু তোমাকে দক্ষ করে তুলতে পারবো না। সেটা তোমাকে নিজেকেই অর্জন করে নিতে হবে।'

'কিন্তু সেই অর্জনের রাস্তা তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। সমাধিতে বসেও আমার মন কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না।'

'সেটা তোমার দোষ নয়, আমারও নয়। তুমি হয়তো ভাবতে পারো, গুরু হিসেবে আমি ব্যর্থ। কিন্তু আমি এক্ষেত্রে তা মনে করছি না।'

'না, আপনাকে ব্যর্থ অথবা অক্ষম বলার ধৃষ্টতা আমি দেখাচ্ছি না।'

'হ্যাঁ। তোমাকে বোঝানোর জন্য বলি। পাণ্ডবেরা কয়জন ছিলেন?'

'সবাই জানে। পাঁচ জন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেই পাঁচ জনের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যোদ্ধা কে ছিলেন?'

'নিঃসন্দেহে অর্জুন। শুধু যদি গায়ের জোরের চিন্তা করা যায় তাহলে ভীমসেন।'

'অর্জুনের কথাই ধরে নিই আমরা। অর্জুন কেন নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড়ো যোদ্ধা ছিলেন? বলতে পারবে?'

'অবশ্যই। তিনি সবচেয়ে বড়ো ধনুর্ধর ছিলেন বলেই সবচেয়ে বড়ো যোদ্ধা ছিলেন। ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করে তিনি যে-কোনো সৈন্যকে অথবা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারতেন। এজন্যই তিনি ছিলেন সেরা যোদ্ধা।'

বেশ। আবার তোমাকে এটাও তো বলেছি, পঞ্চ পাণ্ডবেরা কে কোন অস্ত্রে দক্ষ ছিল। বলেছি না?'

'হ্যাঁ। আমার মনে আছে। যুধিস্টির ভল্লে, ভীমসেন গদায়, অর্জুন ধনুকে, নকুল অসিতে আর সহদেব কুঠারে আর অসিতে।'

'কিন্তু ধনুক তো সর্ব অস্ত্রের সেরা। তাহলে পাঁচ জনেই সেটা শিখলো না কেন? গুরু তো একজনই ছিলেন। তখনকার যুগের শ্রেষ্ঠ গুরু দ্রোণাচার্য, তাই না?'

'হ্যাঁ, আসলেই তো। একই গুরুর কাছে শিখতে গিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা না শিখে অপ্রধান অস্ত্র অভ্যাস করার কারণ কী?'

'কারণ, গুরু যেমনই হোক না কেন, প্রতিভা বলেও একটা ব্যাপার আছে। আমার কাছ থেকে শুনে নাও গোপন কথা। এটা কোনো লিখিত মহাভারতে পাবে না।'

আগ্রহী হয়ে উঠলো অসিত।

'হস্তিনাপুর থেকে যখন একশো পাঁচ জনকে দ্রোণের আশ্রমে পাঠানো হলো তখন সেই একশো পাঁচজনই চিন্তা করেছিল ধনুর্ধর হবে। দ্রোণ সেদিন ওদের কথা শুনে একটু হেসেছিলেন। তবে তিনি মানা করেননি। সবাইকেই ধনুকের নানা রকমের বিদ্যা এক সাথে শেখাতে শুরু করেন তিনি। তারপরে পরীক্ষার সময় আসে।'

'পরীক্ষাতে কী হয়েছিল?'

'সেই কথা অবশ্য মহাভারতে লেখা আছে। সেই বিখ্যাত পাখি বেঁধার গল্প। সবাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন দ্রোণাচার্য, এক চোখ বন্ধ করে সবাই কী দেখতে

পাচ্ছে? সবাই উত্তর দিয়েছিল, কেউ গাছের পাতা দেখছে, কেউ পাখির ডানা দেখছে, কেউ আবার দেখছে হাওয়ায় ডালের নড়াচড়া।'

'হ্যাঁ। এই গল্প আগেও শুনেছি। শুধু সেদিনের প্রতিযোগিতায় অর্জুন বলেছিল, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কেবল পাখির চোখ দেখতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, সেই থেকেই অর্জুন হয়ে গেলেন দ্রোণের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য, এমনকি নিজের পুত্রের চেয়েও প্রিয়। আবার শিষ্য না হয়েও কেবল প্রতিভার জোরে একলব্য দ্রোণের কাছ থেকে দূর থেকে দেখে দেখে অপূর্ব ধনুর্বিদ্যা শিখে নিয়েছিল। তাই বলছি, শিক্ষায় ফললাভ গুরু শিষ্যের মধ্যের নির্ভেজাল সম্পর্কের মতো সরল মাঝে মাঝে হয় না।'

'সেটা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি তো প্রথমে ধনুর্বিদ্যায় ভালোই করেছিলাম, কিন্তু এখন এই দিব্যাস্ত্রের বেলায় এসে আটকে গেছি।'

'হ্যাঁ। আর বুদ্ধিমান মানুষ কী করে জানো তো?'

'কী করে?'

'সে যা পারে সেই ব্যাপারে আরও দক্ষ হয়ে ওঠে, যা পারে না সেটা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায় না। তাই তুমি যেই অস্ত্র ভালো চালাতে পারো সেটা নিয়েই বেশি অনুশীলন করলে ভালো করবে।'

'আমি কোন অস্ত্র সবচেয়ে ভালো চালাতে পারি?'

'অবশ্যই তলোয়ার। এখানে গুরু হিসেবে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তুমি শিবের বিশেষ ভঙ্গিগুলোর সাথে সেগুলোর চর্চা করে অতুলনীয় যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে।'

'কিন্তু আমি তলোয়ারে আগ্রহ পাই না। আমাকে যেভাবেই হোক ধনুর্ধর হতেই হবে। দিব্যাস্ত্রের জ্ঞান আমাকে লাভ করতেই হবে। জানি এখন আপনি আমাকে বোকা বলবেন।'

'না, বোকা শব্দটা এখানে বেমানান। তুমি এখানে জেদের বশে কাজটা করছো। অবশ্য বলা যায় না, মানুষ মাঝে মাঝে ক্রোধ আর জেদের বশেও অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।'

কথাবার্তার এই পর্যায়ে বাইরে থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো, একটু পরেই উঁকি দিলো শেইরনের মুখ, 'কই, তোমরা আবার এখানে এসে বসেছ কেন? সবকিছু গুছিয়ে বাইরে চলে এসো। বলেছি না, আঠারো দিনের পরেই স্পার্টা চলে আসবে। এসে গেছে আমার মাতৃভূমি। আহা, কতদিন পরে দেখতে পাচ্ছি। তোমরা এসো। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।'

অসিত এই আবেগের মানে বোঝে। তার গ্রামের সামনে গিয়ে গ্রামের ছোটো নদীটার সামনে যদি দাঁড়ানোর সৌভাগ্য হয় তাহলে তার আবেগ এরচেয়ে কম না হয়ে বরং বেশিই হবে। তবে এখন আবেগ দেখালে চলবে না, হাতে কাজ আছে।

ধনুক, তলোয়ার আর বাকি জিনিস আস্তে আস্তে পুঁটুলি বাঁধতে শুরু করলো সে। রুদ্রদেবও নিজের জিনিস গোছানোয় হাত লাগিয়েছে।

সব কাজ শেষ করে বাইরে এলো দুজনে। বন্দর এখন আরও দৃশ্যমান হয়েছে। ব্যাপারটা রুদ্রদেব আগেই খেয়াল করেছিল। সমুদ্র বিজ্ঞান এক রকম হলেও এক এক দেশের সমুদ্রের সাথে ব্যবহার একেক রকম। সে কিছু নাবিকের কাছে শুনেছে একেক সমুদ্র না-কি একেক রকম ব্যবহার করে। ভারতে বন্দর নির্মাণ হয় এক রকম, আরবে আর মিশরে সে দেখেছে অন্যরকম, আর এখন এই সাগরের এই পাশে পুরোপুরি অন্যরকম। সবকিছু বিশাল বিশাল, কিন্তু নান্দনিকতার ছোঁয়া কম। এরকমটা বেরেনিকের ওই আখড়ায়ও দেখেছিল সে। সব দিক দিয়ে কেবল আকাশ ছুঁতে চাওয়া হয়েছে। এই রাজ্যে জন্মালে অবশ্যই ভীম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার সম্মান পেতো, অর্জুন নয়।

ওরা যে নিজেদের সবকিছু নিয়ে বেরিয়ে এসেছে সেটা রোমান সৈনিক আর জাহাজের প্রধান নাবিক দেখতে পেয়েছে। প্রধান নাবিক কোনোভাবেই ওদেরকে তুলতে চায়নি। এখনো ওদের প্রতি একটা বিদ্বেষ পুষে রেখেছে। সৈনিকের চোখে এখনো সেদিনের ভয় দেখা যাচ্ছে। রুদ্রদেবের ক্ষমতাকে ভয় পাচ্ছে না-কি নিজের সম্মানকে সেটা অবশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

তার দিকে একটু এগিয়ে গেল রুদ্রদেব, একটু চমকে দেবার লোভ সামলাতে পারলো না বোধহয়, সামনে গিয়েই একটু নত হলো, 'আমাদেরকে জাহাজে জায়গা দেবার জন্য ধন্যবাদ। আপনারা সাহায্য না করলে আসতেই পারতাম না। আপনার সম্মানার্থে এখন আরেক বার পাঞ্জা লড়বেন না-কি? সেদিন আপনার শক্তি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এজন্য আজকে আবার দেখতে চাচ্ছি।'

অক্ষম ক্রোধ ভীষণ হয়ে দেখা দিলো অহংকারী সৈনিকের মুখে। শেইরন সাথে সাথে এগিয়ে এলেন, 'ওকে ক্ষমা করে দিন। আপনি কে তা বুঝতে পারেনি। আমাদেরকে পৌঁছে দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

প্রধান নাবিক এবার এগিয়ে এলো, 'তোমরা নামো তো। এখন এখানে অনেক কাজ আছে। শুধু শুধু ভিড় বাড়িও না।'

জাহাজ বন্দরে ভেড়ার জায়গা খুঁজছে। সংকেত দেখাচ্ছে বন্দরের লোকজন। এই বন্দর রোমানদের মালিকানায় থাকলেও গ্রীকদের কাছে ইজারা দেওয়া আছে। আগের সেই রমরমা এখন আর স্পার্টার নেই। এখন কেবল স্থানীয়দের প্রয়োজনীয় মালামাল বহন করতেই এই বন্দর ব্যবহৃত হয়। রোমানদের শাসনে গ্রীসের সবগুলো বন্দরের একই অবস্থা।

এই বন্দরে রোমান জাহাজ বেশি একটা আসে না। ওদের জাহাজ একটা আলাদা সম্মান পেলো। আরেকটা জাহাজকে তড়িৎ পাশে সরিয়ে দিয়ে ওদের জন্য জায়গা করা হয়েছে। তারপর ভিড়তে আর বেশি সময় নেয়নি জাহাজ।

জাহাজ ভিড়তেই দড়ি ছুঁড়ে নাবিকেরা লাফিয়ে ঘাটে নামতে লাগলো। ঘাটের নানা স্থির অংশে দড়ি বাঁধা হয়ে গেল দেখতে দেখতে। সেদিকে নজর দেবার কোনো দরকার নেই তিনজনের। ওরা লাফিয়ে নেমে এলো নাবিকদের সাথে। শেইরন একটু কষ্ট হলেও মাতৃভূমি ছোঁয়ার উত্তেজনায় একটা লাফ দিলেন। কোমরে একটু চেপে ধরা ছাড়া তার আর তেমন কোনো সমস্যা হলো না।

এখনো ওরা পানির ওপরেই আছে। এই ঘাটের অংশটা পানির ওপরে, তবে ভাসমান নয়। শক্ত থামের ওপর অবস্থিত। মূল ভূমিতে পৌঁছানোর জন্য এখান থেকে দুটো প্রশস্ত সেতু আছে। সেগুলোর একটাই উঠে পড়লো ওরা। সেতুর দৈর্ঘ্য খুব বেশি নয়। পঞ্চাশ পেসের মতো হবে।

চারিদিকে দেখতে দেখতে সেতুর ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলো রুদ্রদেব। প্রকৃতি এখানে নতুন। মিশরের মতো রুক্ষ নয়, বরং ভারতের মতো সবুজ। তবে এই সবুজ আর ভারতের সবুজের রূপের পার্থক্য আছে।

এসব নানা ব্যাপার চিন্তা করতে করতে রুদ্রদেব একটু আস্তে এগোতে লাগলো। অসিত ততক্ষণে শেইরনের সাথে অনেকটা সামনে এগিয়ে গেছে। সেতু পেরিয়ে ওরা ওপাশে অপেক্ষা করছে রুদ্রদেবের জন্য। শেইরন ডেকে উঠলেন, 'আরে, দেখার তো অনেক সময় পাবে। একটু তাড়াতাড়ি এসো না। বন্দরে রাজ্যের কাজ বাকি আছে। আমাদেরকে তল্লাশি করে তবেই ছাড়বে।'

শেইরনের আগ্রহ কোথায় তা বুঝতে পারছে রুদ্রদেব। হেসে বলল, 'আসছি।' হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো সে। সেতুর কাঠের পাটাতন পেরিয়ে একটু পরেই তার পা পড়লো স্পার্টার ভূখণ্ডে, প্রথমবারের মতো।

সাথে সাথে রুদ্রদেবের বুকে অদৃশ্য এক হাত যেন প্রকাণ্ড এক ধাক্কা বসিয়ে দিলো। বাতাসের একটা হলকা যেন তাকে বাঁধা দিচ্ছে এই খানে পা ফেলতে। সেই ধাক্কা এড়িয়ে যেতে পারলো না রুদ্রদেব, আবার সেতুর ওপর উঠে এলো সে। একবার মাথা ঝাঁকালো। কিছুই বুঝতে পারছে না। যেন কোনো এক অদৃশ্য শক্তি তাকে এই সেতু পার হতে বাঁধা দিচ্ছে।

নিজের শরীর আরেকবার টানটান করে নিয়ে সেতু পেরিয়ে ভূখণ্ডে পা রাখল সে। এবার আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল। ধাক্কাটা এবারেও এলো, তবে তাকে খুব একটা টলাতে পারলো না। দুই পা নিয়ে এলো সে মাটির ওপরে। তবে এবার পিছিয়ে না গেলেও নিজের শরীরের শক্তির ভীষণ অভাব দেখতে পেলো সে। সাথে সাথে পা দুটো টলে উঠলো তার। মাথা ঘুরে উঠলো, মাটিতে বসে পড়তে বাধ্য হলো রুদ্রদেব।

অসিত আর শেইরন ছুটে এলো সাথে সাথে। অসিত এসে আগে ধরল তাকে, 'কী হয়েছে? মাথা ঘুরেছে না-কি?'

রুদ্রদেব মাথায় একটু হাত দিলো, 'বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ শরীর কেমন যেন করে উঠলো।'

শেইরন মাথা নাড়লেন, 'বুঝেছি। সকাল থেকে কিছুই তো খাওয়া হয়নি, তাই শরীর একটু টলে উঠেছে। কিছু একটা খেয়ে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। উঠে পড়ো।'

সাবধানে উঠে পড়লো রুদ্রদেব, না, এবার আর কোনো সমস্যা নেই। সবকিছু স্বাভাবিক। ঝেড়ে নিজের শরীরের ধুলো ঝাড়ল সে, 'কই চলুন, কোথায় আপনার তল্লাশির জায়গা?'

শেইরনের পেছন পেছন এগিয়ে যেতে লাগলো ওরা। ওদিকে রুদ্রদেব চিন্তা করছে, গভীর চিন্তা। তার মাথায় এখন মণি আছে। আর এই মণির গুণে সে অজর। কোনো জরা তাকে স্পর্শ করবে না, তার শরীর কখনো খারাপ হবে না। তাহলে তার মাথা এভাবে ঘুরে উঠলো কেন?

তার মানে, শরীর খারাপ হয়নি। কোনো অলৌকিক কিছুর সম্পর্ক আছে এই ঘটনার পেছনে।

পাহাড়ের ওপরের চলার পথ একটাই আছে। এখানে রথ অথবা বাহন ওঠার কথা চিন্তাও করা যায় না। যদিও গাধা জাতীয় কোনো অতি কষ্ট সহিষ্ণু প্রাণীকে টেনে হিঁচড়ে হয়তো ওঠানো যাবে তবু সেই চেষ্টা আজ অবদি কেউ করেনি। দরকারই হয় না। মানুষ চলাচল এই পথে খুবই কম। শেষ মানুষের পা পড়েছিল অনেক দিন আগে। পাহাড়ি মৃদু আবার কখনো মন্দ বাতাস সেই পায়ের ছাপের ধুলোর দাগ মুছে দিয়েছে অনেক আগেই। এখন শুধু পরিত্যক্ত একটা ভূমি ছাড়া এই ছোটো গুল্ম সমৃদ্ধ ন্যাড়া পাহাড়কে আর কিছুই মনে হচ্ছে না।

তবে এখানে কিছুদিন আগে এক রাতে বেশ কিছু লোকজন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। হ্যাঁ, এটাই সেই পাহাড়। ডেলফির পূজারীরা যেই পাহাড়ে এরিস বাস করেন বলে মনে করেন। তাদের দেওয়া রীতি আর মন্ত্র অবলম্বন করে সেদিন এরিসকে জাগানো যায়নি। নীরবে পরিহাস করেছে পাথরের মূর্তি। সেই লোকজনদের অধিকাংশই নিহত হয়েছে বিদ্রোহ করতে গিয়ে। কেউ কেউ বেঁচে থাকলেও এখন আর তাদের মনে স্বাধীনতা আর শাসনের চিন্তা অবশিষ্ট নেই। তারা এখন কেবল নিজেদের পিঠের চিন্তাই করছে।

তবে এই অবেলায় ঠিক মাঝ দুপুরে কেন আবার ফিরে আসা হলো এই পাহাড়ে। যেখানে অনেক আগের একটা পরিত্যক্ত মন্দির ছাড়া আর কিছুই নেই। যেখানে ইতিহাস কালের বিবর্তনে বদলে গেছে শুধুই উপকথায়। কারণ আছে। যা রটে, মাঝে মাঝে তার কিছু তো অবশ্যই ঘটে।

স্পার্টায় এই এরিসের বন্দি হওয়া নিয়ে বেশ কিছু মতবাদ আছে। সবাই এক বাক্যে এটা স্বীকার করেন যে, এরিসকে এখানে বন্দি করে রাখা হয়েছে যাতে স্পার্টাকে কেউ কখনো যুদ্ধে হারাতে না পারে। এই সেদিন পর্যন্ত পারস্য আর মেসিডনের হামলা ঠেকিয়ে দিয়ে সেই কথার সার্থকতা প্রমাণ করেছিল স্পার্টার সেনারা। কিন্তু রোমানদের কাছে হেরে সেই বিশ্বাসের ওপর পুরোপুরি ঢাকনা দেওয়া হয়ে গেছে। কেউই এখন আর এই মন্দিরে এরিসের পূজা দিতে আসে না।

বন্দি এরিস কীভাবে স্পার্টানদের জিতিয়ে দেবেন সেটা নিয়েও মতানৈক্য আছে। কেউ বলে এখানে এরিস বন্দি থাকার মানে হচ্ছে স্পার্টার মধ্যে এরিসের শক্তি বন্দি হয়ে থাকা। তখন স্পার্টান যোদ্ধারা যদি কারো সাথে যুদ্ধ করতে যায় তখন তাদের দেহে আর অস্ত্রে সেই শক্তি জড়ো হয়। তখন তাদের সাথে যুদ্ধে কেউ পেরে ওঠে না। প্রত্যেক সেনাই তখন হয়ে যায় একেকজন যুদ্ধ দেবতা এরিস।

আরেকটা মতবাদ একটু কম জনপ্রিয় হলেও প্রচলিত আছে। স্পার্টানরা নিজেদের যুদ্ধের কৌশলে এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল যে তারা একসময়

ধারণা করতে লাগলো কোনো মানুষের দ্বারা তাদেরকে যুদ্ধে হারানো সম্ভব নয়। একমাত্র দেবতাদের দ্বারাই তারা পরাস্ত হতে পারে। এথেনা আর এরিসই আছেন এমন দেবতা যারা যুদ্ধংদেহী। এথেনা যুদ্ধংদেহী হলেও তাকে পূজা করে বশ রাখা যায়, কিন্তু এরিসকে যতই তোয়াজ করা হোক না কেন, যুদ্ধের গন্ধ পেলে তার আর কিছুই ভালো লাগে না। আর সেই এরিস যদি কোনোমতে একবার স্পার্টার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে স্পার্টার পরাজয় হতে পারে। ট্রয়ের সেই বিখ্যাত যুদ্ধে এরিস না-কি গ্রীসের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে অস্ত্রও ধরেছিলেন। সেই বুদ্ধি অনুযায়ী এরিসকে চিরজীবনের মতো বন্দি করে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, এবং জিউসের অনেক পূজা দিয়ে বলি দেওয়া হয় তখন। জিউস তুষ্ট হলে জিউসের বরেই এরিসকে পাথর আকৃতিতে শেকল বন্ধ করে রাখা হয়েছে এই মন্দিরে।

এখন গ্রীসে দেবতাদের রমরমা অনেকটাই কমে গেছে। এখন আর আচরণে নেই বিশ্বাস, বিশ্বাস আছে কেবলই মন্দিরে। বজ্র আকাশে চমকে উঠলে এখন আর লোকে জিউসের ক্রোধ বলে মনে করে না। সবাই বৃষ্টি আর ঝড়ের আশঙ্কাই করে। বলতে গেলে এখন সব দেবতাই বন্দি হয়ে গেছেন। কেউবা অলিম্পাসে নিজের আসনে, কেউবা আবার মানুষের মনে।

এখন পাহাড়ের ওপরের রাস্তায় মাত্র যে বনবেড়ালটা এসে দাঁড়ালো সে কিন্তু এত কথা জানে না। তার জানার প্রয়োজনও নেই। তবে এদের সম্পর্কে যারা জানেন তারা এদেরকে এই দুপুর বেলা এই জায়গাতে দেখলে অবাকই হতেন। এরা মূলত শিকার ধরতে রাতের বেলা বেরোয়। দুপুর বেলাতে শিকার মিলবে না। আর আকৃতিতেও এই বেড়াল সাধারণ বনবেড়ালের চাইতে বড়ো। প্রায় ছোটোখাটো নেকড়ের মতো।

দেখতে দেখতে পথের ওপর একটা দুটো করে মিশকালো বেড়াল এসে জড়ো হতে লাগলো। এই পাহাড় এদের আবাস নয়। কোত্থেকে এসেছে ওরা কেউ বলতে পারবে না। তবে ওরা শিকার করতে আসেনি। দল বেঁধে কাউকে তাড়া করতেও আসেনি। এরা উঠে এসেছে হেডিসের অন্ধকার পাতালের রাজ্য থেকে। কিছু একটার অপেক্ষা করছে তারা। দেখতে দেখতে অগুনতি বেড়ালে পাহাড়ের ওপরের মাটি কালো হয়ে গেল। ওপর থেকে কেউ দেখলে এখন আর নিচের মাটি দেখতে পেতো না।

সবাই এক ভঙ্গিতে বসে আছে। বোঝা যাচ্ছে কিছু একটার অপেক্ষা করছে তারা। আর একটু তারপরেই আসবে সেই ক্ষণ। একটু পরেই পাহাড়ের মাটিটা একটু কেঁপে উঠলো। নিচ থেকে একটা কম্পন উঠে আসতে লাগলো পাহাড়ের গা বেয়ে। বেড়ালগুলোর একটাও বিন্দুমাত্র ভয় পেলো না। কিন্তু সেই কম্পন পুরোপুরি পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে যাবার আগেই বন্ধ হয়ে গেল।

একটু চিৎকার করে উঠেছিল বেড়ালগুলো। কম্পন শেষ হয়ে যেতেই সেই চিৎকার থেমে গেল। আবার অপেক্ষা করতে লাগলো তারা। এবার আবার কেঁপে উঠলো মাটি। যেন বহুদূর থেকে কোনো কম্পন মহাশক্তি নিয়ে ধেয়ে আসছে এদিকে। মাটি থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করলো সেই কম্পন। এবার প্রত্যেকটা বেড়ালের পায়ের নিচে সেই কম্পন অনুভূত হলো। নিজেদের বসে থাকার আরামদায়ক ভঙ্গি ছেড়ে সবগুলো বেড়াল এবার কর্কশ স্বরে উল্লাস করে উঠলো। আর একটু, তাহলেই এতদিনের অপেক্ষার শেষ হবে।

এবার আর কম্পন থেমে গেল না। আরও তীব্র হয়ে পাহাড়ের উপরিভাগের মাটিতে ধুলোর আলোড়ন তুলে আঘাত করলো পুরনো মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে। দেওয়াল বেয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো সেই মহাশক্তি। সে নিজের লক্ষ্যে যাবার আগ পর্যন্ত থামবে না। আর সে ভালো করেই জানে নিজের লক্ষ্য। বাইরে বেড়ালগুলো এখনো কম্পন অনুভব করতে পারছে। তাদের উল্লাস তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

মন্দিরের ভেতরের মাটিও এবার কাঁপতে লাগলো পুরোদমে। না, কোনো বাতাস নেই, কোনো ঘূর্ণি নেই, কেবল মাটি কাঁপছে। পুরো মন্দিরের মেঝে ভীষণ গতিতে কাঁপতে শুরু করল এবার। কম্পনটা আস্তে আস্তে এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে। মন্দিরের মেঝের ঠিক মাঝখানে একটা বৃত্তে এসে জড়ো হলো সেই কম্পন। এতক্ষণের কম্পনে মন্দিরের থাম আর পাথরের মূর্তিগুলো থেকে ধুলো ঝড়ে পড়েছে অনেক। সেগুলো এবার এসে জড়ো হতে লাগলো সেই মধ্যের কম্পনের জায়গায়। দেখতে দেখতে একটা ধুলোর ঘূর্ণি তৈরি হতে লাগলো সেই মেঝের ওপরে। ইতস্তত কম্পন এখন মোটামুটি একটা ঘূর্ণির আকার নিয়েছে।

শক্তি জড়ো হলো আরও কিছুক্ষণ ধরে। শক্তি নিজেকে প্রয়োগের জায়গা খুঁজতে লাগলো। জায়গাটা এই মন্দিরের ভেতরেই আছে। বেশ বড়ো পাথরে খোদাই করা নিখুঁত একটা মানুষ আকৃতির ভাস্কর্য। আকৃতি মানুষের হলেও আকারে প্রায় তিনজন দশাসই মানুষের সমান। সেই মানুষের দুটো পা আর দুটো হাত বিপরীত দিকে ছড়ানো। সেই চার হাত পাতেই পরিয়ে দেওয়া আছে শেকল। সেই কোন আদিকাল থেকে এই শেকল এই মূর্তির গায়ে জড়িয়ে আছে তা কেউ জানে না। শেকলের গায়ে জং ধরে গেলেও বহুকাল আগে বহু যত্নে বানানো সেই শেকল এখনো নিজের কাজ করে চলেছে। এতদিন ধরে যে ধুলো জমেছিল একটু আগের কম্পনে তার বেশির ভাগই খসে পড়েছে, তারপরও এখনো কিছু কিছু আছে। সেই পাথুরে ভাস্কর্যের সামনে একটা বেদিতে কিছুদিন আগে পূজাতে দেওয়া নৈবেদ্যের অংশ বিশেষ এখনো দৃশ্যমান।

আরেকটু অপেক্ষা করলো শক্তি সামনে জমা হতে। তারপর লক্ষ্য ঠিক করে তীব্র বেগে আছড়ে পড়লো সেই ভাস্কর্যের ওপর। এবার পুরো পাথরের তৈরি ভাস্কর্য

কাঁপতে শুরু করলো। সেই সাথে তীব্র বেগে কাঁপতে শুরু করলো শেকলগুলো। ঝনঝন শব্দ ছড়িয়ে পড়লো পুরো মন্দির জুড়ে। পুরানো শেকল খুব বেশিক্ষণ এই কম্পন ধরে রাখতে পারলো না। এক সময় কিছু বাঁধন খুলে আর কিছু অংশ ছিঁড়ে গিয়ে সম্পূর্ণ শেকল লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। এখন আর এরিসের পাথরের ভাস্কর্যের গায়ে কোনো বাঁধন নেই। সেই কোন আদি কাল থেকে বন্দি থাকা এরিস আজ মুক্ত।

শেকল ছিঁড়ে গেলেও কম্পন বন্ধ হলো না। ক্রমাগত শক্তি সঞ্চার করে চলল পাথরের গায়ে। দেখতে দেখতে পাথরের আস্তর খসে পড়তে শুরু করলো। যেন ভেতর থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় পাথরের আস্তর খসে পড়তেই ভেতর থেকে উঁকি দিতে শুরু করলো রক্ত মংসের বলিষ্ঠ চামড়া। এক সময় আর পাথরের কোনো চিহ্নই রইলো না। পুরো পাথরের জায়গায় এখন দাঁড়িয়ে আছে একজন শক্ত সমর্থ রক্ত মাংসের মানুষ। তবে মানুষ বললে ভুল হবে। সাধারণ মানুষের তুলনায় সে প্রায় দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তিন গুণ।

তবে পাথরের চিহ্ন সরে গেলেও একটুও নড়ল না সেই দেহ। এতক্ষণে কম্পন শেষ হয়েছে। পুরো মন্দির জুড়ে আবার অসহ্য নীরবতা। এতক্ষণ বাইরে চিৎকার করতে থাকা বনবেড়ালের দলের চিৎকারও থেমে গেছে। তারা এবার অপেক্ষা করে আছে পরের ঘটনার।

এরিসের দেহের প্রথম যে অংশটা নড়ে উঠলো তা হলো হৃদপিণ্ড। পৃথিবীতে মানব রূপে যে আসে তার এই অংশ ছাড়া উপায় নেই। তারপরেই হাত আর পায়ের আঙ্গুলগুলো নড়ে উঠলো তার। অনেকদিন পরে কোনোকিছু দেখার ইচ্ছে থেকে চোখ খুলল এরিস। কিন্তু এই মন্দিরের ম্লান আলতেই অনেকদিনের বন্ধ থাকা চোখ যেন ঝলসে উঠলো। কয়েকবার চোখ পিটপিট করে নিয়ে স্বাভাবিক হলো সে। চারপাশে তাকিয়ে যেন বুঝতে চাইছে সবকিছু। নিজের পরিচয় অথবা কোনো স্মৃতি মনে আসছে না তার। চারপাশে তাকিয়ে এতক্ষণ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে নেমে মন্দিরের মেঝেতে দাঁড়ালো সে।

ঠিক তখনই তার শরীর যেন সঙ্কুচিত হতে শুরু করলো। তার চুল থেকে শুরু করে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে পেলো স্বাভাবিক মানুষের আকৃতি। নিজের দেহের নানা অঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো এরিস। কিছুই বুঝতে পারছে না সে। প্রাণপণে তার মন চাইছে স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে, কিছু মনে করতে, কিন্তু সবকিছুই যেন হয়ে আছে ফাঁকা, কিছুতেই কিছু মনে পড়ছে না।

মন্দিরের ভেতরে জীবিত প্রাণী বলতে কাউকে দেখতে পেলো না। নিজের গলা দিয়ে একটা অস্ফুট স্বর বের করে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে। চারিদিকে তাকিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো সে সবকিছু। মন্দিরের থামগুলো, দেওয়ালের বিবর্ণ নকশা, সবই সে হাত বুলিয়ে দেখছে, কিন্তু কিছুই চিনতে পারছে না।

দেখতে দেখতে মন্দিরের বাইরে আসার দরজাটা চোখে পড়লো। হাঁটতে হাঁটতে সেখান দিয়ে বেরিয়ে এলো সে। বেরোতেই তাকে দেখতে পেলো বনবেড়ালগুলো। তাদের থেমে যাওয়া চিৎকার আবার শুরু হলো। এরিসের স্মৃতি ভ্রষ্ট হলেও তাদের হয়নি। তারা জানে ওনাকে দর্শন করতেই তারা আজ উঠে এসেছে পাতালের গভীর থেকে। উল্লাস করে উঠলো তারা।

সামনে উল্লাস করতে থাকা জানোয়ারগুলোকে দেখতে পেলো এরিস। এই প্রথম যেন কোনো জীবিত সত্ত্বা দেখতে পেলো। কিন্তু তাতেও তেমন লাভ কিছু হলো না। সব আগের মতোই ফাঁকা হয়ে আছে। মাথাতে কেবল একটা বো বো অনুভূতি।

এরিস বাইরে এসে পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালো। এতগুলো ভয়াল দর্শন বেড়াল দেখেও তার মনে কোনো বিকার নেই। ভয় পাওয়া উচিত কিন্তু তার মন ভয়ের অনুভূতিও ভুলে গেছে। কেবল পাহাড়ের ওপরের এই মৃদুমন্দ বাতাস তার শরীরে এসে লাগছে, শরীরটা যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। যেন বহুদিন কিছু একটার ভেতর বন্দি হয়ে ছিল সে। কোনো কারাগারে, যেখানে শ্বাস নেবারও দরকার পড়েনি। সেই কারাগার থেকে বেরিয়ে এখন কেবলই শরীরের ভালো লাগার অনুভূতি।

বেড়ালগুলো হাঁটতে শুরু করেছে তাকে ঘিরে। দেখে মনে হচ্ছে একটা বিশাল বড়ো কালো চাদর তাকে ঘিরে হাঁটছে। আস্তে আস্তে গতি বাড়তে লাগলো ওগুলোর। এখন আর ওরা হাঁটছে না, রীতিমতো এরিসকে কেন্দ্র করে দৌড়াতে শুরু করেছে। এরিস অনড়। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তার এখন কী করা উচিত। সরে যাওয়া উচিত এখান থেকে? না, দরকার নেই। এই শেষ দুপুরের আলো আর বাতাসটা খারাপ তো লাগছে না।

বেড়ালগুলো এবার দৌড়াতে দৌড়াতে আবার চিৎকার করতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে কেন্দ্র ছোটো করে আনছে তারা। তারপর কেন্দ্রের একেবারে নিকটে থাকা বেড়ালের দল লাফ দিলো এরিসের দেহ লক্ষ্য করে। এবার একটু ঘাবড়ে গেল এরিস, তবু সে সরে গেল না। এরিসের দেহে এসে আঘাত করলো বেড়ালগুলোর শরীর। ওদের কেউই থাবা মেলেনি, অথবা দাঁত বের করে এরিসকে কামড়ে দিতে চেষ্টা করেনি। বোঝাই যাচ্ছে, এরিসকে আক্রমণ করা ওদের উদ্দেশ্য নয়।

এরিসের দেহ স্পর্শ করতেই বেড়ালদের দেহ যেন একবারেই শূন্যে মিলিয়ে যেতে লাগলো। আসলে ওরা সবাই মিশে যাচ্ছে এরিসের দেহে। দেখতে দেখতে অগুনতি বেড়ালের সবগুলো এরিসের দেহের স্পর্শে শূন্যে মিলিয়ে গেল। আবার নীরব হয়ে গেল জায়গাটা।

এরিস এতক্ষণ সবই খেয়াল করেছে নীরবে। তার কাছে কিছুই স্বাভাবিকও মনে হচ্ছে না আবার অস্বাভাবিকও মনে হচ্ছে না। তবে এবার মানব রূপে থাকার

সবচেয়ে অমোঘ অনুভূতি পেয়ে বসলো তাকে। কারো স্মৃতি থাকুক আর নাই থাকুক, যে পৃথিবীর সন্তান হয়ে এই ধরার বুকে হেঁটে বেড়াবে তার এই অনুভূতি হতে বাধ্য। নিজের পেট চেপে ধরে একটু কুঁজো হলো এরিস। পেটের ভেতরে কেমন যেন মোচড় দিচ্ছে, মুখ হাঁ হয়ে যেতে চাচ্ছে বারবার। কিছু একটা মুখের ভেতরে দিতে পারলে ভালো হতো। সবেচেয়ে অমোঘ অনুভূতি ক্ষিধে তাকে গ্রাস করতে শুরু করলো।

চারিদিকে নজর বোলাল এবার সে। কই, কিছুই তো নজরে পড়ছে না। এই সামনে থাকা গাছের পাতা আছে। সেখান থেকে কয়েকটা তুলে নিয়ে মুখে দিলো সে। শরীর নিজের প্রয়োজনে চিবাতে শুরু করলো। পাতার ভেতর থেকে রস বেরিয়ে আসতেই বিস্বাদে ভরে গেল এরিসের মুখ। চিবাতে থাকা পাতাগুলোকে নিমেষে বের করে ছুঁড়ে ফেললো মাটির ওপর।

আবার চারিদিকে নজর দিলো সে। না, এখন আর এখানে মুখে দেবার মতো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখানে হবে না। অন্য কোথাও যেতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে? সে তো কিছুই চেনে না।

পাহাড়ের ওপর থেকে নিচের দিকে নজর দিলো এবার সে। পথটা নজরে পড়লো। এখান থেকে নেমে যেতে হবে। এছাড়া উপায় নেই। পেটের ভেতরের মোচড় আরও বাড়ছে। আরও কয়েকবার পেট চেপে ধরতে বাধ্য হলো সে। কিন্তু চেপে ধরেও তেমন লাভ হচ্ছে না। পেটের ভেতরের যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে। কয়েকবার জোর করে ঢোক গেলার চেষ্টা করেও লাভ হলো না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, ঢোক গিলতে কষ্ট হলো বেশ।

পথ বেয়ে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলো সে। বিপজ্জনক রাস্তার বিপদ সম্পর্কেও সে কিছুই জানে না। তার কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না, কিন্তু সাধারণ কোনো মানুষ দেখলে নিশ্চিত হাঁ হয়ে যেতো। এই প্রায় খাড়া বিপজ্জনক পথ বেয়ে নেমে যাচ্ছে লোকটা সাধারণের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি বেগে। দেখতে দেখতে পাহাড়ের পাদদেশে নেমে এলো সে।

এখানেও মুখে দেবার মতো কিছু নেই। প্রায় হন্যে হয়ে ওঠার অবস্থা হলো তার। চোখ দুটো জ্বলে উঠতে চাইছে। চারপাশে তাকাতে তাকাতে চিৎকার করতে চাইছে তার কণ্ঠ।

অনেকদিন পরে ক্রোধের অনুভূতি একটু একটু করে টের পেতে শুরু করলো এরিস।

দুর্ভাগ্য বন্যার জলের মতো। যখন আসে হুড়হুড় করে কেবল ঢুকতেই থাকে। তারপর মানুষ কেবল অপেক্ষাই করতে পারে। কখন জল ঢোকা বন্ধ হবে আর কখন সেই জল নেমে গিয়ে দুই দণ্ড শান্তি দেবে তাকে। এছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। প্রকৃতির খেয়ালের কাছে মানুষ যেমন অসহায় তেমনি ভাগ্যের কাছেও।

ইভান এটা বেশ ভালোই বুঝতে পারছে। আর কত খারাপ অবস্থার সামনে তাকে পড়তে হবে? নিজের প্রাপ্য মহা অভিজাতের আসন তাকে হারাতে হয়েছে, ঘটনা চক্রে হারাতে হয়েছে নিজের জন্মনগরে থাকার জায়গা। এই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে এখন। যার একসময় হবার কথা ছিল স্পার্টার শ্রেষ্ঠ সৈনিক সে এখন হয়েছে নগরের বাইরের জঙ্গলের শ্রেষ্ঠ ডাকাত। আর কত খেলা দেখাবে ভাগ্য? সবকিছুর পরে যখন ইনোনকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে সকল ঝামেলার বাইরে গিয়ে একটা ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল, সেখানেও বিপত্তি বাঁধিয়েছে মানুষের কূটকৌশল আর লোভ। ভীষণ ক্লান্ত মনে হয় ইভানের নিজেকে। আর যুদ্ধ করার শক্তি হয়তো এই দেহে বেঁচে নেই। কিন্তু এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে যুদ্ধ করেই থাকতে হয়। শ্বাস নেবার মতোই যুদ্ধও একটা স্বাভাবিক ঘটনা।

এরই মধ্যে কলিনের দলের মধ্যে ইভান আর ওরিয়ন একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। ওরা যুদ্ধ কৌশল যেমন জানে, তেমনি চুরি আর ডাকাতির কৌশলও জানে। সেই জ্ঞানই ওদেরকে সবার থেকে আলাদা করেছে। সবাই নানা জিনিস শিখতে চায় তাদের থেকে আর স্বভাবতই তোয়াজ করে। ইভান তার স্ত্রীকে নিয়ে আসবে সেটা জেনে কলিনের দলের মেয়েরা বেশ ভালো ব্যবস্থাই করেছিল। নতুন বানানো ঘরের সাধারণ শয্যা বুনোফুলের স্পর্শে সেজে উঠেছিল অপরূপ সাজে। সেখানেই ইনোনের সাথে জীবনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত রাত কাটাবার কথা ছিল ইভানের। কিন্তু সেই রাত এসেছিল ঘোর অমানিশা হয়ে। সকালের অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছিল ডোরার দেহ সমাহিত করতে। ইনোন কেঁদে চলেছিল এক নাগাড়ে। তারপর ক্লান্ত হয়ে চোখের জল শুকিয়ে এখন ঘুমাচ্ছে সেই সাজিয়ে রাখা ফুলের ওপরেই। ফুলগুলো সময়ের সাথে সাথে বিবর্ণ হতে শুরু করেছে, শুকিয়ে গেছে বেশ কিছু রঙ্গিন পাপড়ি। তার মাঝে ইনোন ঘুমিয়ে আছে বিষণ্নতা মিশ্রিত নিস্পাপ মুখশ্রী নিয়ে। সেদিকে একবার তাকাতেই বুক ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ইভানের। ভাবনা আর বাস্তবে মাঝে মাঝে কতটা ফারাক হয়ে যায়।

কলিনের এক লোক এসে দাঁড়ালো বাইরে। ভেতরে ইভানকে ডাকতে একটু ইতস্তত করছে সে। ইভান টের পেলো তার উপস্থিতি, বেরিয়ে এলো সে, 'কী হয়েছে? কলিন কোনো খবর পাঠিয়েছে?'

'জি। আপনাকে এখনই একটু যেতে বলেছে। একটা জরুরি খবর এসেছে নগর থেকে।'

এই অবস্থায় ইনোনকে একা রেখে কোথাও যাবার কথা ভাবতেও পারছে না ইভান। আগন্তুক হেলটকে দুজন হেলট নারী নিয়ে আসতে বলল সে। ওরা আসলে ওদেরকে ইনোনের কাছে বসিয়ে সে কলিনের সাথে দেখা করতে গেল। ইনোন জেগে উঠলে যাতে সাথে সাথে তাকে খবর পাঠানো হয় এই কথা বেশ কয়েকবার বুঝিয়ে বলে গেল সে হেলট মেয়েদের।

কলিন ওদিকে ইভান আর ইনোনের মতো আবেগে ভেসে যায়নি। খারাপ যে তার একেবারেই লাগেনি তা নয়, তবে ইভানের কাছে ঘটনার ছিটেফোঁটা শুনেই সে আঁচ করে ফেলেছিল, নগরে ভয়ংকর কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে। শোক রত সবার থেকে আলাদা হয়ে তখনই সে একজন গুপ্তচরকে পাঠিয়ে দিয়েছিল নগরে, খবর কী নিয়ে আসার জন্য। এতক্ষণে ফিরে এসেছে সেই চর, যে খবর এনেছে তা আসলেই মারাত্মক, আর এজন্যই এক বিন্দু সময় নষ্ট না করে ইভানকে খবর দিতে বলেছে সে।

ইভান কলিনের সামনে এসে বসলো। তার মনে তাড়াহুড়া থাকলেও বাইরে সেই জলদি ভাব প্রকাশ পেলো না, 'তুমি আমাকে কেন ডেকেছ? যদি কোনো বড়োলোক ব্যবসায়ীর দল অথবা সৈন্যদল জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার কথা থাকে, আর তুমি যদি ডাকাতির পরিকল্পনা করে থাকো, তাহলে আমি বলবো, এখন আমি আর ওরিয়ন ওসব কিছুতেই যেতে পারবো না।'

কলিন চেহারায় একটু দুঃখের ভাব ফুটিয়ে তুলল, 'আমাকে এতটা অবিবেচক না ভাবলেও পারতে। আমি এখন কীভাবে তোমাদেরকে কোনো কাজের কথা বলবো? ওটুকু বিবেচনা আমার আছে। তোমাকে ডেকেছি একটা খবর দিতে।'

'কী খবর?'

'কাল রাতে তোমার মুখে সব শোনার পরেই আমি এক লোককে খবর আনার জন্য নগরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সে ফিরে এসেছে একটু আগে।'

ইভান এবার আগ্রহী হয়ে উঠলো, 'বেশ ভালো করেছ। আমারই উচিত ছিল তোমাকে কাউকে পাঠাবার কথা বলা। কিন্তু মনের অবস্থা এমন ছিল, স্বাভাবিক বুদ্ধিও কাজ করেনি। সেই চর কী খবর এনেছে?'

'খবরটা তোমাকে দেওয়া উচিত হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না। সাধারণ কেউ হলে তোমাকে আমি এই কথা এখন বলতাম না। তবে তুমি তো আর সাধারণ কেউ নও।'

'ভণিতা রাখো। কী হয়েছে?'

'ইনোনের বাবা মহা অভিজাত অ্যালেস্টর মারা গেছেন।'

'কী! উনি মারা গেছেন! কীভাবে?'

'আমার চর আজকে ভোর হবার আগেই নগরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে সকাল হতেই না-কি বেশ কয়েকটা লাশ এনে নগরের একেবারে মাঝের বেদীর ওপরে জড়ো করা হয়েছিল। নগরবাসী ভিড় করেছিল সেখানে। আর সেখানেই সে দেখতে পেয়েছে অ্যালেস্টরের মৃতদেহ। সেই বেদীর ওপরে একটা স্তম্ভের গায়ে ঝোলানো ছিল তার লাশ।'

বিশ্বাস করতে পারছে না ইভান, 'কিন্তু তার মতো একজন প্রভাবশালী অভিজাতের সাথে এমন আচরণের কারণ কী? কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না।'

'আমার দূত সেই খবরও এনেছে। সেখানে সেই বেদীর ওপরে ছিল নিকোলাস, যে সদ্য মহা অভিজাত হয়েছে আর পায়াসও ছিল। সেই নিকোলাসই স্পার্টার লোকজনকে সব কিছু খুলে বলেছে। অ্যালেস্টর না-কি নগরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন পায়াসকে মেরে ফেলার। আর তা করতে গিয়েই তিনি পায়াসের প্রাসাদে ঢোকেন আর নিহত হন স্বয়ং নিকোলাসের হাতে। পরে জানা যায়, শুধু অ্যালেস্টর নয় বরং তার সকল সেনা আর দাসেরাও তার সাথে সাথে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তাদেরকে বন্দি করার জন্য নিকোলাস নিজের এবং পায়াসের সেনা জড়ো করে যায় অ্যালেস্টরের প্রাসাদে আর সেখানেই হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে অ্যালেস্টরের পক্ষের সব সেনা আর দাস মারা পড়েছে।'

দাঁতে দাঁত চেপে বসলো ইভানের। ঘটনা ইনোনের মুখ থেকে যেটুকু শুনেছে তাতে ইনোনদের প্রাসাদে কোনো ধরণের যুদ্ধ হয়নি। নিকোলাস নিজের লোক নিয়ে অতর্কিত চোরাগোপ্তা হামলা করেছে আর তারপরে যা হয়েছে তার নাম নির্মম গণহত্যা।

তবে সেটা এখন বিবেচ্য বিষয় নয়। এই ঘটনার মধ্যে আরও অনেক গভীর ব্যাপার আছে। সেগুলো হয়তো পরে উন্মোচন করলেও চলবে। কিন্তু এখন তাকে আবার ইনোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। নিশ্চয়ই কাল নিজের বাবার মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা সে ভাবতেও পারেনি। এত বড়ো আঘাতের পর এখন যদি বাবার মৃত্যুর খবর শুনবে তখন কী হবে সেটা ভেবেই হাত পা অসাড় হয়ে আসতে লাগলো ইভানের।

আর ঠিক সেই সময়েই ইনোনের আছে বসিয়ে রাখা দুজন হেলট মেয়ের একজন চলে এলো। তার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলো ইভান কী ঘটেছে, 'ইনোন উঠে পড়েছে?'

'আজ্ঞে। উঠে পড়েই আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছেন। আপনাকে না দেখতে পেয়ে মনে হয় এতক্ষণে অনেক কান্নাকাটি করছেন।'

'আচ্ছা কলিন, আমি আসছি। এদিকটা একটু সামলে নিই, তারপরে আমরা আবার আমাদের কাজ শুরু করবো।'

'আরে কাজ নিয়ে তুমি ভেবো না। সেটা পরে দেখা যাবে। পরিস্থিতি ভালোই ভালোই স্বাভাবিক হয়ে গেলে বাঁচি এখন।'

ক্লান্ত পায়ে ইভান ঘরে ফিরে এলো। ওকে দেখেই বিছানা থেকে উঠে এলো ইনোন, জড়িয়ে ধরল ওকে, 'তুমি আমাকে ফেলে কোথায় গিয়েছিলে? আর কখনো এমন করবে না। তুমি আমাকে একা ফেলে কোথাও যাবে না।'

সান্ত্বনা দিলো ইভান, ইনোনের পিঠে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, 'আমি কোথাও যাইনি। এখানেই ছিলাম। ভয় পেও না। আমি কোথাও যাবো না।'

'আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। ওহ ঈশ্বর, এমন কেন হচ্ছে আমার সাথে। তোরার তো কোনো দোষ ছিল না।'

'কী দুঃস্বপ্ন দেখেছ তুমি?'

' জানো, স্বপ্নে বাবাকে দেখতে পেলাম। বাবা সম্পূর্ণ সাদা এক পোশাক পরে আছেন। তার সবচেয়ে প্রিয় সাদা ঘোড়াটার ওপর বসে আছেন। কোথায় যেন যাচ্ছেন। হাসিমুখে ঘোড়া ছোটানোর আগে আমার দিকে চেয়ে একটু মিষ্টি হেসে হাত নাড়লেন। মন খারাপ হবার কোনো কারণ নেই। তবু ঘুমের মধ্যেই আমার বুকটা যেন কেঁপে উঠলো। মনে হলো, বাবাকে আমি আর দেখতে পাবো না। আমার বাবার জন্য মন কেমন করছে। তুমি বাবার খবর এনে দাও। আমার মন বলছে বাবা এখন অনেক বিপদে আছেন।'

ইভান মনটা শক্ত করলো। এই অবস্থায় ইনোনকে কথাটা বলা উচিত না হলেও না বলেও উপায় নেই। সত্যকে মেনে নিতেই হয়। আর সত্যটা যে যত তাড়াতাড়ি জানতে পারে তার পক্ষে তত তাড়াতাড়ি মেনে নেয়া সম্ভব।

'শোনো ইনোন, কলিনের লোক এইমাত্র ফিরে এসেছে নগর থেকে। সে খবর নিয়ে এসেছে।'

ইভানের আলিঙ্গন মুক্ত হলো ইনোন, আগ্রহে একটু খানি জ্বলে উঠেছে তার চোখ, 'সে কি আমার বাবার খবর এনেছে? কেমন আছে বাবা? কোথায় আছে?'

'তোমাদের প্রাসাদের সব সেনা আর দাসই কালকে মারা গেছে। তোমার খোঁজে স্পার্টার সেনারা এখন হন্যে হয়ে ঘুরছে নগরের চার পাশে। আর কাল রাতে তোমার বাবাও নিহত হয়েছেন।'

না, চিৎকার দিলো না ইনোন, কাঁদতে কাঁদতে ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল না। শুধু তপ্ত অশ্রু গড়াতে লাগলো তার দুই চোখ দিয়ে। ইভান বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার বাবা পায়াসের প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। কী উদ্দেশ্য ছিল তার তা জানা যায়নি, তবে সবাই বলছে পায়াসকে হত্যা করার জন্যই প্রবেশ করেছিলেন। সেখানে নিকোলাসের হাতে মারা গেছেন তিনি।'

'ওহ, মানুষ কীভাবে এত নিষ্ঠুর হতে পারে। এই লোককে ভালোবেসে বিশ্বাস করে আমাকে তুলে দিয়েছিলেন বাবা তার হাতে। তিনি বোধহয় জানতেও

পারেননি এই লোকই তার মৃত্যুর কারণ হবে। বাবাকে আমি আর কখনো দেখতে পাবো না জানতাম, জানতাম একবার তোমার সাথে বেরিয়ে এলে এই জীবনে আর বাবার খোঁজ পাবো না। কিন্তু সেই ধারণা যে এভাবে সত্যি হয়ে যাবে তা ভাবতেও পারিনি। বাবা নেই, ডোরাও নেই। সত্যি বলছি কাল পর্যন্তও আমি তোমাকেই আমার সবকিছু ভেবেছিলাম। আর আজকে তোমাকে এত কাছে পেয়েও আমার মনে হচ্ছে আমার পৃথিবী পুরো শূন্য হয়ে গেছে।'

ইনোন মনে হয় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। বিছানায় আবার শুয়ে পড়লো সে। উপুড় হয়ে। কান্নার বেগে তার শরীর ফুলে আসছে। ইভান জানে এখন কিছুটা সময় ইনোনকে একা থাকতে দিতে হবে। কিছু শোকে সান্ত্বনা হয় না। সময় ছাড়া সেসব শোকের আর কোন প্রতিষেধক নেই।

বেরিয়ে এলো সে। একজনকে নিয়েই সেই শুরু থেকে পড়ে আছে সে। আরেকজনের কথা ভুলেই গিয়েছিল। প্রেম যে কতটা সর্বগ্রাসী হতে পারে তার প্রমাণ সে গত কিছুদিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার পেয়েছে। সে প্রেমের মধ্যেই বাঁধা পড়েছিল ওরিয়ন। তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। কাল রাতে সেও তার প্রেমিকাকে হারিয়েছে। ওরিয়নের কাছে একটু যাওয়া দরকার।

এদিক সেদিক ওরিয়নকে খুঁজতে লাগলো সে। কিন্তু খুঁজে পেলো না। তারপরেই আচমকা বুঝতে পারলো ইভান কোথায় পাওয়া যাবে তাকে। হ্যাঁ, এখন তাকে সেখানেই পাওয়া যাবে। আর কোথায় যাবে সে।

কলিনের আস্তানা থেকে একটু দূরের সরু ঝর্নাটার কাছে চলে এলো ইভান। এখানেই কুটিরের ভেতর সমাহিত করা হয়েছে ডোরাকে। ভেতরে উঁকি দিলো ইভান, যা ভেবেছিল তাই, ওরিয়ন ডোরার কবরের পাশেই বসে আছে। তবে শোকের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না তার ভেতর, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসে নিজের অস্ত্র আর শিকারের যন্ত্রগুলো পরিষ্কার করছে, কিছু কিছু একটু মেরামত করছে।

ওরিয়নের পাশে বসে পড়লো ইভান, 'কী করছো তুমি?'

ওরিয়নের গলার স্বরও স্বাভাবিক, 'এইতো একটু শিকারের যন্ত্রগুলো ঠিকঠাক করে নিচ্ছি। অনেকদিন ধরে কিছু মেরামতের দরকার ছিল, সেটাও সেরে নিচ্ছি।'

যাক, ওরিয়ন তাহলে মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ইভানও মোটামুটি স্বাভাবিক গলা করে বলল, 'শিকারে যাবে না-কি আজকে? অনেকদিন ভালো কিছু মাংস খাওয়া হয় না।'

নিজের কাজের দিকেই মন ওরিয়নের, ইভানের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'নাহ, আমি আর কখনো শিকার করবো না। প্রাণী হত্যা বন্ধ। ওসব অবলা প্রাণী হত্যা করতে ভালো লাগছে না।'

'আচ্ছা। না, মনে করলাম তুমি শিকারে যাবে দেখেই এসব পরিষ্কার করছ। আমি জানি, তোমার মনের অবস্থা এখন অনেক খারাপ। আর শিকার করতে

তোমার ভালো লাগে। এই সময় যদি শিকার করতে যাও তাহলে মনটা একটু ভালো লাগতেও পারে। তাই বললাম।'

ওদিকে কলিন ইভানকে এদিকে আসতে দেখেছে। এই মাত্র একটা খবর এসেছে তার কাছে। এই কাজে এই দুজনের সাহায্য ছাড়া চলবে না। মনে মনে কিছু কৌশল ঠিক করে এদিকে এসেছে সে। দেখাই যাক না, দুজনকে রাজি করানো যায় কিনা। পৃথিবীতে কত ঘটনাই তো ঘটে যায়, সেসব ভুলেই মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়। কারো জন্যই কিছু থেমে থাকে না।

কলিন প্রবেশ করলো ঘরে, 'আরে দুজনে এখানেই আছো দেখি।'

ইভান এরই মধ্যে একটু স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, সবাই এক সাথে শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে তো চলবে না। ইনোন, ওরিয়ন আর সে, এই তিনজনের মধ্যে তারই ক্ষতি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কম হয়েছে। তাই তাকেই সবাইকে সামলে নেয়াতে সাহায্য করতে হবে। সে কলিনের দিকে তাকালো, 'বসো। কিছু বলবে না-কি?'

কলিন এক পাশে বসলো, 'হ্যাঁ। বলতেই এসেছি। আসলে আমাদের তো নিজেদের কাজও করতে হবে। একজন অভিজাতের কন্যা এখন আমাদের আস্তানায় এসেছেন। আমরা যেনতেন ভাবে চলতে পারলেও ওনার জন্য তো ভালো খাবার আর পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে। আর সেসব করতে গেলে তো নগদ মুদ্রা লাগবে। সবকিছু তো আর চুরি করে জোগাড় করা যায় না।'

ইভান মাথা নিচু করে রেখেছে, 'ঘুরিয়ে না বলে সরাসরি কথা বলো। কোনো শিকারের খবর এসেছে না-কি?'

লজ্জিত হাসি দেখা গেল কলিনের মুখে, 'তুমি ঠিকই বুঝেছ। একটা শাঁসালো শিকার এসেছে। আজকেই রোমানদের একটা জাহাজ বন্দরে ভিড়েছে। খবর পেয়েছি ওরা বেশ কিছু মালামাল এই স্পার্টার জন্যও নিয়ে এসেছে।'

'তুমি কি পাগল হয়েছ না-কি? রোমান সেনাদের বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না।'

'আরে সেটা আমিও জানি। রোমান সেনারা আসবে না। স্পার্টার এক অভিজাত বণিক সেই মাল নিয়ে আসবে আজকে। সে কালকেই বন্দরে সেনা সমেত গিয়ে বসে আছে। দশজন সেনা আছে। সেনা পাঁচজন থাকলে আমি তোমাদের বলতাম না। কিন্তু দশজন প্রশিক্ষিত সেনার সামনে দাঁড়ানোর লোকবল হয়তো আমাদের আছে, কিন্তু দক্ষতা নেই। কাজটা তোমাদের ছাড়া করতে গেলে দেখা যাবে আমাদের দলের বেশ কয়েকজন লোক প্রাণ হারাবে। সেই মালামালের জন্য দামটা অনেক বেশি হয়ে যাবে। তাই বলছিলাম।'

'দেখো। তুমি তো বুঝতেই পারছ আমাদের মনের অবস্থা। আমি যদিও বা যেতে পারবো, কিন্তু ওরিয়ন কিছুতেই এখন যেতে পারবে না।'

নিজের নাম ঘোষিত হতে এবার কথ বলে উঠলো ওরিয়ন, 'কেন যেতে পারবো না? অবশ্যই পারবো। কাজ তো চালিয়ে যেতেই হবে।'

অবাক হয়ে ওরিয়নের দিকে তাকাল ইভান। কলিনের মুখে হাসি ফুটে উঠলো, সে উঠে দাঁড়ালো, 'ঠিক আছে। আমি সবাইকে তৈরি হতে বলছি।'

কলিন উঠে চলে যেতে ইভান তাকালো ওরিয়নের দিকে, 'আজ কি এসব কাজে না গেলে চলতো না। এসব ব্যাপারে খুনোখুনি হবে। তোমার মন আরও খারাপ হতে পারে। মন ভালো করার কাজ করা উচিত।'

হেসে উঠলো ওরিয়ন, 'তুমি তো দেখছি আমাদের শিক্ষা ভুলে গেছো। আমাদের জন্য তো এসব মারামারি, যুদ্ধ, খুনোখুনিই মন ভালো করার ওষুধ।'

'তবে তুমি যে বললে শিকারে যাবে না। প্রাণী হত্যা করতে তোমার মন চাচ্ছে না।'

'ঠিকই বলেছি। শিকারে যাবো না। তবে কাজে যাবো।'

'তাহলে শিকারের যন্ত্র ঠিকঠাক করছিলে কেন?'

ওরিয়ন তাকালো ইভানের দিকে, তার চোখ ইস্পাত কঠিন, সেই চোখে এসে জমা হয়েছে মৃত্যুদূতের কাঠিন্য, 'আমি এই জীবনে আর একটা শিকারই করবো। আর সেটা কোনো অবলা প্রাণীর নয়, মানুষ রূপী এক জানোয়ারের। আজ থেকে আমার বেঁচে থাকার এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য।'

ইভান আর কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, ওরিয়ন এখানে কার কথা বলছে।

পাহাড় থেকে নেমে এসেছে এরিস। ক্ষিধের অনুভূতি তার মনে তীব্র ক্রোধের সঞ্চার করেছে। কিন্তু মুখে দেবার মতো কিছুই নেই। একটা অদ্ভুত ক্ষমতাবলে চারপাশে যা দেখছে তাই বুঝতে পারছে সে। কোনটা খাবার জিনিস আর কোনটা অখাদ্য এটা কে যেন তাকে ভেতর থেকে বলে দিচ্ছে। সেই হিসেবে এখন চোখের সামনে কিছুই নেই।

পাহাড়ের নিচে এসে পায়ে চলার রাস্তাটা একটু চওড়া হয়েছে। এই রাস্তায় ঘোড়া অথবা গাধার গাড়ি চালানো সম্ভব। জায়গায় জায়গায় মৃদু কিছু চাকার দাগও দেখা যাচ্ছে। সেই দাগ অনুসরণ করে এবার হাঁটতে লাগলো সে। সামনে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে।

আরেকটু সামনে যেতেই বাতাস যেন একটু শীতল হয়ে এলো। চোখের সামনে বদলে যেতে লাগলো প্রকৃতির রং। পাহাড় থেকে নেমে আসার পর প্রকৃতি অনেকটাই সবুজ হতে শুরু করেছিল, আর এখানে প্রকৃতি আরও সবুজ। ঠান্ডা বাতাসের দিকে আরেকটু এগোতেই এবার কলকল ধ্বনি ভেসে এলো তার কানে। শব্দের উৎসের দিকে প্রায় ছুটে গেল সে।

একটা পাহাড়ি নদী এদিক দিয়েই নেমে এসেছে। কলকল শব্দে ক্ষুদ্র কিন্তু বেগবান জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের সাথে মিলিত হবার জন্য। নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো সে। অনেকদিন পরে এই জল দেখতে পাচ্ছে। উবু হয়ে নদীর পাড়ে বসে পড়লো, হাত ডুবিয়ে দিলো নদীর হিমশীতল জলে। আঙ্গুলে ছুঁয়ে গেল তীব্র ঠান্ডা এক অনুভূতি, কিন্তু সে হাতটা সরিয়ে নিলো না। জিনিসটা চিনতে না পারলেও তার মনে হচ্ছে এই স্পর্শটা কত আরামের, কতদিন পরে পাওয়া গেল।

কিছুক্ষণ জলের ধারা ছুঁয়ে থাকতে থাকতে আরেকটা চিন্তা এলো তার মনে। এবার সেই চিন্তা আস্তে আস্তে অনুভূতিতে বদলে যেতে লাগলো। এতক্ষণের তীব্র কোনো কিছু মুখে দেবার অনুভূতির পাশাপাশি তার চেয়েও তীব্র আরেকটা অনুভূতির সৃষ্টি হলো। নতুন চোখে এবার সে তাকাল বয়ে যাওয়া জলের স্রোতের দিকে। হাতকে আজলার মতো করে ডুবিয়ে দিলো জলে, সেই সাথে তুলে নিয়ে এলো এক অঞ্জলি টলটলে জল। ঠোঁট দিয়ে হাতের তালু থেকে চুমুক দিয়ে জলটা বুকের ভেতর নিয়ে নিলো সে। গলা বেয়ে যেন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে একটা ঠান্ডা স্রোত, যেদিক দিয়ে যাচ্ছে সেদিকটা যেন ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে অনেকদিন পর, ঠিক যেমনটা হয় অনেকদিন পরে মরুর বুকে বৃষ্টি পড়লে।

এরিস বুঝতে পারলো সে কত জন্ম ধরে তৃষ্ণার্ত। এবার আরেকটু উবু হয়ে বসে দুই হাত একত্র করে আজলা ভরে পানি তুলে আনতে শুরু করলো সে। গিলতে লাগলো ঢোকের পর ঢোক, ঠিক পাগলের মতো। পুরো পেট ভরে যেতে

এবার একটু শান্ত হলো সে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে রইলো নদীর ধারে। তারপর এক সময় সূর্য যখন দিগন্তের দিকে রওনা দিলো সেদিনের শেষটা ঘোষণা করার জন্য তখন সে উঠে দাঁড়ালো। চারিদিকে আলো কমে আসছে। চোখের দৃষ্টিও কমে আসছে।

পেটে আবার সেই জল খাবার আগের অনুভূতি ফিরে আসতে শুরু করেছে। সেই অনুভূতি জলে দূর হবে না। রাস্তায় আবার ফিরে এলো সে। তারপর চিহ্ন অনুসরণ করে হাঁটতে শুরু করলো। সামান্য একটু যেতেই দেখতে পেলো একটা ক্ষেত। সেদিকে এগিয়ে গেল সে। এখানে গুল্ম গুলো প্রাকৃতিক ভাবে গজায়নি। প্রকৃতি এমন কৃত্রিম সারিবদ্ধ ভঙ্গিতে গুল্ম গজায় না। এটাতে কৃত্রিমতা আছে, তার মানে এখানে প্রকৃতি বাদে অন্য কারো হাত আছে।

জায়গাটা নগরের বাইরে একটা শস্য ক্ষেত। হেলটেরা সেই সকাল থেকেই এখানে কাজ করেছে। সারাদিন কাজ করার পর কাটা ফসল আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে তারা প্রস্থান করেছে নগরের বস্তির দিকে। শুধু একজন হেলট এখানে থাকে। রাতে ফসল পাহারা দেবার জন্য। পশুপাখি ছাড়াও ফসলের আরও অনেক শত্রু আছে। পাহারা দেওয়া হেলটের কাজ নয়, কেউ ফসল চুরি করতে এলে সে কিছু করতেও পারবে না। তবে ছুটে গিয়ে মালিককে অন্তত খবর দিতে পারবে। আর সেই কারণেই হেলটকে এখানে রাখা।

সারাদিনের কাজের শেষে হেলটের একটু আরাম মিলেছে। আজকে দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা অনেক ভালো ছিল। মালিক আজকে দরাজ দিল হয়ে নরম রুটি পাঠিয়েছিলেন হেলটদের জন্য। ওদের মধ্যে একজন কোত্থেকে একটা খরগোশ আর দুটো বনমোরগ মেরে এনেছে। সৈন্যদের চোখ এড়িয়ে রান্না করা হয়েছে ওগুলো। দুপুরের খাবারের সময় প্রহরীদের সামনে সেগুলো বের করার প্রশ্নই ওঠে না। সবাই নিজেদের ভাগের মাংস লুকিয়ে বাড়ি নিয়ে গেছে রাতে খাবে বলে। সেও তার ভাগের মাংস পেয়েছে। সাথে নরম রুটি আছে রাতে খাবার জন্য। জম্পেশ খাওয়া হবে আজ রাতে।

তবে সব কাজের শেষে কাছের নদী থেকে স্নান করে আসার পর এই মুখরোচক খাবারের জন্য রাতের অপেক্ষা করতে মন চাইলো না তার। লোভ মানুষকে তাড়াহুড়া করতে বাধ্য করে। দুপুরের খাবারের পরে এখন ক্ষিধে না লাগলেও স্বাদ তাকে তাড়িত করলো। সিদ্ধান্ত নিলো, রাতের খাবারের জন্য রাখার রুটি আর মাংসের অর্ধেকটা রেখে বাকিটা এখন খেয়ে ফেললে তেমন কোনো সমস্যা হবে না।

রাতের বেলা আগুন তো জ্বালাতেই হবে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আগুন এখন থেকেই জ্বলুক। কাঠ তৈরি আছে। আগুন জ্বেলে নিতেই বেশ গরম একটা আভা

ছড়িয়ে পড়লো। আগুনের পাশে খাবারটা কিছুক্ষণ রেখে দিলো সে। আগুনের আচে একটু গরম হয়ে এলে খাওয়ার মজা আরও জমবে।

দেখতে দেখতে মাংসের গা থেকে ধোঁয়া উঠতে শুরু করলো। যথেষ্ট গরম হয়ে গেছে খাবার। আর অপেক্ষা না করে থালা তুলে নিলো সে। তখনই আগুনে কাঠ পোড়ার চিড়বিড় শব্দের বাইরে আরেকটা শব্দ তার কানে এলো। হাজার হলেও তার প্রহরীর দায়িত্ব। অন্যরকম শব্দ শুনে কান খাড়া হয়ে গেল তার। জমির যেদিকে রাস্তা সেদিক থেকে শব্দটা আসছে। কেউ পায়ে হেঁটে এদিকেই আসছে আর পায়ের আওয়াজে মনে হচ্ছে লোকটা বেশ বড়োসড়ো। কী মতলব হতে পারে সেটা বুঝতে অসুবিধা হলো না হেলটের। খাবার আপাতত মাথায় উঠলো। থালাটা এক পাশে রেখে আগুন থেকে একটু দূরে গিয়ে বসলো সে। আগুনের পাশে থাকলে প্রথমেই আগন্তুকের নজরে পড়ে যেতে হবে।

এরিস এদিকে রাস্তা থেকে ক্ষেতের মাঝে ঢুকে পড়েছে। সম্পূর্ণ নগ্ন শরীরে এখন একটু একটু শীত শীত লাগছে তার, যদিও অনুভূতিটা কিছুতেই ধরতে পারছে না সে। শুধু মনে হচ্ছে, একটা কিছু গায়ে জড়িয়ে রাখতে পারলে ভালো হতো। আরেকটু এগোতেই অবশ্য তার চোখে পড়লো আলো। এমন আলো এতক্ষণ দেখেনি সে। সূর্য এখন প্রায় ডুবে গেছে। আরেকটু এগিয়ে গেল সে আলোর দিকে। আলোটা কাঁপছে, স্থির নয়।

অনেকদিন পর আগুন দেখতে পেয়েছে সে। ত্রস্ত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। আগুনের পাশে আসতেই একটু আগের শরীরের অনুভূতি যেন কমে গেল অনেকটা। আগুন তার দেহের শীতের অনুভূতি কমিয়ে দিয়েছে। সম্পূর্ণ নগ্ন শরীরের প্রায় সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো উত্তাপ। আগুনের পাশে জড়সড় হয়ে বসলো সে।

হেলট এরিসের আসার শব্দই শুনেছিল। এরিস যখন আগুনের পাশে চলে এসেছে তখন এরিসকে সম্পূর্ণ দেখতে পেলো সে। এতক্ষণ কেবল অবয়ব বুঝলেও সম্পূর্ণ নগ্ন এরিসকে দেখে তার চোখ কপালে উঠে যাওয়া বাকি রইলো। এটা কী দেখছে সে। না, নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ানো কোনো পাগল তো এই মানুষ নয়। কোনো পাগলের শরীর এতটা সুগঠিত, পেশীবহুল হতে পারে না। সে স্পার্টার হেলট। স্পার্টার লোকজন যুদ্ধে অতুলনীয়, শরীর গঠনেও তাদের জুড়ি মেলা ভার। স্পার্টায় শরীর চর্চা আর প্রদর্শনের প্রতিযোগিতাও হয় হর হামেশাই। কিন্তু কখনো সে এমন বিশেষ গঠনের কাউকে দেখেনি। দেখলেই মনে হয় এই মানুষের পুরো শরীর থেকে শক্তি যেন ছিটকে বেরোচ্ছে। প্রত্যেকটা পেশি যেন দর্শকের মনে একই সাথে ভয় আর সম্মানের অনুভূতি ছড়িয়ে দিচ্ছে। হেলট নিশ্চিত, এই লোক বড়ো কোনো যোদ্ধাই হবে। কিন্তু তাতেও তো হিসেব মিলছে না। বড়ো যোদ্ধা

হলে সে এখন এখানে কী করবে? আর সবচেয়ে বড়ো কথা তার শরীরে কোনো পোশাক নেই কেন?

কৌতূহল বড়ো ভয়ানক বিষয়। মানুষের অধিকাংশ বিপদের মূলে থাকে এই কৌতূহল। হেলট আগ্রহ নিবৃত করতে পারলো না। এগিয়ে এলো সে। আগুনের কাছে আসতেই বুঝতে পারলো নগ্ন লোকটা আগুনের পাশে জড়সড় হয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশ্চয়ই এতে বড়ো রহস্য আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কী করবে হেলট ভেবে পেলো না। খবর পাঠিয়ে দেবে নাকি মালিকের কাছে। চিন্তাটা আসতেই আবার গিলে ফেললো সে। খবর পাঠানোর উপায় নেই, তাকেই যেতে হবে। কিন্তু এই সময়ে এই লোককে রেখে তার যেতেও ইচ্ছে করছে না। ভয় আর কৌতূহলের এক মিশ্র অনুভূতির মধ্যে নগ্ন লোকটার সামনে বসে রইলো সে।

স্বাভাবিক কোনো লোক হলে অবশ্য তীব্র ভয় পেতো। তবে এই হেলট সাধারণ মানুষের কাতারে পড়ে না। এই জমি সে একা একা বহুদিন ধরে পাহারা দিচ্ছে। আর সবার থেকে তার সাহস বেশি বলেই মালিক তাকে এই কাজে নিযুক্ত করেছে। তবে এখন আরেকটা চিন্তা মাথায় উদয় হলো তার। আচ্ছা, সে কেন ভাবছে এই লোক মানুষ। হতে পারে কোনো অপদেবতা। এখনকার সময়ে অবশ্য দেবতাও নেই আর অপদেবতাও নেই। আগে না-কি এই দুইয়েরই অনেক চল ছিল।

হেলটকে আর দেবতা আর অপদেবতাদের নিয়ে চিন্তা বেশিক্ষণ চালাতে হলো না, তার আগেই চোখ মেলল এরিস। সামনে হেলটকে দেখে একটু চমকে উঠলো তার ভেতরটা, কিন্তু চমকের অনুভূতি তো সে দেখাতে জানে না। স্থির বসে রইলো সে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো হেলট, 'কে তুমি?' এরিসের খোলা চোখ সে দেখতে পেয়েছে, 'এখানে কীভাবে এসেছ? তোমাকে তো আগে এই নগরে কখনো দেখিনি? তোমার শরীরে কোনো কাপড় নেই কেন?'

শব্দগুলো হেলটের মুখ থেকে এরিসের কানে এসে পৌঁছালেও একটা বর্ণের মানেও সে বুঝতে পারলো না। কেবল তাকিয়ে রইলো হেলটের দিকে। একটু পড়ে আবার আগুনের দিকে তাকালো।

হেলটের ভয় আরও বেড়ে গেল। এই লোক তার কথার জবাব দিচ্ছে না কেন? সে তো আর খারাপ কিছু জিজ্ঞেস করেনি। তার মধ্যে অভিজাত সুলভ কোনো ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে না আবার সে যে কোনো দাস নয় তাও চোখ বন্ধ করেই বলে দেওয়া যায়। এখন কী করবে সেটাই সিদ্ধান্ত নেয়া যাচ্ছে না। আরেকটু সরে বসলো সে। হাতে তুলে নিয়েছে খাবারের পাত্র। এই খাবার ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না। অনেকদিন পরে মাংসের সন্ধান মিলেছে। খাবার খেয়েই এখান থেকে কেটে পড়তে হবে। এই লোককে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। এখানে এই লোকের

সাথে থাকা মোটেও নিরাপদ নয়। এখনো যদিও কোনো অস্বাভাবিক কাজ করছে না তবে করতে কতক্ষণ। মালিককে খবর দেবার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

খাবারটা তুলে নিজের কোমরের খাপ থেকে একমাত্র অস্ত্র ধারালো ছোরাটা বের করে পাশে রাখল সে। আত্মরক্ষার প্রয়োজন হলে করা যাবে। ছুরি সে ভালোই চালাতে পারে।

মাংস আর রুটির ওপর থেকে ঢাকনাটা সরাতেই মাংসের ওপরের ধোঁয়া আবার বেরোতে শুরু করলো। সেই ধোঁয়া টেনে নিয়ে এলো সুঘ্রান আর সেই ঘ্রাণ এসে ধাক্কা দিলো এরিসের নাকে। এরিস আবার তাকালো হেলটের দিকে। অবশ্য ঠিক করে বললে হেলটের হাতে থাকা পাত্রের দিকে তাকালো সে। সেখানে থাকা রুটি আর মাংসের ওপর তার চোখ যেন আটকে গেল। পেটের ভেতরের সেই মোচড়ের অনুভূতিটা আবার তাকে জানান দিলো, এবার তুমি সঠিক জিনিসের সন্ধান পেয়েছ। এটাই তুমি মুখে দিতে পারো।

এরিস বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। অবিশ্বাস্য গতিতে হেলটকে অবাক করে দিয়ে চলে এলো হেলটের ঠিক সামনে। ভয়ে চিৎকার করার কথা ভুলে গেল হেলট। অবশ্য চিৎকার করলেও তেমন কোনো লাভ হতো না। এই বিরান জায়গায় তার চিৎকার শোনার জন্য কেউ নেই। তবে একটু পরেই তার চিৎকার করার ইচ্ছে দূর হলো। আগন্তুক তাকে আঘাত করার জন্য ছুটে আসেনি। এসেছে তার হাতের পাত্রের জন্য। আগন্তুক তার হাতের পাত্র তুলে নিয়েছে। আচ্ছা, এতক্ষণে বোঝা গেল। এই লোক অনেক ক্ষুধার্ত।

এরিস খাবারের থালাটা তুলে নিয়েছে। রুটির ওপর একটা আঙুল বোলালো সে। তারপর পোড়া মাংসটাও ছুঁয়ে দেখল। এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে ইতস্তত করে মুখে দিলো সে। কই না, ওই পাতাগুলোর মতো বিস্বাদ ভাব করে উঠলো না মুখের ভেতরে। কেমন যেন সুস্বাদু রসে ভরে গেল মুখের ভেতরটা। দাঁতের কর্ষণে মাংসটা পিষে গলার ভেতরে চালান করে দিলো সে। রুটির টুকরোটা মুখে দিলো তারপর। এটা অতো ভালো না লাগলেও স্বাদটা নেহাত খারাপও নয়। দেখতে দেখতে ছোটো ছোটো টুকরো করে পুরো থালার রুটি আর মাংস পেটে চলে গেল তার।

নিজের খাবার অন্যের পেটে যাওয়াটা অনেকটা দুঃখ নিয়েই দেখল হেলট। অবশ্য সান্ত্বনা একটাই এখানে পুরোটা নেই, অর্ধেকটা রাতে খাবার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছিল সে। নইলে আগন্তুক যেভাবে খাচ্ছে তাতে ওটাও সাবাড় করে দিতো নিশ্চিত।

এরিস থালা খালি হতেই আবার তাকালো হেলটের দিকে। হেলট তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল, 'আর নেই বাবা। এটুকুই ছিল।'

এই কথারও মাথামুণ্ডু এরিস কিছুই বুঝতে পারলো না। তবে তার চোখ আটকে গেল আরেকটা জিনিসে। চোখ সরু করে জিনিসটা তুলে নিলো সে।

ছোরাটা হেলটের পাশেই পড়ে ছিল। ছোরাটা হাতে তুলে ভালো করে দেখতে লাগলো সে। ছুরি হাতে নেয়াতে হেলট মারাত্মক ভয় পেয়েছে। নিজের বোকামির জন্য এখন অনুশোচনা হচ্ছে তার। প্রথমেই পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

তবে এরিস ছুরি নিয়ে হেলটকে আক্রমণ করলো না। উল্টেপাল্টে কেবল দেখতে লাগলো ছুরিটা। এক সময় ফলায় আঙুল দিলো সে। ধারালো ফলার ধার সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না। একটু কেটে গেল আঙুল। রক্তের একটা ক্ষুদ্র ধারা বেরিয়ে এলো সাথে সাথে। তেমন কোনো আঘাত নয়, কিন্তু এরিসের সম্পূর্ণ মাথা যেন ঘুরে উঠলো। ব্যথা নয়, এটা যেন অন্য কোনো অনুভূতি। ছোরাটা আঁকড়ে ধরেই মাটিতে শুয়ে পড়লো সে।

তার মাথায় এবার যেন আস্তে আস্তে সবকিছু পরিষ্কার হতে লাগলো। একটা দৈব স্থানে এক পাহাড়ের ওপরে বারোটা বিশেষ আসন রাখা। সেই আসনগুলোর একটাই বসে আছে সে। সামনে বসে আছেন সেই দৈব পাহাড়ের সর্বেসর্বা, হাতে তার কঠিন উজ্জ্বল বজ্র, তিনি বলে চলেছেন, 'এরিস, তুমি বন্দি হবে। তোমার শক্তি ক্রমাগতই কমছে। কিছুতেই তুমি আর তাদের এই আহ্বানকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমাদের পূজা সব নগর করে। এথেন্স আমার পূজা করে, প্রত্যেক দেবতাদের নিজস্ব নগর আছে, যে নগরের ভক্তির শক্তিতে তারা এই অলিম্পাসে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তোমার হিংসা আর ঘৃণা মূলক আচরণের জন্য তোমার পূজা কেউ করে না। আর মানুষের সমর্পণই আমাদের শক্তি। তোমার সেই শক্তি কমে আসছে। তুমি বন্দি হবে।'

নিজের আসনে বসে কেঁপে উঠছে যেন সে, এতদিন পরেও সেই কম্পন যেন অনুভব করতে পারলো, 'আমার মুক্তির উপায় কী পিতা?'

'তোমার মুক্তির উপায় একমাত্র তোমার রত্ন। যখন টিয়ার অব এপোলোর মতো কোনো দৈব রত্ন এই ভূখণ্ডে উন্মোচিত হবে তখন সেই শক্তির বলেই তুমি জেগে উঠবে। তবে জেগে ওঠার পর তুমি সব ভুলে যাবে। ভুলে যাবে তুমি অসীম শক্তিশালী দেবতা, ভুলে যাবে তুমি কে? ভুলে যাবে তুমি অমর, অজর।'

'আমার স্মৃতি ফিরে আসবে কীসে?'

'যাতে তোমার পরিচয় জড়িয়ে আছে তাতেই তোমার স্মৃতি লুকিয়ে থাকবে। যখন তুমি জেগে উঠবে মানে আদৌ যদি তুমি জাগতে পারো আর কি, তখন তুমি ততদিন স্মৃতি ফিরে পাবে না যতদিন তোমার হাতে কোন অস্ত্রের ছোঁয়া লাগে। সেই অস্ত্রের ছোঁয়াতেই তোমার সব স্মৃতি ফিরে আসবে। কারণ তুমি যুদ্ধের দেবতা, অস্ত্রের দেবতা। অস্ত্রেই লুকিয়ে থাকবে তোমার পরিচয়, অস্ত্রের লুকিয়ে থাকবে তোমার ক্ষমতা।'

এরপরে আরও কিছু খণ্ড দৃশ্য যেন ভেসে উঠলো তার সামনে। যুদ্ধ, রক্ত, উল্লাস, আর্তনাদ আর সবশেষে এক নারী। এমন সৌন্দর্য পৃথিবীর কারো দেখার সৌভাগ্য কখনো হয়নি। এতদিন পরেও কল্পনায় সেই নারীকে দেখতে পেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস কেবল বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে।

'আফ্রোদিতি!'

চোখ মেলল এরিস। নিজের পরিচয়, স্মৃতি আর ক্ষমতা সবকিছুই ফিরে পেয়েছে সে। অনেকদিন পরে ফিরে এসেছে যুদ্ধের দেবতা। শান্তি যার দুই চোখের বিষ।

সামনে দাঁড়ানো হেলট এরিসের অবস্থা দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখনো সে কেন পালিয়ে যাচ্ছে না এটা যেন তার কাছেই একটা বিরাট ধাঁধা। আর বেড়াল কৌতূহলেই মরে।

কাজটা ওরা আগেও করছিল। আজকে যদিও জায়গা একটু বদলে গেছে তবে প্রক্রিয়া একই আছে। নিজেদের জায়গা মতো দাঁড়িয়ে গেল দাসেরা। ইভান আর ওরিয়নও নিজেদের জায়গা মতো দাঁড়িয়ে আছে। শুরুতে প্রতিপক্ষকে ঘাবড়ে দিতে পারলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। আর সুবিধা মতো জায়গায় অবস্থান করাটা চোরাগোপ্তা হামলার সবচেয়ে কার্যকর অংশ।

ইভান একটু এগিয়ে গিয়ে দলটাকে দেখে এসেছে। সেনা প্রায় দশজনের মতো আছে। তবে একবার দেখেই সে বুঝেছে ওরা তেমন দক্ষ সেনা নয়। পোশাকে আর অস্ত্রে সজ্জিত হলেও শিক্ষা অথবা প্রশিক্ষণ তেমন পায়নি। কাবু করতে তেমন কোনো সমস্যা হবে না। তার আসলে কাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করাই চিন্তা। ওদিকে ইনোন অনেকের সাথে থাকলেও আসলে একাই আছে। সে নিজেও আসলে এই মুহূর্তে ইনোনের কাছ থেকে দূরে থেকে স্বস্তি বোধ করছে না।

দলটার কাছে মালামাল ভালো পরিমাণেই আছে। সেগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। ওদের কাঙ্ক্ষিত জায়গায় আসতে আরেকটু সময় লাগবে। সেটুকু সময় অপেক্ষা না করে লাভ নেই। সবাই মোটামুটি দম বন্ধ করেই আছে। ওরিয়ন তাকিয়ে আছে একবারে সামনের দিকে। পথের ওপর মেলে রেখেছে তার অপলক দৃষ্টি। কাজে ডুবে গেলে মানুষের শোক অনেকটাই কমে আসে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দলটার চলাচলের শব্দ শোনা গেল। প্রথমে মৃদু থেকে আস্তে আস্তে শব্দ তীব্র হতে লাগলো। লোকগুলো স্বাভাবিক ভাবে হাসি ঠাট্টা আর গল্প করতে করতে এগিয়ে আসছে। সামনে ওদের জন্য কী অপেক্ষা করছে সেই সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। কেউ কেউ অবশ্য এর মধ্যেও একটু সতর্ক। চারিদিকে মাঝে মাঝে সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে। সম্প্রতি হওয়া ডাকাতির ঘটনাগুলোর খবর ওদের কানে গেছে। তবে ডাকাতেরা ওদের আক্রমণ করব, এই চিন্তা করছে না তারা। সতর্ক থাকাটা নেহাত অভ্যেসের বশে।

তবে দক্ষ না হলে শুধু সতর্কতা কোনো কাজে আসে না। এখানেও এলো না। ইভানের ঠিক করে রাখা জায়গায় পুরো দলটা পৌঁছানো মাত্র ইভান সংকেত দিলো এবং একই সাথে নিজেও বেরিয়ে এলো। তার স্পষ্ট কণ্ঠ যেন চিরে দিলো জঙ্গলের নীরবতা, 'যে যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। নড়লেই নানা রকমের ঝামেলা হবে।'

দলের সাথে থাকা সৈন্যরা নিজেদের অস্ত্র বাগিয়ে ধরল সাথে সাথে। চারিদিকে তাকিয়ে যদিও তারা বুঝতে পারলো ভালো রকম বিপদেই পড়ে গেছে। ডাকাতেরা তাদেরকে সব দিক থেকেই ঘিরে ফেলেছে।

ইভান এবার আরেকটু সামনে এগিয়ে এলো, 'অস্ত্রগুলো ফেলে দিতে বলবো না, তবে সংবরণ করো। তোমরা সহযোগিতা করলে কাজটা অতো কঠিন হবে না। আমরা শুধু তোমাদের সাথের মালামাল নিয়ে যাবো। তোমাদের বাহন, অস্ত্র আর প্রাণের কোনো ক্ষতি হবে না। আর তোমরা প্রতিরোধ গড়ার কথা হয়তো ভাবছ, কিন্তু তাতে যে লাভ একেবারেই হবে না সেই নিশ্চয়তাও আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি। তাই আমার কথা মেনে নিলেই ভালো করবে।'

একজন সৈন্য অস্ত্র সংবরণ করলো ঠিকই কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলো না, ইভানের দিকে এগিয়ে এলো ছোটো ছোটো পায়ে, 'তুমি তো গ্রীক, স্পার্টান নাগরিক ছিলে। এখন এই হেলটদের সাথে মিশে নিজের মর্যাদা খুইয়ে ফেলতে তোমার বিবেকে বাঁধছে না? তুমি কি ভুলে গেলে স্পার্টানদের আভিজাত্য। সেই নগরের সেরা সৈনিক প্রশিক্ষণ পেয়ে এখন সেই নগরের লোকজনের বুকেই তুমি ছুরি ধরছ। গৌরবময় সৈনিক হয়ে বেছে নিয়েছ ডাকাতের জীবন। কোথায় তোমার আত্মসম্মান? কোথায় তোমার আদর্শ?'

ইভান চট করে জবাব দিতে পারলো না কথাটার, কিছু একটা বলতে যাবে, তবে তার আগেই জবাব দিলো ওরিয়ন, কথায় নয়, তলোয়ারে, একেবারে আমূল বিঁধিয়ে দিলো তলোয়ারের ফলা সৈন্যের বুকে। ওরিয়নের ঠান্ডা স্বর সবাইকে যেন কাঁপিয়ে দিলো, 'এত বড়ো বড়ো কথা বলার দরকার নেই। স্পার্টার অভিজাত সেনারা কী করতে পারে, কী তাদের আত্মসম্মান আর অহংকার তা তোমার চেয়ে ভালো জানি আমি।'

কথাটা ঠিকমতো শুনতে পাবার আগেই প্রাণ হারিয়েছে সৈনিক। বাকি সৈন্যরা আর কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পেলো না, তারা তো বটেই এমনকি ইভান আর হেলটেরাও অবাক হয়ে গেছে ওরিয়নের এমন শীতল আচরণে। একটা মানুষ মেরেও নির্বিকার সে। ইভান এগিয়ে এলো ওরিয়নের দিকে, 'এটা তুমি কী করলে? স তো আমাদের আক্রমণ করেনি। বিনা কারণে একজন মানুষ হত্যা করা উচিত হলো না।'

নিজের তলোয়ারের ফলা মুছতে মুছতে ওরিয়ন বলল, 'সে আমাদেরকে শব্দ দিয়ে আক্রমণ করেছে। এবং তার কথা ছিল জঘন্য মিথ্যাচার। আর যাই হোক, স্পার্টার মানুষের মুখে আদর্শের কথা মানায় না।'

'সবাই তো একরকম নয় ওরিয়ন। একজনের দোষে পুরো জাতির ওপর তোমার রাগ হওয়াটা কি উচিত?'

'বাদ দাও তো। এত কথার দরকার নেই। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করো। কাজের সময়ে ওই লোকের জ্ঞান শুনে নষ্ট করার মতো সময় আমাদের ছিল না।'

ওরিয়নের কাজ দেখে এরই মধ্যে বাকি সবাই ভয় পেয়ে গেছে। এতক্ষণ সবাই অস্ত্র সংবরণ করলেও এবার সবাই অস্ত্র ফেলে দিলো হাত থেকে। কেউ টুঁ

শব্দও করছে না। যদি আবার কোন কথায় রেগে গিয়ে কাকে মেরে ফেলে ওরিয়ন।

ওরিয়নের আচরণে যথেষ্ট অবাক হয়েছে ইভান। তবে এটা সে যথেষ্টই বুঝতে পারছে ওরিয়ন পুরোপুরি বদলে গেছে। তাকে এক পলকে অমানুষ করে দিয়েছে ডোরার মৃত্যু। সে এখন কেবল একজনের ওপরেই প্রতিশোধ নেয়ার কথা চিন্তা করছে না, বরণ সমস্ত মানবজাতির ওপরেই তার ক্ষোভ জন্ম নিয়েছে।

এসব চিন্তায় বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করা যাবে না। এই রাস্তায় অন্য কেউ চলে আসতে পারে। হেলটদের দিকে ইশারা করলো ইভান। এবার হেলটেরা এগিয়ে এলো। যত মালামাল ছিল সব ভাগ করে একে একে নিজেদের অধিকারে নিয়ে নিলো তারা। তারপর মালবাহী ঘোড়ার গাড়িতে তুলে দেওয়া হলো লাশটা।

মালামাল নিয়ে হেলটেরা যার যার অংশ ভাগ করে ফেললো। ওদের বাহন বলতে কেবল দুটো এক ঘোড়ার গাড়ি। সেগুলোতে সব এঁটে গেল না। কিছু বয়ে নিয়ে যেতে হবে। ইভান তাকালো ওরিয়নের দিকে। একজন ফুর্তিবাজ মানুষ কীভাবে রাতারাতি বদলে গেছে। বছরের পর বছর নির্দয় প্রশিক্ষণ যে পরিণতি দিতে পারেনি, শুধু একটা রাত, শুধু একটা মৃত্যু তাকে সেই অবস্থার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ইভান চিন্তিত মুখেই চিন্তা করছে ওরিয়নের কথা। যে মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তার ধ্বংস অনিবার্য।

হেলটেরা সবকিছু গুছিয়ে বেঁধে ফেলেছে। এবার আস্তানার দিকে রওনা দেবার পালা। ডাকাতির শিকার হওয়া দলটার কাছে এখন আর বোঝা নেই। তাদের কাছে আছে কেবল আতঙ্ক। সেই আতংকের তাড়ায় ওরা নিজেদের বাহন ছুটিয়ে দিয়েছে সর্বোচ্চ গতিতে। ওদের কোনো চিহ্নই আর দেখা যাচ্ছে না, আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না।

যাত্রা করার ঠিক আগের মুহূর্তে সামনের দিকে নজর রাখতে থাকা এক হেলট মোটামুটি দৌড়েই এলো। ইভানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। এই দলে ইভান যে একমাত্র নেতা সেটা কাউকেই বুঝিয়ে দিতে হয়নি। ইভান জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে? কী দেখেছ তুমি? বড়ো কোনো সেনাদল আসছে না-কি?'

'না, তবে বন্দরের দিক থেকে তিনজন মানুষ এগিয়ে আসছে। ওদের একজন গ্রীকদের মতো হলেও বাকি দুজন সমুদ্রের ওপারের বিদেশিদের মতো দেখতে। ওদের কাছে কিছু জিনিসপত্র আছে।'

মাত্র তিনজন, একেবারে সহজ শিকার। এক দলকে কাবু করতে এসে উপরি হিসেবে আরেক দলকে পেয়ে যাওয়াটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আরেক হেলট মন্তব্য করলো, 'দেখাই যাক না, ওদের কাছে কী আছে। কিছু যদি না থাকে তাহলে ছেড়ে দেবো। নিজেদের পথে চলে যাবে।'

2024/01/15 18:22

কথাটা ইভান এড়িয়ে যেতো তবে ওরিয়ন হেলটদের পক্ষেই মত দিলো, 'দেখাই যাক না ইভান। দলটা ছোটো। কোনো সেনা নেই। ঝামেলা নেই। দেখি ওদের কাছে কী আছে।'

ইভান মনে মনে বলল, ঝামেলা তো যে তিনজন আসছে তাদেরকে নিয়ে না। তুমিই হচ্ছ এখন ঝামেলা। মুখে মত দিলো, 'ঠিক আছে। মালামাল নিয়ে কয়েকজন ভেতরের দিকে চলে যাও। বাকিরা লুকিয়ে পড়ো জায়গা মতো।' ওরা আবার লুকিয়ে পড়ে অপেক্ষা করতে লাগলো তিনজনের দলটার জন্য।

অসিত, রুদ্রদেব আর শেইরন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। তেমন কোনো তাড়া ওদের নেই। তবে এরই মধ্যে শেইরন বলেছেন, প্রথমেই ওদের দুজনের নগরের ভেতরে ঢোকা উচিত হবে না। তার এক পরিচিত জায়গা আছে নগরের বাইরে। আপাতত সেখানে গিয়েই উঠতে হবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

আরও নানা কথায় পথের দৈর্ঘ্য কমাতে থাকে তিনজনে। শেইরনের হাঁটার গতি নিজের দেশে এসে যথেষ্ট বেড়েছে। কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে তেমন দেরি হবার কথা নয়।

আরেকটু এগিয়ে নিজের গতি একটু কমিয়ে আনলো রুদ্রদেব। সামনের পথের দিকে তাকিয়ে আছে চোখ সরু করে। শেইরন রুদ্রদেবের গতি কমানো খেয়াল করলেন, 'কী হয়েছে, তোমার কি আবার হাঁটুতে ব্যথা শুরু হয়েছে না-কি?'

কথাটার উত্তর কোনো ধরনের ঠাট্টায় দিলো না রুদ্রদেব, 'এই জঙ্গলে কি ডাকাত আছে?'

প্রশ্নটা আচমকা এলো, শেইরন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। তিনি নিজেও এবার একটু চিন্তিত বোধ করতে লাগলেন, 'না তো। স্পার্টার সৈনিকদের মোকাবেলা করবে এমন ডাকাত তো থাকার কথা নয়। কিছু বিদ্রোহী নগরত্যাগী হেলট দস্যুর কথা শুনেছিলাম। তবে ওরা কখনো সৈন্যদের আক্রমণ করে না। সবসময় নিঃসঙ্গ অথবা নিরস্ত্র পথিকদের কাছ থেকেই জিনিসপত্র কেড়ে নেয়। তারা তো আমাদেরকে আক্রমণ করার কথা নয়। আমাদের কাছে আর কিইবা আছে।'

'কিন্তু সামনের বাতাস তো তেমন কিছু বলছে না। আমার মনে হয় সামনে কেউ ওত পেতে আছে। আমাদের সাবধান হতে হবে।'

'আর তো কোনো পথ নেই। এদিক দিয়েই তো যেতে হবে।'

'যাবো। তবে সাবধানে। অসিত, চোখ কান খোলা রেখো।'

তিনজনে আবার হাঁটতে শুরু করলো। তবে এবারে আর কথা বলছে না নিজেদের মাঝে। সামনের পথের জায়গাটার দিকেই নজর রুদ্রদেবের। কেউ যদি

লুকিয়ে থেকে হামলা করে চমকে দিতে চায় তাহলে এরচেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর হয় না। আর তার কেবলই মনে হচ্ছে ওখানে কেউ আছে।

ইভান নজর রেখেছে এদিকে। তিনজনের দলটা আরেকটু সামনে আসতেই ওদেরকে স্পষ্ট দেখতে পেলো সে। তবে একেবারে লম্বা বিদেশি লোকটা হঠাৎ হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেছে। এদিকে তাকিয়ে বুড়ো লোকটাকে যেন কী বলছে। তিনজনেই হঠাৎ করে যেন চিন্তিত হয়ে পড়লো। তবে আবার হাঁটতে শুরু করলো ওদের দিকে। ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হলো না ইভানের। ওই লম্বা লোকটা যেন বুঝতে পেরেছে ওরা সামনে অপেক্ষা করছে। কিন্তু কীভাবে বুঝবে? সেরকম কোনো উপায়ই নেই। মন মনে একটু ঝামেলার গন্ধ পাচ্ছে সে। তবে বিপদ হবে না। হয়তো লোকটা খুব ভালো চিহ্ন অনুসরণকারী। প্রকৃতির ভাষা খুব ভালো বুঝতে পারে। যুদ্ধ করতে এলে ওর সামনে পাত্তাই পাবে না।

তিনজন আরেকটু এগিয়ে এসেছে। একটু পরেই ওরা প্রবেশ করলো ওদের বলয়ে। ইভান নড়ে উঠলো। একটা ছোটো লাফ দিয়ে দাঁড়ালো পথের ওপর। রুদ্রদেবের দিকে চাইলো সোজাসুজি, 'তোমাদের কাছে যা আছে তা রেখে পথ ধরে এগিয়ে যাও। তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।'

রুদ্রদেব তাকিয়ে আছে ইভানের দিকে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এমন কিছু যে ঘটবে সেটা যেন সে আগে থেকেই জানতো। সেই মুখে চমকানোর কোনো ভঙ্গি নেই, ভয়ের কোনো ছাপও নেই। এমন দৃঢ়-দৃপ্ত চোখ এর আগে খুব কমই দেখেছে ইভান। এবার একটু ধমক দিলো সে, 'কী, কথা কানে যাচ্ছে না? যা বললাম করো।'

এরই মধ্যে হেলটেরা বেরিয়ে এসেছে যার যার জায়গা থেকে। রুদ্রদেব চারপাশে তাকিয়ে সবাইকেই দেখতে পেলো। তারপর অস্পষ্ট গ্রীকে বলল, 'আমাদের কাছে তো তোমাদের উপকারে আসার মতো কিছু নেই। আমাদের কাছে কেবল কিছু অস্ত্র আছে। অল্প কিছু মুদ্রাও অবশ্য আছে। সেগুলো নিতে পারো।'

ওরিয়ন এগিয়ে এলো এবার মুখ কঠিন করে, 'তোমাদের জিনিস এখানে রাখো। তারপর আর একটা কথাও না বলে এগিয়ে যাও। কী আছে আর কী না আছে সেটা আমরা বুঝবো।'

রুদ্রদেব এবার একটু মুচকি হাসলো, 'সেটা তো করা যাবে না। আমি আমার অস্ত্র দিয়ে দেবার আগে আমার জীবন দিয়ে দেওয়াই ভালো মনে করবো।'

ওরিয়নের চোখ জ্বলে উঠলো সাথে সাথে, তার তলোয়ার একটু আগেই রক্তের দেখা পেয়েছিল। তলোয়ার আর তলোয়ারের মালিক আবারো রক্তের নেশায় হন্যে হয়ে উঠলো। ইভান একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকাতে বাঁধা দেবার সুযোগ পেলো না।

ওরিয়ন ভয়ংকর এক ভঙ্গি করে নিমেষে নিজের বাগিয়ে ধরা তলোয়ার চালিয়ে দিলো রুদ্রদেবের গলা লক্ষ্য করে।

ইভান ওরিয়নকে থামাতে হাত তুলেছিল, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, তলোয়ারের ফলা রওনা হয়ে গেছে রুদ্রদেবের গলার উদ্দেশ্যে। একটু আগেও নিজের চোখের সামনে অকারণ হত্যা দেখেছিল সে। এখন আবার তার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু তারপর সে যা দেখল তাতে চোখ আসলেই কপালে উঠে গেল তার।

রুদ্রদেব একটু ঝুঁকে নিখুঁত হিসেবে এড়িয়ে গেল ওরিয়নের তলোয়ার। তারপরে নিজের হাতে হালকা একটু ধাক্কা দিলো ওরিয়নের বুকে। সেই হালকা ধাক্কার চোটেই মোটামুটি তিন পেস পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো ওরিয়ন।

নিজের হাতটা একটু ঝেড়ে নিলো রুদ্রদেব, 'তুমি দেখছি আমাকে মারার জন্যই আঘাত করেছিলে। আহত করার জন্য নয়। কোনো কারণ ছাড়া এমন আঘাত করা কি তোমার উচিত হচ্ছে। তোমাদের এদিকে তো দেখি ডাকাতের কোনো ধর্মই নেই। ভুলে যেও না, তোমরা ডাকাত, মনুষ্য ধর্ম ত্যাগ করে ফেলা কোনো রাক্ষস নও।'

ওরিয়ন বুক ভীষণ ব্যথা পেয়েছে। তবে ব্যথার অনুভূতির চেয়েও যেটা সবচেয়ে আঘাত করেছে তাকে সেটা হচ্ছে অপমান, ক্রোধ। সে একজন ক্রিস্টেয়ারের সৈন্য আর এই ভিনদেশি কিনা বিনা হাতিয়ারে তাকে হটিয়ে দিলো। তার হাতে আছে তলোয়ার। মরিয়া হয়ে সে আবার হামলা করলো। কিন্তু এবারেও ব্যর্থ হতে হলো তাকে। রুদ্রদেব পিছিয়ে গিয়ে ওর আঘাত এড়িয়ে গেছে। আরেকবার আঘাত করতে যেতে অবিশ্বাস্য গতিতে সামনে এগিয়ে এলো রুদ্রদেব। আবার নিজের বুকে ভীষণ এক ধাক্কা খেলো ওরিয়ন।

রুদ্রদেব একটুও হাফাচ্ছে না, এই জিনিসটাই বড়ো অবাক করছে ইভানকে। সে রুদ্রদেবের শরীরের নড়াচড়া দেখতে দেখতে ওরিয়নকে থামানোর কথা ভুলেই গেল। ওদিকে ওরিয়ন হয়েছে ক্রোধে অন্ধ, নয়তো সেও বুঝতে পারতো সে যার দিকে বারবার আক্রমণ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে সে আসলে সাধারণ কোনো লোক নয়। কিন্তু সেটা বোঝার ক্ষমতা এখন আর তার নেই। সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো।

রুদ্রদেব এবার নিজের ঝোলা ফেলে দিয়েছে রাস্তার পাশে। দুই হাত মুক্ত কর এগিয়ে এলো সে। একটা ছোটো লাফ দিয়ে শরীর বাঁকিয়ে ধরে ফেললো ওরিয়নের কবজি, সাথে সাথে বুঝতে পারলো এই কব্জির মালিকের শরীরে অনেক শক্তি। নিজের খালি হাতে যুদ্ধ করার অস্ত্রগুলোর মাঝ থেকে একটা বড়ো অস্ত্র বের করলো সে এবার। পবন বেগের প্রয়োগ করলো। সাথে পরশুরামের বিদ্যা কালারি। ওর ডান হাতের তর্জনী কেবল নড়ে উঠলো, সেটাকে নিজের দিকে আসতে ঠিকমতো দেখতেও পেলো না ওরিয়ন। সেই তর্জনী তার গলার পাশে মৃদু আঘাত করলো।

মাপা এবং নিখুঁত স্থান নির্বাচন। ওরিয়ন কিছুই করতে পারলো না। তলোয়ার খসে পড়লো তার হাত থেকে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে মাটির ওপরে।

এমন দৃশ্য কেউ কখনো আগে দেখেনি। হেলটেরা চিৎকার করে উঠলো। ইভান এবার তেড়ে গেল রুদ্রদেবের দিকে, 'কী করেছ তুমি ওর সাথে?'

রুদ্রদেব এখনো হাফাচ্ছে না, 'না, তেমন কিছু করিনি। কেবল অজ্ঞান করে দিয়েছি। এক বেলার মধ্যেই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে। মনে হলো তোমার বন্ধুর কোনো কারণে মেজাজ অনেক খারাপ। ক্রোধ তার ভেতরটা পুরোপুরি অধিকার করে নিয়েছে। এছাড়া আসলে ওকে থামানোর আর কোনো উপায় ছিল না।'

ইভান তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করলো ওরিয়নকে, না, শ্বাস এখনো চলছে। সে এবার দাঁড়ালো রুদ্রদেবের সামনে, 'তোমরা তিনজন এখন আমাদের সাথে যাবে। আমার বন্ধু জেগে উঠলে তোমাদের মুক্তি। নইলে তোমাদের তিনজনকে আমি নিজ হাতে মারবো।'

'উত্তম প্রস্তাব। আমরা এমনিতেও একটু আশ্রয় খুঁজছিলাম। তোমাদের সাথে যেতে কোনো আপত্তি নেই। আর তোমার বন্ধুও জেগে উঠবে।'

ওরিয়নকে তুলে দেওয়া হলো ঘোড়ার গাড়িতে। ওরা রওনা দিলো জঙ্গলের ভেতরের দিকে। শেইরন হাঁটতে হাঁটতে কেবল ভাবছে, আশেপাশের সব তো দেখা যাচ্ছে হেলট। এর মধ্যে দুজন নিশ্চয়ই হেলট নয়। যুদ্ধ করার ভঙ্গিতেই বোঝা গেছে যে অজ্ঞান হয়ে গেছে সে আসলে ক্রিপ্টেয়ারের সদস্য। ওদের দুজনের তো অভিজাত হবার কথা।

স্পার্টার দুই অভিজাত কোন কারণে হেলটদের ডাকাত দলে এসে যোগ দিয়েছে সেই হিসেব কিছুতেই মেলাতে পারছে না শেইরন।

হেলট বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে ছিল এরিসের দিকে। ছুরিটাই হাত দিতেই আগন্তুক যেন কেমন হয়ে গেছে। তারপর অনেকক্ষণ পড়ে লোকটা বন্ধ চোখ খুলল। একটা শব্দ বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে, শব্দটা বুঝতে পারলো না হেলট, তবে এটুকু বুঝতে পারলো ঠিকই, লোকটা বোবা নয়।

আরও কিছুক্ষণ সময় পেরিয়ে গেল। এবার হেলটের মনে ফিরে এলো একটু সাহস, সে হাত বাড়িয়ে দিলো, 'আমার ছুরিটা দাও।'

এরিস এবার তাকালো হেলটের দিকে, এতক্ষণ সে যেন ভুলেই গিয়েছিল সামনের মানুষটার উপস্থিতি, 'তোমার ছুরির এই অবস্থা কেন? যত্ন নাও না। কেউ যদি তার অস্ত্রের যত্ন না নেয় তখন আমার খুব রাগ হয়।'

হেলট ধীর গতিতে অস্ত্রটা আগন্তুকের হাত থেকে নিলো। আগন্তুক তো আর জানে না, তারা হেলট, অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি তাদের নেই। অনেক সৌভাগ্যের ফলে হেলট হয়েও সে এই অধিকার পেয়েছে। সে অনুযোগ করল, 'আমার হাতে ছুরির এই অবস্থা হয়নি। ছুরিটা ব্যবহার করতে করতে নষ্ট হবার পরেই মালিক আমাকে দিয়েছে। আমি যতটুকু পেরেছি ভদ্রস্থ করেছি এর চেহারা।'

এরিস মেনে নিলো হেলটের কথা। হেলট এর মধ্যেই বুঝে গেছে আগন্তুক শুধু বোবা নয় যে তা না, বরং সে তাদের ভাষাতেই কথা বলতে পারে। এবার কথাবার্তার সুবিধা হবে। জিজ্ঞেস করলো সে, 'তুমি এইখানে এলে কোত্থেকে?'

'অলিম্পাস থেকে।'

'কোত্থেকে?' অবাক হয় গেল হেলট। এমন কোনো জায়গার নাম সে তো কখনো শোনেনি।

এরিস বুঝতে পারলো এই লোক অলিম্পাস সম্পর্কে কিছুই জানে না। সে প্রসঙ্গ বদল করলো, 'আচ্ছা, সেই কথা থাক। তোমার কাছে কি আর কোনো খাবার আছে? থাকলে নিয়ে এসো। ক্ষিধে এখনো আছে।'

হেলট এবার মনে মনে প্রমাদ গুনলো। অনেকদিন পরে একটু ভালো খাবার কপালে জুটেছিল। সেই খাবারের অর্ধেকটা এরই মধ্যে এই ব্যাটা হজম করে ফেলেছে। এখন আবার বাকি অর্ধেকের দিকেও হাত বাড়াবার মতলব। তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লো সে, 'আমার যা খাবার ছিল সবটাই তো তুমি একটু আগে খেয়ে ফেলেছ। এখন আর আমার কাছে কোনো খাবার নেই। খাবার পেতে হলে তোমাকে এখন নগরের দিকে যেতে হবে।'

'নগর কোন দিকে?'

'ওদিকে।' নগরের দিকে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দিলো হেলট।

রাস্তাটা দেখে নিয়ে এবার এরিস তাকালো হেলটের দিকে। তার চোখমুখই বলে দিচ্ছে মিথ্যে বলেছে ব্যাটা। হয়তো তেমন কোনো বড়ো অপরাধ নয়, সে তো আর জানে না তার পরিচয়। তবে মিথ্যে বলার শাস্তি তো দিতেই হবে।

এগিয়ে গেল এরিস। অনায়াসে হেলটের গলা ধরে তাকে শূন্যে তুলে ফেললো, 'তোমাকে আরেকটু দয়াশীল হতে হবে। মানুষ হিসেবে দান করতে জানতে হবে। ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া সবার উচিত। দেবতাদের শিক্ষা তোমার ভেতরে দেখছি একদম নেই। খাবার সম্পর্কে তুমি মিথ্যে কথা বললে কেন?'

নিজের গলায় চাপ লেগে থাকার কারণে কিছুই বলতে পারছে না হেলট। একটু বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে আর সেই সাথে হাত পা ছুঁড়ছে বিপুল বেগে।

'জানি তুমি মিথ্যে বলেছ। আর এই মিথ্যে কথাটা আমি পছন্দ করলাম না।'

কথাটা শেষ করেই এরিস তার মুক্ত হাতের এক ভীম মুষ্ট্যাঘাত করলো হেলটের বুকের ওপর। যেখানে হৃদপিণ্ড ধুকপুক করতে থাকে। বড়োই ভীষণ সে আঘাত, বুকের শক্ত পাজর খাঁচার ওপর দিয়ে সে আঘাত পাজর ভেঙ্গে হৃদপিণ্ডে পৌঁছে গেল। এক নিমেষে বিস্ফোরিত হলো হেলটের হৃদপিণ্ড। আর সে শব্দ করার চেষ্টা করলো না, হাত পা ছোঁড়ারও আর কোনো কারণ রইলো না।

হেলটের শরীরটা একদিকে ফেলে দিলো এরিস। তারপর এদিক ওদিক একটু তাকাতেই অদূরে দেখতে পেলো হেলটের জিনিসপত্র। সেদিকে একটু হাত লাগাতেই খাবারের সন্ধান পেলো সে। খাবারটা পেয়ে গরম করা অথবা অন্য কোনো ঝামেলায় গেল না, সোজা চালান করে দিলো পেটে। খিধে এখন পুরোপুরি মিটেছে তা বলা যাবে না, তবে মোটামুটি সুস্থির হবার মতো অবস্থায় আসা গেছে।

এভাবে নগ্ন অবস্থায় থাকা চলবে না। সভ্য জগতে তাকে দেখলে প্রথমেই লোকে ভিরমি খাবে। এমনিত তা খাবে তবে প্রথম দেখাতেই খাক এটা সে চায় না। হেলটের কাপড়গুলো তুলে দেখতে লাগলো সে। বেশ কিছু গায়ে জড়ানোর মতো জিনিস খুঁজে পেলো। মাপ মতো হলো না, তবে চলে যাবে। হেলটের দেহ পুষ্টিতে তার দেহের অর্ধেক, তাই মাপ মতো হবার কোনো কারণ নেই। পোশাক ঠিকমতো গায়ে জড়িয়ে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলো সে। তার ঘুমের দরকার হয় না। না ঘুমিয়েই মাসের পর মাস থাকতে পারে। তবে একটু অলস বসে থাকতে কোনো আপত্তি নেই।

আগুনের কাঠের ব্যবস্থা হেলট একেবারে সকাল পর্যন্তই করে রেখেছিল। তাই দিয়ে কিছুক্ষণ পর পর আগুন উস্কে দিচ্ছিল এরিস। একেবারে ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত এই কাজ চালিয়ে গেল সে। ভোরের আলো উঁকি দিতেই উঠে দাঁড়ালো। এখানে এখন এই নিহত ব্যক্তির পরিচিত লোকজন চলে আসতে পারে।

যদিও কেউই তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তবু শুধু শুধু ঝামেলায় জড়ানোর কী দরকার। স্থান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

কাল রাতে হেলট তাকে নগরে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছিল। দেখানো দিকে একটু এগিয়ে আসতেই সেই রাস্তার খোঁজ পাওয়া গেল। নগর বেশি দূরে হবার কথা না। তার ঘ্রাণ শক্তি অনেক প্রখর। দেবতাদের ক্ষমতার মধ্যে এটাও একটা ক্ষমতা। মানুষের গন্ধ পাচ্ছে সে, অনেক মানুষের গন্ধ একত্রে। আর একসাথে অনেক মানুষ একমাত্র নগরেই থাকবে। গন্ধই তাকে পথ দেখাল। নগরের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। হেলটের গায়ের বেখাপ্পা পোশাকে তাকে অদ্ভুত লাগছে। যে কেউ দেখলেই অবাক হবে। তবে নগ্ন থাকার চেয়ে এটা শতগুণে ভালো।

ভোরের আলো ততক্ষণে পুরোপুরি ফুটে উঠেছে। নগরের গায়ে লোকজন জেগে উঠতে শুরু করেছে। এরিস ঢুকে পড়লো নগরের ভেতরে। সদর দরজার দুজন প্রহরী তার দিকে একবার বাঁকা চোখে তাকিয়েছিল কিন্তু একটু বাদেই তারা দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো। লোকটার গায়ে সাধারণ হেলটের পোশাক। প্রহরীদের চোখে লেগে ছিল রাতের নিদ্রা। নয়তো তারা বুঝতে পারতো, অনাহারে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে থাকা কোনো হেলটের দেহ এত সুগঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

এরিস নগরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। কাল রাতের খিধেটা এখন আবার চাগিয়ে উঠেছে। এমনিতেও অলিম্পাসের দেবতাদের মধ্যে তার মন্দির সবচেয়ে কম ছিল। যুদ্ধের দেবতাকে কে নিজের রাজ্যে, নিজের ঘরে এনে স্থান দেবে। কেউই দিতে চাইত না। তাকে সবসময় অন্যের নৈবদ্য খেয়ে খেয়েই কাটাতে হয়েছে।

নগরের এক ধারে একটা খাবারের দোকান খুলি খুলি করছে। সেটার সামনে সকালের বানানো মোটা রুটি ধোঁয়া ছাড়ছে। সেই গন্ধে নেচে উঠলো এরিসের মন। এগিয়ে গেল সে। দোকানের সামনে গিয়ে একটা রুটি হাতে তুলে নিলো।

দোকানি অবশ্য প্রহরীদের মতো ভুল করলো না। এরিসের দেহের হেলটের পোশাকের সাথে সাথে সে এরিসের শরীরও পরখ করে ফেলেছে। সাবধানে জিজ্ঞেস করলো সে, 'তুমি কোন অভিজাতের হেলট? তোমাকে তো আমার দোকানে আগে কখনো দেখিনি।'

এরিস জবাব না দিয়ে রুটিতে কামড় বসালো। বাহ, বেশ ভালো তৈরি হয়েছে। শুকনো রুটি খেতেও মনে হচ্ছে রসালো।

এরিসের রুটিতে কামড় বসানো দেখে এবার আর দোকানির রাগ বাঁধা মানলো না, 'তোর এত বড়ো সাহস। এই রুটিতে কামড় বসানোর সাহস তুই কোথায় পেলি? তোর মালিক এই রুটির দাম দেবে না। আর দাম না পেলে আমিও তোকে

ছাড়বো না। মুদ্রা বের কর। এটা অভিজাতের জন্য তৈরি হওয়া রুটি। তোর কত বড়ো সাহস, সামান্য হেলট হয়ে তুই এই রুটিতে কামড় বসিয়েছিস।'

আরেকটা কামড় বসালো এরিস রুটির গায়ে, চিবাতে চিবাতে শান্ত গলায় বলল, 'আমি হেলট না।'

'হ্যাঁ, বুঝলাম, তুমি হেলট না, তুমি রোমান সেনাপতি। এখন আমার রুটির মুদ্রা দাও। তোমার কাছে যে মুদ্রা নেই তাতে আমি একশো ভাগ নিশ্চিত।'

'এবার তোমার ধারণা ঠিক আছে। আমার কাছে কোনো মুদ্রা নেই।' একটা রুটি শেষ করে দ্বিতীয়টায় কামড় বসিয়েছে এরিস, 'এটা আমার দুই নম্বর রুটি। আমি আরও দুটো রুটি খাবো। চারটা রুটির দাম কত?'

'তোমার থেকে আর বেশি রেখে কী করবো। এমনিতে তো দুই সেস্টেরস রাখি, তোমাকে একটা সেস্টেরস দিতেই হবে।'

'আমি দুটোই দেবো। তবে এখন তো নেই। একটু পরে দিয়ে যাবো। তুমি শুধু আমার আরেকটা উপকার করো। এখানে নগরের রাজার প্রাসাদটা কোনদিকে আছে বলতে পারবে?'

চোখ সরু হয়ে গেল দোকানির, 'রাজার প্রাসাদ? এই নগরে তো কোনো রাজা থাকে না। রাজার প্রাসাদ আবার কী?'

'রাজা নেই মানে?' এবার অবাক হবার পালা এরিসের, 'তাহলে এই নগর শাসন করে কে?'

'শাসন করে রোমান গভর্নর। আগে যখন নগর স্বাধীন ছিল তখন রাজা ছিল। এখন শুধু আছে গভর্নর। সেও রাজা নয়। রোমান সম্রাটই হচ্ছেন সর্বেসর্বা। সমস্ত গ্রীসের কোনো রাজ্যেরই এখন রাজা নেই। সব গভর্নর চালায়। তুমি মনে হয় গভর্নরের কথায় বলতে চেয়েছ, তাই না?'

'হ্যাঁ' তৃতীয় রুটি চিবাতে চিবাতে আনমনে মাথা নাড়ে এরিস।

'সেই গভর্নরের প্রসাদ দিয়ে তুমি কী করবে? সেখানে তো তোমাকে ঢুকতেই দেবে না। আমি হয়তো দয়া করে তোমাকে রুটি খাইয়েছি, কিন্তু ওরা দয়া করবে না। সেখানে গেলে হতে পারে তোমার প্রাণটাই চলে যাবে।'

একটু যেন জ্বলে উঠলো এরিসের চোখ, 'তুমি আমাকে দয়া করোনি। আমাকে দয়া করার সাধ্য কারো নেই। তোমাকে যা জিজ্ঞেস করেছি তার জবাব দাও। প্রাসাদ কোনদিকে?'

এরিসের ভঙ্গিতে দোকানির ভয় ধরে গেল। এক সেস্টেরসের মায়া ত্যাগ করলো সে। এরিসকে প্রাসাদের রাস্তা বুঝিয়ে দিলো তাড়াতাড়ি। সাথে প্রাসাদ দেখতে কেমন তাও বলে দিলো। চার নাম্বার রুটিটা হাতে নিয়ে সেদিকে পা বাড়ালো এরিস।

2024/01/15 18:23

অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হলো তাকে। তবে পেট ভরেছে। হাঁটতে তেমন একটা আপত্তি করছে না শরীর। একবার অলিম্পাসে ফিরে যেতে পারলে শরীরের এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। কিন্তু অলিম্পাসে যাবার জন্য এখনো অনেক কিছু করা বাকি। সরাসরি অলিম্পাসে যাবার অধিকার এখন তার নেই।

পায়াসের প্রাসাদে এখনও ভোরের পূর্ণ নীরবতা বজায় আছে। কাল অনেক পর্যন্ত উৎসব চলেছে এখানে। সৈন্যদের মধ্যেও সেই উৎসবের রেশ বাকি আছে। কাল রাতের পানীয়ের ভাগ সবাই পেয়েছিল। এখনও তাদের কেউ কেউ ঢলছে।

একেবারে সদর দরজার প্রহরী যখন এরিসকে এগিয়ে আসতে দেখল, তখন সে একটু অবাক না হয়ে পারলো না। একটা ছিন্ন হেলটের পোশাক পরা লোক এখন এই অবস্থায় কেন গভর্নর প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছে? উত্তরটা সাথে সাথে দিয়ে দিলো তার মাথা। নিশ্চয়ই লোকটা পাগল। হেঁটে আসার ভঙ্গিতেও অনেকটা তেমনই মনে হচ্ছে।

তবে আরেকটু সামনে আসতেই লোকটা সম্পর্কে প্রহরীর ধারণা পুরোপুরি বদলে গেল। লোকটার শরীর মারাত্মক সুগঠিত। বিশেষ অভিজাত সেনাদের শরীর তারা নিয়মিত দেখে, তাদের থেকেও এই লোকের শরীর শক্ত। কাপড়ের ওপর দিয়েই পেশীর নাচন আর শক্তি টের পাওয়া যাচ্ছে। প্রহরী সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করলো। নিজের সাথের জনকে সতর্ক করলো সে। অপর জন কেবল একটু চোখ বুজেছিল, সামনের আগন্তুককে দেখে সেও একটু অবাক হলো। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দুই প্রহরীর।

একজনকে সামনে রেখে আরেকজন এগিয়ে এলো। এসে দাঁড়ালো এরিসের পথরোধ করে, 'এই সময়ে এই রাস্তায় হাঁটা সাধারণের জন্য বারণ, এটা তোর জানা নেই। মরতে এখানে এসেছিস কেন?'

নিজের ওপরে এখন একটু বিরক্ত হচ্ছে এরিস। সে যেই পোশাক পরে আছে সেটা নিয়েই আসলে বেঁধেছে বিপত্তি। এই পোশাকের কারণেই সবাই তার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। সে সৈনিককে পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগলো ফটকের দিকে।

এহেন বেয়াদবি সহ্য করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সৈনিক ছুটে এসে এরিসের সামনে দাঁড়ালো, 'কথা কানে যাচ্ছে না। আর এক পা এগোলে একেবারে গলা নামিয়ে দেবো।'

এরিস এবার দাঁড়ালো, 'এটাই তো গভর্নরের রাজপ্রাসাদ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে তোর কী?'

'আমি এই প্রাসাদের গভর্নরের সাথে দেখা করতে চাই। তাকে গিয়ে আমার কথা বলো। আমার হাতে অপেক্ষা করার মতো সময় নেই।'

এবার রাগ ছেড়ে হেসে উঠলো প্রহরী, 'বাবারে, তুমি কোথাকার সম্রাট। এভাবে গভর্নরের সাথে দেখা করতে চাচ্ছো? নতুন নতুন পাগল হয়েছিস না? যা তো এখান থেকে।'

সৈনিক এরিসের বুকে একটা জোরালো ধাক্কা দিলো। আর ধাক্কাটা দিয়েই চমকে গেল সে। সামনের লোকটার শরীর পাথরের মতো শক্ত, আর মনে হয় পর্বতের ওজন ভর করেছে ওই শরীরে। একটুও টলানো গেল না এরিসকে।

এরিস ধৈর্য সরিয়ে রাখল এক পাশে, প্রহরীকে শিক্ষা দিতে হবে। তাহলে সবাই বুঝতে পারবে সে কে। আর গভর্নর তখন নিজে থেকেই ওর সাথে দেখা করতে ছুটে আসবে। প্রহরীর নাক বরাবর একটা ভীম ঘুসি তারচেয়েও বেগে বসিয়ে দিলো সে। এক ঘুসিতেই প্রহরীর সংজ্ঞা চলে গেল। তারপরে তার বুকেও একই রকমভাবে একটা ভয়াল ঘুসি বসালো এরিস। প্রহরীর মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো সাথে সাথে। মাটিতে পরে গেল সে। তার আগেই অবশ্য প্রাণ হারিয়েছে।

সদর দরজার ঝামেলার দিকে সব প্রহরীর নজর ছিল না। দুয়েকজন কেবল দেখছিল ঘটনা। তারা চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখল তাতে চমকিত হওয়া স্বাভাবিক, আর সেই চমকের ধাক্কায় প্রথম কয়েক মুহূর্ত কোনো কথায় বেরোল না তাদের গলা দিয়ে। তারপরে সেই চমকের রেশ কেটে যেতে সদর দরজার প্রহরী বাজিয়ে দিলো বড়ো ঘন্টা, যা একটাই মানে, প্রাসাদে হামলা হয়েছে, সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

এবার সবাই এদিকে তাকালো। কয়েকজন সৈন্য অস্ত্র বাগিয়ে ছুটে আসছে। বেশির ভাগ সেনা সদর দরজা দিয়ে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারলো না। প্রাসাদে আক্রমণ হবার কোনো লক্ষণ নেই। মাত্র একজন নিরস্ত্র মানুষ সামান্য হেলটের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। তবে এরপরেই তার পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকা প্রহরীর প্রাণহীন দেহ তাদের চোখে পড়লো। একজন দেওয়ালের পাহারা দেবার জায়গা থেকে এরিসের দিকে বর্শা ছুঁড়ে দিলো। ওদিক থেকে বর্শা ছুটে আসলে এরিসের দেখার কথা নয়, আর এসব দেওয়ালের ওপর অবস্থান করা বর্শা নিক্ষেপকারী প্রহরীদের টিপ আর শক্তি অনেক ভালো হয়। কিন্তু সহজেই সেই বর্শাকে প্রতিহত করলো এরিস। প্রতিহত করেছে বললে ভুল হবে, বর্শাটা ধরে ফেললো সে। এক পাশে ফেলে দিলো বর্শাটার দিকে একবার তাকিয়ে।

এবারে সেনারা বুঝতে পারলো নিরস্ত্র যে লোকটা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে সাধারণ কেউ নয়।

এরিস সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। আটজনের একটা দল ছুটে এলো এরিসের দিকে। চোখ বন্ধ করলো এরিস। আহ, কতদিন পরে, কত কত দিন পরে। রক্তে সেই পুরানো নাচন টের পেলো সে। সে যুদ্ধের দেবতা, মানুষ তার উপাসনা করেই যুদ্ধের প্রতি আসক্ত হয়, যুদ্ধে সফল হয়। সেই জন্ম লগ্ন থেকে

এই ব্যাপারটাই তাকে দিয়েছে উত্তেজনা, তাকে ভুলিয়ে রেখেছে সবকিছু। আজ এতদিন পর আবার তার দিকে এগিয়ে আসছে সেই যুদ্ধ।

প্রথম সেনার বাগিয়ে ধরা বর্শাটা সহজেই ধরে ফেললো এরিস। একটা আঘাত করে দশ পেস দূরে ফেলে দিলো সৈনিককে। বর্শা হাতে বিঁধিয়ে দিলো আরেক সেনার বুকে। বাকি ছয়জন তাকে একত্রে ছয়দিক থেকে আক্রমণ করলো।

কিন্তু তারা তো আর জানে না এরিস দশদিকের আক্রমণ সামলানোর ক্ষমতা রাখে। হাতের বর্শার খোঁচায় দুজনকে পরপারে পাঠিয়ে দিলো। বাকি দুজনকে তলোয়ারের আঘাতে গলা কেটে শেষ দুজনকে নিজের হাঁটুর নিচে নিয়ে এলো অনায়াসে। হাঁটুর চাপে ওই দুই সৈন্যের প্রাণ বেরিয়ে যেতে বেশিক্ষণ সময় লাগলো না।

আরও কিছু সৈন্য অস্ত্র নিয়ে তেড়ে আসছিল। গাছ থেকে একটা পাতা খসে পড়ার চেয়েও দ্রুত সময়ের মধ্যে আটজন সৈন্যকে মেরে ফেলেছে সামনের লোকটা। তার সামনে যাবার সাহস সঞ্চয় করতে পারলো না তারা। এরিসকে কেন্দ্র করে অস্ত্র বাগিয়ে পাংশু মুখে ঘুরতে লাগলো ওরা।

এরিসের মনোরঞ্জন যথেষ্ট হয়েছে। এখন কাজ শুরু করা যায়। সব সৈন্যের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল সে, 'আমি যুদ্ধ করতে আসিনি। শুধু বলে রাখি, তোমরা কেউ বোকামি কোরো না। তোমাদের সবাইকে মারতে আমার এক ইশারার বেশি সময় লাগবে না। আমি কেবল এই প্রাসাদের রাজার সাথে দেখা করতে চাই।'

সৈন্যরা ওকে ঘিরেই রাখলো। তবে দুয়েকজন ওই জায়গা থেকে দৌড় দিলো প্রাসাদের উদ্দেশ্যে। এরিস বুঝতে পারলো এবার কাজ এগোবে।

কলিনের আস্তানায় পৌঁছতে ওদের খুব বেশি সময় লাগলো না। ইভান খুব সাবধানে এনেছে ওরিয়নকে। এখনও তার জ্ঞান ফিরে আসেনি। তবে রহস্যময় লোকটার কথা অনুযায়ী জ্ঞান খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে। আস্তানায় পৌঁছেই ইভান খুব সাবধানে শুইয়ে দিয়েছে ওরিয়নকে।

ওদিকে কলিন ওদেরকে আসতে দেখে এগিয়ে গিয়েছিল। সাথে নিজের লোকদের সাথে তিনজন নতুন লোককে দেখে তার চোখ একটু সরু হয়ে উঠেছিল। ডাকাতি ভালোভাবেই করেছে তারা। সাথে অনেক জিনিসপত্র দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই তিনজন লোক কোত্থেকে এলো। সাথে আবার একজন লোককে শুইয়ে আনা হচ্ছে।

কোনো প্রতিপক্ষ আহত অথবা নিহত হলে নিশ্চয়ই তাকে এভাবে নিয়ে আসা হবে না। নিশ্চয়ই তাদের পক্ষের কেউ আহত অথবা নিহত হয়েছে। কলিনের শঙ্কা আরও বেড়ে গেল যখন দেখল অচেতন দেহটা ওরিয়নের। ইভান আর ওরিয়ন এখন তাদের জন্য ভবিষ্যতের আশার আলো।

ইভান ওরিয়নকে শুইয়ে দিতেই কলিন প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো, 'কী হয়েছে ওরিয়নের। আঘাত পেয়েছে না-কি মরেই গেছে?'

ইভান কিছু বলল না। এক হেলট সৈন্য এগিয়ে এলো কলিনের দিকে, 'নাহ, মারা যায়নি সর্দার। আহত হয়েছে।'

'কীভাবে?'

এই কথা উত্তর দেওয়া শক্ত। কথার উত্তর দিলো শেইরন, 'এতক্ষণ কাউকে চিনতে না পারলেও তোমাকে তো আমি চিনতে পারছি কলিন। তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো?'

একবার বৃদ্ধের দিকে তাকিয়েই চোখ সরু হয়ে এলো কলিনের, আরে, ইনি যে শেইরন। সে অবাক কণ্ঠে বলল, 'আরে আপনি। মহামান্য শেইরন। আপনি এখানে?'

কলিন যখন বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি, যখন নগরে গভর্নরের প্রাসাদে তাকে মাঝে মাঝে প্রশিক্ষণ প্রাঙ্গনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতে হয়েছিল তখন সেই প্রাসাদে মাঝে মাঝেই আসতেন শেইরন। তখন থেকেই এই বৃদ্ধকে চেনে সে। কখনো হেলট বলে তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন না তিনি। সবসময় স্নেহ করতেন।

'আপনাকে কীভাবে ভুলবো। কিন্তু আপনি এতদিন পরে কোত্থেকে এসেছেন? অবশেষে তাহলে মনে পড়লো দেশের কথা?'

'হ্যাঁ। মনে পড়েছে। শুনেছিলাম এখানে না-কি এক হেলট দল বিদ্রোহ করে ডাকাত সেজে বসেছে। তুমিই যে তাদের সর্দার এটা কিন্তু জানতাম না। ভালো,

অভিজাতরা যেই পদ্ধতিতে সমাজ চালাচ্ছে সেই পদ্ধতির বিরোধিতা হওয়া উচিত।'

'আমিও চাই নিজের লোকদের নিয়ে একটু ভালো থাকতে। না খেয়ে থাকি ঠিক আছে, কিন্তু স্বাধীনভাবে থাকতে হবে। কিন্তু, আপনি ওদের সাথে এলেন কী করে?'

'আরে দেশে আসতে না আসতেই তোমার লোকেদের পাল্লায় পড়লাম। তারা ডাকাতির উদ্দেশ্যে আক্রমণ করেছিল আমাদের। আমার সাথে দুজন ভিনদেশি অতিথি আছে।'

এবার লজ্জা দেখা গেল কলিনের মুখে, 'আমি খুবই দুঃখিত। ওরা আপনাকে চিনতে পারেনি। আপনার কোনো ক্ষতি হয়নি তো। কেউ কোনো আঘাত করেছে আপনাকে?'

'না, আমার অথবা আমাদের তিনজনের কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে আমাদের একজন তোমাদের দলের একজনকে অজ্ঞান করে দিয়েছে। তবে আমি যতটুকু বুঝতে পারছি সেই লোক তোমাদের লোক নয়। তার ভাব অভিজাত সৈন্যদের মতো।'

আবার ওরিয়নের সংজ্ঞাহীন হবার ব্যাপারটা মাথায় চলে এলো কলিনের, শেইরনকে দেখে সে এতক্ষণ ভুলে ছিল। ওরিয়নের শোয়ানো শরীরের কাছে চলে গেল সে। সেখানে এক পাশে বসে আছে ইভান, আরেক পাশে বসে আছে দুই ভিনদেশি। নিশ্চয়ই ওরাই এসেছে শেইরনের সাথে।

ইভানের পাশে বসে পড়লো কলিন, 'কী অবস্থা ওরিয়নের। তেমন খারাপ অবস্থা হলে নগর থেকে গোপনে একজন চিকিৎসককে আনাবার ব্যবস্থা তো করতে হবে।'

ইভানের মনেও সেই চিন্তাই চলছে, 'আমাদের এখনই একজন চিকিৎসক নিয়ে আসা উচিত নগর থেকে। চিকিৎসকের কাছে নিশ্চয়ই জ্ঞান ফেরাবার ওষুধ থাকবে।'

ওপাশে বসে থাকা দুই জন লোকের মধ্যে লম্বা মতন লোকটা এবার কথা বলল, 'আমার কথায় একটু বিশ্বাস রাখুন। কোনো চিকিৎসকের দরকার পড়বে না। আর অল্প কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান এমনিতেই ফিরে আসবে। সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।'

কলিন তাকালো রুদ্রদেবের দিকে, 'তোমরাই এসেছ শেইরনের সাথে?'

'হ্যাঁ। আমরা ভারত থেকে এসেছি। আমার নাম রুদ্রদেব। আর আমার সাথের এই ছেলের নাম হচ্ছে অসিত।'

ওদের নামের দিকে কোনো আগ্রহ নেই ইভানের, সে এবার জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আসলে কী করেছ? কীভাবে এক নিমেষে অজ্ঞান হয়ে গেল ওরিয়ন?'

রুদ্রদেব জবাব দিলো, 'এটা একটা কৌশল। আমাদের ভারতের যুদ্ধ বিদ্যার একটা বিশেষ কৌশল বলতে পারো। তোমাদের এদিকে বোধহয় এই বিদ্যার তেমন একটা চল নেই। মানুষের শরীরের বিশেষ কিছু জায়গা আছে যেখানে চাপ দিলে সে মুহূর্তের মধ্যে সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়। এই বিদ্যা অবশ্য যে শুধু আমরা যুদ্ধক্ষেত্রেই ব্যবহার করি তা নয়, বরং কেউ যদি কোনো আঘাত পায়, ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা যাতে সে অনুভব না করে তখনও আমরা এই বিদ্যা কাজে লাগাই। তোমার বন্ধুর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করা ইচ্ছে আমার ছিল না, এখনও নেই।'

রুদ্রদেবের গলায় এমন বিশ্বাস ছিল ইভান কিছুতেই বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারলো না। তবে ইভান বলতে না পারলেও কলিন কথা চালিয়ে গেল, 'বুঝলাম তোমার কথা। তোমরা শেইরনের সাথে এসেছ। লোক তোমরা খারাপ না। কিন্তু এই জ্ঞান কখন ফিরে আসবে সেটা তো তুমি অবশ্যই জানো।'

'হ্যাঁ। সময়ের মাপটা আমি আসলে রাখতে পারছি না। তবে আর বেশিক্ষণ লাগবে না। আমার মনে হয় আর এক মুহূর্ত।'

'এক কী বললে?' কলিন ভ্রু কুঁচকে ফেললো।

ভারতীয় সময়ের মাপ এই গ্রীকদের কীভাবে বোঝাবে মাথায় এলো না রুদ্রদেবের, সে মাথা ঝাঁকাল, 'আর অল্প সময়।'

ইভানের তখন মনে পড়লো ইনোনের কথা। ইনোনের কাছে যে দাসীকে রেখে গিয়েছিল সে এখনও অনুপস্থিত। তার মানে ইনোনের সাথেই আছে। আছে দাঁড়ানো এক মেয়েকে জিজ্ঞেস করলো সে, 'ইনোন কী করছে?'

'মহামান্য ইভান, আপনি যাবার আগেই তিনি ঘুমিয়েছিলেন। এখনও শয্যা ত্যাগ করেননি। আমরা তাকে কয়েকবার খাবার জন্য ডেকেছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের কথা যেন শুনতেই পাননি। শুয়ে আছেন। কখনো ঘুমাচ্ছেন, আবার কখনো ঘুমের মধ্যে কাঁদছেন।'

পরিস্থিতি এমনটা হবে তাই ধারণা করেছিল ইভান। যাক, নিজের মতো করে আরও কিছুক্ষণ থাকুক ইনোন। এই শোক তাকেই সামলে উঠতে হবে।

অসিত এতক্ষণ এক জায়গায় বসে চারিদিকে তাকিয়ে সব দেখছিল। এদিকের মানুষজনের আকার আকৃতি সবই আলাদা। সবাই তাকে অবাক চোখে দেখছে। এখানে অনেক মানুষ আছে যারা কখনো এর আগে ভারতের লোক দেখেনি।

রুদ্রদেব এখনও বসে আছে ওরিয়নের পাশে। এবার সেই জিজ্ঞেস করলো, 'আপনাদের এই বন্ধুর মনের অবস্থা এমন কেন? তার সাথে কি খুব খারাপ কিছু ঘটেছে?'

প্রশ্নটা করা হয়েছে ইভান আর কলিনকে উদ্দেশ্য করে। তারা দুজনেই যথেষ্ট অবাক হয়েছে। তেমন কিছু তো অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু তা তো কিছুতেই এই আগন্তুকের জানার কথা না। একে অপরের দিকে তাকালো তারা। রুদ্রদেব নিজের

অবস্থান পরিষ্কার করলো সাথে সাথে, 'না, না, আপনাদের অবাক হবার কোনো কারণ নেই। আমি কোনো অলৌকিকভাবে কথাটা জানতে পারিনি। ভেবে দেখুন, আমরা তিনজন ছিলাম সাধারণ পথিক। আপনাদের সাথে আমরা কোনো খারাপ ব্যবহার করিনি। কিন্তু তাতেই আপনাদের সবার মধ্যে আপনার বন্ধু সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখালো। আমি বারবার তাকে সরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সে বারবার আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল। এটা কোনো সাধারণ ডাকাত করলে মানা যেতো। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আপনাদের বন্ধু অনেক প্রশিক্ষিত যোদ্ধা। তার তো আত্মনিয়ন্ত্রণ আরও বেশি থাকার কথা। তার মানে কোনো কারণে তার মনে প্রচুর পরিমাণে ক্রোধের জন্ম নিয়েছে। আর মানুষের ক্রোধের কারণ তার সাথে খারাপ কিছু ঘটাই হয়ে থাকে স্বভাবত। তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

ইভান এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। এমনিতেও তার শক্ত মন আর চমক, উত্তেজনা এসব নিতে চাচ্ছে না। একদিনের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। সে এতদিন নিজেকে যুদ্ধ বিদ্যার সর্ববিশারদ মনে করতো। তার শিক্ষকেরাও তাকে আকারে ইঙ্গিতে তাই বলেছে। কিন্তু সামনে বসে থাকা লোকের জ্ঞানের কাছে তার জ্ঞান নিতান্ত তুচ্ছ মনে হচ্ছে। সে সবকিছু খুলে বলার সিদ্ধান্ত নিলো। ততক্ষণে শেইরনও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ওদের সাথে এসে বসেছেন।

সব খুলে বলল ইভান। ধীরে ধীরে। রুদ্রদেব সবকিছু শুনে মাথা নাড়লো, অসিত বুঝতে পারলো, এই পৃথিবীতে সমস্যা কেবল তার একার নেই। কেউ কেউ তার থেকেও বড়ো বিপদে আছে, তার থেকেও বড়ো কষ্টে আছে। কেবল রুদ্রদেবের মনে তেমন কোনো চিন্তা জায়গা নিলো না। মানুষের জীবনে বিপদ তো আসবেই। সে যা চায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হবে না। কিন্তু এসব মেনে নিয়ে যে হাসি মুখে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারে সেই তো আসল সিদ্ধপুরুষ। সেই তো আসল মানুষ।

রুদ্রদেব মন্তব্য করলো, 'ওনার জ্ঞান যখন ফিরে আসবে, তখন আপনারা অনুমতি দিলে আমি তার একটু চিকিৎসা করতে চাই। আমাদের ভারতীয় নিয়মে যদিও। আবারো বলছি যদি আপনাদের অনুমতি পাই।'

ইভান চকিতে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি চিকিৎসক?'

'নাহ, এটা বলতে পারেন একটা টোটকা। তবে কোনো ক্ষতি হবে না। সেরকম কোনো সম্ভাবনা নেই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।' ইভান অনুমতি দেয়।

'তার আগে একটা প্রশ্ন করে নিই। আপনার বন্ধু কি ওই ঘটনার পরে কান্নাকাটি করেছিলেন?'

'খুব একটা না, একেবারে পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিল।'

'বুঝতে পেরেছি। কান্নায় স্নায়ুর কষ্ট কমে। তিনি কান্না করেননি, তাই তার সমস্ত কষ্ট এখনও স্নায়ুতেই রয়ে গেছে। যা তাকে করে তুলেছে ক্রোধিত, প্রতিশোধপরায়ণ। আমার মনে হচ্ছে আমি তাকে সাহায্য করতে পারবো।'

এই কথার মধ্যেই একটু নড়ে উঠলো ওরিয়নের দেহ, রুদ্রদেব বলে উঠলো, 'এই যে। তার জ্ঞান ফিরে আসছে।'

সবাই উৎসাহ নিয়ে ঘিরে আছে ওরিয়নকে। ওরিয়ন আস্তে করে চোখ মেলল। ঠিক তখনই তার হাতে আর কাঁধে হাত দিলো রুদ্রদেব, তার গলা অনেক শান্ত, 'ওরিয়ন, আপনি ভয়ানক কষ্ট পেয়েছেন। ভয়ানক মানসিক যাতনা পেয়েছেন। কিন্তু, একজন সৈন্য হিসেবে আপনি অবশ্যই জানেন, এই কষ্ট পাওয়া আর মানসিক ভঙ্গুর অবস্থা আপনার সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হতে পারে। অতীতকে আঁকড়ে ধরে রাখা উচিত নয়। তার মানে এই নয় যে, সেই ঘৃণ্য অপরাধীকে আমরা ক্ষমা করে দেবো। না, দেবো না। কিন্তু সেই অপরাধীকে শাস্তি দিতে হলে আমাদেরকে প্রথমে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আপনি এখন আপনার যত ক্রোধ, রাগ, উত্তেজনা সব চোখের জলে ভাসিয়ে দেবেন।' রুদ্রদেব জানে ভাঙা ভাঙা গ্রীকে বললেও তার কথা একেবারে ভুল হয়নি। ওরিয়ন বেশ ভালোই শুনতে পেয়েছে।

আস্তে করে ওরিয়নের ঘাড় আর হাত থেকে নিজের আঙ্গুল সরিয়ে নিলো রুদ্রদেব। ওরিয়ন আবারো চোখ মেলল। এবার তার চোখে সেই উন্মত্ত ভাব নেই। উঠে বসলো সে। তার নজর পড়লো ইভানের দিকে। ইভানের দিকে দুই বাহু বাড়িয়ে দিলো সে। ইভানও নিজের দুই বাহু এগিয়ে দিলো। জড়িয়ে ধরলও বন্ধুকে।

শিশুর মতো কেঁদে উঠলো ওরিয়ন। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার দেহ। চোখের জল গাল বেয়ে টপটপ করে পড়ছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে ইভানের পিঠ। একটু পরে ওরিয়ন ইভানকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে রেখেই বলল, 'আমাকে কি একটু ডোরার কাছে নিয়ে যাবে?'

ইভান ধরে ওরিয়নকে দাঁড় করালো। আর কেউ গেল না ওদের সাথে। ওরা দুজন চলে গেল ডোরাকে শায়িত করা সেই কুঁড়েঘরে। সেখানে গিয়ে ওরিয়ন ডোরার সমাধির পাশে বসে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলো। ইভান তার সাথে বসে রইলো অনড়। চোখের জলে ভেসে যেতে লাগলো ওরিয়নের মনের সব কষ্ট। আর চোখের জলে কষ্ট ভেসে গেলে মানুষের মনে একটা জিনিসই বেঁচে থাকে, প্রতিজ্ঞা।

এদিকে কলিন এতক্ষণে একটু স্বাভাবিক সময় পেয়েছে। ডাকাতি করে কী পাওয়া গেছে সেদিকে নজর দেবার ভার দিলো কয়েকজনকে। দুঃখের খেলা নিয়ে

রাতদিন পড়ে থাকলে তো আর দল চলবে না। তার নিজেরও ইচ্ছে আছে জিনিসগুলোর খোঁজ নেবার। সেদিকে চলে গেল সে।

তবে শেইরন আর শেইরনের সাথিদের জন্য ব্যবস্থা করতে ভুল করলো না সে। ভালো মাছের ব্যবস্থা হয়েছে আজকে। সেই মাছ আর শস্য খেতে দেওয়া হলো তাদের। অসিত রুদ্রদেবের দিকে তাকালো, 'পুরো থালা জুড়েই তো দেখি আমিষ। এসব কীভাবে খাবো?'

'শাস্ত্র ঠিকমতো পড়লে আর এই প্রশ্ন করতে না। পরদেশে নিয়ম নাস্তি। বিদেশে পরিব্রাজক হিসেবে গেলে কিছু নিয়ম মানা সম্ভব নাও হতে পারে। তাতে তেমন একটা পাপ হয় না। খেয়ে ফেলো। আমরা তো আর এদিকের গাছপালা চিনি না যে নিজের খাবার নিজেরাই জোগাড় করতে পারবো।'

কথাটা বলে নিজেই প্রথমে মাছের টুকরোয় কামড় বসালো রুদ্রদেব, একটু চিবিয়ে গিলে ফেললো, 'জিনিসটা খেতে তো খারাপ না। স্বাদ আছে।'

গুরুর দেখাদেখি একটু বিতৃষ্ণা নিয়ে অসিতও কামড় বসালো, মনের ভেতর ভয় কাজ করছে, কেমন লাগে তার ঠিক নেই। তবে দেখল যে রুদ্রদেবের কথাই সত্য। খেতে তেমন একটা ভালো না লাগলেও একেবারে খারাপ নয়। অন্তত বমি আসার মতো কোনো অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি।

ওদিকে শেইরন খাওয়া শেষ করে এনেছেন। অনেক দিন পর নিজের দেশের পরিচিত স্বাদ পেয়েছেন তিনি খাবারে। তিনজনের খাবার শেষ হতেই ওদের কাছে ফিরে এলো কলিন। তার মেজাজ এখন যথেষ্ট ভালো। ডাকাতি করে ভালো ভালো জিনিস পাওয়া গেছে। বেশ কিছু অরাস উপার্জন করা যাবে সেগুলো বেচে।

কলিন এসে বসলো ওদের পাশে, 'অনেকদিন পর আপনার সাথে দেখা হলো মহামান্য শেইরন। এতক্ষণ তো আমাদের অবস্থার কথা শুনলেন। এবার নিজের কথা কিছু বলুন।'

'নিজের কথা আর কী বলবো।'

'আপনি তো এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াবার লোক। অনেক দিন পরে দেশে এলেন। একা এলে না হয় বুঝতাম জন্মভূমি দেখতে এসেছেন। কিন্তু আপনি তো একা আসেননি। দুজন বিদেশি নিয়ে এসেছেন। তারা আবার ভারতীয়। এদিকের ব্যবসায়ীরা ভারতে যায়, তাদের সাথে এদিকের লোকজনও নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে যায় ভারত। কিন্তু ওদিকের কোনো লোক তো এদিকে আসে না। তাদের এদিক সম্পর্কে কোনো প্রয়োজন বা আগ্রহ কিছুই নেই। কিন্তু আপনার সাথে এসেছে দুই ভারতীয়। নেহাত একটু বুদ্ধি থাকলে যে কেউই বুঝবে, তারা নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে। আমি কেবল সেই উদ্দেশ্যই জানতে চাইছি।'

'উদ্দেশ্য একটা আছে বটে, কিন্তু তাতে তো তোমার কোনো লাভ হবে না। তোমাদের এই কাজের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সেই উদ্দেশ্যের।'

আহত হলো একটু কলিন, 'সবসময় লাভের জন্য কাজ করবো তাই বা আপনি মনে করলেন কী করে।'

'ডাকাতেরা তো তাই করে।'

'আবার আপনি আমাকে আহত করলেন। আমি তো আর ডাকাত নই। আমি নেতা। এই সমাজের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। নিজেদের জন্য একটা সমাজ বানাতে চেষ্টা করছি। আমাদের কোনো লাভ না থাকুক, হয়তো আমি আপনাদের কাজে কোনো সাহায্য করলেও করতে পারি।'

'তাহলে তোমাকে বলছি, শোনো। আমরা এখানে এসেছি একটা বানর খুঁজতে। বানরটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

শেইরনের স্বভাব হচ্ছে বেশির ভাগ সময় মজা করা। এটা কলিন জানে। তবে এখন শেইরনের মুখ দেখে মনে হচ্ছে না তিনি মজা করছেন।

তার মানে সেই সুদূর ভারত থেকে এই দুজন এসেছে শুধু একটা বানরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বেরোলো না কলিনের মুখ থেকে।

কাল রাতে আনন্দ একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। এমনিতেও সফলভাবে ষড়যন্ত্র দমন করা গেছে। স্বয়ং অ্যালেস্টর যে এই সবকিছুর পেছনে আছেন সেটা তো ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করতে পারেননি পায়াস, যদিও তাকে বলা হয়েছিল, এই অভিজাতদের বিশ্বাস নেই। সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু এভাবে সবাইকে বিশ্বাস না করে বেঁচে থাকার কোনো মানে আছে? তবে এতদিনে বিশ্বাস করার মতো একজনকে পাওয়া গেছে। নিকোলাস কাল আমন্ত্রিত ছিল। এখন নিজের মেয়ের বিয়েটা আয়োজন করা যায় ঠান্ডা মাথায়।

এরই মধ্যে চিন্তা শুরু হয়ে গেছে তা নিয়ে। পায়াস ভাবতে বসেছেন বিয়ের আয়োজন সম্পর্কে। নিমন্ত্রিত অথিতিদের নিয়ে চিন্তা করতে হবে। কাকে নিমন্ত্রণ করা হবে আর কাকে করা হবে না তা নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। চিন্তা তো আর একদিকে করলে হবে না। এক স্তরের একজনকে নিমন্ত্রণ করলে আরেকজনকে নিমন্ত্রণ না করলে বিপদ। আবার দেখা গেল একজনের সাথে আরেকজনের সম্পর্ক খারাপ, কেউ আবার কাউকে একটুও সহ্য করতে পারে না। এখানে অর্থনীতির ব্যাপার আছে, সামাজিক ব্যাপার আছে আর সবকিছু ছাপিয়ে রাজনীতি তো আছেই। তাই স্পার্টার একজন স্বাভাবিক অভিজাতের মতো তিনি ষোলো আনা নিমন্ত্রণ ঘোষণা করে পার পাবেন না। সেই তালিকা প্রস্তুত করতেই যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।

কাল রাতের উৎসবের পর আজ এত ভোরে ঘুম না ভাঙলেও চলতো। কিন্তু সেই নিমন্ত্রিত অথিতিদের চিন্তাতেই ঘুমটা মনে হলো ভেঙ্গে গেছে। উঁচু জায়গার থাকার সমস্যাও উঁচু উঁচু হয়।

এখানে আবার সবার পরামর্শ নিলে হবে না। যারই পরামর্শ নেয়া হোক না কেন সেই নিজেদের দলের লোক দিয়ে উৎসব ভারী করতে চাইবে। সেই সুযোগ সবাইকে দেওয়া যাবে না। সকালেই সুরা পাত্র নিয়ে বসেছেন তিনি। ঠিক তখনই প্রহরীকে ছুটে আসতে দেখা গেল। এই প্রহরী সদর দরজার দিকের। চোখ একটু কুঁচকে এলো তার। ঘটনা কী? ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়, এখন প্রাসাদের যা পরিস্থিতি তাতে কোনো প্রহরীর ছুটে আসা দেখলে আতংকিত হওয়াই স্বাভাবিক। বিপদ হয়তো চলে গেছে, কিন্তু ভয় তো এখনও বাসা বেঁধে আছে ভেতরে।

প্রহরী তার সামনে এসে হাঁফাতে লাগলো। তিনি সুরা পাত্র নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে? এই সকাল সকাল ছুটে এসেছ কেন? রোম থেকে কি কেউ এসেছে?'

'না, মহামান্য পায়াস, রোম থেকে কেউ আসেনি। তবে একজন অচেনা আগন্তুক এসেছে। সে প্রাসাদে ঢুকে আপনার সাথে কথা বলতে চায়। আমরা তাকে বাঁধা দিয়েছিলাম, কিন্তু সেই আগন্তুক অতুল শক্তির অধিকারী। এরই মধ্যে আমাদের দশজনের মতো সৈনিক তার হাতে প্রাণ হারিয়েছে, অথচ তার হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না। বলতে গেলে খালি হাতেই সে আমাদের দশ জনকে মেরে ফেলেছে। এখন আমাদের বাকি সৈন্যরা ঘিরে আছে তাকে। সে আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছে, আমাদের সবাইকে মারতে তার এক ইশারার বেশি সময় লাগবে না। তবে সে আমাদেরকে মারতে চায় না। সে কেবল আপনার সাথে দেখা করতে চায়।'

এই কথা ভয়ানক। পায়াস পাংশু মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তার শরীরে কী পোশাক? মানে কোন সেনাদলের পোশাক পরে আছে সে? চিনতে পেরেছ?'

'না, মহামান্য। সে কোন সেনার পোশাক পরে নেই। সে এখন পরে আছে হেলটের পোশাক।'

'কী বললে! হেলটের পোশাক।'

'হ্যাঁ। স্পার্টার সাধারণ হেলটের পোশাক। আর আগন্তুককে কখনো এর আগে দেখিনি। এত শক্তিশালী যে-কোনো মানুষ হতে পারে, কখনো কল্পনাও করিনি আমি।'

পায়াস এবার মহা ধন্ধে পড়লেন। তবে অচিরেই তার বুদ্ধি কাজ করা শুরু করলো। তিনি প্রহরীকে আদেশ দিলেন, 'এখুনি নিকোলাসকে অথিতি ঘরে জাগানোর ব্যবস্থা করো। সেনাপতিদের খবর দাও। যত সেনারা ঘুমিয়ে আছে তাদের সবাইকে হাজির করো। সভাসদদেরও হাজির করো। যত লোক প্রাসাদে থাকবে ততই ভালো। কোনো সেনা যাতে বিশ্রাম ঘরে না থাকে।'

'আজ্ঞে মহামান্য। তবে সদর দরজার দিকেও একজনের যাওয়া দরকার। এতক্ষণে কি আমাদের পুরো প্রহরী দল নিহত হলো কি না কে জানে।'

'সেদিকে আমি দেখছি।'

পায়াসের মাথা খুব দ্রুত কাজ করতে শুরু করলো। সাধারণ কোনো মানুষ সে নয়। একজন পুরো প্রহরী দলকে ঘোল খাইয়ে দিচ্ছে কীভাবে। এটা আবার কোন নতুন আপদ এলো।

মন্ত্রী আর সভাসদ যারা প্রাসাদের বাইরে থাকেন তাদেরকে খবর দিতে দেরি হবে। প্রাসাদের ভেতরে যারা আছেন তাদেরকে খবর দেওয়া শুরু হয়ে গেল। প্রথমে একজন মন্ত্রীকে আসতে দেখেই সিদ্ধান্ত বদলালেন পায়াস। প্রথমে ভেবেছিলেন তিনিই যাবেন সদর দরজায়, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার যাওয়া উচিত হবে না। প্রথমে অন্য কেউ গিয়ে লোকটাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে নিয়ে আসুক। তিনি লোকটার সাথে সভাতেই দেখা করবেন।

মন্ত্রী ঘুমঘুম চোখে আসতেই আদেশ শুনতে পেলেন, 'শুনুন, এক রহস্যময় লোক এসেছে সদর দরজায়। আমার কাছে মনে হচ্ছে রোমানদের গ্লাডিয়েটরদের কেউ হবে। এক সাথে এতজনের বিরুদ্ধে লড়াই একমাত্র উঁচু মাপের প্রশিক্ষিত গ্লাডিয়েটররাই করতে পারে। আপনি একটু সদর দরজায় যান। তাকে শান্ত করে ভেতরে নিয়ে আসুন। কাজটা আস্তে আস্তে করবেন, যাতে আমি সবকিছু নিয়ে তৈরি হবার সময় পাই। আমরা সবাই মিলে তার সাথে সভাতেই দেখা করবো।'

নিকোলাস অথিতিদের জন্য নির্ধারিত একটা কামরায় ঘুমাচ্ছিল। মরিস আছে তার সাথে। মরিসের জন্য আলাদা কামরার ব্যবস্থা থাকলেও কাল রাতে এতটাই গিলে ফেলেছিল সে, তাতে সেই কামরায় আর যেতে পারেনি। নিকোলাসের কামরার মেঝেতেই শয্যা পেতে রাত কাটিয়ে দিয়েছে। তার ঘরে প্রাসাদের এক পরিচারিকা অপেক্ষা করছিল, তবে মেয়েটাকে মনে হয় ঈশ্বর নিজ হাতে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

পরিচারক খবর দিতে এসেছে। ঘরের ভেতরে ঢোকার সাহস করলো না সে, বাইরে থেকেই ডাকলো, খুটখাট কিছু আওয়াজও করলো। কিন্তু সুরার মত্তে গভীর ঘুম এত সহজে তো ভাঙার নয়। পরিচারককে তাই ঢুকতে হলো ভেতরে। মরিসের অসংলগ্ন অবস্থা দেখে যথেষ্ট লজ্জা পেলো সে। অন্য সময় হলে অবশ্যই ঘর থেকে চলে যেতো। তবে এখন সময় একটু কঠিন। নিকোলাসের শয্যার পাশে গিয়ে আলগোছে ডাকল এবার সে। নিকোলাসের ঘুম টলে গেল, চোখ মেলে তাকালো সে।

চোখের সামনে পরিচারককে দেখে একটু অবাকই হতে হলো তাকে। এই মুহূর্তে তাকে ডাকার কোনো কথা নেই। একটু চোখ ফেরাতেই মরিসের অপর চোখ পড়লো তার। স্পার্টার প্রথম শ্রেণির অভিজাত ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে। মনে মনে মরিসকে একটা গাল না বকে পারলো না সে। তারপর আবার পরিচারকের দিকে তাকালো, 'কী হয়েছে?'

'মহামান্য পায়াস আপনাদেরকে এখনই তৈরি হয়ে সভায় উপস্থিত হতে বলেছেন।'

'এত সকালে?'

'হ্যাঁ। শুধু আপনাদের নয়। ওনার সব সভাসদদের আনতেও লোক গেছে। প্রাসাদের প্রতিটা সৈন্যকেই তৈরি হবার আদেশ দিয়েছেন তিনি।'

রীতিমতো যুদ্ধাবস্থা। নিকোলাস একটু ভয় পেয়ে গেল। নিজের প্রাণ চলে গেলে প্রাসাদ আক্রমণের অন্য কোনো উপায় করে রেখেছিলেন না-কি অ্যালেস্টর। কিন্তু তার আর তার লোকেদের অপর নজর রেখে তেমন কোনো লক্ষণ তো বোঝা যায়নি। চিন্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো নিকোলাস, 'কী হয়েছে প্রাসাদে?'

পরিচারকের কণ্ঠেও চিন্তা, 'সেটা আমি ঠিক জানি না মহামান্য। তবে যতটুকু শুনেছি সদর দরজার দিকে একটা সমস্যা হয়েছে।'

কথাটা শুনে নিকোলাসের চিন্তা আরও বাড়লো, 'ঠিক আছে। তুমি যাও। আমরা তৈরি হয়েই প্রাসাদে চলে যাচ্ছি।'

'আজ্ঞে মহামান্য। আপনার সেনাদের এরই মধ্যে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বিশ্রাম নিচ্ছিল। একটু পরেই প্রাসাদের সেনাদের সাথে এসে যোগ দেবে।'

পরিচারক বেরিয়ে যেতেই মরিসের ঘুম ভাঙানোর কঠিন কাজটাই হাত দিলো নিকোলাস।

ওদিকে যে মন্ত্রীকে এরিসকে নিয়ে আসার জন্য পাঠানো হয়েছে তার অবস্থা ধীরে ধীরে শোচনীয় হতে লাগলো। প্রথমে ঘুমের ঘোরে আর গভর্নরের আদেশের ধাক্কায় সে ব্যাপারটা আঁচ করতে না পারলেও এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে তাকে আসলে এক বিপদের মধ্যে পাঠানো হচ্ছে। তবে কাজ করার জন্য সম্মত হয়ে এখন তো আর পিছিয়ে আসা যায় না। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সদর দরজার রাস্তায় উঠতেই তার হাঁটার গতি একটু কমে এলো। দূর থেকে ভিড় করে থাকা সেনাদের দেখা যাচ্ছে। সেই ঘিরে থাকা সেনাদের কেন্দ্রেই আছে সেই মানুষ। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলেন মন্ত্রী।

এরিস অপেক্ষা করছে। এত সকালে সবকিছু ব্যবস্থা করতে একটু তো সময় লাগবেই। আর এরই মধ্যে প্রায় দশ জনকে মেরে ফেলেছে সে। তাই পুরো প্রস্তুতি ছাড়া রাজা তার সাথে দেখা করবেন না তা তো বলাই বাহুল্য।

একজনকে এদিকে আসতে দেখল সে। লোকটার পোশাক সৈনিকের মতো না। এই লোক কে দেখে রাজা বলে মনে হচ্ছে না। তবে রাজার লোক হতে পারে।

লোকটার দিকে এগিয়ে গেল সে। ঘিরে থাকা সৈনিকদের পাত্তাই দিলো না এরিস। লোকটা তাকে দেখে ভয় পাচ্ছে, তবে সামনে এগিয়ে আসা বন্ধ করলো না।

এরিস লোকটার সামনে দাঁড়ালো। ছোটোখাটো চেহারার মন্ত্রীকে এরিসের বিশাল শরীরের সামনে কৌতুকের মতো মনে হচ্ছে। এরিস ভ্রু তুলল, 'তুমিই কি রাজা?'

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি বলল, 'আজ্ঞে না। গভর্নর আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আপনার সাথে দেখা করবেন সভায়।'

'আমাকে সভায় নিয়ে চলো।'

'সেজন্যই আমি এসেছি। চলুন আমার সাথে।' সৈনিকদের দিকে ফিরে পেছন পেছন আসার নির্দেশ দিলেন মন্ত্রী। এরিসকে নিয়ে প্রবেশ করলেন প্রাসাদে। মন্ত্রীর

2024/01/15 18:43

নির্দেশ অনুযায়ী সৈনিকেরা ঘিরে ফেললো প্রাসাদ। সদর দরজা পাহারা দেবার বদলে এবার প্রাসাদ পাহারা দিচ্ছে রক্ষীরা।

ওদিকে নানা সভাসদেরা প্রাসাদের বাইরে আর ভেতর থেকে পায়াসের আহবান শুনে আর দেরি করেননি। যে যেই অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই চলে এসেছেন। সভার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে পরিচারকেরা। বিকেলের সভা সকালেই বসাতে বাধ্য হয়েছেন পায়াস। সভার সবাই নতুন এক আপদের অপেক্ষা করছে। কোথায় কী হচ্ছে তা নিয়ে কারো কোনো জ্ঞান নেই।

পায়াস সভায় এসে বসতেই সবার মাঝে চলতে থাকা গুঞ্জন থেমে গেল। পায়াস সভার চারিদিকে তাকালেন। ব্যবস্থা সব পাকা আছে। তার নিয়ন্ত্রণের সেনারা সবাই উপস্থিত। সেনাপতি আর নিকোলাসও উপস্থিত আছে। এবার নিজের নিরাপত্তা নিয়ে একটু আশ্বস্ত হলেন তিনি। বলতে শুরু করলেন, 'প্রাসাদে আরেকটা নতুন বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। আজকে ভোরে একজন আগন্তুক এসেছে। সে অতুল শক্তির অধিকারী। আমার রক্ষীরা তাকে থামানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে একাই দশ জন সৈন্যকে মেরে ফেলেছে। এটা কিছুতেই স্বাভাবিক কোনো মানুষের কাজ হতে পারে না।'

আবার গুঞ্জন উঠলো সভার মধ্যে। এই নতুন আপদের কথা শুনে সবাই কমবেশি ঘাবড়ে গেছে। একজন বলে উঠলো, 'মহামান্য পায়াস, তাকে অচিরেই মেরে ফেলা উচিত। এত বড়ো সাহস।'

আরেকজন মেরে ফেলা পর্যন্ত এগোলো না। সে বুদ্ধিমানের মতো জিজ্ঞেস করলো, 'লোকটা এখন কোথায়? তাকে কি বন্দি করা হয়েছে?'

পায়াস উত্তর দিলেন, 'সরাসরি বন্দি করা হয়েছে বললে ভুল হবে। কৌশলে বন্দি করেছি। তাকে আমার এক মন্ত্রী বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করেছে। এখন আপনারা সবাই প্রস্তুত থাকলে তাকে সভায় নিয়ে আসতে পারি?'

ওরকম একজনকে বিনা শৃঙ্খলে সভায় আনা হবে এটা ভেবেই অস্বস্তি হতে লাগলো সবার। তবে সে যে গুপ্তঘাতক নয় এতে সবাই এখন নিশ্চিত। সবাই মোটামুটি অনিচ্ছায় সম্মতি দিতে বাধ্য হলো।

পায়াস ইশারা করলেন। মন্ত্রী এরিসকে নিয়ে প্রবেশ করলেন সভায়। সভার প্রতিটা লোক তাকিয়ে রইলো এরিসের দিকে। এমনকি নিকোলাস, যার দেহ এই সভায় অতুলনীয় সে পর্যন্ত এরিসের দিকে তাকিয়ে রইলো অবাক হয়ে।

মন্ত্রী এরিসকে শুধু সভায় নিয়েই আসেননি। তার আগে এরিসের জন্য হেলটের পোশাক বদলে একটা ভালো পোশাকের ব্যবস্থাও করেছেন। সেই পোশাক এখন শোভা পাচ্ছে এরিসের গায়ে। অভিজাত পোশাক গায়ে দিতেই এরিসের শরীর থেকে আভিজাত্য যেন ছিটকে বেরোচ্ছে। উপস্থিত সবার মুখ থেকে যেন কথা সরছে না। কারো মাথায়ই এরিসকে বন্দি করার কথা এলো না।

কেউ কিছু বলছে না দেখে এরিসই নড়ে উঠলো। একে একে তাকালও বসে থাকা সবার দিকে। সবচেয়ে উঁচু আসনে বসে থাকা পায়াসের অপর দৃষ্টি আটকে গেল তার। তার দিকেই কয়েক পা এগিয়ে গেল সে। সভায় এখনও পিনপতন নীরবতা।

'তুমি নিশ্চয়ই রাজা।'

পায়াস একটা ঢোক গিললেন, 'না, আমি রাজা নই, গভর্নর। এই রাজ্য আমি দেখাশোনা করি।'

'তার মানে শাসন করো। যে শাসন করে সেই তো রাজা, তাই না?'

পায়াস তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, আমি শাসন করি না। এই রাজ্যের প্রধান শাসক হচ্ছেন রোমান সম্রাট। তার হয়ে আমি দেখাশোনা করি।'

এরিস নিচের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলো, 'তার মানে এখানে কোনো রাজা নেই।' মুখ তুলল সে, 'এই নগরের নামই তো স্পার্টা। তাই না?'

পায়াস মাথা নেড়ে সায় জানালেন। এরিস এবার হেসে উঠলো, 'তার মানে স্পার্টা নগরী এখন পরাধীন। যে স্পার্টার সৈনিকদের জগতের সবাই ভয় করতো সেই নগরের লোকজন এখন সম্রাটের অধীনে আছে। ছি ছি।'

এবার অবাক হবার পালা লোকজনের। স্পার্টা তো আর আজকে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে আসেনি। কে এই লোক। কয়েক শত বছর আগের গল্প এখন করতে এসেছে। এবার নিকোলাস একটু সামনে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিলো, তার এখন এই সভায় একটা স্থান সৃষ্টি হয়েছে। উঠে দাঁড়ালো সে, 'সেসব কথা বলার আগে নিজের পরিচয় দাও। তুমি কে? কেনই বা এই রাজ্যে এসে হাঙ্গামা শুরু করেছ?'

এবার এরিস একটু মেপে নিলো নিকোলাসকে। শরীরের গঠনে বলে দিচ্ছে সৈনিক। হাবেভাবেও তাই বোঝা যাচ্ছে। নিজের পরিচয়টা এখন দিতে হবে বুঝতে পারলো সে, 'আমি এরিস। অলিম্পান। দেবতা।'

এরিসের স্বর কঠিন। কণ্ঠে দৃপ্ততা। তবু উপস্থিত সভাসদেরা না হেসে পারলেন না। এবার তারা নিশ্চিত হয়েছেন, যে একটা পাগলের পাল্লায়ই পড়া গেছে। কোনোভাবে এক গ্রীক যোদ্ধা কোনো দিক থেকে পাগল হয়ে রাজ্যে চলে এসেছে।

এরিসের চোখ আস্তে আস্তে জ্বলে উঠতে শুরু করল। এই অজ্ঞানীরা এতটাই নিচে নেমেছে একজন দেবতাকেও চিনতে পারছে না। চিৎকার করে উঠলো সে, 'সবাই থামো। একেবারে চুপ।'

কোনো মানুষ যে এত জোরে চিৎকার করে উঠতে পারে সেটা কেউই বিশ্বাস করতে পারলো না। মনে হলো যেন একটা বেশ বড়োসড়ো বজ্রপাত হলো। বেশ কিছুক্ষণ গমগম করে উঠলো পুরো ঘর। হাসিঠাট্টার রেশ মাত্র রইলো না আর কারো মধ্যে।

একজন বৃদ্ধ মন্ত্রী কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। প্রথম থেকেই এরিসকে দেখে তার সন্দেহ হয়েছিল। এরিস নিজেকে দেবতা ঘোষণা করার পরেও তিনি অন্য সবার সাথে হাসিঠাট্টায় মগ্ন হননি। তিনি এগিয়ে গেলেন এবার পায়াসের দিকে, কানে কানে কিছু কথা বললেন।

পায়াস এরিসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনি বলছেন আপনি দেবতা। কিন্তু আমরা তা বিশ্বাস করবো কী করে।'

'সেটা তোমাদের ব্যাপার। আমার পিতা সবসময় বিশ্বাস অবিশ্বাসের খেলাটা মানুষের জন্যই বরাদ্দ রেখেছিলেন।'

'আমাদের হাতে একটা উপায় আছে। স্পার্টার প্রধান মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে খবর দিয়েছি। তিনি চলে আসবেন এখনই। তিনিই শনাক্ত করবেন আপনি দেবতা না-কি দেবতা না। আশা করি একজন পূজারীর শনাক্ত কাজে আপনি সহায়তা করবেন।'

ব্যাপারটা এখন আর কেউ ঠাট্টা হিসেবে দেখছে না দেখে হাসলো এরিস, 'তার মানে আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে? দেবো পরীক্ষা। কোনো সমস্যা নেই। ডেকে পাঠাও তোমাদের পুরোহিতকে।'

পুরোহিতের অবশ্য ঘুম থেকে ওঠা নিয়ে এত ঝামেলা নেই। সকালে উঠেই তার দেবতার আরাধনা করা হয়ে গেছে। তাকে যখন প্রহরী গিয়ে রাজ প্রাসাদে যাবার কথা বলল তখন তিনি অবাক না হয়ে পারলেন না। আর অবাক হবার মাত্রাটা আরও বেড়ে গেল যখন তিনি রাজসভায় এসে এরিসকে দেখতে পেলেন।

ওরা যে বানর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে সেটা নিয়ে কলিন আর কিছুই জানতে চাইলো না। এই জীবনে নানা রকমের মানুষ দেখে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। একটা বানর নিয়ে যাবার জন্য চলে এসেছে ভারত থেকে। প্রথমে শেইরনকে এই ব্যাপারে সাহায্য করার কথা বললেও এখন আর তার ইচ্ছে করছে না। এরচেয়ে ঢের গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে।

'কই' শেইরন জিজ্ঞেস করলেন, 'একটু আগে তো বলছিলে সাহায্য করবে। এখন তো দেখছি মুখ দিয়ে কথাই সরছে না।'

এড়িয়ে যাবার রাস্তা তৈরিই আছে কলিনের হাতে, 'সে তো বলেছিলাম। কিন্তু আপনিই তো বললেন জেইস নিয়ে এসেছে সেই বানর। আর এনে বিক্রি করে দিয়েছে পায়াসের কাছে। এখন পায়াসের প্রাসাদ থেকে আমি কীভাবে সেই বানর উদ্ধার করে দেবো? সেই ক্ষমতা কি আমার আছে? ক্ষমতা থাকলে অবশ্যই ব্যবস্থা করতাম।'

রুদ্রদেব এখানে পরামর্শ দেয়, 'সাহায্য করতে পারবেন কি পারবেন না সেটা পরের কথা। আগে আমাদের বানরের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। বানরটা আসলে ঠিক কোথায় আছে সেটা নিশ্চিত হতে না পারলে তো কিছুই করা যাবে না।'

এই কথার সাথে একমত না হয়ে উপায় নেই। সে চিন্তা শেইরনের মাথায়ও ঘুরছিল, 'এজন্যই তো তোমাকে বললাম কলিন, কিছু একটা করে খবরটা বের করে দাও।'

'এটা তো আপনি আমাকে মুশকিলে ফেললেন। সাধারণ কোনো অভিজাতের ঘর কিংবা সেনার ঘর থেকে খবর বের করা আর স্বয়ং পায়াসের ঘর থেকে খবর বের করা কি এক হলো? ওখানে আমার কোনো গুপ্তচর নেই।' চেষ্টা করলে হয়তো কলিন খবর বের করতে পারতো, কিন্তু ওই যে, বানরের জন্য এই ঝুঁকি নেবে না সে। উল্টো তার কাছ থেকে এলো সমাধান, 'আপনি অবশ্য এই কাজটা ভালোভাবেই করতে পারবেন। আপনাকে তো স্পার্টার সবাই চেনে, সম্মানও করে। পায়াসের প্রাসাদে আপনার চেনা লোক অবশ্যই আছে। তাদের দিয়েই তো আপনি খবরটা বের করে আনতে পারেন।'

এবার রুদ্রদেব তাকায় শেইরনের দিকে। শেইরন রুদ্রদেবকে আশ্বস্ত করলেন, 'ঠিক আছে। আর কেউ না গেলে আমিই যাবো। কীভাবে কাজটা করবো তাই কেবল একটু ভাবতে হবে।'

ভাবনায় বসে একাকিত্বে চলে গেলেন না শেইরন। তার জন্য পানের ব্যবস্থা করে দিলো কলিন। উৎকৃষ্ট মদ, আজকে বণিকদের কাছ থেকে ডাকাতি করা

মালামালের ভেতর পাওয়া গেছে। শেইরন পান করতে করতে প্যাঁচ কষতে লাগলেন।

রাতে এক সাথেই ঘুমিয়েছে শেইরন, অসিত আর রুদ্রদেব। শেইরন ভোর হবার বেশ খানিক আগে উঠে পড়েছেন, রুদ্রদেব নড়াচড়া পেয়ে উঠে বসলো। শেইরন চাদর গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে বললেন, ' অঙ্গদের খবর বের করার একটা উপায় মাথায় এসেছে, তাই করতে যাচ্ছি।'

' এত রাতে?'

'হ্যাঁ। উপায়টা কাজ করাতে হলে ভোর ভোর যেতে হবে নগরে। এখন রওনা না দিলে সময়মত পৌঁছানো যাবে না। তুমি ঘুমাও, আমি যে নগরে গেছি এটা কলিনকে বলবে।'

শেইরনের চলে যাওয়া আস্তানার আরেকজনের চোখে পড়লো। ইভান রাতটা জেগেই কাটিয়েছে। ইনোন আর ওরিয়ন দুজনেরই খেয়াল রাখতে হচ্ছে তাকে। দুজনেরই ঘরে পালা করে যাচ্ছে সে। দুজনকেই দিচ্ছে নীরব সান্ত্বনা।

শেইরন চলছেন একটু ত্রস্ত পায়ে। জন্মভূমিতে ফিরে যেন শরীরে আলাদা একটা শক্তি চলে এসেছে তার। এই জঙ্গলের দুর্গম পথে আঁধারে শুধু রাতের চোখ সওয়া আলো নিয়ে হাঁটতে তার অসুবিধা হচ্ছে না। হাতের লাঠিটা ভালোই কাজে দিচ্ছে। একটা মশাল সাথে আছে কিন্তু জ্বালানোর প্রয়োজন বোধ করছেন না তিনি। হিসেবে একটুও ভুল হয়নি তার। ঠিক আলো ফোটার মুহূর্তেই নগরে এসে প্রবেশ করলেন তিনি।

প্রবেশ করেই আর দেরি করলেন না। তিনি পরিকল্পনা সম্পাদনে লেগে পড়লেন। প্রথমেই চলে গেলেন সবজি আর মাছের বাজারে। এত সকালে সেসব দোকান খুলে যাবার কথা। অভিজাত সম্প্রদায়ের বাড়ির হেলটেরা এখনই নিতে আসবে নানা জিনিস। নইলে তাজা তাজা খাবার সকালের নাস্তায় পরিবেশন করা যাবে না।

সেখানে এরই মধ্যে লোকসমাগম শুরু হয়ে গেছে। অনেক লোকের ভিড়ে বিশেষ একজনের জন্য চোখ পেতে রেখেছেন শেইরন। খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। লোকটাকে দেখা গেল। সাধারণ হেলটের সাথে কিছু পার্থক্য আছে এই লোকের। সে হেলট, কিন্তু রান্নার অতুল প্রতিভার জন্য সে জায়গা করে নিয়েছে পায়াসের প্রাসাদের প্রধান রাঁধুনি হিসেবে। তার সাথে চারজন সাধারণ হেলট আছে। সবাই মিলে প্রাসাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে এসেছে।

এই ব্যাপারটা আগে থেকেই জানা ছিল শেইরনের। তবে নিশ্চিত ছিলেন না আজকে সে আসবে কি না তা নিয়ে। কপাল ভালো। এসেছে। এখন কেবল কাজটা ঠিকঠাক করার বাকি।

এগিয়ে গেলেন শেইরন। পায়াসের রাঁধুনি তখন সবজির গুণাগুণ পরীক্ষা করছেন। শেইরন গিয়ে দাঁড়ালেন তার পেছনে, 'এই সবজিটা নিতে পারো। তোমার থেকে বয়স ঢের কম আছে।'

সহসা সবজি সম্পর্কে নিজের পেছনে এমন মন্তব্য শুনে চমকে পেছনে তাকালো রাঁধুনি, শেইরনকে দেখেই তার মুখে ছড়িয়ে পড়লো চওড়া একটা হাসি, 'আরে, দেখো না, কে বয়সের কথা বলছে। তোমাকে দেখলেই তো মনে হয় হেডিস ছুটিতে আছে।'

হেলট হলেও এই রাঁধুনি এখন পায়াসের প্রধান রাঁধুনি। সম্মান সে ভালোই পায়। শেইরন হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন রাঁধুনিকে, ' অনেকদিন পড়ে এসেছি। এখন তোমার সাথে গল্প করবো।'

'কিন্তু, আমার কাজ?'

'আরে তুমি মারা গেলেও তো ঐ পায়াসের রান্না করে খেতে হবে তাই না। এখন তোমার লোকদের একটু শেখবার সুযোগ দাও। আজকে বাজারটা ওরাই করুক।'

'আচ্ছা, তুমি তো নাছোড়বান্দা।' চার হেলটের দিকে ফিরলো রাঁধুনি, কণ্ঠ এখন অনেকটাই শক্ত হয়ে গেছে, 'তালিকা তো করাই আছে। সেই অনুযায়ী সবকিছু কিনবে। একটাও যদি বাসী সবজি আর মাছ আমি খুঁজে পাই তাহলে গর্দান থাকবে না। আর মাংস কেনার দরকার নেই। লাগলে সেটা আমি নিজে কিনবো।'

হেলটেরা সবজি বাছাইয়ে লেগে পড়লো। রাঁধুনি এবার বাজার থেকে একটু বেরিয়ে এলো শেইরনের সাথে, 'বলো, এবার কী গল্প বলবে।'

'আরে, খালি মুখে কি গল্প জমে নাকি। অনেকদিন পর একসাথে হয়েছি। মুখ খালি রাখলে চলবে?'

'এত সকালে কোথায় যাবে, এখনও তো কেউই পসরা সাজায়নি।'

'না, তুমি আসলেই বুড়ো হয়ে গেছো। চল আমাদের আসল জায়গায়। সেটা তো আর কখনো বন্ধ হয় না।'

রাঁধুনির চোখ এবার একটু বড়ো হয়ে উঠলো, 'আরে না। আমার এখান থেকে গিয়ে রান্না করতে হবে। সেখানে এখন আমি যেতে পারবো না।'

'আরে চলো। তোমার হেলটদের কেনাকাটা শেষ হবার বহু আগেই আমরা ফিরে আসবো। এতদিন পর দেখা হয়েছে। এভাবে ফিরিয়ে দিও না।'

শেইরনের বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেললো রাঁধুনি, 'আচ্ছা চলো। তবে আগেই বলে রাখছি, দুই পাত্রের বেশি খাবো না।'

জায়গাটা একটু গোপন আড্ডা, কিন্তু বাজার থেকে খুব একটা দূরে নয়। সেখানে গিয়ে কড়া মদের দুটো পাত্র হাতে নিয়ে দুজনে বসলো মুখোমুখি। রাঁধুনি

আসতে না না করছিল, কিন্তু দেখা গেল পানে তারই আগ্রহ সবচেয়ে বেশি, বড়ো একটা চুমুক দিলো সে, 'তারপর বলো, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আর কখনোই এদিকে আসবে না। আমরা তোমার জ্বালা থেকে বাঁচলাম। কিন্তু ঈশ্বর দেখা যাচ্ছে আমাদের কপালে এত সৌভাগ্য লেখেননি। কী মনে করে এলে?'

'অনেকদিন নিজের নগর দেখা হয় না। এজন্যই আসা।' সতর্ক উত্তর দিলেন শেইরন।

'আচ্ছা। সেটা বুঝলাম কিন্তু মানতে তো পারছি না ভায়া। আসল কারণ কী?'

'তোমাকে কিছুতেই বোকা বানানো যাবে না সেটা জানতাম। আমি এসেছি একটা জিনিস দেখতে। নগরে এমন একটা জিনিস এসেছে আর আমি দেখতে পারলাম না তা কীভাবে হয়। জানোই তো এমন আজব আজব জিনিস দেখার জন্যই অনেকদিন আগে চিরতরে ভবঘুরে হয়ে গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, কিন্তু নগরে কী দেখতে এসেছ?'

'শুনেছি, পায়াসের প্রাসাদের চিড়িয়াখানায় এক আজব জন্তু এসেছে। যে এখানে নিয়ে এসেছে সেই জেইসের কাছ থেকেই শোনা, এমন জন্তু না-কি এর আগে কেউ কখনো দেখেনি।'

এবার বুঝতে পারলো রাঁধুনি, 'ওহ আচ্ছা, তুমি ঐ বানরের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধরতে পেরেছ। সেই বানর দেখতেই আমি এসেছি।'

একটু চিন্তিত দেখালো রাঁধুনির মুখ, 'কিন্তু সেই বানর তো তুমি দেখতে পারবে না। এমনিতেই তো পায়াসের ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানায় কোনো মানুষ প্রবেশ করতে পারে না। আগে যাও পারতো এখন তো গুপ্তঘাতকের হামলার পরে সেই সুযোগ একেবারেই নেই।'

'গুপ্তঘাতক!' সবকিছু আগে জানলেও একটু আঁতকে ওঠার ভান করলেন শেইরন।

'হ্যাঁ। প্রাসাদে গুপ্তঘাতক ঢুকেছিল। তারপর থেকে সাধারণের জন্য প্রাসাদে প্রবেশ অনেক কঠিন।'

'আরে এজন্যই তো তোমার কাছে আসা। গভর্নরের প্রাসাদে প্রবেশ সবসময় কঠিন ছিল। এটা আর নতুন কী। কিন্তু আমি জানি, তোমার জন্য এটা কোনো কাজই না। দাঁড়াও আরেক পাত্রের জন্য বলি। আরেক পাত্র শেষ করলেই তোমার মাথায় উপায় বেরিয়ে আসবে।'

আরেক পাত্র শেষ হতে হতে আসলেই রাঁধুনির মাথায় উপায় বেরিয়ে এলো, 'আমি প্রতিদিন সবজি বহন করে নেবার জন্য কিছু লোককে নিয়ে যাই। তাদের সাথে অবশ্য তুমিও ঢুকতে পারবে প্রাসাদে।'

'এইতো বেরিয়েছে। আমি জানতাম তোমার কাছে এলেই কাজ সমাধা হবে।'

'এখন আর কথা না বাড়িয়ে চলো। এরপর দেরি করলে আমার চাকরি আর প্রাণ দুটোই যাবে।'

সবজি গাড়িতে তুলে সেই গাড়ি নিয়ে রওনা দিলো তারা। সবজির দোকানের কর্মচারী হিসেবে যাচ্ছেন শেইরন। রাঁধুনির ওপর তার পুরো ভরসা আছে।

প্রাসাদের পেছনে ভাঁড়ার ঘরে যাবার একটা ছোটো দরজা আছে। প্রহরী একবার সবকিছু দেখেই তাদেরকে ভেতরে যেতে দিলো। প্রহরীর অবস্থা দেখে মনে হলো বেশ ভয়ে ভয়ে আছে সে। ওদেরকে তল্লাসি অথবা পরীক্ষার কাজে বেশি সময় ব্যয় করলো না সে। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে দরজা ভালো করে আটকে দিয়ে চলে গেল প্রাসাদের মূল ভবনের দিকে।

শেইরন আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?'

রাঁধুনি নিজেও বুঝতে না পেরে মাথা নাড়লো। রান্নাঘরে গিয়ে সবাইকে নিয়ে নিজের কাজ শুরু করলো রাঁধুনি। এরই মধ্যে শেইরনকেও একটা কাজ দেওয়া হয়েছে। মাঝে একবার শেইরন জানতে চেয়েছিলেন, কখন তাকে ঐ বানর দেখানো হবে। রাঁধুনি নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছে, 'তোমার সেই চিন্তা আমি আগেই করে রেখেছি। একটু পরেই প্রাসাদের চিড়িয়াখানার পরিচারক প্রাণীদের সকালের খাবার নিতে আসবে। আজকে আমিও যাবো খাবার নিয়ে, তুমিও আমার লোক হিসেবে আমার সাথে যাবে। তখনই প্রাণ ভরে দেখতে পারবে, কিন্তু খবরদার সে যাতে কিছুতেই বুঝতে না পারে, তুমি সেই বানর দেখতে এসেছ।'

'আরে না, বুঝতে পারবে না। তুমি কি আমাকে বোকা পেয়েছ নাকি।'

'বোকা না তো কী। এত বয়স হলে কি আর মানুষের মাথায় বুদ্ধি বাকি থাকে।'

দুজনের অনেক দিন পর দেখা হয়েছে। কথায় কথায় এগিয়ে চলেছে কাজ। প্রাণীদের খাবার রান্না হতেই নিয়ে যাবার জন্য লোক এলো। চোখের ইশারা করলো রাঁধুনি। একটা পাত্র কাঁধে তুলে নিলেন শেইরন। যাবার পথে আরেকটা দৃশ্য দেখে অবশ্য তার আবার খটকা লাগলো। সব প্রহরীদের মধ্যেই কেমন যেন একটা ভীত ভীত ভাব। হয়তো কয়েকদিন আগে প্রাসাদে গুপ্তঘাতক ঢুকেছিল বলে। কিন্তু সেই গুপ্তঘাতক তো মারা পড়েছে। এতদিন পরেও সেই ভয়ের থেকে যাওয়া একটু আশ্চর্যের ব্যাপারই বটে।

চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করে সবার মতো শৃঙ্খলা মেনে খাবার নামিয়ে রাখলেন শেইরন। এখন নানা খাঁচায় খাবার দেওয়া হবে। তারপর তারাই আবার খালি পাত্র নিয়ে রসুইয়ে ফিরবেন। এটুকু সময়ই আছে কেবল তার হাতে। নিজের চোখকে চারিদিকে চালনা করলেন তিনি। সতর্কভাবে।

বেশি সময় লাগলো না। অঙ্গদ নতুন এসেছে। তার খাঁচা সবার সামনেই আছে। একবার অঙ্গদের দিকে তাকিয়েই তাকে চিনতে পারলেন শেইরন। সেই

সাথে এটাও বুঝতে পারলেন আসলেই অঙ্গদ একটা দেখার মতো জিনিস। এই বানরের জন্যই তিনি দুজনের সাথে ছুটে এসেছেন সেই ভারত থেকে। অবশ্য তার তো কোনো ঠিকানা নেই। পথের কষ্টের কথা চিন্তা করলে এই বানর দেখে সেই কষ্ট দূর হয়ে গেছে। প্রাপ্তির খাতা অবশ্যই ভারী হয়েছে।

এখানে খাবার দেওয়ার কাজ যারা করে তারা সবাই এই কাজ অনেক দিন ধরে করছে। কাজটা শেষ করতে তাদের তেমন সময় লাগলো না। দেখতে দেখতে বাঘ পেলো সেদ্ধ মাংস, সাপের খাঁচায় চলে গেল মরা সাদা ইঁদুর আর নানা রকমের বিড়ালের খাঁচায় চলে গেল নানা রঙের ইঁদুর। অঙ্গদকে প্রাণ ভরে দেখার অনেকটা সময় পেলেন শেইরন। কিন্তু ঠিক তার পরেই আরেকটা জিনিস দেখতে পেলেন যা তার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিলো।

লোকটা এই মাত্র চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করেছে। ঢুকেই একজনের সাথে কথায় মেতেছে সে। লোকটাকে দেখে স্মৃতির পাতায় যেন ঢেউ খেলে গেল শেইরনের। লোকটা নির্দ্বিধায় ভারতীয়। একটু লম্বা। আর গালে একটা স্পষ্ট কাটা দাগ আছে।

তার মানে!

গলা নিচু করে পাশে দাঁড়ানো রাঁধুনিকে জিজ্ঞেস করলেন শেইরন, 'এই মাত্র যে লোকটা এখানে এসেছে সে কে? দেখে তো আমাদের এদিকের লোক বলে মনে হচ্ছে না।'

রাঁধুনিরও গলা নিচু, 'জেইস তো এই বানর নিয়ে এবার একা আসেনি। এই লোকও সাথে এসেছিল। আর বানরটা না-কি এই লোকেরই। পায়াসের কি খেয়াল হলো, এই লোককে বলল কয়দিন থেকে বানরটার হাবভাব চিড়িয়াখানার লোকদের বুঝিয়ে দিতে। তাই থেকে গেছে। এখন আর কথা বাড়িও না। এমনিতেই তোমাকে রান্নাঘরের লোক সাজিয়ে এনেছি। ঠিকমতো খেয়াল করেনি দেখে প্রহরীরা বুঝতে পারেনি। অবশ্য এমনিতেও ধরতে পারতো না। হেলটদের দিকে ওরা ঠিকমতো তাকায় না। ওদের কাছে সব হেলট এক। কিন্তু তুমি এমন করে ওদের মনে সন্দেহ আর উৎপাদন কোরো না।'

একেবারে চুপ করে গেলেন শেইরন। যা দেখার দেখা হয়েছে, খবর যা নেবার নেয়া হয়েছে। যেভাবে ঢুকেছিলেন ঠিক সেভাবেই বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ থেকে। কাজ করে লাভও হয়েছে। সবজির দোকানের সবাইকে একটা করে সেস্টেরেস দেবার নিয়ম। তিনিও একটা পেয়েছেন। সেটা দিয়ে সকালের খাবারটা ভালো মতোই খেলেন। ক্ষিধেও পেয়েছিল। কাল রাত থেকেই দৌড় ঝাঁপের ওপর ছিলেন।

খেয়েদেয়ে আবার কলিনের আস্তানার দিকে রওনা দিলেন তিনি। এবার আর রাতের মতো জোরে জোরে হাঁটছেন না। আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছেন। চারপাশে দেখতে দেখতে তার মন ফুরফুরে হয়ে উঠেছে। সকালের পান করা পানীয়কে

তিনি এতক্ষণ তার ওপর ক্রিয়া করবার অধিকার দেননি। এবার দিয়েছেন। সেটা নিজের কারিগরি দেখানো শুরু করেছে। চারপাশে নানা রঙের আলো দেখতে দেখতে হাঁটছেন তিনি।

কলিনের আস্তানার দিকে আসতেই তাকে দেখতে পেয়েছে রুদ্রদেব। তিনি যেভাবে হেলেদুলে আসছেন তাতে বোঝাই যাচ্ছে কাজ হোক আর না হোক, পান কর্মটা ঠিকমতোই সেরে এসেছেন তিনি নগর থেকে। রুদ্রদেব গিয়ে তার পথ আটকালো, 'এভাবে হাঁটছেন কেন?'

'সেটা না বোঝার মতো বোকা তো তুমি নও।'

'তা এতোটা পান করেছেন কী উদযাপন করার জন্য?'

'চাওয়ার থেকেও বেশি পাওয়া উদযাপন করছি।'

'মানে?'

'অঙ্গদকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। পায়াসের প্রাসাদে ঢুকতে পেরেছি আর সেই প্রাসাদে ঢুকে তাকে দেখেও এসেছি। অঙ্গদ এখন সেই প্রাসাদেই আছে।'

'এটাই তো আমাদের চাওয়া ছিল। কিন্তু আপনি বলছেন চাওয়ার চেয়ে বেশি পেয়েছেন। তার মানে কী?'

'মানে হচ্ছে আমি শুধু অঙ্গদকেই খুঁজে পাইনি। সাথে আরেকজনকেও খুঁজে পেয়েছি। তাকেও তোমাদের বেশ ভালো করেই দরকার।'

'কাকে?'

'রাহুকে।'

এরিস এখনও দাঁড়িয়ে আছে সভার একেবারে মাঝখানে। পুরোহিত নিজের মন্দিরের পোশাক পরে এসেছেন। প্রাসাদে এমনিতে পুরোহিতের এখন আর তেমন আসা হয় না। এমনিতেই ভিনদেশি শাসক। আগের দিন তো আর এখন নেই। আগে যে-কোনো ছোটো বড়ো কাজে পুরোহিতদের ডাক পড়তো। তাদেরকেই মানুষের সাথে দেবতাদের সেতু হিসেবে ব্যবহার করতেন রাজারা। যুদ্ধ যাত্রা করা যাবে কি না, করলে কখন করা উচিত, সেনাপতি কে হবে, কতজন সৈন্য যাবে, কোন রাজার সাথে সন্ধি করতে হবে এমন সব সিদ্ধান্ত রাজা দেবতাদের আদেশ অনুযায়ী নিতেন। আর দেবতাদের আদেশ আসতো পুরোহিতদের মাধ্যমে। কিছু কিছু পুরোহিত যে রাজাদের ভুজুং ভাজুং দিয়ে ঠকাতেন না সেই কথা বলা যাবে না, তবে কিছু কিছু পুরোহিত লক্ষণ বিচার করে রাজাদের সঠিক দিশা দিয়ে সাহায্যও করতেন।

যে জিনিসের চর্চা থাকে না সে জিনিসে অবশ্যই মরচে পড়ে যায়। এতদিন পর প্রাসাদে ডাক পেয়ে পুরোহিত এখন একটু ভয়েই আছেন। এখন কি তাকে দেবতাদের কাছ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত এনে দিতে হবে না-কি, সেই চিন্তাই কাবু করে ফেলছে তাকে। ওসব বিদ্যা তো অনেক আগেই হারিয়ে গেছে।

তবে একটু পরেই কারণটা বুঝতে পারলেন পুরোহিত। স্বয়ং পায়াস তাকে নিজের আসনের কাছে ডাকলেন। তারপর কানে কানে বলে দিলেন কী করতে হবে। এটা যেন ফুটন্ত কড়াই থেকে জলন্ত উনুনে এসে পড়া। নাহ, দেবতাদের কাছ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে আসতে হবে না। তবে এখানে না-কি স্বয়ং দেবতাই এসে পড়েছেন। তাকে নিতে হবে সেই দেবতার পরীক্ষা। তারপর সনদ দিতে হবে।

পুরোহিত হিসেবে তিনি শাস্ত্রের দেবতাদের লক্ষণ সম্পর্কে জানেন। দেবতাদের কিছু ক্ষমতা থাকবে যা কিছুতেই সাধারণ মানুষের দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। সেই ক্ষমতাগুলো পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে সভার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা এই ব্যক্তি দেবতা না-কি মানুষ।

পুরোহিত এগিয়ে গেলেন এরিসের দিকে। এরিসের চোখের দিকে তাকাতেই একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ করলেন, এই চোখের আগায় যেন একেবারে ছুরি বসানো আছে। মুহূর্তেই সামনের মানুষের বুক চিরে অন্তরে ঢুকে যেতে পারে এই চোখ।

পুরোহিত এরিসের সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিজেকে ঠিক রাখতে তাকে অনেকটা পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এরিস হেসে উঠলো, 'তোমার যা অবস্থা দেখছি

তাতে দেবতা হিসেবে আমার পরীক্ষা নেবার আগে তো পুরোহিত হিসেবে তোমার পরীক্ষা নেয়া জরুরি।'

মোটামুটি হেসে ফেলার মতো কথা হলো কেউই হাসল না। এরিস নিজেই নিজের কথায় কিছুক্ষণ হাসল। তারপর আবার তাকালো পুরোহিতের দিকে, 'কই, কাজ শুরু করো। আমার হাতে তো নষ্ট করার মতো সময় খুব বেশি নেই।'

পুরোহিতের সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। তবু রাজ দায়িত্ব বলে কথা। পালন তো করতেই হবে। তিনি মিনমিনে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার পরিচয় বলুন।'

'কী বললে?'

পুরোহিত এবার জোরে বলল, 'আপনার পরিচয় জানতে চাইছি। আপনি বলছেন আপনি দেবতা। আপনার নাম কী?'

'আমার নাম এরিস। পুরোহিত যখন হয়েছ, তখন নিশ্চয়ই জানো আমার নাম। আমি বারো অলিম্পিয়ানের একজন। প্রধান দেবতা। যুদ্ধ আর যোদ্ধাদের আমিই আশীর্বাদ করে থাকি সবসময়। দেবতা জিউস আর হেরার পুত্র হিসেবে আমি দেবতাদের প্রধান গুণাবলীর সবগুলোরই অধিকারী।'

এরিসের কথার দমকে পুরোহিত আরেকটু ঘাবড়ে গেলেন। প্রাণপণে মনে করতে লাগলেন দেবতাদের ক্ষমতা সম্পর্কে। একটু গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন, 'আপনি অলিম্পাসের প্রধান বারো দেবতার একজন। জিউস আর হেরার পুত্র। তাহলে তো আপনি বজ্র শক্তির অধিকারী হবেন। জিউসের পুত্র হিসেবে বজ্রকে অস্ত্র না হোক অন্তত প্রকৃতিতে ব্যবহার করার ক্ষমতা তো নিশ্চয়ই দিয়েছেন তিনি।'

এরিস হাসল, 'তোমার কথা ঠিক আছে। বজ্র আমি ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু, এখন এই ঘরে বজ্র প্রহার করলে তো সবকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আমার পরীক্ষা নিতে গিয়ে কি তোমরা সেই ঝুঁকি নেবে।'

'শুধু আকাশে বজ্রের উপস্থিতি দেখালেও চলবে।' পুরোহিতের সতর্ক জবাব।

'ঠিক আছে।' কথাটা এরিসের মুখ দিয়ে পুরোপুরি বের হয়ে পারলো না, সেই সাথে রোদের মধ্যেও আকাশের বুক চিরে ছুটে গেল এক টুকরো আলো, ক্ষণিক পরেই বজ্রপাতের প্রবল শব্দে কেঁপে উঠলো পুরো স্পার্টা। সবাই অবাক হয়ে গেল সাথে সাথে। এরিসের মুখে তখনো হাসি লেগে রয়েছে, 'এবার বুঝেছ তো আমি কে? তোমার আর কোনো পরীক্ষা বাকি আছে?'

পুরোহিত ঘটনায় অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন, 'না, আমি আর কোনো পরীক্ষা নিতে চাই না। আপনি যে দেবতা এরিস তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'বোকা পুরোহিত। একই সাথে বোকা এবং অজ্ঞানী। আমি এখন যে কাজ করলাম সেই কাজ তো যে কোনো জাদুকর অথবা ভেল্কিবাজ করে ফেলতে পারে।

এতেই তোমরা বোকা বনে গেলে। আমি যুদ্ধের দেবতা। তোমরা পরীক্ষা দিতে না চাইলেও আমি তো এখন পরীক্ষা দেবো। পুরোপুরিভাবে। তোমাদের জ্ঞানও তো আমার দিতে হবে।'

এরিস নিজের দুই হাত তুলল। সাথে সাথে বড়ো সভা ঘরে জ্বলতে থাকা আলোর উৎসে আগুনগুলো কেমন যেন ম্লান হয়ে যেতে লাগলো। সবাই নিজেদের দেহে একটা অনুভূতি টের পেতে শুরু করেছে। তারপর দুই হাত তড়িৎ গতিতে নিজের দিকে টেনে আনলো এরিস।

সাথে সাথে যার কাছে যত অস্ত্র ছিল সবকিছুই মালিকের শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল। সৈনিকদের হাত থেকে ছুটে গেল বর্শা, কোমরের তলোয়ারের খাপ থেকে খুলে এলো তলোয়ার, শরীরের নানা কাজে লুকানো খাপ থেকে বেরিয়ে পড়লো বিভিন্ন মাপের এবং নকশার ছুরি। এরিসের আহ্বানে এবার সেই সব অস্ত্র এরিসের দিকে ছুটে এলো। না, একটাও এরিসকে আঘাত করলো না। সবগুলো অস্ত্র এসে পড়লো এরিসের পায়ের কাছে। তার পায়ের সামনে জমা হলো অস্ত্রের স্তূপ।

পুরোহিত আর সবাই এই ভীষণ দৃশ্য নিজেদের চোখের সামনে স্পষ্ট দেখল। পুরোহিতের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো প্রাচীন শাস্ত্রের একটা বাক্য, অস্ফুটে, 'তিনিই এরিস। এই পৃথিবীর সব অস্ত্র যার কথা শুনবে। তার এক আহ্বানেই অধীনস্থের সব অস্ত্র এসে লুটিয়ে পড়বে তার পায়ে।'

সব অস্ত্র লুটিয়ে পড়ার কথাটা অবশ্য একটু ভুল হয়েছে। কাছাকাছি থাকা যে-কোনো অস্ত্র আকর্ষণ করতে পারে এরিস। কিন্তু, যোদ্ধা যখন যুদ্ধের নিয়তে সেই অস্ত্র ধরে তখন যোদ্ধাকে অভিশাপ অথবা আশীর্বাদ দিতে পারে এরিস, অস্ত্র কেড়ে নিতে পারে না।

এরিস এবার হুংকার দিয়ে উঠলো, 'এখনও তোমরা বুঝতে পারলে না। আমিই দেবতা এরিস। তোমরা মনে হয় সবাই হতবাক হয়ে গেছো। অনভ্যাসে ভুলে গেছো, একজন দেবতার সাথে কী আচরণ করতে হয়। আচ্ছা, আমিই শিখিয়ে দিচ্ছি।'

'এবার নিজের চোখ স্থির করলো সে। সাথে সাথে তার কালো মণিতে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠলো যেন। যারা আগে থেকে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা আরও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই ঘরে বসে থাকা প্রত্যেকটা মানুষ দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো। নিজেদের শরীরের ওপর যেন নিয়ন্ত্রণ নেই তাদের। ভয়ে গলা কাঠ হয়ে আছে, কিছুতেই নিজের শরীরের ওপর ইচ্ছেশক্তি কাজ করছে না। দেখতে দেখতে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সবাই এরিসকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ালো।

চারিদিকে একবার চোখ বোলালো এরিস, তারপর চিৎকার করে উঠলো, 'হাঁটু ভেঙ্গে সম্মান জানাও।'

সবাই এক সাথে দুই হাঁটু ভেঙ্গে নত হতে বাধ্য হলো। দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে সম্মান গ্রহণ করলো এরিস, 'দেবতারা অনেকদিন তোমাদের অবাধ্যতা সহ্য করেছে। আর নয়। আবার তোমরা অলিম্পাসের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বাঁচবে। আবার তোমরা দেবতাদের পূজা করবে আর তাদের কাছেই যা চাইবার চাইবে। আবার তোমরা দেবতাদের শক্তিকেই নিজের জীবনের শক্তি করে তুলবে।'

আরেকটু সময় সবাইকে হাঁটু ভেঙ্গে নত করে রাখলো সে। তারপর সবাইকে নিজের প্রভাব মুক্ত করে দিলো। সবাই এক এক করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। অনেক বয়স্ক সভাসদ হাঁটুতে ভালোই ব্যথা পেয়েছেন। তারাও অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। যে যার জায়গায় গিয়ে বসে পড়তে লাগলো আস্তে আস্তে।

এবার এরিস তাকালো পায়াসের দিকে, 'আশা করি, আপনার এবং আপনার লোকদের এখন আর আমাকে দেবতা বলে মানতে কোনো অসুবিধা নেই। আপনার পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি আমাকে সনদ দেবেন কি না।'

পায়াস ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'মহামান্য, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি। অবশ্যই আপনি নিজের পরিচয় সম্পর্কে সঠিক কথাই বলেছেন। পুরোহিতকে আর কিছু বলার দরকার নেই। এখন আপনি বলুন, আপনার জন্য এই নগর কী করতে পারে। আমাদের শ্রদ্ধা আর ভক্তি এখন শুধু আপনার জন্যই।'

'তুমি কিছু জানো না দেখেই এই কথা বললে। তোমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এখানে সবার সামনে কথা বলতেও আমার আর ভালো লাগছে না। সভা ছুটি দাও। আমি একান্তে তোমার সাথে কথা বলবো। সামনের বেশ কিছু ব্যাপার নিয়ে আমাদের কথা বলা দরকার।'

এরিসের কোনো কথায় এখন বাঁধ সাধা পায়াসের দ্বারা সম্ভব নয়। তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। সভাসদেরা এতে একটুও মন খারাপ করলেন না। দেবতা হোক আর যাই হোক এখানে থাকতে তাদের সবারই অনেক ভয় লাগছিল। তারা সভা থেকে বেরিয়ে বাঁচলো। সভা কক্ষের অদূরে নিজের একান্ত মন্ত্রনাকক্ষে এসে বসলেন পায়াস। এরিস বসেছে তার সামনে। নিকোলাস আর তার সেনাপতিকেও ডেকে এনেছেন তিনি। একা এরিসের সাথে কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না। এরিসকে অনুনয় করলেন তিনি, 'এরা আমার প্রধান মন্ত্রণাদাতা আর সেনাপতি। বলতে পারেন আমার ডান হাত আর বাঁ হাত। আপনি সব আলোচনা এদের সামনে করতে পারেন।'

'আচ্ছা। জিজ্ঞেস করেছিলে না, তোমরা আমার জন্য কী করতে পারো। বলছি। আমার একটাই চাওয়া। তোমরা আমাকে আবার অলিম্পাসে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারো। একবার অলিম্পাসে যেতে পারলেই আমি আমার পূর্ণ ক্ষমতা ফিরে পাবো। যা বারো জন প্রধান দেবতার ক্ষমতা।'

নিকোলাস এবার কথা বলল, 'মহামান্য এরিস, আমরা আপনাকে কীভাবে অলিম্পাসে ফেরত পাঠাবো। আমি জানি, অলিম্পাস দেবতাদের রাজ্য। কিন্তু কোনো মানুষের পক্ষে তো আর সেই রাজ্যের ঠিকানা জানা সম্ভব নয়।'

'তা তো আমিও জানি। অলিম্পাসের ঠিকানা শুধু তোমরা কেন এখন তো আমার কাছেও অজানা।'

'তাহলে আমরা আপনাকে কীভাবে সেখানে পাঠাবো?' এবার হতাশ ভঙ্গিতে কথাটা বলে উঠলেন পায়াস।

'আরে আমাকে তো আর সেখানে তুমি ঘোড়ার গাড়িতে করে দিয়ে আসবে না। আসলে অলিম্পাস কেবল একটা জায়গার নাম নয়, এটা আসলে তোমাদের রাজ্যের মতো পৃথিবীর কোনো রাজ্যও নয়। এটা হচ্ছে একটা আসনের নাম, পদবির নাম। যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে অলিম্পাস পর্যন্ত এমনিতেই পৌঁছানো যাবে। তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অলিম্পাসের দরজা আমার সামনে খুলে যাবে। আবার এর উল্টোটাও ঘটে। ঠিকমতো যোগ্যতা ধরে রাখতে না পারলে অলিম্পাস থেকে দেবতাদের পতনও হয়, যেমনটা আমার হয়েছে।'

'এখনও কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো না। আমরা কীভাবে আপনার যোগ্যতা বাড়িয়ে দিতে পারি।'

এরিস এবার একটু রেগে উঠলো, 'এখানেই মানুষের কাছে দেবতারা আটকে আছে। আদি পিতা জিউসের কোন মতিভ্রমে তিনি এই শাশ্বত নিয়ম তৈরি করেছিলেন কে জানে। মানুষের হাতেই দেবতাদের যোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। আর সেটাও বেশ সহজ নিয়মে। কোনো মানুষ যদি দেবতাদের পূজা করে, নিত্য সেই দেবতার মন্দিরে পূজা হয় তাহলেই সেই দেবতা শক্তিশালী হয়ে গমন করতে পারে অলিম্পাসে। সে কারণেই আমার অলিম্পাস থেকে পতন হয়েছিল। কেউই আমাকে পছন্দ করতো না। তারা জিউসের পূজা করতো, তারা পূজা করতো এথেনার, এমনকি সেই চোর হার্মিসের পূজাও করেছে কেউ কেউ, কিন্তু আমার পূজা কেউ করেনি, আমাকে কেউ চায়নি, বোকাগুলো কখনো বুঝতে পারেনি আমার গুরুত্ব, বুঝতে পারেনি এই পৃথিবীতে কেবল আমিই সত্য, এই পৃথিবী যতদিন আছে, ততদিন যুদ্ধও থাকবে।'

এই কথা কেউই অস্বীকার করতে পারলো না। তবে একটা ভরসার জায়গা দেখা গেল। নিকোলাস তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'আপনি আমাদের যে কাজ করতে বলছেন সেটা করা এমন একটা কঠিন হবে না। আপনার কয়েকটা মন্দির আমরা স্থাপন করবো। আমাদের এখানে অনেক পূজারী আছে। দরকার হলে আমরা ডেলফি থেকে বড়ো পুরোহিত নিয়ে এসে প্রতিদিন আপনার পূজা দিয়ে আপনার হারানো সম্মান ফিরিয়ে দেবো। আপনি আবার চলে যেতে পারবেন অলিম্পাসে। যতদিন এসবের ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন আপনি এই প্রাসাদে বেশ আরামেই থাকতে পারবেন।'

সহজ সমাধান। তবে এরিস তেমন একটা খুশি হতে পারলেন বলে মনে হলো না। ওদের সবার মুখে জমে উঠতে থাকা আলোটা আলগোছে নিভে গেল। এরিস বলে উঠলো, 'ব্যাপারটা এত সহজ নয়। আমার পূজা করলেই হবে না। পূজা কে করছে সেটাও দেখতে হবে। আমি তখন শুনলাম, তুমি না-কি এখানের রাজা নও। রাজা না হয়েও তুমি থাকছো রাজপ্রাসাদে, এই ব্যাপারটাই আমি বুঝতে পারছি না। এই ব্যাপারে আমাকে একটু আলো দান করো।'

পায়াস স্বল্প কথায় বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, 'আসলে গ্রীস এখন আর স্বাধীন কোনো ভূমি নয়। আগে এই গ্রীসের অনেকগুলো স্বাধীন রাজ্য ছিল। এখন সেগুলোর একটাও স্বাধীন নেই। সবাই আছে এখন রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে। রোমান সাম্রাজ্যের আয়তন অনেক বড়ো। এই গ্রীসের তুলনায় কয়েক গুণ। একা সম্রাট তো আর সব জায়গায় শাসন পরিচালনা করতে পারেন না। তাই তার হয়ে আমরা নানা অংশ শাসন করি। তিনিই আসল রাজা, আমরা তার প্রতিনিধি মাত্র।'

এরিসের চোখেমুখে তৎক্ষণাৎ এক আলো জ্বলে উঠলো, মনে হলো একটা কিছু বুঝতে পেরেছে সে, 'আবার বলো তো। এখন আর গ্রীসের ভূমিতে কোনো স্বাধীন রাজ্য নেই?'

'না।'

আচমকা হাঁ হাঁ করে হেসে উঠলো এরিস, সেই হাসি যেন এই ছোটো ঘরে ধ্বনিত হতে লাগলো মন্দিরের বড়ো ঘন্টার শব্দের মতো, কিছুক্ষণ ধরে চলল সেই হাসি, তারপর হাসি থামিয়ে এরিস বলল, 'যে জন্য দেবতারা আমাকে সাহায্য করেনি, তারই ফল ভোগ করছে এখন ওরা। এখন আর কোনো রাজ্য স্বাধীন নেই। অলিম্পানদেরকে যারা পূজা করতো তারা এখন আর কেউই তাদের পূজা সঠিকভাবে করতে পারছে না। তার মানে এখন কেবল আমি না, কেউই ঐ অলিম্পাসে নেই। তার মানে অলিম্পাস এখন শূন্য।'

বাকি তিনজন হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো এরিসের দিকে। অলিম্পাস শূন্য হওয়াতে এরিসের এখন কী লাভ তা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু নিকোলাস এরিসের একটা কথায় একমত হতে পারেনি, 'ক্ষমা করবেন। আপনার বোধহয় কোথাও একটু ভুল হয়েছে।'

'তাই নাকি! ঠিক করে দাও।' এরিসের চোখে কৌতুক।

'আমি গ্রীসের বিভিন্ন রাজ্য সম্পর্কে জানি। গ্রীসের বিভিন্ন রাজ্য রোমানদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও সবগুলো বড়ো বড়ো শহর এখন ফ্রি টাউন হিসেবে আছে। আমাদের এই রাজ্যও আছে ফ্রি টাউন হিসেবে। সব রাজ্যেই বড়ো বড়ো মন্দির আছে। আর সেখানে বিভিন্ন দেবদেবীর নিত্য পূজা হয়।'

'তুমি মনে হয় আমার কথা শুনতে পাওনি। আমি বলেছি পূজা হতে পারে, কিন্তু সঠিকভাবে না।'

'যদি মনে কিছু না করেন তাহলে কি কারণটা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'কারণ, রাজ্যে কোনো রাজা নেই। পরাধীন রাজ্যে প্রধান পূজা হবে না। রাজা যদি নৈবদ্য না দেন তাহলে সেই পূজার কোনো মূল্য নেই। ঐ নগর অথবা রাজ্যের রাজাকেও পুরোপুরি সমর্পণ করতে হবে দেবতার কাছে। অলিম্পাসে স্থান পাবার জন্য এটা অপরিহার্য। এখন বলো, এই গ্রীসের নগরগুলোর এখন রাজা কে?'

'কেন? রোমান সম্রাট।'

'হ্যাঁ, সে কি আমাদের কোনো পূজায় অংশ নেয়?'

'না।'

'তাহলেই আমার কথা সত্য হয়ে গেল। পরাধীনতার মধ্যে সম্মান পাওয়া যায় না। আর এখানেই আমাকে তোমাদের সাহায্য করতে হবে। ছোটো একটা সাহায্য। এরপরে আমি হবো অলিম্পাসের একমাত্র শাসক। সমস্ত অলিম্পাসের নিয়ম কানুন বদলে দেবো আমি। আবার চালু করবো পৃথিবীর ওপর দেবতাদের শাসন। তবে এবার সবকিছু বদলে ফেলা হবে। নতুন নিয়ম নিয়ে আসা হবে। আমিই হবো এবার দেবরাজ।'

একটু থেমে বলতে লাগলো এরিস, 'সব মন্দিরে আমার প্রতিকৃতি স্থাপন করতে হবে। এই গ্রীসের সব নগরে কেবল আমারই উপাসনা হবে। আর কারো নয়। কিন্তু তার আগে আমাদেরকে একটা ছোটো কাজ করতে হবে।'

তিনজনের মুখ থেকে এক সাথে বেরিয়ে এলো, 'কী?'

'সহজ কাজ। গ্রীসকে স্বাধীন করতে হবে। মুক্ত করতে হবে বিদেশি শাসন থেকে।'

কিছুক্ষণ আগে বিনা মেঘে বজ্র পড়েছিল এরিসের ক্ষমতায়। এবার কথা দিয়েই ঘরের ভেতরে বজ্রের আঘাত করলো এরিস। গ্রীসকে মুক্ত করার মানে হচ্ছে রোমান বশ্যতা অস্বীকার করতে হবে। কিন্তু রোমান বশ্যতা অস্বীকার করলে তো রোমান সম্রাট ওদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন।

'তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো না কীভাবে আমরা গ্রীস স্বাধীন করবো, তাই না?'

তিনজনেই নীরব। এরিস নিজের সহজ পরিকল্পনার কথা বলে, 'আমরা যুদ্ধ করবো। আক্রমণ করবো রোমানদের। তারপর মুক্ত করবো গ্রীস। গ্রীসের প্রত্যেক নগরে রাজাদের অভিষেক করবো। তারা তখন কেবল প্রতি নগরে আমার মন্দির বানিয়ে আমারই পূজা করবে। সহজ কথা।'

এবার পায়াস কথা না বলে পারলেন না, 'মহামান্য। এই মুহূর্তে রোমান সেনা পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সেনা। ঐ বাহিনীকে হারানোর ক্ষমতা কারো নেই।'

এরিস হাসলো, 'ভুলে যেও না, আমি যুদ্ধের দেবতা। যুদ্ধ কীভাবে জিততে হবে সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমরা কেবল আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। তোমাদের শ্রদ্ধা আমাকে প্রদান করো। তাহলেই চলবে।'

ট্রাজান আজকে খুব একটা ভালো বোধ করছেন না। এমনিতে তার শরীরে জরা চিহ্ন খুব একটা নেই। শরীরের নানা ব্যায়াম আর চিকিৎসকদের বলা নানা কথা তিনি বেশ ভালো ভাবেই মেনে চলেন। বয়স তার হয়েছে, তারুণ্য হারিয়েছে শরীর থেকে, কিন্তু তাকে দেখে বুড়ো বলার সাহস সামনে তো কেউ করবেই না, বরং শত্রুরাও আড়ালে তাকে বুড়ো বলতে দুবার ভাবতে বাধ্য হবে।

লক্ষ্যহীন হয়ে পড়া মানুষের জন্য সবসময় বিপজ্জনক। বিশেষ করে সেই মানুষের জন্য যিনি নিজের পুরো জীবন নানা বড়ো বড়ো লক্ষের অর্জন আর রক্ষায় অতিবাহিত করেছেন। সম্রাট হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না প্রথম জীবনে ট্রাজানের। কিন্তু তিনি হয়েছেন। রোমান সাম্রাজ্য আজকে নিজের সর্বোচ্চ আয়তন লাভ করেছে একমাত্র তারই শাসনে। কিন্তু এখন আর সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। এমন কোনো চূড়া খুঁজে পাচ্ছেন না যার ওপরে ওঠার জন্য আবার তিনি সংগ্রাম শুরু করতে পারেন। মনে হয় অবসর নেবার সময় চলে এসেছে।

তার ঘরেই বসে আছেন তিনি। পাশে ফেলে রাখা পান পাত্রে চুমুক দিয়ে যাচ্ছেন আনমনে। কিছুক্ষণ পর পর পরিচারক আসছে। সে সব নিয়মই জানে। পান পাত্র খালি দেখলেই সে আবার ভরে দিয়ে যায়, আর যদি ভরা দেখে তবে খালি হবার জন্য অপেক্ষা করে। ট্রাজান বিধাতার কথা চিন্তা করেন। তিনিও কি তার খালি পাত্র আবার ভরিয়ে দেবেন? শেষবারের মতো?

তার শেষ কাজটা অবশ্য তিনি জানেন। এই সাম্রাজ্যের সব রাজাই এই কাজটা করতে চেয়েছিলেন। কেউ পেরেছেন আবার কেউ হয়েছেন ব্যর্থ। তিনি ব্যর্থ হতে চান না। তিনি চান না তার উত্তরাধিকারী তাকে নিহত করে এই সিংহাসন দখল করুক। তিনি নিজেই এই আসনের উত্তরাধিকার নির্বাচন করবেন। শেষ বয়সটা কাটাবেন অবসরে। সম্মান নিয়ে।

জীবনের শেষ ধাপ আর সম্মান নিয়ে তার এই একান্ত ভাবনায় বাঁধ সাধলো একজন। কক্ষের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সে। ভেতর থেকেই বুঝতে পারলেন ট্রাজান, এ পরিচারক নয়।

'ভেতরে এসো।' ট্রাজানের ধীর স্বর ঘরের নীরবতা ভেঙ্গে দিলো।

ভেতরে প্রবেশ করলেন ট্রাজানের সেনাবাহিনীর উঁচু পদের সেনাপতিদের একজন। তাকে দেখেই ভ্রু একটু কুঁচকে গেল সম্রাটের। একসময় এদের সাথে তিনি কত জায়গায় যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছেন, যুদ্ধ জিতেছেন, জেতার পর এক সাথে উদযাপন করেছেন, তারপর আবার পরবর্তী অভিযানের

পরিকল্পনা। এখন আর কোথাও যাবার নেই। এই সেনাপতিরাও কি তার মতো হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন কি না কে জানে।

'তুমি এখনও রোমে আছো দেখছি? আমার যতদূর মনে পড়ে, কিছু গুপ্ত সংবাদ আনার কথা তোমাকে বলেছিলাম।'

'আপনি আমাকে রোমে থেকেই ঐ সব খবর আনতে বলেছিলেন। তার পরে অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। আমি এরই মধ্যে সবদিকে গুপ্তচর পাঠিয়েছি, আমাদের সব প্রাদেশিক শাসক আর গভর্নরদের আপনার আদেশের কথাও জানিয়েছি। দূতেরা এরই মধ্যে আমাদেরকে খবর পাঠানো শুরু করেছে, কিন্তু সেসব নিয়মিত খবর, তাই আপনাকে বিরক্ত করার প্রয়োজন মনে করিনি।'

তাও এই সেনাপতিরা একটা কিছু নিয়ে আছে, তাদের হাতে একটা হলেও কাজ আছে, তাকে সম্মান করা। তিনি কী করবেন?

সেনাপতিকে বসতে আজ্ঞা দিলেন ট্রাজান, 'তাহলে আজকে আমাকে বিরক্ত করার মতো কি কোনো ঘটনা ঘটেছে? মনে তো হচ্ছে সেজন্যই তুমি এখানে এসেছ।'

'আজ্ঞে সম্রাট। আমি একটা বিশেষ খবর দিতেই এখানে এসেছি।'

এরই মধ্যে পরিচারক আবার পাত্রে পানীয়ের স্তরের উচ্চতা পরীক্ষা করতে ঢুকেছে। তার দিকে হাত তুললেন ট্রাজান, 'শোনো, তুমি আমার পাত্র ভরিয়ে দাও, সাথে আরেকটা ভরা পাত্র নিয়ে আসবে। তার পরে তোমাকে আর এই ঘরে কিছু পরীক্ষা করতে আসতে হবে না। আবার আমি ডাকলে আসবে। বুঝতে পেরেছ?'

পরিচারক মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই সম্রাটের আজ্ঞা মতো পানীয় সরবরাহ করলো সে।

আবার পানীয়ের পাত্রে চুমুক দিলেন ট্রাজান, 'কই তোমার পাত্র তুলে নাও। এখন তো তোমরা আর কোনো কাজেই আমার সামনে আসতে চাও না। অথচ এক সময় আমরা দিনের পর দিন এক টেবিলে কাটিয়েছি।'

'হয়তো সময় বদলে গেছে সম্রাট।'

'হয়তো আমিই বদলে গেছি। সমরনীতি, রাজনীতি সব পেরিয়ে এখন আপাতত শেষ নীতি নিয়ে পড়ে আছি। যাক এসব কথা। বলো।'

'সম্রাট, আমরা বেশ কয়েকজন আমাদের সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যকে কয়েক ভাগ করে একেক ভাগের দায়িত্ব একেকজন নিয়েছিলাম। আমার ভাগে যে চরেরা পড়েছিল তাদের একজনের কাছ থেকেই আজকে চাঞ্চল্যকর একটা খবর পেয়েছি।'

'আচ্ছা।' একটু মনে করার চেষ্টা করলেন ট্রাজান, 'তোমাকে যেন কোন ভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল?'

'আমি গ্রীসের দায়িত্ব নিয়েছিলাম।'

'এই জায়গা সম্পর্কেই আমার সবচেয়ে বেশি ভয়। আমাদের সাথে দূরত্ব ওদের বেশি নেই। না শক্তিতে, না অস্ত্রবিদ্যায়, না সমর কৌশলে। শুধু বুদ্ধিতে একটু মার খেয়ে গেছে। ওদেরকে শান্ত রাখার জন্য আমরা ওদের জন্য বেছে নিয়েছিলাম মধ্যম পন্থা। সম্পূর্ণ সাম্রাজ্য থেকে একমাত্র গ্রীস থেকেই আমরা সবচেয়ে কম খাজনা পাই। ওদেরকে আমরা সুযোগ দিয়েছি ওদের সংস্কৃতি আর রীতি যথারীতি পালন করার জন্য। ওদের মধ্যে তো অসন্তোষ জন্ম নেবার কিছু নেই। তাহলে তোমার গুপ্তচর ঐ জায়গা থেকে কীভাবে খারাপ খবর পেলো?'

'সম্রাট, গ্রীসের নগরগুলো এখন বলতে গেলে মুক্ত অবস্থাতেই আছে। কোনো পরাধীন রাষ্ট্রের চেহারা যেমন হওয়া উচিত তেমন কিছুই নয়। আর এখানেই ওরা একটু নড়েচড়ে বসেছে। আমার মনে হয় পূর্ণ স্বাধীনতা পাবার জন্য গ্রীসের বেশ কিছু রাজ্যের লোকজন এখনও স্বপ্ন দেখে। ওরা এখনও স্বপ্ন দেখে রোমানদের হটিয়ে দিয়ে গ্রীসকে আবার স্বাধীন করবে, গ্রীক সাম্রাজ্য আবার প্রতিষ্ঠিত হবে।'

'স্বপ্ন দেখা ভালো। স্বপ্ন দেখতে তো কোনো আপত্তি নেই। আর আমরা তো মানুষ। স্বপ্নের দেবতা নই। তাহলে আমরা কীভাবে মানুষের স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণ করবো। তুমি কি এই স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা জন্যই আমার কাছ এসেছ?'

'না সম্রাট। আমাদের গুপ্তচর তো স্বপ্নের খবর আনেনি।'

'তবে কি সে কোনো বিদ্রোহের খবর এনেছে?'

'সরাসরি বিদ্রোহের কথাও বলা যাবে না। তবে এমন কিছু ঘটে চলেছে গ্রীসের একটা রাজ্যে যাতে আমাকে চিন্তিত হয়ে উঠতে হয়েছে।'

'আর সাথে সাথে চলে এসেছ আমাকে সেই চিন্তার ভাগ দিতে?'

সেনাপতি একটু হাসলো, 'সম্রাট, ভাগ করে দিলে সব জিনিসই কমে যায়।'

'হ্যাঁ, তা যা বলেছ। গ্রীসের কোন নগরে আমাদেরকে ভড়কে দেবার মতো কাজ হয়েছে?'

'মহারাজ, স্পার্টায়।'

'আমিও তাই সন্দেহ করেছিলাম। ইতিহাস থেকে যদি আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হয় তাহলে অবশ্যই এই রাজ্য সম্পর্কে আমাদের সবচেয়ে সতর্ক থাকা উচিত। এই রাজ্যের গভর্নর কাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল?'

'পায়াস নামে একজন। সে অনেক আগে থেকেই ঐ নগরের গভর্নর।'

'কিছুদিন আগে আমরা যখন আমাদের সব প্রাদেশিক শাসকদের সাবধান করেছিলাম তখন কি তাকেও সাবধান করা হয়েছিল?'

'আজ্ঞে মহারাজ। আমি নিজের বিশেষ দূত পাঠিয়ে পায়াসকে অনেক আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম। তাকে কাজের গতি বাড়ানোর জন্য বিশেষ গুপ্তচর দলকেও পাঠিয়েছি স্পার্টাতে।'

'আচ্ছা। এখন তাহলে বলো কী ঘটেছে সেখানে।'

সেনাপতি দূতের মুখ থেকে সবকিছু ভালো করে শুনেই এখানে এসেছে। তবে তার সামনে যিনি বসে আছেন তিনি এই পৃথিবীর বর্তমানে সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি, একটু থেমে সবকিছু গুছিয়ে নিলো।

'আমাদের স্পার্টার গভর্নরের ওপর হামলা হয়েছিল। এক গুপ্তঘাতক চেষ্টা করেছিল তাকে হত্যা করতে।'

এবার নিজের আনমনা ভাবটা একটু কাটিয়ে উঠতে বাধ্য হলেন ট্রাজান, 'কী বললে! আমাদের গভর্নরের ওপর হামলা। তাও গুপ্তঘাতকের দ্বারা।'

'হ্যাঁ, আমাদের যেই চর এই খবর এনেছে সে শতভাগ নিশ্চিত হয়েই খবরটা দিয়েছে। তার প্রাসাদে গুপ্তঘাতক ঢুকে পড়েছিল।'

'তারপর কী হলো?'

'গুপ্তঘাতক ধরা পড়েছে। তবে তার কাছ থেকে কোন কথা আদায় করতে পারেনি কেউ। পুরোপুরি ধরা পড়ার আগেই সে নিহত হয়েছে।'

'আমাদের চর এই কথা তোমাকে সরাসরি এসে বলেছে?'

' আজ্ঞে না। তার সাথে কবুতর ছিল। এমনিতে এতদিন এসে এসেই খবর দিতো। কিন্তু এই খবরটা জরুরি বলে সে কবুতরের মাধ্যমেই পাঠিয়েছে।'

'আচ্ছা। কী মনে হয় তোমার? গুপ্তঘাতক কে পাঠাতে পারে? এখানে আমরা অবশ্য শুধু বাইরের চিন্তা করলেই হবে না। আমাদের রোমান সম্রাটদেরও হত্যা করা হয়েছে ক্ষমতা দখল করার জন্য। তাই ব্যাপারটা বিদ্রোহী কেউ করেছে সেটা শুধু চিন্তা করলে বোকামি হবে। হতে পারে কেউ পায়াসের সেই আসন দখল করতে চাইছে। অথবা কারো পায়াসের সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে।'

'তা হতে পারে। তবে এখানে ব্যাপারটা ওদিকে চিন্তা করলে হবে না সম্রাট। এখানে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এই গুপ্তঘাতক ঐ স্পার্টার একজন। তিনি স্পার্টার একজন সম্মানিত লোক ছিলেন। নাম অ্যালেস্টর। খুব উঁচু মাপের সৈনিক। সবচেয়ে বড়ো কথা তার সাথে পায়াসের কোনো ধরনের ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই।'

এবার একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন ট্রাজান, 'তার মানে হচ্ছে এটা স্পষ্ট একটা বিদ্রোহের লক্ষণ। বলতে গেলে ওরা চেষ্টা করেছে পায়াসকে মেরে ফেলতে। এবং এখানে আঘাতটা পায়াসের ওপর ব্যক্তিগত নয়, এটা সম্পূর্ণ রোমান সাম্রাজ্যের ওপর আঘাত।'

কথাটা বলতে বলতে চোখ দুটো জ্বলে উঠলো ট্রাজানের। তার মধ্যে হঠাৎ করে যেন ফিরে এলো সেই নিষ্ঠুর, একরোখা সমরনায়ক। যে সাম্রাজ্যের জন্য এই জীবন পুরোটাই দান করেছেন, তার দিকে কেউ চোখ তুললে তার ভালো লাগবে না। এবার তিনি সেনাপতির দিকে তাকালেন, 'কিন্তু, এই খবরটা পায়াস আমাদের কাছে এখনও পাঠালো না কেন?'

'আমার মনে হয় সময় এখনও যথেষ্ট পেরিয়ে যায়নি। খবর তার তরফ থেকে এলেও আসতে পারে। তবে আমার মনে হচ্ছে সে পাঠাবে না। কারণটাও নিশ্চয়ই আপনি ধরতে পারছেন।'

'হ্যাঁ, পারছি। তার প্রাসাদে গুপ্তঘাতক ঢুকেছে, তার রাজ্যে বিদ্রোহ হবার সম্ভাবনা আছে, এমনটা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে রোমান সেনাপতি সেখানে পাঠিয়ে দেবো আমি। সেখানে ঘাঁটি গাড়বে রোমান সেনারা। ঐ নগরের ফ্রি টাউন হবার সুবিধা সাথে সাথে আমি রহিত করে দেবো। আর তখন তার গভর্নর হিসেবে সুযোগ সুবিধা ভোগ করার কোনো উপায় থাকবে না। সেনাদের নিয়ন্ত্রণে যখন নগর চলে যাবে, তখনই সেই নগর শাসিত হবে সরাসরি আমার দ্বারা।'

'একেবারে ঠিক ধরেছেন সম্রাট। এই কারণেই পায়াস এই খবরটা আপনার কাছে পাঠাবে না। সে ভাবছে বিপদ তো চলেই গেছে। সবকিছু সামলে নিয়েছে সে। এখন আর কোনো ভয় নেই।'

'তোমার কি মনে হয়? ভয় কি এখন আসলেই নেই। এটা কি কেবল একটা ক্ষণিকের উত্তেজিত সিদ্ধান্ত? এটা কি কেবল দেশপ্রেমের একটা সাক্ষর রাখার চেষ্টা?'

'এই কথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না মহারাজ। পায়াসের প্রাসাদের একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল ঐ গুপ্তঘাতক। পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়ে। শুধু পায়াসকে মেরে ফেললেই তো আর তার উদ্দেশ্য পূরণ হতো না। নগর দখল করতে হলে অবশ্যই সেনাবাহিনী দরকার।'

'হ্যাঁ। আমাদের গভর্নর মারা যাবার খবর শুনলে অবশ্যই আমরা চুপ করে বসে থাকতাম না। অবশ্যই সেনা পাঠাতাম। সেই সেনা তো আর ছোটো বাহিনী হতো না। অতো বড়ো বাহিনীর সাথে সে লড়াই করতো কী করে?'

'এই চিন্তা স্পার্টার বিদ্রোহীদের মনে ছিল বলেই আমার ধারণা। এবং আমাদের চর তার চিঠিতে এও জানিয়েছে, অ্যালেস্টরকে গুপ্তঘাতক হিসেবে হত্যা করার রাতেই আরও কিছু সৈন্য এবং আরও কিছু অভিজাতকে অ্যালেস্টরের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে হত্যা করা হয়েছে। তার মানে পায়াস কিছু একটা আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন সেটা পরিষ্কার। তার প্রাসাদে না-কি কিছুদিন আগে থেকেই গোপনে গোপনে একটা সাজ সাজ রব ছিল।'

'না, হিসেব মিলছে না।' ট্রাজানের কণ্ঠে অসন্তোষের ছাপ, 'তুমি যেভাবে বললে সেভাবে কয়েকজন সৈন্য আর কয়েকজন অভিজাত নিয়ে তো আর কিছুতেই আমাদের পাঠানো সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারতো না বিদ্রোহীরা। তাদের জন্য এই কথা জানা অপরিহার্য ছিল, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন। আর তারা সেই কথা অবশ্যই জানতো। আর সম্পূর্ণ পরিকল্পনা

ঠিক না করে কোন যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে নামে না। আমি যতটুকু শুনেছি স্পার্টানরা জাত যোদ্ধা।'

'কিন্তু চিঠিতে তো আর কিছুই খুঁজে পেলাম না। এটুকুই লেখা ছিল।' সেনাপতি নিজের মনেই যেন বলতে লাগলো, 'তাহলে তারা রোমানদের সাথে লড়াই করার উপায় বের করেই রেখেছিল। কিন্তু কী সেই উপায়?'

উত্তরটা দিয়ে দিলেন ট্রাজান, 'খুবই সোজা কথা। আমাদের রোমান সেনার সাথে লড়াই করার জন্য আরেকটা সেনাবাহিনী। নিশ্চয়ই তাদের কাছে একটা বাহিনী ছিল।'

'ঠিক'! এবার একমত হলো সেনাপতিও, 'ওদের কাছে বাহিনী অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেই বাহিনী কোথায়? তাদের কোনো খবর তো আমাদের কোন চর আমাদের দিতে পারেনি। এতো বড়ো বাহিনী তারা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে? এতগুলো সৈন্যের প্রশিক্ষণ, ছাউনি, মহড়া কিছুই তো আর আমাদের অলক্ষ্যে করা সম্ভব নয়। গ্রীসের নগরগুলো যদিও ফ্রি টাউন তবু আমরা ওদের প্রত্যেক নগরের প্রত্যেক প্রশিক্ষিত সৈন্যের হিসেব রাখি। তাহলে অতো বড়ো বাহিনী ওরা গঠন করলো কোত্থেকে?'

একটু নিজের মনে ভাবলেন ট্রাজান, তারপর মত দিলেন, 'এই হিসেবটাও সহজ। তারা ওদেরকেই নিজেদের বাহিনীতে নিয়েছে যাদেরকে আমরা হিসেব করি না। আমরা কাদেরকে হিসেব করি না, বলো তো?'

চট করে কথাটা মনে উঁকি দিলো সেনাপতির, চমকে উঠে সে তাকালো ট্রাজানের দিকে, 'আপনি দাসদের কথা বলছেন। আপনি বলতে চাইছেন গ্রীকদের মাঝেও এক স্পার্টাকাসের জন্ম হয়েছে?'

'অবশ্যই। এটা ছাড়া এই ঘটনার আর কি ব্যাখ্যা দেবে তুমি। অবশ্যই ঐ অ্যালেস্টরের কাছে হেলটদের সেনাবাহিনী ছিল। সে ঐ বাহিনী রেখে দিয়েছিল রোমান আক্রমণ ঠেকানোর জন্য। ভেবেছিল পায়াসকে মেরে স্পার্টার ক্ষমতা এমনিতেই দখল করে ফেলবে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, পায়াসকে মারতে গিয়ে নিজেই মারা পড়েছে।'

'কিন্তু, তাহলে সেই সেনাবাহিনী এখন কোথায়?'

'এখনও আছে সেই বাহিনী। যা আমাদের হিসেবের বাইরে। যার তথ্য আমাদের কোনো গুপ্তচরের কাছে নেই। হেলটদের সেই বাহিনী। আমি কিন্তু আমার আগের শাসকদের মতো কোনো ভুল করবো না। তারা ঐ সময়ে দাসদের বিদ্রোহ খুবই হালকা ভাবে নিয়েছিল। এখানে আমাদের হালকা করে কিছু নেবার সুযোগ নেই।'

'হ্যাঁ, সম্রাট। জানি। আপনার শেখানো সেই যুদ্ধের সময়ের কথাগুলো আমি ভুলে যাইনি। একটা ছোটো ছিদ্র বড়ো জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে।'

'একদম সত্য কথা। আরেকটা কথাও হয়তো জানো, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। এখন আমাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে স্পার্টার দিকে। সেখানে এমন এক বাহিনী আছে যা এখন আত্মগোপনে আছে, নেতৃত্বশূন্য। এখনই সেই বাহিনীকে খুঁজে বের করে হয় ধ্বংস করতে হবে, নয়তো ছত্রভঙ্গ করে দিতে হবে। আমার মনে হয় না অ্যালেস্টর একা মাথায় এত বড়ো দায়িত্ব নিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই তার সাথে আরও মাথা ছিল। তাদের সবাইকে পায়াস মারতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয় না। তার মানে, যে-কোনো সময় ঐ নেতৃত্বহীন বাহিনী একজন নেতা পেয়ে যেতে পারে, আর আমাদের সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই না?'

'আজ্ঞে সম্রাট। এখন আমরা কী করবো?'

'পুরো গ্রীসের সব বিশেষ গুপ্তচরদের কাছে খবর পাঠাও। আমাদের সেনাদলের যত গুপ্তচর এখানে অবকাশ যাপন করছে সবাইকে এখন স্পার্টা আর তার আশেপাশের নগরে পাঠাও। সবাইকে বলে দেবে ঐ বিশেষ সেনাদলের কথা। বলবে দাসেরা বাহিনী গঠন করেছে, আর আমরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত। তারা যেভাবেই হোক যেন সেই বাহিনীর সন্ধান বের করে।'

'আজ্ঞে সম্রাট।' সেনাপতি তড়িৎ বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন সম্রাট ট্রাজান। নাহ, ঈশ্বর তার কথা শুনেছেন। তার জীবনে উত্তেজনার শূন্যস্থান আবার ভরিয়ে দিয়েছেন তিনি।

অসিত ধনুক নিয়ে কলিনের আস্তানা থেকে একটু দূরে চলে এসেছে। এখানে এসে চারিদিকে ভালো করে তাকিয়েছে সে। না, বাইরে থেকে এই জায়গা দেখা যায় না। দিনের বেলাও এখানে প্রায় সন্ধ্যার আধার গাছপালার বদৌলতে। এখানে দিব্য অস্ত্রের সাধনা করা যাবে। ধনুক থেকে শক্তিআলোক বের হলেও এখানে আটকে থাকবে, কারো চোখে ধরা পড়বে না।

শেইরনকে সকালে উঠেই আর দেখা যায়নি। রুদ্রদেব ধারণা করেছেন তিনি নগরের দিকে যেতে পারেন। আর সেখানে এভাবে যাবার একটাই কারণ হতে পারে, অঙ্গদের খবর বের করা। সেই কথাটা শোনার পর থেকেই মন যন চঞ্চল হয়ে উঠেছে অসিতের। রাহুর পেছনে ধাওয়া করে এতদূর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে তারা। তবে সে জানে, এটাই পথের শেষ। এখানে যদি অঙ্গদের দেখা না পাওয়া যায় তাহলে অঙ্গদের খোঁজে যাবার আর কোনো জায়গা অবশিষ্ট থাকবে না। এই চিন্তাটা ক্রমশ তাকে অসুস্থ করে ফেলছিল। শেষ পর্যন্ত মানুষের ভিড়ে আর থাকতে পারেনি সে। ধনুকটা হাতে নিয়ে নির্জনে চলে এসেছে। এখন কিছু একটাতে মনঃসংযোগ করতে হবে। রুদ্রদেবের উপদেশের কথা ভাবল সে। সক্ষম যোদ্ধা হবার এখনও অনেকটা পথ বাকি, যোগী হবারও।

নিজের ধনুক তুলে ধরল সে। এবার মন্ত্রটা পড়ে নিলো বায়বাস্ত্রের। আঙুল দুটো ভালো করে সমন্বয় করলো। মনের যত বিক্ষিপ্ত অংশগুলো এক জায়গায় জড়ো করার চেষ্টা করলো প্রাণপণে। চোখ বন্ধ করেই টান দিলো ধনুকের ছিলায়। হ্যাঁ, চোখের কোণের খোলা অংশ দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে, এইতো ছিলার মধ্যে তীর রূপে শক্তি প্রকাশিত হচ্ছে। ছিলায় টান বাড়াতে লাগলো সে। শক্তির আলোক রূপটা আস্তে আস্তে ধরতে লাগলো তীরের রূপ। আরেকটু হলেই পুরোপুরি রূপ ধরবে তীরের। আরেকটু টান বাড়ালো সে। কিন্তু না, একেবারে শেষ প্রান্তে এসে আর পারলো না। আলোটা মিলিয়ে গেল। একবার হতাশ হয়ে নিজের হাতে থাকা ধনুকের দিকে, আরেক বার নিজের আঙুলের দিকে তাকালো সে। হয়তো রুদ্রদেব যা বলেছে তাই সত্য। তার দ্বারা ধনুর্বিদ্যার উচ্চ অংশে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

তবে দিব্যাস্ত্র প্রকট করতে না পারলেও একটা উপকার এতে হয়েছে। অনেকটা সময় মনের একাগ্রতা ছিল এই কাজে। শেইরন, অঙ্গদ আর দুশ্চিন্তা সবকিছুই ভুলে থাকা গেছে। আরও কিছুক্ষণ অভ্যাস করার সিদ্ধান্ত নিলো সে। দেখা যাক না। এমনিতেও তো তাকে কোনো রাজ্য উদ্ধার করতে যেতে হবে না। আবার মন্ত্র আউড়ে নিলো। এর আগে একেক সময় পঞ্চভূতের একেক শক্তি প্রকটের চেষ্টা করতো সে। এরপর রুদ্রদেব উপদেশ দিলো, যাতে প্রথমে একটা

শক্তিই বেছে নেয় আর সেই একটা শক্তিই যেন চালানোর চেষ্টা করে। একটা আয়ত্ত হয়ে গেলে বাকি সব এমনিতেই আয়ত্ত হয়ে যাবে।

আবারো বায়বাস্ত্র মন্ত্র পড়ে ছিলা টানলো সে। এবার ছিলায় টান বাড়াতে লাগলো আরও আস্তে। তবে ফলাফল বদলালো না। এবারও শক্তি প্রকট হলো, কিন্তু পূর্ণ তীরের আকৃতি নেবার আগেই সেই আলো মিলিয়ে গেল।

এবারে অবশ্য আলোটা একটু বেশি তীব্র হয়েছিল। আলোটা চট করে মিলিয়ে যেতেই জায়গাটা যেন আরও বেশি অন্ধকার হয়ে গেল। সেই অন্ধকারে ঘাড়টা যেন একটু নুয়ে পড়লো অসিতের। দুশ্চিন্তা দূর করতে এখানে এসে এখন আবার তার মধ্যে হতাশা ঝাঁকিয়ে বসছে।

এমন সময় একটা গলা শুনতে পেলো সে, 'এমন জায়গায় এই অভ্যাস করাটা খুবই বিপজ্জনক।'

কণ্ঠটা অসিতকে চমকে দিতে গিয়েও পারলো না, কণ্ঠটা রুদ্রদেবের। রুদ্রদেব অসিতকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছে, 'তোমাকে না বলেছি, এভাবে দিব্যাস্ত্রের অভ্যাস করবে না। কেউ দেখে ফেললে বিপদ হয়ে যাবে। প্রথমে সঠিক জায়গা খুঁজে বের করতে হবে।'

'কোথায় পাবো সঠিক জায়গা, এখানে তো কিছুই চিনি না।'

'খুঁজে বের করতে হবে। আমারও তো অভ্যাস করা দরকার। সবচেয়ে ভালো হবে কোনো ছোটোখাটো গুহা খুঁজে পেলে। এখানে যেহেতু পাহাড়ি জঙ্গল, গুহা ে অবশ্যই থাকার কথা। তবে সাবধান থাকতে হবে। এখানে না-কি পাহাড়ি সিংহ আছে। দেখা যাবে গুহা খুঁজতে গিয়ে হাজির হয়েছি সিংহের গুহায়।'

পশুরাজের গুহায় হাজির হলে কী পরিণতি হতে পারে সেটা ভেবে একটু না হেসে পারলো না অসিত, 'আপনি আমাকে খুঁজতে এসেছেন না-কি এখানে অভ্যাস না করার উপদেশ দিতে এসেছেন?'

'আমি তোমাকে এদিকে আসতে দেখেছিলাম। ধনুক হাতে দেখেই বুঝেছিলাম কী করতে যাচ্ছ। শোনো অসিত, জেদ জিনিসটা যে একেবারেই খারাপ তা নয়, তুমি যদি জেদ আঁকড়ে ধরে রাখতে চাও, তাতেও আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার মধ্যে ধনুর্ধর হবার তেমন কোনো লক্ষণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আজকেও তোমার ভেতরে চূড়ান্ত মনঃসংযোগের অভাব দেখলাম। যাই হোক, অনুশীলন তো আর তুমি কম করোনি। পঞ্চভূত হচ্ছে এই দিব্যাস্ত্রের শুরুর ধাপ। পরের ধাপগুলোতে তো আরও কঠিন মনঃসংযোগের দরকার পড়বে।'

'কী রকম।' অসিতের মনে আবার প্রশ্নের উদয় হয়েছে।

'এই যে তুমি পঞ্চভূতের সাধনা করছ, কিছু যোদ্ধা ছিলেন তারা এই পঞ্চভূতের শক্তি সন্ধানে দুইয়ের অধিক আঙুল ব্যবহার করতেন। তখন তাদের ধনুকে একের অধিক শক্তি দেখা যেতো। চিন্তা করো, তখন তাদেরকে দুটো অথবা

তিনটা মন্ত্র পড়তে হয়েছে, মনকে দুই থেকে তিন ভাগ করে একেক ভাগে একেক শক্তি এনে জড়ো করতে হয়েছে, তারপর ধনুকে এসে জড়ো হয়েছে একের অধিক শক্তি। তারা তখন সেগুলো একের অধিক লক্ষ্যে আঘাতের জন্য ব্যবহার করেছেন। এটা খুবই কঠিন কাজ। খুব কম যোদ্ধাই এই কাজ করতে পারতেন।'

অসিতের গলায় বিস্ময়, 'এমনটাও সম্ভব?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব। সবটা জানতে পারলে তো তোমার বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। এতদিন আমি তোমাকে কেবল আমাদের দেহের ভেতরের শক্তির কথা বলেছি। এগুলো কিন্তু একটাও আদিভৌতিক শক্তি নয়। এগুলো সব পার্থিব শক্তি।'

'হ্যাঁ, জানি। কারণ পৃথিবীর সবকিছু এই পঞ্চভূতের শক্তি দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে।'

'একেবারে ঠিক। কিন্তু এই শক্তির বাইরেও কিছু শক্তি আছে। যা দিয়ে এই মহাজগত গঠিত হয়েছে। সেগুলোকে বলা হয় মহাজাগতিক শক্তি। সেগুলো এই পৃথিবীতে কিছুতেই ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু আগের যোদ্ধারা দেবতাদের কাছ থেকে ঐ শক্তিগুলো অনেক সাধনা করে লাভ করতেন এবং যুদ্ধে তা ব্যবহারও করতেন। তুমি কি জানো সেই অস্ত্রগুলোর নাম?'

অসিত অস্ফুটে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ। আমি শুনেছি। কিন্তু সেসব তো কল্পকাহিনি। ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মশির, সুদর্শন, নারায়ণ, পাশুপত এসব কি বাস্তবে আছে?'

'আছে। আবার কিছু অস্ত্র আছে যা তপোবলের দ্বারা তৈরি হয়েছে। যেমন ভার্গবাস্ত্র, বজ্র। এমন আরও অনেক শক্তি আছে। তবে সেসব তুমি আস্তে আস্তে জানতে পারবে। এখন তো শক্তি তোমার ভেতর থেকে এনে তুমি তীরে জুড়ছ, তখন তোমাকে বাইরে ছড়িয়ে থাকা শক্তির সাথে নিজের মনের সংযোগ করাতে হবে। মন্ত্রের ব্যবহার তখনো করতে হবে, তবে খুব উঁচু মাপের যোগী না হলে সেসব অস্ত্র ব্যবহার করা যায় না।'

'আপনি কি সেসব শক্তি ব্যবহার করতে পারেন?'

অসিতের আচমকা প্রশ্নে একটু থমকে না গিয়ে পারলো না রুদ্রদেব, তবে সেটাও খুবই সীমিত সময়ের জন্য, 'আমি সেজন্যই তো একটু অভ্যাস করতে চাচ্ছিলাম। সেই অস্ত্রগুলো নইলে আয়ত্তে আসবে কীভাবে? এখন চলো ফিরতে হবে।'

'আলো তো এখনও আছে। আরেকটু পরে গেলেও ক্ষতি হবে না।'

'আলোর ব্যাপার না। শেইরন শহর থেকে চলে এসেছে।'

'কী বলছেন! কোনো খবর পাওয়া গেছে অঙ্গদের?'

'ব্যাটা বদ্ধ মাতাল হয়ে আছে', যা শুনেছে এড়িয়ে গেল রুদ্রদেব, অসিত সব নিজের কানেই শুনুক, 'চলো, আমি ওকে একটু স্বাভাবিক হতে রেখে এসেছি। গিয়ে দেখি এখন কী অবস্থা।'

দুজনে আবার আস্তানার দিকে হাঁটতে লাগলো। অসিত টের পেলো একটু আগে অস্ত্রের অভ্যাসের সময় হারিয়ে যাওয়া উত্তেজনা আবার ফিরে আসছে।

শেইরন ততক্ষণে একটু স্বাভাবিক হয়েছেন। অসিত আর রুদ্রদেব এসে বসলো তার পাশে। অসিত জিজ্ঞেস করলো সরাসরি, 'অঙ্গদকে পাওয়া গেছে?'

শেইরনের মুখে অম্লান হাসি, 'আগেই বলেছিলাম, আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। তারই ফল পেলে এখন। আমি অঙ্গদকে দেখে এসেছি পায়াসের প্রাসাদে। শুধু তাই নয়, সেখানে রাহুও আছে।'

কথাটা শুনে অসিতের মুখ শক্ত হয়ে গেল, 'ভালোই হয়েছে। তার সাথে আমার বেশ কিছু হিসেব বাকি।' পরের মুহূর্তেই তার মাথায় এলো আরেক প্রশ্ন, 'আপনি নিশ্চিত তো আপনি অঙ্গদকেই দেখেছেন? অন্য কোনো বানর দেখেননি তো আবার?'

'আরে না। আমি নিশ্চিত। তোমার কথায় ঠিক। ঐ বানর এই দুনিয়ায় একটাই থাকা সম্ভব। দুটো নয়। আর রাহুর বর্ণনা এতদিন ধরে তোমাদের মুখে শুনে আর মানুষের কাছে বলে এতটাই পরিচিত হয়েছে ওকে একবার দেখেই চিনতে পেরেছি।'

রুদ্রদেব নিজের প্রশ্নটা করলো এবার, 'একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কীভাবে ঢুকলেন ঐ প্রাসাদে?'

শেইরন আবারো হাসলেন, 'ভুলে যেও না, আমি এই নগরে জন্মেছি। আমার আস্তিনে এমন আরও অনেক কৌশল আছে যা আস্তে আস্তে দেখতে পাবে।'

'তা আর বলতে।'

অসিত ধৈর্যহারা হয়ে পরে, আর দেরি করতে চায় না সে, 'তাহলে এখন অঙ্গদকে উদ্ধারের উপায়ের কথাও তো চিন্তা করা দরকার।'

'সেখানে একটু ঝামেলা হয়ে আছে।' এবার একটু চিন্তা দেখা দিলো শেইরনের মুখে, 'এরই মধ্যে বেশ বড়ো পরিমাণ মুদ্রা দিয়ে অঙ্গদকে কিনে নিয়েছেন পায়াস। চুক্তি অনুযায়ী জেইস সেই মুদ্রার অর্ধেক নিয়ে নিজের পথে চলে গেছে। রাহু এখনও তার ভাগের বাকি অর্ধেক পায়নি, তবে পেয়ে যাবে। পায়াস নিজে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে অঙ্গদকে কিনে নিয়েছে। আমাদের প্রার্থনা তার কাছে কোনো দাম পাবে বলে তো মনে হয় না।'

'ঠিক ধরেছেন।' রুদ্রদেব সায় দিলো, 'একটুও দাম পাবে না। আমাদেরকে পাত্তা দেবার কোনো কারণ নেই তার। আর আমরা সেই রাস্তা দিয়ে হাঁটবো না। যেভাবে করলে অঙ্গদকে উদ্ধার করা যায় সেদিকেই কাজ করবো।'

'কী করবো?' এবার অসিত জানতে চায়।

'এবার আর আমাদের তিনজনকে দিয়ে হবে না। এখানে আমার মতে কলিন আর তার দলের সাহায্য লাগবে। এখনই ওদের সাথে আলোচনায় বসতে হবে।'

শেইরন দ্বিমত করলেন না। পায়াসের প্রাসাদ থেকে অঙ্গদকে বাঁকা উপায়ে বের করে আনার ক্ষমতা আসলেই তার নেই। তবে সেখানেও সন্দেহ হচ্ছে তার। রুদ্রদেব ভাবছে কলিন তাকে সাহায্য করতে পারবে। কলিন কীভাবে তাকে সাহায্য করবে? পায়াসের প্রাসাদ থেকে খবর বের করতে পারে না যে, অঙ্গদকে সে কীভাবে বের করবে?

কলিন আরও দুজনকে নিয়ে কথাগুলো শুনলো বসে বসে। আগেও সে শুনেছে ওরা সেই ভারতবর্ষ থেকে এসেছে এখানে বানরের খোঁজে। এখন দেখা যাচ্ছে আসলেও সত্যি। শুধু যে সত্যি তাই নয়, এই শেইরন বুড়ো বয়সে এই পাগলামিতে মজেছেন। আজকে না-কি গিয়েছিলেন ঝুঁকি নিয়ে পায়াসের প্রাসাদে আর সেখান থেকে খবর নিয়ে এসেছেন, তাদের বানর ঐ প্রাসাদেই আছে।

শেইরন বোঝানোর সুরে বলছেন, 'এখানে তোমাদের সাহায্য পেলেই কাজটা সম্পন্ন হবে। একটু সাহায্য করো।'

কলিন আহত চোখে তাকায়, 'আপনি আবার আমাকে এই কথা বলতে এসেছেন। শুনুন, আসলেই প্রথম বার শুনে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনারা পাগল হয়ে গেছেন। একটা বানরের জন্য কেউ এত বড়ো ঝুঁকি নেয়?'

শেইরন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, 'তুমি একটু বেশি নিষ্ঠুর আচরণ করছো না আমার সাথে?'

'না মহাশয়, করছি না। আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি হয়তো এই নগরের অবস্থা সম্পূর্ণ জানেন না। নগরের অবস্থা টালমাটাল। অনেক কিছু ঘটে গেছে। পায়াসের প্রাসাদে কয়দিন আগে এক গুপ্তঘাতক ঢুকেছিল। সেই গুপ্তঘাতক নিহত হয়েছে। এবার বুঝতে পারছেন তো, সেই প্রাসাদের নিরাপত্তার অবস্থা এখন কেমন হবে। আমি কিছুতেই এখন ঝুঁকি নিয়ে সেই প্রাসাদে আমার লোক দিয়ে চুরি করাতে পারবো না।'

শেইরন আহত চোখে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রুদ্রদেব এবার বলে উঠলো, 'আপনি মনে হয় বলেছিলেন আপনার এই দল নিয়ে একটা উদ্দেশ্য আছে। আপনারা ডাকাত না। তাহলে ঝুঁকি নিতে এত ভয় কেন?।'

কলিন এবার পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, 'কেন ঝুঁকি নেবো? আপনারা আমার সাথি না-কি বন্ধু? আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছি, নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করছি। আমি ওদেরকে পরিচালিত করছি মুক্তির দিকে। এখন আমিও যদি আপনাদের জন্য একটা গৌণ কাজে ওদের ব্যবহার করি তাহলে ওরাই বা আমাকে কী মনে করবে?'

কথাটা যথেষ্ট অপমানকর, রুদ্রদেব অপলক চোখে তাকালো কলিনের দিকে, 'আপনি এখানে আপনার দল নিয়ে যা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখুন। কিছুতেই আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে খারাপ কিছু বলবেন না। আমরা এখানে অনেক কষ্ট করে এসেছি। অনেক কিছুর সামনাসামনি হতে হয়েছে আমাদেরকে এখানে আসার জন্য। আপনার উদ্দেশ্য যেমন আপনার কাছে মহান, তেমনি আমাদের উদ্দেশ্যও আমাদের কাছে মহান।'

কলিন তবু কথা বলতে ছাড়ে না, 'আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই মহান। আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়ছি। মানুষের কাছে এরচেয়ে মহান আর কিছু হতেই পারে না।'

রুদ্রদেব মৃদু হেসে বলল, 'আমরাও স্বাধীনতার জন্য লড়ছি। শুধু বাহ্যিক স্বাধীনতাই তো স্বাধীনতা নয়, অন্তরের মুক্তিও তো দেখতে হবে। যা আপনার মুক্তির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে তাকে রাস্তা থেকে সরিয়েই আপনাকে মুক্তি পেতে হবে। শান্তির চেয়ে বড়ো স্বাধীনতা আর নেই। আপনার কাছে আমাদেরকে পাগল মনে হতেই পারে, কিন্তু আমরা যা করছি তার পুরোটাই অন্তরের শান্তি লাভ করার জন্যই করছি।'

কলিন আর কিছু বলে না, প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে, 'আপনাদের দুপুরের খাওয়া নিশ্চয়ই হয়ে গেছে। খাবার কেমন ছিল?'

রুদ্রদেব নিজেও প্রসঙ্গ বদলে নিলো, 'আপনাদের আতিথেয়তা সত্যিই দেখার মতো। আমাদের ভাগ্য ভালো আমরা এমন আদর পাচ্ছি। এত দূরে এসে যা সত্যিই অভাবনীয়।'

'আপনারা শেইরনের সাথে এসেছেন। যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকতে পারবেন। কিন্তু ঐ কাজে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না। ক্ষমা করবেন।'

কলিন চলে যেতেই শেইরন নতুন পথ বাতলে দিলো, 'আচ্ছা, এখানে দুই স্পার্টার অভিজাত সৈন্য আছে, ওদের কাছে সাহায্য চাইলে হয় না?'

কাদের কথা বলা হয়েছে বুঝতে পেরেছে রুদ্রদেব, 'একজন তো আমার চিকিৎসা পেয়ে এখন কিছুটা ভালো। আরেকজন আছে বন্ধু আর প্রেমিকা উভয় সংকটে। এমন অবস্থায় তাদের কাছে কোনো ধরনের সাহায্য চাওয়া উচিত হবে না।'

অসিত বুঝতে পারছে সামনে কোনো পথ নেই, 'তাহলে এখন আমরা কী করবো? এতদিন পরে অঙ্গদের খোঁজ পেয়েও আমরা কিছুই করবো না?'

রুদ্রদেব বসলো, 'এখন কয়দিন বিশ্রাম আর শরীর চর্চা। এছাড়া তো কোনো উপায় দেখছি না। আমাদের ভাগ্যের সরোবরের জল এখন অনেক বেশি কাঁপছে। একটু সময় দিতে হবে সেই জল পুরোপুরি শান্ত হবার জন্য। তারপর সেই জল আমাদের জন্য হয়ে উঠবে আয়না, সেই আয়নাতেই আমরা খুঁজে পাবো আমাদের পরবর্তী রাস্তা।'

কথাগুলোর মানে অসিত তেমন একটা ধরতে পারলো না। শেইরন ধরার চেষ্টাও করলেন না। দুজনেই বুঝতে পেরেছে রুদ্রদেব কী বলতে চেয়েছে।

এখন আপাতত শিকারের পেছনে তাড়া করা শেষ হয়েছে। এবার কেবল ওঁত পেতে অপেক্ষা করার পালা।

এরিস যেভাবে এক কথায় রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কথা বলল সামনে বসা তিনজনের মাথায় কাজটা ঠিক ততটা সহজ হয়ে ধরা দিলো না। এরিস যুদ্ধের দেবতা এই কথা প্রমাণিত, কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপার নিকোলাস যে জানে না তা নয়। তাদের পুরানো ইতিহাসে দেবতাদের মানুষের হাতে পরাজিত হবার নজির আছে। আর আট দশজন সৈন্যের বিরুদ্ধে একা দাঁড়ানো আর সম্পূর্ণ এক সেনাবাহিনীকে রুখে দেওয়া এক কথা নয়। অবশ্য দৈব ক্ষমতার পরিচয় তো এখনও পাওয়া যায়নি। দেখাই যাক সামনে কোথাকার জল কোথায় যায়। এরিস যদি শেষ পর্যন্ত গ্রীসকে মুক্ত করে ফেলে তাহলে তো তার লাভ কম হবে না। এতদিন সে কেবল ভেবে এসেছে পায়াসের পর তার মেয়ের জামাই হিসেবে স্পার্টার গভর্নর হবার কথা। এবার যে-কোনো একটা বড়ো রাজ্যের সরাসরি স্বাধীন রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ সামনে।

তবে এখানে যে বিপদও একেবারে নেই তা নয়। যদি এরিস তার কথা রাখতে না পারে। তখন এরিসের দলে থাকার অপরাধ হিসেবে রোমান সম্রাট ওদের প্রাণদণ্ড অবশ্যই দেবেন। তখন গভর্নর হওয়া তো দূর, প্রাণ নিয়েই টানাটানি পড়ে যাবে।

পায়াস অবশ্য এত চিন্তা করছেন না। তবে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তার মন সায় দিচ্ছে না। যাদেরকে মোটামুটি এই জীবনে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে রেখেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে হঠাৎ করে যাওয়া যায় না।

এরিস সবার মুখের দিকেই একে একে তাকাচ্ছে। তারপর নিজের শেষ চালটা দিলো, 'তোমরা এখনও আমার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করছ। তোমরা এখনও ভরসা করতে পারছো না আমার কথা। এজন্যই আমার পিতা বলতেন, মানুষের মধ্যে নানা ভালো গুণ থাকলেও কিছু খারাপ গুণও আছে। তারা একইসাথে যেমন স্মৃতিকাতর আবার সময়ে সময়ে তাদের স্মৃতি তাদের সাথে প্রতারণা করে বসে। একটু আগেই আমি তোমাদেরকে আমার ক্ষমতার এত বড়ো কিছু নমুনা দেখালাম, আর তাতেও আমার পাশে দাঁড়াতে তোমরা ভয় পাচ্ছো। ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে জোর করবো না। সত্যি বলতে কি, তোমরা আমার পাশে থাকা অথবা না থাকাতে আমার বিন্দু পরিমাণও কিছু যায় আসে না। সুযোগ তোমরাই হারালে। হয়তো হতে পারতে স্বাধীন রাজা, আমার একনিষ্ঠ ভক্ত, কিন্তু এখন হয়ে গেলে আমার চোখে একজন সাধারণ মানুষ মাত্র।'

এরিসের কথা শুনে মনে হচ্ছে রোমান সেনাকে পরাজিত করা ছেলে ভুলানোর চেয়েও সহজ কাজ। এই আত্মবিশ্বাস এড়িয়ে যেতে পারলেন না পায়াস, 'কিন্তু, আমার সেনার তো অধিকাংশই রোমান। হাতে গোণা কিছু গ্রীক সৈন্য আছে এই

নগরে। আপনি যত কথাই বলুন, সেনাবাহিনী তো একটা লাগবে তাই না?' শেষ দিকে পায়াসের গলা আকুল হয়ে উঠলো।

এরিসের তাতে কিছুই গেল আসলো না, 'আমি তো আগেই বলেছি তোমাদের সেনা আমি ব্যবহার করবো না। তোমরা কেবল আমার সাথে থাকার সুযোগটা নিয়ে ধন্য হবে।'

'তাহলে আপনি সেনা জোগাড় করবেন কোত্থেকে?' এবার প্রশ্ন করলো নিকোলাস।

'সেই কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। তোমাদের সেনা তোমরা নিতে চাইলে নিয়ে নেবে। যুদ্ধ যাত্রা করার সময় এই নগরের রক্ষা করার জন্যও তো সেনা রেখে যেতে হবে তাই না? ধরো অর্ধেক রেখে গেলে আর অর্ধেক নিয়ে গেলে। আমার সেনা এলো বলে।' একটু হাসির বিরতি নিলো এরিস, 'আর তোমরা ভাবলে কী করে, তোমাদের এই সেনাদের নিয়ে আমি যুদ্ধে যাবো?'

'কবে নাগাদ আমরা তাহলে যুদ্ধযাত্রা করবো? পায়াসের এই প্রশ্নের আড়ালে আরেকটা উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমি অনেকদিন অপেক্ষা করেছি। যদিও অচেতনে। আর অপেক্ষা করার মতো সময় আমার কাছে নেই। যত তাড়াতাড়ি অলিম্পাসে উঠতে পারি ততই মঙ্গল।'

'না, আসলে আমাদের একটা কাজ বাকি রয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন সময় দিলে কাজটা সমাধা করে তারপর যুদ্ধের কাজে গেলে ভালো হতো।'

এরিস হালকা স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কী কাজ?'

'আজকে আমরা প্রাসাদে এই আলোচনাই করতাম। কিন্তু আপনার আগমনে আলোচনাটা আর করা হয়নি। আমার মেয়ের সাথে এই স্পার্টার অভিজাত যুবকের বিয়ের কথা আজকেই পাকাপাকি করে ফেলার কথা ছিল। শীঘ্রই বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হতো এই রাজ্যে।'

'বেশ ভালো' এরিস খুশি হলো, ' তবে আমার হিসেবে বিয়েটা যুদ্ধের পরেই হোক। তখন তোমরা রাজ্যের রাজা হবে। জনগণ আবার ফিরে পাবে স্বাধীনতা, দেবতাদের কৃপা, অলিম্পাসের আশ্রয়। তখন সব মিলিয়ে এই বিয়ের উৎসবটা জমবে ভালো। এখন তো যুদ্ধের ছোটোখাটো প্রস্তুতি নিতে নিতেই সময় পেরিয়ে যাবে। আসলে বিয়ের অনুষ্ঠান করে এখন তেমন একটা সুবিধা হবে না।'

পায়াস এখন কিছু বলতে পারলেন না। আসলে এরিসের কোনো কথার বিরোধিতা তিনি করছেন না ভয়ে। এমন একজনকে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। আর হিসেব করে বলতে গেলে কথাটা ঠিকই আছে। তার নিমন্ত্রিত অথিতি তালিকার বেশির ভাগই রোমান। আর এখন তো সেই রোমানদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন তারা। যুদ্ধটা শেষ হোক, তারপর উৎসব করা যাবে।

এরিস উঠে অন্য ঘরে গেল। সেই ঘরে একটু আগে তার পোশাক রেখে গেছে পরিচারক। তার মাপের পোশাক পাওয়া যায়নি, মাপ নিয়ে তড়িৎ বানিয়ে আনতে

হয়েছে। সেটা পরতেই গেছে সে। দেবতার উপযুক্ত পোশাক কী হবে সেটা সেই জানিয়েছে দর্জিকে।

এরিস বেরোতেই তিনজন এক অপরের দিকে তাকালো। রোমান সেনাপতি এতক্ষণ কিছু বলেনি, এবার মুখ খুলল, 'এই পাগল কি আমাকেও রোমানদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে না-কি? আমি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবো না, আগে থেকেই বলে রাখছি।'

'আহ, এটা তেমন কোনো সমস্যা না', পায়াস বিরক্ত হন, 'এটার সমাধান আমি করে দেবো। বলল না, এখানে কিছু সৈন্য নগরের রক্ষার জন্য রেখে যেতে। আপনাকেও রেখে যাবো সৈন্যের সাথে।'

কথাটা বলেই নিজের চিন্তায় ডুবে গেলেন পায়াস। যুদ্ধে জিতলে তিনি গ্রীসের কোনো এক রাজ্যের রাজা হবেন। স্পার্টার মধ্যেই থাকবেন তিনি। এরিস নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে তাকে প্রাধান্য দেবেন। কথা হচ্ছে হেরে গেলে কী হবে? রোমানদের ক্ষমতা আছে, দৈব ক্ষমতাও থাকতে পারে। হেরে গেলে ট্রাজানকে সব বুঝিয়ে বলতে হবে। তাকে এখানে জিম্মি করার কথাটা বলতে হবে সবার আগে। তার আসলে কিছুই করার ছিল না।

এসবের মধ্যেই নতুন পোশাক পরে এরিস প্রবেশ করলো ঘরে। তাকে দেখে আরেক বার সবাই চমকে গেল। একটা দ্যুতি যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে তার সারা শরীর থেকে। বিশেষ করে মুখমণ্ডলে সেই ছাপ একেবারে স্পষ্ট। এই পোশাকে সুন্দর মানিয়েছে তাকে।

নিজের আসনে বসতে বসতে বলল এরিস, 'অনেক দিন পরে নিজের পোশাক পরলাম। এখন আরাম লাগছে। হেলটদের পোশাকে নিজেকে নোংরা লাগছিল। তখন যে বিয়ের কথা বলছিলে তোমরা, সেখানে আমিও উদযাপন করবো। অনেক দিন পৃথিবীর কোনো উৎসব দেখিনি। আগে লোকে দেবতাদের আমন্ত্রণ জানাতো। কিছু কিছু দেবতা তো নিজেরাও সশরীরে উপস্থিত থাকতো সেসব বিয়েতে।

এমন সময় প্রহরী এলো ঘরের সামনে। পায়াস একটু চমকে গেলেন, অবাকও হলেন খানিকটা। তিনি প্রহরীদের এদিকে আসতে নিষেধ করেছিলেন।

এরিস প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভেতরে এসো। আপনারা কেউ অবাক হবেন না। এই প্রহরীকে আমিই নির্দেশ দিয়েছিলাম। আমার কাছে একজনের আসার কথা। সে সদর দরজায় আসলে আমাকে যেন খবর দেয়।'

প্রহরী ভয়ে ভয়ে বলল, 'মহাশয়। এক বৃদ্ধ আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন। আপনি যেমন যেমন বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার চেহারা ঠিক তেমনই।'

'চলো সবাই', উঠে দাঁড়ালো এরিস, ' আমাদের নতুন সাথির সাথে পরিচিত হই। অবশ্য তোমাদের জন্য সে নতুন হলেও আমার জন্য অনেক পুরাতন।'

ওদেরকেও এরিসের সাথে উঠে কক্ষের বাইরে বেরিয়ে আসতে হলো। প্রহরী এগিয়ে চলেছে সামনে। এরিস একবার জিজ্ঞেস করলো, 'ওকে কোথায় রেখেছ?'

'মহাশয়। আপনার কথা অনুযায়ী ওনাকে ভেতরে আসতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি প্রাসাদের দরজাতেই অপেক্ষা করবেন জানালেন।'

ওরা চলে এলো সেই নতুন আগন্তুকের সামনে। ওদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে ছিল সে। এরিস পেছন থেকে দেখেই চিনতে পারলো। গমগম করে উঠলো তার গলা, 'আরে আমার ভাই, তুমি বাইরে এই জায়গায় কেন বসে আছো?'

আগন্তুক উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ফিরলো এরিসের দিকে। এরিসের সাথে থাকা বাকি তিনজন অবাক হয়ে তাকালো আগন্তুকের দিকে। ঠিক যেন অনেকদিন জেল খাটা কেউ সাজা মেয়াদ পূর্ণ না করেই বেরিয়ে এসেছে। কালের ছাপ আগন্তুকের সারা দেহে। চুল দাঁড়ি একেবারে সাদা, জট পাকানো। তবে শরীরের চামড়া টানটান, পোশাক বিবর্ণ, কিন্তু দেহে শক্তির অভাব আছে বলে মনে হলো না। একবার দেখেই তিনজন বুঝতে পারলো এই আগন্তুক কোনো মানুষ নয়, অবশ্যই একজন দেবতা। এবার আর দেবত্ব প্রমাণের জন্য পুরোহিতকে ডাকার দরকার নেই, যদিও এরিস এরই মধ্যে আগন্তুককে ভাই ডেকে পরিচয়টা সবার সামনে ভালো ভাবেই প্রকাশ করে দিয়েছে।

আগন্তুক কিন্তু এরিসের দিকে খুব খুশি মনে তাকাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। সে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে, সেই দৃষ্টিতে রাগ প্রকাশ পাচ্ছে স্পষ্ট। এরিস আগে থেকেই জানতো আগন্তুক এমনটা করবে। তাই এবার সে এগিয়ে গেল কাছে, 'আমাকে দেখে তুমি খুশি হওনি? আমি কিন্তু তোমাকে দেখে খুবই খুশি হয়েছি।'

'তুমি এটা ভালো করেই জানো আমি কখনোই তোমাকে দেখে খুশি হবো না। তারপরেও এসব কথা অর্থহীন।'

'আচ্ছা, বুঝেছি তুমি এখনও রেগে আছো। এখন আমার কথা মন দিয়ে শোনো। এখানে এই মানুষগুলোর সামনে এভাবে আমরা কথা বলবো না। চলো ভেতরে যাই।'

ওদের তিনজনের দিকে তাকালো এরিস, 'আমরা এখন একটু ভেতরে যাচ্ছি। তোমাদের সাথে আবার রাতে কথা বলবো।'

আগন্তুককে নিয়ে ভেতরের একটা ঘরে চলে এলো এরিস। এরই মধ্যে সে এই প্রাসাদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে ফেলেছে। এই প্রাসাদের সব ঘরেই যাবার অধিকার আছে তার।

হেফাস্টাস এরিসের সামনের আসনে বসলো। এরিস এগিয়ে আনল মুখ, 'তুমি এখনও ওসব মেয়ে ঘটিত পুরানো কাহিনি নিয়ে পড়ে থাকবে? ওসব অনেক আগের ঘটনা। সেসব ভুলে যাও।'

'সাধারণ কোনো ঘটনা ছিল না সেটা এরিস। সে আমার স্ত্রী ছিল। অনেক কষ্ট করেই তাকে আমার অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু তুমি সবকিছুই নষ্ট করে দিয়েছ।'

'আচ্ছা, যাও, আমি সেদিনের জন্য ক্ষমা চাইলাম।'

'কিছু অপরাধ ক্ষমা করা যায় না। সেসব বাদ দাও। কাজের কথায় এসো। এতদিন পরে তুমি কোথেকে উদয় হলে?'

'আমার উদয় হওয়াতে তো তোমার সুবিধাই হলো। তুমিও তো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলে। হারিয়ে ফেলেছিলে তোমার সব ক্ষমতা। এখন তো আর কেউই তোমার মন্দিরে পূজা দেয় না। অলিম্পাস থেকে অন্য সব দেবতার মতো তুমিও তো নির্বাসিত হয়েছ। আমি তোমাকে পুনর্জীবিত করেছি। ঠিক যেমনটা করেছিলেন জিউস আর হেরা। তোমার আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

'আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ না। এখানে আমি এসেছি কর্তব্যের খাতিরে।'

'হ্যাঁ, তাতে কিছু প্রতিজ্ঞাও মিশে আছে। যুদ্ধের দেবতা ডাকলে তোমাকে আসতেই হবে। সেই প্রতিজ্ঞার টানেই তুমি এসেছ। তোমার কপাল ভালো তোমাকে আহ্বান করার শক্তি এখনও আমার মধ্যে অবশিষ্ট আছে। আর কোন দেবতাকে আমি ইচ্ছে করলেও জাগিয়ে তুলতে পারবো না। এটা জানো তো?'

'আমি শুধু জানি অনেক দিন পরে আমি জেগেছি। পৃথিবীর আর কোনো ব্যাপারে এখন আমার জ্ঞান নেই। এখন বলো, কেন আমাকে আহ্বান করেছ? আমি তোমার ভাই অথবা বন্ধু কিছুই নই। নিশ্চয়ই তোমার কোনো দরকার আছে।'

'ঠিক ধরেছ। তবে দরকার খুবই অল্প। এখানে তোমার স্বার্থই বেশি। আমি আবার অলিম্পাসে ফিরে যাবার ব্যাপারে চিন্তা করছি।'

হেসে উঠলো হেফাস্টাস, 'অলিম্পাসের দরজা আমাদের জন্য চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি কীভাবে খুঁজে বের করবে সেই দরজা। আমাকে শুধু শুধু ঘুম থেকে জাগালে। অদৃশ্য ছিলাম, হারিয়ে গিয়েছিলাম, তাই ভালো ছিল।'

'না, আমরা আবার অলিম্পাসে ফিরে যাবো। মানুষের ভক্তি আর উৎসর্গই হবে আমাদের শক্তি। সেই চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। আমার কথা মেনে চলো। অলিম্পাসে ফিরে গেলে আমাদের হাতে আসবে জিউসের ক্ষমতা। আমাদের সবকিছু আবার নতুন করে গুছিয়ে নেবো আমরা।'

'আমার এত লোভ নেই। এতটা উচ্চাভিলাষীও আমি নই। এখন বলো তোমার জন্য কী করতে পারি। আবারও বলছি, আমি কোনো বাজে কাজ করতে পারবো না।'

'সেটা করতে হবে না। তুমি শুধু তাই করবে, যা তুমি সবচেয়ে ভালো পারো। আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। আমাদের অলিম্পাসে প্রত্যাবর্তনের জন্য এই যুদ্ধ জরুরী।'

'আমি তোমাকে চিনি এরিস। তোমার কাজই হচ্ছে যে-কোনো ভাবে যুদ্ধের জন্য অজুহাত খোঁজা। মানুষকে তো বটেই তুমি কখনো চাওনি দেবতারাও শান্তিতে থাকুক।'

'বিশ্বাস করো, এই যুদ্ধটা দরকার।'

'কোনো যুদ্ধই দরকার হতে পারে না এরিস। এখন শুধু বলো, আমাকে কী করতে হবে। আমি তো যুদ্ধে অতো পারদর্শী নই। আমি তোমার আহ্বানে এসেছি। তুমি এখন আমার প্রভু। আদেশ দাও।'

'তুমি আমার জন্য অস্ত্র তৈরি করে দেবে। দেবতারা তোমার বানানো অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ করতে পারে না। আমার জন্য সব ধরনের অস্ত্র আর ঢাল তৈরি করবে তুমি। এটাই হবে তোমার কাজ।'

'ব্যস, এটুকুই!' হেফাস্টাস একটু অবাক হয়, 'আমাকে তুমি শুধু অস্ত্র তৈরি করার জন্য আহ্বান করেছ?'

'হ্যাঁ, তবে কাজ ছোটো নয়। তোমাকে শুধু আমার জন্য নয়, সেই সাথে আমার বাহিনীর জন্যও অস্ত্র তৈরি করে দিতে হবে।'

'তোমার বাহিনী? মানে? এখন তো দেবতাদের নিয়ে তুমি যুদ্ধ করতে পারবে না। তোমাকে মানুষদের মনে ভয় উৎপাদন করেই তোমার অনুসারি করতে হবে। তাদেরকে দিয়েই যুদ্ধ করাতে হবে। আর আমার তৈরি কোনো অস্ত্র তো সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারবে না। যেসব মানুষ আমার তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করতো তারা তো কবেই পরপারে চলে গেছে।'

'না, তার বাইরেও উপায় আছে', এরিস হাসল, 'এমন অনেক সৃষ্টি এই পৃথিবীতে আছে যা মানুষও নয় আবার দেবতাও নয়। তারাই এই যুদ্ধে আমাকে সাহায্য করবে।'

'মানে! তুমি কাদের কথা বলছ। কাদের তুমি আবার জাগিয়ে তুলতে চাও? তাদেরকে তুমি আবার আনতে চাও মানুষের মাঝে?'

হেফাস্টাসের চোখে তীব্র আতঙ্ক। তখনই এরিসের কক্ষের দরজায় দেখা দিলো পায়াসের মুখ, আতঙ্কে যেন কথা বলতে পারছেন না পায়াস, 'প্রাসাদের দিকে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে। এমন কোনো বাহিনী, এমন কোনো সাজ আমি আগে কখনো দেখিনি। এরা কি আমাদেরকে আক্রমণ করতে আসছে?'

হেফাস্টাসের দিকে তাকালো এরিস, 'তোমার প্রশ্নের উত্তর চলে এসেছে। চলো এক সাথে দেখি কারা এসেছে।'

পায়াসের আতঙ্ক এখনও কমছে না দেখে তাকেও আশ্বস্ত করলো এরিস, 'চিন্তার কিছুই নেই। ওরা আমারই বাহিনী। আমার হয়ে যুদ্ধ করার জন্যই আসছে।'

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলো তিনজনে। প্রহরীরা সবাই জড়ো হয়েছে সদর দরজার সামনে। প্রাসাদের সামনের উন্মুক্ত প্রান্তরে পা ফেলার জায়গা নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সহস্র যোদ্ধা। একেবারে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তারা। এরিস একবার সেদিকে তাকিয়েই আবার তাকালো হেফাস্টাসের দিকে।

হেফাস্টাস এক মনে তাকিয়ে আছে সামনের সেনাবাহিনীর দিকে। এই বাহিনীর পরিচয় সে জানে। এরিস আবার এই পৃথিবীকে নরক বানাবার প্রত্যয়ে নেমেছে।

আরও অপেক্ষা করতে হবে। অসিতের সব শিক্ষা যেন ব্যর্থ হয়ে যায়। লক্ষ্যের এত কাছে এসে সে অধীর হয়ে পড়েছে। হাত ছোঁয়ানো দূরত্বে আছে অঙ্গদ। কিন্তু ওকে আনতে যাওয়া যাবে না। অঙ্গদ এখন একজন রাজার অধীনে আছে। সেই রাজার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে আনা অনেক কঠিন। এখানে ওদেরকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। সব মিলিয়ে ওরা এখন একেবারে বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেছে।

রুদ্রদেব অনেকদিন পরে শরীর চর্চা করতে গিয়েছিল। অসিতকেও নিয়ে গিয়েছিল সাথে। ঝর্ণার ধারে বেশ সুন্দর একটা জায়গা আছে। ওখানেই অনেকটা সময় ব্যয় করলো রুদ্রদেব। অসিত অবশ্য একটু অভ্যাস করেই এসে বসেছে ঝর্ণার ধারের একটা হেলানো গাছের ওপর। প্রকৃতির সুধা সে পান করতে পারছে না। তার মন জুড়ে এখন শুধু আছে অঙ্গদ। সময়ের হিসেব সেই সাথে রেখে চলেছে সে। সেই প্রথম দিন থেকে। যেদিন থেকে গ্রাম ছেড়েছিল। রাধার মা কি উমা পিসির কথা রাখবেন। ওর জন্য কি তিন বছর অপেক্ষা করবে তারা। সেই তিন বছরের অর্ধেক তো পেরিয়ে গেছে।

রুদ্রদেব আজকে একেবারে ঘেমে যাওয়া পর্যন্ত শরীর চালিয়ে গেল। সে নিজেও যে একটু চিন্তার কবলে পড়েনি তা নয়। কিন্তু সেই চিন্তাই দূর করতে চেয়েছে শরীরের ঘাম হিসেবে। সে দিক দিয়ে তাকে ব্যর্থ বলা যাবে না। শরীরের সাথে মনও এখন অনেক হালকা মনে হচ্ছে। অসিতের দিকে নজর পড়লো তার। শিষ্যের পাশে গাছের ওপর এসে বসলো সে।

'আমার গুরু হিসেবে ব্যর্থতা খুব কটু ভাবে নজরে পড়ছে।'

অসিত কিছু বলল না, সে বুঝতে পারছে রুদ্রদেব কীসের কথা বলছেন।

'তোমাকে কতবার বলেছি দুশ্চিন্তার কবলে না পড়তে। আমরা কখনোই ফলাফল নিয়ে চিন্তা করবো না। করবো শুধুই কর্মপদ্ধতি নিয়ে, প্রক্রিয়া নিয়ে। কথাটা তুমি মনে হয় ভালো করে বুঝতে পারোনি।'

'পেরেছি। আমি সেই কথা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু জীবনে কখনো কখনো অন্ধ গলির সামনে পড়তে হয়। যা পেরিয়ে কোনোভাবেই যাওয়া যায় না। এখন তো আমরা সেই অবস্থাতেই পড়েছি। কী কর্ম করবো তারই ঠিক নেই। তাহলে এখন কর্মপদ্ধতি ঠিক করবো কী করে?'

'শোনো অসিত, অসম্ভব বলে পৃথিবীতে আসলেই কিছু নেই। কেবল ধৈর্য আর চিন্তা করে যেতে হবে কাজটা করার জন্য। চেষ্টা করলে সব দরজাই খোলা যায়।'

'তাহলে এই পায়াসের প্রাসাদের দরজা খোলার বুদ্ধিটা বের করলেই হয়। আমরা অঙ্গদকে নিয়ে চলে যাই। সহজ হিসেব। সকল চিন্তার শেষ।'

'মাঝে মাঝে পরিস্থিতি একটু জটিল হয়ে যায়, এই কথা মানতেই হবে। এখানে পরিস্থিতি জটিল হয়ে গেছে। তবে তুমি ভেবো না, আমি কাজ অথবা চিন্তা বন্ধ রেখেছি। আমাদের এখন গুপ্ত পন্থায় কাজ করতে হবে। তোমাকে এই বিদ্যাটা শেখানো হয়নি। এবার শেখানোর সময় এসেছে। সহজ কথায় বললে আমাদের এখন অঙ্গদকে চুরি করতে হবে।'

'অঙ্গদকে শেষ পর্যন্ত চুরি করতে হবে?'

'এই ছাড়া তো আর কোনো উপায় দেখছি না। তবে এতে সমস্যা আছে। আমি আমাদের ওদিকের প্রাসাদ নির্মাণ কৌশল আর স্থাপত্য সম্পর্কে জানি। আমাদের ওদিকে হলে কোনো সমস্যাই হতো না। কিন্তু এদিকের নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই আমার নেই। তার ওপর আমরা চেহারার কারণে নগরে খবর আনতে যেতে পারবো না। আর প্রাসাদের স্থাপত্য সম্পর্কে না জেনে সেখানে সফলভাবে চুরি করা যাবে না।'

'তাহলে উপায়?'

'আপাতত একটা উপায়ই মাথায় এসেছে। শেইরন। সেই যাবে নগরে। আমাদেরকে ঐ পায়াসের প্রাসাদের পুরো নকশা আর ছবি এনে দেবে। তার জন্য এই কাজটা কিছুতেই কঠিন হবে না।'

এই পথে একটা বিপদ দেখতে পাচ্ছে অসিত, 'কিন্তু ঐ প্রাসাদে না-কি কে একজন গোপনে প্রবেশ করেছিল। নির্মম মৃত্যু হয়েছে তার। আমরাও যদি সফল হতে না পারি?'

'আবার বাজে চিন্তা। সফলতা তো আমাদের হাতে নেই। আমাদের হাতে আছে কাজ। আর কেউ একজন ব্যর্থ হয়েছে বলেই কি ঐ কাজে আর কেউ সফল হতে পারবে না? এমন তো কোনো কথা নেই। চলো, শেইরনের সাথে পরামর্শ করি। বুড়োর মাথায় বুদ্ধি আছে। এদিকের রীতিনীতি ভালোই বোঝে।'

ওরা আবার আস্তানার দিকে এগোলো। আস্তানার পথেই পড়ে ইনোনের জন্য বানানো ইভানের কুঁড়েঘর। ইনোন এখন ঘরের বাইরে বসে আছে। ইভান বসে আছে ঠিক তার পাশে। ইনোন এখন একটু স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ইভান ক্রমাগত ওর সেবা করে গেছে। আজ সকাল থেকেই ইনোনের মনে হচ্ছে ইভানের সাথে সে ভালো ব্যবহার করছে না। সেদিন রাতে ইভান সময়ের আগে না চলে এলে তো তার অবস্থা বাবা আর ডোরার চেয়েও খারাপ হতো। ওরা তো মরে গিয়ে মুক্তি পেয়েছে, তাকে তো ঐ নরপিশাচ নিকোলাসের রক্ষিতা হিসেবে প্রতিদিন মরতে হতো।

ইভানের কাঁধে মাথা ফেলে দিলো ইনোন। ইভান চমকে উঠলো। সেই রাতের পর থেকে ইনোন এই প্রথম বার তাকে ইচ্ছে করে স্পর্শ করেছে। যেটা প্রয়োজনীয় নয়, অথবা কে জানে হয়তো এটাই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। ইনোনের

কপালে একটা চুমু দিলো ইভান। ইনোনের গাল বেয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো, গাঢ় বিষাদ দেখা দিলো তার গলায়, 'আমাকে ছেড়ে কখনো যাবে না তুমি। তুমি যেদিন চলে যাবে সেদিন যেন আমার নিঃশ্বাসও আমাকে ছেড়ে চলে যায়।'

ইভান শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ইনোনকে, 'আমি কোথাও যাবো না। তোমার নিশ্চয়ই খিধে পেয়েছে। সেই কখন থেকে কিছুই তো খাওনি। দাঁড়াও, আমি খাবার নিয়ে আসি।'

আরেকটা চুমু দিয়ে ইভান উঠে পড়লো। ঘরের সামনে বসে রইলো ইনোন।

ঘরের সামনে থেকে আস্তানায় যেতে ইভানের দেখা হয়ে গেল রুদ্রদেব আর অসিতের সাথে। রুদ্রদেব তাকে দেখে হাসলো। ইভান এক নজর তাকালো রুদ্রদেবের ঘর্মাক্ত দেহের দিকে, 'ব্যায়াম সেরে আসলে না-কি?'

'এইতো একটু। উনি এখন কেমন আছেন?'

'আজ সকালে একটু ভালো।'

'আর তোমার বন্ধু?'

'ওকে তো তুমিই ভালো করে দিয়েছ। দেখি কোথায় আছে সে।'

আস্তানায় সবাই স্বাভাবিক কাজ করছে। ইভান আর রুদ্রদেব দুজনেই খাবারের খোঁজে গেল। খাবার যেখানে বানানো হয় সেখানেই দেখা পাওয়া গেল ওরিয়নের। সে আবার আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে। তিনটে খরগোশ কোত্থেকে যেন মেরে এনেছে, মাছও ধরেছে দুটো, মাঝারি আকারের।

ওদেরকে দেখে খুশি হলো সে, 'তোমাদেরই তো দরকার ছিল। আজকে অনেক দিন পর আবার শিকার করলাম। রান্নাও প্রায় শেষের দিকে।'

মাছ সেদ্ধ হচ্ছে। মাংস আছে আগুনের ওপর। ওদের সাথে কথা বলতে বলতে সাহায্যকারী ছেলেটকে মাঝে মাঝে নির্দেশ দিচ্ছে ওরিয়ন। খাবার তৈরি হতে খুব বেশি সময় লাগলো না। বেশ একটু মাংস আর মাছ নিয়ে ইভান চলে গেল ইনোনের কাছে।

ওরিয়ন নিজের খাবার নিয়ে বসেছে। মাংসের দিকে তাকিয়ে রুচি এলো না অসিত আর রুদ্রদেবের। ওরা বসেছে শস্য সেদ্ধ নিয়ে।

ওরিয়ন প্রথম কামড় দিয়েই চোখ বন্ধ করলো, 'খাসা হয়েছে।' তারপর সে তাকালো রুদ্রদেবের দিকে, 'তোমার সাথে তো ঠিকমতো কথাই হলো না। সবাই বলছে তুমি না-কি জাদু জানো।'

'জাদু আমি কিছুই জানি না। তবে কিছু কৌশল জানি। কিছু কৌশল তো তুমিও জানো।' রুদ্রদেবের সাধাসিধে উত্তর।

'জাদু জানো কি না জানি না, যুদ্ধ করতে ভালোই জানো এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি উন্মাদ হয়ে তোমাকে আক্রমণ করেছিলাম সত্য কিন্তু আক্রমণে তো

আর কোনো গলদ ছিল না। আমি তোমাকে মেরে ফেলার জন্যই আক্রমণ করেছিলাম।'

'সেটাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম।'

'যুদ্ধ শাস্ত্র বলে কেউ যদি তোমাকে হত্যার জন্য আক্রমণ করে, তাহলে তুমিও তাকে আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করবে। তোমাদের ওদিকে নিয়ম কি আলাদা নাকি?'

'না, অনেকটা এরকমই।'

'তাহলে তুমি আমাকে মেরে ফেললে না কেন? যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলে আমাকে মারার।'

'আমাদের ওদিকে আত্মরক্ষার জন্য সামনের যোদ্ধাকে মেরে ফেলার নিয়ম আছে সত্য, তবে একজন পাগল আর যোদ্ধার মধ্যে তো পার্থক্য আছে। তোমার সাথে আমার কোনো শত্রুতা নেই, আমাকে মেরে ফেলার তোমার কোনো কারণ নেই। তুমি উন্মাদ হয়ে নিষ্ঠুর হয়েছ, ঠান্ডা মাথার নিষ্ঠুর মানুষ নও। সেটা আমি সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম। আর এমন মানুষকে আমি সাহায্য করি, মেরে ফেলি না।'

খরগোশের মাংস থেকেও রুদ্রদেবের কথাটা ওরিয়নের বেশি পছন্দ হলো। সাথে সাথে আরেকটা ব্যাপার এলো তার মাথায়, 'কিন্তু একটা কথা বলতেই হচ্ছে, যোদ্ধা হিসেবে তুমি অতুলনীয়। আমাদের পরিচয় জানো তো?'

'তোমাদের পরিচয়?'

'আমার আর আমার বন্ধু ইভানের?'

রুদ্রদেব এবার নিজের ধারণার কথা বলল, 'ঠিক জানি না। তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারছি তোমরা এখানে থাকা বাকি সবার মতো নও, একটু আলাদা।'

'আমরা ক্রিপ্টেয়ার। বলতে পারো স্পার্টার সেরা যোদ্ধা। আমি আর আমার বন্ধু। আমি সেদিন উন্মাদ হয়ে হামলা করেছিলাম দেখেই তুমি বেঁচে গেছো। ঠিকভাবে হামলা করলে মারা পড়তে।'

অসিত ওরিয়নের কথায় আপত্তি করে কিছু একটা বলতে যাবে কিন্তু রুদ্রদেবের ইশারায় চুপ হয়ে গেল। রুদ্রদেব তাকালো ওরিয়নের দিকে, 'সেটাই হবে হয়তো। আমার কপাল ভালো ছিল।'

'হ্যাঁ, একদিন তোমার সাথে একটু যুদ্ধের চর্চা করে দেখবো। তবে চিকিৎসক হিসেবে যে তুমি আসলেই জাদু জানো তাতে ভুল নেই।'

রুদ্রদেব আর কথা বলল না। এক মনে খেতে লাগলো। এরই মধ্যে একবার শেইরনকে খুঁজে দেখেছিল, কিন্তু বুড়ো কোথায় যেন গেছে, আস্তানায় নেই।

রুদ্রদেবদের খাওয়া শেষ হতেই শেইরন আস্তানায় প্রবেশ করলেন। সাথে তিনি একা নন, আরও অনেকেই আছে। সেই সাথে একজন নতুন লোককেও দেখা গেল। সেই লোকের পরনের পোশাক অন্যরকম। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সে এই

দলের লোকদের মতো না। তাকে একটু টেনে হিঁচড়েই নিয়ে এসেছে বাকি লোকেরা। অবস্থা কী দেখার জন্য রুদ্রদেব এগিয়ে গেল।

হই হট্টগোল শুনে কলিনও বেরিয়ে এসেছে নিজের ডেরা থেকে। সেও বাকি সবার মতোই উত্তেজিত হয়ে উঠলো বন্দি লোকটাকে দেখে। চিৎকার করে উঠলো সে, 'এই হারামজাদাকে কোথায় পেলে?'

উপস্থিত লোকজন সর্দারের ক্ষেপে যাওয়াতে যেন জ্বালানী পেলো নিজেদের ক্রোধে। তাদের রাগ আরও বেড়ে গেল। রুদ্রদেব জানে ভিড় যখন এক সাথে রেগে ওঠে তখন তাকে সামলানো অনেক কঠিন। রামচন্দ্র নিজেও ভিড়ের মতের বিরুদ্ধে যেতে পারেননি, সীতাকে পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল বনবাসে।

তবে ভিড়ের মতের বিরুদ্ধে যাবার কাজটা বেশ সাহসিকতার সাথেই করলেন শেইরন, 'তোমার লোকজনকে শান্ত হতে বলো কলিন। আমি না থাকলে তো এই লোককে মেরেই ফেলত এতক্ষণে ওরা।'

কলিনের রাগ একটুও কমেনি। সে এগিয়ে এসে বন্দির গলার কাছে জামার অংশ ধরে জোরে ঝাঁকি দিলো, 'সেটা যদি ওরা করতো তাহলে আমি ওদেরকে পুরস্কার দিতাম। এই অভিজাতেরা আমাদের হেলটদের সাথে কত খারাপ আচরণ করে, তা তো আপনি জানেনই। এতদিন কোনো অভিজাতকে এভাবে মওকা মতো পাইনি। আজকে সব উসুল করবো।'

শেইরন এগিয়ে এলেন, 'শোনো। এই অভিজাতদের যা অবস্থা এমনিতেও সে যথেষ্ট শাস্তির মধ্যে আছে। এই জঙ্গলে তো তার আসার কথা না। তাকে আগে জিজ্ঞাসাবাদ করো। তারপরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তুমি একজন নেতা। উন্মাদের মতো আচরণ কোরো না। ওকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। আগে ওর সাথে কথা বলে দেখি।'

কৃতজ্ঞ দৃষ্টি নিয়ে বন্দি অভিজাত তাকিয়ে আছে শেইরনের দিকে। কলিন নিজেকে একটু সংবরণ করলো। শেইরনের কথা ঠিক আছে। আগে কিছু তথ্য উদ্ধার করতে হবে।

জিজ্ঞাসাবাদের কাজ শুরু হলো একটু পরেই। শেইরনের সাথে থাকার সুযোগ পেয়েছে রুদ্রদেব, ইভান আর ওরিয়নও আছে। কয়েকজন মিলে কলিনের ঘরে বন্দিকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। প্রথম প্রশ্ন করলেন শেইরন, 'এবার বলো তো, তুমি এখানে কেন এসেছ? নগরের লোকেরা তো জঙ্গলের এই জায়গায় আসে না।'

এতক্ষণ পরে বন্দি কিছু বলার সুযোগ আর সাহস দুটোই পেলো, 'নগরে থাকার সাহস পাইনি আমি। ভয় পেয়ে এই জঙ্গলে পালিয়ে এসেছি। আমি কিছুই জানি না। জঙ্গলে থাকার অভ্যেস নেই আমার। আর এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে ধরা পড়েছি ওদের হাতে।'

'আচ্ছা, ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছ কেন? কীসের ভয়?' শেইরন এগিয়ে নিলেন আলোচনা।

'আমি অ্যালেস্টরের দলে ছিলাম। কীভাবে যেন তিনি খুন হয়ে গেলেন। আমাদের সবার পরিচয় কীভাবে যেন জেনে ফেললো ঐ পায়াস আর তার লোকেরা। অনেককেই মেরে ফেলেছে ওরা। আমি কপাল জোরে পালিয়ে এসেছি। শুনেছি আমার পরিবারের অবস্থা খারাপ। ওদেরকে মেরে ফেলেছে কিনা জানি না।'

'তার মানে তুমিও ঐ ষড়যন্ত্রের অংশ ছিলে?' এবার কথা বলল কলিন, 'সাহস হলো কীভাবে ঐ রোমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার? আগে বুঝতে পারোনি, অবস্থা একেবারে পোড়া খরগোশের মতো হয়ে যাবে?'

এবার প্রশ্ন করলো ইভান, প্রশ্নটা রুদ্রদেবের মাথায়ও এসেছিল, কিন্তু সে এই জায়গায় চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, 'তোমরা কয়জন অভিজাত ছিলে এই ষড়যন্ত্রে?'

'পনের থেকে ষোলো জন। আমি পুরোটা জানি না। আমাকে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেগুলোই পালন করেছি। কিন্তু আমরা ব্যর্থ হয়েছি। একেবারে আসল জায়গায়।'

'পনের ষোলো জন অভিজাত মিলে তোমরা রোমানদের সাথে কীভাবে যুদ্ধ করতে?' ইভানের হিসেব মিলছে না।

'না', উৎসাহ পেলো অভিজাত, 'আরও সৈন্য ছিল। তোমাদের মতো হেলট বিদ্রোহী গ্রীসের সব নগরেই আছে। কিছু কিছু বিদ্রোহী হেলটের দল তো অনেক বড়ো। আমাদের অভিজাতেরা এমন আরও কিছু নগরের স্বাধীনতাকামী অভিজাতদের সাথে দেখা করেছিল। গোপনে রাজি করিয়েছিল হেলটদের বিদ্রোহী দলগুলোকেও। তারা একত্র হয়ে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করতে রাজি হয়েছিল।'

'বোকার দল', মন্তব্য করলো কলিন, 'রোমান আর গ্রীকদের ব্যাপারে কি আমাদের জন্য কোনো পার্থক্য আছে? নেই। হেলটের দল কী বুঝে রাজি হয়েছে এই কাজ করার জন্য? আমাদের জন্য তো রোমান হলেও যে কথা গ্রীক হলেও একই কথা। সবাই আমাদের সাথে দাসের মতোই ব্যবহার করবে। আমরা সবার পা চেটেই যাবো।'

কলিনের অভিযোগ সত্য হলেও এটাই এখন আলোচ্য বিষয় নয়। ইভান অগ্রহী হয়ে উঠলো হঠাৎ করে, 'দাঁড়াও কলিন। আমাকে কথা বলতে দাও। তুমি বললে হেলটদের সেনা তোমাদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছে গ্রীসের নানা নগর থেকে। স্পার্টায় তোমরা যদি পায়াসকে মেরে ফেলতে তাহলে রোমান সেনারা তো এই নগরেই হামলা চালাত। যুদ্ধটা এখানেই হতো। তাহলে বলো সেই হেলটদের বাহিনী এখন কোথায় আছে?'

'হেলটদের বাহিনী এখনও একত্র হয়নি। তার আগেই তো আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলাম। ওরা আছে এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তবে আমার কাছে যেটুকু খবর আছে ওরা এখন স্পার্টার কাছেধারেই আছে। নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু এখন ওদেরকে নির্দেশ দেবার কেউ নেই। এখন পুরো পরিকল্পনাই শেষ।'

ইভানের মগজ চলতে লাগলো তীব্র গতিতে, 'তোমাদের পরিকল্পনা হয়তো শেষ, কিন্তু সেনাবাহিনী তো এখনও আছে স্পার্টার আশেপাশেই, তাই না?'

ঝট করে মুখে তুলে ইভানের দিকে তাকালো অভিজাত, ইভান তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। তারপর তাকালো কলিনের দিকে, 'এই লোককে বন্দি করে রাখো ভালোভাবে। তবে খবরদার একটুও যাতে অযত্ন না হয়। ভালো করে খাবার দেবে।'

হতাশ হলো কলিন, 'এখনও এই অভিজাতদের সেবা করতে হবে?'

'হ্যাঁ। তবে এবার সেবা করতে হবে বন্দি হিসেবে। আর সবাই বাইরে এসো। আমাদেরকে আলোচনায় বসতে হবে।'

আলোচনায় যে বসতে হবে এই ব্যাপারে শেইরন আর রুদ্রদেবও একমত। সবাই বন্দিকে ঘরে পাহারায় রেখে বাইরে এলো।

বাইরে আসতেই আরও কিছু হেলটকে দেখা গেল। ওদেরকে দেখে কলিনের মুখ পুরো হাঁ হয়ে গেছে। এভাবে তো ওদের সবার একসাথে আসার কথা না।

ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো কলিন, 'কী হয়েছে। তোমরা স্পার্টার সব গুপ্তচরেরা এক সাথে এখানে চলে এলে কেন?'

হেফাস্টাসের মতো সবাই অভিজ্ঞ নয়। সবাই এই বাহিনীর পরিচয় জানে না। তারা শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এই বিশাল বাহিনীর দিকে। পৃথিবীর কেউ এমন বাহিনী দেখা দূরে থাক, কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

স্পার্টার নারীরা বীর প্রসবিনী, সেই সম্মান এখন একটু ক্ষুণ্ণ হলেও এখনও পুরোপুরি দূর হয়নি। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে এভাবে নারীদের উপস্থিতি কে দেখেছে। দেবতাদের মধ্যে অনেক দেবীও আছে। তার মধ্যে এথেনা যুদ্ধে বেশ সফল কিন্তু এক এরিসকে মাঝে মাঝে পরাজিত করা ছাড়া তার আর কোনো ঘোরতর যুদ্ধের নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাই এতগুলো মানবীকে এক সাথে যুদ্ধের ময়দানে দেখে সবার চোখ কপালে উঠে যাবে তা আর আশ্চর্য কী। এরা যে কেবল দেখাবার জন্য যুদ্ধ সাজ পরেনি বরং একেক জন এই কাজে সুনিপুনা সেটা সাজ আর ভাবের বহর দেখেই বোঝা যাচ্ছে। পুরো বাহিনীর সবার শরীর থেকে যেন এক ধরনের জ্যোতি বেরোচ্ছে।

অবাক হয়ে সবারই গলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে পায়াসই প্রথম মুখ খুললেন, তাও বিস্ময় ভরা কণ্ঠে, 'এরা কারা?'

উত্তরটা এরিসের দেবার কথা থাকলেও সে দিলো না। হেফাস্টার তখনো চেয়ে আছেন এই বাহিনীর দিকে, তার মুখ থেকে আলগোছে বেরিয়ে এলো, 'এরাই আমাজনদের বাহিনী। যুদ্ধ দেবতা এরিসের মানসকন্যা সব।'

এরিস হাসি মুখে এগিয়ে গেল। তার পথ থেকে ত্রস্ত পায়ে সরে দাঁড়াতে কারো নির্দেশের অপেক্ষা করলো না সেনারা। এরিস সদর দরজা পেরিয়ে হাঁটতে লাগলো উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে। তাকে দেখে বাহিনীর সবচেয়ে সামনে থাকা উজ্জ্বল সোনালি বর্ম পরিহিত একটা মেয়ে এগিয়ে এলো। মুখে তার মাপা হাসি, তবে সে যে এরিসকে দেখে অনেক খুশি হয়েছে এটা তার চেহারায় ফুটে উঠেছে।

দৌড়ে এসে পিতা এরিসকে জড়িয়ে ধরলো আমাজনদের সেনাপতি মেয়েটা। কিছুক্ষণ পিতা আর কন্যার মধ্যের এই মায়া বিনিময় চলল। মেয়েটা এরিসের দিকে তাকালো আনন্দিত চিত্তে, 'আপনাকে অনেক দিন পরে দেখতে পেলাম পিতা। অবশেষে আপনি বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছেন। আমাদের সবার ভাগ্য আবার আমাদের দিকে মুখ তুলেছে।'

'তোমরা এতদিন অনেক কষ্ট করেছ, তাই না?'

'আজ্ঞে পিতা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এখন থেকে আমাদের আর কোনো কষ্ট নেই। আপনার অভাবে আমরা যেন শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের বাসস্থান দ্বীপে কোনোমতে কেটে যাচ্ছিল আমাদের দিন। মানুষের দলের কিছু আক্রমণও সহ্য করতে হয়েছিল আমাদের। কিন্তু আজ এতদিন পরে আবার আপনার আহ্বান পেয়ে আমরা যেন জেগে উঠেছি। আজ শুধু আপনিই মুক্ত হননি, আমরাও মুক্ত হয়েছি।'

'তোমাদের সবাইকে দেখে এত ভালো লাগছে যে বলে বোঝাতে পারবো না। তোমরা এখন আমার সাথে এখানেই থাকবে। এই প্রান্তরেই তাবু ফেলো।'

'আপনার সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পেয়ে ধন্যবাদ। তবে জানেন তো, আপনার ক্রোধ আর যুদ্ধ শিক্ষা থেকে আমাদের জন্ম। আজ কতদিন আমরা শস্ত্র ঠিকমতো চালাতে পারিনি। আমরা আর এই যুদ্ধহীনতা সহ্য করতে পারছি না। দয়া করে এবার আপনার কৃপায় আমাদেরকে ধন্য করবেন।'

'আমি জানি, তোমরা আমার কন্যা। তোমরা আমার নিয়মেই চলবে। এরই মধ্যে তোমাদের জন্য আমি আনন্দের আয়োজন করে ফেলেছি।'

মেয়েটার চোখ যেন এবার আরেকটু জ্বলে উঠলো, 'সত্যি বলছেন পিতা? আপনি আমাদের জন্য যুদ্ধের আয়োজন করেছেন?' উচ্ছ্বাসে এখানেই কথা আটকে গেল তার। এবার সে এরিসের সামনে থেকে গিয়ে দাঁড়ালো নিজের বোনদের সামনে। সবার সামনে দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো অমানুষিক তীব্রতায়, কোনো মানুষ এত জোরে চিৎকার করতে পারবে না, 'তোমরা সবাই শোনো। এখানে আমাদেরকে পিতা কেবল দেখা করতে ডাকেননি। আমরা এখানে সবাই যুদ্ধযাত্রা করতে এসেছি।'

ঘোষণাটা শোনা মাত্র সামনের মেয়েদের দলের মধ্যে যেন একটা আনন্দের হলকা বয়ে গেল। সবাই নিজেদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে শরীর কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলো। এমন রণহুংকার এই পৃথিবী খুব কমই শুনেছে। এরিস আর হেফাস্টাস ছাড়া বাকি সবাই থরথর করে কেঁপে উঠলো এই চিৎকার শুনে। নিকোলাস নিজেকে সামলে নিলো। অবাক হয়ে দেখছে সে সামনের দিকে। এরা নিশ্চয়ই মানুষ নয়। কী হচ্ছে এসব। তার সব পরিকল্পনা বদলে যাচ্ছে। শুরুটা হয়েছিল ইভানকে দিয়ে। সে ইনোনকে কেড়ে নেবার পর থেকেই তার সাথে কিছুই ঠিকমতো হচ্ছে না।

কিন্তু এখন তাকে ইভানের শাস্তি থেকে চিন্তা সরিয়ে নিয়ে আসতে হলো আমাজনদের দিকে। এরিস এখন মেয়েদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। হেঁটে যাচ্ছে সে সারিবদ্ধ মেয়েদের মাঝ দিয়ে। সবাই তার সাথে কুশল বিনিময় করছে। কেউ বা জড়িয়ে ধরছে তাকে, কেউ কপালে এঁকে দিচ্ছে চুমু। কেউবা আবার নত হয়ে সম্মান প্রদর্শন করে নিয়ে নিচ্ছে আশীর্বাদ। প্রাঙ্গন কম বড়ো নয়। কিন্তু এরিসের হাঁটার গতি প্রায় দৌড়ের মতো। নিমেষে মেয়েদের কাছ থেকে সম্ভাষণ গ্রহণ করে আবার সামনে এসে দাঁড়ালো সে, তার গলাও এবার গমগম করে উঠলো, প্রান্তরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেল তার গলার আওয়াজ, 'তোমরা এখানেই এখন বিশ্রাম করবে। তাবু ফেলার ব্যবস্থা করো। তোমাদের খাবারের ব্যবস্থা আমি করছি। আর কারো কোনো নতুন অস্ত্র লাগলেও আমাকে বলবে।

আমি ব্যবস্থা করে দেবো। অতি শীঘ্রই আমরা যুদ্ধ যাত্রা করবো। এরিস হাত তুলে ওপরে ধরল। সাথে সাথে আরেক বার গগনবিদারী চিৎকার করে উঠলো এরিসের আমাজন বাহিনী।

এবার ওদেরকে তাবু খাটানোর কাজে লাগিয়ে দিয়ে এরিস আবার ফিরে এলো প্রাসাদে। এখনও লোকজনের ঘোর কাটেনি। পায়াসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো এরিস, 'কী বলেছিলাম না, তোমাদের কোনো সৈন্য লাগবে না। আমি আমার নিজের সেনাই নিয়ে এসেছি। এরাই রোমানদের সাথে যুদ্ধ করবে।'

তখনই একটা ভুল করে বসলো মরিস, আসলে তার দীর্ঘ লালিত চিন্তাই তাকে এই কথা বলতে বাধ্য করেছে, মেয়েদের সে কখনোই সম্মান করে না, 'কিন্তু এরা কীভাবে যুদ্ধ করবে? এরা তো সব মেয়ে।'

এরিস মুচকি হেসে কৌতুক ভরে তাকালো মরিসের দিকে, 'ঠিকই বলেছ। মেয়ে হয়ে আর কী যুদ্ধ করবে। তোমাদের নিশ্চয়ই মেয়েদের যুদ্ধ ক্ষমতার কোনো পরিচয় নেই। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো। যদিও আমি যুদ্ধের দেবতা তবু এক মেয়ের কাছে আমাকে অনেক বার হারতে হয়েছে। এথেনা আমাকে অনেক বার দ্বন্দ্বে হারিয়েছে।'

মরিস কথাটা গিলে ফেললো কোঁত করে, বুঝতে পারছে মুখ ফসকে কথাটা বলে ভুল করেছে। কিন্তু সে গিলে ফেলতে চাইলেও এরিস কথাটা মিলিয়ে যেতে দিলো না, 'আমি বুঝতে পারছি, এখানে অনেকেই হয়তো এই প্রশ্ন মনে রেখেছে। কারণ তারা আমাজনদের জানে না। ঠিক আছে, আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখতেই পারি। আশা করি মহড়া দেখতে তোমাদের ভালোই লাগবে।'

মরিস প্রমাদ গুনল। কথাটা বলেই এরিস তার দিকেই কেমন করে যেন তাকাচ্ছে। এরিস এগিয়ে এলো ওর সামনে, 'তুমিই তো কথা বলেছিলে, তাই না? তোমার সম্পর্কে আমি শুনেছি। তুমি না-কি স্পার্টার অভিজাতদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির হয়েছ। তার মানে যুদ্ধ করতে ভালোই পারো। তাহলে আর দেরি কেন? আমাজনদের যুদ্ধের পরীক্ষা তুমিই নেবে।'

এতগুলো মানুষের সামনে না তো বলা যায় না, অবশ্য এরিসকে না বলার সাহস এখন কারো মধ্যেই অবশিষ্ট নেই। অগত্যা এগিয়ে যেতে হল মরিসকে। সবাই তাকিয়ে আছে প্রাঙ্গনের দিকে। এরিসের পিছু পিছু হেঁটে যাচ্ছে মরিস।

আমাজনদের মেয়েরা ততক্ষণে তাবু খাটাতে শুরু করেছে। তাদের থেকে একজনকে ডাকলো এরিস। এগিয়ে এলো মেয়েটা, 'শোনো, এই লোক স্পার্টার অনেক বড়ো যোদ্ধা। সে সন্দেহ প্রকাশ করছে মেয়ে হয়ে তোমরা যুদ্ধ করতে পারবে কি না। এখন সে এসেছে তোমার পরীক্ষা নিতে। এখন বলো, অস্ত্র দিয়ে লড়বে না-কি অস্ত্র ছাড়া?'

'খালি হাতেই হোক পিতা। মল্ল যুদ্ধে দেখি তার হাতে কত শক্তি।'

মরিসের দিকে ফিরল এরিস, 'তুমি কী বলো? রাজি আছো, খালি হাতে যুদ্ধ করতে?'

মরিস এর মধ্যেই মেয়েটাকে দেখেছে, আবার সাহস ফিরে এসেছে তার মধ্যে, 'আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'তাহলে তো মিটেই গেল। আমি সরে যাই।' মেয়েটা আর মরিসের মধ্য থেকে সরে গেল এরিস। কোনো ঘোষণা দিতে হলো না। কিন্তু সবাই বুঝতে পারছে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে।

একবার যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়লে পিছিয়ে যাবার আর উপায় নেই। মরিস চরিত্রে যেমনই হোক তার প্রশিক্ষণ খারাপ হয়নি, সে নেমেই মনঃসংযোগ করতে সমর্থ হলো। সামনের প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে খুব সাবধানে তাকালো সে। মেয়েটার গড়ন অসাধারণ একথা মানতেই হচ্ছে। শরীরে এক ফোঁটা মেদ নেই। ঝুঁকে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আঁটসাঁট যুদ্ধের পোশাকে দেহের ভাজগুলো ভালোই বোঝা যাচ্ছে। মেয়েটাকে এখানে না পেয়ে নিজের ঘরে পেলে যুদ্ধটা আরেকটু ভালোভাবে করা যেতো। মাথা ঝেড়ে নিজের মাথায় আসা বাজে চিন্তাটা সরিয়ে দিলো মরিস। সম্মুখ দ্বন্দ্বের নিয়ম মেনে ভালো করে খেয়াল করতে লাগলো মেয়েটার নড়াচড়া।

মেয়েটা যদিও অতো মনোযোগ দিয়ে মরিসকে লক্ষ্য করছে না। তার ভঙ্গি স্বাভাবিক, তাতে উত্তেজনার লেশ মাত্র নেই। আচমকা মরিস দুই পা এগিয়ে গিয়েই শূন্যে লাফ দিলো, আঘাত করলো মেয়েটার বুক বরাবর। মরিসকে আসতে দেখল সে, সহজেই বুঝতে পারলো মরিস কী করতে যাচ্ছে, একটা দোল দিলো তার শরীরে, দুই হাত বামে সরে গেল। মরিস লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে খানিকটা সামনে ছিটকে গেল। আবার দাঁড়ালো মেয়েটার মুখোমুখি। বুঝতে পেরেছে লড়াইটা অতো সহজ হবে না।

মেয়েটা আক্রমণ করার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। কেবল শরীরের নানা অঙ্গের নড়াচড়া দিয়ে যেন আহ্বান করছে মরিসকে। এবার আবারও আঘাত করতে উদ্যত হলো মরিস। এবার লক্ষ্য মেয়েটার ডান গাল।

নিজের মুখের দিকে আঘাত আসতে দেখে এবার সামনে এগিয়ে এলো মেয়েটা। মরিসের আঘাত ঠেকিয়ে দিলো নিজের হাতে। কোনো মেয়ের হাত যে এতটা শক্ত হতে পারে তার ধারণাও ছিল না মরিসের, মনে হলো তার হাত যেন একটা নিরেট লোহাকে আঘাত করেছে। পরের মুহূর্তেই সেই নিরেট লোহার আঘাত আবার অনুভব করলো মরিস। এবার মেয়েটা অন্য হাতে আঘাত করেছে মরিসের মুখে।

মাথা টলমল করছে মরিসের। এমন আঘাত জীবনে খুব একটা সহ্য করতে হয়নি তাকে। মাঝে মাঝে দ্বন্দ্বে প্রতিপক্ষের কাছে ধরাশায়ী হতে হয়েছে অবশ্যই, তবে স্মৃতি খুঁজেও সে এমন ভয়ানক শক্ত মার খেয়েছে কি না মনে করতে পারলো

না। মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিজের শরীরকে স্বাভাবিক করতে লাগলো সে। আর সেই সাথে লক্ষ্য করলো মেয়েটা তার দিকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে না, বরং তার নাজেহাল অবস্থা লক্ষ্য করছে নির্মল আনন্দ নিয়ে, যেন কোনো কুৎসিত ইঁদুরকে নিয়ে খেলছে সুন্দর একটা বেড়াল।

ব্যথা ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো মরিস। এতক্ষণ সে লড়াইটাকে সহজ মনে করেছিল। এবার বিশেষ ভঙ্গিগুলোর প্রয়োগ করতে হবে। এবার শরীরকে নানা ভাবে বাঁকিয়ে আঘাত করতে লাগলো মরিস। কিন্তু তাকে একেবারে আশ্চর্য করে দিয়ে সবগুলো আঘাতই অনায়াসে ফিরিয়ে দিতে লাগলো মেয়েটা। প্রতিবার মেয়েটার হাতের সাথে নিজের দেহ লাগতেই ব্যথায় তার ভেতরটা যেন কেঁপে উঠছে। আস্তে আস্তে নিজের পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে মরিয়া হয়ে উঠতে লাগলো মরিস।

এরিস এতক্ষণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে লড়াইটা দেখছিল। এবার সে বলে উঠলো, 'অনেক হয়েছে মা। এবার যুদ্ধটা শেষ করতে হবে। কাজের তো অভাব নেই। এবার আক্রমণ করো।'

পিতার ইশারা পেয়ে এবার এগিয়ে এলো মেয়েটা। নিজের শরীর অদ্ভুতভাবে বাঁকিয়ে আক্রমণ করলো মরিসকে। মরিস নড়ে ওঠার সময়ও পেলো না। নিজের তলপেটে একটা বেমক্কা আঘাত পেয়ে তার শ্বাস আটকে এলো। বাতাসে ওঠানো মাছের মতো খাবি খেতে লাগলো সে। ঝুঁকে পড়েছে তার শরীর।

এবার আর অন্যান্য বারের মতো মরিসকে সুযোগ দিলো না মেয়েটা। এগিয়ে এসে মরিসকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো, অনায়াসে একটা ঝটকা টানে মরিসকে তুলে ফেললো ঘাড়ের ওপর। তারপর দড়াম করে আছড়ে ফেললো মাটিতে। যেটুকু বাতাস মরিসের বুকের ভেতর জমা ছিল সেটুকুও বেরিয়ে গেল মাটিতে পড়ার সাথে সাথে। মরিসের মনে হলো সে মারা যাবে। আতঙ্কে একটু বাতাস ভেতরে নেবার জন্য হাঁসফাঁস করতে লাগলো সে মাটিতে পড়ে।

আমাজনদের মধ্যে কয়েকজন মেয়ে দাঁড়িয়ে দ্বন্দ্ব দেখছিল। তারা এবার হাততালি দিয়ে উঠলো। মেয়েটা এসে বসলো মরিসের পাশে, আলতো গলায় বলল, 'ভয় পেও না। মরবে না। তোমাকে মেরে আসলে নিজের অসম্মান করতে চাই না আমি। তোমার কপাল ভালো এই যোগ্যতা নিয়ে তুমি একজন আমাজনের সাথে যুদ্ধ করতে পেরেছ। বাবার কাছে চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তোমার। আমরা মাঝে মাঝে আমাদের দ্বীপে কিছু পুরুষ নিয়ে যাই, সন্তান জন্মদানের জন্য। তোমাকে সেই ভাড়াটে পুরুষ হিসেবেও নিতাম না আমি।'

অপমানের আর তেমন কিছু বাকি রইলো না মরিসের। একটু পরেই সে উঠে দাঁড়ালো। শরীরে একটুও শক্তি অবশিষ্ট নেই। পুরানো ক্ষততে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে এগোতে লাগলো প্রাসাদের দিকে।

পুরো যুদ্ধটা এতক্ষণ প্রাসাদ থেকে অনেকেই দেখেছে। এই অনেকের মধ্যে রাহুও ছিল। এমন যুদ্ধ সে কখনো দেখেনি, তার ওপর একটা মেয়ে এমনটা করছে। কানাঘুষা যা শুনেছে তার সবই সত্য হয়ে উঠছে। একটা বড়ো সেনাবাহিনী এসে হাজির হয়েছে। এরা এখন যুদ্ধে যাত্রা করবে। আর রাহু যুদ্ধ পছন্দ করে না। যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে সে শত হাত দূরে থাকে সব সময়।

মরিসের মতো যোদ্ধার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা দেখে একটা সিদ্ধান্ত নিলো রাহু, এখানে আর থাকা যাবে না। তার এখান থেকে পালিয়ে যেতে তেমন সমস্যা হবার কথা নয়। সে এখন প্রাসাদের বিশ্বাসযোগ্য লোকদের একজন হয়ে গেছে। যখন ইচ্ছে বাইরে যেতে পারে। সমস্যা হচ্ছে, তার ভাগের পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা এখনও পাওয়া যায়নি। তাকে খরচের জন্য কিছু মুদ্রা দেওয়া হয়েছে, তবে সেটা নিতান্তই সামান্য। এখন যা পরিস্থিতি তাতে তাকে কিছুতেই ওরা মুদ্রা দিয়ে বিদায় করবে না।

তবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রাহু। এদিকে আর এক মুহূর্তও নয়। উপায় একটা মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করছে তার। এতদিন প্রাসাদে থেকে আর কিছু নজরে না রাখুক, কোষাগার আর মুদ্রা রাখার জায়গাগুলো ভালোভাবেই নজরে রেখেছে সে। চুরি করার ইচ্ছে ছিল তার সেটা বলা যাবে না, তবে যার যা আগ্রহ সে তো তারই খবর রাখবে। তার দরকার পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা। তার জন্য আসল কোষাগারে হামলা দিতে হবে না। প্রধান অন্দরের একটা সিন্দুকে কোনোমতে হাত গলাতে পারলেই এরচেয়ে বেশি পাওয়া যাবে। এদের সম্পদের কোনো অভাব নেই। বেশি দেরি করা চলবে না। আজ কালের মধ্যেই কাজ সারতে হবে। কোনোমতে স্বর্ণমুদ্রা হস্তগত করে এই নগর থেকে চলে যেতে হবে। সম্ভব হলে ছাড়তে হবে এই রাজ্যই। একটা না একটা জাহাজে চড়ে মিশরে গিয়ে উঠতে পারলেই ওকে আর কেউ খুঁজে পাবে না। এতদিন অঙ্গদের কারণে সে সবার চোখে পড়ে যেতো। এখন আর সেই ঝামেলা নেই।

রাহুর হাতে যে নষ্ট করার মতো সময় বেশি নেই সেটা বোঝা গেল এরিসের কথায়। মরিসের সাথে সাথে সেও এসে দাঁড়িয়েছে প্রাসাদের দরজায়। পায়াস আর নিকোলাসকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমাদেরকে আসলে কিছুই করতে হবে না। কেবল ঘোড়া আর রথের ওপর বসে থাকবে। আমরাই সকল যুদ্ধ জয় করবো। তোমাদের কাজ বলতে কেবল একটাই।' পায়াসের মুখের সামনে এসে দাঁড়ালো সে, 'বলো তো সেটা কী?'

সেই কাজটা এতদিনে পায়াস পুরোটাই বুঝে গেছেন, 'কেবল আপনার ওপর শ্রদ্ধা আর ভক্তি রাখতে হবে।'

এখনো নিজের আশ্চর্য অবস্থা থেকে বেরোতে পারছে না কলিন। অনেক দিন সময় লেগেছে তার এই অবস্থায় এসে পৌঁছাতে। এক সময় তার সাথে কেউই ছিল না। অনেক কষ্ট করে একজন একজন করে হেলটের মনে সে এই বীজ বুনতে পেরেছে। বোঝাতে পেরেছে, এই জঙ্গলে না খেয়ে মরে যাওয়া ঐ নগরে বেঁচে থাকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। লোকবল যথেষ্ট হয়ে যেতেই নিজের রাজ্যের সুরক্ষা আর বিস্তারে মন দিয়েছে সে। গড়ে তুলেছে একটা বেশ চলনসই গুপ্ত বাহিনী। নিজের কিছু জ্ঞান তো আগে থেকেই ছিল এসব ব্যাপারে। বাকিটা সময়ই তাকে শিখিয়ে দিয়েছে।

সব যে জংগলে থাকা লোক তাও না। অনেক চরেরা আছে, যারা এখনো স্পার্টায় নানা অভিজাতের বাড়িতে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আর প্রাসাদগুলোতে কাজ করে। সাথে তার হয়ে করে গুপ্তচরের কাজ। শেইরনের সাথে কথাটা খোলাসা না করলেও স্বয়ং পায়াসের প্রাসাদেও তার কিছু লোক আছে। সেই গুপ্তচর দলের সিংহ ভাগ গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে এক সাথে নিজের আস্তানায় দেখে চোখ কপালে উঠে যাওয়া স্বাভাবিক।

একের পর এক চমক আসছে তার সামনে। একটু আগেই শুনেছে একটা বড়ো হেলট বাহিনী নাকি খণ্ড খণ্ড হয়ে অপেক্ষা করছে স্পার্টার আশেপাশে। এখন আবার সব গুপ্তচরেরা এসে হাজির হয়েছে।

সবার সামনে নিজেকে সামলে নিলো সে। গুপ্তচরদের নিয়ে গেল একটা গোপন জায়গায়। এমনকি ইভান, ওরিয়ন, রুদ্রদেব, শেইরনকেও সেসবের বাইরে রাখলো সে। আলোচনা শুরু করতে কোনো ভূমিকার প্রয়োজন হলো না।

শুরুতেই নিজের মনঃক্ষুণ্ণ হবার কথাটা জানিয়ে দিলো কলিন, 'তোমরা সবাই এক সাথে এখানে চলে এলে কোন আক্কেলে? তোমরা কি সবাই আমার শেখানো কথাগুলো ভুলে গেছো? গুপ্তচরের জন্য নিজের গোপনীয়তা রক্ষার চেয়ে বড়ো কোনো নীতি নেই। আজকে তোমরা সবাই নগরে এক সাথে অনুপস্থিত। এখন কেউ যদি একটু চিন্তা করে তাহলেই তো পুরো ব্যাপারটা ধরে ফেলবে।'

ভৎসনায় কিছু এলো গেল বলে মনে হলো না কারো। সামনে দাঁড়ানো একজন বলে উঠলো, 'খবর অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য আপনাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেছি সবাই মিলে। আসলে এই মুহূর্তে আপনার কাছ থেকে আদেশ পাওয়া দরকার। একসাথে সবারই দরকার। এমন সঙ্গিন অবস্থার সৃষ্টি না হলে আমরা সবাই মিলে আপনার কাছে আসতাম না।'

হাত তুলল কলিন, 'থামো। জানি তো কী বলবে। তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ খবর আগেই আমার কানে এসেছে। পায়াসের প্রাসাদে হামলা হয়েছিল। যে হামলা

করেছে সে নিজের কাজে সফল হতে পারেনি। মারা গেছে। আর নগরে তাদের মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এখন অভিজাতরা রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছে, এই তো তোমাদের খবর, তাই না?'

এক চর বলে উঠলো, 'এসব তো অনেক পুরানো খবর। আর এরই মধ্যে আপনাকে কেউ না কেউ দিয়েছে, তাও আমরা জানি।'

এবার একটু আগ্রহী হলো কলিন, 'তাহলে তোমরা আবার নতুন কী খবর নিয়ে এসেছ?'

সবাই খবরটা কম বেশি জানলেও সবচেয়ে ভালো যে জানে তার প্রতিই আঙ্গুল তোলা হলো। সেই সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে।

এবার পায়াসের প্রাসাদে কাজের দায়িত্বে থাকা লোকটা মুখ খুলল, 'পায়াসের প্রাসাদে ঐ গুপ্তঘাতকের প্রবেশের থেকেও অনেক বড়ো ঘটনা ঘটে গেছে। এমন কিছু কখনো দেখিওনি, আবার শুনিওনি।'

'কী হয়েছে?' ভূমিকায় একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছে কলিন।

'এক দেবতার আগমন ঘটেছে স্পার্টায়।'

'কী হয়েছে?' কলিন প্রথমে কথাটা বুঝতে পারলো না। আশপাশের সবাই এরই মধ্যে ঘটনা জানে। তবে তাদের মধ্যে একমাত্র কথকই ঐ দেবতাকে সচক্ষে দেখেছে। আবার তার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই আগ্রহী দৃষ্টিতে।

'আপনি দেবতাদের ব্যাপারে কিছু জানেন না?'

এবার কলিন বুঝতে পারলো, 'ওহ আচ্ছা। ঐ যে যাদের মন্দির আছে। পূজারী বিভিন্ন ঢংবং করে পূজা দেয়। মানুষ মাঝে মাঝে নিজের ভবিষ্যৎ জানার জন্য পূজারীর কাছে যায়। কিন্তু সেসব ভুয়া ভবিষ্যৎবাণীর কিছুই মেলে না। এসব তো বুজরুকি। দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছো?'

'একজন এসেছে পায়াসের প্রাসাদে।' নিজের কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট রহস্য ফুটিয়ে উঠলো কথক। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার দেহে ভর করেছে অন্ধ কবি হোমারের আত্মা। ভালো গল্প পেলে মাঝে মাঝে সাধারণ মানুষও ভালো গল্প বলিয়ে হয়ে উঠতে পারে, 'তার অসামান্য ক্ষমতা। এমন সুঠাম দেহ আমি কোনো মানুষের দেখিনি। একাই সে প্রাসাদের দশ জন সৈন্যকে খালি হাতে মেরে ফেলেছে। তারপর পরীক্ষা দিতে বলায় সে নিজের ইচ্ছেয় বজ্রের আওয়াজ করেছে। পূজারীকে একেবারে নাকাল করে দিয়েছে। সবাইকে নিজের ইচ্ছের বাধ্য করে তার সামনে নত করেছে। সবাই এক বাক্যে মেনে নিয়েছে তাকে দেবতা হিসেবে।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও।' এখনো পুরো ব্যাপারটা ঠিক মতো ধরতে পারেনি কলিন, 'তুমি কী বলছ, তা কি তুমি জানো? বলতে চাইছো, যেসব দেবতার পূজা করা হয়

পাথরের মূর্তি হিসেবে তাদের একজন রক্ত মাংসের মানুষের মতো হয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে স্পার্টায়?'

'আজ্ঞে। তাই হয়েছে।'

হতাশ হলো কলিন, 'আর সেটাই বিশ্বাস করে তোমরা এখানে সবাই মিলে চলে এসেছ। তোমাদেরকে একটুও বুদ্ধিমান বানাতে পারলাম না এতদিনে। আরে গাধা, ওসব দেবতা-টেবতা বলে কিছু হয় না। এই লোক নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। কয়েকটা ভেল্কি দেখিয়েছে। এখন কয়েকদিন পায়াসের ঘাড় ভেঙ্গে মজা করবে। তারপর একদিন চলে যাবে ফুস হয়ে। আর তোমরা এসব বিশ্বাস করেছ?'

নিজেদের গনহারে বুদ্ধিহীন বলাতে সবারই একটু মন খারাপ হয়েছে, তাদের বুদ্ধি আর সবার থেকে বেশি বলেই তারা গুপ্তচরের কাজ করে। এক বৃদ্ধ চর বলে উঠলো, 'আমাদের এটুকু বুদ্ধি অবশ্যই আছে। তবে সেই দেবতা কেবল পায়াসের ঘাড় ভাঙতে উদ্যত হয়নি। তার লক্ষ্য আরও বিশাল। সে চায় রোমানদের আক্রমণ করে গ্রীসকে মুক্ত করতে। খুব শীঘ্রই স্পার্টার বাহিনী রোমের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ যাত্রা করবে।'

এবার থমকে যেতে বাধ্য হলো কলিন, 'কী বলছো এসব? পায়াস তাতে রাজি হয়েছে? স্পার্টার সামান্য বাহিনী নিয়ে যাবে রোমের সাথে লড়তে!'

'হ্যাঁ। আসলে রাজি না হয়ে পায়াসের কিছু করার ছিল না। আপনি যদি তাকে সামনাসামনি দেখতেন তাহলে আপনিও রাজি হতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

কিছু একটা আছে ঘটনার মধ্যে সেটা স্পষ্ট বুজতে পারছে কলিন। নিশ্চয়ই এই রহস্যময় আগন্তুক একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে স্পার্টায়। কিন্তু সে রোমানদের কেন আক্রমণ করবে? ধরে নেয়া গেল, সে দেবতা। কিন্তু হলোই বা, রোমানদের কেন আক্রমণ করতে হবে। তাকে চিন্তাযুক্ত দেখে পায়াসের প্রাসাদের সেই চর বলে উঠলো, 'আর আপনি বাহিনী নিয়ে যে চিন্তা করছেন সেই সমস্যারও সমাধান হয়ে গেছে।'

ঝট করে মুখ তুলল কলিন, 'কীভাবে?'

'উনি নিজের সেনা নিয়ে এসেছেন। এক বিশাল সেনাবাহিনী এসেছে স্পার্টায়। এমন বাহিনী কেউ কখনো দেখেনি। পায়াসের প্রাসাদের ঠিক সামনে সেই বাহিনী আস্তানা গেড়েছে।' এসবের পর বোমাটা ফোটালো সে, 'সেই বাহিনীর সবগুলো সদস্যই নারী। সেই বাহিনীতে একটাও পুরুষ সেনা নেই।'

আরেক চর একটু আগেই ঘটনা শুনেছে, সে এবার বলতে লাগলো, 'সম্পূর্ণ নারী বাহিনী দেখে তো সবাই অবাক। সেই দেবতাই সবার সন্দেহ ঘুচানোর জন্য একজন নারী যোদ্ধার সাথে একজন অভিজাত সেনাকে লড়তে আহ্বান জানান। কী

আর বলবো, সেই নারী অভিজাত যোদ্ধার সাথে এমন ভাবে যুদ্ধ করলো , যেন কোনো কিশোরী তার পুতুল নিয়ে খেলছে।'

কলিন এবার বুঝতে পারছে ঘটনা। চট করে কিছুই বোঝা যাবে না। ভাবতে হবে, 'ঠিক আছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। কিন্তু তাও তোমাদের এমন ভাবে সবার চলে আসা ঠিক হয়নি। এখুনি তোমরা নগরে ফিরে যাবে। আর সবাই এখন থেকে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় থাকবে। কোনো খবর পেলেই সাথে সাথে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে।'

সবাই চলে যেতে উদ্যত হলো। একটা কথা মনে হতেই একজনকে ডেকে ফেরালো কলিন, 'আচ্ছা, গ্রীকদের তো অনেক দেবতা আছে। এখন যে নিজেকে দেবতা হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে তার নাম কী?'

'এরিস। সে না-কি যুদ্ধদেবতা।'

আর কোনো কথা বলল না কলিন। চরেরা মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে। নিজের মনে চিন্তা করতে করতে সে বুঝতে পারলো এভাবে চিন্তা করে কিছুই হবে না। তার একার মাথায় কুলাবে না। শেইরনের বুদ্ধি ধার করতে হবে। আর সে যেভাবে চিন্তা করছে তাতে ইভান আর ওরিয়নেরও ভালো ভূমিকা থাকবে সামনের ঘটনায়।

আস্তানায় ফিরে আর দেরি করলো না সে। এবার সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসলো। ইভানকে একটু ধারণা দিতেই ইভান মত দিলো, ' রুদ্রদেবকেও ডাকো। তারও থাকার দরকার আছে।'

বিরক্ত হয়েছে কলিন, 'ভিনদেশিকে আবার এসবের মধ্যে জড়ানো কেন?'

ইভান কিছুই বলেনি। চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিয়েছে নিজের সিদ্ধান্ত। রুদ্রদেবও জায়গা পেয়েছে আলোচনা ক্ষেত্রে।

কলিন প্রথমে শুরু করলো, 'আপনারা সবাই হয়তো দেখেছেন, একটু আগে এখানে আমার নগরের কিছু চর এসেছে। তার মধ্যে একজন ছিল পায়াসের প্রাসাদের চর। তাদের থেকে কিছু চমকপ্রদ তথ্য জানতে পেরেছি।'

হাত তুলে তাকে থামালেন শেইরন, 'দাঁড়াও, আগে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাক। আমি যখন তোমাকে অঙ্গদকে খোঁজার কথা বললাম, তখন তো তুমি বলেছিলে পায়াসের প্রাসাদে তোমার কোনো চর নেই। এখন এই চর কোত্থেকে উদয় হলো?'

একটু থতমত খেলেও সামলে নিলো কলিন, 'আমি আগেও বলেছি, ওসব ছেলেমানুষিতে আমার কোনো আগ্রহ নেই। কোনো বানরের জন্য আমি আমার লোকের প্রাণ বিপন্ন করবো না।'

' আচ্ছা, বলে যাও।' এবার কথা বলে উঠলো ইভান।

'স্পার্টায় না-কি এক দেবতা এসেছে।' একটু আগে শোনা কথাটাই সরাসরি বলে দিলো কলিন।

শেইরনের ভ্রু কুঞ্চিত হলো খানিকটা, 'দেবতা!'

'হ্যাঁ' কলিন শোনা কথাগুলো বলে গেল এক এক করে। দেবতার পরিচয়, নাম, সে কী কী করে দেখিয়েছে, আর সবার শেষে বলল রহস্যময় নারী বাহিনীর কথা।

পুরোটা সময় শেইরন ঘটনাগুলো সন্দেহ নিয়ে শুনে গেলেও শেষের কথাটা শুনে তার মুখ সন্দেহ মুক্ত হলো, 'আমাজন।'

সবাই তাকালো শেইরনের দিকে। এই কথার মানে তাদের জানা নেই। শেইরন ব্যাখ্যা করলেন, 'এক সময় সেসব ইতিহাস ছিল। এখন রূপকথা হয়ে গেছে। যেই দেবতা স্পার্টায় এসেছে তার নাম এরিস। আর এই আমাজনেরা সব তারই মেয়ে। আমাজনেরা তার হয়ে যুদ্ধ করে। সম্পূর্ণ নারীদের দ্বারা গঠিত হলেও এই বাহিনীর সামনে পৃথিবীর কোনো পুরুষ বাহিনী দাঁড়াতে পারবে না।'

'তার মানে আপনি ব্যাপারটা বিশ্বাস করছেন?' ইভান এবার প্রশ্ন করে।

'এখনো বিশ্বাস করিনি, লক্ষণ বিচার করছি মাত্র।'

কলিন একটু হেসে উঠলো, 'আমার কাছে ব্যাপারটা এখনো একটা চাল মনে হচ্ছে, আসল ব্যাপারটা আমরা ধরতে পারছি না। কী বিদেশি, তোমার কী মনে হয়। এসব দেবতা-টেবতায় তুমি বিশ্বাস করো না-কি?'

রুদ্রদেব আচমকা কিছু বলল না, তার মুখ জুড়ে শুধু রইলো রহস্যময় নীরবতা।

শেইরন এবার মত দিলেন, 'যদি সত্যিই কোনো দেবতা এসে থাকে তাহলে তো এটা অনেক বড়ো ঘটনা। কিন্তু তাতে এখন আমরা কী করতে পারি। দেবতার কাজ দেবতা করবেন। আমাদের তো তাতে কিছু আসে যায় না।'

'অবশ্যই আসে যায়' কলিন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'আমি এখনো আপনাদের আসল কথাটাই বলিনি, 'সেই দেবতা নিজের নারী বাহিনী নিয়ে এমনি এমনি স্পার্টায় আসেননি। তিনি এই বাহিনী আর স্পার্টার নিজস্ব বাহিনী নিয়ে রোমানদের আক্রমণ করার চিন্তা করছেন। রোমানদের পরাজিত করতে অতি শীঘ্রই না-কি যাত্রা করা হবে।'

ইভান এবার বুঝতে পারলো না, 'কেন? রোমানদের সাথে আবার তার কী শত্রুতা?'

শেইরন বুঝিয়ে দিলেন, 'কারণ তিনি গ্রীক দেবতা। আর কোনো দেবতা কিছুতেই চাইবেন না যাতে গ্রীকরা পরাধীন থাকে। তাহলে দেবতাদের জন্য বেশ অসুবিধা।'

কলিন এবার নিজের চাল দিলো, 'কিন্তু আপনারা সবাই একটা কথার জবাব দিন। গ্রীস তো আর আজকে থেকে পরাধীন না। অনেক দিন ধরেই গ্রীস রোমানদের নিয়ন্ত্রণে আছে। তাহলে এতদিন পরে দেবতা কেন এলেন? এতদিন কোথায় ছিলেন?'

এই প্রশ্নের উত্তর কেউই চট করে দিতে পারলেন না। এমনকি শেইরনকেও চুপ থাকতে হলো।

কলিন এবার নিজের মত দিলো, 'তার মানে এই দেবতার ব্যাপারটা পুরোই ভুয়া। আমরা তো জানি কিছু কিছু মানুষ জাদু দিয়ে নানা অদ্ভুত প্রদর্শন করতে পারে। সেসবই দেখিয়েছে সে। আর সেগুলো দেখিয়েই লোকজনকে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করছে।'

'কিন্তু এমনটা সে কেন করবে?' শেইরনের প্রশ্ন।

এবার কলিনের কথা থেমে যায়, আমতা আমতা করতে থাকে সে, 'ইয়ে মানে সেটা জানি না।'

ইভান এতক্ষণ পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখছিল, এবার সে একটা সম্ভাবনার কথা বলে, 'আচ্ছা, তার মানে স্পার্টার বাহিনী আর নতুন আসা বাহিনী মিলে যাবে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করতে, তাই না?'

সবাই চুপ, কী চলছে ইভানের মনে?

ইভান শেষ করে কথাটা, 'তার মানে স্পার্টা থাকবে মোটামুটি সৈন্য শূন্য। আমাদের জন্য অবশ্যই এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। আমরা স্পার্টা দখল করতে পারবো সহজেই।'

কথাটা যেন একেবারে কলিনের মন থেকে টেনে নিয়ে বলেছে ইভান, কলিন রীতিমতো চিৎকার করে উঠলো, 'আমিও তাই বলতে চাই। স্পার্টার আগন্তুক দেবতা হোক আর না হোক, স্পার্টার আশেপাশে যে অনেক হেলট সৈন্য আছে তাতে তো আমরা নিশ্চিত। এখন ওদেরকে খুঁজে বের করা তেমন শক্ত কাজ হবে বলে মনে হয় না। সেই বাহিনী নিয়ে আমরা যদি স্পার্টা আক্রমণ করে অবরোধ করে রাখি তাহলে স্পার্টা আমাদের দখলে চলে আসবে।' আজন্ম লালিত স্বপ্ন সত্যি হবার চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠলো কলিন।

শেইরন অতটা আবেগে ভেসে গেলেন না, 'কিন্তু, যারা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করতে গেছে, সেই যুদ্ধের পরে তারা অথবা রোমানরা তো আবার ফিরে আসবে স্পার্টায়। তখন তাদেরকে আটকাবো কীভাবে?'

কলিন এত কিছু আগে থেকে ভেবে স্পার্টা বিজয় থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইলো না, 'আরে সেটাও ভাবা হয়ে গেছে। ঐ ভুয়া দেবতা কিছুতেই রোমানদের সাথে জিততে পারবে না। স্পার্টার পুরো বাহিনী ধ্বংস হবে। তখন

রোমানরা তাদের লোক পাঠাবে এখানে। আমরা তখন রোমানদের বশ্যতা স্বীকার করে নেবো। হয়ে গেল।'

রুদ্রদেব হাসলো, 'রোমানদের বশ্যতা স্বীকার করে নিলে তোমার স্বাধীনতার কী হবে?'

খোঁচাটা বুঝতে পারলেও গায়ে মাখলো না কলিন, 'এখানে দাস হয়ে বেঁচে আছি। তখন তো ফ্রি-টাউনের সমঅধিকার লাভ করবে আমার লোকেরা। তাহলেই আপাতত চলবে।'

শেইরন মত দিলেন, 'তোমার পরিকল্পনায় কোনো ঝামেলা নেই। কিন্তু একটা যদির ওপর পুরোটাই নির্ভর করছে।'

'কী?' জানতে চায় কলিন।

'স্পার্টার এই আগন্তুক যদি আসলেই দেবতা হয়? তখন কী হবে?'

আলোচনা শেষ হতে রুদ্রদেব বেরিয়ে এলো সবার সাথে। ইভান থেকে গেল তার সাথে। রুদ্রদেব বুঝতে পারলো ইভান কিছু বলবে।

'এই যুদ্ধ নিয়ে তোমার কী মত?'

রুদ্রদেব ইভানের প্রশ্নের উত্তর দেয়, 'এটুকুই বলতে পারি এটা আমার যুদ্ধ নয়। তাই কোনো মতই নেই। গ্রীসে আমি আর আমার সাথি এসেছি আমাদের বানরের খোঁজে। সেই বানর পেলেই আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাবো।'

'সেই বানর তো আছে স্পার্টায়, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো ব্যাপারটা সমাধান হয়েই গেল। আমরা তো স্পার্টা দখল করবোই। তখন পায়াসের প্রাসাদের সবকিছুই আমাদের অধিকারে চলে আসবে। তখন সেই বানর তোমাকে ফিরিয়ে দেবো।'

'তাহলে আপনাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।'

ইভান এবার একটু হাসলো, 'সেই সুযোগ তোমাদেরকে দেবো না।'

'মানে?' রুদ্রদেব সন্দেহের গন্ধ পাচ্ছে।

'সেদিন ওরিয়ন রেগে ছিল, চিন্তা করার মতো অবস্থায় ছিল না। সেসবই সত্য। কিন্তু সে তোমাকে যেসব কৌশলে আক্রমণ করেছে সেগুলো নিখুঁত ছিল। আমাদেরকে অনেক যত্ন করে সেসব শেখানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের সেই কৌশল তুমি যেভাবে হাসতে হাসতে উড়িয়ে দিলে, যেভাবে ওরিয়নকে কাবু করলে তাতে তুমি যে এক বড়ো যোদ্ধা তা আর আমার বুঝতে বাকি নেই।'

নিজেকে লুকিয়ে লাভ নেই। এখন ইভানের কথা শুনে যেতে হবে। রুদ্রদেব অপেক্ষা করছে।

'আমারও কিছু ব্যক্তিগত হিসেব আছে স্পার্টার কিছু লোকের সাথে। কিন্তু এটাও সত্য, হয়তো রোমান অথবা দেবতার বাহিনী, আমাদেরকে দুটোর একটা

মোকাবেলা করতেই হবে। আর তোমার মতো একজন যোদ্ধাকে সেই যুদ্ধে আমি অবশ্যই আমার পাশে চাইবো। তুমি আমাকে সুযোগসন্ধানী মনে করতেই পারো, কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তোমার বানর উদ্ধারের বিনিময়ে এটুকু তোমাকে করতেই হবে। আর আমার মনে হয় না, যুদ্ধ করতে তোমার কোনো আপত্তি আছে।'

এবার মৃদু হাসলো রুদ্রদেব, 'না, আপত্তি নেই। আমি তোমার শর্তে রাজি।'

'না' ইভান বলল, 'এতে হবে না। তুমি আমাকে কথা দাও। তোমাদের ওখানের পুরুষদের কথার অবশ্যই দাম আছে, তাই না?'

রুদ্রদেব মাথা নাড়লো, ' হ্যাঁ। ত্রিভুবন অপেক্ষা চরিত্র শ্রেষ্ঠ, স্বর্ণ অপেক্ষা শস্ত্র শ্রেষ্ঠ, প্রাণ অপেক্ষা প্রতিজ্ঞা শ্রেষ্ঠ। আমি কথা দিলাম।'

ইভান মেনে নিলো এবার, 'তাহলে আমিও কথা দিলাম, সব ঝামেলা শেষ হবার পরে, আমি নিজে তোমাদেরকে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো। বানর-সহ।'

দুজনে নিজেদের ডেরার দিকে চলে গেল। ওদিকে কলিন হেলট সৈন্যদের খোঁজার জন্য কাকে কোনদিকে পাঠানো হবে সেই পরিকল্পনা করছে।

নিক্স কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। সবকিছু কেমন যেন বদলে গেছে। তার ভেতরের বদল সে টের পাচ্ছিল অনেকদিন ধরে। প্রেমের অন্তর্ঘাতে বার বার বিক্ষত হচ্ছে সে। হয়তো আগের মতো নিশ্চিন্ত জীবনে ফিরে যেতে পারলে ভালো হতো। সেই বেপরোয়া জীবন, যেখানে এক মুহূর্তের সাথে আরেক মুহূর্তের কোনো সংযোগ নেই। যেখানে কেবল বেঁচে থাকার উন্মাদনাই শেষ কথা। কিন্তু সেদিকে আর সে যেতে পারছে কই। ক্রমাগত ভেতরের আলোড়ন তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

সেদিনের নিকোলাসের ব্যবহারের পরে সে মনে কষ্ট পেয়েছিল। পরে অবশ্য সেটুকু ভুলেছে। সে নিজের সেই সকালে নিকোলাসের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতেই গিয়েছিল। তার বাবার প্রাণ রক্ষা কেবল একটা অজুহাত ছিল মাত্র, তার অনুরক্তি তো কবেই সীমা ছাড়িয়েছে, তার সাথে কেবল যুক্ত হয়েছিল একটু কৃতজ্ঞতা বোধ, কিন্তু নিকোলাস যে তার সাথে এভাবে পশুর মতো আচরণ করবে তা সে ভাবেনি।

তবু একটা সান্ত্বনা ছিল, হয়তো রাতের পরিশ্রম আর সময়ের চাপ সামলাতে না পেরে নিকোলাস তার সাথে তেমন আচরণ করেছিল। নিজেকে আরেকটু সান্ত্বনা সে দিয়েছিল। সে তো এমন পুরুষ সঙ্গই পছন্দ করে এসেছে আজীবন। তাহলে আজ কেন তার মন এমন ভাবছে। নিকোলাসকে সে ভালোবাসে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই ভালোবাসাই তাকে আস্তে আস্তে নিকোলাসের পশু হয়ে ওঠার কথাটা ভুলিয়ে দিলো। যোদ্ধা পুরুষ, শরীরের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, হয়তো ভেবেছিল সঙ্গম এভাবেই করে। নাহ, নিজের মনে একটু হেসে নিয়েছিল নিক্স, সঙ্গমের প্রকারভেদ ঐ পুরুষকে সে শেখাবে।

কিন্তু প্রাসাদে যা ঘটে চলেছে তাতেও নিক্সের মন বিচলিত হয়ে উঠেছে ভীষণ ভাবে। এরই মধ্যে কোত্থেকে এক দেবতা এসে উদয় হয়েছে। তার সামনে এখনো পড়েনি নিক্স কিন্তু দাসদাসীদের কথাবার্তা তার কানে এসেছে। সেই দেবতার ক্ষমতা নিয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই। আর সেই দেবতার কথা অনুযায়ী রোমানদের আক্রমণ করতে যাবে স্পার্টার সৈন্যরা। কোত্থেকে যেন এক বিশাল সেনাও নিয়ে এসেছে সেই দেবতা। রোমানদের পরাজিত করে তবেই দেবতা আবার ফিরে যাবে নিজের জায়গায়।

নিক্স আর নিকোলাসের বিয়ে পিছিয়ে গেছে। এখানেই নিক্সের যত আপত্তি। বাবার সাথে একবার কথা বলার চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এই সময় কোনো সিদ্ধান্ত নেবার সামর্থ্য তার নেই। ঐ দেবতার ক্ষমতার কাছে সবাই নত হতে বাধ্য হয়েছে। তিনি যা বলবেন তাই হবে এই নগরে।

আজ ভোরে ঘুম ভেঙেছে নিক্সের অনেকক্ষণ আগে। এখনো বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না তার। দাসদাসীরা এখনো কেউ তার খোঁজ নিতে আসেনি। প্রাসাদে ঐ দেবতা আসার পর থেকে তার সেবাতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মানুষ প্রভু বদলাতে বেশি সময় নেয় না।

চোখ মেলার অনেকক্ষণ পরে বিছানা ছাড়লো সে। একটু পায়চারি করতে ইচ্ছে করলো। পোশাকের দিকে নজর দিলো না। রাতের পোশাক অবিন্যস্ত হয়ে আছে। দাসীদের সাহায্য ছাড়া নতুন পোশাক পরাও একটা ঝামেলা। সেই ঝামেলা করতে ইচ্ছে করলো না নিক্সের। পোশাকের ঝুল মাটিতে গড়িয়েই বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সে। এখান থেকে অন্দরের বাগান দেখা যায়। সেখানে কিছু দাস ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু সৈন্যকেও দেখা গেল। কারোই কোনো ফুরসত নেই। সবাই ছুটে বেড়াচ্ছে নিজের কাজে। তাদের এখন দম ফেলার সময় নেই। হরেক আয়োজনে সময় কেটে যাচ্ছে। একমাত্র মনে হয় এই প্রাসাদে তারই কোনো আয়োজন নেই, কোনো কাজ নেই করার মতো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগলো না। আবার ঘরে ঢুকে পড়লো নিক্স। শুয়ে পড়লো আবার অবিন্যস্ত শয্যায়।

হেফাস্টাস কাল সারারাত ঘুমায়নি। এমনিতেও দেবতারা মানুষের মতো শীঘ্রই ক্লান্ত হয় না। না ঘুমিয়ে তারা লম্বা সময় কাটিয়ে দিতে পারে। তবে পৃথিবীতে আলস্য নামের এক অদ্ভুত বস্তু আছে, আর এখানে যেই আসে তাকেও এই বস্তু নিজের বশে নিয়ে নেয়। হেফাস্টাসের মনে হচ্ছে, কাল রাতে মদ্য পানের পরে একটু গড়িয়ে নিলে খারাপ হতো না।

তবে সে উপায় যে ছিল তা নয়। কিছু কাজ তাকে করতে হয়েছে। তার কথা মতো বেশ কিছু বিশেষ ধাতু জোগাড় করে এনেছে এখানকার কারিগরেরা। সেসব ধাতু পরীক্ষা করে দেখেছে সে। কাজ চলে যাবে। ধাতুর মিশ্রণ বানানোর জন্য বিশেষ একটা চুলাও তৈরি করা হয়েছে। সেই চুলায় আজ সকাল থেকেই ধাতু গলানোর কাজ শুরু হবার কথা। তবে মানুষ কারিগরদের প্রতি তার দয়া হয়েছে, সবাইকে একটু দম ফেলার ফুরসত দেওয়া হয়েছে। সে দেবতা কিন্তু আর সবাই তো মানুষ, ওদের তো সারা রাত জেগে থাকার পর একটু বিশ্রামের দরকার আছে।

এরিস এসে দাঁড়ালো তার সামনে। সেও কাল সারা রাত ঘুমায়নি, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ চেহারায় নেই, 'কি, তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে? তোমার কাজ শেষ হবার আগে তো আমরা আবার যাত্রা করতে পারবো না। তাড়াতাড়ি শেষ করো।'

'সময় তো লাগবেই। ধাতু তো আর মুখের কথায় গলবে না।'

'আরে তুমি হচ্ছো শ্রেষ্ঠ কারিগর। তোমার অসাধ্য আর কী আছে। যথেষ্ট ধাতু আশা করি তোমাকে জোগান দেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ, চুলাও তৈরি হয়ে গেছে। আজকেই কাজ শুরু করে দেবো। তবে আমার সাথে যে কারিগরদের দেওয়া হয়েছে তারা বেশ দুর্বল। অতো শক্ত কাজ করতে পারবে কি না সেই ভরসা পাচ্ছি না। এই কয়েক শো বছরের মধ্যে মানুষের শক্তি এত কমে গেল কেন?'

'কমবে তো বটেই। কোনো ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা নেই। আমাদের উপাসনা না করলে সেই শক্তি আসবে কোত্থেকে? যাই হোক, একটু চাপ দিয়ে ঐ দুর্বল কারিগরদের দিয়েই কাজ উদ্ধার করতে হবে।'

এরিস একটু এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, একটু তেরচা দৃষ্টিতে ওপরের দিকে তাকাতেই এবার তার নজর পড়লো অন্দরের বারান্দার দিকে। সাথে সাথে অস্ত্র তৈরি আর মানুষের শক্তি হ্রাস বিষয়ক আলোচনা মন থেকে হারিয়ে গেল তার। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী। এমন কাউকে এখন পর্যন্ত নগরে আসার পর থেকে চোখে পড়েনি।

মেয়েটা খুব বেশিক্ষণ বারান্দায় ছিল না। একটু পরেই আবার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। তবে ওটুকু সময়ই এরিসের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিছু কিছু মানুষের শরীরে দেবলক্ষণ থাকে। এরিসের কেন যেন মনে হতে লাগলো, এই মেয়ের শরীরেও সেসব লক্ষণ অবশ্যই আছে। প্রাসাদের ওদিকের বারান্দাটা বেশ ভালো করে খেয়াল করলো সে।

হেফাস্টাস এত কিছু বুঝতে পারলো না, তবে এটুকু বুঝেছে এখন এরিস আর কিছুই আলোচনা করবে না, কাজে যাবার সময় হয়ে এসেছে, এরিসের প্রতি প্রস্থানের ইশারা করে সে চলে গেল কামারশালার দিকে।

এরিসও হেফাস্টাসের ইশারার উত্তর ফিরিয়ে দিলো। তার আগ্রহ এখন পুরোই প্রাসাদের ঐ বারান্দার দিকে। এদিকটায় এখনো তার যাওয়া হয়নি। আগেই সে শুনেছে এই দিকটা প্রাসাদের অন্দর। অভিজাত মেয়েরা থাকে এখানে। তাই এই জায়গায় যাবার আগ্রহ পায়নি সে। অস্ত্রাগার আর কোষাগারই ছিল মূল আগ্রহের জায়গা। কিন্তু এবার অন্দরের দিকে যেতে আগ্রহ পেলো সে।

এরিসের অন্দরে যাবার জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই। অন্দরের সামনে যে কয়েকজন প্রহরী ছিল তারাও এরিসকে বাঁধা দেওয়ার কথা চিন্তাও করলো না। ভেতরে এসে দোতলায় উঠে পড়লো এরিস। বারান্দার যে জায়গায় মেয়েটা দাঁড়িয়ে ছিল সেই জায়গাটা খুঁজতে লাগলো। কিছুক্ষণ খুঁজতেই অবস্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হলো সে। হ্যাঁ, এই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটা।

ঠিক পেছনেই একটা দরজা আছে। সেই দরজা দিয়েই ভেতরে গেছে মেয়েটা। হয়তো এটাই সেই মেয়েটার কামরা। দরজার পাল্লায় হাত রেখে এবার একটু সংকোচ বোধ করলো এরিস। কিছুক্ষণের জন্য হলেও। হাজার হোক, রমণী, আর সে এই রমণীর সবচেয়ে জটিল রূপের সন্ধানে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে

ওসব জিনিসে জড়ানো উচিত হচ্ছে না, কর্তব্যের সংকোচ তাকে আঘাত করলো দমকা হাওয়ার মতো। তবে আকর্ষণ সেই সংকোচকে জায়গা দিলো না।

দরজার পাল্লায় হালকা করে চাপ দিলো সে। ভেজিয়ে রাখা দরজাটা খুলে গেল বিন্দুমাত্র শব্দ না করে। এরিস ঘরে ঢুকে দেখতে পেলো শয্যার ওপর সুললিত নারী মূর্তি।

ওদিকে নিক্স শুয়ে শুয়ে ভাবছে নিকোলাসের কথা। সেদিনের পর থেকে আর তার সাথে দেখা করেনি সে। একটু অভিমান যেন হয় নিক্সের, কোথায় যেন জমে উঠতে চায় একটু বাষ্প। সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে সে আশা করে নিকোলাসকে। হ্যাঁ, এখন অনেক দায়িত্ব নিকোলাসের কাঁধে, এই যুদ্ধ যাত্রা নিয়ে তাকে নিশ্চয়ই অনেক ছোটাছুটি করতে হচ্ছে, কিন্তু সেই সময়ের বয়ে যাওয়া নদীর থেকে কি নিক্সের জন্য দুই এক ফোঁটা জল বরাদ্দ হতে পারে না?

তখনই দরজাটা আলগোছে খুলে যাবার শব্দ একটু করে কানে এলো তার। কে এসেছে? কোনো দাসী, না-কি সে যা ভাবছে এতক্ষণ, যা মনে প্রাণে চাইছে, সেই নিকোলাস তার সাথে দেখা করতে এসেছে?

মাথাটা ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল নিক্স। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো বিছানা থেকে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে দিব্যকান্তি পুরুষ। একবার না চিন্তা করেই সে বুঝতে পারলো ইনি সাধারণ কোনো মানুষ নন, নিশ্চয়ই সেই দেবতা যার সাথে তার এখনো দেখা হয়নি। এরিস তার সামনে এসে দাঁড়ালো। নিজের বিচার বুদ্ধি সব যেন হারিয়ে ফেলছে নিক্স। কিছুই চিন্তা করতে পারলো না। আপনা হতেই তার হাঁটু ভেঙ্গে এলো। নত হয়ে এরিসের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করলো সে।

এরিস হেসে উঠলো, 'না কুমারী। এভাবে কুর্নিশ করতে হবে না।' দুই হাত বাড়িয়ে সে ধরে ফেলেছে নিক্সকে। এই মেয়ের দেহে ঐ লক্ষণ আছে। মেয়েটাকে নিজের সম্মোহন ক্ষমতায় বশ করে ফেললো সে। দিব্য লক্ষণের নারী দেহে হাত দিতেই নিজের ভেতরের কাম সত্ত্বার জেগে ওঠা টের পেলো সে। কামে সে কম ভাগ্যবান না। এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী তার প্রেমিকা ছিল। দেবীরাও যার রূপের সামনে ম্লান, সেই আফ্রোদিতি ছিল তার নিত্য শয্যাসঙ্গিনী। এরিসের কাম জাগিয়ে তোলা সহজ কথা নয়।

নিক্সের দুই বাহু ধরে তাকে বিছানায় বসিয়ে দিলো এরিস, 'তোমাকে কুমারী বলে সম্বোধন করলেও বুঝতে পারছি এখনো তোমার বিয়ে হয়নি দেখেই তুমি কুমারী, কিন্তু সতী নও। আমি এতদিন কেন অন্দরে এলাম না, তাই ভেবে খারাপ লাগছে।'

এরিসের কথার কিছুই বুঝতে পারছে না নিক্স। আচমকা তার আগমনে একটু হকচকিয়ে গেছে সে। তবে একটু পরেই বুঝতে পারলো এখানে দেবতাই আসুক

আর যেই আসুক আদতে এসেছে এক পুরুষ। আর একজন পুরুষের সামনে এমন পোশাক অস্বস্তিকর। নিজের উর্ধ্বাঙ্গের গোপন অনাবৃত জায়গাগুলো ঢাকতে সচেষ্ট হলো সে সাথে সাথে।

এরিস লক্ষ্য করলো সবকিছু। একটু হেসে বলল, 'তুমি হয়তো আমার কথা শুনেছ?'

মাথা নাড়লও নিক্স, 'হ্যাঁ।'

'আমি এরিস। গ্রীক দেবতা। এসব এখন আর তোমাদেরকে শেখানো হয় না। মানুষ মনে করে দেবতাদের সময় অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু না, দেবতারা আবার ফিরে আসবে। অলিম্পাসে বসে কর্তৃত্ব করবে এই পৃথিবীর ওপর। জন্ম-বেঁচে থাকা-মৃত্যুর ওপর হবে আমাদেরই কতৃত্ব। তুমি নিজে একটুও বুঝতে পারছো না, তুমি কতটুকু ভাগ্যবান। ভবিষ্যতে যে অলিম্পাসে রাজত্ব করবে সেই দেবরাজ এরিসকে তুমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ।'

নিজেকে একটুও ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে না নিক্সের। দেবতার উপস্থিতিতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে তার। মন বলছে, একটা ঝামেলা আসতে চলেছে। মৃদু গলায় বলল সে, 'আমরা স্পার্টার সবাই ভাগ্যবান। আপনি নিজে থেকে আমাদেরকে দেখা দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, সবাই ভাগ্যবান। তবে সবার সাথে নিজেকে মিলিও না। তোমার ভাগ্য আরেকটু বেশি ভালো।'

এই কথার প্রচ্ছন্ন অংশটাও বুঝতে পারলো না নিক্স। এরিস বলে চলেছে, 'সবাই আমাকে যুদ্ধের দেবতা বলেই জানে। তাতে আমি কাউকে দোষ দেই না। হিংসা আর ক্রোধের অনেক উদাহরণই আমি দিয়েছি। তবে সেসবের আড়ালে আমার প্রেমের কথাটা সবাই ভুলে গেছে। আমি কিন্তু দেবতাদের মধ্যে প্রেমিক হিসেবেও কম ছিলাম না। আর তুমি এই সবার চেয়ে বেশি ভাগ্যবতী, আমার প্রেমের রূপটাও দেখতে পাবে তুমি।'

ঝট করে মাথা তুলে এবার এরিসের দিকে তাকালো নিক্স, এবার বোধহয় একটু একটু বুঝতে পারছে সে এরিসের মতলব, 'আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমি দেবতা। অন্য নারীদের মতো, তোমার রূপের নিশ্চয়ই অনেক স্তাবক আছে। তাদের মতো ইনিয়েবিনিয়ে প্রেম নিবেদন করার ইচ্ছে আমার নেই। আমি সরাসরি বলছি, তোমাকে একটু আগে যখন দূর থেকে প্রথম দেখেছি, তখনই অনেক দিন পরে, মনে হলো অনন্ত কাল পরে আমার মধ্যে সেই অনুভূতি টের পেয়েছি। অলিম্পাসের বাগানে যখন দূর থেকে আফ্রোদিতি আমার ডোরে বাঁধা পড়তে আসতো তখন এই অনুভূতির মালিক হতাম আমি। অনেক দিন পরে তুমি আমাকে আফ্রোদিতির কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। তোমাকে একবার দেখেই আমি

বুঝেছি, তুমিই হবে আমার প্রেম সঙ্গিনী। এবার বুঝলে তো, কেন আমি তোমার ভাগ্যকে সবার থেকে উঁচুতে অবস্থান দিয়েছি।'

অন্য কেউ এই কথা বললে এতক্ষণে ক্রোধে ফেটে পড়তো নিক্স, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানে দমে গেল সে, তবু বলল, 'আপনি মনে হয় আমার পরিচয় জানেন না। আমার নাম নিক্স। আমি পায়াসের একমাত্র মেয়ে।'

এবার এরিসের মনে পড়লো ঘটনা। বিছানার পাশে রাখা একটা আসনে বসে পড়লো সে, 'আচ্ছা। তুমিই তাহলে স্পার্টার রাজকুমারী। আর ঐ যে কি একটা অভিজাত যোদ্ধা আছে, নিকোলাস নাম, তার সাথে তোমার বিয়ে হবার কথা চলছে। এখনই বিয়ে হয়ে যেতো, কিন্তু আমার প্রস্তাবেই আমাদের যুদ্ধ জয়ের পরে বিয়ে হবার কথা হয়েছে, তাই তো?'

'হ্যাঁ', এবার গলার স্বর স্পষ্ট হলো নিক্সের, 'আমি নিকোলাসকে ভালোবাসি। আমি তার বাগদত্তা। তার সাথেই আমার বিয়ে হবে। তাই আপনার আর আমাকে এসব কথা বোলা শোভা পায় না।'

ক্ষণিকের জন্য যেন জ্বলে উঠলো এরিসের চোখ, 'তুমি আমার প্রেম নিবেদনকে আর দশ জনের প্রেম নিবেদনের সাথে গুলিয়ে ফেলেছ। আমি তোমাকে দেখেই তোমার শরীরে দিব্য লক্ষণ খুঁজে পেয়েছি। তোমাকে ছোঁয়ার পরে তোমার শরীরের কোনো রহস্যই এখন আর আমার জানতে বাকি নেই। তুমি এই পর্যন্ত অসংখ্য পুরুষের সাথে মিলিত হয়েছ। কিন্তু কখনোই তৃপ্তি পাওনি। সেটা আমি জানি। আসলে পৃথিবীর কোনো পুরুষের তোমাকে তৃপ্তি দেবার ক্ষমতাই নেই। আমি তোমাকে আমার সাথে করে অলিম্পাসে নিয়ে যাবো।'

মরিয়া হয়ে উঠলো নিক্সের গলা, 'আপনি এসব কী বলছেন। আমি নিকোলাসকে ভালোবাসি। আমাদের বিয়ে হবে। আর আপনি তো দেবতা। ন্যায় অন্যায়ের বিচার করাই আপনার কাজ। আপনি এত বড়ো অধর্ম করতে পারেন না।'

'তোমার মুখে ধর্মের কথা কেমন যেন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। আর আমাকে অন্যায় শিখিও না। আমাদের আগের যে দেবরাজ ছিলেন তিনি তো মানুষের স্ত্রীদের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হতেন। তাদের সাথে মিলন করে জন্ম দিতেন জারজ সন্তানদের। তাদেরকে আবার বলা হতো ডেমিগড। জিউস যথেষ্ট কামোন্মত্ত ছিলেন। সেই হিসেবে আমি তোমাকে ভালো স্বামী পাবার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আমি আর অন্য কারো দিকে তাকাবো না। তুমি মানবী হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে আমি অলিম্পাসে দেবীর আসন দেবো।'

এবার ক্রোধ স্থান পেলো নিক্সের গলায়, ' আমি স্বর্গ সুখ চাই না। দেবী হতেও চাই না। আপনি এখন আমাকে মুক্তি দিন। আপনার কামের বলি আমাকে বানাবেন না।'

'বাহ' এরিস হেসে ফেললো, 'তুমি দেখছি নিকোলাসকে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছ। অমরত্বকেও অগ্রাহ্য করছো অবলীলায়। তবে তুমি আমার ক্ষমতা জানো না, জানলে আমার কথার বিরোধিতা করার কথা চিন্তাও করতে না।'

ফুঁসে উঠলো নিক্স, 'ক্ষমতা, তা তো জানিই। শক্তি দিয়েই বশ করবেন আপনি আমাকে। সারা জীবন পুরুষ তাই করার চেষ্টা করে এসেছে, হোক সে দেবতা অথবা মানুষ।'

এরিসের হাসি এখনো মুখে যায়নি, 'তোমাকে বশ করতে আমার শক্তির দরকার নেই। ভুলে গেছো, তোমাকে যে বললাম, স্বয়ং প্রেমদেবের মাতা, প্রেমের দেবীকে আমি বশ করেছিলাম, আচ্ছা দেখা যাক, সেই ক্ষমতা এখনো আমার মধ্যে বাকি আছে কি না।'

দরজার দিকে একবার তাকালো এরিস, আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল ঘরের দরজা। এরিস এগিয়ে গেল ভয়ার্ত নিক্সের দিকে। নিজের চোখ রাখলো নিক্সের দুই বিস্ফোরিত দৃষ্টির সামনে।

নিক্সের সামনে দুনিয়া যেন বদলে গেল। আচমকা যেন নিজের ওপরের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে সে। তার সামনের পুরুষের চেহারা আস্তে আস্তে বদলে যেতে শুরু করলো। একটা সময় পর সে অবাক হয়ে দেখলো তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিকোলাস। স্মিত হেসে তাকে নিজের বাহুতে আহ্বান করছে সে। সেই আহ্বানের উত্তর না দেবার সামর্থ্য নিক্সের নেই। নিজের হাত বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলো নিক্স। ভোজ বাজির মতো তার শরীর থেকে সব বস্ত্র যেন উধাও হয়ে গেল। সামনে দাঁড়ানো নিকোলাসের শরীরের এখন কোনো বস্ত্র নেই।

এগিয়ে এলো নিকোলাসের দেহ। নিক্সকে চিন্তা করার বিন্দুমাত্র সময় না দিয়ে, বুঝে ওঠার একটুও অবসর না দিয়ে মিলিত হলো তার সাথে। নিক্সের শরীরের প্রত্যেক রক্ত কণিকা যেন সেই মিলনের সুখ অনুভব করলো সাথে সাথে। মৃদু বাতাসের প্রান্তরের ঘাসের ওপর যেমন হিল্লোল বয়ে যায় তেমনি নিক্সের শরীরের সব রোমকূপ যেন আন্দোলিত হতে লাগলো। মনে হলো এই ঘূর্ণিঝড়ের যেন আর শেষ হবে না। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ অনেক আগেই হারিয়েছে সে। প্রবল সুখে চিৎকার করে উঠলো ভীষণভাবে।

এরিস নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে গিয়েও হারালো না। অনেক দিন পর নারী সঙ্গ লাভ করছে সে। যদিও নিক্সের শরীরে দেবতাদের সাথে সঙ্গমের ক্ষমতা আছে, তবু প্রথম বার এত প্রবল সঙ্গম করলে ক্ষতি হতে পারে তার, হয়তো প্রাণও চলে যেতে পারে। আর দেবতা হিসেবে সব ক্ষমতা থাকলেও এই ক্ষমতা সে কখনোই অর্জন করতে পারেনি। মৃতকে সে জীবিত করতে পারে না।

আরেকটু ক্ষণ সুখ ভোগ করলো এরিস। তারপর সঙ্গম সমাপ্ত করলো। শুয়ে পড়লো সে অচেতন নিক্সের পাশে। এখন নিজেকে সে নিকোলাসের রূপ থেকে আসল রূপে ফিরিয়ে এনেছে।

বেশ খানিকক্ষণ পরে নিক্সের জ্ঞান ফিরে এলো। নিজের এবং এরিসের দেহের দিকে তাকিয়ে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা মনে পড়লো তার। একটু আগের উত্তেজনা হারিয়ে গেছে। প্রতারিত হয়েছে সে দৈব ক্ষমতার কাছে। চোখ থেকে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

এরিস ততক্ষণে পোশাক পরে নিয়েছে, 'দেখলে তো, তুমি শুধু দেবীই হবে না। পাবে দেব সুখ। আর বেশি অপেক্ষা করতে হবে না তোমাকে। রোমানদের পরাজিত করেই আমি তোমাকে নিয়ে যাবো অলিম্পাসে।

এরিস চলে গেলেও অনেকক্ষণ শুয়ে রইলো নিক্স। সমস্ত জগত যেন শূন্য হয়ে গেছে তার কাছে। না, সে দেব সুখ চায় না। সে চায় না দেবী হতে। শুধু সেই মানুষটা পাশে থাকুক, গ্রহণ করুক তার ভালোবাসা। কিন্তু, এই দেবতার নির্দেশ কীভাবে অমান্য করবে সে।

কিছুই ভেবে উঠতে না পেরে নিজেকে আবার অশ্রুর কাছে সমর্পণ করলো নিক্স।

2024/01/15 18:53

অবশেষে যাত্রা দিন সমাগত। আর দেরি করার কোনো কারণ নেই। গত এক সপ্তাহ কেবল অস্ত্র তৈরি করেছে হেফাস্টাস। প্রথমে স্পার্টার কামাররা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল হেফাস্টাসের সাথে মিলে কাজটা শেষ করার কিন্তু প্রথম দিনেই এরিস বুঝে গিয়েছিল ওদের দ্বারা তার নির্ধারণ করা সময়ে কাজটা শেষ করা সম্ভব হবে না। সাথে সাথেই এরিস ডেকে পাঠিয়েছিল হেফাস্টাসকে।

'আমার তো মনে হয় সময়ের আগে অস্ত্র তৈরি করা শেষ হবে না। কয়েক মাস লেগে যাবে।'

হেফাস্টাস খুব একটা গা দিলো না, 'তা তো হবেই। এই কামারেরা সারা জীবন গৃহস্থালির জিনিসই তৈরি করেছে। একে তো অস্ত্র তৈরি করার অভ্যাস নেই, তার ওপর দেবতার অস্ত্র তৈরি করতে হবে। ওদের কারিগরি জ্ঞানও নেই। শরীরে শক্তিও নেই। ওদের দিয়ে আমি কাজ কীভাবে করাবো। তোমাকে যুদ্ধ যাত্রা পিছিয়ে দিতেই হবে।'

এরিস একটু ভাবলো, তার অপেক্ষা করার কোনো ইচ্ছে নেই, আর নিক্সকে দেখার পর আর তার সাথে প্রণয়ের পরে সেই অপেক্ষা না করার তাড়া আরও বেড়েছে। যেভাবেই হোক স্বর্গ রাজ্যে নিক্সের সাথে গিয়ে বসত পাততে হবে। সিদ্ধান্ত নিতেই মাথা নাড়লো সে, 'না হেফাস্টাস, এত সময় আমার হাতে নেই। যা বলেছি তাই করতে হবে। এক সপ্তাহ সময় আছে তোমার হাতে। এর মধ্যেই অস্ত্র তৈরি করে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'তাহলে আমি অপারগ। আদেশ যদি তুমিই দেবে, তাহলে কাজটা কীভাবে করতে হবে সেটাও বলে দাও।'

এবার এরিস একটু বিপদে পড়লো। এখানে হেফাস্টাসকে ভয় দেখানো যায়, কিন্তু তাতে খুব একটা লাভও হবে না। আর এই ব্যাটা ভয় পাবার লোক নয়। এখানে তার হয়ে কাজ করছে নেহাত কৃতজ্ঞতা থেকে। অনেক দিন পর সে তাকে জাগিয়ে তুলেছে। এজন্যই। কিন্তু তাকে তো উপায়ের কথা না বলতে পারলে এখানে তার কথা শুনেই চলতে হবে। যুক্তির খেলায় হেরে যাচ্ছে এখানে এরিস। স্পার্টার কারিগরদের দোষ দিয়েও লাভ নেই। ওরা নিতান্ত সাধারণ মানুষ, অতো শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করার ক্ষমতা পাবে কোথায়।

হন্যে হয়ে যে-কোনো একটা উপায় খুঁজতে লাগলো সে। কিছু না কিছু তো ব্যবস্থা করতেই হবে। মনে কৌতুক আর মুখে উদাসীনতা নিয়ে এরিসের আপাত অসহায়ত্ব লক্ষ্য করছে হেফাস্টাস। এরিসের কোনো ক্ষতি হলে অথবা অসুবিধা হলে তার ভালোই লাগে। সেটা সেই আদিকাল থেকেই।

তবে একটু পরেই এরিসের মুখে একটা দুষ্টু হাসি ফুটে উঠতে দেখে মনে একটা শঙ্কার কালো মেঘ দেখা গেল হেফাস্টাসের। নিশ্চয়ই এই আজন্ম ধূর্ত দেবতা নতুন কোনো উপায় খুঁজে পেয়েছে। কী সেটা?

এরিস স্মিত হেসে বলল, 'আমি আসলে বোকা হয়ে গেছি। তাই না হেফাস্টাস?'

এই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও চলে। এরিসই দিয়ে দিলো, 'অবশ্যই বোকা হয়ে গেছি। অনেক দিনের অনভ্যাসে এই অবস্থা হয়েছে। এটা কীভাবে ভুলে গেলাম আমি।'

'কী ভুলে গিয়েছিলে?' এবার প্রশ্ন করে হেফাস্টাস।

হেফাস্টাসের দিকে একটু এগিয়ে এলো এরিস, 'আচ্ছা, এখানে তো আমরা তোমার সঙ্গী খুঁজে পাচ্ছি না, তাই না? কিন্তু তুমি তো কখনো একা এত দেবতা আর মানুষের অস্ত্রের কাজ করতে না। অনেক আগে থেকেই তো তোমার কাজের লোক ছিল। শক্তিশালী কাজের লোক। এবং তারা একান্তই তোমার বাধ্যগত।'

এরিসের কথাটা এবার বুঝতে পেরেছে হেফাস্টাস, ঝট করে চোখ তুলল সে, 'তুমি নিশ্চয়ই ওদেরকে ডেকে আনবে না, তাই না। এই পৃথিবী এমনিতেই অনেক সমস্যার সামনে পড়ে যাবে তোমার কারণে। দেবতাদের জাগিয়ে তুলবে না-কি না তুলবে সেটা তোমার ব্যাপার, কিন্তু সেই পৌরাণিক জন্তুদের জাগিয়ে তোলার কোনো দরকার নেই।'

'অবশ্যই দরকার আছে। দেবতাদের যুগ আবার ফিরে আসতে চলেছে। আস্তে আস্তে আমি সবাইকেই নিয়ে আসবো। ওসব শক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে দেখেই মানুষ দেবতাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওরা আসবে, মানুষের ওপর অত্যাচার করবে। মানুষ ওদের কাছ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের শরনাপন্ন হবে। এজন্যই সেসব অশুভ শক্তি আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। তবে এবার তোমার সাথিদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। ওরা শক্তিশালী, অন্ধকারের শক্তি, কিন্তু একেবারেই বুদ্ধিহীন।'

'তুমি এই কাজটা করবে না।' এবার একটু অনুনয়ের সুর হেফাস্টাসের গলায়, 'আমি নিজে হাতে পরিশ্রম করবো। যত তাড়াতাড়ি পারি তোমার আর আমাজনদের জন্য অস্ত্র তৈরি করে দেবো। আমার এই অনুরোধ রাখো।'

কিন্তু ততক্ষণ এরিস সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। দুই হাত একত্র করে নিজের বুকের কাছে জড়ো করলো সে। চোখ বন্ধ করে মাথাটা একটু হেলিয়ে ওপরের দিকে তুলে ধরলো। সাথে সাথে তার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়লো এক দৈব জ্যোতি। কিছু দুর্বোধ্য আওয়াজ ভেসে এলো এরিসের মুখ থেকে। কাজটা শেষ করে এরিস হেফাস্টাসের দিকে তাকালো, 'নাও, এবার তোমার সাথিরা আসছে। এবার তো আর এক সপ্তাহের বেশি লাগবে না।'

'না, এক সপ্তাহের আগেই শেষ হয়ে যাবে।' হেফাস্টাসের মুখে আবার নেমে এসেছে রাজ্যের উদাসীনতা।

একটু পরেই পায়াসের রাজ প্রাসাদের লোকজনের মুখ আবার বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। এবার অবশ্য বিস্ময়ের সাথে সাথে মিশে রইলো ভয়ও। প্রাঙ্গনের আমাজনদের শিবিরের মধ্য দিয়ে পা ফেলে এগিয়ে আসছে ভয়াল দর্শন কিছু প্রাণী। ওদেরকে মানুষ বলতে যে কারোই আপত্তি হবার কথা। মানুষের মতোই দুই হাত দুই পা আছে। তবে ওটুকুই। আমাজনদের তাবুর অগ্রভাগ তাদের বুকের কাছে পড়ে আছে। তারা এগিয়ে আসছে বিশাল শরীর নিতে থপথপ শব্দে। তদের হাতে একটা বিশাল এবড়োথেবড়ো মুগুর। নাকের একটু ওপরে দুই চোখ যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। তার বদলে কপালের ঠিক মাঝখানে আছে একটা চোখ। বেশ বড়ো।

আমাজনদের তাবুর ভেতর দিয়ে তারা এগিয়ে আসছে প্রাসাদের দিকে। আমাজনদের কয়েকজন শব্দ শুনে উঁকি দিয়েছিল তাবু থেকে। ওদেরকে দেখে আবার তাবুতে ঢুকে পড়েছে। এদেরকে তারা চেনে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এরা আক্রমণ করতে আসেনি।

প্রাসাদের ভয়ে কাঁপতে থাকা লোকজনকে অভয় দিতে কথাটা বলল এরিস, বেশ জোরে, 'তোমরা কেউ ভয় পেও না। ওরা আমাদের বন্ধু। আমাদের ক্ষতি করবে না। যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করার জন্য এসেছে।'

হেফাস্টাস নিজেও দাঁড়িয়ে থেকে সাইক্লপসদের এগিয়ে আসা দেখছে। এগিয়ে গেল সে আগুয়ান দলটার দিকে। এবার প্রাসাদের দিকে এগোতে থাকা সাইক্লপসরা দেখতে পেলো হেফাস্টাসকে, নিজেদের প্রভুকে। তার সামনে বড়ো বড়ো পা ফেলে এসে দাঁড়ালো তারা। সবাই নত হয়ে হেফাস্টাসকে সম্মান জানালো। অনুভূতির দোলাচলে দুলছে হেফাস্টাস। ওদেরকে জাগিয়ে তোলা হোক এটা সে চায়নি, কিন্তু এতদিন পরে এদেরকে দেখে ভালোও লাগছে, সেই অনুভূতিও অস্বীকার করতে পারছে না। একসময় তার হয়ে এরা রাতদিন কাজ করেছে। মুখ বুজে।

সাইক্লপসরা তার ভাষা বোঝে, হেফাস্টাস আর দেরি না করে ওদেরকে খাবার দিতে বলল। পায়াসের প্রাসাদে ভাঁড়ারে সবকিছুই আছে। উৎকৃষ্ট কিছু মাংস ব্যবস্থা করে দানবদের খাওয়ানো হলো। সবাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পরিবেশন করছে। এরিসের অভয় দানে কেউ তেমন ভরসা পায়নি। এমন দানবদের কোনো বিশ্বাস নেই।

তারপরে এক সপ্তাহ একজন সাইক্লপসও ঘুমায়নি। কেবল খাওয়া আর কাজ। দেখতে দেখতে এক সপ্তাহের আগেই এরিসের আশার থেকে বেশি অস্ত্র তৈরি হয়ে

গেল। শেষ দিন বিকালে সব পরীক্ষা করে এরিস রায় দিলো, 'এবার আর কোনো সমস্যা নেই। কাল সকালেই আমরা যাত্রা করবো।'

আজ সকালে সবাই এসে জড়ো হয়েছে প্রাসাদের সামনে। বেশ কিছু সৈন্য রেখে যাচ্ছেন পায়াস। এরিস আর তার দেবত্বের ওপর এতদিনে বিশ্বাস চলে এসেছে তার। রোমানদের সাথে যে এই দল যুদ্ধে জিতবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজের ভাগ্য নিয়ে একটু সন্দেহ হচ্ছে তার। এই কদিনে তিনি এরিস আর দেবতাদের সম্পর্কে অনেক তথ্যই জোগাড় করেছেন। আর তাতে তার যা মনে হয়েছে তা খুব একটা সুখকর নয়। এই দেবতারা গ্রীসের মানুষদেরই সাহায্য করবে। তার মনে হয় আর রাজা হওয়া হলো না। তবে তিনি আনুগত্যের চূড়ান্ত রূপ দেখিয়েছেন এরিসের প্রতি। দেখা যাক ভাগ্যে কী আছে।

নিকোলাস আর মরিস দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক পাশে। কদিন ধরে নিকোলাস পায়াসের প্রতি একটু শীতল ব্যবহার করছে। সে বুঝতে পারছে পায়াস যতই চেষ্টা করুন না কেন, এরিস কিছুতেই একজন গ্রীসের বাইরের লোককে স্পার্টার রাজা বানাবেন না। তবে একটা জায়গায় দুজনের মতই স্পষ্ট। রোমানরা অবশ্যই হেরে যাবে। মানুষের সাথে শক্তি দেখানো যায়, কিন্তু এদের সাথে কারো কোনো সুযোগই নেই।

পায়াস নিকোলাসের দিকে তাকেলেন, 'নিক্সের বিয়েটা হয়ে গেলে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করতাম। এখন একটা কাজ বাকি রেখেই যাত্রা করতে হচ্ছে।'

নিক্সকে যে উদ্দেশ্যে বিয়ে করতে চেয়েছিল নিকোলাস তার অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। এখন তার সামনে সরাসরি রাজা হবার সুযোগ। তখন সে নিক্সের সাথে কী করবে সেটা পরে দেখা যাবে, তবে তখন সে নিজের সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করে ইনোনকে অবশ্যই খুঁজে বের করবে। আর ইভানকে এমন মৃত্যু দেবে যা সে কখনো কল্পনাও করেনি। সেদিনের সেই অপমান তার সব পরিকল্পনা ঘেঁটে দিয়েছিল। ইনোনকে গ্রাস থেকে হারানোর বেদনা এখনো ভুলতে পারেনি সে। আর নিক্সের সম্পর্কে সত্যি জানার পর থেকে তো আগ্রহ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

আপাতত কেবল এই যুদ্ধ যাত্রায় নজর তার। পাশে ঘোড়ার ওপর বসে থাকা মরিসের অবশ্য এত জটিল চিন্তা নেই। সেদিন আমাজন মেয়ের সাথে লড়াইয়ের পর তার পুরানো ব্যথার জায়গাতে তো আঘাত লেগেছেই, সাথে শরীরের আরও কিছু নতুন জায়গাতে সারা জীবনের মতো আঘাত লেগে গেছে। অনেক চেষ্টার পরে এখন সে চলাচলের যোগ্য হয়েছে। নিকোলাস তাকে থেকে যাবার জন্য বলেছিল, কিন্তু মরিস এত বোকাও নয় যে এখন সে এরিসের পেছন ছেড়ে দেবে।

তবে যুদ্ধে যাবার আগ পর্যন্ত কোনো ধরনের পরিকল্পনা করেনি এরিস ওদের সাথে। যে যাই বলুক, এই যাত্রায় তো সেনাপতি এরিসই। যুদ্ধের দেবতাকে সামনে রেখে আর কেইবা সেনাপতি হবে।

এরিস বেরিয়ে এলো অন্দর থেকে। একেবারে তৈরি হয়ে। সবার দিকে তাকিয়ে খুশি হলো, হেসে উঠলো সে, 'আশা করি এবার আমাদের যাত্রা সফল হবে।'

এতদিন সেসব সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর না রাখলেও এই কদিনে গ্রীকদের নিয়মকানুন পালন করতে পায়াস সদা ব্যস্ত। পুরোহিতের সাথে আলোচনা করে ভালো করেই শুনে নিয়েছেন গ্রীকদের যুদ্ধ যাত্রার কী রীতি। সেই অনুযায়ী সব কিছুই ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এরিস নিজে যুদ্ধ বেশে এসে যাত্রায় উদ্যত হতেই পুরোহিতকে চোখে ইশারা করলেন পায়াস। পুরোহিত এগিয়ে এলো এবার। নানা উপচারে প্রাসাদ দরজা সাজিয়ে বিভিন্ন মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করলেন।

এরিস বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পুরোহিতের কাজ দেখল। তারপর হেসে এগিয়ে গেল পায়াসের দিকে, 'এগুলো কী করছো তোমরা?'

পায়াস একটু ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন, 'না, মানে যুদ্ধ যাত্রার আগে এসব তো করতেই হয়।'

'সেটা ঠিক আছে। করতে হয়। কিন্তু কেন করতে হয়, তা কি জানো?'

'এটা একটা রীতি।'

'রীতি তো আর শুধু শুধু পালিত হয় না। এটা করতে হয় দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য। আর এখানে যুদ্ধের দেবতা এমনিতেই তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট। তোমাদের সাথে যুদ্ধ যাত্রা করছে। এবার এসব বন্ধ করো।'

পায়াসকে কিছুই বলতে হলো না, পুরোহিত এরিসের কথা শুনেই সবকিছু গুছিয়ে সদর দরজা থেকে সরে পড়লেন।

প্রাসাদের বাইরে প্রান্তরের সামনে এসে দাঁড়ালো এরিস। তার সারা শরীর থেকে যেন তেজ নির্গত হচ্ছে। আমাজনেরা সবাই বেরিয়ে এসেছে শিবির থেকে। তারা এরিসের এই রূপ দেখে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো আমাজনেরা। এমন ভয়ানক আওয়াজ কেউ কখনো শোনেনি। কানে যেন সত্যিকারের তালা লেগে যাবার জোগাড় হলো।

এরিস আমাজনদের হাতের ইশারায় থামতে বলল, তারপর চিৎকার করে উঠলো দৈব ক্ষমতা ব্যবহার করে, 'তোমরা শিবির গুটিয়ে নাও। যাত্রার সময় হয়ে গেছে।'

আমাজনেরা হাত চালালো যন্ত্রের মতো। দেখতে না দেখতে শিবির গুছিয়ে সারি বেঁধে যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে গেল তারা। সবাইকে সাথে নিয়ে যাত্রা শুরু হলো। আমাজনদের সাথে আছে সাইক্লপসরা। তাদের ভেতরে ভেতরে এগিয়ে

চলছে। এই ভয়ানক বাহিনীর সামনে দাঁড়ানোর সামর্থ্য এই পৃথিবীর কোনো সেনার নেই। এরিস চলে এসেছে সবার সামনে। এক পাশে স্পার্টার সেনারা এগিয়ে চলেছে। ঘোড়ায় চড়েও ওরা হাঁটতে থাকা আমাজন আর সাইক্লপসদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। নগর থেকে বেরিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা প্রশস্ত জায়গায় শিবির স্থাপন করার আদেশ দিলো এরিস। তারপর এগিয়ে এলো পায়াসের দিকে, 'এবার আমরা যাত্রার পরিকল্পনা করবো।'

'প্রাসাদেও তা করা যেতো মহামান্য।'

'তা যেতো। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম আজ সকালেই সেনা যাত্রা করবো। পরিকল্পনা টুটে গেলে আমার কিছুতেই ভালো লাগে না। এখন আমরা যুদ্ধ যাত্রা করে ফেলেছি। এবার আলোচনা করে নিই, কোন দিক থেকে রোমে যাবো।'

একটা তাবুতে কিছুক্ষণ পরে বসলো তারা। নিকোলাস আছে পায়াসের সাথে। সাথে আরও কিছু মানচিত্র বিশেষজ্ঞকে ডেকে আনা হয়েছে।

এরিস শুরু করলো, 'আচ্ছা, রোমে পৌঁছানোর সবচেয়ে সহজ পথ কী? মানে সোজা রাস্তা কোনটা?'

এক বাক্যে উত্তর দিলেন পায়াস, 'সমুদ্র। সরাসরি স্থল পথে যাওয়া যাবে না। যদি স্থল পথে যেতেও চাই তাহলে পাত্রাসের ওখানে একটা প্রণালী পার হতে হবে। কিন্তু সেই প্রণালী পার হলেও রোমে পৌঁছতে আমাদেরকে অনেক ঘুর পথে যেতে হবে।'

নিজের কথার সমর্থনের জন্য মানচিত্র বিশেষজ্ঞ সৈন্যের দিকে তাকালেন তিনি। সৈন্য সায় দিলো, 'ঠিক।'

'আচ্ছা' একটু চিন্তা করলো এরিস, 'আমরা তাহলে স্পার্টা থেকেই যুদ্ধ জাহাজে রওনা দেই? তাহলেই তো ঝামেলা শেষ। স্পার্টায় তো বন্দর আছে, তাই না?'

'তা আছে মহামান্য, কিন্তু আরেকটা সমস্যা আছে।'

পায়াসের দিকে তাকালো এরিস, 'কী সমস্যা?'

'মহামান্য, আমাদের বন্দর বাণিজ্যিক বন্দর। যুদ্ধ জাহাজের প্রয়োজন কখনো হয়নি দেখে বানানো হয়নি।'

'তার মানে যুদ্ধ জাহাজ নেই', বিড়বিড় করলো এরিস, তারপর ঝট করে মাথা তুলে তাকালো হেফাস্টাসের দিকে, 'যুদ্ধ জাহাজ নেই তো কী হয়েছে। আমাদের আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কারিগর। সেই যুদ্ধজাহাজ বানিয়ে দেবে।'

এবার আলোচনায় প্রবেশ না করলে পারলো না হেফাস্টাস, 'তুমি বোধহয় ভুলে গেছো এরিস, আমি আর আমার সাইক্লপসরা ধাতুর কাজ অনেক ভালো করতে পারি, আর জাহাজ তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। সেই কাজে আমরা আনাড়ি।'

এরিস ভুলে গিয়েছিল কথাটা, একটু চিন্তায় পড়তে হল তাকে, 'তাহলে কী উপায়?'

এরিসকে উপায় বলে দেবার সাধ্য কার আছে। সবাই চুপ করে আছে। এরিসই বিড়বিড় করতে লাগলো, 'স্পার্টায় যদি যুদ্ধ জাহাজ না থাকে তাহলে কোথায় আছে?'

এবার সেই মানচিত্র বিশেষজ্ঞ সৈনিক বলে উঠলো, 'কোনো গ্রীক রাজ্যে আপনারা যুদ্ধ জাহাজ পাবেন না। আমি গ্রীসের মানচিত্র হাতের তালুর মতো চিনি। রোমানদের কাছেই আছে যুদ্ধ জাহাজ।'

এরিস এবার একটু ভ্রূ কুচকালো, 'রোমানদের কাছে যুদ্ধ জাহাজ থেকে আমার লাভ কি?'

' বলছি মহামান্য। স্পার্টা থেকে পাত্রাস মাত্র চার দিনের পথ। পাত্রাস প্রণালী ধরে আমরা খুব সহজেই আইওনিয়ান সাগর ধরে রোমে চলে যেতে পারবো। পাত্রাসে অনেক যুদ্ধজাহাজ আছে। আমাদের বাহিনীর জন্য যথেষ্ট।'

এরিসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'তাহলে তো হয়েই গেল। চলো পাত্রাসে।'

'একটা সমস্যা আছে মহামান্য। এটা রোমানরাও জানে, পাত্রাস তাদের জন্য একটা বিপজ্জনক জায়গা। যে কেউ ইচ্ছে করলেই পাত্রাস দিয়ে সমুদ্র পথে রোমের হৃদপিণ্ডে আঘাত করতে পারে। তাই পাত্রাস বন্দর আর পাত্রাস প্রণালী রক্ষা করে রোমের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ নৌ বাহিনী। আমরা যদি সেই পাত্রাস বন্দর অধিকার করতে চাই তবে আমাদেরকে সেই বাহিনীকে পরাস্ত করেই সেসব যুদ্ধ জাহাজের অধিকার পেতে হবে।'

এরিস এবার মাথা নাড়লো, 'ভালো কথা। রোমানদের সাথে আসল যুদ্ধের আগে একটা প্রস্তুতিমূলক যুদ্ধ সেরে নেবো আমরা। এখন আমরা যাত্রা করবো পাত্রাসের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে যুদ্ধ জাহাজ অধিকার করে যাবো রোমে। কারো কোনো আপত্তি আছে এই পরিকল্পনায়?' সবার মুখের ওপর দিয়েই ঘুরে এলো এরিসের দৃষ্টি।

কারো কোনো আপত্তি থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

ট্রাজান অনেকটা সময় নিয়ে কথাগুলো শুনলেন। এই গুপ্তচর সাধারণ নয়। তাকে রোমান সাম্রাজ্যের বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন এক চিহ্ন তার কাছে আছে, তার সাহায্যে যে-কোনো রোমান সৈন্য, গভর্নর, সেনাপতি তাকে যে-কোনো সময় যে-কোনো সাহায্য করতে বাধ্য। কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না, একমাত্র সম্রাট ছাড়া কারো তাকে গ্রেফতার অথবা দণ্ড দেবার অধিকার নেই।

সমস্ত কালো পোশাকে আবৃত হয়ে সেই দূত হাজির হয়েছে আজকেই। স্পার্টার খবরাখবর শুনে বুদ্ধিমান ট্রাজান বুঝতে পেরেছিলেন, সেখানে একটা ঘোঁট পাকিয়ে উঠতে পারে। আর পুরো সাম্রাজ্যে সেই জায়গাতেই বর্তমানে তিনি সবচেয়ে বেশি বিপদ দেখতে পেয়েছিলেন। আর প্রথমেই ডাক পড়েছিল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে চৌকস গুপ্তচরের। আর সেই গুপ্তচর এসেছে আজ বিকেলে। দুপুরের খাবার সম্রাট সবে শেষ করেছিলেন। তখনই এই খবর এসেছিল।

কাউকে সাথে নেননি সম্রাট। একাই দেখা করেছিলেন সেই দূতের সঙ্গে। এই দূত যখন নিজে থেকে কোনো খবর না দিয়ে স্বয়ং এসে হাজির হয়েছে তাতে ব্যাপার যে খুব গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'বলো, কী খবর নিয়ে এসেছ? স্পার্টানরা আবার কি অঘটন ঘটিয়েছে?'

দূত সরাসরি আসল কথাটা বলে দিলো, 'স্পার্টা থেকে এক বিশাল সেনাবাহিনী বের হয়েছে, কোনো সন্দেহ নেই সেই সেনা যুদ্ধ যাত্রা করেছে।'

রোমান সাম্রাজ্যে সম্রাটের নিজের বাহিনী ছাড়া অন্য কেউ বাহিনী গঠন করলেই তা বিদ্রোহ বলে গণ্য হবে। আর এখানে তো বাহিনী গঠন করে যুদ্ধ যাত্রাও করে ফেলেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি কীভাবে সেই বাহিনী গঠিত হলো? কোনো ফ্রি টাউনকে তো যুদ্ধ যাত্রা করার মতো সেনা গঠনের সুযোগ এবং সুবিধা কিছুই দেওয়া হয়নি। প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়লো তার মুখ থেকে, 'যুদ্ধ যাত্রা করার মতো বাহিনী তারা পেলো কোথায়?'

এই প্রশ্নের উত্তর দূতের অবশ্যই দেবার কথা, 'সম্রাট, ওরা এই বাহিনী কোথায় পেলো তা আমারও অজানা। আসলে যেন শূন্য থেকে ভোজবাজির মতো উদয় হলো এই বাহিনী। এমন আশ্চর্য বাহিনী কখনো দেখা তো দূরের কথা, এমন কিছুর বর্ণনাও কখনো শুনিনি।'

' বাহিনীর আবার আশ্চর্য কী?'

'এই বাহিনীর সব যোদ্ধাই মেয়ে। কোন জায়গা থেকে এসব মেয়েরা এসেছে তা আমি জানতে পারিনি। কারো কাছেই কোনো তথ্য নেই এই ব্যাপারে।'

ট্রাজান জীবনে কম যুদ্ধ করেননি, কিছু কিছু জায়গায় যে কিছু কিছু মেয়ে যোদ্ধা দেখেননি তা নয়, কিন্তু কেউ একজন সম্পূর্ণ একটা মেয়ে বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে নেমেছে শুনতে অদ্ভুত এবং হাস্যকর লাগছে। তবে তিনি হাসলেন না, চলে গেলেন পরের প্রশ্নে, 'তারা যুদ্ধ যাত্রা করেছে সেটা ঠিক। কিন্তু করেছে কার বিরুদ্ধে? গ্রীসের কোন রাজ্য তারা জয় করতে চায়?'

এবার নিজের আয়ত্তের প্রশ্ন করেছেন সম্রাট, উত্তর দিতে আগ্রহী হলো দূত, সে এই যুদ্ধ যাত্রার কারণ নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে গ্রীসের পুরোহিতের কাছ থেকে জেনে এসেছে। দূতের স্বভাব পালন করলো সে। ঘটনার গুরুত্ব, সত্যি, মিথ্যা যাচাই তার কাজ নয়, তার কাজ কেবল খবর পৌঁছে দেওয়া, ' মহারাজ, তারা গ্রীসের কোনো রাজ্য জয় করতে চায় না। তারা রোমান সাম্রাজ্য জয় করতে চায়। তারা রোমের দিকেই এগোচ্ছে।'

এই কথাটা একেবারেই আশা করেননি ট্রাজান, তার চোখ সরু হয়ে উঠলো, 'স্পার্টার সব লোক কি এক সাথে পাগল হয়ে গেল না-কি? কী ভেবে ওরা এই কথা ভাবতে পারলো। পায়াস কী করেছে?'

'পায়াসও সেই বাহিনীর সঙ্গেই আছেন। বলতে পারেন তিনিও আমাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধযাত্রা করেছেন।'

'একে তো বিশ্বাসঘাতকতা বলা যাবে না। এটা তো নেহাত পাগলামি। কিন্তু এমন মতি ওদের হলো কেন?'

'সম্রাট, পায়াসকে পাগল বলে মনে হয়নি আমার। আর তার কোনো উপায় ছিল না। পায়াস এই বাহিনীর সাথে থাকলেও তার ভূমিকা অতি নগণ্য। স্পার্টার এই বাহিনী চালনা করছে আরেক জন। সেই নেতৃত্ব দিচ্ছে।'

'কে?' অবাক হবার মাত্রা বাড়ছেই ট্রাজানের, 'কোনো বহিরাগত কি পায়াসকে বশে নিয়ে এসেছে? অথবা কোনো অভিজাত?'

'না মহারাজ। স্পার্টার সবাই মনে করছে, কোথেকে যেন এক দেবতা এসেছে তাদের রাজ্যে। নিজেকে সে পরিচয় দিয়েছে যুদ্ধের দেবতা এরিস বলে। আর সেই এরিসই এই যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রধান হোতা। তার ক্ষমতা অসাধারণ। আসলে আমি যতটুকু বুঝেছি কোনো সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা পায়াসের ছিল না। অতো বেশি ক্ষমতার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলাও যায় না। প্রাণ জিনিসটা সবার কাছেই প্রিয়।'

পায়াসের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ছিল কি ছিল না তা নিয়ে ভাবছেন না ট্রাজান, তার মাথায় আঘাত করেছে নতুন কথা, 'দেবতা! সে আবার কী।' তিনি নিজে রোমের বাইরের হওয়াতে আর সারা জীবন যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাটাতে এসব নিয়ে তেমন একটা ধারণা নেই তার। উপাসনা, প্রার্থনা জীবনে খুব একটা করেননি তিনি।

এবার দূত একটু বিপদে পড়লো, দেবতা কী এই প্রশ্নের উত্তর তো অনেক কঠিন। ঈশ্বর কি সেটা বোঝানো নেহাত সহজ কাজ নয়, তবু চেষ্টা করলো সে,

'গ্রীকরা মানে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন দেবতারা। তারা পৃথিবীর বাইরের রাজ্যে মানে স্বর্গে থাকেন। মানুষ জীবনে যত কিছুই করুক না কেন, তার ভাগ্য থেকে শুরু করে কর্ম, সবকিছুতেই একজন না একজন দেবতার নিয়ন্ত্রণ আছে।'

'আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তাহলে সেই দেবতা এখন আমাদেরকে আক্রমণ করতে চাইছে কেন? সে তার রাজ্য থেকে কেনই বা এসেছে?'

'সেই দেবতা এসেছে গ্রীকদের স্বাধীন করতে। গ্রীস রাজ্য পরাধীন থাকলে না-কি তাদের স্বর্গে থাকতে কী অসুবিধা আছে। অতো বিস্তারিত আমি জানি না। তবে তারা রোমানদের হামলা করার জন্যই বের হয়েছে।'

ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু ট্রাজান তা করতে পারছেন না। তার মন বলছে, কোথাও একটা বড়ো গণ্ডগোল হচ্ছে। মানুষ কখনোই এতটা উন্মাদ হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু দেবতা বলতে এই দূত যা বোঝাচ্ছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ভালো রকমের বিপদেই পড়তে হবে।

যুদ্ধে তিনি ভয় পান না। তবে সেই দলকে রোমে আসতে হলে অনেক কাঠখড় পুড়িয়েই আসতে হবে, 'আচ্ছা, ওরা রোমে আসছে কোন দিন দিয়ে? কেউ ওদেরকে বাঁধা দেয়নি এখনো? না-কি স্পার্টা থেকে জাহাজে করে আসছে?'

'স্পার্টা থেকে জাহাজে করে যাত্রা করার কোনো উপায় নেই। সেখানে কিছু বাণিজ্যিক জাহাজ ছাড়া আর কিছুই নেই। সেজন্য ওরা স্থল পথে যাত্রা করেছে। পথে ওদের ঐ সৈন্যকে কেউ আটকানোর সাহস করেনি। আমাদের রোমান বাহিনী যেগুলো আছে, তারা বেশির ভাগ জায়গাতেই হয়তো পালিয়েছে, নয়তো নিজেদের নগরে আবদ্ধ করে রেখেছে। আর সেই বাহিনী এগিয়ে গেছে পাত্রাসের দিকে। নির্দ্বিধায়, নির্বিবাদে।'

আচমকা ট্রাজান যেন বুঝতে পারলেন ঐ বাহিনীর উদ্দেশ্য। হ্যাঁ, হতেই হবে। তিনি এত বছর ধরে সর্বাধিনায়ক। যুদ্ধক্ষেত্রে কে কী চিন্তা করছে তা তিনি বুঝতে পারবেন না, সেটা আবার হয় না-কি, 'ওরা পাত্রাসের দিকে যাচ্ছে কেন? পাত্রাস প্রণালী পার হয়ে ঘুরে রোমে আসবে?'

'আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম সম্রাট। ওদের কাছে তো আর যুদ্ধজাহাজ নেই। হেঁটেই আসতে হবে। আমি ভেবেছিলাম ওরা পাত্রাস প্রণালী পার হবার চেষ্টা করবে।'

'কিন্তু সেই কাজ তো অসম্ভব। আমি পাত্রাসে আমার বাহিনীর বিশাল এক অংশ যুক্ত করেছি। আমার সেরা নৌবাহিনী পাত্রাসে আছে। ওরা ওদেরকে বাঁধা দেবে।'

'আপনার বাহিনী তাই করেছে। ওরা অন্যদের মতো পালিয়ে যায়নি। ওরা আক্রমণ করেছিল এই আগুয়ান স্পার্টার বাহিনীকে।'

তার মানে যুদ্ধ হয়েছে। কতদিন পরে। ট্রাজান শেষ এমন সংগ্রামের কথা মনে করতে পারলেন না, যুদ্ধের ফলাফল জানতে ইচ্ছুক হলো তার মন, 'তারপর কী হয়েছে যুদ্ধে? ফলাফল কী? শীঘ্র বলো।'

দূতের মুখ এবার নিচু হয়ে গেল, 'সম্রাট, আমি দূর থেকে লক্ষ্য রেখেছিলাম সেই যুদ্ধের ওপর। তারপর যে দৃশ্য আমি দেখেছি, তা বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নেই। সেই দৃশ্য দেখা মাত্র আমি বুঝে গেলাম, স্পার্টার লোকজন উন্মাদ হয়ে যায়নি, ঐ বিশেষ লম্বা শক্তিশালী লোকটা দেবতা হোক আর যাই হোক, কো সাধারণ মানুষ নন। তার সাথের সেই নারী বাহিনী তারাও সাধারণ নয়। পুরো ব্যাপারটাই অপার্থিব। অলৌকিক শক্তির কোনো অভাব নেই তাদের মধ্যে।'

এবার একটু ভয় উঁকি দিলো ট্রাজানের মুখে, 'তার মানে আমার পাত্রাসের বাহিনী হেরে গেছে?'

'হ্যাঁ মহারাজ। হেরে গেছে। কিন্তু সেটা আসল কথা না। যুদ্ধে জয় পরাজয় হতেই পারে। এই রোমান সাম্রাজ্য যে সবসময় সব যুদ্ধে জয়ী হয়েছে তা তো নয়। তবে পাত্রাসে আমাদের বাহিনী যেভাবে হেরে গেছে তা আগে কখনো হয়নি আমি নিশ্চিত।'

'তাই না-কি' ট্রাজানের গলা শান্ত, 'কী হয়েছিল একটু খোলাসা করে বলো তো?'

ঘোর খেলে গেল দূতের চোখেমুখে, গলায়, 'পাত্রাসের দিকে এগিয়ে আসছিল স্পার্টার সেই অদ্ভুত বাহিনী। প্রথমে পাত্রাসের সেনাপতি কয়েকজনকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। সেখানে সেই দেবতার সাথে কথাবার্তা হয়েছিল, আমি পরে জানতে পেরেছি- সেই দেবতা না-কি ওদেরকে সবগুলো যুদ্ধ জাহাজ বন্দরে রেখে সরে যেতে বলেছিল।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও' ট্রাজান বাঁধা দেন, 'যুদ্ধ জাহাজ বন্দরে রেখে সরে যেতে বলেছিল মানে?'

'মহারাজ, ঐ দেবতার কখনোই কয়েক মাসের রাস্তা হেঁটে পার হয়ে রোমে আসার ইচ্ছা ছিল না। স্পার্টা থেকেই তিনি নিশ্চয়ই এই পরিকল্পনা করে এসেছিলেন। পাত্রাসে এসে তাদের যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে তারা রোম আক্রমণ করবেন। পাত্রাস প্রণালী পার হবার জন্য তারা পাত্রাসে আসেননি। এসেছেন যুদ্ধ জাহাজ অধিকার করার জন্য।'

'বলে যাও, তারপর কী হলো?'

'আমাদের পাত্রাসের সেনাপতি তো প্রথমে একচোট হেসে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়লেন। তার সেনারাও প্রথমে কিছুই বুঝতে পারছিল না। একটু পরেই ওদের দল থেকে কয়েকটা দানব এগিয়ে এলো। তাদের দেখে এবার টনক নড়ল আমাদের বাহিনীর যোদ্ধাদের।'

আবার বাঁধা দিতে বাধ্য হলেন ট্রাজান, 'দানব মানে কী?'

'একমাত্র ঐ শব্দ দিয়েই ওদেরকে প্রকাশ করা যাবে। আপনাকে এতক্ষণ বলা হয়নি। সেই দেবতার দলে কয়েকটা দানব আছে। তিনজন মানুষের সমান লম্বা

একেকটা। মানুষের মতো দুই হাত দুই পা থাকলেও ওদের কপালে একটা চোখ। প্রথম বার দেখার পর আমি তিন রাত দুঃস্বপ্ন দেখেছি। এখন অবশ্য আমার অবস্থা একটু স্বাভাবিক হয়েছে।'

'আর কী কী রহস্য লুকিয়ে রেখেছে ঐ দেবতা নিজের বাহিনীতে।'

'আর কোনো রহস্য নেই। এটাই শেষ।'

'আচ্ছা যুদ্ধের কথা বলো।'

'প্রথমে ভয় পেয়ে গেলেও তারপর আমাদের বাহিনী সাহস করে এগিয়ে আসে। বেশ কয়েকজন মিলে একেকজন দানবকে আক্রমণ করে তারা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আমাদের ছুঁড়ে দেওয়া বর্শা, তীর কিছুই ওদেরকে ভেদ করতে পারে না। অনেক শক্ত চামড়া। প্রথম দফাতেই আমাদের ঘোড়সওয়ারদের একেবারে নাশ করে ফেলে সেই বাহিনী। নেহাত সাহস আর অদম্য রোমান চেতনা সাথে নিয়ে পদাতিকেরা যুদ্ধ চালিয়েছিল শেষে। কিন্তু ঐ দানবদের সাথে কেউই এঁটে উঠতে পারেনি। ঐ দেবতার পুরো বাহিনী, স্পার্টার সাধারণ সেনারা বসে বসে তামাশা দেখেছে শুধু। আমাদের পাত্রাসের বাহিনী এক বেলাও যুদ্ধ করতে পারেনি। তার আগেই খেলা শেষ। তারপরে আমাদের সেনাপতি বাকি থাকা সৈন্যদের জীবন ভিক্ষা চেয়েছিল ঐ দেবতার কাছে। কিন্তু ঐ দেবতা মানা করে দিয়েছেন, বলেছেন, প্রথম বারেই ওদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। দেবতার দান যে একবার বুঝেশুনে হেলায় হারায় তার পরে এমন দশাই হয়। নিজের মেয়ে সৈন্যদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন দেবতা সেই বাকি থাকা সৈন্যদের ওপর। আমি লুকিয়ে ছিলাম বলে বেঁচে গেছি। সেই মেয়েরা একটুও দয়া মায়া নিয়ে জন্মায়নি। নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত দেখিয়েছে তারা। একজন সৈন্য বেঁচে থাকা পর্যন্ত নির্বিচারে তলোয়ার চালিয়ে গেছে।'

ট্রাজান এতক্ষণ মুখ শক্ত করে সব শুনেছেন। এবার দূতের কথা শেষ হতে তিনি বুঝতে পারলেন, দূতের সব কথা বলা শেষ। জানতে চাইলেন তিনি, 'ওরা এখন কোথায় আছে? সেই দেবতার বাহিনী?'

'সেই দিনই ওরা পাত্রাস থেকে গোছগাছ করে পরের দিন বেরিয়ে পড়েছে রোমের উদ্দেশ্যে।'

'আর তুমি কীভাবে এসেছ? ওরা তো তাহলে রোমের মাটিতে নেমে পড়েছে।'

'না মহারাজ। এত তাড়াতাড়ি পারার কথা নয়। ওরা পাত্রাস থেকে জাহাজ নিয়ে যাত্রা করেছে, সাথে সাথে আমিও স্থল পথে আইওনিয়ান সাগর আর আড্রিয়াটিক সাগরের সংযোগ প্রণালী পর্যন্ত গেছি। এরপরে তো জানেনই ঐ প্রণালী এই সমুদ্রে সবচেয়ে কম প্রশস্ত। দ্রুতগামী জাহাজে সেই প্রণালী পার হয়ে আমি প্রাসাদে চলে এসেছি। আমার হিসেবে ওরা এখনো মাঝ সমুদ্রেই আছে।'

'তার মানে আমাদের কাছে কিছু সময় আছে বলতে চাচ্ছো?'

এবার অবাক হয়ে গেল দূত, 'কীসের সময় মহারাজ?'

'অবশ্যই ওদেরকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতির সময়। যুদ্ধক্ষেত্রে এবার দেবতাকে রোমানদের আসল সেনার মুখোমুখি হতে হবে।'

মাথা নত করলো দূত, 'মহারাজ, আমি দূত নিয়মের সব নিয়ম সম্পর্কে জানি। আমি জানি দূত কখনো নিজের মত প্রকাশ করবে না। সে শুধু সত্যি খবর জোগাড় করে প্রকাশ করবে। কিন্তু এখানে মহারাজ আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে প্রাণদণ্ড দিতে পারেন। তবে আমি আপনাকে পরামর্শ দেবো, আপনি ঐ দেবতার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিন। তাকে গ্রীসের স্বাধীনতা বুঝিয়ে দিন। তাতেই তিনি খুশি হয়ে ফিরে যাবেন।'

'তুমি যে পরামর্শ দিলে তাতে প্রাণদণ্ড দেওয়াই উচিত। কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। এখন দয়া করে আমার চোখের সামনে থেকে যাও। আর রোমের বাইরে যাবে না। ওদের ঐ দানবদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা সাজাতে তোমাকে লাগবে।'

পরের কথাটা দূতোকে বললেন না তিনি, যেন নিজেকেই বললেন, 'আমি ট্রাজান। ভুলে যেও না। রোমানদের এই বিশাল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো অংশ আমিই তৈরি করেছি। আমার মতো মহান রোম সম্রাট আগেও আসেননি, ভবিষ্যতেও আসবে না। আর আমি যুদ্ধে ভয় পেয়ে গেলে কীভাবে হবে। এতদিন মানুষকে পরাজিত করেছি। এবার গ্রীক দেবতার পালা, দানবদের পালা। রোমানরা সারা জীবন মনে রাখবে আমার কথা। কীভাবে আমি আর আমার অজেয় বাহিনী গ্রীকদের দেবতাদেরও ছেড়ে দেয়নি। ওদেরকে হারিয়ে দিয়েছি।'

দূত চলে যেতে উদ্যত হয়েও দাঁড়িয়ে রইলো। গর্ব সম্রাটের সবচেয়ে বড়ো অবলম্বন এখন। আর অহংকারী মানুষকে কোনো কিছু বোঝানোর চিন্তা করা বৃথা। তার যতটুকু করা দরকার সে করেছে, বাকিটা সম্রাট যা ভালো বুঝবেন করবেন।

দূতকে এবার আর এমনিতেই যেতে বললেন না সম্রাট, আদেশ দিলেন, 'আমার সেরা বারো জন সেনাপতি এখন রোমেই আছেন। তাদেরকে আর সমরবিদ অভিজাতদের খবর দেবার ব্যবস্থা করো। আজ রাতেই আমি আলোচনায় বসবো। তুমি নিজেও থাকবে সেই আলোচনায়। তবে খবরদার, কিছুতেই ওদের সেনাবাহিনীর কথা রং চড়িয়ে বলবে না। কিছুতেই যাতে আমার সেনাপতিদের মনোবল ভেঙ্গে না পড়ে।' ভয় নিজেও পাচ্ছেন ট্রাজান, তবে দেবতার সাথে যুদ্ধ করার আর সেই যুদ্ধে জেতার এমন সুযোগ তো আর সবসময় পাওয়া যাবে না। রোমের অগুনতি সম্রাটদের মধ্যে তার নাম লেখা থাকবে আলাদা অক্ষরে।

'আজ্ঞে সম্রাট, আমি খবর পাঠাচ্ছি। আপনার কথা অবশ্যই পালন করবো। আমি রং চড়িয়ে আলোচনায় একটা কথাও বলবো না।'

যদিও দূত জানে, এতক্ষণ সে রং চড়িয়ে একটা কথাও বলেনি।

নিক্স বসে আছে নিজের ঘরে। প্রাসাদ এখন খুবই নিস্তব্ধ। কয়দিন খুব হইচই গেছে। যুদ্ধের প্রস্তুতি, নানা আলোচনা নিয়ে কম ব্যস্ততা হয়নি। প্রাসাদের দাসদাসীদের কাজও বেড়ে গিয়েছিল। ভেতরে এবং বাইরে দুই দলের দেখভাল করার কাজটা সহজ নয়। দলটা যখন প্রাসাদ ছাড়ে তখন সবচেয়ে খুশি হয়েছিল দাসদাসীরা। যাক, এবার কাজের বোঝা একটু হলেও কমবে। একটু আরাম পাবে শরীর।

তবে নিক্সের সেই সৌভাগ্য হয়নি। এতদিনের প্রাসাদের ছোটাছুটি তাকে স্পর্শ করেনি। সে নিজের ঘরেই ছিল নিজের মতো। শুধু সেদিন সকালে নিজের মতো থাকতে পারেনি। ঐ লোকটা, না-কি দেবতা, এসেছিল তার ঘরে, দেবতা হিসেবে তাকে সঙ্গিনী বানাবার কথা বলেছিল, শুধু বলেই ক্ষান্ত হয়নি, নিক্স তার সঙ্গিনী হবার যোগ্য কি না সেই পরীক্ষাও নিয়েছে। তার ইচ্ছের কোনো মূল্যই ছিল না, শুধু পরীক্ষা দিতে হয়েছে। পরীক্ষায় না-কি ভালোভাবেই উথরে গেছে সে। যুদ্ধের অবসানের পর তাকে নিয়ে যাওয়া হবে অলিম্পাসে।

দেবতা মিথ্যে বলে না, দেবতা মানুষের ওপর ইচ্ছে চাপিয়ে দেয়। মানুষের নিজস্ব কোনো ইচ্ছে থাকতে নেই, দেবতার ইচ্ছেতেই তাকে চলতে হয়। নিক্স অনেকবার ভেবেছে। কার কাছে প্রতিকার চাওয়া যায়। বাবাকে কিছু বলতে ইচ্ছে করেনি। মাকেও না। এতদিন তারা দুজন এই নগরের সর্বেসর্বা হিসেবে জীবন যাপন করেছেন। তারা নিজেদেরকে প্রায় ঈশ্বর ভাবতেন, আর এখন এক দেবতার আগমনে তাদের সেই ভুল ভেঙেছে। তার বাবার তো কিছুই করার নেই, দেবতার ইচ্ছেই তার কাছে এখন করণীয়। দেবতা যদি নিক্সকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তার বাবা রুখতে পারবেন বলে মনে হয় না।

তবে এভাবে তো বসে থাকা যায় না। নিক্স বসে থাকতে চায়ওনি। বাবাকে বলা যাবে না ঠিক আছে, কিন্তু যাকে সে ভালোবেসে ফেলেছে গভীরভাবে, যার সাথে বাকি জীবন কাটানোর জন্য মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করেছে, তার কাছে তো বলতেই হবে। কিন্তু তার দেখা পাওয়া বড়ো শক্ত। নিকোলাস এই যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতিতে সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব পালন করছে। সারাক্ষণ তাকে ছোটাছুটির মধ্যে থাকতে হয়। সেই অপ্রতুল সময় ভাণ্ডার থেকে নিক্সের জন্য কিছুক্ষণ সময় বের করা যথেষ্ট কঠিনই হয়তো।

নিক্স বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল নিকোলাসের সাথে দেখা করার জন্য। সেদিন সারা দিন চেষ্টা করেও কোনো দাসীকে দিয়ে নিকোলাসের দেখা পায়নি। তারপর বিকেল থেকেই সে অপেক্ষা করেছিল রাতের। সারা দিনের ক্লান্ত দেহ নিয়ে

নিকোলাস গভীর রাতে নিজের বিছানায় তো ফিরে আসবে। সেখানেই তার সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

নিকোলাস ঘরে ফিরেছে গভীর রাতে। কাজ করা আর কাজ দেখানোর মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। তোষামোদ করতে করতে ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করছে সে। তাদেরকে সারা জীবন প্রশিক্ষণে আত্মনির্ভরতা, গর্ব, মাথা উঁচু করা শেখানো হয়েছে। সেই শিক্ষা এক দিকে ঠেলে দিয়ে এখন তাকে শুধু দেবতার মনোরঞ্জন করতে হচ্ছে। ভেতর আর বাইরের এই দ্বন্দ্ব যে তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সবার সামনে তো আর সেই বিরক্তি প্রকাশ করার কোনো উপায় নেই, কিন্তু নিজের ঘরে তা করাই যায়। নিরুপায় হয়ে তোষামোদ করার গ্লানি ধুয়ে ফেলতে সে শুরু করলো ঘরে প্রবেশ করেই।

সারা শরীর মুছে ফেলে বিছানার কাছে যেতেই সে বুঝতে পারলো ঘরে এতক্ষণ সে একা ছিল না, আরেক জন আছে। আর তাকে দেখা মাত্র নিকোলাসের মুখটা আরও বিষাদ হয়ে উঠলো যেন। একটা তেতো স্বাদ যেন ছড়িয়ে গেল গলার ভেতর। মুখাবয়বেও সেই অনুভূতির ছাপ যে পড়েছে তা বলাই বাহুল্য।

সেই বিরক্তির ভঙ্গিকে নেহাত সারাদিনের ক্লান্তি আর পরিশ্রমজনিত বিরক্তি বলেই ধরে নিলো নিক্স, এগিয়ে এলো সে নিকোলাসের দিকে, 'তোমার জন্য কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। প্রতিদিনই কি এমন দেরি করে ঘরে আসো?'

নিকোলাস উত্তর দেবে না দেবে না করেও বলল, 'হ্যাঁ, কাজ সারতে এমনিতেই অনেক রাত হয়ে যায়।'

'তোমার সাথে আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।'

'এখন আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই যুদ্ধ। আর আমাদের বিয়ে তো পিছিয়ে গেছে। আমাদেরকে এখন ফলাফলের জন্য ভবিষ্যতের অপেক্ষা করতে হবে।' চাঁচাছোলা ভাষায় কথা বলছে নিকোলাস, সেই স্বরে কোনো প্রেম অথবা আবেগের স্থান নেই।

নিক্স এতকিছু বুঝতে পারছে না। সে চিন্তা করছে তার পরিণতি নিয়ে। চরম বিপদ ঘনিয়ে আসতে চলেছে তার ভাগ্যে। একমাত্র নিকোলাসই পারে তাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে, 'আমি কয়েকদিন ধরেই তোমাকে খুঁজছি। তুমি এত ব্যস্ত যে কিছুতেই দেখা পাচ্ছি না। আমার জন্য কি একটুও সময় নেই তোমার?'

নিক্সের অনুযোগ কে একটুও পাত্তা দিলো না নিকোলাস, 'আমাকে কেন খুঁজছিলে?'

'তোমরা যাকে দেবতা বলছো তার ব্যাপারে একটা কথা বলতে।' এবার নিক্সের গলায় বিষাদ ভর করেছে।

দেবতার নাম শুনে আগ্রহী হয়ে উঠলো নিকোলাস, 'কী কথা? সেই দেবতার সাথে কি তোমার দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, সেদিন সকালে আমার ঘরে এসেছিল। দাসদাসীরা কেউ ছিল না, সবাই ছিল প্রাসাদের নানা কাজে ব্যস্ত। প্রথমেই নানা রকম অদ্ভুত কথা বলতে শুরু করলো। আমাকে না-কি তার খুব পছন্দ হয়েছে, আমাকে এই যুদ্ধের পরে নিয়ে যাবে অলিম্পাসে, তার সাথে। সেখানে আমি হবো দেবতাদের রানী। তারপর সে আমার পরীক্ষা নিয়েছে। আমি কি তার রানী হতে পারবো কি না সেই পরীক্ষা।'

'কী পরীক্ষা নিয়েছে সে ঘরের ভেতর।'

নিক্সের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো, অন্য কারো সাথে, হোক সে দেবতা, তার সাথে নিজের শারীরিক সম্পর্কের কথাটা নিকোলাসকে বলতে বাঁধছে তার, কিন্তু কথাটা তো বলতেই হবে, নইলে ঘটনার গুরুত্ব নিকোলাস বুঝতে পারবে না, 'সে আমার সাথে মিলিত হয়েছিল। আমি একটুও বাঁধা দিতে পারিনি। সমস্ত শক্তি যেন আমার শরীর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। সেই মিলিত হবার পরীক্ষায় আমি না-কি উত্তীর্ণ হয়েছি। এই যুদ্ধের পরে আমাকে সে নিজের সাথে নিয়ে যাবে।'

নিক্সের চোখের জল নিকোলাসের চিন্তা একটুও টলাতে পারলো না, 'আমি এই ব্যাপারে কী করতে পারি? দেবতা যদি তোমাকে দেবী করতে চান, তাহলে আমার কিছুই করার নেই। এটা তো তোমার জন্য ভালোই হবে।'

'আমার জন্য ভালো হবে!' বিস্ময়ে যেন কাঁদতে ভুলে গেল নিক্স, 'তুমি এই কথা বলছ! আমি আমার বাবা মাকে এই ঘটনা না জানিয়ে তোমাকে জানিয়েছি। তুমি কি কোনো ব্যবস্থা নেবে না। আমরা একে অপরকে ভালোবাসি।' এবার নিকোলাসের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিক্স, 'আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। আমি তোমাকে বিয়ে করবো। তুমি ঐ দেবতাকে শাস্তি দেবে। কেন সে আমার সাথে এই আচরণ করলো? কেন সে আরেকজনের বাগদত্তাকে নিজের সঙ্গিনী করে পাবার আকাঙ্ক্ষা করে?'

তবু নিকোলাস অনড়, শুধু হাতটা একটু বাড়িয়ে নিজের বুক থেকে সরিয়ে দেয় নিক্সকে, 'তুমি ঐ দেবতার সম্পর্কে কিছুই জানো না, তাই এমন হাস্যকর কথা বলছো।'

মরিয়া হয়ে গেল নিক্স, 'হ্যাঁ, আমি জানি। ঐ দেবতার ক্ষমতার সব খবরই আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। আমি জানি তার বিরুদ্ধে কেউ কিছুই করতে পারবে না। আচ্ছা আমাদের কিছু করার দরকার নেই। তুমি আর আমি এই প্রাসাদ থেকে পালিয়ে যাবো। আজ রাতেই। অনেক দূরে চলে যাবো আমরা। যেখানে কোনো দেবতা আমাদেরকে খুঁজে পাবে না। আমি এই প্রাসাদ, রাজকীয় আরাম, দাসদাসী কিছুই চাই না। আমি শুধু তোমার সাথে থাকতে চাই। আমাদের ভালোবাসা বেঁচে থাকবে জীবন ভর।'

নিক্সকে এবার পুরোপুরি নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলো নিকোলাস, উচ্চারণ করলো সবচেয়ে নিষ্ঠুর বাক্য, 'ভুলের জগত থেকে বেরিয়ে এসো নিক্স। আমি তোমাকে ভালোবাসি না।'

চোখ স্থির হয়ে গেল নিক্সের, এই কথা শুনতে হবে তা ভুলেও চিন্তা করেনি সে, এবার তার গলার জোর অনেকটাই কমে এলো, 'তাহলে আমাদের এক সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো কি সব মিথ্যে?'

এবার আর নিকোলাস নিজেকে শান্ত রাখতে পারলো না, 'এমন শারীরিক মুহূর্ত তুমি না জানি কত পুরুষের সাথে কাটিয়েছ, তার কোন হিসেব নেই। তুমি কী মনে করেছ, আমি কিছুই জানি না। তোমার কিশোরী বয়স থেকে এখন পর্যন্ত কীর্তি কলাপ কিছুই আমার অজানা নেই।' এবার সে এগিয়ে এলো নিক্সের দিকে, চোখ নামিয়ে চোখ রাখলো তার চোখে, 'আর তোমার মতো মেয়ের জন্য কারো হৃদয় থেকে ভালোবাসা আসতে পারে না, একমাত্র ঘৃণাই বর্ষিত হতে পারে। আর আজকে জেনে রাখো, আমি তোমাকে ঘৃণা করি, তুমি একটা কুৎসিত শুঁয়াপোকা ছাড়া আমার চোখে আর কিছুই না।'

কথা শেষ করলো নিকোলাস। আর কিছুই শোনার বাকি নেই নিক্সের, সে উন্মাদের মতো আচরণ করলো না, চিৎকার করে কেঁদে উঠলো না, নিকোলাসের হাত পা ধরে নিজের ভালোবাসা বাঁচানোর চেষ্টাও করলো না। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো সে ঘর থেকে, নিকোলাস ওদিকে বলে চলেছে, 'এই নগরে কেউ তোমাকে বিয়ে করবে না। এই যুদ্ধের পর তোমার বাবা আর গভর্নর থাকবেন না। তাই দেবতার ভোগ্যা হওয়াই তোমার জন্য ভালো হবে। রক্ষিতা যখন হতেই হবে তখন মানুষের রক্ষিতা না হয়ে দেবতার রক্ষিতা হওয়াই ভালো।'

নিক্স সেই কথাগুলোর একটা বর্ণও শুনতে পেলো না, শোনার চেষ্টাও করলো না। ধীর পায়ে, ঘোর লাগা চন্দ্রগ্রস্থের মতো নিজের ঘরের বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। সেদিন রাতটা তার ওভাবেই কেটে গেল। তারপর যেদিন সকালে এরিস স্পার্টা থেকে নিজের বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে চলে গেল সেদিন সকালে প্রথম নিজের ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলো নিক্স। কিছুই ভালো লাগছে না দেখে চলে গেল প্রাসাদের চিড়িয়াখানার দিকে, লক্ষ্য করছে দাসদাসীদের সম্মান অনেকটাই কমে গেছে ওর প্রতি। সবাই কেমন উদাসীন আচরণ করছে।

চিড়িয়াখানার প্রধান পরিচারক ওকে দেখে অবশ্য তেমন কোনো ব্যবহার করলো না। এই দাসকে পছন্দ করতো নিক্স, তার সাথে ভালোই ব্যবহার করতো। দাস সম্মান প্রদর্শন করলো, নিক্স তার সামনে দাঁড়ালো, 'এখন থেকে আমি এখানে ওদের সাথে থাকবো। খাবার দেবো। তুমি যাও, অন্য দাসদের কাছে। শুধু রাঁধুনিকে বলবে জন্তুদের খাবার যাতে সময়মত নিয়ে আসে।'

দাস খুব খুশি হলো। এখন আর প্রাসাদে খবরদারি করার মতো কোন লোক নেই। দেবতা তাদের জন্য মানে দাসদের জন্য কী করবেন সেটা পরে দেখা যাবে, তবে এখন এই দেবতার জন্যই কয়েকদিন একটু আরামে শ্বাস ফেলা যাবে।

সেদিনের পরে আর দুই দিন কেটে গেছে। এই দুই দিন নিক্স এই চিড়িয়াখানাতেই ছিল। এখানেই প্রাণীদের খাবার দিয়েছে। মানুষের সঙ্গের চেয়ে ওদের সঙ্গ নিঃসন্দেহে তার এখন বেশি ভালো লাগছে। তাকে দেখলে এখন মনে হবে না, সেদিন সন্ধ্যায় কি ভয়ানক এক পরিস্থিতির সামনে পড়তে হয়েছিল তাকে। নিকোলাসের কথাগুলো যেন তীক্ষ্ণ বর্শার মতো ছেদ করছিল বুক। আসলে নিকোলাস তাকে কখনোই ভালোবাসেনি, সে বোকার হদ্দ দেখেই কথাটা বুঝতে পারেনি। একটু বুদ্ধি থাকলে সেদিন সকালে নিকোলাসের প্রাসাদের সেই ঘটনার পরেই বুঝে ফেলত সবকিছু। তার বাবা গভর্নর, ক্ষমতার জন্যই তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল নিকোলাস। এখন আর তার বাবার ক্ষমতা নেই, আর তার প্রতি অনুরক্ত থাকার দরকারও নেই নিকোলাসের।

একটা বিশেষ হরিণকে কিছু শস্য খাওয়ানোর সময় এসবই ভাবছে সে। হরিণটাকে খাওয়ানো হয়ে যেতেই ঠিক দুই দিন পরে চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে এলো সে বারান্দায়। এরই মধ্যে মা কয়েক বার তাকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাদেরকে ফেরত পাঠিয়েছে সে, রানী টায়রাও তাকে একটু একা থাকতে দিয়েছেন।

এই বারান্দায় কেউ নেই। একটু সময় নিয়ে সূর্যের আলো গায়ে মেখে নিলো সে। চারিদিকে দেখতে লাগলো চোখ ভরে। এই দৃশ্যগুলো তার কত চেনা, কিন্তু হঠাৎ করে এতটা আপন লাগছে কেন? কেন মনে হচ্ছে, এই রূপ-রস-আলো-স্পর্শ বিশেষ কিছু। সকালের খাবার রাখা আছে বারান্দার একটা আসনে। এখানে রাখারই আদেশ করেছিল সে। সেটা খাবার কোনো ইচ্ছে জাগ্রত হলো না তার মনে।

যথেষ্ট সূর্যের আলো গায়ে মাখা হয়েছে। আবার চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করলো সে। ঘরটার একেবারে শেষ মাথায় একটা বড়ো খাঁচা আছে। সেখানে এক চিতা বসে আছে একমনে। মাঝে মাঝে জিভ বের করে নিজের ঠোঁট আর থাবা চেটে নিচ্ছে। এই জায়গার বাকি প্রাণীর মতো এই প্রাণীটাও বিশেষ। এমনিতে চিতার শরীরে হলুদের ওপর কালো ছোপ থাকলেও এই চিতার সারা শরীরে কালোর বদলে সাদা ছোপ। ধবল রোগে আক্রান্ত এই বিশেষ চিতাকে পায়াস অনেক মুদ্রা খরচ করে কিনে এনেছেন।

নিক্স এগিয়ে গেল চিতার খাঁচার দিকে দৃঢ় পায়ে। খাঁচার দরজা খুলে ফেললো অভ্যস্ত হাতে। চিতাটা ওকে ভেতরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। এমনিতে সে

নিক্সের পোষা, তবে এমন সময়ে তো তার কাছে নিক্সের আসার কথা না, আসার কথা আরেকজনের।

এমন সময় চিতাটা আরেকজনকে আশা করছে। প্রতিদিন দুই বেলা নিয়ম করে খাবার খায় সে, কিন্তু গত দুই দিন নিক্সই এখানে সবাইকে খাইয়েছে, কিন্তু তার খাঁচায় কোন খাবার আসেনি। অভ্যাসের তাড়নায় গত দুই দিনে চিতার ক্ষিধে চরম আকার ধারণ করেছে। এমনিতে জঙ্গলে এত কম সময়ে খাবারের দরকার হয় না, কিন্তু খাঁচায় থেকে চিতা জঙ্গলের গুণ কবেই হারিয়ে ফেলেছে।

নিক্স এগিয়ে এসে চিতার পাশে বসলো। তার কানে বেজে উঠলো এই চিতার মালিকের কথাটা- পোষ মানানো চিতার কাছে সব সময় যাওয়া যাবে, সেটা নিরাপদ, একমাত্র তীব্র ক্ষুধার্ত থাকলেই সেখানে ভয়ের কারণ আছে, নয়তো নয়।

গত দুই দিন নিক্স এই ঘরের সবার খাবারের দায়িত্ব নিয়েছিল, কিন্তু এই চিতাকে একবারও খাবার দেয়নি। আজকে দেবে।

নিক্সের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে চিতা। বারবার নিজের থাবা চেটে নিচ্ছে। একটুও ভয় লাগছে না নিক্সের। সে গিয়ে বসলো চিতার পাশে। নিক্সের প্রতি আবেগ আচরণ প্রকাশ করলো না চিতা। তাকে বাঁধা দিচ্ছে ক্ষিধে। তার এখন আদর না, খাবার দরকার।

নিজের শরীরের পোশাক একে একে খুলে ফেলছে নিক্স। ছোটবেলা থেকে যৌনতা সে উপভোগ করেছে নিজের ইচ্ছেমতো। এই শরীরকে কখনো ক্ষুধার্ত থাকতে দেয়নি। আর সেই কলঙ্কই তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত। জীবনে যার প্রতি সে সবচেয়ে বেশি অনুরক্ত হয়েছিল, সেও তাকে ত্যাগ করেছে এই অপবিত্র শরীরের জন্য, এই বহুগামী যৌনতার জন্য।

এই শরীর আজকে ত্যাগ করবে সে। আজকেই সেই দিন। এই অপবিত্র শরীর সে ত্যাগ করবে এই যৌনতার মাধ্যমেই।

এই চিতাকে সে আদর করার প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, সব কাপড় খুলে সে জড়িয়ে ধরল চিতার শরীর। চিতা ঠিক পছন্দ করতে পারলো না ব্যাপারটা। সে নিজেকে ছাড়াতে চাইলো, কিন্তু নিক্স ছাড়তে নারাজ, আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল চিতার দেহ। তার ধারালো নখের আঁচড়ে মৃদু আর্তনাদ করে উঠতে লাগলো চিতা, আস্তে আস্তে উত্তেজনা বাড়তে লাগলো নিক্সের, শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে লাগলো সে। একসময় সে চিতার গলায় বসিয়ে দিলো দাঁত, কামড়ে ধরলো ভীষণ শক্তিতে। সেই সাথে বাঘের পিঠে বসে গেল দুই হাতের দশ নখ।

এই আচরণ চিতার জন্য সম্পূর্ণ নতুন। ব্যথায় চিৎকার করে ওঠার পাশাপাশি এবার আত্মরক্ষায় ব্রতী হলো সে। ঝেড়ে ফেলে দিলো সে নিক্সকে প্রচণ্ড জোরে। কিন্তু নিক্স ততক্ষণে উন্মাদ হয়ে গেছে। একটা চিৎকার করে সে ছুটে এলো চিতার দিকে।

এটাকে আক্রমণ হিসেবেই ধরে নিলো চিতা। আর এবার সে ভুলে গেল সে পোষা আর নিক্স তার মালিক। বন্যতা ফিরে এলো তার মাঝে। ক্ষিধে আর ভয় পোষ মানানো পশুকে বন্য করে দিলো। নিক্সের গলা লক্ষ্য করে মোক্ষম থাবা চালালো সে। নিক্স সেই ভীষণ আঘাতে পড়ে গেল মাটিতে। চিতা তাকে এবার কোনো সুযোগ দিলো না। লাফিয়ে এসে মোক্ষম কামড় দিলো গলা লক্ষ্য করে। সাথে সাথে তার জিভ পেলো উষ্ণ মনুষ্য রক্তের স্বাদ, সাথে সাথে সে বুঝতে পারলো এই পর্যন্ত যত খাবার খেয়েছে তার মধ্যে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। রক্তে লম্বা চুমুক দিলো সে।

শেষ নিঃশ্বাস বেরোতে খুব কম সময় লাগলো নিক্সের। তবে সেই নিঃশ্বাসে যন্ত্রণা ছিল না, আর্তনাদ ছিল না, মুখে হাসি নিয়েই মরেছে সে।

রাহু শুধু শুধু ভয় পেয়েছিল। এই কয়দিনে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু পুরো প্রাসাদে সেনারা আর দাসেরা চলাফেরা করতো নিরন্তর। এমনকি গভীর রাতেও তাদের কাজ চলতো। একটা পুরো যুদ্ধের ব্যবস্থা করা এত কম সময়ে-সহজ কথা নয়। কিছুতেই সুযোগ পায়নি রাহু। এমন কিছু করতে গেলে তখন ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তার কেবল একটাই ভয়, তাকেও যদি এরা যুদ্ধে নিয়ে যায়।

কিন্তু সেই ভয় সে অকারণেই অনুভব করেছিল। এমনিতেও এই যুদ্ধের সেনাপতি সাধারণ মানুষের বাহিনীর ওপর তেমন গুরুত্ব দেননি। তাদের কাজ কেবল পথ দেখানো আর তাদেরকে সঙ্গ দিয়ে সাহায্য করা, খেদমত করা। যারা মোটামুটি যুদ্ধ করতে পারে তাদেরকেই তারা নিয়ে গেছে যুদ্ধে। রাহু যুদ্ধে পটু লোকজনের তালিকায় পড়ে না, আর তাকেও যেতে হয়নি। কেউ তার দিকে আঙুল তুলবে দূরে থাক, ফিরেই তাকায়নি। তাতে রাহুর মনে একটুও কষ্ট লাগেনি। মাঝে মাঝে জীবনে অনাহুত, অপাংক্তেয় হতে পারলেই ভালো।

ওরা যুদ্ধযাত্রা করেছে বেশ কয়েক দিন হয়ে গেছে। এর মধ্যেই নিজের পরিকল্পনা সাজিয়ে নিয়েছে রাহু। তাকে এখনো স্বর্ণমুদ্রা বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। তাতে অবশ্য তার কিছুই যায় আসে না। এখন আর প্রাসাদে তেমন প্রহরীর আধিক্য নেই। আর তাকে কেউ পাহারা দেবে না, সে এখন দাস এবং প্রহরী দুই দলেরই নিজের লোক। নির্বিঘ্নে নিজের কাজ সেরে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে।

প্রথমেই নিজের পরিকল্পনাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিয়েছে সে। এখান থেকে বেরোতে হলে প্রথমেই জোগাড় করতে হবে সম্পদ। নিজের ভাগের পাঁচশ স্বর্ণমুদ্রা তো নিতেই হবে, আর সেই প্রক্রিয়ায় যদি হাতে বাড়তি কিছু আসে সেটাও ফেলে যাওয়া যাবে না। তাই করতে হবে প্রথমে।

তারপর জোগাড় করতে হবে খাবার। আসার সময়েই দেখেছে, স্পার্টার বন্দর থেকে নগর বেশ খানিকটা দূরের রাস্তা, আর সেই রাস্তায় ঘন জঙ্গল। আর এমনিতেও প্রাসাদ থেকে পালানোর পর সে কোনো মানুষ অথবা বসতির সামনে পড়তে চাচ্ছে না। কোনোক্রমে বন্দরে গিয়ে জাহাজ ধরতে হবে। তাই সাথে থাকতে হবে যথেষ্ট শুকনো খাবার, অন্তত যাতে জাহাজে ওঠা পর্যন্ত টিকে থাকা যায়। খাবার জোগাড় করতে হবে বেশ কয়েকদিন ধরে, নিজের ভাগের খাবার থেকে কিছু কিছু করে অপচনশীল খাবার জমিয়ে নিতে হবে। রাঁধুনি খুব চালাক। ভাঁড়ার অথবা রান্নাঘর থেকে খাবার চুরি করলে অবশ্যই সে ধরা পড়ে যাবে।

এরপরে কিছু কাপড়চোপড়ও সাথে নিতে হবে। বাইরে নিশ্চয়ই প্রাসাদের চেয়ে বেশি ঠান্ডা থাকবে, তাই জোগাড় করতে হবে গরম কাপড়।

প্রথমেই খাবার জোগাড় করার দিকে নজর দিলো রাহু। যুদ্ধযাত্রা যেদিন হলো তার পরদিন সকাল থেকেই শুরু হলো সেই কাজ। মানুষ কমে গেছে দেখে রাঁধুনি সবাইকেই একটু বেশি করে খাবার দিচ্ছে, ভাগ্য সুপ্রসন্ন। কিছু কিছু করে খাবার জমিয়ে দুই দিনেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করে ফেললো সে। একটু চুরিও করেছিল, তবে সেটা অন্য দাসেদের না খাওয়া খাবার থেকে।

দুই দিনে কাজ শেষ হয়ে যাওয়াতে এবার পরের কাজে নজর দিলো সে। সবচেয়ে কঠিন কাজটা বাকি এখনো। গরম কাপড়ও সহজেই জোগাড় হয়ে গেছে।

অনেক দিন ধরে লক্ষ্য করেছে সে। রেকি করার কাজটা সে বেশ ভালোই করতে পারে। একটা ছেঁড়া সুতো সব জায়গাতেই একটা না একটা থাকে। এখানেও সে রানী টায়রার তৃতীয় শয়ন কক্ষের দাসীর একটা দুর্বলতা খুঁজে পেলো।

দুর্বলতা অবশ্য খুব বেশি কিছু না। প্রাসাদের অনেক দাসীরাই দাসদের সাথে সময় ও সুযোগ বুঝে একটু দৈহিক আনন্দে অংশ নেয়। সবারই এমন গোপন সঙ্গী আছে। এই দাসী তক্কে তক্কে থাকে। রানী টায়রা স্নান করতে অনেকটা সময় নেন। আর রানী স্নানে ঢুকলেই দাসী বেরিয়ে যায় নিজের গোপন জায়গার উদ্দেশ্যে, সেখানে আগের থেকেই খবর পেয়ে অপেক্ষা করে পুরুষ।

অনেক বার ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে রাহু। না, কোনো ভুল নেই। তারপর সেদিন সন্ধ্যার পড়ে রানী যখন সান্ধ্য স্নানে প্রবেশ করলেন, দাসী সব বুঝে চলে গেল অভিসারে। রাহু চট করে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে প্রবেশ করলো তৃতীয় শয়ন কক্ষে। রানীর স্নান আর দাসীর অভিসারের সময়ের ক্ষেপণ তার মুখস্ত হয়ে গেছে। যথেষ্ট সময় নিয়ে সে সিন্দুক খুলে ফেললো। সিন্দুকের বন্ধ ডালা খুলতে হলো না। ওপরের খোলা অংশের মধ্যেই পাওয়া গেল অনেক গয়না। সেসবে তেমন একটা লোভ করলো না রাহু। শুধু মোক্ষম আকারের মণি মুক্তা খচিত একটা গলার হার নিজের পোশাকের ভেতরে চালান করে দিলো। তারপর একটু হাত চালাতেই কাঙ্ক্ষিত বস্তু খুঁজে পেলো সে। একটা বেশ মোটা মুদ্রার থলি। রানীর ব্যবহার করা সব সিন্দুকেই এমন থলি থাকে। রানীর আবার গয়না কেনার বাতিক আছে। বড়ো বড়ো রত্ন ব্যবসায়ীরা সরাসরি রানীর সাথে দেখা করে।

থলির ওজনটা আরেক বার মেপে নিলো রাহু। না, সে জীবনে খুব বেশি স্বর্ণমুদ্রার মালিক না হলেও স্বর্ণমুদ্রা অনেক স্পর্শ করেছে। এই থলিতে তার পাঁচশো মুদ্রার বেশিই আছে বলে মনে হচ্ছে।

আর দেরি করলো না সে। বিপজ্জনক জায়গায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় অবস্থান করা নির্বুদ্ধিতা। বেরিয়ে এলো সে শয়ন কক্ষ থেকে। আজ রাতেই বেরিয়ে যেতে হবে এই প্রাসাদ থেকে। নিজের ঘরে এসে বেশ সাবধানে পোশাকের ভেতরে

গয়না আর মুদ্রার থলি লুকিয়ে রাখল সে। বাইরে থেকে কেউ খুঁজে পাবে না, এমনকি সাধারণ তল্লাসি করেও পাওয়া যাবে না। খাবারের পুঁটুলিটা জায়গার অভাবে লুকানো গেল না। তবে এমন ভাবে নিলো যাতে কেউ এটাকে খাবারের পুঁটুলি বলে সন্দেহ না করে। অবশ্য কারো সামনে পড়ার ইচ্ছে নেই তার, কোনোমতে পড়ে গেলেও যাতে সন্দেহ না করতে পারে সেজন্যই এত ব্যবস্থা।

সবকিছু তৈরি হতে একটু রাত হয়ে গেল। বেরোবার জন্য এখনই প্রশস্ত সময়। স্বাভাবিকভাবেই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো রাহু। একটা গোপন দরজা আছে দেওয়ালের দিকে, সেদিক দিয়েই যাবে, এক বুড়ো দাসকে একটু তোল্লাই দিয়ে রাস্তাটার খবর জোগাড় করেছে সে। ভাগ্য আর একটু সাথে থাকলেই হবে।

প্রাসাদের প্রধান ভবন পার হয়ে বেরিয়ে এলো সে, দরজাটা আর খুব বেশি দূরে নয়, ঠিক তখনই কে যেন তাকে পেছন থেকে ডেকে উঠলো, 'রাহু?'

বুকটা ধরাস করে উঠলো রাহুর। চমকে উঠলো না অনেক কষ্টে। আস্তে করে ঘুরলো। এক দাস দাঁড়িয়ে আছে, সেই ডেকেছে।

যাক, একজন দাস। কোনো প্রহরী নয়। রাহু এগিয়ে এলো আস্তে আস্তে। দাস দ্রুত হেঁটে তাকে ধরলো, 'আরে তোমাকেই তো খুঁজছি।'

'কেন?' সন্দিগ্ধ গলা রাহুর।

'আরে, আমাদের তো এখন অনেক আনন্দের সময়। আজ রাতে অনেকটা মদ জোগাড় হয়েছে। আমাদের হাতে বানানো খারাপ স্বাদের মদ নয়। রাজকীয় মদ। আর মদ খেতে বসলে তুমি না হলে কি চলে। তোমার মজার গল্প না শুনতে পারলে নেশাটা ঠিক জমে না। এজন্যই তোমাকে দরকার।'

নিজের রসিক স্বভাবের ওপর এত রাগ রাহুর আর কখনোই হয়নি। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সে।

এবার দাসের নজর গেল রাহুর হাতের পুঁটুলির দিকে, 'এটা আবার কী তোমার হাতে?'

এবার আমতা আমতা করতে লাগলো রাহু, 'না, মানে, এটা একটা'

রাহুর কথা শেষ করতে দিলো না দাস, 'বাদ দাও। কাজ পরেও করা যাবে। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, এদিকেই তো ধোপাখানা, এই রাতের বেলা তুমি কাপড় ধুতে যাচ্ছ। চিন্তা কোরো না। কাল সকালে তোমার কাপড় আমি ধুয়ে দেবো। চলো এখন আমার সাথে।'

না গিয়ে উপায় নেই। আসরে গিয়ে উপস্থিত হলো রাহু। বসতেই পেটের কাছে স্বর্ণমুদ্রার খোঁচা লাগলো। জীবনে কখনো এতটা বিতৃষ্ণা নিয়ে মদের পেয়ালায় চুমুক দেয়নি সে।

তবে মদের মাদকতা একটু পরেই ছড়াতে শুরু করলো। রাহু নিজের কোমরের কাছে গোঁজা মুদ্রা আর অলংকারের কথা বেমালুম ভুলে গেল এক সময়,

নানা ধরনের অশ্লীল কৌতুক বেরিয়ে আসতে লাগলো তার মুখ থেকে, পেট যতই ভরতে লাগলো ঝাঁঝালো তরলে ততই অশ্লীলতার মাত্রাও বাড়তে লাগলো। শেষ পর্যন্ত গলা পর্যন্ত গিলে ঘরের এক কোণায় শুয়ে পড়লো রাহু। তার পরিকল্পনা আর পুঁটুলি দুইই গড়াগড়ি খেতে লাগলো ঘরের ধুলোয়।

সকালে বেশ হট্টগোলেই ঘুম ভাঙলো রাহুর। রোদ তখন অনেকটা চড়ে গেছে। কাল রাতের মদিরার আবেশ এখনো দেহ মনে পুরোপুরি রয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ সে বুঝতে পারলো না, কোথায় আছে সে, আর তার করণীয় কী। আস্তে আস্তে সব মনে পড়তে লাগলো তার। কাল রাতে পরিকল্পনার বারোটা বাজিয়ে সে মেতে ছিল মদে। সবকিছু মনে পড়তেই তার হাত চলে গেল কোমরে। নাহ, ওখানে দুটো জিনিস ঠিকই আছে।

হট্টগোল ক্রমেই বাড়তে লাগলো। এর মধ্যে দুটো কথা কানে এলো তার, 'রাজকুমারীকে বাঘে মেরে ফেলেছে।' 'রানী অজ্ঞান হয়ে গেছে।' বাকি কথাগুলো সে বুঝতে পারলো না। তবে কী হয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছে। ঐ চিড়িয়াখানায় বাঘ ভাল্লুকও আছে। সেই বাঘ নিশ্চয়ই বাগে পেয়েছিল রাজকুমারী নিক্ককে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে। প্রাসাদের দাসদাসীরা এত বড়ো ঘটনার পড়ে কেউই দাঁড়িয়ে নেই। সবাই এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছে, কেউ বা রানীকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কেউ নেতৃত্ব দিতে পারছে না।

চিড়িয়াখানার ওদিক থেকেই হট্টগোলের শব্দ ভেসে আসছে বেশি। একবার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে সেদিকে যেতে উদ্বুদ্ধ করলো, কিন্তু সাথে সাথে নিজেকে সামলে নিলো সে। হঠাৎ করেই তার মাথা বুঝতে পারলো, এটাই পালাবার সুবর্ণ সুযোগ। এখন কেউই তার দিকে নজর দেবে না। এত বড়ো ঘটনার সাহায্য তাকে নিতেই হবে। একটু চোখ বোলাতেই ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকা নিজের পুঁটুলিটা দেখতে পেলো সে। তাড়াতাড়ি বগল দাবা করলো সেটা। রাজকুমারী গোল্লায় যাক। এবার আর গোপন দরজার দিকে গেল না সে। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলো একেবারে সামনের দরজা দিয়ে। কোনো প্রহরী এখন সদর দরজায় নেই। আর থাকলেও এমন অবস্থায় তার দিকে কেউ নজর দেবার সময় পেতো না।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে নগরের বাজারের মধ্যে প্রবেশ করতে তার বেশি সময় লাগলো না। পেছনে এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার তাকিয়েছে সে, কিন্তু না, কেউই তার পেছনে আসছে না। বাজারে লোকজন তেমন নেই। এমনিতেও দেবতার আগমনে মানুষ বেশ ভয় পেয়ে গেছে। তারা চলে গেলেও সেই ভয় খুব একটা কমেনি। এখন বাজারে যেমন গমগম থাকার কথা তেমন নয়। বাজার পেরিয়ে জঙ্গলের রাস্তায় এসে পড়তে তেমন কোনো সমস্যা হলো না।

এবার একটু মনোযোগ দিতে বাধ্য হলো রাহু। আসার সময় জেইসের সাথে এসেছিল সে। কিন্তু পুরোপুরি জেইসের ওপর নির্ভর করেছে এটা বললে ভুল হবে।

রাস্তাটা মাথায় গেঁথে নিয়েছিল, মানচিত্র আঁকার যেটুকু বিদ্যা আছে সেটা কাজে লাগিয়ে একটা খসড়া এঁকেও রেখেছিল, এখন কাজে লাগলো সেটা। খসড়াটা বের করে একটু মিলিয়ে নিতেই জঙ্গলের রাস্তাটা খুঁজে পেলো সে। এটা ধরে গেলেই বন্দরে পৌঁছে যাবে। রাস্তাটা একটু লম্বা, তবে সাথে পর্যাপ্ত খাবার আছে, সমস্যা হবে না।

হাঁটতে শুরু করলো রাহু। তারপর প্রকৃতির ডাক এলো তার। কাল রাতের মদিরা এখন হজম হয়ে তার শরীর ত্যাগ করতে চাইছে। একটা জায়গার সন্ধান করলো রাহু। প্রকৃতির ডাকে সারা দিয়ে নির্বিঘ্নে বসে একটু খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে হবে।

মানচিত্রে দাগ দিয়ে রাখা জলের উৎস একটু কষ্ট হলেও খুঁজে পেলো সে। তারপর পুঁটুলি নামিয়ে রেখে চলে গেল ঝোপের ভেতর। কাজ সেরে হাতে জল মেখে ফিরে এলো আবার পুঁটুলির কাছে। তবে সেখানে আসতেই তার চোখ থমকে গেল।

যাবার সময় জায়গাটা যেমন জনমানবহীন রেখে গিয়েছিল এখন আর তেমন নয় পরিস্থিতি। মোটামুটি আট থেকে দশ জন তাকে আর তার খাবারের পুঁটুলি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরকে দেখেই বুঝতে পারলো ওরা গ্রীসের অভিজাত নয়, নিশ্চিত ভাবেই হেলট। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে হেলটদের দলের সবার হাতে অস্ত্র থাকে না। বিশেষ অনুমতি ছাড়া অস্ত্র বহন করার অধিকার নেই তাদের।

অবশ্য এদের ভাবভঙ্গি দেখেই সে বুঝতে পেরেছে এরা ওসব অধিকার অথবা অনুমতির ধার ধারে না। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারলো এরা কারা। সেই সাথে তার শরীর হিম হয়ে এলো। এদের কথা প্রাসাদে থাকার সময় তার কানে এসেছিল। এরা সবাই বিদ্রোহী দাস। জঙ্গলের ভেতরে এসে ডাকাত হয়ে গেছে। এদের হাতে যে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে সেই ধারণা কিছুতেই তার মাথায় আসেনি। পরিকল্পনায় একটা বড়ো গলদ হয়ে গেছে।

দলের একজন হেলট এগিয়ে এসে ওর পুটুলিটা খুলে ফেললো, সেখানে পাওয়া খাবারগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো, বোঝাই যাচ্ছে তেমন খুশি হলো না। রাহু মাথা ঠান্ডা রেখে বলতে লাগলো, 'আমি সাধারণ নাবিক। এগুলো আমার খাবার, বন্দরের দিকে যাচ্ছি।'

পরীক্ষা রত হেলট একটু হাসলো, তুমি তো এদিকের কেউ নও। সন্দেহজনক। তারপর আবার বলছ মিথ্যে কথা।'

কথাটা একেবারে কাঁপিয়ে দিলো রাহুকে। চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো সে। বিপদ থেকে বাঁচার এখন একটাই উপায় আছে। চোখ যেদিকে গেল, সেদিকে ঝেড়ে দৌড় দিলো সে। হেলটেরা সাথে সাথে পিছু নিলো তার।

এসব জঙ্গলের মধ্যে রাহুর চলাচল করার অভিজ্ঞতা নেই, এক সময় সে ধরা পড়ে যেতে বাধ্য। তবে তাকে হেলটেরা ধরাশায়ী করার আগে এই জঙ্গলই ধরাশায়ী করে ফেললো, একটা বেরিয়ে থাকা শেকড়ে পা বেঁধে হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে। পায়ের হাড় ভাঙার আওয়াজ নিজের কানে শুনতে পেলো স্পষ্ট।

হেলটেরা দৌড়ে এসে ততক্ষণে ঘিরে ফেলেছে তাকে। তবে সবাই বুজতে পারলো এই মিথ্যেবাদী নাবিকের এখন আর পালানোর উপায় নেই। একটু পড়ে রাহু আর চিৎকার করতে পারলো না, গোঙাতে লাগলো সে। একজন পরীক্ষা করে দেখল রাহুর পা, রায় জানালো একবার দেখেই, 'ভেঙ্গেছে।'

তারপর রাহুর কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'দেখলে তো মিথ্যে বলার শাস্তি। পা ভেঙ্গে গেল। নাবিকেরা ভিনদেশে কখনো একা চলাফেরা করে না, এই সত্যটা তুমি জানতে না বলেই মিথ্যেটা বলেছ।'

রাহুর প্রতিবাদ করার অথবা অন্য কোনো কথা বলার কোনো সামর্থ্য অথবা ইচ্ছে নেই। সবাই মিলে একটা ডালপালার খাটিয়া বানিয়ে তাকে তুলে নিলো। আস্তানায় নিয়ে যেতে হবে। তারপর সর্দার যা ব্যবস্থা করার করবেন।

কলিনের সামনে নিয়ে আসা হলো রাহুকে। রাহুর দিকে একবার তাকিয়ে স্মৃতির পাতায় যেন একটা টোকা পড়লো কলিনের। কোথায় হয়তো শুনেছে সে এমন চেহারার একজনের বর্ণনা, কিন্তু মনে করতে পারলো না। সেদিকে চিন্তা করার সময়ও এখন নেই। হেলট সৈন্যদের কয়েকটা দল খুঁজে পাওয়া গেছে, বাকিগুলো খোঁজার কাজ চলছে পুরো দমে। সেই কোথায় ফিরে গেল কলিন, রাহু অযত্নে পড়ে রইলো এক কোণে, 'তোমরা হেলট বিদ্রোহীদের আর কোনো দল খুঁজে পেয়েছ?'

দলের সবাই না সুচক মাথা নাড়ল। বিরক্ত হলো কলিন, 'কাজের কাজ কিছুই হলো না, কোত্থেকে ধরে নিয়ে এলে এক আপদকে।'

রাহু তখনো পায়ের ব্যথায় গোঙাচ্ছে। কলিন ভাবছে এখন আর কোনদিকে লোক পাঠানো যায়। ঠিক তখন একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার জঙ্গলের চারপাশ যেন একেবারে স্তব্ধ করে দিলো, সবাই চমকে উঠতে বাধ্য হলো। কলিন অবাক হয়ে দেখল, চিৎকার করেছে অসিত। শেইরনের সাথে আসা ছোটো ছেলেটা। তার চোখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠেছে। এক দৃষ্টে সে চেয়ে আছে খাটিয়ায় শোয়ানো লোকটার দিকে। ঠিক তখনই আচমকা কলিনের মনে পড়ে গেল খাটিয়ায় শুয়ে থাকা লোকটার পরিচয়। এই লোকটাই ওদের বানর চুরি করে এনেছে।

অসিতের শরীরে যেন অসুর ভর করলো, তীব্র গতিতে সে ছুটে এলো রাহুর দিকে। এতদিনের জমানো সব কষ্ট, ক্রোধ এক সাথে বেরিয়ে আসতে চাইলো যেন, কলিন তাড়াতাড়ি এসে জড়িয়ে ধরতে চাইলো অসিতকে, নইলে একটা খুনোখুনি হতে বাধ্য। অসিত কলিনের বাধাকে গ্রাহ্য করলো না, এক ঝটকায়

সরিয়ে দিলো, আরও দুজন দাস ধরতে চেষ্টা করলো অসিতকে, কিন্তু ওরাও ছিটকে পড়লো হাত পাঁচেক।

রাহু বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে অসিতের দিকে। এই চেহারা সে কিছুতেই ভুলবে না। তবে কি ব্যথার চোটে ভুলভাল দেখছে সে? সেই ইন্দ্রপুরের ছোটো সাধারণ ছেলে এখানে কীভাবে আসবে? মাথায় কিছুই ঢুকছে না তার।

তবে এটা যে তার ব্যথার ঘোরে দেখা কোনো ভুল দৃশ্য নয় সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল যখন অসিতের দুই হাত বজ্র হয়ে চেপে বসলো তার গলায়। চাপের চোটে চোখ যেন ঠিকরে বের হবার উপক্রম হলো রাহুর। শ্বাসরোধ অথবা গলার হাড় ভাঙাই এখন তার নিয়তি।

ঠিক সে সময় একটা জোরালো টান অসিতকে সরিয়ে নিলো রাহুর ওপর থেকে। রুদ্রদেবকেও ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইলো অসিত, কিন্তু রুদ্রদেব ওকে ধরে রেখেছে শক্ত করে, বিশেষ প্যাঁচে, অসিত ছুটতে পারলো না।

অসিতের কানে কানে বলছে রুদ্রদেব, 'শান্ত হও অসিত। আমি জানি জীবনে মাঝে মাঝে ক্রোধ নিবারণ করা খুবই কঠিন, কিন্তু তাহলে আমার শিক্ষা আর তোমার এতদিনের যোগাভ্যাস যে ব্যর্থ হয়ে যাবে। ক্রোধ নিবারণ করো।'

অসিত ফুঁসে উঠছে, 'ওকে ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না। ওকে আমি মেরে ফেলবো।'

'তুমি ক্ষত্রিয় অসিত। নিরস্ত্র, অসহায় কাউকে হত্যা করা তোমার শোভা পায় না। একজন ক্ষত্রিয় সবসময় ক্ষত্র ধর্মের পালন করে। ওকে শাস্তি দেবো আমরা। যদি প্রাণদণ্ড ওর শাস্তি হয়ে থাকে তবে তাই হবে। কিন্তু এমন ভাবে না। ওকে নিজের পাপ স্বীকার করতে হবে, বুঝতে হবে, তারপর সে শাস্তি পাবে। ক্রোধ শান্ত করো।'

অসিতের শ্বাস আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এলো। অসিতকে ছেড়ে এবার রাহুর দিকে এগিয়ে গেল রুদ্রদেব। এই চেহারা দেখার একটা কৌতূহল তার মধ্যেও আছে। কম তো ঝক্কি যায়নি এই লোকের জন্য। রাহু মুখ হাঁ করে দম নিচ্ছে।

লোভের বলি চোখের সামনে দেখছে রুদ্রদেব। অঙ্গদ অবশ্যই প্রার্থনীয় বস্তু, তবে মানুষকে কোনো কিছু অর্জনের পেছনে ছোটার আগে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে, সেটা রাখার জন্য উপযুক্ত পাত্র তার কাছে আছে কি না। সুযোগ পেলেও কোনো দরিদ্রের যেমন হাতির মালিক হওয়া উচিত নয়, রাহুরও উচিত হয়নি অঙ্গদের মালিক হওয়া। এই তার শেষ পরিণতি। কর্ম কাউকে ছাড় দেয় না।

রুদ্রদেবের মনে হচ্ছে কথাটা, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করে। কর্ম নির্ধারণ করে ভবিষ্যৎ। রিপুর বশবর্তী হয়ে ইন্দ্রিয় উপাসনা করে গেলে একদিন সেই ইন্দ্রিয় কালসর্প হয়ে ছোবল দেয় একেবারে কপালে।

পাত্রাসে আধাবেলার যুদ্ধ করে এরিস কিছুটা আনন্দ পেয়েছিল। তবে সেখান থেকে এই সমুদ্র যাত্রা তার খুব একটা ভালো লেগেছে তা বলা যাবে না। সমুদ্রকে প্রথম থেকেই তার ভালো লাগতো না। যেমন লাগতো না মৃত্যুর রাজ্য পাতালকেও। প্রধান তিন দেবতা এই তিনটে স্থানের অধিকারী। অলিম্পাসে থাকার দরুন এরিসের লোভ শুধু জিউসের অধিকার করে থাকা রাজ্যের দিকে। এই পৃথিবী তার পদতলে আসবে। জিউস-সহ যেসব দেবতারা ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাদের ঘুমকে চিরস্থায়ী করে দেবে সে। নিজের অনুগত দেবতা তৈরি করবে।

সেসব ভাবনাকে একটু লাগাম দিতে হলো যখন সামনে রোমের ভূমি চোখে পড়লো। সাধারণ নাবিক আর কিছু সমুদ্র বিশারদদের ক্ষমা করেছিল এরিস পাত্রাসে। যদিও সেসব নিজের স্বার্থেই। ওরাই জাহাজগুলো চালিয়ে নিয়ে এসেছে। সাধারণ নাবিকেরা এখনো ভূমি দেখতে পাচ্ছে না। তবে দৈবিক দৃষ্টি ক্ষমতায় এরিস ঠিকই দেখছে।

ঘোষণা করলো এরিস, 'আর বেশি দেরি নেই। আমরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ফেলেছি। ঐ শক্তিশালী রোমান বাহিনীর সাথে লড়াইয়ের আর অল্পই বাকি। এই কাজটাও আমাদের কোনো ধরনের সময়ক্ষেপণ না করেই শেষ করতে হবে।'

পায়াস এবার একটু একটু ভয় পাচ্ছেন। তিনি যা করছেন তা স্পষ্ট বিদ্রোহ, রাজদ্রোহের সামিল, যদি একবার ট্রাজান এই যুদ্ধে কোনোমতে জিততে পারেন, তাহলে তার পরিণতি অত্যন্ত সঙ্গিন। রোমানদের নিজস্ব ভূমির কাছে আসতেই রোমান শৌর্যের কথা মনে পড়লো তার।

তবে ভয় একমাত্র মনে হচ্ছে পায়াসই পাচ্ছেন। অন্য কারো ওপর কোনো হেলদোল নেই। এই জাহাজে আমাজনরা আছে, দুটো দানবও আছে, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিকওদিক, কিন্তু তাদের মুখে আসন্ন যুদ্ধের কিছুমাত্র চিন্তা নেই। এমনকি পায়াস আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন, তার নিজস্ব যে সেনারা যুদ্ধে এসেছে তারাও আছে বেশ ফুরফুরে মেজাজে। অবশ্য ওদের তো কোনো ভয় নেই। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন, ওরা তো আর করছে না। ওরা তো কেবল তার আদেশ পালন করছে অক্ষরে অক্ষরে।

একটু পরে সাধারণ মানুষদের চোখেও ধরা দিলো ভূমি। কূল দেখে নাবিকদের যে পরিমাণ উল্লাস হবার কথা তা হলো না। তারা ভালো করেই জানে, তারা বন্দি এবং যে-কোনো সময় মৃত্যু তাদের সাথে দেখা করতে পারে। সুবিধাজনক জায়গা দেখে সবগুলো জাহাজ ভেড়ানো হলো। সবাই নেমে এলো জাহাজ থেকে।

নিচে নেমেই মানচিত্র বিশেষজ্ঞ সৈনিককে জিজ্ঞেস করলো এরিস, 'এখান থেকে রোম নগরী কত দূরে?'

'অনেকটা দূরে। এমনিতে হেঁটে গেলে এক মাসের রাস্তা, কিন্তু আমরা যে গতিতে চলছি তাতে অর্ধেক দিনেই হয়ে যাবে।'

অর্ধেক দিনে হয়ে যাবে শুনে তেমন একটা পুলকিত হলো না এরিস, বিড়বিড় করে বলল, 'তার মানে আরও পনের দিন। যেতে পনের, আসতে পনের। মাঝে যুদ্ধের দুই দিন।' তার মুখই বলে দিচ্ছে এই অপেক্ষা তার ভালো লাগছে না।

নাবিকদের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত তো নিতে হবে। এরিস একটু ভাবল। নাবিকদের এখনই মেরে ফেলা ঠিক হবে না। আর ওরা তো পাত্রাসে সরাসরি তার বিরোধিতা করেনি, তাই মেরে না ফেললেও চলবে। রোম থেকে ফেরার পথে ওদেরকেই আবার দরকার হবে পাত্রাস পৌঁছানোর জন্য। নাবিকদের জাহাজে থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো। যাতে ওরা কিছুতেই পালাতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে প্রতি জাহাজে দেওয়া হল দুজন করে আমাজন। এই কয়েকজন নাবিককে দুজন আমাজন বেশ সহজেই সামলাতে পারবে। আর এমনিতেও নিজের প্রাণের প্রতি মায়া থাকলে কোনো বোকামি করার ভুল এই নাবিকের দল করবে না।

কাউকে বিশ্রাম নেবার কোনো সুযোগ দিলো না এরিস। সবাই যাত্রা শুরু করলো নিজের নিজের ভাগের জিনিসপত্র নিয়ে। দেবতারা ক্লান্ত হয় না ঠিক, কিন্তু, জাহাজ থেকে নামার পর একটু অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে এরিসের। মনে হচ্ছে তার ক্ষমতার উৎস থেকে সে বেশ দূরে চলে এসেছে। এমনটা কেন হচ্ছে তাও বুঝতে পারছে সে। গ্রীক ভূখণ্ডেই তার ক্ষমতা বাঁধা পড়ে আছে। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সেখানে যেতে হবে। একবার অলিম্পাসে চলে গেলেই ক্ষমতার আর কোনো অভাব হবে না।

সেদিন সন্ধ্যার পরেও বেশ খানিকটা পথ চলল ওরা। পথ নির্দেশক একবার এসে বলে গেছে সামনেই রোমানদের একটা বড়ো নগর আছে। তাদের চলার পথেই পড়বে। সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখন এরিসকে।

তাবু ফেলা হয়েছে জায়গা বেছে নিয়ে। আমাজনদেরকে শিবির পাহারা দেবার দায়িত্ব দিয়েছে এরিস। নিজে বসেছে হেফাস্টাসের সঙ্গে। একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে মদিরায়।

'অনেক দিন পরে যুদ্ধে এসে তোমার কেমন লাগছে হেফাস্টাস?'

'যুদ্ধে আর কই এলাম। বলতে পারো তোমার সাথে আছি। মানুষের ক্ষমতা এখন অনেক কমে গেছে। সেই একিলিস, অডিসিউস, হেক্টরদের মতো বীর এখন আর নেই।'

'তোমার এই কথায় আমার একটু আপত্তি আছে। হারকিউলিস, একিলিস, পেলেউস এসব বীরেরা কিন্তু সম্পূর্ণ মানুষ ছিল না। তাদের কেউ ছিল দেবতার সন্তান, আবার কেউ ছিল দেবীর। তাদের শরীরে এজন্য দেবতাদের ক্ষমতা ছিল।'

'হ্যাঁ, আর তারা সেই অর্ধ-দেবতা হবার ক্ষমতা নিয়েও মাঝে মাঝে আসল দেবতাদের হারিয়ে দিতো।' খোঁচাটা ইচ্ছে করেই দিলো হেফাস্টাস।

এরিস রেগে উঠলো একটু, তুমি আমার কোন ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলছ তা আমি জানি। হ্যাঁ ট্রয়ের যুদ্ধে দেবতারাও নেমে গিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। আর সেখানে দুই পক্ষেই দেবতারা ছিল। এখন জিউস আর এপোলো তো আমাকে সহজেই হারিয়ে দিতে পারে, তাই না?'

'তাহলে তোমার যুদ্ধের দেবতা হয়ে লাভ হলো কী? এমনকি তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি, একবার আমার হাতেও পরাজিত হয়েছ তুমি?'

'সেসব ভুলে যাও। আমি আমার পিতার মতো ভুল করবো না। জিউস যেমন আমাদের সবাইকে অতুল ক্ষমতা দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলেন আমি তেমনটা কিছুতেই করবো না। আমি অলিম্পাসে গিয়ে নতুন দেবতা তৈরি করবো বটে, তবে তারা আমার সহচর হবে না, হবে দাস। আমার কথায় চলবে সব, শুধু পৃথিবী না, বরং সমুদ্র আর পাতালও।'

'আচ্ছা। সেসব চিন্তা রেখে কাল সকালে কী করবে সেই চিন্তা করো। একটা নগর নাকি পড়বে রাস্তায়। সেটা ধ্বংস করার অভিপ্রায় নিশ্চয়ই আছে তোমার মনে।'

'মিথ্যে বলবো না। রোম সাম্রাজ্যের নগর ধ্বংস করতে পারলে আমার ভালোই লাগবে, আর তাই করা উচিত, কিন্তু হাতে তো সময় নেই। যেভাবেই হোক আগে অলিম্পাসের দরজা খুলতে হবে আমার। তাই চিন্তা করেছি যদি ঐ নগর প্রতিরোধ না করে তাহলে আমরা পাশ দিয়ে চলে যাবো, কিছুই বলবো না। আর যদি প্রতিরোধ করে তাহলে নিজেদের সর্বনাশ তারা নিজেরাই ডেকে আনবে।'

'যাক, ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছ। আর আমার ব্যাপারে কী চিন্তা করলে? আমাকে ছুটি দেবে কখন?'

'তোমাকে ছুটি দেবো মানে? তোমাকে তো আমার সাথে নিয়ে যাবো অলিম্পাসে। তোমাকে সেখানে স্থান দেওয়া হবে।'

'তোমার মতো অলিম্পাসে যাবার অথবা থাকার কোনো লোভ নেই আমার, আর এতকাল যে আমার আত্মা ঘুমিয়ে ছিল, আমি সত্যি বলছি, তাতে আমার একটুও খারাপ লাগেনি। ভেবে দেখলাম, তুমি যাই করতে যাও, সেটাই তোমাকে একটা না একটা ঝামেলায় ফেলবে। ঝামেলায় না পড়ে তুমি হাতটাও নাড়তে পারবে না। আর তুমি যে কথা বলেছ তার পরে তো অলিম্পাসে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি পৃথিবীতেই থাকবো, আমার সেই দ্বীপে।' উঠে দাঁড়ালো হেফাস্টাস,

নিজের তাবুতে যাবে এখন, 'অলিম্পাসে গিয়ে তোমার দাস হয়ে বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

সকাল হয়ে গেল নিয়মমতো। আবার যাত্রা শুরু করলো দলটা। এরিস সবার সামনে আছে, তার কাছে পথ নির্দেশক আসতেই প্রশ্ন করলো, 'আর কতদূর ঐ নগর?'

'আর বেশি দূরে নয়। আমার অনুমান যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে সূর্য মাথার ওপরে ওঠার আগেই আমরা পৌঁছে যাবো ঐ নগরে।'

'ভালো কথা। তাহলে ঐ নগরের মানুষেরাই আজ আমাদের দুপুরের খাবারের জোগান দেবে।'

চিন্তাটা ভালোই ছিল। কিন্তু, ওদের জন্য দুপুরের খাবার নয়, বরং অন্য কিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছিল নগরের লোকজন। নিজের বাহিনী নিয়ে এগোতে এগোতে নগরের বাইরের বিশাল প্রান্তরে এসে পৌঁছাল এরিস। আর অনেকটা আগে থেকেই দেখতে পেয়েছে এই প্রান্তরে তাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সেনা। সেনার আকৃতি যথেষ্ট বড়ো। পায়াস একবার সেনার আকার দেখেই ঢোক গিলে গলা ভিজিয়ে নিলেন। নিকোলাস আর মরিসের মধ্যে থাকা এতদিনের আত্মবিশ্বাস এখন একটু কম মনে হতে লাগলো।

এরিস ঘোড়া দাঁড় করালো পায়াসের পাশে, 'ভেবেছিলাম এই নগরের লোকেরা আমাদের দুপুরের খাবারের জোগান দেবে, এখন দেখছি ওরা আমাদেরকে যুদ্ধের জোগান দেওয়ার জন্য তৈরি। ঠিক আছে, এই বাহিনীকে ধ্বংস করে আমরা নগরে গিয়ে দুপুরের খাবার খাবো।'

পায়াসের এই কথায় যথেষ্ট সন্দেহ আছে, 'এত বড়ো বাহিনী কি এক বেলায় ধ্বংস করা সম্ভব হবে?'

এরিস এই কথার জবাব দিলো না, সে ভাবছে অন্য কথা, 'রোমের সামান্য এক নগর কীভাবে এত বড়ো বাহিনী পালন করে? এটা কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে আমার কাছে।'

প্রশ্নের উত্তর পাওয়া জরুরী। দূত প্রেরন করার সিদ্ধান্ত নিলো এরিস। একজন দূত সাদা পতাকা নিয়ে রওনা হল সামনের বাহিনীর উদ্দেশ্যে।

দূত সেই বাহিনীর কাছে গিয়ে বেশি সময় নষ্ট করলো না। যতটুকু বেগে গেল ফিরে এলো তারচেয়ে বেশি বেগে। শিবিরে এসে ঘর্মাক্ত দেহ নামালো ঘোড়া থেকে। দূতকে সামান্য জিরনোর অবসর দিলো না এরিস, ' কি সংবাদ নিয়ে এলে?'

'মহামান্য। এটা এই নগরের সেনা নয়। এটা রোমান সেনা। এই সেনা রোম থেকে এসেছে। রোমের সব বড়ো সেনাপতিরা নিজেদের সেরা সেরা যোদ্ধাদের নিয়ে এসেছেন।'

হাসি ফুটে উঠলো এরিসের মুখে, ' বাহ্, আমাকে আর রোম পর্যন্ত কষ্ট করে যেতে হলো না। এক মাসের কষ্ট বেঁচে গেল। সময় বেঁচে গেল। নিশ্চয়ই আমাদের আসার খবর গুপ্তচর আগেই পৌঁছে দিয়েছে রোমে। যে গুপ্তচর এই খবর রোমে পৌঁছে দিয়েছে তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। দেবতা হয়ে আমি তাকে আশীর্বাদ করবো। এবার বলো, সেখানে তোমার সাথে কার কথা হয়েছে?'

'সম্রাট ট্রাজান নিজে আছেন বাহিনীর সাথে। আমার সাথে তিনি দেখা করেননি। তবে তার একজন প্রধান সেনাপতি দেখা করেছেন। অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরকে।'

'ভালো নির্দেশ' হেসে ফেললো এরিস, 'আচ্ছা, আমি এখনই তাদের ওপর আক্রমণ করবো না। সবারই নিজের বিপদ বুঝে তারপর সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আছে। তুমি কি ওদের বলেছ, যে আমি একজন দেবতা, আর আমার সাথের এরা দেব সৈনিক?'

এবার দূত আমতা আমতা করতে লাগলো, 'আমি আসলে একটু বলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওরা আমার কথা কানেই তোলেনি। বলেছে এসব খবর না-কি ওদের অনেক আগ থেকেই জানা।'

'আচ্ছা, আমি তারপরেও একবার চেষ্টা করবো। ঠিকই বলেছে পায়াস, এই বড়ো বাহিনী ধ্বংস করতে কয়েকদিন লেগে যাবে। পাত্রাসের মতো সহজ হবে না কাজটা। দেখি যদি বুঝিয়ে সেই কয়েকদিনের পরিশ্রম বাঁচাতে পারি।'

দূতকে নির্দেশ দেওয়া হলো। দূত রওনা দিলো আবার। এবার সম্রাট ট্রাজানকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। স্বয়ং দেবতা এরিস তার সাথে কথা বলবেন।

প্রান্তরের ঠিক মাঝখানে অতি দ্রুত খাটানো হয়েছে শুভ্র তাবু। ট্রাজান সেনাপতিদের নিয়ে এসে বসলেন আসনে। সামনে বসে আছে এরিস। একা, নিরস্ত্র। চোখেমুখে কোনো ভয় নেই তার। সাথে শুধু একজন লোক। এমন চোখের আত্মবিশ্বাস কোনো যুদ্ধের ময়দানে আগে কারো চোখে দেখেননি ট্রাজান। এই একটাই বিশেষত্ব ধরা পড়লো তার চোখে। কিন্তু এই ব্যাপারের জন্য তো আর এই লোককে দেবতা বলে মেনে নেয়া যায় না।

এরিস হাসি মুখে কথা শুরু করলো, 'এমনিতে আলোচনা শুরুর আগে তোমাদের উচিত আমাকে কুর্নিশ করা। জানো তো, আমি যেই ক্ষমতার দেবতা, তাতে আমার আশীর্বাদ তোমাদের সরাসরি কাজে লাগবে। আমাকে চিনতে পারোনি দেখেই তোমরা এখনো সম্মান দেখাচ্ছো না, বুঝতে পারছি। অবশ্য এখনো কুর্নিশ করার সুযোগ চলে যায়নি।'

এরিসের কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালো এক সেনাপতি, কিন্তু কিছু বলার আগেই ট্রাজানের হাতের ইশারা চুপ করিয়ে দিলো তাকে। এরিস সেনাপতির রাগ দেখে হেসে উঠলো, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, সম্মান দেখাতে হবে না।'

এবার প্রথম কথা বললেন ট্রাজান, 'তাহলে কাজের কথা শুরু করা যাক। আপনি দেবতা হন বা না হন তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। আপনি আমার সীমানায় কেন প্রবেশ করেছেন? এর কোনো অধিকার আপনার নেই। অযথা ঝামেলা, যুদ্ধ অথবা প্রাণের ক্ষয় হোক আমি তা চাই না।'

এরিস এবার হাসি গিলে ফেললো, 'এটা তো আমার জন্য বড়োই দুঃখের কথা। এত বড়ো সাম্রাজ্যের মালিক যদি বলে সে যুদ্ধ চায় না, তাহলে তো যুদ্ধের দেবতা হিসেবে আমি ব্যর্থ। তোমরা যুদ্ধ না করলে তো আমার কাজই থাকবে না।'

ট্রাজান উত্তর দিলেন, 'যুদ্ধে আগ্রহ নেই, অথবা যুদ্ধ করবো না তা একবারও বলিনি, শুধু বলেছি বিনা কারণে যুদ্ধ করবো না। আর এই মুহূর্তে আপনি আপনার সেনা নিয়ে এখান থেকে চলে যাবেন। পরে আমি রোমান প্রতিনিধি স্পার্টায় পাঠিয়ে সবকিছু ঠিক করবো।'

'না, না, সেটা আর হবে না, তুমি আর কখনোই তোমার প্রতিনিধি স্পার্টায় পাঠাতে পারবে না। তোমাদের এই রাজ্য মানে সমুদ্রের এই পারের রোমে আমার কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু গ্রীসের ওপর থেকে তোমার সমস্ত অধিকার এখন থেকে তুলে নিতে হবে। গ্রীস আজ থেকে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমি যুদ্ধের দেবতা হয়েও যুদ্ধের বিকল্প তোমার হাতে তুলে দিলাম। তুমি গ্রীসকে মুক্ত করে দেবে। আমার কাছে আগুন জ্বালিয়ে সাক্ষ্য দেবে। আমি গ্রীসে ফিরে গ্রীসের সব রাজ্যে নতুন রাজাদের অভিষেক করবো। তারপর তুমি থাকবে তোমার রাজ্যে, আর আমরা আমাদের রাজ্যে। যুদ্ধ এড়ানোর এই উপায়টা তোমার কেমন মনে হচ্ছে?'

ট্রাজান ভেতরে ভেতরে যে একটু কেঁপে উঠছেন না তা কিন্তু নয়। এমন আত্মবিশ্বাসের সামনে নত হওয়া স্বাভাবিক। তবে ট্রাজানকে বেঁধে রাখল তার অহংকার। আজীবন যুদ্ধ জয়ের গৌরব। রোমান সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আয়তনের ভূখণ্ডের মালিক হবার গৌরব। সেই গরিমা বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে, 'আমার যুদ্ধ এড়ানোর ইচ্ছে ছিল। তবে এখন আর সেই ইচ্ছে নেই। রোম সাম্রাজ্যের এক বিন্দু মাটিও কেউ এমনিতে নিতে পারবে না, আর তুমি তো বলছ পুরো গ্রীসের কথা। তোমাদেরকে এই মাটিতেই মরতে হবে।'

এরিস আরেক বার বোঝানোর চেষ্টা করলো, 'তোমার দূত, যে তোমাকে আমার এখানে আসার খবর আগে থেকেই দিয়েছে, সে কি পাত্রাসে আমার সেনারা কেমন যুদ্ধ করেছে তা বলেনি?'

'হ্যাঁ, বলেছে' ট্রাজান নির্বিকার, 'সে বলেছে তোমার সাথে কিছু বিদ্ঘুতকিমাকার জন্তু আর একটা নারী সেনাদল আছে। যারা রোমান বাহিনীর সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। আর তোমার ঐ জন্তুদের ব্যবস্থাও আমাদের কাছে আছে। তুমি তো গ্রীসের যুদ্ধের দেবতা। গ্রীসের লোকজন যুদ্ধ তোমার আশীর্বাদেই শিখেছে। তার মানে তুমি তাদের যুদ্ধের গুরু। তোমার শিষ্যদের যা অবস্থা দেখলাম তাতে গুরুর অবস্থা খুব বেশি ভালো হবার কথা না।'

এবার সেনাপতিরা সমস্বরে হেসে উঠলো, ট্রাজানের ঠোঁটে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি।

এরিস অপমানের জবাবে কিছুই বলল না, ট্রাজানই এই আলোচনার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন, 'ঠিক আছে। তাহলে কাল সকালে প্রান্তরেই দেখা হবে। আশা করি তুমি যেহেতু যুদ্ধের দেবতা, তাই যুদ্ধের সাধারণ আচার আচরণগুলো তুমি আর তোমার যোদ্ধারা জানো।'

এরিস এবারও কিছু বলল না, তাবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দূতের উদ্দেশ্যে শুধু বলল, 'আমি বাইরে যাচ্ছি। কাল সকালের যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম আর যুদ্ধের সময়ের হিসেবটা ওদের থেকে বুঝে নাও।'

'আর কেউ মনে হয় বাকি নেই।'

এতদিন বন্দি অবস্থায় থেকে অভিজাতের চোখের আর মনের দুটোর জোরই কমে গেছে। অন্ধকার থেকে আলোতে এসে পিটপিট করে তাকাচ্ছে সে, কোথায় আছে যেন বুঝতে পারছে না।

কলিন একবার পরিস্থিতি দেখে সবটা বুঝে নিলো। না, এই লোককে প্রশ্ন করে এখন আর কোনো লাভ নেই, নির্দেশ দিলো সে, 'কেউ এক পাত্র জল এনে ওর চোখে মুখে ঢেলে দাও।'

কথাটা যে মজা করে বলা হয়নি, এটা সবাই বুঝতে পেরেছে, একজন পালন করলো আদেশ। চোখেমুখে ঠান্ডা জলের ঝাপটায় অভিজাতের জ্ঞান ফিরে এলো। সাথে সাথে কলিনের দিকে তাকালো সে। এবার কলিন বুঝতে পারলো তাকে চিনতে পেরেছে অভিজাত।

প্রশ্নটা আবার করলো সে, এবার একটু ঘুরিয়ে, 'বিদ্রোহী হেলটদের কয়টা দল সমগ্র গ্রীস থেকে স্পার্টার আসার কথা ছিল? এটা তো তুমি অবশ্যই জানো।'

তথ্য দিতে এখন আর অভিজাতের কোনো বাঁধা নেই, আপত্তিও নেই, 'উনিশটা হেলট সেনার দল আমরা এই কাজের জন্য জোগাড় করতে পেরেছিলাম। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওরা সবাই চলে এসেছিল স্পার্টার আশেপাশে। কিন্তু তারপরই ঘটে গেছে সেই ঘটনা। অ্যালেস্টর নিহত হলেন পায়াসের প্রাসাদে, আমাদের সব পরিকল্পনা বিফল হয়ে গেল।

স্পার্টার অভিজাতদের বিদ্রোহ ভেঙে গেছে এটা জানতে পেরে একটুও কষ্ট হচ্ছে না কলিনের। রোমান অথবা গ্রীক তাদের কাছে সবাই সমান। সবাই তাদেরকে দিয়ে নিজেদের কাজই করাবে, তাদের সাথে ব্যবহার করবে নালার ঘৃণ্য কীটসম।

অভিজাতের কথা শুনে হিসেব কষতে বসলো কলিন। তাকে সাহায্য করছে তার গুপ্তচরেরা। এরই মধ্যে প্রায় সবগুলো হেলটের দলকেই খুঁজে আনা হয়েছে। আর কথাও খোঁজার বাকি নেই। হিসেব মেলাতে হবে এবার কেবল।

'আমরা তাহলে কয়টা দল খুঁজে পেয়েছি?'

'আঠারোটা। আমাদের সবাই মিলে। আর তারা সবাই এখন আমাদের আস্তানার সাথেই আছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ জেনে গেছে আসল ঘটনা। ওদেরকে যে নিয়ে এসেছে সে ধরা পড়েছে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। আর এখন তারা যথেষ্ট ভয় পাচ্ছে। কেউ কেউ তো চলে যেতে চাচ্ছে নিজেদের এলাকায়।

গুপ্তচরের কথা বেশ মন দিয়ে শুনল কলিন, এই ঝামেলা এড়ানোর পরিকল্পনা তার আগে থেকেই করা আছে। নেতা হয়েছে কিন্তু ঠিকমতো ভাষণ না দিতে

পারলে চলবে কীভাবে। কিন্তু এখানে সমস্যা আরেকটা, 'বাকি আছে আর একটা দল। তারা কোথায় গেল?'

'মনে হচ্ছে ওরা ফিরে গেছে খবর পেয়ে। ওদের চিন্তা করে আর লাভ নেই সর্দার।'

'আমাদেরকে একটা নগর অধিকার করে রাখতে হলে যত বেশি পারা যায় সেনা একত্র রাখতে হবে। আমরা সবাই হেলট। আমাদের তো আর অতো ভালো প্রশিক্ষণ নেই, তাই বলছিলাম। আচ্ছা, এখন আর সময় নেই। ওরা যুদ্ধে গেছে কবে?'

'তা প্রায় দশ দিনের মতো হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, স্পার্টা এখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত। এখনই সুযোগ নগরে যাবার। সবকিছু নিজেদের করে নেবার। আহা, এটা নিশ্চয়ই ভাগ্য দেবতার আশীর্বাদ। কখনো কি ভেবেছিলাম, বিনা যুদ্ধে এভাবে আমরা হেলটেরা ঐ স্পার্টা নগরী অধিকার করতে পারবো। কিন্তু এখন সেই সুযোগ আমাদের সামনে।'

একটা কণ্ঠ বলে উঠলো, 'একটা কথা জেনে রাখো, কোনো কিছুই কখনো বিনা সংগ্রামে প্রাপ্ত হয় না। হয়তো কারো সংগ্রামটা করতে হয় প্রাপ্তির আগে, আর কারো জন্য সংগ্রামটা হয় প্রাপ্ত হবার পর।'

কলিন তাকিয়ে শেইরনের দিকে দেখল, এক কোণায় দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। কলিন প্রশ্ন করলো, 'আপনি আসলে কী বলতে চাচ্ছেন?'

'আমি যা বলতে চাইছি তা আসলে খুবই সরল। তুমি স্পার্টা দখল করতে চাচ্ছো। এখন তোমাকে অবশ্যই যে-কোনো এক পক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। রোমান আর দেবতার যুদ্ধে যেই জিতুক, তারা কিন্তু স্পার্টায় আসবেই। তোমাকে একটা যুদ্ধ করতেই হবে।'

'তা আমি জানি। এজন্যই হেলটের এক বিশাল সেনা আমি তৈরি করেছি।'

হেসে ফেললেন শেইরন, 'হেলটের সৈন্য দিয়ে তুমি রোমানদের বিরুদ্ধে লড়বে? ভালো কথা। অনেক আগে এই চেষ্টা একজন করেছিল। তার কথা তো তুমি জানোই।'

'হ্যাঁ, স্পার্টাকাস।'

'স কিন্তু তোমার মতো অকর্মণ্য যোদ্ধা ছিল না, অনেক দক্ষ ছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাকে পরাজিত হতে হয়েছিল। তোমার মাথায় ঢুকে গেছে, যেভাবেই হোক নগর অধিকার করতে হবে, কিন্তু একটুও ভাবছ না সেটাকে কীভাবে রক্ষা করবে।'

'সে চিন্তাও করছি। একটু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। নইলে আমরা হেলটেরা কখনোই তাদের অধিকার ফিরে পাবো না। সারা জীবন তো আর এভাবে বাঁচা

যাবে না। এক সময় তো ঝুঁকি নিতেই হবে আর সেই ঝুঁকিটা এখন নিলেই বা ক্ষতি কী?'

'যাক, বুঝেশুনে যখন ঝুঁকি নিতে চাচ্ছো তখন আর আমার কিছু বলার নেই।'

'হ্যাঁ। ঐ ব্যাপারে না বলে আমাকে এখন একটু পরামর্শ দিন। কীভাবে আমি হেলটদের বাহিনীগুলোকে আমাদের সাথে যোগ দেবার কথা বলতে পারি? ওদের অনেকেই নিজের রাজ্যে চলে যেতে চাইছে।'

ঠান্ডা স্বরে বললেন শেইরন, 'একটাই উপায় আছে। ওদেরকে তুমি সত্যিটা বলতে পারো। কেন তুমি হেলটদেরকে ঐ নগরে নিয়ে যেতে চাও? তোমার আসল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তাহলে হেলটেরা রাজি হবে।'

উপদেশ দেবার পর আর দাঁড়ালেন না শেইরন। সেই স্থান ত্যাগ করলেন। কলিন স্পষ্ট বুঝতে পারলো তাকে কী বলতে হবে। নিজের লোকদেরকে নিজেকে অনুসরণ করতে বলল সে। একটু দূরেই জঙ্গলের ভেতর হেলটের দলেরা আছে। একেকজন দলনেতা নিজের নিজের দল সামলে রেখেছেন।

কলিন এগিয়ে গিয়ে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াতেই সব দলের প্রধান লোকজন তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। এত মানুষ চার পাশে দেখে একটু ঘাবড়ে গেল কলিন, মনে হলো তার ঠিক করে আনা ভাষণ মাথার ভেতর থেক উধাও হয়ে গেছে। জোরে একটা দম নিলো সে, বাতাসটা ছেড়ে দিলো ধীরে ধীরে।

'তোমাদের আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমরা হেলটেরা একে অপরের ভাই। হতে পারি আমরা একেকজন একেক রাজ্য থেকে এসেছি। কিন্তু একটা জিনিস আমাদের সবার জন্যই এক। আমরা সবাই অত্যাচারিত। আমরা সবাই আমাদের অধিকার আর স্বাধীনতা ফিরে পেতে লড়বো বলে ঠিক করেছি।'

সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো হেলটেরা, কলিনের ভাষণের প্রথম অংশই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে, সর্দার মতো একজন বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, আমরা সেজন্যই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছি। আমাদেরকে স্বাধীনতা লাভ করতেই হবে।'

এবার নিজের ভাষণের মোড় পরিবর্তন করে দিলো কলিন, 'তাহলে তোমরা এই বোকার মতো কাজটা কেন করলে?'

কলিনের তিরস্কারে এবার হেলটদের উল্লাস একটু কমে এলো। কলিন চার পাশ ঘুরে সবার দিকেই তাকালো, তারপর চিৎকার করে উঠলো, 'আমাদের জন্য রোমানরা যেই কথা, এই গ্রীসের অভিজাতরাও একই কথা। যেই ক্ষমতায় থাকুক, আমাদের কোনো লাভ হবে না। আমাদেরকে নিজের লড়াই নিজেদের জন্যই লড়তে হবে, কারো পুতুল হয়ে নয়। তোমরা এখানে ধোঁকায় পড়ে একজন অভিজাতের পক্ষে লড়তে এসেছিলে। আমি বলবো যে কপাল ভালো, সেই

পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। নইলে সেই অভিজাতকে ক্ষমতায় বসিয়ে তোমাদেরকে আবার ফিরে যেতে হতো সেই চাকরের আসনে।'

আঠারো দলের এক দলের সর্দার একটু প্রতিবাদ করে উঠলো, 'কিন্তু তারা আমাদেরকে কথা দিয়েছিল, আমাদের সব যোদ্ধাকে তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক করে দেওয়া হবে।'

অট্টহাসি বেরিয়ে এলো কলিনের গলা দিয়ে, 'আর তোমরা এই কথা বিশ্বাস করেছ। বোকা আর কাকে বলে। আচ্ছা, আচ্ছা ধরে নিলাম তোমাদেরকে ওরা তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক বানিয়ে দিলো। তাতে কী লাভ হবে। তোমরা তো সেই নিচু শ্রেণিতেই থেকে গেলে। তারচেয়ে এখন আমরা আমাদের মতো করে আক্রমণ করবো, দখল করবো, নিজেদের সমাজ গঠন করবো। সেখানে কোনো প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণি থাকবে না। আমরা সবাই সেখানে নিজেদের মতো করে থাকবো।'

তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হবার চেয়ে কলিন যা বলছে তা অবশ্যই উত্তম। এবার আবার হর্ষধ্বনি উঠলো হেলটদের মধ্যে। এই উৎসাহ মিলিয়ে যেতে দিলো না কলিন, সে চিৎকার করে বলল, 'এখন থেকে আমাদের কোনো শ্রেণি নেই। আমরাই হবো আমাদের রাজ্যের মালিক। স্পার্টা হবে হেলটদের রাজ্য। এখানে কোনো অভিজাতের স্থান হবে না।'

একটু গলাকে বিরাম দিলো কলিন, তারপর আবার চিৎকার শুরু করলো, 'আমরা আর দেরি করবো না। ভাগ্য আমাদের সাথে আছে। স্পার্টা আজ অরক্ষিত। আমরা আজকেই সেই নগরী দখল করবো। আজকেই।'

কলিনের চিৎকার চাপা পড়ে গেল হেলটদের মিলিত চিৎকারে। সবাই নিজের নিজের জিনিস তুলে নিতে লাগলো। কলিন আর দেরি করবে না।

দলটা যখন জঙ্গল চিরে নগরের দিকে হাঁটতে লাগলো, তখন আসলেই মনে হলো বিশাল কোন দল যাচ্ছে, তবে এই দলকে আর যাই হোক বাহিনী বলা যাবে না। শৃঙ্খলা পুরো মাত্রায় অনুপস্থিত। সেটা অবশ্য কেউই বুঝতে পারলো না, কেবল ইভান, ওরিয়ন আর রুদ্রদেব ছাড়া। তারা ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে। ইভান নিজের ঘোড়ার সামনে বসিয়েছে ইনোনকে। অনেক দিন পরে নগরে যাচ্ছে ভেবে আজ ইনোন একটু ভয় অনুভব করছে। এতদিনে শোক তার একটু কমে এসেছিল। ইভানের চেষ্টাকে এখানে বাহবা দিতেই হবে। নিজের পুরো সময়, পুরো ভালোবাসা সে ইনোনের জন্য বরাদ্দ করেছিল। ইনোন সেরে উঠেছে, এখন শোক সামলে তাদের সম্পর্ক হয়ে উঠেছে স্বামী স্ত্রীর মতো। কিন্তু আজ নগরের পথে যাত্রা করাতে ইনোনের মাথায় আবার সেদিনের বিভীষিকা ফিরে আসতে শুরু করেছে।

স্পার্টায় এখন যথেষ্ট সেনা নেই। তবে পায়াস যেই সেনার ওপর সবার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন সে সদর দরজা খালি রাখার কথা চিন্তা করেনি। নগরের প্রত্যেক প্রবেশ দ্বারে পাহারা আছে। অপ্রতুল হলেও মোটামুটি আট দশ জনের একটা দল প্রতি দরজা পাহারা দেয়।

দুপুরের খাবার খাওয়া হয়েছে মাত্র। অলসতা একটু একটু করে জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছিল মাত্র। এমন সময় বনের ভেতরের রাস্তা থেকে কলরব ভেসে এলো তাদের কানে। বেশ বড়োসড়ো কোলাহল। যেন এক সাথে চলছে অনেক মানুষ। প্রহরীদের ভয় পাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। তারপর এক সময় তাদের দৃষ্টির সামনে চলে এলো হেলটদের দল। এত বড়ো হেলটের দল মারমুখী হয়ে কেন নগরের দিকে আসছে সেটা না বোঝার মতো বোকা এই প্রহরীরা না। কারো মাথায় সদর দরজা বন্ধ অথবা রক্ষার কোনো চিন্তাই এলো না। আশ্চর্যজনকভাবে সবাই এক সাথে একই সিদ্ধান্ত নিলো। এক যোগে দরজা রেখে ছুটল প্রাসাদ লক্ষ্য করে।

বিনা বাঁধায় হেলটের দল প্রবেশ করলো নগরে। তার আগেই তাদের আগমনের শব্দ পৌঁছে গিয়েছিল নগরে। সাথে প্রহরীদের ছুটতে দেখে লোকে যা বোঝার বুঝে নিয়েছিল। রাস্তা ঘাট ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল এক মুহূর্তে। যাদের বাড়ি কাছে আছে তারা বাড়িতে প্রবেশ করেছে, আর যাদের বাড়ি দূরে তারা সেদিকে ছুট দিয়েছে। কেউবা আবার দোকানের ঝাঁপ ফেলে ভেতরে বসে কাঁপছে।

এমন জনশূন্য রাস্তার মধ্যে প্রবেশ করলো ওরা। কলিনের লক্ষ্য পরিষ্কার। সে জোর কদমে চলতে লাগলো পায়াসের প্রাসাদ লক্ষ্য করে। তবে সে এটাও জানে, এখানে যেমন কোন প্রতিরোধের সামনে পড়তে হয়নি, তেমনটা সেখানে হবে না। প্রাসাদের রক্ষায় কিছু সেনা অবশ্যই আছে। তারা একটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা অবশ্যই করবে। সেই জন্য যত সময় কম দেওয়া যাবে ততই ভালো।

পায়াসের প্রাসাদে পৌঁছে দেখল ধারণা সত্য। সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রাসাদের সব সেনা একত্র হয়ে সেই দরজার ভেতরে অবস্থান নিয়েছে। কলিন দাসদেরকে আদেশ দিলো, 'সবাই এক সাথে আক্রমণ করো। আজ আর আমাদেরকে আটকে রাখা যাবে না।'

সেই সদর দরজা কিছুতেই এই স্রোত আটকে রাখতে পারলো না। কয়জনকে আটকে রাখবে ভেতরের সৈন্যরা। বাণের জলের মতো দেওয়াল আর দরজা বেয়ে হেলটেরা ঢুকতে লাগলো ভেতরে। সেনারা একসময় রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হলো। একটু পিছিয়ে গিয়ে অস্ত্র ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

কলিন ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে, খোলা হয়েছে সদর দরজা, সবাই ঢুকছে বিনা বাঁধায়। হতাহত দুই পক্ষেই বেশ কিছু হয়েছে।

আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো কলিন, 'তোমরা কী ভেবেছ, তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে? না, তার কোনো সুযোগ নেই। এই তোমরা সবাই এদেরকে আক্রমণ করো। আমাদের সাথে আজীবন খারাপ ব্যবহার করার জন্য ওদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম আমি।'

হেলটের দল এগিয়ে গেল খোলা অস্ত্র হাতে নিয়ে, ওদের দিকে বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে সৈনিকেরা, বুঝতে পারছে, অনেক দেরি করে ফেলেছে, যুদ্ধ করতে করতে মরাই ভালো ছিল। এখন অসহায়ভাবে মরতে হবে।

হেলটের দল বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ তাদের আর আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের মাঝে চলে এলো একটা ঘোড়া। হেলটদের থেকে ঘোড়াটা স্পার্টান সৈনিকদের আড়াল করে দাঁড়ালো। আচমকা গতি রোধ হওয়াতে হেলটেরা খুব রেগে গেল। ঘোর সওয়ারকে আক্রমণ করতে গিয়েও থমকে গেল তারা। সে শত্রু নয়, আবার ঠিক বন্ধুও বলা যাবে না। তবে জঙ্গল থেকে এই যাত্রায় ওদের সাথেই এসেছে সে।

সৈন্যদের আড়াল করে দাঁড়িয়েছে রুদ্রদেব। তার দৃষ্টি এখন কলিনের দিকে, 'তুমি তোমার লোকদের এই কাজটা করতে বারণ করো। আমি এই একটা সৈন্যকেও মরতে দেবো না।'

কলিন এখন উত্তেজিত অবস্থায় আছে, 'তুমি আমাদের ব্যাপারে নাক গলিও না। তোমার সাথে আমাদের আলাদা চুক্তি আছে। সেটা নিয়ে পরে দেখা যাবে।'

রুদ্রদেব অনড়, 'নাক তো একটু গলাতেই হবে ভাই। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসরণ করি। আর তোমাদের দলে যখন যোগ দিয়েছি, তাই আমি এখন তোমাদের দলের সৈন্য, তোমরা কোনো অধর্ম করলে সেই দায়িত্ব আমার ওপরেও পড়বে। আর ক্ষত্রিয় কখনো কোন শরণাগতের ওপর আঘাত করে না, কাউকে আঘাত করতে দেয়ও না।'

ক্ষত্রিয় ধর্মের প্রতি কলিন কোনো সম্মান দেখাবে কি না সেটা নিয়ে একটু দ্বিধা রুদ্রদেবের মনে ছিল, সেটা কলিনের মনেও ছিল। তার চোখে একটু আগুন জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু সেটা নিভতেও দেরি হলো না, নিজের ঘোড়া নিয়ে রুদ্রদেবের পাশে দাঁড়িয়েছে ইভান, 'আমি রুদ্রদেবের সাথে একমত। ওরা আত্মসমর্পণ করেছে। যুদ্ধ করতে থাকলে মেরে ফেলা যেত। কিন্তু এখন মেরে ফেলা উচিত হবে না।'

কলিন নিজেকে সংবরণ করলো, ইভানের যুদ্ধের ক্ষমতা সে জানে, ক্ষেপিয়ে লাভ হবে না। আসল যুদ্ধে ইভানকেই সেনাপতি বানানো হবে। তবে সে এমনিতে এই সেনাদের ছেড়ে দেবে না, 'তাহলে ওদের এখন কী করবো?'

রুদ্রদেব সমাধান দিলো, 'এই প্রাসাদে সবকিছু যেমন আছে, কারাগারও নিশ্চয়ই আছে। সেখানেই বন্দি করে রাখো ওদের।'

সেই সিদ্ধান্তই নেয়া হলো। সবাই হইহই করতে করতে প্রাসাদে প্রবেশ করলো। প্রাসাদের প্রতি কোণ ভরে উঠতে লাগলো হেলটে। দুপুরের খাওয়া হয়নি। সবার জন্য তাই ব্যবস্থা করতে হবে। রাঁধুনির আর ভাঁড়ারের খোঁজে গেল কয়েকজন। বন্দি সৈন্যদের সাথে রাহু আর আগে থেকে বন্দি অভিজাতকেও রাখা হলো কারাগারে।

রুদ্রদেব একটা আরামদায়ক আসন দেখে বসেছে, প্রাসাদটা বেশ সুন্দর। অসিত বসার জন্য একটা যুতসই আসন খুঁজছে। এমন সময় শেইরন তাকে ডাকলো, 'তুমি কি এখানে বসবে না-কি? চলো, তোমাকে তো অন্য জায়গায় যেতে হবে।'

শেইরনের কথাটা রুদ্রদেব আর অসিত দুজনেই বুঝতে পেরেছে। দুজনেই পিছু নিলো শেইরনের।

এদিকটায় এখনো কেউ আসেনি। শেইরন কিছুদিন আগেই প্রাসাদে এসেছেন। রাস্তাটা তার পুরো মুখস্ত। ঘরটা খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না তার। ঘরের দরজা খুলে ঢুকে পড়লো ওরা তিনজন।

ভেতরে ঢুকে সবাই অবাক হয়ে গেল। ভেতরে নানা রকমের প্রাণী আছে বিভিন্ন খাঁচায়। অস্বাভাবিক প্রাণীগুলোকে দেখে অবাক না হয়ে উপায় নেই।

তখন একটা অতি পরিচিত শব্দ, অনেক দিন পরে শুনলেও সেই শব্দ চিনতে একটুও অসুবিধা হলো না অসিতের। অঙ্গদকে সে দেখতে পায়নি, অঙ্গদই তাকে দেখতে পেয়েছে। চি চি করে গলার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে ডাকছে অসিতকে।

খাঁচার দরজায় এসে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে অঙ্গদ। অসিত ছুটে এলো তীব্র বেগে। খাঁচার দরজা খুলে দিলো, অঙ্গদ লাফিয়ে এসে তার বুকে পড়লো। রুদ্রদেব এই প্রথম অঙ্গদকে দেখছে। নাহ, আসলেই একটা দেখার মতো দৃশ্য।

অসিত সাথে সাথে ভুলে গেল সবকিছু। অঙ্গদ কাঁদছে কি না বোঝা গেল না, তবে অসিতের চোখের জল দরদর করে পড়ছে। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে ভালোবাসার অকৃত্রিম পাশে।

ট্রাজান অনেক দিন পরে পোশাকটা পরেছেন। এই সাজ অনেক দিন আগে তুলে রাখা হয়েছিল, কখনো পরতে পারবেন সেটা ভাবেননি। সেনানায়েক থেকে যেদিন সম্রাট হয়েছিলেন সেদিনই অভিজাত পোশাক চেপে বসেছিল তার গায়ে। কিন্তু আজ বুঝতে পারছেন, শরীরের শক্তি কম গেলেও এতদিন তিনি নিজের সৈনিক পরিচয়, নিজের এই পোশাকের তীব্র অভাব অনুভব করেন। রণ সাজে সেজে ওঠা মাত্র তার মধ্যে যেন তারুণ্য ভর করলো। যুদ্ধক্ষেত্রে এসে তিনি দাঁড়ালেন সবার সামনে, মাথা আর শিরস্ত্রাণ দুটোই আকাশের দিকে মুখ করা।

নিজের বাহিনীর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। না, সবাই ঠিক জায়গাতেই আছে। এই যুদ্ধে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সেগুলো আরেকবার জায়গা মতো আছে কি না সেটাও দেখে নিলেন। সন্তুষ্ট হলেন তিনি। তার সেনাপতিরা অনেক দিন যুদ্ধ না করলেও এখনো তাদের জ্ঞান টনটনে, অভিজ্ঞতার ঝুলিতে একটুও টান পড়েনি। নিজের ঘর সামলে এবার প্রতিপক্ষের দিকে নজর দিলেন তিনি।

এরিসকে অনেক দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে। একটা বিশাল ঘোড়ার পিঠে আয়েশ করে বসে আছে সে। সাথে থাকা স্পার্টার বাহিনী পূর্ণ সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের অপেক্ষা করলেও আমাজনদের মধ্যে তেমন কোনো লক্ষণ নেই। তারা আপাতত ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছে। সাথে আছে সাইক্লপসরা। যারা একাই ধসিয়ে দিয়েছিল পাত্রাসের রোমান বাহিনী।

এই দানবদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন ট্রাজান। দূতের মুখে শুনেই তিনি বুঝেছিলেন, স্পার্টার এই বাহিনীর সবচেয়ে বড়ো শক্তি ঐ দানবগুলো। ওগুলোর চামড়া অনেক শক্ত বলে তাদের দেহে তলোয়ার অথবা বর্শার ফলা বিধতে পারে না। সেজন্য আরেক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। একটা সংবাদ দিয়ে দূত খুব ভালো করেছে, কাজের কাজ হয়েছে তাতে। দানবগুলোর গায়ে অনেক শক্তি, শরীরের চামড়া দুর্ভেদ্য, কিন্তু এই জন্তুগুলো নড়াচড়া জোরে করতে পারে না। মানে ক্ষিপ্রতা অনেক কম। যার অনেক শক্তি আছে তার কিছু দুর্বলতা অবশ্যই থাকবে। তাই দিয়েই সেই শত্রুকে ঘায়েল করতে হয়।

নিজের বাহিনীকে সামনে এগোনোর নির্দেশ দিলেন ট্রাজান। ঘোড়সওয়ারদের একটা দল বর্শা হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। দুলকি চালে শুরু করলেও আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো গতি।

এরিস রণবাদ্য শুনতে পেয়েছে, ঘোড়সওয়ারদের এগিয়ে আসাও দেখতে পেয়েছে। একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। পেছন ফিরে তাকালও সে। তার বাহিনী তার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।

নিকোলাস অপেক্ষা করছে। পায়াসের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সে নিজেই হয়েছে স্পার্টার বাহিনীর অধিনায়ক। অবশ্য পায়াস অনুমতি না দিলেও খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি হতো বলে মনে হয় না। পায়াস নিজেও বুঝতে পেরেছেন, সাথে আর সবাইও বুঝতে পেরেছে, আস্তে আস্তে পায়াসের ক্ষমতা কমে আসছে।

এরিসের চেহারা একবার ঘুরে গেল স্পার্টার বাহিনীর ওপর দিয়ে। নিকোলাস আশা করলো এরিস তাদেরকে যেতে বলবে, তাহলে নিজের যুদ্ধ কৌশল আর সেনা পরিচালনার দক্ষতা একবার দেখিয়ে দেওয়া যাবে। রাঁধুনির যেমন রান্নার প্রশংসা সবচেয়ে আনন্দের কারণ, তেমনি এরিসকে খুশি করতে হলে নিজের যুদ্ধের ক্ষমতা দেখাতে হবে। এমনিতেও মরিস যেভাবে আমাজন মেয়ের কাছে নাকানিচুবানি খেয়েছে তাতে এরিসের চোখে তারা মানে স্পার্টার অভিজাত যোদ্ধারা তেমন একটা সম্মানের জায়গায় নেই।

কিন্তু এরিস আজকে নিকোলাসকে সেই সুযোগ দিলো না। পাত্রাসের পথটাই বেছে নিলো সে। সহজ কিন্তু কার্যকর সেই পথ।

এরিসের অঙ্গুলি নির্দেশে আমাজনদের মধ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে নড়ে উঠলো সাইক্লোপসরা। হেলেদুলে এগিয়ে যেতে লাগলো তারা আগুয়ান রোমান ঘোড়সওয়ারদের দিকে। এরিসের পরিকল্পনা ট্রাজান আগেই ধরতে পেরেছিলেন। তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

তবে যেই রোমান সেনারা দানবদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তাদের মুখে হাসি মুছে গেছে। যতই পরিকল্পনা করে আসা হোক না কেন, এমন দানবদের সামনে কোনো সৈনিকই দাঁড়াতে চাইবে না। আর একটু পরেই মুখোমুখি হবে তারা। দানবদের সাথে প্রশ্ন উত্তরের কোনো পর্ব নেই, কেবল আক্রমণ।

রোমান ঘোড়সওয়াররা তীব্র গতিতে আক্রমন করলো সাইক্লপসদের। ঘোড়া ছুটিয়ে নিজেদের হাতের বর্শা ছুঁড়ে দিলো তীব্র গতিতে। এই কাজে তারা এই পৃথিবীর সেরা, এমনি এমনি রোমান সাম্রাজ্য এখন অর্ধেক পৃথিবী শাসন করছে না। কিন্তু সেই তীব্র গতিতে ছোঁড়া বর্শা সাইক্লপসদের কোনো ক্ষতিই করতে পারলো না। তাদের গায়ে লেগে খসে পড়লো ঝরা ভেজা পাতার মতো।

চোখের সামনে দূতের কথার সত্যটা দেখতে পেলেন ট্রাজান। আগেও যে অবিশ্বাস করেছিলেন তা নয়। এবার বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন তিনি।

রোমানদের এই যন্ত্র অনেক অভিনব। মূলনীতি আবিষ্কার করা হয়েছিল তিনশো বছর আগে। ইতালিতে জন্মগ্রহণ করা সেই বিজ্ঞানীকে দুনিয়া গ্রীক জাত বলেই চেনে। তবে সেই জ্ঞান গ্রীকরা খুব একটা কাজে লাগাতে পারেনি, উৎকর্ষ সাধন করেছে রোমানরা। চোখের সামনে সেই জ্ঞানের প্রয়োগ দেখতে পেলো এবার গ্রীকরা।

এরিস এবার একটু অবাক হলো। এমন জিনিস আগে কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেনি সে। একটা বড়ো লম্বাটে ঘরের মতো জিনিস, কিন্তু চলতে পারে। ঠিক যেন দেখতে নগর দুর্গের পাহাড় দেবার উঁচু স্থান। কিন্তু এই জিনিসকে যুদ্ধের ময়দানে টেনে আনার কারণ কী?

ট্রাজান এবং অন্যান্য রোমান সেনাপতিরা বুঝতে পেরেছিলেন সাইক্লপসদের কিছুতেই বিদ্ধ করা যাবে না। যাকে হত্যা করতে ধার কাজ করবে না, সেখানে ভার অবশ্যই কাজ করবে। তীক্ষ্ণ বলের বিপরীতে এখন ব্যবহার করা হবে ঘাত বল।

এরিস এবং বাকি গ্রীক পক্ষের সবার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যই যেন সেই লম্বাটে চলমান ঘর থেকে তীব্র বেগে ছুটে এলো একটা বিশাল আকৃতির পাথর। একটা সাইক্লোপসকে লক্ষ্য করে পাথরটা ছোঁড়া হয়েছে। এক চোখে প্রথমে দেখতে না পেলেও একটু পরেই নিজের দিকে ছুটে আসা পাথরটা নজরে পড়লো সাইক্লপসের, কিন্তু নিজের ক্ষুদ্র গতির কারণে সরে যেতে পারলো না সে। পাথর এসে তীব্র গতিতে আঘাত করলো দানবীর ঘাড়ে। পুরোপুরি হত না হলেও প্রচণ্ড আহত হলো দানব। ঘাড় ধরে বসে পড়লো যুদ্ধক্ষেত্রে, সেই সাথে চিৎকার করে উঠলো দানবীয় শক্তিতে, কর্কশ গলায়।

রোমানদের যুদ্ধ কৌশল দেখে এরিস এবার একটু সোজা হয়ে বসলো। সহজেই সে বুঝতে পেরেছে, ঐ পাথরের কোনো জবাব সাইক্লপসদের কাছে নেই। ওরা কাবু হবেই।

আশঙ্কা সত্যি হলো। এবার আর একটা একটা করে নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে পাথর ছুটে আসতে শুরু করলো সেই বিশেষ যন্ত্রগুলো থেকে। এবার কয়েকজন সাইক্লপসকে একত্রে আক্রমণ করলো সেই পাথর। আহত হয়ে বসে পরতে বাধ্য হলো তারা।

রোমান বাহিনী জিতে যাচ্ছে প্রথম খণ্ড যুদ্ধে। দানবদের পরাজিত করা গেছে, পরাভূত হয়েছে তারা, হাঁটু মাটিতে গেঁথে দিতে বাধ্য হয়েছে। রোমান সেনারা একত্রে উল্লাস করে উঠলো। অদ্ভুত সেই ধ্বনি। আত্মবিশ্বাস যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে সেই গলা দিয়ে।

এরিস এবার তাকালো আমাজনদের দিকে, স্পার্টার বাহিনীর ওপর তার তেমন ভরসা নেই। আমাজনেরা এরিস তাকাতেই যা বোঝার বুঝে নিলো। এক পলকে দেখা গেল প্রায় গা হাত পা ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকা আমাজনেরা সারিবদ্ধ হয়ে গেছে, এমন সজ্জিত বাহিনীই যেন আর হয় না।

এরিস একটু গলা চড়িয়ে আমাজনদের বলল, 'যাও, দেখিয়ে দাও রোমানদেরকে তোমাদের শক্তি, দিয়ে দাও ঔদ্ধত্যের শাস্তি। ওদের ঐ নিক্ষিপ্ত গোলককে ভয় পেও না, সেগুলো তোমাদের কিছুই করতে পারবে না। নিশ্চয়ই

দেখেছ এতক্ষণ কীভাবে রোমান ঘোড়সওয়াররা সেই গোলাগুলো থেকে বেঁচে ছিল।'

আমাজনদের একজন বলে উঠলো, 'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না পিতা। আপনিই তো আমাদের একেকজনকে এথেনার মতো যোদ্ধা হবার কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি ভালো করেই জানেন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে নামলে ঐ রোমান বাহিনী এসব খেলনা দিয়ে কিছুই করতে পারবে না।'

এগিয়ে গেল আমাজনদের অর্ধেক বাহিনী। ওদিক থেকে রোমান উল্লাস একটু হলেও কমে আসতে লাগলো। ঘটনা কী কিছুই বোঝা গেল না। এই দানবেরাই ছিল প্রতিপক্ষের শক্তি, তাদেরকে কাবু করে ফেলা হয়েছে, কিন্তু শত্রু এখন সাদা পতাকা ওড়াবার বদলে সামনে এগিয়ে দিয়েছে তার নারী সেনাদের। আচ্ছা, দেখা যাক।

ওদিকে সাইক্লপসেরা যুদ্ধের ময়দান থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে গেছে। কম আহত হয়েছে যারা তারা অন্য আহত সাইক্লোপসদের ধরে নিয়ে গেছে প্রান্তরের পাশে। ময়দানে যুদ্ধের অপেক্ষায় এখন দাঁড়িয়ে আছে রোমানদের ঘোড়সওয়ারেরা। তারা দেখছে নিজেদের পায়েই ছুটে আসছে নারীর দল, তীব্র গতিতে।

চিৎকার করে উঠলো ঘোড়সওয়ারদের সেনাপতি। ঘোড়া ছোটানোর বদলে সারিবদ্ধ ওয়ে দাঁড়াতে বলা হলো তাদের। বর্শা বাগিয়ে ঘোড়ার ওপর থেকে পদাতিক নারী যোদ্ধাদের শায়েস্তা করা হবে। এমনিতেই ঘোড়ার ওপর থেকে পদাতিক যোদ্ধাদের সহজেই কাবু করে ফেলা যায়, তার ওপর এরা হচ্ছে নারী। কোনো সুযোগই পাবে না এরা।

আমাজনদের প্রথম সারি ভালোভাবেই দেখতে পেলো রোমান ঘোড়সওয়ারদের। সাথে সাথে তারা বুঝতে পারলো তাদের পরিকল্পনা। একে অন্যের দিকে তাকালো ওরা। একটা কুটিল হাসি ফুটে উঠলো সবার মুখে।

আমাজনরা এগিয়ে আসা মাত্র রোমান সেনারা নিজেদের বর্শা হাঁকালো, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তারা লক্ষ্য করলো, এই নারীদের শরীর যেন চিতার মতো। তারা লাফাতে পারে স্বাভাবিক মানুষের কয়েক গুণ ক্ষমতায়। আমাজনদের প্রথম সারির যোদ্ধারা এক সাথে লাফালো। শূন্যে থাকতেই তাদের হাতে বেরিয়ে এলো দুর্ধর্ষ বাঁকানো ফলার ছোটো তলোয়ার। হেফাস্টাস খুব যত্ন করে এগুলো বানিয়েছে। এগুলোর ধারের কোনো তুলনা হয় না। রোমান ঘোড়সওয়ারদের হাঁকানো বর্শার ওপর দিয়ে তারা উড়ে এসে করলো মোক্ষম আঘাত। বেশির ভাগ রোমান সৈন্যের গলা কেটে গেল, কারো কারো ভীষণ আঘাতে ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেল মাথা।

কয়েক পলের বেশি সময় লাগলো না। রোমান ঘোড়সওয়ারদের একজনও আর ঘোড়ার ওপর থাকলো না। আমাজনেরা এই যোদ্ধাদের হত্যা করে ঘোড়াগুলো অধিকার করে নিলো সহজাত ভঙ্গিতে। কেউ কেউ আবার ঘোড়ায় না চড়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকলো ময়দানে।

এক নিমেষে থেমে গেল রোমানদের কোলাহল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছে না রোমান সেনাপতি আর সেনারা। এমন যুদ্ধের কৌশল তারা জন্মেও দেখেনি। মানুষের শরীর যে এমন কোনো কাজ করতে পারে তা ভাবতেও পারেনি কেউ। তার একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে, এই মেয়েগুলো মানুষ না।

কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে তো আর এভাবে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, পরেও ধাপে পা তো রাখতেই হবে। ট্রাজান এবার জোরালো গলায় নির্দেশ দিলেন তীরন্দাজদের, এই নারী যোদ্ধারা আর যাই হোক, তাদের শরীরে তো তীর অবশ্যই বিঁধবে, এরা তো আর দানবদের মতো দুর্ভেদ্য শরীরের বলে মনে হচ্ছে না।

তীরন্দাজেরা সেনাপতির নির্দেশ পালন করলো সাথে সাথে। বাহিনীর তিন ভাগের এক ভাগ তিরন্দাজ প্রথম থেকেই তৈরি ছিল, তারা এক যোগে মাটিতে হাঁটু গেঁড়ে বসে ছুঁড়ে দিলো তীর। লক্ষ্য ময়দানের মাঝে জড়ো হওয়া আমাজনদের দল।

আকাশের এক অংশ অন্ধকার করে দিয়ে তীরের বৃষ্টি ছুটে আসতে লাগলো তাদের দিকে। এবার আর অচেনা কোনো অস্ত্র নয়, এই তীরের যুদ্ধ অনেক আগে থেকেই করে আসছে আমাজনেরা। শিক্ষাও ভালোই হয়েছে। নিমেষে নিজেদের ব্যূহ ঠিক করে নিলো তারা। সবাই এক যোগে সংকেত শব্দ বলে চিৎকার করে উঠলো। সবার পিঠে ঝোলানো বর্ম পিঠ থেকে চলে এলো হাতে। এক যোগে বর্ম দিয়ে দুর্ভেদ্য ব্যূহ তৈরি হলো। আমাজনদের শরীরের সিকি অংশও বর্মের বাইরে রইলো না। তীরের বৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে ঝরে পড়লো বর্মের ওপর।

গ্রীকদের বর্ম ব্যবহারের দক্ষতার কথা ট্রাজান আগে থেকেই জানতেন। এই উপায় কাজ করবে কি না সেটা নিয়ে আগে থেকেই সন্দিগ্ধ ছিলেন তিনি। এবার সন্দেহের নিরসন হলো। কাজ হয়নি।

আমাজন নারীদের যুদ্ধ কৌশল যেটুকু বোঝার বোঝা হয়ে গেছে। এখন ট্রাজান নিজের সামনে আর একটা উপায়ই খোলা দেখতে পাচ্ছেন। যখন সামনে শত্রু কৌশলে আর দক্ষতায় ওপরে থাকে, তখন সেই শত্রুকে ঘায়েল করার একটাই কার্যকর উপায় থাকে। সংখ্যা।

সংখ্যা দিয়েই শত্রুকে ঘায়েল করার সিদ্ধান্ত নিলেন ট্রাজান। প্রান্তরে থাকা আমাজনদের তিন গুণ সংখ্যার পদাতিক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। নির্দেশ

দেওয়া হলো বাহিনীকে। পদাতিকেরা সারিবদ্ধ হয়ে হাঁটতে লাগলো এবার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

রোমান বাহিনীর এই পদাতিকেরা যুদ্ধ কৌশলে অনেক পটু। তার ওপর তারা একত্র হয়ে যুদ্ধ করতে জানে। আমাজনেরা বুঝতে পারলো এবার আর বর্মের আড়ালে লুকিয়ে থেকে কাজ নেই। তারা বর্ম আবার চালান করে দিলো পিঠে। হাতে বাঁকানো ফলার তলোয়ারের সাথে ধারালো মাথার চাবুক বের হয়ে এলো। একেক জনকে চার জন করে সৈন্যের মোকাবেলা করতে হবে। কাজটা সহজ নয়।

আমাজনদের দলপতি মেয়েটা ইশারা করলো। সাথে সাথে সবাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। জায়গাটা বড়ো করে নিলো যুদ্ধক্ষেত্রের, এবার আগুয়ান পুরো রোমান বাহিনীর মোকাবেলা করা যাবে। ওদেরকে এক জায়গায় জড়ো অবস্থায় পাবে না রোমানরা।

আমাজনদের কীর্তি দেখে আরেক বার আশ্চর্য হলেন ট্রাজান। ওরা এতগুলো সৈন্য এগিয়ে আসছে দেখেও একটু ভয় পায়নি। জায়গা বড়ো করে পুরো আগুয়ান বাহিনীকে আহ্বান করছে। তার মানে প্রতিরক্ষা না, ওরা আক্রমণ করার চিন্তা করছে। কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছেন ট্রাজান।

আর একটু পরেই রোমান পদাতিকেরা মেয়েগুলোর কাছে চলে আসবে। শেষ কয়েক পেস রাস্তা একটু দৌড়ে এলো তারা। তবে আমাজনেরা অনড়, তারা এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে রোমান বাহিনীর দিকে।

একটু পরেই হলো সংঘর্ষ। নিজেদের তলোয়ার আর বর্শা দিয়ে রোমান বাহিনী হামলে পড়লো অপেক্ষমান আমাজনদের ওপর। তীব্র গতিতে তারা চালাতে লাগলো তলোয়ার।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই তাদের ভুল ভেঙ্গে গেল। তারা বুঝতে পারলো এতদিন তাদেরকে মানুষের অস্ত্র চালনার যেসব দক্ষতা আর ক্ষমতার সীমা শেখানো হয়েছিল তা আসলে ঠিক নয়। তার চেয়েও শক্তি ধরতে পারে মানুষ, তার চেয়েও গতিতে আঘাত করা সম্ভব। আমাজনদের হাতের বাঁকানো তলোয়ার আর চাবুকে যেন বিদ্যুৎ খেলে যেতে লাগলো। একজন আমাজনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকছে না। মুহর্মুহু জায়গা বদলাচ্ছে তারা, সেই সাথে হাতের তলোয়ার আর চাবুক দিয়ে করছে মোক্ষম আঘাত, দেখতে দেখতে দলে দলে রোমান সেনা মাটিতে পড়ে যেতে লাগলো হত হয়ে। রোমান সেনা এহেন পরিণতি দেখে এবার শঙ্কার সাথে সাথে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো পুরো শিবির জুড়ে।

কিছুতেই রোমান পদাতিকেরা নিজেদের অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারছে না। শত্রুর অবস্থান বোঝা গেলে অস্ত্র প্রহার করা যায়, কিন্তু এখানে তো শত্রুর অবস্থান বোঝাই যাচ্ছে না। কয়েকজন মৃত্যুর আগে মরিয়া হয়ে অস্ত্রাঘাত করতে গিয়ে দেখা গেল নিজের দলের সৈন্যই মেরে ফেলছে। আমাজনেরা প্রায় অর্ধেক রোমান

পদাতিক মেরে ফেলেছে, যেই গতিতে তারা আঘাত করছে তাতে মনে হচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমান পদাতিক বলে যুদ্ধক্ষেত্রে আর কেউ থাকবে না।

ঠিক তখনই ঘটলো ঘটনাটা। এক রোমান পদাতিক আর সবার মতো আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল নিশ্চিত মৃত্যুকে সামনে দেখে। চোখ বন্ধ করে নিজের হাতের বর্শা সামনের দিকে ছুঁড়ে দিল সে। কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করেনি, কিন্তু মানুষের জীবনে ভাগ্য বলেও একটা জিনিস আছে, মাঝে মাঝে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েও লক্ষ্যে বেঁধানো যায়।

দৈবক্রমে সেই বর্শার সামনে এসে পড়লো লাফিয়ে আক্রমণ রত এক আমাজন। তার বুক ফুঁড়ে দিলো বর্শা। কয়েক হাত পিছিয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে।

গগনবিদারী চিৎকারে সাথে সাথে প্রান্তর যেন কেঁপে উঠলো। এই আমাজনেরা সবাই এরিসের মেয়ে। নিজের মেয়ের এমন হাল দেখে বাবা স্থির থাকতে পারলো না। নিজের ঘোড়া থেকে নেমে এলো এরিস। হাতে তুলে নিলো নিজের তলোয়ার। তারপর ঘোড়ার সর্বোচ্চ বেগের চেয়েও দ্বিগুণ বেগে পেরিয়ে গেল মাঝের খালি জায়গা। যুদ্ধের মাঝে গিয়ে পড়লো কয়েক পলকের মধ্যে।

এরিসের চিৎকার শুনে আমাজনেরা যুদ্ধ বন্ধ করে পিছিয়ে গেছে। যেই মেয়ের বুকে আঘাত লেগেছে সে আহত হয়েছে ভীষণভাবে। বর্মের জন্য বর্শা বেশি ভেতরে ঢুকতে পারেনি। ওরা শুশ্রূষা চালিয়ে গেল।

ভীষণ ক্রোধে সামনে সৈন্যদের দিকে তাকালো এরিস। একটা চিৎকার দিয়ে সেই সেনাদের মধ্যে গিয়ে পড়লো।

রোমান সেনারা তাণ্ডব দেখতে পেলো ময়দানের মাঝখানে। ময়দানের প্রান্তে নিজেদের সীমায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না তাদের। এরিস নিজের তলোয়ার দিয়ে একেক বারে কয়েকজন করে সৈন্যের গলা কেটে ফেলছে। এরিসের শক্তির কাছে বর্ম টিকতে পারছে না। এমনিতেও হেফাস্টাসের বানানো তলোয়ারের ফলা কোনো সাধারণ বর্ম আটকাতে পারা কথা না। সাথে যোগ হয়েছে এরিসের অমানুষিক শক্তি। নিমেষে বাকি অর্ধেক সেনা নিহত হয়ে ভূমিতে পড়লো।

রোমান বাহিনীর দিকে একবার তাকালো এরিস। সেদিকে কোনো নড়াচড়া নেই। তারপর আবার ফিরে গেল আহত মেয়ের অবস্থা দেখতে।

ট্রাজান অনুভব করলেন তার কানের পাশ দিয়ে ঘামের ফোঁটা ঘাড় বেয়ে নেমে যাচ্ছে ক্রমশ নিচের দিকে। সেই সাথে ঘোড়ার ওপরে তার দুই পা কাঁপছে।

দুটো অনুভূতিই তার জীবনে প্রথমবার।

স্পার্টা নগরীতে যেন একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। লোকজন ঠিকমতো বুঝতেও পারেনি, ক্ষমতা চলে গেছে দাসদের হাতে। সব অভিজাতদের বাড়িতে খবর পৌঁছে গেছে। এখন আর হেলটরা কারো অধীনে থাকতে বাধ্য নয়। তারা এখন স্বাধীন। এতদিন পর্যন্ত অভিজাতরা যেসব সম্পদ নিজেদের মনে করে অবাধে ভোগ করতো, সেসব এখন থেকে রাষ্ট্রের সম্পত্তি আর দাসদেরকে এখন থেকে আর তাদের হয়ে কোনো কাজ করতে হবে না।

হোক নির্দয়, নিষ্ঠুর, অসাম্য, কিন্তু এতদিন স্পার্টায় একটা নিয়ম তো ছিল। হঠাৎ দাসেরা স্বাধীন হয়ে যেতেই সেই পুরো নিয়মের কাঠামো ভেঙ্গে পড়লো। প্রথম প্রথম দাসেরা তাদের এই সৌভাগ্য বুঝতেও পারলো না, মেনেও নিতে পারলো না। কিন্তু, আস্তে আস্তে তাদের কাছে খবর পৌঁছে যেতে লাগলো নানা মারফতে। ক্রমাগত এসব কথায় অভিজাতের বাড়ি থেকে নিজেদের বাড়িতে চলে আসতে লাগলো দাসেরা, কিছু কিছু জায়গায় ছোটোখাটো লুটপাটের ঘটনাও যে ঘটলো না তা নয়।

কলিন এখন খুবই ব্যস্ত। পুরো নগরের ক্ষমতা হাতে নিতে হবে, আর তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সেদিনই রানী টায়রাকে নজরবন্দি করা হয়েছে, নেহাত রানী বলে কারাগারে পাঠানো হয়নি। আগেই না-কি রাজকুমারীর বীভৎস মৃত্যু হয়েছে। সেদিকে অবশ্য কলিনের কোনো আগ্রহ নেই। অভিজাতদের পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করতেই তার দুদিন সময় কেটে গেল।

স্পার্টার অভিজাত যোদ্ধারা বেকায়দায় পড়ে গেছে। যারা যুদ্ধে পটু, মানে তরুণ-যুবক-মধ্য বয়স্ক, তারা সবাই যুদ্ধে চলে গেছে। সাথে তাদের সেনার বেশির ভাগই তারা নিয়ে গেছে যুদ্ধে। এখন বুড়ো যে কজন অভিজাত আছে তারা এই বয়সে সাহস করলো না অস্ত্র ধরার। অনায়াসে বিদ্রোহী এবং বিজয়ী দাসদের হাতে চলে যেতে লাগলো অভিজাতদের একেকটা প্রাসাদ। সব প্রাসাদেই অভিজাতদের নজরবন্দি করে ফেললো কলিন, হেলট বিদ্রোহী সেনারা প্রত্যেক প্রাসাদেই পাহারা দিতে লাগলো।

পায়াসের প্রাসাদের হেলটদের তো পোয়াবারো। এমনিতেও পায়াস যখন সবাইকে নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করলেন তখন তারা একটু স্বস্তি পেয়েছিল, আর এখন কলিনের দল তো তাদেরকে স্বাধীনতাই এনে দিলো। তাদের যথেচ্ছ ব্যবহারে এখন আর কোনো বাঁধা রইলো না। তারা ভাঁড়ারের মদ, রেশন, মাংসের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার শুরু করলো।

শুধু দুই দলের ওপর এসবের কোনো প্রভাব পড়লো না। অসিত তো অঙ্গদকে পেয়ে গেছে, সে এখন অঙ্গদের পরিচর্যা নিয়ে ব্যস্ত। রুদ্রদেব আছে নিজের মতো।

অসিতের লক্ষ্য পূরণ হয়েছে, বলতে গেলে তারও লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। শেইরনও অবশেষে নিজের কথা রাখতে পেরেছেন, ওদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন অঙ্গদের কাছে। ওরা প্রাসাদের এবং প্রাসাদের বাইরের এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত।

ইভান, ওরিয়ন আর ইনোনও মুক্ত অবস্থাতেই আছে। কলিন শুরুতেই তার লোকদের বলে দিয়েছিল, সব অভিজাতের বাড়ি অধিকার করলেও অ্যালেস্টরের প্রাসাদের ধারেকাছেও যেন কেউ না যায়। ইনোনকে নিয়ে ইভান সেখানেই গেছে। সাথে আছে ওরিয়ন।

নিজের বাড়িতে সেই ভয়াল রাত্রির পরে প্রবেশ করে ইনোনের মনে আবার বিষণ্নতা ফিরে এলো। সেদিন রাতের তাণ্ডবের চিহ্ন বাড়িটায় এখনো তাজা। সব আসবাব, কার্পেট, দেওয়ালের চিত্র, পর্দা তছনছ অবস্থায় আছে। যেই ঘরে হেলটদের আর এই প্রাসাদের সৈন্যদের একত্র করে হত্যা যজ্ঞ চালানো হয়েছিল সেই জায়গায় শুকিয়ে জমাট হয়ে আছে রক্তের রং। কেউ পরিষ্কার করার প্রয়োজন বোধ করেনি। যে ঘর থেকে ডোরাকে উদ্ধার করা হয়েছিল, সেই ঘরের অবস্থা ওরা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনই আছে। একমাত্র ইনোনের নিজস্ব ঘরের অবস্থা একটু বাস করার মতো আছে এখনো। এই ঘরে আততায়ীরা আসেনি। অনেকদিনের অনুপস্থিতিতে আর স্পর্শের অভাবে কিছু ধুলো পড়েছে কেবল। সেই ধুলোর আস্তর পড়া বিছানাতেই নিজের গা এলিয়ে দিলো ইনোন।

ইভান আর ওরিয়ন বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ইভান মন্তব্য করলো প্রথম, 'এই প্রাসাদের অবস্থা তো অনেক খারাপ।'

'হ্যাঁ, তা তো হবেই। এই প্রাসাদে গণহত্যা চালানো হয়েছিল। প্রত্যেক মানুষ হত্যা করেছে ঐ পাষণ্ডের দল। আর তারপরে এই প্রাসাদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।'

'কিন্তু, এখন উপায় কী?'

'উপায় আর কিছু নেই বন্ধু। হেলটেরা স্বাধীন হয়ে গেছে। এখন ওরা আমাদের কথা শুনবে না। কিছু করতে হলে আমাদেরকেই করতে হবে।'

নিজেদের কাজ করতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এত বিশাল প্রাসাদের ক্লেদ মুছে ফেলা তো যেনতেন কথা নয়। তবু কাজ শুরু করলো ওরা। আর একবার শুরু করতেই সেই কাজের মধ্যে ডুবে গেল।

দুদিন পরে সকালে অঙ্গদকে নিয়ে বসে আছে অসিত। শেইরন মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করছেন অঙ্গদের সাথে। এর মধ্যেই শেইরনের সাথে অঙ্গদের খুব ভাব হয়ে গেছে। তার সাথে বেশ খেলা করে, নানা রকম ইশারায় সাড়াও দেয়।

রুদ্রদেব আজ সকালে প্রাসাদটা একটু ঘুরে দেখতে গিয়েছিল। ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্র আর এদিকের প্রাসাদ নির্মাণের কলাকৌশলের মধ্যে তুলনা করে কিছু অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান অর্জন করাই ছিল উদ্দেশ্য। এরই মধ্যে বেশ কিছু চমৎকৃত

হবার মতো ব্যাপার দেখতে পেয়েছে কিন্তু বিশেষ কৌশলগুলোতে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তবে নির্মাণ ভাবনা আর সৌন্দর্যের ধারণা তাদের কারিগর আর এদিকের কারিগরদের অনেকটাই আলাদা।

এসব দেখতে দেখতে অসিত আর শেইরনের কাছে এসে বসে পড়লো রুদ্রদেব, 'তোমরা এখানে বসে কী করছো?'

রুদ্রদেবকে কেন যেন একটু এড়িয়ে চলে অঙ্গদ, সে অসিতের কোলে চড়ে বসলো। শেইরন হেসে বললেন, 'কী করা যায় সেটাই চিন্তা করছি। তোমাদের সাথে সাথে তো আমারও কাজ শেষ হয়েছে।'

অসিত কথার খেই ধরলো, 'কিন্তু আমার কাজ তো এখনো শেষ হয়নি।'

শেইরন অবাক হলেন, 'কেন? এখন আবার কী কাজ বাকি?'

অসিত নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার জন্য এখানের কাজ শেষ। আপনি তো নিজের বাড়িতেই আছেন। কী করবেন তা ভেবে বের করতে হবে। কিন্তু আমরা তো আর নিজেদের বাড়িতে নেই। আমাদেরকে তো বাড়ি ফিরতে হবে।'

বাড়ি ফেরার কথা বলতে গিয়ে অসিতের মনে ফিরে এলো রাধা। রাধার মা কি এখনো অপেক্ষা করে আছেন? তার বলা তিন বছরের কথা কি রাধার মা রাখবেন? উমা পিসি কি শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারবেন রাধার বিয়ে? না-কি, সবাই ধরে নেবে অসিত একেবারেই গেছে। সে আর ফিরে আসবে না। যে যার চোখের জল আর অপেক্ষার ক্ষণ মুছে দিয়ে নিজের জীবনে ফিরে যাবে।

অসিত আর ভাবতে পারছে না। এবার রুদ্রদেবের দিকে তাকালো সে, 'আমাদেরকে এখনই আমাদের রাজ্যের দিকে যাত্রা করা উচিত। আমরা তো অঙ্গদের দেখা পেয়েই গেছি। এখানে আর কেন থাকবো?'

রুদ্রদেব মাথা নাড়লো, 'হ্যাঁ, এখন আর এখানে থাকার আমাদের জন্য কোনো মানে নেই। চলে যাওয়া যায়।'

অসিত উৎসাহী হলো, 'তাহলে আমরা কখন যাত্রা করবো? শেইরনও কি আমাদের সাথে যাবেন?'

'সেটা শেইরন বলতে পারবেন। তবে এখুনি আমাদের যাবার ব্যাপারে একটু সমস্যা আছে।'

এই কথার মানে শেইরন আর অসিত দুজনের কেউই বুঝতে পারলো না। শেইরন জিজ্ঞেস করলেন এবার, 'কী সমস্যা?'

'শোনো অসিত' রুদ্রদেব এবার বোঝায়, 'অঙ্গদকে তুমি এখানে এসে পেয়েছ। কিন্তু যে অঙ্গদকে তোমার কাছ থেকে চুরি করে এনেছিল, সে কিন্তু এখন আর অঙ্গদের মালিক নয়। সে অঙ্গদকে বিক্রি করে দিয়েছে স্পার্টার শাসকের কাছে। তার মানে অঙ্গদ হয়ে গিয়েছিল রাজ সম্পত্তি। আর এখন এই স্পার্টার অধিকার

হেলটদের মানে কলিনের হাতে। আর সেই কলিন আর হেলটেরাই এখন নিয়ম মতো রাজ সম্পত্তির মালিক। তার মানে অঙ্গদের ওপর তোমার অধিকার নেই।'

অসিত এবার রেগে উঠলো, 'আপনি আমাকে যা বোঝানোর বোঝাতে পারেন, কিন্তু আমি আর অঙ্গদকে কারো হাতে দেবো না। এখন থেকে ও আমার কাছেই থাকবে।'

'সেটা আমিও নিশ্চিত করতে চাই। আর সেটা নিশ্চিত করতে গিয়েই আমি হেলটদের দলের অন্যতম সেনাপতি ইভানকে কথা দিতে বাধ্য হয়েছি। তারা অঙ্গদকে উদ্ধারে আমাদের সহায়তা করেছে, এখন অঙ্গদের মালিকানাও আমাদের দিয়ে দেবে, কিন্তু বিনিময়ে ওদের আগামী যুদ্ধে আমাদেরকে ওদের হয়ে যুদ্ধ করতে হবে।'

'ঝামেলা' এক শব্দের মন্তব্য করলেন শেইরন, 'আবার যুদ্ধ হবে না-কি?'

'যুদ্ধ তো হবেই। এই ঝুঁকি নেয়াটা প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দেবে হেলটদের। আপনি এই রাজ্যের বাসিন্দা হয়েও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না?'

একটু চিন্তা করলেন শেইরন, 'হ্যাঁ, সেটা তো সহজেই বুঝতে পারি। দেবতা, রোমান, গ্রীক যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তাদের সবার মত এক বিন্দুতে মিলে যাবে। তারা কেউই হেলটদের সহ্য করবে না, উঁচুতে স্থান দেবে না। হেলটদের ঔদ্ধত্য কেউই মেনে নেবে না। তাই ওদেরকে আক্রমণ করবেই কেউ না কেউ।'

'হ্যাঁ, আর সেই আক্রমণ সামলানোর সময় আমাদেরকে হেলটদের সাথে থাকতে হবে।'

শেইরন মাথা নাড়লেন, 'নাহ, সেই যুদ্ধে হেলটদের সাথে থাকা কোন বুদ্ধিমান লোকের পরিচয় হবে না। সেই যুদ্ধে যেই লড়ুক, হেলটেরা ধ্বংস হবে অথবা পিঠ দেখিয়ে পালাতে বাধ্য হবে। এখন এখান থেকে কেটে পড়াই ভালো। আমি ভাবছি তোমাদের সাথে সাথে আমিও কেটে পড়বো।'

রুদ্রদেব হাসে, 'হ্যাঁ, সেটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি পদক্ষেপ এবং বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো কাজ তো আর করতে পারবো না, বোকামি আগেই করেছি।'

'কী বোকামি?'

'আমি ইভানের কাছে যুদ্ধে সহায়তা করার প্রতিজ্ঞা করেছি।'

'সেরেছে' মন্তব্য করলো অসিত। সে জানে, ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ভাঙার আগে জীবন দিয়ে দেবে হাসি মুখে।

'হ্যাঁ।' রুদ্রদেবের মুখের হাসি এখনো মোছেনি, 'এজন্যই এই ব্যাপারটার একটা শেষ না দেখে আমরা কোথাও যেতে পারবো না।'

কথা হয়তো আরেকটু এগোত, কিন্তু ঠিক তখনই কয়েকজনকে নিয়ে সেই জায়গায় চলে এলো কলিন। এসেই সরাসরি শেইরনকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো,

'এই যে আপনাকে পেয়েছি এই জায়গায়। এখানে কী করছেন? আপনার কি এখন এভাবে বসে থাকা মানায়?'

'কেন?' চোখ সরু হয়ে এলো শেইরনের, 'কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে তা নিশ্চয়ই আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আমরা একটা রাজ্য দখল করেছি। ব্যাপাটা তো আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। কতদিকে কত কাজ করতে হচ্ছে, এদিকে এই সমস্যা, ওদিকে ঐ সমস্যা। আর এর মধ্যে কথায় আপনি একটু বুদ্ধি পরামর্শ দেবেন, তা না করে বসে বসে মাছি তাড়াচ্ছেন।'

শেইরনের মুখ নির্বিকার, 'যেচে পড়ে কাউকে আমি কখনো পরামর্শ দেই না। তোমার দরকার হলে আমাকে ডাকলেই পারতে।'

'এতক্ষণ তো দরকার পড়েনি। কিন্তু এখন তো আর পারা যাচ্ছে না। আপনার সাথে কথা বলা দরকার।'

'বলো।'

'এখানে?' আশেপাশে একটু তাকালো কলিন।

সমাধানটা দিলো রুদ্রদেব, 'এখানে কেন? আপনারা এখন রাজ্য দখল করেছেন। আর রাজ্যের বিভিন্ন আলোচনা, শলা-পরামর্শ করার জন্যই তো তৈরি হয়েছে রাজসভা। এই প্রাসাদের রাজসভা আমি ঘুরে দেখে এসেছি। মনোরম জায়গা।'

বুদ্ধিটা বেশ পছন্দ হলো কলিনের। রাজসভায় যাবার কথা এতক্ষণেও তার চিন্তায় আসেনি। সবাইকে নিয়ে সে এবার রাজসভার দিকে রওনা দিলো। রুদ্রদেব আর অসিতের না গেলেও চলতো, কিন্তু রুদ্রদেব পা বাড়ালো দলের সাথে। মূলত রগড় দেখাই তার উদ্দেশ্য। ভালোই জমবে মনে হচ্ছে।

কলিনের চেহারায় চিন্তার আসল ছাপ পড়েছে। অনেক সময় মানুষ বেশি আনন্দের ক্ষণে ন্যাকামি করে নিজের দুশ্চিন্তার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটায়। ব্যাপারটা তেমন মনে হচ্ছে না রুদ্রদেবের। আসলেই নানা দিকের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত কলিন।

তবে রাজসভায় প্রবেশ করতেই কলিনের চেহারায় আমূল পরিবর্তন দেখা দিলো। এক নিমেষে তার চেহারা থেকে দুশ্চিন্তা মুছে গিয়ে সেহানে জায়গা করে নিলো মুগ্ধতা। এই রাজসভা থেকে এতদিন স্পার্টার ক্ষমতা পরিচালিত হয়েছে। এই সেই জায়গা। যেখানে আসার জন্য সে এতদিন কষ্ট করেছে। কিন্তু আসার পরে নানা দিকের নানা চিন্তায় প্রাসাদের সবচেয়ে মোক্ষম জায়গায় আসার কথাই মনে পড়েনি। রঙ্গশালা আর মদের দুনিয়াতেই মজে ছিল। কিন্তু আসল জায়গা তো আসলে এটা।

সবকিছু ছাপিয়ে একটা আসনের দিকে নজর চলে গেল কলিনের। চেহারার চাকচিক্য আরেকটু বেড়ে গেল সাথে সাথে। রুদ্রদেবের নজর এড়ালো না এই

পরিবর্তন। এর মধ্যেই হেলটদের মাঝ থেকে কিছু তোষামোদকারী জুটিয়ে ফেলেছে কলিন। তাদেরকে চার পাশে রেখেই এখন ঘুরছে সে। তাদের একজন মোক্ষম সুযোগ বুঝে এগিয়ে এলো। গলায় যথেষ্ট পরিমাণ তেল আর আবেগ ঢেলে বলল, 'দেখেছেন। এটাই সেই আসন। এখানে থেকেই পায়াস এতদিন ছড়ি ঘুরিয়েছেন সবার ওপর। এই আসনেই আছে ক্ষমতা। যতক্ষণ এই আসনে কেউ না বসবেন ততক্ষণ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা চলতেই থাকবে। সময় এসেছে এখন আপনার সর্দার থেকে রাজা হবার। রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন। আপনি বসুন এই সভার সবচেয়ে উঁচু আসনে। এখানেই আপনাকে মানায়।'

সিংহাসনের দিকে চকচকে চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এগোতে লাগলো কলিন। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে এলো এক এক করে। যেন কোনো ঘোরের দুনিয়ায় আছে সে। আসনের কাছে গিয়ে হাতলে একটা হাত লাগলো। মহামূল্য মণি আর ধাতুর স্পর্শে শরীর যেন কেঁপে উঠলো তার। আজ থেকে এই আসন তার। এখানে আর কারো কোন অধিকার নেই। এই রাজ্যে তার কথাই হবে শেষ কথা।

আসনে বসে পড়লো কলিন ধীরে ধীরে। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে সবার দিকে তাকাতে লাগলো। ওদিকে এখন কেবল সভাকক্ষে অসিত, রুদ্রদেব আর শেইরনই দাঁড়িয়ে আছে। বাকি সবাই নিজেদের জন্য আসন দেখে নিয়েছে। মোটামুটি এটাই কলিনের সভাস্থল। সবার দিকে তাকিয়ে হাসিটা ভেতরেই চেপে রাখলো রুদ্রদেব। যেমন হয়েছে রাজা, তেমন হয়েছে তার মন্ত্রিদল।

শেইরন রুদ্রদেবের মতো মজা পাচ্ছেন না, তিনি যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন, 'তোমাদের রাজা মন্ত্রী খেলা শেষ হলে এবার এখানে কেন ডেকে এনেছ তা কি বলা যাবে?'

শেইরনের কথায় কেটে গেল ঘোর। কলিন স্বাভাবিক হয়ে এলো, তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, তোমরা যেন কে কী সমস্যার কথা বলছিলে?'

'সর্দার' সম্বোধন করেই তোষামোদকারী বুঝতে পারলো সম্বোধন ভুল হয়ে গেছে, 'মহারাজ, আমাদেরকে সবকিছুর বিশেষ করে নগরের এবং প্রাসাদের ভাঁড়ারের খাবার দাবারের ওপর একটু নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাপন করতে হবে। এখন যা অবস্থা তাতে খাবার খাওয়া হচ্ছে কম, নষ্ট হচ্ছে বেশি। এই কথা মদের ক্ষেত্রের খাটে। এমন করে চলতে থাকলে খাদ্য সংকট দেখা দিতে দেরি হবে না।'

সমস্যা তো গুরুতর। শেইরন এবার বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন, 'খাবার বাঁচিয়ে রাখাই একমাত্র কাজ নয়। বসে খেলে যেভাবেই খাও না কেন একসময় রাজার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যাবে।'

একটু আগে কলিন রাজা হয়েছে। নিজের রাজভাণ্ডার ফুরিয়ে যাবার ভয় দেখা দিলো তার মধ্যে, 'এখন উপায়?'

'উপায় একটাই। খাদ্যের আমদানির ব্যবস্থা রাখতে হবে। ফসল ফলানোর কাজ বন্ধ করা যাবে না।'

এবার একটু বিপদে পড়লো কলিন। সে নগরে এসেই ঘোষণা দিয়েছে, এখন থেকে সবাই স্বাধীন। কেউ কারো হয়ে কাজ করবে না। গত দুই দিন ধরে তো কেউই কাজে যাচ্ছে না। এমন চললে তো হবে না।

শেইরন এবার সমাধান দিলেন, 'তোমরা আমার কাছে বুদ্ধি চেয়েছিলে, তাই না? এখনই সব ধরনের অবাধ খাওয়া দাওয়া আর চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করো। সবাইকে কাজে পাঠাও আর সেই কাজের পেছনে পরিদর্শক নিয়োগ করো। একটা নগর রক্ষার শৃঙ্খলা বাহিনী গড়ে তোলো, কোটাল আর সেনাপতির দায়িত্ব ভাগ করে দাও।'

আরও অনেকগুলো প্রশাসনিক কাজের এবং পদক্ষেপের কথা একের পর এক বলে গেলেন শেইরন। সব শুনতে শুনতে একবার ঢোক গিলল কলিন। এত ঝামেলা রাজ্য চালনায়, তা কে জানতো? এই আসনে বসে আরাম করলে কিছুই হবে না। এখনই পথে নামতে হবে। শেইরনকেও রাখতে হবে সাথে।

সভা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো সবাই। রুদ্রদেব হাঁটতে হাঁটতে কলিনকে বলল, 'তোমার মুখে শ্রেণি বৈষম্য আর সাম্যের কথা ঐদিন শুনে হাসি পেয়েছিল। তবে সেদিন তোমার ভুলটা ভাঙাতে চাচ্ছিলাম না। কোনো রাজ্য শৃঙ্খল ছাড়া চলতে পারে না। আর শৃঙ্খলার প্রথম কথাই হচ্ছে ধাপ। সবাইকে সবার কাজটা করতে হবে। আর তাতে শ্রেণিবিভাগ থাকবেই। পরম সাম্য বলতে আসলেই কিছু হয় না পৃথিবীতে।'

আজকে আর এই কথার প্রতিবাদ করতে পারলো না কলিন, কিন্তু তার সারা জীবনের ভাবনায় আঘাত লেগেছে, আজকে সে নিজে রাজা হয়ে হেলটদের শ্রেণিভেদের সূচনা করেছে। শুধু মিনমিন সরে সে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে মনীষীরা যে সাম্যের কথা বলেন তার কি বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই?'

রুদ্রদেব বুঝিয়ে দেয়, 'অবশ্যই কিছুটা আছে। রাজ্যে থাকবে শ্রেণিবিন্যাস, কিন্তু শ্রেণি বৈষম্য নয়।'

'তা কীভাবে সম্ভব?' কলিনের চোখে প্রশ্ন।

'একটা আজ করলেই তা সম্ভব। ন্যায় বিচার। সম অপরাধের জন্য সমাজের সব শ্রেণির মানুষ সমান শাস্তি পাবে, আর সমান গুণের জন্য সমান সম্মান। বিচারক কিছুতেই নিজে ন্যায়চ্যুত হবেন না। আর আমার মনে হয় সেটাই সাম্যের সমাজ।'

আর যুদ্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। সব রোমান সৈন্যকে মেরে ফেলার পরে এরিস আর আমাজনেরা একজন আহত মেয়েকে নিয়ে ফিরে গেছে শিবিরে। পেছনে ফেলে গেছে অগুনতি রোমান সৈন্যদের মৃতদেহ। যুদ্ধের কাল অতিবাহিত হয়নি, নিয়ম অনুযায়ী আরও অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করা যেতো। কিন্তু পুনর্বার সেনা পাঠানোর জন্য তো আদেশ দিতে হবে। সেই আদেশ কে দেবে? ট্রাজান অনেকক্ষণ বসে ছিলেন ঘোড়ার ওপরে। সামনে যে দৃশ্য তিনি দেখেছেন তাতে অবিশ্বাস করবেন কী করে। কারো মুখে এমন কোনো ঘটনার বর্ণনা শুনলে অবশ্য কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। দূতের শঙ্কা অমূলক ছিল না। জীবনে এই প্রথম বার পরাজয়ের ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে দিলো। এখানে শুধু যে পরাজিত হতে হবে তা নয়, সমূলে বিনষ্ট হবে রোমান সেনা। এই প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ করার কোনো উপায় নেই।

অনেকক্ষণ পরে নিজের ঘোড়া থেকে নামলেন তিনি। ফিরে তাকালেন নিজের বাহিনীর দিকে। বিশাল সজ্জিত এক বাহিনী। সব ধরনের শস্ত্র চালনা করার মতো যোদ্ধা আছে তার, কিন্তু তারা কিছুতেই ঐ শক্তির সাথে লড়তে পারবে না। জীবনে এমন সময় মাঝে মাঝে আসে, যখন পুরোটা ঢেলে দিলেও সফল হওয়া যায় না, দৈবের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে হয়। এখন সেই সময় উপস্থিত বলেই মনে হচ্ছে।

রোমান সেনাদলে প্রত্যেকটা সেনার মনোবল শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। তারা ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে সম্রাটের দিকে। সম্রাট আদেশ করলে যুদ্ধে যেতেই হবে। কিন্তু এমন অবস্থায় যুদ্ধে যাওয়া আর আত্মহত্যার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। যুদ্ধে প্রাণহানি যে-কোনো সময় হতে পারে, তবে যেখানে জয়ের কোনো সুযোগই থাকে না, সেখানে যুদ্ধ হয় না, হয় আত্মহনন।

নিজের পুরো বাহিনীর ওপর চোখ ঘুরিয়ে আনলেন ট্রাজান। তারপর তাকালেন সামনের শিবিরের দিকে। নাহ, ওদিক থেকে আক্রমণের কোনো লক্ষণ নেই। সম্পূর্ণ শান্ত পরিস্থিতি। তিনিও আদেশ দিলেন, 'যুদ্ধ পতাকা নামিয়ে ফেলো। আজকের জন্য যুদ্ধ এখানেই শেষ।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো অনেকগুলো। কিছু কিছুর আওয়াজ তো স্বয়ং ট্রাজানই শুনতে পেলেন স্পষ্ট। বাদক কথাটা শুনতে পেয়েই বাজিয়ে দিলো যুদ্ধ বিরতির সংকেত বাদ্য। নিশানের রংও বদলে ফেলা হলো সাথে সাথে।

ময়দানে পড়ে থাকা দেহগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। মৃতদেহ সরিয়ে নেয়া অথবা সৎকার করার লোক আগে থেকেই বাহিনীতে ঠিক করা আছে। তবে সেনাপতিরা বুঝতে পারলেন সেসব ঠিক করা লোক এখানে কিছুই করতে পারবে না। তাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি রোমান সেনা মারা গেছে প্রথম দিনের

যুদ্ধে। সেগুলো সৎকার করতে অনেক লোক লাগবে। সবাই নিজের দল থেকে সৈনিকদের ঐ কাজে নিযুক্ত করতে লাগলো।

ট্রাজনের পরিচারক এসে দাঁড়ালো একটু পেছনে, 'মহামান্য, আপনার শিবিরে সবকিছু তৈরি আছে।' ঘোড়ার রশি ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো সে।

হাতের ইশারায় পরিচারককে সরে যেতে বললেন ট্রাজান। তার চোখ একেবারে সামনের দিকে নিবদ্ধ। সেখানে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে তার সৈন্যদের লাশ। রোমান বাহিনী অনেক উত্থান পতন দেখেছে। সম্রাটরা এসেছেন, গেছেন, কিন্তু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল এই বাহিনী, কিন্তু আজকের মতো এমন অসহায়ত্ব কি এর আগে কোনো সম্রাট অনুভব করেছিলেন? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই তার কাছে।

দেখতে দেখতে সূর্য রশ্মি ম্লান হতে লাগলো। দিনের আয়ু ফুরিয়ে এলো সন্ধ্যা। ট্রাজান তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে। পুরো বাহিনী তার আদেশের অপেক্ষা করতে করতে এখনো নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। যারা সৎকার করা কাজ পেয়েছে তারা অন্তত এই অপেক্ষা করা ঝামেলা থেকে মুক্তি পেয়েছে। সন্ধ্যার আঁধারে সৈনিকদের চিতার আগুনের আলো জ্বলজ্বল করে উঠলো।

ট্রাজান ফিরে তাকালেন নিজের বাহিনীর দিকে, 'তোমরা শিবিরে ফিরে যাও।'

কথাটা অনেকটা কষ্টে তার গলা দিয়ে বেরোল। নিজের ঘরে চলে এলেন ট্রাজান। তার জন্য রেখে দেওয়া পরিষ্কার জলে মুখ ধুয়ে যেন গ্লানি আর ক্লান্তি দুটোকেই দূর করে দিতে চাইলেন। এতক্ষণ কোনো ধরনের চিন্তা করতে পারছিলেন না তিনি। এই ঠান্ডা জলের স্পর্শে যেন তার সম্বিত ফিরে এলো।

ভয় এখন অনেকটাই কেটে গেছে। সারাদিনের জমানো ক্ষিধেও অনুভব করলেন তিনি। সেজন্য কাউকে ডাকতে হবে না। তিনি জানেন তার ঘরেই খাবার সাজানো আছে। দূতকে ডাকলেন তিনি।

দূত এসে দাঁড়াতেই আদেশ দিলেন, 'আমার সেনাপতিরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে খাবার শেষ করেছে। আরেকটু অপেক্ষা করবে তুমি। তারপর তাদেরকে খবর পাঠাবে। আমার ঘরেই সভা বসবে।'

দূত চল গেল। সেনাপতিরা নিজেরাও ভয়ে আছেন। এই রোমান সাম্রাজ্যে সেনাপতিদের মূল্য যে-কোনো অভিজাতদের চেয়ে বেশি। তারা যে-কোনো অভিজাত অথবা সভাসদের চেয়ে বেশি সম্মান পায় আর গর্ব নিয়ে চলে। তাদের সেই গর্ব আজ চূর্ণ হয়েছে আর এখন তাদের অস্তিত্বই পুরোপুরি মিটে যাবার পথে। তারাও জানেন, সম্রাট ট্রাজান এমন অবস্থায় কিছুতেই চুপ করে বসে থাকবেন না। কাল কিছু না কিছু তো করতেই হবে। আর সেই আলোচনায় তাদের ডাক পড়বে সবার আগে। তাই তারাও সুযোগ পেয়েই প্রথমে করেছেন স্নান, আর তারপরে মনোযোগ দিয়েছেন খাওয়ায়।

যুদ্ধ চলাকালীন রাত্রে এমন আলোচনা সভা কে দেখেছে কোন কালে। এখানে সবাই উপস্থিত আছে। সম্রাট নিজে আছে সর্বাধিনায়ক হয়ে, পরামর্শদাতারা আছেন, সেনাপতিরা উপস্থিত আছেন এমনকি বিশেষ গুপ্তচরেরাও আছে। কিন্তু কেউই এখানে কিছু বলছে না। সেনাপতিরা উৎসাহজনক কোনো কৌশলের কথা বলছে না, পরামর্শদাতারা কোনো ধরনের বুদ্ধি দিতে পারছে না, দূতেরা বিপক্ষ শিবিরের সেনা সংখ্যা, কৌশল নিয়ে কোনো খবর দিচ্ছে না। এতগুলো মানুষ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ঘরে শুধু নিঃশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

ট্রাজান বুঝতে পারলেন কেউই কোনো কথা বলবে না। তিনিই শুরু করলেন, 'আমি জানি, আপনারা সবাই কেন চুপ কর আছেন। আমরা এখন একটা ভয়াবহ সমস্যায় পড়েছি। তবে সমস্যা যতই ভয়াবহ হোক না কেন, সমাধান তো অবশ্যই বের করতে হবে, তাই না?'

এবারও কেউ কোনো কথা বলছে না, আসলে কী বলা যায় সেটাই কেউ ভেবে পাচ্ছে না। সম্রাট ট্রাজান এবার একটু অধৈর্য হলেন, 'এভাবে সবাই চুপ করে বসে থাকলে কাল সকালে তো আমরা কিছুই করতে পারবো না। আমাদেরকে কিছু একটা তো অবশ্যই করতে হবে।'

এইবার এক জ্যেষ্ঠ সেনাপতি বলে উঠলো, 'সম্রাট। অপরাধ ক্ষমা করবেন। এখানে কী আলোচনা করবো আমরা? আমাদের হাতে এমন কোনো যুদ্ধ কৌশল নেই, শুধু আমাদের হাতে কেন, এই পৃথিবীতেই আমার মনে হয় এমন কোনো যুদ্ধ কৌশল নেই, যার দ্বারা ঐ বাহিনীকে পরাজিত করা যায়। আশা করি এখানে উপস্থিত প্রত্যেক সেনাপতি এই কথায় একমত হবেন।'

এই কথায় ভিন্ন মত পোষণ করার মতো মানসিকতা কারো মধ্যেই দেখা গেল না। সব সেনাপতিই মাথা নাড়লো একযোগে।

সেনাপতিদের চেয়ে এই মুহূর্তে এরচেয়ে বেশি কিছু আশা করছেন না ট্রাজান। তিনি নিজেও যুদ্ধ বোঝেন। এবার তিনি ফিরলেন পরামর্শদাতা কূটনৈতিকদের দিকে। এমন একটা দল সব সম্রাটই পালন করেন। যুদ্ধে গেলে এই দলকে নিয়ে যান। এই অভিজাতের দল সম্রাটের পাশে থেকে সম্রাটের মনোরঞ্জন করেন, নানা ধরনের আনন্দ দান করে। পরামর্শ দাতা হয়ে পরামর্শ না দিয়ে দেন আনন্দ, করেন ভাঁড়ের কাজ। এই পর্যন্ত কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে রোমান সৈন্যদের সম্মুখ যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু করে জেতার কথা চিন্তা করতে হয়নি। আর যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শদাতাদের মতামত খুব একটা নেয়া হতো না।

পরামর্শদাতারাও পড়েছে মহা ফাঁপরে। সম্রাট যেহেতু তাকিয়েছেন কিছু একটা তো বলতেই হবে। এক পরামর্শদাতা মিনমিনে কণ্ঠে বলে উঠলো, 'সম্রাট, আমরা এখন রোম থেকে অনেকটা দূরে আছি। এখান থেকে সেনা নিয়ে এই

রাতেই যদি আমরা রোমে পালিয়ে যাই, তাহলে হয়তো এই যাত্রা আমাদের সেনা বেঁচে যাবে।'

বুদ্ধিটা যে খুব একটা অভিনব কিছু না তা বলেই বুঝতে পেরেছে বুদ্ধিদাতা। ট্রাজান উত্তর দিলেন, 'ভালো বলেছেন। এই যাত্রা বেঁচে যাবো। কিন্তু পরের যাত্রায়। তখন কী করে বাঁচবো। আমরা পালিয়ে গেলে এই বাহিনী নিশ্চয়ই গ্রীসে ফিরে যাবে না। তখন ওরা আমাদের রোম নগরী পর্যন্ত ধাওয়া করবে। তখন পরিস্থিতি হবে আরও খারাপ। আমাদের বাহিনী ধ্বংসের সাথে সাথে তখন রোমেরও পতন ঘটবে। মানে রোমান সাম্রাজ্যের নামধাম মিশে যাবে পৃথিবী থেকে। মিশরে আমাদের যে বাহিনী আছে তারা যখন রোমের পরাজয়ের খবর শুনবে তখন কী করবে মনে হয়?'

তারা কী করবে সেই উত্তরে কারো আগ্রহ নেই। সম্রাটেরও নিশ্চয়ই নেই। তবে সম্রাটের কথায় পরামর্শদাতাদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কথাটা দুয়েকজন সেনাপতির যে একেবারেই অপছন্দ হয়েছে তা নয়। তাদের মধ্যে মৃত্যুভয় প্রবেশ করেছে। এখন রোমের দিকে পালিয়ে গেলে আপাতত প্রাণ তো রক্ষা পাবে। পরে না হয় ভেবেচিন্তে কিছু একটা বের করা যাবে। কিন্তু সম্রাটের উত্তর দেওয়া আর মুখের ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে তিনি এই পথে হাঁটবেন না।

সেনাপতিদের মুখ আগেই বন্ধ হয়েছিল, এবার পরামর্শদাতাদের মুখও বন্ধ হলো। রইলো কেবল গুপ্তচরেরা। কিন্তু তাদেরও কিছু বলার নেই। যা বলার তারা এরই মধ্যে সম্রাটকে বলে দিয়েছে। তারাই হচ্ছে এখন সবচেয়ে নিরাপদ। সম্রাট তাদের ওপর রাগ করতে পারবেন না। তারা যা বলেছে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে সব।

ট্রাজান গুপ্তচরদের দিকে তাকালেন, 'সে এখনো আসেনি কেন?'

গুপ্তচরেরা একটু অবাক হলো। নিজেদের দলের দিকে একবার দেখে মিলিয়ে নিলো তারা। না, সবাই তো এখানে উপস্থিত আছে। তাহলে সম্রাট আবার কার উপস্থিতির কথা বলছেন।

ট্রাজান এবার শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আজকে আমার বাহিনীর যে সদস্যরা মারা গেছে তাদের জন্য আমরা সবাই ব্যথিত। কিন্তু মাঝে মাঝে শোককে পাশে ঠেলে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদেরকে প্রতিশোধের ব্যাপারে সবসময় ভাবলে চলবে না। গর্ব, অহংকার এসব একদিকে সরিয়ে রেখে এখন যুক্তিকেই সম্বল করে বেঁচে থাকতে হবে। সবার প্রথমে রোমান সেনা আর রোমবাসীর প্রাণ বাঁচানোই আমাদের লক্ষ্য। হ্যাঁ, জানি, সম্রাট হিসেবে আমার এই কথা বলা উচিত হচ্ছে না, কিন্তু আমি এই মুহূর্তে আসলেই বিশ্বাস করছি, সাম্রাজ্যের গর্ব বাঁচানোর চেয়ে সাম্রাজ্যের নাগরিক আর সেনাদের প্রাণ বাঁচানোই এখন আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।'

এই ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারলো না। সবার মনে প্রাণ ভয় ঢুকে গেছে, গর্ব অনেক আগেই ত্যাগ করেছে সবাই।

এবার এক পরামর্শদাতা বলে উঠলো, ' সম্রাট যথার্থ বলেছেন। তাহলে কূটনীতির মতামত অনুযায়ী এখন আমাদের হাতে দুটো কাজ করার আছে। আত্মসমর্পণ অথবা সন্ধি।'

'না', ট্রাজান জানালেন নিজের মত, 'এখন আমাদের সামনে দুটো পথ খোলা নেই। পথ খোলা আছে একটাই। সন্ধি করার মতো অবস্থানে আমরা নেই। আমাদেরকে আত্মসমর্পণই করতে হবে। সন্ধি করার মতো অবস্থায় আছে প্রতিপক্ষ। তাদের দেওয়া সিদ্ধান্তই আমাদেরকে মেনে চলতে হবে।'

এবার একটু গুঞ্জন উঠলো সেনাপতিদের মাঝে। রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে মাঝে মাঝে কৌশলগত ভাবে যুদ্ধ এড়ানো অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সন্ধি করার উদাহরণ থাকলেও এমন নির্ভেজাল আত্মসমর্পণ করার ইতিহাস একেবারেই নেই। রোমান সাম্রাজ্য এই কাজের ফলে একটা বড়োসড়ো ধাক্কা খাবে তা বলাই বাহুল্য।

ট্রাজান নিজের চিন্তাটা সবার কাছে ব্যক্ত করলেন এবার, ' আমাদেরকে ঐ দেবতা আর ঐ বাহিনীর সম্পর্কে আরও খোঁজ নিতে হবে, তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ঐ দেবতা আমাকে বলেছিল, এই রোমের মাটিতে তার কোনো আগ্রহ নেই, সে চায় গ্রীস যাতে স্বাধীন হয়। কিন্তু কেন? গ্রীস স্বাধীন হলেই বা তার কী, অথবা পরাধীন হলেই বা তার কী?'

একজন বলে উঠলো, 'হতে পারে সেই দেবতা গ্রীসের নাগরিকদের নিজের লোক মনে করে আর নিজের লোকের স্বার্থের জন্যই এসব করছে।'

ট্রাজান ভ্রু কুচকালেন, 'তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা সম্পূর্ণভাবেই করা হচ্ছে গ্রীসের স্বার্থের জন্য। কিন্তু সেটা তো এভাবে না করে অন্য ভাবেও করা যেত।'

'কীভাবে', এক সেনাপতি প্রশ্ন করে।

'সে নিজের বাহিনী নিয়ে গ্রীসের বিভিন্ন রাজ্যে যেতে পারতো, রোমানদেরকে যুদ্ধে মেরে ফেলতে পারতো, অথবা তাড়িয়ে দিতে পারতো। তারপর নিজেদের রাজ্যকে স্বাধীন ঘোষণা করতো। রোমে আসার দরকারই পড়তো না। যেহেতু রোমের মাটি নিয়ে তার কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু তা তো সে করেনি। সে রোমে এসেছে এবং তার আসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরাসরি আমাকে মানে রোমান বাহিনীকে পরাজিত করা। সহজ কাজ ফেলে রেখে সে কঠিন কাজটা কেন বেছে নিলো?'

' এই প্রশ্নের উত্তর কার কাছে আছে?' এক পরামর্শদাতা জানতে চায়।

'আমাদের কারো কাছে নেই সেটা নিশ্চিত। তবে যার কাছে আছে তার এতক্ষণে এই সভায় যোগ দেবার কথা। এখনো কেন দিচ্ছে না সেটাই বুঝতে পারছি না।'

সম্রাটের কথা শেষ হবার সাথে সাথে ঘরের দরজার কাপড় সরিয়ে দেবার আওয়াজ শোনা গেল। সবার মুখ ঘুরে গেল দরজার দিকে। সম্পূর্ণ কালো চাদরে ঢাকা একজন প্রবেশ করেছে ঘরে। ঢুকেই সম্রাটকে মাথা নিচু করে কুর্নিশ করলো সে। তারপর গায়ের চাদর সরিয়ে ফেললো। ভেতরের সাজ প্রকাশিত হয়ে পড়লো সাথে সাথে। স্পার্টার সৈন্যের সাজ। এই সাজ পরা লোকদের আজকে দেখা গেছিল বিপক্ষের শিবিরে।

'এসো', বললেন ট্রাজান, 'তোমার তো এত দেরি করার কথা ছিল না।'

'ক্ষমা করবেন সম্রাট। শিবিরে আমাদের দলে সৈন্যের সংখ্যা অনেক কম। চোখে ধুলা দেওয়া একটু কঠিন। তাই আসতে একটু দেরি হয়েছে।'

'বসো।' এই সৈন্যরুপী গুপ্তচরই তাকে সব খবর দিতে পারবে। পায়াসের বাহিনীতে কিছু রোমান সৈন্যের মধ্যে সেও আছে। ট্রাজান কালই তাকে খবর দিয়ে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য তেমন কিছু না। বিপক্ষ দলের যুদ্ধ পরিকল্পনা জানা। জাতে রোমান হওয়াতে সেও রাজি হয়ে গেছে গুপ্তচরের কাজ করতে। সেটা কি ভয়ে না কৃতজ্ঞতায় তা বলা শক্ত।

'আমি একবার ভেবেছিলাম তুমি আসবে না। প্রায় পরাজিত এক পক্ষের জন্য এমন ঝুঁকি তুমি নাও নিতে পারতে। এরই মধ্যে তুমি আছো প্রায় জয়ী দলে।'

'সে কথা ঠিক সম্রাট। কিন্তু আমি রোমান সেনা। আর রোমান সেনারা সাম্রাজ্যের প্রতি ঋণ কখনোই ভোলে না।'

হাসি ফুটে উঠলো ট্রাজানের মুখে, 'তাহলে তোমাকে আর দেরি না করাই। কিছু প্রশ্ন আছে, সেগুলোর উত্তর দিয়ে তুমি আবার শিবিরে ফিরে যাও। তোমার কোনো বিপদ ঘটুক, তা আমি চাই না।'

'সানন্দে সম্রাট।'

'তাহলে এবার বলো, ঠিক কি কারণে ঐ দেবতা আমাদের রাজ্য আক্রমণ করেছে?'

'সম্রাট। দেবতার এখানে একটাই উদ্দেশ্য। সে নিজের আসল জায়গা মানে অলিম্পাসে ফিরে যেতে চায়।'

'অলিম্পাস! সেটা আবার কোন জায়গা?'

'সেটা পৃথিবীর কোনো জায়গা নয়। দেবতাদের বাসস্থান। সেখানে যেতে হলে স্বাধীন রাজ্যের রাজার ঐ দেবতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হয়। সেজন্যই ঐ দেবতা আপনাকে পরাজিত করতে এসেছে। আপনি এখন রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হিসেবে গ্রীসেরও রাজা। আর আপনাকে পরাজিত না করতে পারলে গ্রীস

কিছুতেই স্বাধীন হবে না। তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে, কিন্তু তাতেও লাভ হবে না। ঐ দেবতার মতে এই কাজ সম্পন্নের জন্য আপনাকে আক্রমণ করে পরাজিত করাই সবচেয়ে সহজ রাস্তা।'

এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে গেল ট্রাজানের কাছে, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ দূত। এই খবরটার জন্যই আমি অপেক্ষায় ছিলাম। তুমি আর দেরি কোরো না। গোপনে শিবিরে ফিরে যাও। তোমার কোনো বিপদ ঘটুক তা আমি চাই না।'

দূত বেরিয়ে যেতেই সবার উদ্দেশ্যে বললেন ট্রাজান, 'এবার বলুন আমরা কী করবো?'

এক পরামর্শদাতা এবার খুঁজে পেলো মোক্ষম উপায়, 'সম্রাট, আমার কাছে সহজ এক উপায় আছে। গ্রীসের স্বাধীনতাই ঐ দেবতার লক্ষ্য। তো আপনি যদি ঐ দেবতার সাথে কাল যুদ্ধ শুরুর আগে সাক্ষাৎ করে তাকে সমস্ত গ্রীস বিনা শর্তে দিয়ে দেন, তখন তো আর আপনার সাথে যুদ্ধ করে ঐ দেবতার কাজ নেই। একমাত্র তখনই আমরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি।'

এই প্রস্তাবের একটা সমস্যাও আছে, আর সেটাও খুঁজে বের করলো এক সেনাপতি, 'সম্রাট, এই কাজটা আপনি করতেই পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন, গ্রীস তাদেরকে দিয়ে দেওয়ার মানে হচ্ছে আমাদের রোমান সাম্রাজ্যের মাঝখান দিয়ে দুই ভাগ হয়ে যাওয়া। গ্রীস কিন্তু ইতালি আর মিশরের মধ্যে একটা সেতু। আমরা সেনা চালনা এবং বাণিজ্য দুটোতেই তখন অনেক অসুবিধায় পড়বো।'

নিজের প্রস্তাবের বিরোধিতা হওয়াতে চুপ করে বসে থাকার মানুষ ঐ অভিজাত না, এমনিতেও অভিজাত সভায় ঝগড়া করার গুণকে আলাদা সম্মান দেওয়া হয়, সে রীতিমতো খেঁকিয়ে উঠলো, 'আমার বুদ্ধি তাহলে তোমার পছন্দ হয়নি। তাহলে কী চাও? সবাই মিলে এখানে মারা যাই?'

সেনাপতি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ট্রাজান হাত তুলে ততক্ষণে দুজনকেই থামিয়ে দিয়েছেন, 'কেউ আর কোনো কথা বলবে না। আমার আর কোনো আলোচনার দরকার নেই। পুরো ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। চিন্তাও এখন আমি একা করবো, সিদ্ধান্তটাও আমাকেই নিতে হবে। এখন সবাই ঘর ত্যাগ করুন।'

আদেশ পালিত হলো সাথে সাথে। ঘরের আলো কমিয়ে দিয়ে আসনে আধশোয়া হয়ে চিন্তা করছেন ট্রাজান। ভালোই বুঝতে পারছেন, আজকে রাতটা তাকে নির্ঘুম কাটাতে হবে।

2024/01/15 19:08

আজ আর রোমান বাহিনীর যুদ্ধে কোনো উৎসাহ নেই। কাল সারারাত ট্রাজান ঘুমাতে পারেননি। সেনাপতি আর বাকি সেনাদেরও যে খুব ভালো ঘুম হয়েছে তা বলা যাবে না। আজকে সকালে কী করতে হবে, তার কোনো সিদ্ধান্তই কোনো সেনাপতি জানে না। ট্রাজান কাল সারারাত ধরে কী চিন্তা করেছেন, কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার কিছুই জানা যায়নি। ভোর হতেই সেনাপতিরা সবাই বেরিয়ে এসেছে নিজেদের তাবু ছেড়ে। সম্রাটের তাবু থেকে একটু দূরত্ব রেখে একত্র হয়েছে সবাই।

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে বেশি কিছুক্ষণ আগে। ট্রাজানের তাবু থেকে কোনো সাড়া আসছে না। সেনাপতিরা জানেন, আর যাই হোক, ট্রাজান পালিয়ে যাবেন না। কাল সারারাত সম্রাট ঘুমাননি সেই খবর এর মধ্যেই তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। শুধু তাই নয়, পাশের নগর থেকে সেই রাতেই দুজন পুরোহিতকে ডেকে আনা হয়েছিল সম্রাটের তাবুতে। অনেকক্ষণ তাদের সাথে নানা আলাপে মগ্ন ছিলেন সম্রাট। তারাও ফিরে গেছে ভোর হবার একটু আগে। এখন সব সেনাপতিরা তাই নিয়েই কানাঘুষা করছেন। এই সময়ে আবার পুরোহিত আনার কী দরকার পড়লো।

একটু পরেই ঘনিয়ে এলো দিনের যুদ্ধ শুরুর সময়। সূর্য আরেকটু মাথা তুলেছে। সেনাপতি আর সেনারা এবার তাকালেন বিপক্ষ শিবিরের দিকে। ওদিকে বেশ কিছু নড়াচড়া এবার চোখে পড়ছে। আর সেই নড়াচড়া স্বাভাবিক নয়। কাল বিপক্ষ দলের বাহিনীর মধ্যে একটা গা-ছাড়া ভাব ছিল। কিন্তু আজ তার একটুও দেখা যাচ্ছে না। পুরো বাহিনী সারিবদ্ধ হয়ে অবস্থান করছে। বাহিনীতে কোনো বিভাজন নেই। নারী সেনাদলের মধ্যে মধ্যে অবস্থান করছে দানব সৈন্যরা। আর এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্পার্টার পুরুষ সৈন্যদের বাহিনী। তার মানে আজ যুদ্ধ শুরু হলে ওদেরকে এক সাথে আক্রমণ করবে শত্রু। কোনো কৌশলগত কারণে কম সেনা দিয়ে ওদের খণ্ড সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না। শত্রু এখন কৌশল দিয়ে যুদ্ধ করবে না, করবে প্রবল হিংসা আর ক্রোধ দিয়ে।

স্পার্টার শিবিরে উড়লো সমর পতাকা। সমর ধ্বনি বেজে উঠলো তীব্র নিনাদে। সেই ভীষণ ধ্বনি শুনে গলা-বুক হিম হয়ে আসতে লাগলো রোমান বাহিনীর। একদিকে সিদ্ধান্তহীনতা আর আরেকদিকে শত্রুর এই ধ্বংস পদক্ষেপ তাদেরকে একেবারে বোবা করে দিলো।

সেনাপতিরা আর অপেক্ষা করতে পারলো না। যুদ্ধ শুরু সময়ের আর খুব বেশি বাকি নেই। সেই সময় সমাগত হলেই বিপক্ষ দল আক্রমণ শুরু করবে। আর

সেই আক্রমণের তোড়ে ভেসে যেতে হবে তাদের। এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি হলো সিদ্ধান্ত, আর সেটা দিতে হবে সম্রাট ট্রাজানকেই।

শেষ পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ সেনাপতি ট্রাজানের কাছে যেতে রাজি হলেন। ভয়ে ভয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন সম্রাটের তাবুর সামনে, 'সম্রাট, আসতে আজ্ঞা দিন।'

'এসো।' ভেতর থেকে ভেসে এলো সেই চিরপরিচিত কঠিন স্বর।

'সম্রাট' প্রবেশ করলো সেনাপতি, 'বাইরে শত্রু যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমাদের সেনা এখনো গঠন করা হয়নি। আপনার নির্দেশের জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করছি।'

'সেনাকে বিশ্রামে থাকতে বলো। এখন আর সেনা সাজানোর প্রয়োজন নেই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। যেই কাজ করতে চলেছি সেখানে যুদ্ধ করতে হবে না।'

সম্রাট বাইরের শত্রুর অবস্থান আর মানসিকতা দেখেননি, বুঝিয়ে দিলো সেনাপতি, ' সম্রাট, শত্রু যুদ্ধের জন্য একেবারে মুখিয়ে আছে। আমার মনে হয় না কোনোভাবে এই শত্রুকে এখন যুদ্ধ থেকে দূরে রাখা যাবে। আজকে যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে।'

'তাই না-কি, তাহলে দেখি শত্রুর অবস্থা।'

সম্রাট ট্রাজান বেরিয়ে আসতেই সবাই সোজা হয়ে দাঁড়ালো, সেই সাথে সবাই খেয়াল করলো, সম্রাটের পরনে যুদ্ধ সাজ নেই। যুদ্ধ শুরু হবার তো আর অল্পক্ষণই বাকি আছে।

ট্রাজান সামনের বাহিনীর দিকে তাকালেন। শত্রুর দাঁড়ানোর ওপর ভিত্তি করে তিনি শত্রুর মনোভাব বুঝতে পারেন। এই বাহিনী আজকে অবশ্যই সর্ব ধ্বংসের অভিপ্রায়ে যুদ্ধ করবে। তবে তার নিজের ওপর বিশ্বাস আছে। তিনি জানেন, তার কাছে এই যুদ্ধ রোধ করার যথেষ্ট উপায় আছে।

জোরালো গলায় ঘোষণা করলেন ট্রাজান, 'আমার ঘোড়া নিয়ে এসো।'

আদেশ পালিত হলো সাথে সাথে। সম্পূর্ণ সজ্জিত করে নিয়ে আসা হলো তার ঘোড়া। একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি ঘোড়ার ওপর। নানা অস্ত্রসস্ত্র সজ্জিত আছে ঘোড়ার গায়ের পিঠাবরণের বিভিন্ন জায়গায়। কাউকে কিছু বললেন না তিনি। সবগুলো অস্ত্র আস্তে আস্তে খুলে মাটিতে রাখলেন। কাজ শেষে ভালো করে পরীক্ষা করে নিলেন, যাতে ঘোড়ার গায়ের কোনো খোপে আর কোনো অস্ত্র না থাকে।

তার নিজের শরীরেও কোনো অস্ত্র নেই। ঘোড়ায় উঠে পড়লেন সম্রাট ট্রাজান, তারপর ছুটিয়ে দিলেন যুদ্ধ ঘোড়া প্রায় ঝড়ের বেগে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের দিকে এই ঘোড়ায় করে অনেক বার ছুটে গেছেন তিনি। কিন্তু কখনো এমন অস্ত্রশূন্য হয়ে নয়।

2024/01/15 19:22

এদিকে এরিস আজকে সেনার একেবারে সামনে অবস্থান করছে। তার কালকের ক্রোধ একেবারেই শান্ত হয়নি। বরং আরও বেড়েছে। এই বাহিনীর সাথে খেলা করা, ক্ষমা করার কোনো ইচ্ছেই তার নেই। সে রোমান বাহিনীকে ধ্বংস করে দেবে। নিজে যুদ্ধের দেবতা হওয়াতে এখনো আক্রমণ করতে পারছে না। কিন্তু সময়টা এগিয়ে এলেই আর ছাড় দেবে না। একেবারে সমূলে বিনাশ করে দেবে ওদের। তার পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে থাকা আমাজনদেরকে কিছুই বলতে হয়নি, কিন্তু তারা সবাই এরিসের মনের কথা বুঝতে পেরেছে। তারা নিজেরাও ক্রোধে ফুটছে। এই মানুষের দলের এত বড়ো সাহস, যুদ্ধে আমাজনদের গায়ে বর্শা বিদ্ধ করে।

তখনই শত্রুর শিবির থেকে একটা মাত্র ঘোড়া ছুটে আসতে দেখা গেল। রোমান শিবির কোনো পতাকা টানিয়ে দেয়নি, কোনো রণবাদ্যের আওয়াজও ভেসে আসছে না সেখান থেকে। কিন্তু একজন ঘোড়সওয়ার শুধু এগিয়ে আসছে। এখনো দূরে আছে বলে ঠিক ঠাহর ওরা যাচ্ছে না ঘোড়সওয়ারের পরিচয়। নিজের দৈব দৃষ্টি ক্ষমতার ব্যবহার করে চোখের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিলো রুদ্রদেব। সাথে সাথে চিনতে পারলো ঘোড়সওয়ারকে। রোমান সম্রাট ট্রাজান আসছে। কেন আসছে সেটাও জানে এরিস। নিশ্চয়ই সন্ধি করতে, না না, সন্ধি তো আর করার অবস্থা নেই, নিশ্চয়ই দয়া ভিক্ষা করতে আসছে সে। কিন্তু দয়া ভিক্ষা পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

দৈব দৃষ্টিতে সে দেখতে পাচ্ছে, না, সম্রাটের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। নিজের ক্রোধ বেড়ে গেল সাথে সাথে এরিসের। এই মানুষ জাতি চিরকালই খুব চালাক। এই ব্যাটাও ওরকমই। বুদ্ধি করে নিজের সাথে কোন অস্ত্র আনছে না, ঘোড়ার গায়েও কোনো অস্ত্র সজ্জিত নেই। অস্ত্রহীন একটা মানুষকে যে কিছুতেই যুদ্ধের দেবতা যুদ্ধক্ষেত্রে মারবে না, এটা এই ব্যাটা জানে।

দাঁতে চেপে বসা দাঁতের পাতি একটু আলগা করলো এরিস, তাকালো এক স্পার্টান সৈন্যের দিকে, 'রোমান সম্রাট ট্রাজান আসছে। যাও, গিয়ে দেখো, সে কেন আসছে। আমার কাছে নিয়ে এসো।'

সৈন্য এগিয়ে গেল আদেশ পালন করার জন্য। একটু পরেই ট্রাজানকে দেখা গেল সৈন্যের সাথে আস্তে আস্তে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন। সৈন্য গিয়ে দাঁড়ালো এরিসের পাশে, 'মহামান্য, রোমান সম্রাট আপনার সাথে আলোচনা করার জন্য এসেছেন।'

সৈনিকের কথার উত্তর দিলো না এরিস, ঘোড়াকে একটু ধাক্কা দিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো ট্রাজানের সামনে, 'কথা যা বলার ছিল সেটা তো যুদ্ধ শুরুর আগেই বলে ফেলেছি। এখন আর কী বলবে? এখন শুধু কথা হবে শস্ত্রে শস্ত্রে। যাও, শিবিরে ফিরে যাও। সবাই মিলে প্রস্তুতি নাও। পতাকা ওড়াও, যুদ্ধ সাজে সাজো। সবাই

মিলে আজ বীরগতি প্রাপ্ত হবে। একজন যোদ্ধার জন্য সবচেয়ে সম্মানের মৃত্যুই আজকে তোমাদের উপহার দেবো আমরা।'

ট্রাজান কিছুই বললেন না। নেমে এলেন ঘোড়া থেকে। আলখাল্লাটা গুটিয়ে নিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসলেন এরিসের সামনে, ঝুঁকে এলো তার মাথা, 'মহামান্য। আমি আর আমার সৈন্যরা অস্ত্র ত্যাগ করে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি। আপনি দেবতা। নিশ্চয়ই আমাকে এভাবে ফিরিয়ে দেবেন না। আমার কথা একটু শুনুন। আমার প্রস্তাব যদি আপনার ভালো না লাগে তাহলে আমি নিজে আমার এবং আমার সৈন্যদের গলা আপনাদের শস্ত্রের নিচে পেতে দেবো।'

'যাক, কুর্নিশ করাটা অবশেষে শিখতে পেরেছ।' ঘোড়া থেকে নেমে এলো এরিস, 'আচ্ছা, তোমার এই বিনয়ের জন্য একটা সুযোগ তুমি পেতে পারো। তবে সেজন্য তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

স্পার্টান শিবিরের একটা ছোটো তাবুতে বসে আছেন স্বয়ং রোমান সম্রাট ট্রাজান। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে যুদ্ধ শুরুর সময়। কিন্তু এরিসের দল এখনো আক্রমণ করেনি।

আরও বেশ কিছুক্ষণ পরে ঘরে এসে প্রবেশ করলো এরিস। ট্রাজান সাথে সাথে দাঁড়িয়ে আবার কুর্নিশ করলেন। এরিস হাসতে হাসতে বসে পড়লো সবচেয়ে বড়ো আসনে, 'তুমি যে ইচ্ছে করে আমাকে সম্মান জানাচ্ছো না তা আমি জানি। তবে যাই হোক, হতে পারে, একসময় তুমি মন থেকে আমাকে সম্মান জানাবে।'

'আমি আপনাকে মন থেকেই সম্মান জানাচ্ছি।' মিথ্যে কথাটা না বলে উপায় থাকলো না ট্রাজানের।

'যাই হোক, তোমার ভাগ্য খুবই ভালো। তোমার সেনাবাহিনী বেঁচে গেছে কি-না সেটা বলতে পারছি না, তবে আমার ক্রোধ একটু হলেও শান্ত হয়েছে। নইলে এতক্ষণে তোমাদের মৃতদেহ মাঠে পড়ে থাকতো।'

এরিস মুখটা এগিয়ে আনল ট্রাজানের দিকে, 'মনে আছে, কাল যুদ্ধে আমার এক মেয়ের বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দিয়েছিলে তোমরা?'

জবাব দিলো না ট্রাজান, জবাব দেবার দরকারও নেই, কথা বলছে এরিস, 'আমার মেয়ের প্রাণের ওপর তোমাদের প্রাণ নির্ভর করছিল। চিকিৎসক কাল দুপুর থেকেই চেষ্টা করছিল। আজ সকালে আমাকে বলেছিল, মেয়েটা আর বাঁচবে না। আর পিতা হিসেবে তোমাদের না মেরে আমার প্রতিশোধ পূর্ণ হবে কী করে। কিন্তু ঐ যে বললাম, তোমার ভাগ্য ভালো, তুমি যখন ঘোড়া নিয়ে এলে তখন ঐ চিকিৎসক আমাকে ইশারায় ডাকলো। মেয়েটা বেঁচে গেছে। জ্ঞান ফিরে এসেছে।'

'শুনে খুব আনন্দিত হলাম।' সাবধানে শব্দ চয়ন করতে হচ্ছে ট্রাজানকে।

'আচ্ছা, এবার বলো, এখানে কেন এসেছ? সেটা তো বুঝতেই পারছি, কালকের যুদ্ধ দেখে চোখে ধাঁধা লেগেছে। তোমার মতো মানুষদের নিয়ে সমস্যা।

তারা শুনে কিছুই বিশ্বাস করতে চায় না, সবসময় প্রমাণ চায়। মাঝে মাঝে প্রমাণ করার জন্য করা পরীক্ষায় মানুষের চরম সর্বনাশ হয়ে যায়।'

'আজ্ঞে। এখন আমার চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি আপনার পরিচয়।'

'যাক ভালো। আচ্ছা শোনো, আমার প্রথমে যে প্রস্তাব ছিল, গ্রীসের মালিকানা তুমি ছেড়ে দিয়ে রাজা হিসেবে অন্য কাউকে ঘোষণা করবে, সেই শর্ত মেনে নিলেও কিন্তু এখন এই যুদ্ধ বন্ধ হবে না।'

আশ্চর্য হয়ে গেলেন ট্রাজান, 'কেন? আপনি তো তাই চেয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা তো যুদ্ধ শুরু হবার আগে। তখন তুমি আমাকে বিশ্বাস করলে তো যুদ্ধই হতো না। এখন আমি একদিন যুদ্ধ করে ফেলেছি। তখন ছিল সন্ধির অবস্থা, আর এখন তোমরা পরাজিত পক্ষ। এখানে আমি কীভাবে আগের শর্তে রাজি হই?' এরিসের ঠোঁটে কৌতুকের হাসি। পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সম্রাটকে নিয়ে খেলতে মজাই লাগছে।

কাল সারারাত অনেক চিন্তা করেছেন ট্রাজান, নিজে নগরের পুরোহিতদের সাথে কথাও বলেছেন। দেবতার কাছে প্রস্তাব দিতে হলে, দেবতার সাথে যুক্তির লড়াই লড়তে হলে, তাকে বোঝাতে হলে আগে তো দেবতাকে বুঝতে হবে। কাল রাতে পুরোহিতকে ডেকে এনে সেটাই বোঝার চেষ্টা করেছিলেন ট্রাজান।

সেখানেই জানা গেছে অভূতপূর্ব কিছু তথ্য। রোমানরা এই গ্রীক দেবতাদেরই পূজা করে, নাম পাল্টে গেছে শুধু। সেখানে এরিস গ্রীসের যুদ্ধ দেবতা, কিন্তু রোমে সেই একই এরিস পূজিত হন মার্স নামে। ঐ পুরোহিতদের থেকেই দেবতা আর মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ভালো ভাবে বুঝে নিয়েছেন তিনি। এখন আলোচনায় সেই জ্ঞানই কাজে লাগবে।

ট্রাজানের গলায় যথেষ্ট নম্রতা, 'আপনার শর্ত আমি অবশ্যই পালন করবো। এটা এখন আর আমার কাছে শর্ত না, এটা আমার কাছে আদেশ। তবে আপনি নিজেই আপনার ক্ষমতাকে বেঁধে রাখছেন একটা গণ্ডিতে। সেই পুরানো গ্রীসের ব্যাপারস্যাপার এখন অনেকটা পাল্টে গেছে।' কাল রাতে সেনাপতির বলা কথাটা ট্রাজানকে ভালো চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। গ্রীস যদি সত্যিই রোমান সাম্রাজ্যের বাইরে চলে যায় তাহলে তো পুরো রোমান সাম্রাজ্য দুই টুকরো হয়ে যাবে, আর টুকরো সাম্রাজ্য বেশিদিন টিকে না।

ট্রাজানের কথায় আগ্রহী হয়ে উঠলো এরিস, 'আমি পুরানো গণ্ডিতে আটকে আছি মানে?'

'মানে মহামান্য, অনেক কিছুই আপনাকে জানানো হয়নি। এজন্য আপনি গ্রীসকে আপনার রাজ্য আর রোমকে শত্রুরাজ্য ধরে নিয়েছেন।' লোভের টোপ আস্তে আস্তে সাজিয়ে রাখছেন ট্রাজান। তিনি একটা কথা অবশ্যই জানেন, দেবতা

যেহেতু নিজের স্বার্থে এতদূর যুদ্ধ করতে চলে এসেছে, তাই সেই স্বার্থের বৃদ্ধিতে তাকে মিত্র বলেও অবশ্যই স্বীকার করে নেবে।

'আমাকে কী জানানো হয়নি' এরিসের আগ্রহ বাড়ছে।

'মহামান্য। আপনি এখন আর শুধু গ্রীসেই পূজিত নন, রোমানরাও আপনার উপাসনা করে। আপনি নিজে গ্রীসকে স্বাধীন করে গ্রীসের পূজা পেতে চাচ্ছেন। তার বদলে তো আপনি পুরো রোমান সাম্রাজ্যেরই পূজা পেতে পারেন। আপনিই হতে পারেন এই রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান দেবতা।' টোপটা ফেলে দিলেন ট্রাজান, তারপর সুতো ছাড়লেন, এসব কথাগুলো কাল রাতে পুরোহিতদের কাছ থেকে শেখা, 'একটু ভেবে দেখুন, অলিম্পাসে আপনার শক্তি যাবে মানুষের পূজা আর ভক্তি থেকে, তাই তো?'

'হ্যাঁ।' স্বীকার করতে বাধ্য হলো এরিস।

'কিন্তু এই রোমান সাম্রাজ্যে আপনি যদি প্রধান দেবতা হন? যদি পূজিত হন জিউস কিংবা জুপিটারের মতো? তখন আপনার শক্তি তো আরও অনেক বেড়ে যাবে। আপনার পূজা করবে আরও অনেক বেশি মানুষ। আর আপনি চেয়ে আছেন গ্রীসের গুটিকয়েক লোকের পূজার দিকে।'

কথাটা ভাবনায় পড়তে বাধ্য করলো এরিসকে, 'তোমরা আসলেই আমার পূজা করো?'

'হ্যাঁ, আমাদের মন্দিরে নিয়মিত করা হয়। শুধু এখানে আমাদের রীতি অনুযায়ী আপনাকে মার্স নামে ডাকি। সেটাও এখন থেকে এরিস নামেই ডাকা হবে।'

চিন্তা করতে লাগলো এরিস। এই সম্ভাবনার কথা তো ভেবে দেখেনি সে। সত্যিই তো, এতো বিশাল ভূখণ্ডের আরাধ্য দেবতা হলে তার প্রভাব আর ক্ষমতা দুটোই তো বেড়ে যাবে। তবে একটা ব্যাপারে এখনো মনটা খচখচ করছে তার, 'কিন্তু তাহলে তো গ্রীসের মানুষদের প্রতি অবিচার করা হবে। আমি তো আসলে গ্রীসেরই দেবতা। তাদেরকে আমি কীভাবে পরাধীন রাখি?'

এই কথার উত্তর সাবধানে দিতে হবে বুঝতে পারলেন ট্রাজান, ' আপনি একটা ছোটো জায়গায় আটকে থাকবেন না। আর এখন এই দিকের পুরো ভূখণ্ড রোমান সাম্রাজ্যের অংশ। আর আপনি এখন পুরো রোমান সাম্রাজ্যের দেবতা। আমি রোমে আপনার নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবো। সম্রাট হয়ে নিয়মিত আপনার পূজা করবো সেখানে। নৈবদ্য দেবো নিজ হাতে। তখনই তো আপনার আর ক্ষমতার অভাব হবে না।' এসব কিছুই জানতেন না ট্রাজান, কালকের পুরোহিতদের কাছ থেকেই এই তত্ত্বগুলো জানা গেছে।

চোখ চকচক করে উঠলো এরিসের, প্রস্তাবটা বেশ ভালো, কিন্তু গ্রীসের মানুষের জন্য তার এখনো দ্বিধা বোধ হচ্ছে।

তা বুঝতে পেরে এরিসকে শেষ যুক্তিটা দিলেন ট্রাজান, কাল রাত থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন, 'মহামান্য, একটা কথা কেবল ভাবুন, আপনি যখন সুপ্ত ছিলেন, তখন এই রোমান আর গ্রীসের মধ্যে যুদ্ধে কিন্তু আমরাই জিতেছিলাম। আপনি যুদ্ধের দেবতা। বলতে গেলে আপনার আশীর্বাদেই আমরা জিতেছিলাম তখন। আর আজকে এসে আপনি সেই আশীর্বাদ কেড়ে নিতে চাচ্ছেন কেন? যুদ্ধের দেবতা হিসেবে আপনি তো আমাদেরকেই কৃপা করার কথা।'

এবার অহমে লেগেছে যুক্তির আঘাত, এরিস মাথা নাড়লো, 'ঠিক। রোমান সাম্রাজ্য ভাঙবে না। গ্রীস স্বাধীন হবার দরকার নেই। তুমি নিজে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীতে আমার পূজা দেবে। নিজ হাতে নৈবদ্য দেবে। গ্রীসের প্রতি মন্দিরে কেবল আমারই পূজা হবে। মনে রাখবে রাজা হিসেবে প্রত্যক মন্দির জগ্রত করার জন্য তোমাকে গ্রীসের প্রত্যেক মন্দিরেই আসতে হবে।'

'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি গ্রীসের আনাচে কানাচে যত মন্দির আছে সবগুলোতেই যাবো। নিজ হাতে প্রতিষ্ঠা করবো আপনাকে।'

স্মিত হাসলো এরিস, 'ঠিক আছে যাও। রোমে পূজার আয়োজন করো। আমি গ্রীসে ফিরে গিয়ে আমার মন্দিরগুলোকে সজ্জিত করি। রোমের পূজা শেষ হলেই তুমি চলে আসবে গ্রীসে।'

এই শর্তে রাজি না হবার কোনো মানে নেই। নিজের আসন থেকে উঠে আবার কুর্নিশ করলেন ট্রাজান, 'আজ্ঞে মহামান্য।'

ট্রাজান বেরিয়ে এলেন গ্রীক শিবির থেকে। মনটা প্রসন্ন হয়েছে তার। সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটেছে। টোপ ভালো মতোই কাজ করেছে। জীবনের সবচেয়ে বড়ো বিপদটা নিরস্ত্র অবস্থাতেই কাটিয়ে দিলেন তিনি।

মুখে বলা আর কাজে মেলানো এক কথা নয়। কলিন যতই শেইরনের সাথে আলোচনা করে নগরের বাস্তব সমস্যা বুঝতে পেরেছে, কিন্তু তার সমাধান করা এত সহজ নয়। প্রথমেই গোল বাঁধল হেলটদের জমির কাজে ফেরানো নিয়ে।

শেইরনের পরামর্শ অনুযায়ী কিছুতেই ফসল ফলানোর কাজ বন্ধ করা যাবে না। সেখানে প্রথমে ভালো শাসকের মতোই ব্যবহার করেছিল কলিন। এক নব্য হেলট মন্ত্রী তাকে বুদ্ধি দিয়েছিল ঘোষণা দেবার জন্য, যাতে হেলটেরা আবার সবাই কাজে ফেরে। সেই অনুযায়ী ঘোষক নিযুক্ত করা হয়েছিল। সারা প্রাসাদে এবং সব অভিজাতদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই ঘোষক হেলটদের আবার কাজে ফেরার তাগাদা দিয়ে এসেছিল।

গোলটা বেঁধেছে সেখানেই। হেলটেরা অনেক দিন পরে স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ পেয়ে গিয়েছিল। আর একবার যখন আরাম শরীরে জাঁকিয়ে বসে তখন সেই আরাম ত্যাগ করা অনেক কঠিন। এখানে হেলটদের শুধু শরীরে না মনেও আরাম জাঁকিয়ে বসেছে। তাদের ধারণা হয়েছে এই জীবনের মতো তাদেরকে সব কাজ থেকে মুক্ত করা হয়েছে। এতদিন যাদেরকে সম্মান এবং ভয়ের চোখে দেখেছিল তারা, যাদের জীবন যাপন তাদেরকে ঈর্ষান্বিত করতো প্রতি মুহূর্তে তাদের মতো জীবন পেয়ে সেটাকে ত্যাগ করতে বেশির ভাগ হেলটই চাইলো না। ঘোষণার ফলাফল তাই যথেষ্ট খারাপ হলো। মাঠে দুই এক জন হেলট হয়তো গেছিল প্রথম দিন, কিন্তু পরে কেউ নেই দেখে আবার নিজের নিজের জায়গায় ফিরে আমোদে মন দিয়েছে।

খবরটা কলিনের কাছে পৌঁছতে বেশি সময় লাগেনি। আনন্দের আর পরিবর্তনের ছোঁয়া যে তার মধ্যে লাগেনি তা নয়। সেই প্রথম দিন সিংহাসনে বসার পর থেকে বেশির ভাগ সময় এই সভাতেই কাটায় সে। এরই মধ্যে বুঝে গেছে আসনের মজা। সাথে এও বুঝেছে চন্দ্র যেমন আকাশে একা থাকলে ভালো দেখায় না, তারা বেষ্টিত থাকাই নিয়ম তেমনি রাজার চারপাশেও থাকতে হবে সভাসদদের। সেজন্যই এখন পারিষদ বেষ্টিত হয়েই বেশির ভাগ সময় কাটান রাজারা।

আজকেও সভা বসেছে। শেইরন প্রথম কয়েকদিন এখানে এসে বসলেও এখন বিরক্তির কারণে আর বসেন না। তিনি তো জানেন, এখানের যারা এসব আসনে বসে আছে তাদের না আছে এসব আসনে বসার অধিকার, না আছে এসব কাজ করবার যোগ্যতা। এসব অযোগ্যের ভিড়ে তিনি আর থাকেননি। তাদের অবশ্য এই সভার এমন কোনো সমস্যা হয়নি।

একজন মন্তব্য করলো, 'মহামান্য কলিন, আপনার অনুমতি পেলে একটা কথা বলতে পারি। যদি অনুমতি দেন।'

কলিন মাথা নাড়লেন। নিজের অজান্তেই সে যে কখন একজন আদর্শ পুঁজিবাদী রাজা হয়ে উঠেছে তা সে নিজেও জানে না। গ্রীসের নানা আদর্শ দার্শনিকদের উক্তিগুলো দূরে সরে গেছে বহু আগেই।

'সভাটাকে ঠিক সভার মতো মনে হচ্ছে না।' সভাসদের এই উক্তিটা যথেষ্ট পরিমাণ ভাজ ফেললো কলিনের কপালে। তড়িৎ জিজ্ঞেস করলো, 'কেন? এমন মনে হচ্ছে কেন তোমার?'

সভাসদ আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল এই আলোচনাটা তুলবে। সাথে সাথে কী কী যুক্তি দেবে সেগুলোও ঠিক করা। এই প্রাসাদেই আগে হেলটের কাজ করতো সে। এখন কলিনের দলে ভিড়ে রাজসভাসদ হয়েছে।

দাঁড়িয়ে গেল সদ্য সভাসদ, 'আমি ঠিকই বলছি মহামান্য কলিন। একটা রাজসভা কখনো এমন হয়? হয় না। আমি নিজেও তো এক রাজপ্রাসাদে ছিলাম। তা তো আপনারা সবাই জানেন।'

সেটা সবাই জানে। মাথা নেড়ে সায় দিলো সভার সবাই, একজন জানতে চাইলো, 'তাহলে তো তুমি বলতে পারবে রাজসভা কেমন হয়। বলো আমাদেরকে।'

'রাজসভার আলাদা একটা আভিজাত্য আছে। অন্য সবা জায়গার মতো নয়। এখানে প্রত্যেক সভাসদের জন্য দাসদাসী থাকবে, রাজার জন্য থাকবে হাওয়া করার লোকজন। খাবার এগিয়ে দেবার লোক থাকবে, নৃত্য গীতে পারদর্শী লোকজন থাকবে। আরও অনেক ধরনের সেবক থাকে এই সভায়।'

কলিন একটু দমে যায় ভেতরে ভেতরে, তার সভায় তো এসবের কিছুই নেই, এসবের কী দরকার তাও তার জানা নেই।

সেই উত্তর ঐ সভাসদই দিয়ে দিচ্ছে, 'এসব রাজকার্যে অনেক চাপ আসে মাথায়। আপনি যখন সেই সব চিন্তা করবেন, তখন সুন্দরী দাসী আপনাকে শরবতের পেয়ালা বাড়িয়ে দেবে, চামর দুলিয়ে বাতাস করে আপনাকে আরাম দেবে। এসবে শরীর আর মনের চাপ অনেকটাই কমে যায়। এসবের দরকার অবশ্যই আছে মহারাজ।'

নিজের সভার এত বড়ো খামতি কিছুতেই মেনে নিতে ইচ্ছে করে না কলিনের। এবার মত জানালো সে, 'সমস্যার সমাধান করতে হবে তো।'

সমস্যার উৎপাদনকারী সভাসদের কাছেই আছে সমাধান, 'মহামান্য। সেই ব্যবস্থা আমি এরই মধ্যে করে রেখেছি। এখন আপনার আজ্ঞা পেলে আপনার সামনে সেই সমাধান পেশ করবো।'

কলিন এক কথায় আজ্ঞা দিয়ে দিলো। সভাসদ এবার চিৎকার করে উঠলো, 'ওদেরকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

হেলট সৈন্যদের একটা দল সাথে সাথে প্রবেশ করলো সভায়। ওদের মাঝে মাঝে বেশ কিছু দাস আর দাসী। এই দাসদাসীরাই আগে এই সভায় এসব কাজ করতো। ওদেরকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হলো ওদের আগের অবস্থা। কলিনের দুই পাশে দুজন সুন্দরী দাসী এসে দাঁড়ালো। এরা দাসী হলেও রাজসভার উপযুক্ত করার জন্য এদেরকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, সাধারণ দাসীদের মতো এরা ময়লা কাপড় পরে না, এদের প্রসাধনের ব্যবস্থাও আছে। ফলে দেখতে এই দাসীরা সাধারণ দাসীদের মতো নয়, আবার অভিজাত নারীদের মতোও নয়, তবে কাছাকাছি কিছু একটা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দুই পাশে দাঁড়ানো দুই দাসীর প্রসাধনের সুবাস এসে ধাক্কা মারল কলিনের নাকে। স্বপ্নালু একটা আবেশ ছড়িয়ে পড়লো কলিনের দেহ জুড়ে। আসলেও এই ব্যাপারটা শরীর আর মন দুটোর চাপই কমিয়ে দিতে সক্ষম। নারী দেহ নিয়ে এতদিন তেমন উদগ্র আগ্রহ না থাকলেও আজকে কেমন একটা টান অনুভব করতে লাগলো কলিন। এই দুই দাসী আক্ষরিক অর্থেই তার মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

অন্য সভাসদদেরও একই অবস্থা। তাদের পাশেও দাসীরা গেছে। সব দেখেশুনে সব ব্যবস্থা করা সভাসদ বলে উঠলো, 'এবার এটা একটা সভা হয়েছে। এবার আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি।'

আলোচনা শুরু হলো। হেলটদের জমিতে কাজে না যাওয়া নিয়ে আলোচনা হলো বেশ কিছুক্ষণ।

এবার একটু রেগে উঠলো কলিন, 'এভাবে চললে তো হবে না। খাদ্যের ভাণ্ডার থেকে শুধু যাবে, কিন্তু কিছুই ঢুকবে না, এভাবে চললে তো কিছুদিন পরে দুর্ভিক্ষ লেগে যাবে।' কলিনের এই চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। এখন আর তারা জঙ্গলে নেই। জঙ্গলে খাবার দাবারের প্রাকৃতিক উৎস ছিল। এখন শহুরে আরামকে যখন আঁকড়ে ধরা হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই জঙ্গলের সেসব সুবিধা পাওয়া যাবে না।

'আমরা কী করবো?' এক সভাসদ সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

কারো কাছেই এই কথার সঠিক উত্তর নেই। যখন কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন পূর্ববর্তী পথ ধরেই চলতে হয়। একজন মন্ত্রী বলে বসলো, 'আগের অভিজাতেরা যেভাবে চালিয়েছে ওদেরকে সেভাবেই চালাতে হবে। নইলে ওরা পথে আসবে না।'

এই ওরা যে আসলে তাদেরই লোক এটা এই মন্ত্রী ভুলে গেছে। শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে প্রকট ভাবে।

কলিন মত দিলো, ' ঠিক। এখন থেকে প্রত্যেক অভিজাতের বাড়িতে আমাদের একজনকে শাসনের দায়িত্ব দাও। তার সাথে আমাদের কিছু হেলট সৈন্য থাকবে। ওরা চাবুক আর লাঠি ব্যবহার করবে। কেউ যদি কাজে যেতে না চায় তাহলে তাকে যথাযথ শাস্তি দেওয়া হবে। এভাবেই চালাতে হবে।'

কলিনের মুখের কথা আদেশ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগলো না। মন্ত্রীদের ওপর অভিজাত বাড়ির মালিকানা বিলির ভার পড়লো। তারাও তাদের সুবিধা মতো নানা হেলটদের সেই আরামদায়ক অবস্থান দান করতে লাগলেন। কেউ কেউ তা করতে লাগলেন বিশেষ কিছু সুবিধা নিয়ে। স্পার্টার আসল অভিজাতদের আগেই বন্দি করা হয়েছে যার যার বাড়িতে। তারা এই বন্টন ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারলো না।

কোনো কিছু শুরু করা আর পরিবর্তন করার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে উদাহরণ সৃষ্টি করা। এটা সৈনিকের দায়িত্ব পাওয়া হেলটদের শিখিয়ে দিতে হলো না। প্রথম দিনেই বেশ কিছু সাধারণ হেলটের পিঠে লাঠি আর চাবুক আছড়ে পড়লো।

স্পার্টার সাধারণ হেলটরা অবাক হয়ে দেখতে পেলো, যাদের হাতে ক্ষমতা গেছে বলে তারা খুব আনন্দিত হয়েছিল, ভেবেছিল বাকি জীবন আয়েশে কেটে যাবে, তারাই তাদেরকে আবার আগের কষ্টের জীবনে ফেরত পাঠাচ্ছে। তাদের খাদ্য, পানীয়, পোশাক আবার নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালে জড়িয়ে গেল। তীব্র রোদে পুড়ে তাদেরকে জমিতে কাজ করতে হলো, কেউবা আবার নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী ফিরে গেছে অন্য কায়িক শ্রমে। ঘামের ফোঁটা তরতর করে ঝরে পড়তে লাগলো, আর তারা অনুভব করলো জীবনের পরম সত্য- এই কলিন আর পায়াসের মধ্যে আসলে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। দুজনের একটাই পরিচয়- তারা শাসক।

দুই দিনে চাবুক আর লাঠির যথাযথ ব্যবহারে শৃঙ্খলা অনেকটাই ফিরে এসেছে। রাজা হয়ে যাবার দরুন কলিন এখন অনেক কাজ তদারক করে। মাঝে মাঝে দরবার পরিবেষ্টিত হয়ে মাঠে গিয়ে হেলটদের কাজ করা দেখে আসে। এখন মোটামুটি অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। হেলটেরা মাঠের ফসল তোলার কাজ শুরু করেছে। অন্যান্য উৎপাদন মূলক কাজও বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাবারের চিন্তাই সবার আগে। খাদ্য ভাণ্ডার পূর্ণ থাকলে আর সব বিপদই সামলে নেয়া যায়।

এখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত মনেই সভাসদেরা বসলো সভায়। তবে একটা ব্যাপার এখনো কলিনের শেখা বাকি আছে। রাজা অথবা শাসক কখনো নিশ্চিন্ত জীবন কাটাতে পারেন না। সেই অনিশ্চয়তা নিয়েই হাজির হলেন শেইরন।

'আসুন, আসুন। আমি আরও ভেবেছি আপনি আমাদের ওপর মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন, এজন্য আমাদের সভায় আসছেন না।' শেইরনকে সভায় প্রবেশ করতে দেখেই কলিন সম্ভাষণ জানালো।

শেইরন সভার মাঝ খানে দাঁড়িয়ে চারদিকটা ভালো করে দেখলেন, 'বাহ, ভালোই তো সাজানো হয়েছি দেখছি। নগরের ভেতরটা বেশ গুছিয়ে নিয়েছ।'

'হ্যাঁ, তা তো একটু করতেই হবে।' কথাটা বলেই কলিনের খেয়াল হলো, সভার প্রতিটা আসনই পূর্ণ, শেইরনের বসার জন্য খালি আসন নেই। নিজের মধ্যে রাজ অহংকার এখনো পুরোপুরি আসেনি, এখনো তার মনে শেইরনের সম্পর্কে সম্মান বজায় আছে, তাড়াতাড়ি নির্দেশ দিলো সে, 'এখুনি ওনার জন্য আসনের ব্যবস্থা করা হোক।'

অথিতি অথবা অভ্যাগতদের জন্য আসনের ব্যবস্থা এই সভাতেও আছে। তবে এখানে অনেককে জায়গা দিতে গিয়ে মন্ত্রীমণ্ডলে অনেক বাড়তি সদস্য যোগ হয়েছে, তারাই অথিতিদের জন্য রাখা আসন দখল করেছে।

কলিনের আদেশ তড়িৎ পালিত হলো। কারোই আর চাবুকের আঘাত পিঠে নেবার শখ নেই। আসনে বসে পড়লেন শেইরন, 'তোমার বেশকিছু কাজকর্মের কথা কানে এসেছে। একটু শক্ত হতেই হবে। নইলে রাজ্য সামলানো যায় না। রাজাকে একই সাথে দয়ালু আর নিষ্ঠুর হতে হয়। এটাই নিয়ম।'

নিজের একটু হলেও প্রশংসা করেছেন শেইরন, এই ভেবে একটু আপ্লুত হলো কলিন। শেইরন অভিজাত সমাজের বিচক্ষণ লোক, একটু খেয়ালি হলেও বিবেচনাবোধ প্রখর। কিন্তু একটু পরেই শেইরনের কথায় আত্মতুষ্টির পরিবর্তে চিন্তার উপাদান পেয়ে গেল কলিনের মাথা। শেইরন স্বর শান্ত রেখেই বলছেন,

'তবে রাজাকে কেবল ভেতরের দিকে নজর রাখলেই হয় না। সব সময় বাইরের দিকেও নজর রাখতে হয়। তোমার জন্য তো এই কথা আরও বেশি প্রযোজ্য। প্রবল শত্রু তোমার দিকে ধেয়ে আসা এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।'

ভেতরের চিন্তা নিয়ে কলিন বেশ চিন্তিত ছিল কয়েকদিন। সত্যি বলতে বাইরের ঘটনা সে ভুলেই গিয়েছিল। ওদিকে স্পার্টান অদ্ভুত বাহিনীর সাথে রোমানদের প্রবল সংগ্রাম এতদিনে শুরু হয়ে যাবার কথা। কিন্তু সেই ব্যাপারে তো তারা এখনো কিছুই জানে না।

কলিনের সাথে সাথে সভাসদরাও চিন্তিত হলো। কলিন সবার উদ্দেশ্যেই বলল, 'রোমানরা অথবা দেবতার সেনা দুই দলের যে-কোনো এক দল আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে।'

শুধরে দেন শেইরন, 'আক্রমণ করতে পারে না, করবেই। নিশ্চিত। তোমাকে এই ব্যাপারে আগেও সাবধান করা হয়েছিল। এখন সময় এগিয়ে আসছে। আমার তোমাকে সতর্ক করা কর্তব্য তাই করলাম।'

যুদ্ধের কথা আসতেই সভাসদদের সবার গলা শুকিয়ে গেল। সাধারণ অস্ত্রচালনাও তারা জানে না, পারে কেবল তেল ঢালতে। কারো মুখেই কোনো কথা জোগাল না। তাদের দলে হেলটের অভাব না থাকলেও যুদ্ধ জানা লোকের দারুণ অভাব। খুব কমেরই মোটামুটি অস্ত্র ধরা আর চালনার অভিজ্ঞতা আছে। যুদ্ধ নিয়ে জ্ঞান তো আরও কম।

কলিনেরও খুব বেশি যুদ্ধ নিয়ে জ্ঞান নেই। তবে সমাধান একটা সেই সময়েই মাথায় রেখে দিয়েছিল সে, 'আমাদের সামনে দুটো উপায় আছে। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত, এই স্পার্টার বাহিনী যতই অদ্ভুত হোক না কেন, রোমান বাহিনীর সাথে পারবে না। রোমান বাহিনীর কাছে বিধ্বস্ত হবে এই বাহিনী। তখন রোমানরা কী করবে? বিশ্বাসঘাতকদের দেবে শাস্তি। আর এখানে প্রতিনিধি পাঠাবে। তখন রোমান সম্রাটের কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করবো। বলবো, আপনাদের অধীনে থেকে আমরা এই নগর চালাতে চাই। এই নগরের শাসন ভার যাতে আমাদেরকে দেওয়া হয়।'

কৌতুকের হাসি ফুটে উঠলো শেইরনের মুখে, এই গর্দভের কোনো ধারণাও নেই রোমানদের চিন্তা ভাবনার বিষয়ে। অভিজাত সমাজ ব্যবস্থার হিসেবে ওরা গ্রীকদের থেকে কয়েক কাঠি ওপরে আছে। কখনোই স্পার্টার মতো একটা নগরী তারা হেলটদের হাতে শাসন করতে ছেড়ে দেবে না।

শেইরনের মুখের হাসি কলিনের নজর এড়ালো না, 'আপনি হাসছেন কেন? আমি কি ভুল কিছু বলেছি?'

'না, না, আমি এমনিতেই হাসছি। তুমি পরিকল্পনার একদিকের কথা বলেছ। রোমানরা জিতলে তুমি তাদের কাছে এই নগরী ভিক্ষে চাইবে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকে তো সকল সম্ভাবনার জন্যই প্রস্তুত থাকে। ধরো, তোমার ধারণা মতো কাজ হলো না। রোমানরা জিতল না, কোনো এক দৈব বলে জিতে গেল স্পার্টার দেবতার বাহিনী। আর তারা ফিরে আসবে স্পার্টায়। তখন তুমি কী করবে?'

এই প্রশ্নের জবাব চট করে দিতে পারলো না কলিন, একটু ভাবতে বাধ্য হলো, 'তাদের সামনে তো আর আত্মসমর্পণ করা যাবে না, তা আমি করবোও না। ওদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় নেই।'

'যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারবে?' শেইরন জানতে চান।

'অবশ্যই পারবো' একটু আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে কলিনের চেহারায়, 'রোমান বাহিনী ছাড়া এই পৃথিবীর কোনো বাহিনীকেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমাদের দলেও সৈন্য কম নেই। গ্রীসের সব বিদ্রোহী হেলটেরা এসে যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে।'

এমন উক্তির পরেও সভাসদদের কেউই হই হই করে উঠলো না। যুদ্ধে কারোরই ইচ্ছে নেই। শেইরন এবার আর কলিনের নির্বুদ্ধিতায় হাসলেন না।

কলিন রোমান বাহিনীকে সমীহ করে, কিন্তু যেই বাহিনী রোমানদের হারিয়ে আসবে তাদেরকে সমীহ করবে না। হাস্যকর চিন্তা। তবে নিজের পরামর্শ দেবার কাজটা করলেন তিনি,

'শোনো, লোক পাঠিয়ে রাখো চারিদিকে। যাতে তারা কোন বাহিনী আসছে, কত দূরে আছে সেসব বেশ ভালো ভাবেই তোমাদেরকে জানাতে পারে। গুপ্তচর আগে থেকে খবর দিলে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে।'

বেশ ভালো প্রস্তাব। নিজের শেষ পরামর্শটাও বলে দিলেন শেইরন,

'যুদ্ধ যদি করার সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকো, তাহলে আমাদের দুই অভিজাত ইভান আর ওরিয়নের সাথে সত্বর যোগাযোগ করো। ওদেরকে দিয়ে তোমার বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়াও। মহড়া দেওয়াও। নইলে আসল সময়ে যুদ্ধে গিয়ে একেকজন একেক দিকে চলে যাবে। ঐ দুজনকে সেনাপতি করে বাহিনী তৈরি করো।'

'আপনার দুটো নির্দেশই আমি এখনই পালন করার ব্যবস্থা করছি।'

'আচ্ছা, আমার সাথে যে বিদেশি লোক এসেছে, একটু লম্বা, তাকেও কিন্তু যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় রেখো, সেও অনেক বড়ো যোদ্ধা।'

'বিলক্ষণ।' কলিন বুঝতে পেরেছে, বসে বসে সুখ ভোগ এই জীবনে তার কপালে জুটবে না।

এরিস এসে বসেছে মেয়ের বিছানার পাশে। আমাজনেরা মেয়েটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। এরিস আসতেই তারা জায়গা ছেড়ে দিয়েছে।

এখনো জ্ঞান ফেরেনি আহত আমাজনের। তবে শ্বাস এখন স্বাভাবিক। ভেতরে কোনো গভীর ক্ষত হয়নি, রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, খুব শীঘ্রই জ্ঞানও ফিরে আসবে। এরিসের কঠিন মুখে ভাবান্তরের কোনো লক্ষণ নেই।

আমাজনদের চিকিৎসক মেয়েটা নিজে থেকেই বলল, ' কাল রাতে তো আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তবে এটুকু বুঝেছিলাম ভেতরের কোনো মর্ম স্থানে আঘাত লাগেনি, নয়তো এতক্ষণ টিকে থাকতে পারতো না। রক্ত বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সকাল থেকে অবস্থা একটু ভালোর দিকে। আমার জ্ঞান যদি সঠিক নির্দেশনা দেয় তাহলে আর একটু পরেই জ্ঞান ফিরে আসবে।

চিকিৎসকের জ্ঞান সঠিক দিশাই দিয়েছে, মেয়েটা আস্তে আস্তে চোখের পাতা মেলল, প্রথমেই দেখতে পেলো এরিসকে। সে চোখ খুলতেই এরিস তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো, মেয়ের বেঁচে যাওয়াতে খুশির চিহ্ন সেই হাসিতে স্পষ্ট।

আমাজনদের কাছে যুদ্ধই ধ্যান-জ্ঞান, মেয়েটা দুর্বল স্বরে নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিলো, 'আমাকে ক্ষমা করবেন পিতা। আমার দিকে আসা বর্শাটা আমি লক্ষ্য করিনি। মনে হয় একটু অমনোযোগী হয়ে পড়েছিলাম। আপনার মেয়ে হিসেবে কলংক লেপে দিয়েছি আমি আপনার শরীরে। আমি আরও অনুশীলন করবো। এমনটা আর হবে না পিতা।'

এরিস তাড়াতাড়ি হাত রাখলো মেয়ের মাথায়, 'তোমার কোনো দোষ নেই মা। এখুনি এত কথা বলতে হবে না। আমি কতদিন নিরুদ্দেশ ছিলাম। তোমাদের ঠিকমতো খেয়াল রাখতে পারিনি। প্রশিক্ষণ দিতে পারিনি। সরাসরি নামিয়ে দিয়েছি যুদ্ধে। ভুলটা তোমার না মা, আমার। তুমি এখন বিশ্রাম নাও।'

এরিস উঠে দাঁড়ালো, স্পার্টা থেকে দাসদাসীদের কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল তাবুর বাইরে। তাদের উদ্দেশ্যে আদেশ দিলো এরিস, 'তাড়াতাড়ি ভালো ভালো খাবারের ব্যবস্থা করো। চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করো, এখন রোগীকে কী খেতে দেওয়া যাবে। তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলতে হবে তাকে।'

এরিসের আদেশ পালনে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। এরিস এদিক থেকে এবার পায়াস আর নিকোলাসদের তাবুর দিকে যাত্রা করলো। এরিসকে আসতে দেখে স্পার্টার সৈন্যরা ঘাবড়ে গেল। এমনিতেও আজকে যুদ্ধের আর কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এরিসের মনে কী ইচ্ছে, জানা নেই। রোমান সম্রাট ট্রাজান এরিসের তাবু থেকে ঘুরে যাবার খবর এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে পায়াসের কাছে। সেটা নিয়েই আলোচনা চলছিল তার আর নিকোলাসের। কিন্তু সেই আলোচনা

কোনোদিকে এগোচ্ছে না। ট্রাজান কেন এসেছেন সেটা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই ওদের। নিকোলাস যদিও ধারণা করছে, সন্ধি করতেই এসেছেন। এমন ধ্বংস ক্ষমতা দেখার পরে বুদ্ধিমান লোকে তাই করবে। পায়াস চাচ্ছেন সঠিক ব্যাপারটা জানতে, কিন্তু কোন কিছুর জন্যই নিজে যেচে পড়ে এরিসের সামনে যেতে মন সায় দিচ্ছে না।

সেই কাজটা পায়াসকে করতে হলো না। খবর পেলেন এরিস তার তাবুর দিকেই আসছে। এখন হয়তো আসল কারণটা জানা যাবে। তবু এরিস আসছে শুনে কৌতূহলের চেয়ে ভয়ের অনুভূতিটাই বেশি হয়। নিকোলাস আর পায়াস আগে থেকেই দাঁড়িয়ে গেল। এরিসকে সম্মান দেবার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে তাদের শরীর।

এরিস প্রবেশ করলো ঝড়ের মতো। এরিসকে দেখেই দুজনে কুর্নিশ করলো এক সাথে। নিকোলাসের অভিজাত সত্ত্বা মাঝে মাঝে এমন আচরণে একটু বাঁধ সাধে, কিন্তু সাথে সাথে মন এটাও বলে ওঠে, ইনি দেবতা, তাকে ভয় করতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে, কুর্নিশ করতে হবে।

এরিস একটা আসনে বসে পড়েছে, 'তোমরাও বসো। দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।'

দুজনেই আলগোছে বসে পড়লো।

এরিস এবার একটু হেসে বলল, 'তোমাদের স্পার্টান বাহিনীর ভাগ্য অনেক ভালো। তোমাদেরকে একবারও যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে হলো না। পাত্রাসেও না, এখানে এই রোমান বাহিনীর সামনেও না। এরই মধ্যে আমরা যুদ্ধ জিতে গেছি।'

'যুদ্ধে জিতে গেছি' কথাটা নতুন। পায়াস আর নিকোলাস এবার বুঝলো, ট্রাজান এসে আত্মসমর্পণ করে গেছেন। নিজের ধারণার কথা বললেন পায়াস, 'তার মানে, রোমানরা আত্মসমর্পণ করেছে? আর এখন থেকে গ্রীসের ওপর তাদের কোনো দাবি নেই?'

'হ্যাঁ, ওরা আমার কাছে দয়া ভিক্ষা চেয়েছে। আমি মহান দেবতা হিসেবে ওদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছি। তবে এখানে একটু পরিবর্তন হয়েছে পরিকল্পনার। আসলে এজন্য আমি রোমান সম্রাটের কাছে কৃতজ্ঞ। এখানে ওরা গ্রীসের অধিকার ছাড়েনি।'

অবাক গলায় বলে উঠলো নিকোলাস, 'তাহলে আমাদের জয় কীভাবে হলো? রোমানদের হাতে যদি গ্রীস থাকে তাহলে তো গ্রীস এখন পরাধীন। আর সেটা হলে আমার আপনার কারো লক্ষ্যই পূরণ হলো না।'

'ব্যাপারটা আসলে এত সহজ নয়। আমি অনেক দিন ধরে নিদ্রায় ছিলাম। পৃথিবীর চেতনায় আমার কোনো সংযোগ ছিল না। তাই জানতাম না, আমার পূজা আসলে এতটা ছড়িয়ে গেছে। এই রোমানদের পুরোহিতেরাও আমার পূজা করে।

যদিও ওদের মতো একটা নাম ঠিক করে রেখেছে। তাই এখন রোমানরা গ্রীসের অধিকার ছাড়েনি, বরং আমি এখন থেকে গ্রীস-সহ সম্পূর্ণ রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান দেবতা হিসেবে পূজিত হবো। বিনিময়ে রোমান সাম্রাজ্য থাকবে অক্ষুণ্ণ।'

ব্যাপারটা এরিসের জন্য যতটা ভালো হয়েছে, ঠিক ততটাই খারাপ হয়েছে ওদের দুজনের জন্য। দুজনেরই স্বাধীন রাজা হবার শখ ছিল। কিন্তু এখন তো রোমানরা তাদের সবচেয়ে বড়ো শক্তিকে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। আগে মুখোমুখি গ্রীস আর রোমানদের যুদ্ধে এরিস আর তার বাহিনী রোমানদের বিরুদ্ধে ছিল। এখন এই প্রস্তাবের ফলে এরিস নিশ্চিতভাবেই রোমানদের দলে চলে যাবেন।

না, মানতেই হচ্ছে ট্রাজান ভীষণ চতুর এক চাল দিয়েছেন। এক চালে একেবারে কাত করে দিয়েছেন ওদের। পায়াস নিজের রাজত্ব হারানোর শঙ্কায় মরিয়া হয়ে উঠলেন, 'কিন্তু আপনি তো গ্রীসের দেবতা। এখন রোমানদের পূজায় কি আপনি অলিম্পাসে যেতে পারবেন?'

এরিস পায়াসের প্রশ্নের কারণ বুঝতে পারলো, 'দেখো, তোমাদের দুজনের আমি অলিম্পাসে যেতে পারবো কি পারবো না, সেটা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। তোমরা আছো নিজেদের রাজা হবার ধান্ধায়। আমি এটাও জানি আমি তোমাদেরকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েই এখানে এনেছি। তোমরা আমাকে প্রাথমিক আশ্রয় দিয়েছ। সেনাদের অস্ত্র তৈরি করতে সাহায্য করেছ। আমি আমার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালন করবো। তোমাদের দুজনের জন্যই রাজত্বের ব্যবস্থা করবো। রোমানরা তোমাদেরকে কোনো ধরনের যন্ত্রণা দেবে না, এটাও আমি দেখবো।'

কথাটা শোনার পর পায়াস আর নিকোলাস দুজনের মনেই একটা স্বস্তির বাতাস বয়ে গেল। যাক, এখনো আশা আছে। নিকোলাস এবার প্রশ্ন করলো, 'তাহলে কি গ্রীসে এখন আর আপনার রাজার নৈবদ্যে পূজা করার দরকার নেই?'

'অবশ্যই আছে। মন্ত্র আর রাজার নৈবদ্য ছাড়া তো অলিম্পাসে আমার প্রতিষ্ঠা হবে না। আর এখানে ট্রাজান প্রথমে রোমান রাজধানীতে পুরোহিত দিয়ে দেবতা হিসেবে আমার অভিষেক করবে। তারপর গ্রীসে গিয়ে প্রতি রাজ্যের প্রতি বড়ো মন্দিরে আমার অভিষেক করা হবে। ট্রাজানকে আমি খুব শীঘ্রই গ্রীসে আসতে বলেছি।'

কথাবার্তা সব আগে থেকেই পাকা হয়ে আছে। এখানে আসলে সিদ্ধান্ত দেবার তেমন কিছুই নেই। সিদ্ধান্ত দেবার বিষয় থাকলেও এরিস ওদের থেকে কোন পরামর্শ নিতেন কি-না সেই ব্যাপারে তীব্র সন্দেহ আছে নিকোলাসের।

'এখানে তো তাহলে এভাবে তাবু গেঁড়ে বসে থাকার কোনো কারণ নেই। আমরা এখন কী করবো?' এরিসের সিদ্ধান্ত জানতে চাইলো নিকোলাস।

এরিস নিজেও উঠে দাঁড়িয়েছে, 'আমরা গ্রীসে ফিরে যাবো। এখানে আর আমাদের কোনো কাজ নেই।'

পায়াসের মন থেকে এখনো সংশয় যায়নি। সবকিছু রোমানদের নিয়ন্ত্রণে থাকলে কীভাবে তারা শান্তিতে রাজত্ব করবে? এরিসের মনে একটু সন্দেহ উৎপাদন করার চেষ্টা করলেন তিনি, 'কিন্তু আমরা চলে যাবার পর যদি ট্রাজান শর্ত ভঙ্গ করে? যদি আপনার পূজা না দেয়, তাহলে কী হবে?'

এরিস হাসলো, 'চিন্তা কোরো না, ট্রাজান এই ভুল ভুলেও করবে না। আমি তো গ্রীসে যাচ্ছি, কোথাও মিলিয়ে যাচ্ছি না। আমাকে দেবতা হিসেবে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে সে। যাক, তোমরা তো জানো, আমাদের আমাজনদের এক মেয়ে আহত হয়েছে। তার চিকিৎসার কাজ চলছে। আমাজনদের সেরে ওঠবার ক্ষমতা অনেক ভালো, কাল নাগাদ সে আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে বলেই মনে হয়। তোমরা তোমাদের শিবির গুটিয়ে ফেলার কাজ ধরো। সব গুছিয়ে ফেলো। আমরা ফিরে যাচ্ছি।'

এরিস চলে যেতেই দুজনে পরস্পরের দিকে তাকালো। কোনো কথা বেরোল না, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো উভয়ের গলা থেকে। নিকোলাসের কোনো লক্ষ্যই পূরণ হয়নি। রোমানদের সাথে যুদ্ধ করে এরিসকে এবং রোমানদেরকে নিজের বীরত্বের একটা প্রমাণ দেবার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানেই নামতে পারেনি, বীরত্ব প্রদর্শন কীভাবে করবে।

শিবির তুলে ফেলার কাজ শুরু করলো ওরা। দেখতে দেখতে সবকিছু গোছগাছ করা হয়ে গেল। রোমান সৈন্যরা আগেই যাত্রা শুরু করেছে রোমের উদ্দেশ্যে। ওরাও ফিরতি পথ ধরল।

সমুদ্রের পারে জাহাজগুলো যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেভাবেই পাওয়া গেল। রক্ষীরা তাদের কাজ ভালোভাবেই করেছে। জাহাজের একজন নাবিকও কোনোদিকে পালাতে পারেনি। আর দেরি করলো না এরিস। সবাইকে আগের মতো যার যার জাহাজে উঠে পড়তে বলল। জাহাজের খালাসিরা নানা রকম সামগ্রী তুলে নিতে শুরু করলো সমুদ্র যাত্রার জন্য।

জাহাজ নিয়ে সরাসরি পাত্রাসে যাবে না-কি স্পার্টার বন্দরে যাবে সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে একটু আলোচনা হলো। পায়ে হেঁটে যেতে কষ্ট বেশি, কিন্তু জাহাজ নিয়ে স্পার্টায় যেতে ঘুর পথে যেতে হবে। সময় কিছুটা বেশি লাগবে সেখানে। এরিস পাত্রাস হয়ে যাবারই সিদ্ধান্ত নিলো। কোনেরকম ঝামেলা ছাড়াই পাত্রাসের বিধ্বস্ত বন্দরে এসে পৌঁছল তাদের জাহাজ বহর।

বন্দরে নেমে নিজেদের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করতে লাগলো এরিস। বন্দর পুরো জনমানবহীন। এতটা নিষ্ঠুর না হলেও মনে হয় চলতো। কিন্তু যা হয়ে গেছে তা তো আর ফেরানো যাবে না। এই বন্দর তারই অনুগত লোকজনের সম্পত্তি।

জাহাজ থেকে সবকিছু নামানোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো এখন সবাই। এখান থেকে স্পার্টা খুব বেশিদিনের রাস্তা নয়।

জনমানবহীন বন্দরে এতক্ষণ তারা ছাড়া আর কেউই ছিল না। ওরা জাহাজ থেকে নেমে আসার একটু পরেই এক সৈন্যকে তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখা গেল বন্দরের দিকে। এরিস দূর থেকে নিজের তীব্র দৃষ্টি ক্ষমতা প্রয়োগ করলো। এই সৈন্যের পরনে স্পার্টার সেনাবাহিনীর পোশাক। তার মানে স্পার্টার যেই কয়েকজন সৈন্যকে নগর রক্ষার জন্য রেখে আসা হয়েছে এই সৈন্য তাদের একজন।

পায়াসকে ডাকলো এরিস, 'শুনে যাও পায়াস। তোমার এক সৈন্য নগর থেকে এদিকেই আসছে।'

পায়াস অদূরেই নিকোলাস আর মরিসের সাথে ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এই দীর্ঘ ভ্রমনে অনভ্যস্ত শরীর মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ করতে চাইছে তার। শরীর আর মন দুটোই এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ চাইছে, চাইছে একটু বিশ্রাম। এখন স্পার্টার দিকেই যাবে তারা। কিন্তু এরই মধ্যে স্পার্টা থেকে সৈন্য এদিকে আসবে কেন? এরিসের কথাটা পায়াসকে চিন্তায় ফেলে দিলো। নিকোলাস আর মরিসের দিকে তাকালেন তিনি, 'দেখি তো কী হয়েছে?'

সৈন্য তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে পায়াসের সামনে ঘোড়া থামালো, নিচে নেমে কুর্নিশ করলো পায়াসকে। এরিসের দিকেও একটা কুর্নিশ করতে ভুল করলো না। এরিসও এখন ওদের সাথে যোগ দিয়েছে।

'কী খবর?' পায়াস গলা স্বাভাবিক রাখার ভীষণ চেষ্টা করছেন, 'তোমাদেরকে তো নগর রক্ষা করার জন্য রেখে আসা হয়েছিল। তুমি এখানে এসেছ কেন?'

'মহামান্য' সৈন্যের গলায় দুঃখের প্রবল ছাপ, 'স্পার্টায় ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটে গেছে। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা, কুমারী নিক্স এখন আর আমাদের মাঝে নেই। নিজের পোষা চিতার আক্রমণে চিড়িয়াখানায় মারা গেছেন তিনি।'

কথাটা শুনে পায়াসের মাথায় যেন বজ্রপাত হলো। এই এক মেয়ে ছাড়া তার তো এই পৃথিবীতে কেউই ছিল না। স্ত্রীর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক অনেক আগেই মিলিয়ে গিয়েছিল। এই মেয়ের আবদার, খুনসুটি এসব নিয়েই তো তিনি বেঁচে থাকতেন। এমনিতেও শরীর আর মনে দারুণ চাপ ছিল পায়াসের, এই কথা শুনে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না। চোখ উল্টে পড়ে গেলেন মাটিতে। নিকোলাস আর মরিস ধরার আগেই।

ধরাধরি করে পায়াসকে নিয়ে যাওয়া হলো নিজের তাবুতে। এরিস খবরটা শুনে একটা ধাক্কা খেলো। ভালো একটা সঙ্গিনী পাওয়া গিয়েছিল অলিম্পাসের জন্য। এখন অমন লক্ষণের আরেকটা মেয়েকে জোগাড় করা কঠিন হবে।

দেবভোগ্যা মেয়ে তো আর ঘরে ঘরে মেলে না। খবর নিয়ে আসা সৈন্যকে ইশারায় তার সাথে বাইরে আসতে বলল সে।

আরেকজনেরও মনে আলোড়ন উঠেছে নিক্সের মৃত্যু সংবাদ শুনে। নিকোলাস মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এই নিক্স মরে গিয়ে তাদেরকে বাঁচিয়ে গেছে। এই যুদ্ধ যাত্রায় ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছে সে। নিক্সকে চরম অপমান করেছিল সে। আঘাত দিয়েছিল চরম ভাবে। মরেছে, এখন আর শাপশাপান্ত করে লাভ নেই, কিন্তু এমন দুশ্চরিত্রার এমন পরিণতিই হওয়া উচিত।

এরিস যে নিক্সকে নিয়ে অলিম্পাসে যাবে বলেছিল, এটা শুধু সেই জানতো। পায়াস জানতেন না। স্পার্টায় গিয়ে এটা নিয়ে নিশ্চয়ই একটা ঝামেলা হতো। এরিস তো জানেই তার সাথে নিক্সের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। তাই নিক্সকে পাবার জন্য তাকেই রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতো সে। যদিও এরিসের জন্য নিকোলাস স্বেচ্ছায় নিক্সকে ছেড়ে দিতো, কিন্তু এরিস হয়তো এত ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যেতো না। হয়তো এই নিক্সের জন্য তার জীবনে নেমে আসতে পারতো দেবতার অভিশাপ। অনেক জটিল হতে পারতো পরিস্থিতি। মেয়েটা মরে গিয়ে তাদেরকে বাঁচিয়ে গেছে, এখন আর তার অস্বস্তির কোনো কারণ নেই।

দূতকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো এরিস। কুণ্ঠিত হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সৈন্য। এরিস হালকা চালে জিজ্ঞেস করলো, 'নিক্সের মৃত্যু সম্পর্কে তুমি যা বলেছ, তা কি শুনে বলেছ না দেখে বলেছ?'

ফুঁপিয়ে উঠলো সৈনিক, 'আমি নিজে রাজকুমারীর মৃতদেহ দেখেছি। এত বীভৎস দৃশ্য কোনো যুদ্ধক্ষেত্রেও দেখা যায় না।'

নিক্সের প্রসঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলো এরিস, 'আচ্ছা, তুমি আরও কিছু ঝামেলার কথা বলছিলে স্পার্টার ব্যাপারে। আর কী হয়েছে?'

'মহামান্য। আমাদের রাজ্য দখল হয়ে গেছে।'

এরিস একটু অবাক হলেও, 'দখল হয়ে গেছে মানে? কে দখল করলো?'

'আমাদের রাজ্যের বাইরে একটা হেলট বিদ্রোহী দল আছে। তারা ছোটোখাটো চুরি-ডাকাতি করে বেড়াতো এতদিন। কিন্তু এত সৈন্য ওরা কোথায় পেলো আমি জানি না। বিশাল এক সেনাদল নিয়ে সেই হেলটদের দল আক্রমণ করলো স্পার্টা। আমাদের গুটিকয়েক সৈন্য কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারলো না। আমি সদর দরজায় পাহারায় ছিলাম। সাথে সাথে নগর ছেড়ে পালালাম। পরে খবর পেলাম হেলটরা দখল করেছে নগর। এই খবর তো আপনাদের কাছে পৌঁছাতে হবে, আমাকেও যেতে হবে নিরাপদ আশ্রয়ে। আপনাদের সন্ধান করতে করতে জানতে পারলাম, পাত্রাস বন্দর এক যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গেছে। বুঝলাম, আপনারা এখানেই আছেন, তাই আর দেরি না করে এদিকেই এসেছি। আমার ভাগ্য ভালো। আপনাদের এখানেই পেয়েছি।'

ততক্ষণে নিকোলাসও এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে, সেও শুনতে পেয়েছে প্রতিটা কথা।

সৈন্যের কথা শেষ হতেই হেসে উঠলো এরিস, 'কী বললে। গ্রীসের অবস্থা তো আসলেই খারাপ। হেলটের দল নগর দখল করে ফেললো। আসলেই হাসির ঘটনা।'

নিকোলাস জিজ্ঞেস না করে পারলো না, 'আমরা তাহলে এখন কী করবো?'

'কী আর করবো। হেলটদেরকে হটিয়ে স্পার্টা দখল করবো। স্পার্টাই হবে আমাদের শাসনের কেন্দ্র। এই সিদ্ধান্ত আমি অনেক আগেই নিয়েছি।'

নিকোলাস এবার একটা প্রচ্ছন্ন খোঁচা দিতে ছাড়লো না, 'দেখা যাবে আপনি আবার হেলটদের পূজার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাদেরকে স্পার্টা দিয়ে দিলেন।'

'আরে না। তা হবে না। রোমানদের সাথে তুমি এই হেলটদের মিলিয়ে দিলে কীভাবে। অভিজাতরাই আমার পূজা করবে। নিয়ম হচ্ছে হেলটেরা সেবা করবে, কিছুতেই শাসন করবে না। দেবতা হয়ে আমি এই নিয়ম কীভাবে ভেঙ্গে ফেলি।'

একটু বিরতি দিয়ে এরিস নিজের পরিকল্পনার কথা জানালো, 'আমার হাতে সময় খুবই কম। তার মানে আমাদের হাতেও অনেক কম। আমাকে গ্রীসের সবগুলো রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সবকিছু ট্রাজানের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। এই হেলটদের জন্য এক দিনের বেশি সময় আমি দেবো না।'

'আপনি কি ওদের ক্ষমা করে তাড়িয়ে দেবেন?'

'নাহ।' এরিসের চোখে এবার নিষ্ঠুরতা, 'একবার তো বললামই, আমি নিয়মের কোনো ব্যাতিক্রম করি না। না জেনে ভুল করেছিল ট্রাজান, তাই তাকে ক্ষমা করেছি। কিন্তু এই হেলটেরা জেনেশুনে বিদ্রোহ করেছে রাজার বিরুদ্ধে। আর রাজদ্রোহের শাস্তি কী তা তো তুমি জানোই।'

শাস্তিটা একবার বিড়বিড় করে আওড়ে নিলো এরিস, 'মৃত্যুদণ্ড।'

ভাগ্যকে অতিক্রম করা যায় না। তবে মাঝে মাঝে অমোঘ ভাগ্য অতিক্রান্ত হবার জন্য সামনে পর্বতের মতো অপেক্ষা করে না, বরং বিশাল ঢেউ হয়ে ছুটে আসে ভাসিয়ে নেয়ার জন্য। স্পার্টার রাজসভার সবচেয়ে আরমাদায়ক আসনে বসার সৌভাগ্য কলিনের হয়েছে, কিন্তু সেই সুখ ভোগ করার অবসর সে খুব বেশি পায়নি। প্রথমে আভ্যন্তরীণ সমস্যা আর এখন বাহ্যিক আতঙ্ক দুটোই তাকে একেবারে পর্যুদস্ত করে ফেলেছে।

শেইরন তাকে গুপ্তচরের ব্যাপারটা বেশ ভালো ভাবেই বুঝিয়ে বলেছিলেন। তার দিকে এই বাহিনীই আসুক, সেই খবর যাতে আগে থেকেই পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থ করতেই হবে। আগে থেকে জেনে সেই মতো ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু সেই গুপ্তচর প্রয়োগ করা নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা। তার চরেরা খুব বেশি প্রশিক্ষণ পায়নি। অধিকাংশ চরই নিজেদের কাজের জায়গা থেকে যতটুকু খবর কানে আসে ততটুকু দিয়ে কাজ চালাতো। কিন্তু নগরের বাইরে গিয়ে গুপ্ত অবস্থায় থেকে একটা বাহিনীর অগ্রগতি সম্পর্কে খবর এনে দেওয়া সম্পূর্ণ অন্যরকম দক্ষতার কাজ। কিন্তু যা আছে তাই নিয়েই তো পথে নামতে হবে। তাই নিজের লোকের মধ্যে সবচেয়ে ভালো চরকে বেছে নিয়ে কাজে পাঠালো কলিন।

সেদিন পাত্রাস বন্দরে নামার পর দলকে বিশ্রামের সুযোগ দেয়নি এরিস। মালামাল জাহাজ থেকে নামাতে যা দেরি, চলতে শুরু করলো বাহিনী। আমাজন আর দানবদের কথা বলাই বাহুল্য, জানা কথা, তাদের কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু স্পার্টার বাহিনীর নাভিশ্বাস উঠে গেল। এমনিতেও তাদের সমুদ্রযাত্রার ফলে সাগরের রোগে ধরেছিল, অনেকে দাস্ত আর বমিতে ছিল চরম ক্লান্ত, তার মধ্যেই এই পথের ধকল। পায়াস নিজেও চরম অসুস্থ। পায়াসকে পরিবহনের জন্য রথের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিকোলাস একবার এরিসের কাছে বিশ্রামের আর্জি জানাতে গিয়েছিল, কিন্তু 'আমার হাতে সময় নেই'- এই একটা কথা দিয়েই নিকোলাসের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল এরিস। এই কথার ব্যাখ্যা জানে না নিকোলাস, তবে এটুকু জানে, এই কথার বিরোধিতা করা যাবে না।

এরিসের উৎসাহের কোনো কমতি নেই। সবার মাঝে সেই উৎসাহ ছড়িয়ে দিতে শুরু থেকেই সবার সামনে চলছে সে, নিজের গতিতে সবাইকে তাল মেলাতে বাধ্য করছে। বিরতিহীন পথ চলায় স্পার্টার দূরত্ব যেন অনেকটাই কমে গেছে।

এই মুহূর্তে স্পার্টা থেকে আর একদিনের দূরত্বে আছে এরিসের বাহিনী। সামনেই সমতল জমি শেষ হয়ে একটা পাহাড় শ্রেণি শুরু হয়েছে। জমি এখানে

একটু রুক্ষ, খুব বেশি বড়ো গাছপালা নেই পাহাড়ের গায়ে, কিন্তু প্রচুর ঝোপঝাড় আছে। সেগুলোর একটার দিকেই চোখ আটকে গেল এরিসের।

স্পার্টা থেকে পাঠানো চর এই পাহাড়ের ওপর ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে ছিল। পাত্রাস থেকেই আসবে ওরা, এমন খবর আছে তার কাছে। আর ওদিক থেকে এলে এই জায়গাতেই ওদেরকে অনেক দূর থেকে দেখা যাবে, আর খুব তাড়াতাড়ি পাহাড় পার হয়ে ওদের আগেই ওপাশের রাস্তায় নামা যাবে, কিন্তু আগত বাহিনীকে আসতে হবে পাহাড় ঘুরে। অনেকটা সময় পাওয়া যাবে খবরটা স্পার্টায় দেবার জন্য।

এই চর স্পার্টার পায়াসের প্রাসাদে ছিল। এরিসের ক্ষমতা, আমাজনদের যুদ্ধ কৌশলের ছিটেফোঁটা সবই সে দেখেছে, তাই যখন এরিসের বাহিনীকে পাহাড়ের ওপর থেকে আসতে প্রথম বার দেখল, তখনই সে বুঝতে পারলো তাদের পরিচয়। সাইক্লপসদের বিশাল শরীর অনেক দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে। নাহ, রোমান বাহিনীর সাথে জিতে এই বাহিনী চলে এসেছে। খবরটা তাড়াতাড়ি দিতে হবে স্পার্টায়।

যখন সে নিজের জায়গা ছেড়ে আস্তে আস্তে পেছন দিকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে যাবে, ঠিক তখনই তার নজর পড়লো অনেক দূরের বাহিনীর একেবারে সামনে থাকা লোকটার দিকে। বলিষ্ঠ, লম্বা সেই শরীর দেহে সে এই দূরত্ব থেকেও অনায়াসে চিনতে পারলো। এই লোকই এরিস।

তবে ভাবনার কথা হলো, এরিস একেবারে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে তাকে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব। একে তো অনেকটা দূরত্ব, তার ওপর সে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে আছে। এমন ভাবে মিশে আছে যে তার ঝোপের সামনে দিয়ে এখন কোনো মানুষ হেঁটে গেলেও তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না।

বিষয়টা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করলো না সে। পেছন দিকে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এলো ঝোপের পেছনে। তারপর আরেকটু সময় মাথা তুলল না। একই ভাবে পেছন দিকে হামাগুড়ি দিতে লাগলো। তারপর যখন বুঝতে পারলো, নাহ, এখন নিরাপদ জায়গায় চলে এসেছে, ঠিক তখনই খাড়া হলো সে। এবার ঘোড়ার কাছে পৌঁছতে পারলেই হবে।

কিন্তু ঘোড়ার কাছে তার যাওয়া হলো না। একটা বজ্র কঠিন হাত তার ঘাড় চেপে ধরল পেছন থেকে। লোকটা ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মুষ্টির বাঁধন এতটাই কঠিন, পেছন দিকে ফিরে লোকটার চেহারা দেখতে পেলো না গুপ্তচর। তাকাতে পারলে দেখতে পেতো, তার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়েই কুটিল হাসি ফুটে উঠেছে এরিসের মুখে।

এরিসের দূরবীক্ষণের মতো চোখ ব্যবহার করার দৃষ্টি সম্পর্কে এই চরের জানার কথা না। সেই অনেক দূর থেকেই এই ঝোপের দিকে তাকিয়ে এরিস ওকে দেখতে পেয়েছিল। এরিস অলিম্পাসের দেবতা। তার ক্ষমতা কেবল অনেক দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সেই সাথে তার আছে প্রবল গতি, সে যদি দৈব ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ছোটে, তাহলে সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়াও মনে হবে ধীরে ধীরে হাঁটছে। সেই গতি ব্যবহার করেই এরিস নিমেষে উঠে এসেছে এই পাহাড়ের ওপর। ধরেছে গুপ্তচরকে।

কিছুই বুঝে ওঠার আগেই নিজেকে মাটি থেকে অনেকটা ওপরে আবিষ্কার করলো গুপ্তচর। তারপর এমন গতিতে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলো এরিস, সেই গতির সাথে চরের কখনোই পরিচিতি ছিল না। নিজের বাহিনীর সামনে এসে চরের শরীরটা সবার সামনে মাটিতে ছুঁড়ে ফেললো এরিস, 'এই লোকটা আমাদের ওপর নজর রাখছিল। নিশ্চয়ই স্পার্টার হেলটের দলের লোক।'

পায়াসের প্রাসাদের হেলট হিসেবে এই চরকে আগে থেকেই চিনতো নিকোলাস, সে এগিয়ে এলো, 'হ্যাঁ, এই লোক পায়াসের প্রাসাদের দাস।'

'ছিল।' নিকোলাসকে শুধরে দিলো এরিস, 'এখন বিদ্রোহীদের গুপ্তচর। এখন ওর কাছ থেকে আমাদেরকে সবকিছু জানতে হবে।'

গুপ্তচর এখনো গতির রেশ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বড়ো বড়ো করে দম নিচ্ছে এখন সে। গুপ্তচর ধরা পড়লে পাশার দান উল্টে যায়। খবর দেবার কথা ছিল এপাশ থেকে ওপাশে, আর এখন দিতে হবে ওপাশ থেকে এপাশে।

এরিসের কথায় না বলার কোনো কারণই নেই তার। আসল গুপ্তচরদের অত্যাচার সয়ে নেবার কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাকে এমন কিছুই দেওয়া হয়নি। অবশ্য দেওয়া হলেও যে পরিস্থিতি খুব একটা বদলাতো, তা নয়।

এরিস এসে বসলো হেলট চরের পাশে, 'স্পার্টা কারা দখল করেছে?'

'কলিন নামের একজন। হেলটদের নেতা।'

নিকোলাস কলিনের নাম আগেও শুনেছে, সে মন্তব্য করলো, 'কলিন আগে স্পার্টার হেলট ছিল। পরে নিজেও জঙ্গলে পালিয়ে যায়, আর আর কয়েকজন পলাতক হেলট নিয়ে দল গঠন করে। এতদিন ডাকাতি করতো আর এখন একেবারে ক্ষমতা দখল করে বসে আছে।'

কাজের প্রশ্ন করলো এবার এরিস, 'একটা ডাকাত দল দিয়ে তো আর নগর দখল কর যায় না। অবশ্যই কলিনের সেনা আছে। কলিন সেনা কোথায় পেলো?'

'গ্রীসের সব নগরেরই কমবেশি বিদ্রোহী হেলটের দল আছে। সেই দলগুলোর মধ্যে অনেকগুলো দল এসে কলিনের সাথে যোগ দিয়েছে। তারা নিজেদের জন্য একটা স্বাধীন নগর চায়। আর স্পার্টাই হবে হেলটদের নগর।'

শেষ কথায় নিজেদের ইচ্ছেটাও একটু করে জানিয়ে দিলো হেলট, এরিস একটু হাসল, 'স্বাধীনতা তো এই দুনিয়ায় কারোই নাই। সবাইকেই নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হয়। তোমরা তা না করে করেছ বিদ্রোহ। দেবতাদের বানানো নিয়মের বাইরে কাজ করেছ তোমরা। করেছ রাজদ্রোহ। সমাজের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছ।'

আগেই এই অপরাধের শাস্তির ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল এরিস, এবার তা পালন করলো, চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠলো তার একজন আমাজনের দিকে, মেয়েটা এগিয়ে এলো, হাতে বেরিয়ে এসেছে বাঁকা তলোয়ার। এক কোপে গুপ্তচরের মাথা আলগা হয়ে গেল।

এরিস ঠোঁট থেকে একটু আফসোসের শব্দ বের করে মন্তব্য করলো, 'নীতি শাস্ত্রে দূত সর্বদা অবধ্য আর গুপ্তচর সর্বদা বধ্য। আহা, কি নীতি। যারা বানিয়েছে তারা অমর হোক।'

দলের দিকে ফিরল সে, 'এই লোকটাকে ছেড়ে দিতে পারতাম। কিন্তু এই লোক স্পার্টায় খবর পৌঁছে দিলে ওরা আবার ভয়ে জঙ্গলে গিয়ে লুকাতো। তখন হেলটদের খুঁজতে খুঁজতে অনেক সময় ব্যয় হতো আমাদের। এখন আমরা নগরে গিয়েই ওদেরকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারবো। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো ওদের সবাইকে নগরের ভেতরেই পাওয়া যাবে। সবাইকে এক সাথে দেবো শাস্তি। এমনিতেই অনেক কিছু বদলাতে হবে। অনেক নির্মাণ করতে হবে। আর তার জন্য দরকার মুখ বুজে কাজ করার মতো হেলট। স্পার্টার বিদ্রোহীদের মেরে আমি সম্পূর্ণ গ্রীসের হেলটদের সাবধান করে দিতে চাই।'

মৃতদেহটা একটা খাদে ফেলে দেওয়া হলো। আবার চলতে শুরু করলো ওদের বাহিনী। এবার গতি আরও বেড়ে গেছে। এরই মধ্যে একজন গুপ্তচরের খোঁজ পাওয়া গেছে। সামনে আরও কী অপেক্ষা করছে কে জানে। এরিস এবার আর সামনে থেকে সরছে না। নিজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করছে সে। আর যদি কোনো গুপ্তচর এসে থাকে তাহলে তাদেরকেও ছাড়া হবে না।

ওদিকে শেইরনের কথা শুনে সেদিন থেকেই আমোদে মেতে থাকা হেলট বিদ্রোহীদের নগরের প্রাসাদের সামনের প্রান্তরে নিয়ে এসেছে কলিন। ওদেরকে বিদ্রোহী হয়তো কষ্টেসৃষ্টে বলা যায়, কিন্তু কিছুতেই যোদ্ধা বলা হয় না। ওদিকে ইভান আর ওরিয়ন ছিল অ্যালেস্টরের প্রাসাদে। বিশেষভাবে ওদেরকে খবর দিয়ে আনা হয়েছে। এই বাহিনী গঠন করা আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা একমাত্র এই দুজন দিয়েই সম্ভব। শেইরন যদিও ঐ লম্বা লোকটার কথা বলেছিল, কিন্তু বিদেশি লোকে ভরসা হয় না। সে বিদেশি, এদিকের লোকের যুদ্ধের কৌশল কীভাবে বুঝবে?

ইভান আর ওরিয়ন যুদ্ধের ব্যাপারটা আগে থেকেই জানতো। এড়িয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। নিকোলাস আর মরিস বিপক্ষ দলেই আছে। ওদের সাথে হিসেব চুকাতে সামনে দেবতা আসুক আর স্বয়ং মৃত্যুই আসুক পরোয়া করে না ইভান। সে বেশ আগ্রহ নিয়েই হেলটদের প্রশিক্ষণ দেবার কাজ করছে। রুদ্রদেব নিজেকে অপাংক্তেয় মনে করছে না। তবে যুদ্ধ বিদ্যায় তার আগ্রহের কমতি নেই। সে আগ্রহ ভরে মাঠের এক প্রান্তে বসে হেলটদের যুদ্ধের তোড়জোড় দেখছে। অসিত বসে আছে তার পাশে, অঙ্গদকে কাঁধে নিয়ে।

এক সপ্তাহের মতো চলেছে প্রশিক্ষণ। যে আগ্রহ নিয়ে ইভান আর ওরিয়ন শুরু করেছিল, তার অনেকটাই মিলিয়ে গেছে। শুরুতে বাঁশ নোয়ানো হয়নি, এখন পেকে গেছে আর ঠাস ঠাস আওয়াজ করছে। কিছুতেই হেলটদেরকে এক সারিতেই দাঁড় করানো যাচ্ছে না, অস্ত্র চালনা আর একত্রে ব্যূহ বানাবার কথা তো ছেড়ে দিলেই ভালো। কয়েক সারিতে দাঁড় করিয়ে হেলটদেরকে সামনে এগোবার কথা বলতেই ওরা সামনে চলে, আর তখন সেখানে সারি বলতে কিছু থাকে না।

অস্ত্রের অবস্থাও যাচ্ছেতাই। ওদের জন্য কোনো কামার যত্ন করে অস্ত্র বানায়নি, যারা চুরি করে কিছু ভালো অস্ত্র বাগাতে পেরেছে তাদের কাছে ভালোটা আছে, কিন্তু বাকি বেশির ভাগের কাছেই অপটু হাতে তৈরি নড়বড়ে হাতিয়ার। সে সব দিয়ে যুদ্ধে কিছুক্ষণও টেকা যাবে না। তবু চেষ্টা করে যাচ্ছে ইভান, আর বারবার আগের থেকেও বেশি হতাশ হচ্ছে।

অনেকক্ষণ চর্চার পর ইভান এসে বসেছে রুদ্রদেবের পাশে। কপাল থেকে ঘাম বেয়ে পড়ছে তার। রুদ্রদেব মন্তব্য করলো, 'অনেকটা পরিশ্রম হলো।'

'সেটা দুঃখ নয়, তবে পণ্ডশ্রম করতে হচ্ছে, এটাই কষ্টের।'

'সারা জীবন ওরা সাহসের অভাবে ভুগেছে, আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগেছে, এখন যুদ্ধ করতে গেলে তো আটকে যাবেই। যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্র হাতে ঐ দুটো জিনিসেরই তো সবচেয়ে বেশি দরকার হয়।'

আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। ইভান মুখ মুছে আবার উঠে যায়। কামারশালায় একবার যেতে হবে। সাত দিন আগেই অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থা দেখে কামারদের কিছু অস্ত্র বানাতে বলেছিল। যদিও চাহিদা অসীম আর কাঁচামালের জোগান স্বল্প। ধাতুর প্রায় সবটাই এরিসের বাহিনীর জন্য অস্ত্র তৈরি করতে গিয়ে খরচ হয়ে গেছে। সেই স্বল্প জোগানে যতটুকু পারা যায় অস্ত্র তৈরি করার চেষ্টা করতে হচ্ছে।

দুপুরের খাবারের পর খানিক বিশ্রাম, তারপর আবার তাদের অনুশীলন শুরু হলো। এদিকে একটা সুখবর পাওয়া গেছে। পায়াসের প্রাসাদের অনেকগুলো গুপ্তকক্ষের বেশ কিছু খুঁজে পাওয়া গেছে এতদিন পরে। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটা অস্ত্রাগারও আছে। প্রচুর অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে সেখানে।

একটা তীরন্দাজ বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব পেয়েছে ওরিয়ন। এদিকে অবশ্য পদাতিকদের মতো লেজেগোবরে করেনি হেলটেরা। তার পেছনে অবশ্য বহুদিনের চর্চা কাজে লেগেছে। যুদ্ধ করার জন্য না হলেও শিকার করার জন্য নিজেদের হেলটদের অনেক অভিজাতই তীর ছোঁড়া শেখায়। সেই বিদ্যেই কাজে লেগেছে। সম্মুখ যুদ্ধে কতটুকু কী করা যাবে, তা বোঝা যাচ্ছে না, তবে দলটা যে তীর দিক মতো ছুঁড়ে দিতে পারবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নতুন আবিষ্কার হওয়া অস্ত্রাগারে প্রচুর তীর ধনুক পাওয়া গেছে।

সন্ধ্যের আর বেশি বাকি নেই। ঠিক তখনই নগরের রাস্তা থেকে হইহই শব্দ ভেসে এলো। উৎসুক হয়ে উঠলো প্রাসাদের লোকজন। আবার কী হলো? শব্দের উৎস অনুসন্ধানের জন্য কেউ কেউ উঠে গেল ছাদে, কেউবা আবার দেওয়ালের ওপর।

হই হই শব্দ করছে মানুষ। ওরা হেলট বিদ্রোহী সৈন্য। শেইরনের পরামর্শ মতো নগরীর রাস্তায় আর বিভিন্ন সদর দরজায় ওদেরকে মোতায়েন করেছিল কলিন। তারা এখন নগরের চারদিক থেকে ছুটে আসছে প্রাসাদের দিকে। ছোটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তীব্র আতঙ্ক ভর করেছে তাদের ওপর।

কলিন প্রাসাদের ছাদ দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছে এই দৃশ্য। মনে হচ্ছে ওদেরকে কেউ তাড়িয়ে আনছে। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলো সে।

পিলপিল করে প্রাসাদের সদর দরজা দিয়ে ঢুকছে হেলটের দল। একজন বিদ্রোহী হেলট নেতা গোছের একজনের দিকে এগিয়ে গেল কলিন, 'কী হয়েছে?'

প্রাসাদের ভেতর ঢুকে পড়াতে এখন পলাতকদের মধ্যে একটু হলেও প্রাণ ফিরে এসেছে, তারা এখন হাফাচ্ছে, কলিনের প্রশ্নের উত্তর এলো, 'আমাদেরকে যেখানে পাহারায় রেখেছিলেন, সেদিক দিয়ে এক বিশাল বাহিনী আসছে দেখলাম। সুসজ্জিত। আমরা কিছুতেই ওদের সামনে দাঁড়াতে পারতাম না। সেই চেষ্টাও করিনি।'

সবাই ঢুকে পড়েছে। প্রাসাদের দেওয়ালের ভেতরে হেলটেরা গিজগিজ করছে। বাইরে এখন আর একজন বিদ্রোহী হেলটও নেই।

তাড়াতাড়ি সদর দরজার দিকে দৌড়ে গেল কলিন, বিপদ বুঝতে পেরেছে সে, 'তাড়াতাড়ি সদর দরজা বন্ধ করো। দেওয়ালের ওপর সেনারা তৈরি থাকো।'

কলিনের কথা শেষ না হতেই আদেশ পালিত হলো। দরজা বন্ধ করার কাজ আরও আগেই শুরু হয়ে গেছে।

শেইরন সামনে পড়লেন কলিনের, 'তোমার পাঠানো গুপ্তচর কী খবর দিলো?'

'গুপ্তচরের তো দেখাই নেই। গুপ্তচরের আগেই তো শত্রু এসে পড়েছে।'

দুজনেই উঠে এলেন দেওয়ালের ওপর। দৃষ্টি সামনের দিকে। রুদ্রদেব, অসিত, ইভান, ওরিয়ন- সবাই এখন উঠে এসেছে দেওয়ালের ওপর। ইনোনের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে ইভানের। মাত্র দুজন দাসীকে তার সাথে রেখে এসেছে সে।

এরিস তার বাহিনীকে নগরের সব সদর দরজা দিয়ে ভাগ করে প্রবেশ করিয়েছে। প্রত্যেকটা ভাগ প্রত্যেক দরজা দিয়ে একই সময়ে প্রবেশ করেছে। একজন হেলটকেও পালিয়ে যেতে দেবে না সে। সব সদর দরজা থেকে তাড়িয়ে হেলটদের প্রাসাদে নিয়ে এসেছে। এটাও তার পরিকল্পনার একটা অংশ ছিল।

এরিসের বিশাল বাহিনী এসে মিলিত হলো প্রাসাদের দেওয়ালের বাইরের প্রান্তরে। নিজের বাহিনীর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'এবার আর আমাদের ছোটাছুটির দরকার নেই। তোমরা অনেক কষ্ট করেছ। রাত হয়ে এসেছে। শিবির স্থাপন করো। ওদেরকে জীবনের শেষ রাতটা কাটিয়ে নিতে দেই। কাল সকালেই ওদেরকে হত্যা করা হবে।'

আমাজনদের মধ্যে রণহুংকার ধ্বনিত হলো। হাত তুলল এরিস, 'তোমরা রণহুংকার দিচ্ছ কেন? কাল আমরা কোনো যুদ্ধ করবো না, কালকে কিছু বিদ্রোহী দুষ্কৃতকারীর বিচার হবে মাত্র।'

আমাজনেরা যার যার কাজে মন দিলো। স্পার্টার বাকি সৈন্যরাও শিবির স্থাপন করতে লাগলো।

এরিস তাকালো পায়াসের প্রাসাদের দিকে। অনেকগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে প্রশস্ত দেওয়ালের ওপর। সেখানে একজনের ওপর চোখ আটকে গেল তার। লোকটা গ্রীক নয়, কিন্তু বিশেষ কেউ, অবশ্যই বিশেষ কেউ।

ওদিকে রুদ্রদেবও একদৃষ্টে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

কালরাত্রি বোধহয় একেই বলে। কাল কী হবে কেল্টিদের বুক কাঁপিয়ে আসতে লাগলো। সবাই একযোগে তাকিয়ে আছে কলিনের দিকে। সে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদের সামনের সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে। নেতার জায়গায় আছে, কিছু একটা তাকে বলতেই হবে কিন্তু কোনো পরিকল্পনাই তার মাথায় আসছে না। কাল সকালে কিছু একটা তো করতে হবে। ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেছে, এখন তার মন গেল অতীতে, একটা নিষ্ফল ঘুসি বসিয়ে দিলো সে নিজের হাতে,

'আমাদের পাঠানো চরের কী হলো? সে আগে থেকে খবর দিলেও তো পালিয়ে যেতে পারতাম।'

'পালিয়ে যেতে!' শেইরনের গলায় একটু বিস্ময়, 'তোমার যুদ্ধ করার চিন্তা কোথায় গেল?'

হাল আরও আগেই ছেড়ে দিয়েছে কলিন, 'আমি এই কথাটা বলেছিলাম সবকিছু বোঝার আগে। ভেবেছিলাম সবগুলো কেল্টের দল বিদ্রোহী, তারা এত আটঘাট বেঁধে যখন যুদ্ধ করতে এসেছে নিশ্চয়ই যুদ্ধের কৌশল কিছু না কিছু জানে। ওরা যে কিছুই না জেনে এভাবে দল বেঁধে স্পার্টার বিদ্রোহী অভিজাতদের হয়ে যুদ্ধ করতে চলে এসেছে তা তো আর আমি বুঝতে পারিনি।'

রুদ্রদেব এবার ধীরে বলল, 'বিদ্রোহী হয়ে ডাকাতি করা আর সম্মুখ যুদ্ধ করার মধ্যে রাতদিন তফাৎ। ওরা হয়তো ডাকাতিতে সফল হয়ে ভেবেছিল যুদ্ধের কাজেও ভালোভাবেই উৎরে যাবে।'

গত সাত দিন ওদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে ইভান, তারই সবচেয়ে বেশি ধারণা আছে এই সেনাদের নিয়ে। সে জানে ওরা ভয়েই মৃতপ্রায় হয়ে যাবে যুদ্ধক্ষেত্রে নামলে। এই দল নিয়ে বেশিদূর আগানোর চিন্তা করা ভুল হবে।

কথাটা ইভান মুখ ফুটে বলতে চায়নি, কিন্তু শেইরনের প্রশ্নের পর না বলার উপায় রইলো না, 'তুমি তো ওদেরকে যুদ্ধের মহড়া দিয়েছ? কেমন বুঝেছ?'

ইভান যে ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল উত্তরটা, তবু সে মুখে বলল, 'কোনো সজ্জিত প্রশিক্ষিত বাহিনীর সামনে এরা এক বেলাও দাঁড়াতে পারবে না।'

তার পরে আলোচনা আর এগোয় না। সবাই তাকিয়ে থাকে কলিনের দিকে। উপায় থাকুক আর থাকুক, সিদ্ধান্ত তো একটা দিতেই হবে। পৃথিবীর সব জায়গায় নেতা হবার এই এক বিড়ম্বনা।

কলিন এক পর্যায়ে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না, হতাশা যেন তার ঘাড় চেপে ধরে তাকে মাটিতে বসিয়ে দিয়েছে। সর্দার এভাবে ভেঙ্গে পড়েছে দেখে বাকিদের অবস্থাও হলো শোচনীয়। এমন সময় আত্মরক্ষার জন্য একটা চিন্তাই

মাথায় আসে সবার আগে। হেলট দলগুলোর এক নেতা এগিয়ে এলো, উত্থাপন করলো তার প্রস্তাব, 'আচ্ছা, আমরা কাল আত্মসমর্পণ করলে কী হয়? যদি ক্ষমা ভিক্ষা করি? তাহলে হয়তো স্পার্টার রাজা আমাদেরকে ক্ষমা করলেও করে দিতে পারেন।'

কলিন এবারে মাথা তুলে। এই প্রস্তাবটা এমনিতে শুনলে তার তেলেবেগুনে জলে ওঠার কথা। কিন্তু এখন যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে সে এই প্রস্তাব, 'তোমরা সবাই কী বলো? আত্মসমর্পণ করলে কি আমাদের ক্ষমা করবে? মেরে না ফেলে যদি ক্ষমা করেও দেয় তবুও তো আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে সেই আগের জীবনে।'

'কলিন' এবার হেলটদের এক নেতা তাকে নাম ধরে ডাকল, কিছুক্ষণ আগের 'মহামান্য', 'সর্দার' সম্বোধনগুলো উধাও হয়ে গেছে, 'বেঁচে থাকলে অনেক কিছুই চিন্তা করা যাবে। ওরা আমাদেরকে বন্দি করুক, আবার ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করুক, অন্তত মেরে তো ফেলবে না। মরে গেলে কি আদৌ কোনো লাভ আছে?'

'না।' বিড়বিড় করলো কলিন, 'মরে গেলে কোনো লাভ নেই। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।'

গলা উঁচিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত দিলো কলিন, জগতের সবচেয়ে সরল সিদ্ধান্ত, হাল ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে মানুষের তেমন কোন কষ্ট হয় না, 'আমরা কাল সকালে দল বেঁধে আত্মসমর্পণ করবো। এই যুদ্ধ কিছুতেই করবো না আমরা। শুধু শুধু আত্মহত্যা করার কোনো মানে হয় না।'

কোনো রকমে জীবন বাঁচানোর একটা উপায় পাওয়া গেছে, এতেই হেলটেরা খুশি হয়ে উঠলো। কেউ কেউ আবার নিজেদের নির্বুদ্ধিতাকে দিতে লাগলো দোষ। ভালোই তো চলছিল জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে, ডাকাতি করে, স্বাধীন তো ছিল। নিজেদের একটা স্বাধীন রাজ্যের লোভে পড়ে এখানে এসে এবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই যেতে বসেছে। কে জানে, আত্মসমর্পণের পরিকল্পনা যদি সফল না হয়, তাহলে কাল এই প্রাণও চলে যেতে পারে।

রুদ্রদেব এই সিদ্ধান্ত শোনামাত্র এর অসারতা বুঝতে পেরেছে, কোনোমতেই এই উপায়ে প্রাণ বাঁচানো যাবে না। সামনে এগিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলো সে। কলিনের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশ্যে হাত তুলল। রুদ্রদেবের হাত তোলা দেখে সবার কলকাকলি থেমে গেল। কলিন তাকালও রুদ্রদেবের দিকে, 'তুমি আবার কী বলবে?'

'খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা।' হেলটদের দিকে ফিরে গলা চড়াল রুদ্রদেব, 'এখন আমরা যে অবস্থায় আছি তার জন্য আত্মসমর্পণের চিন্তা আত্মঘাতী হবে। ওরা আমাদেরকে বন্দিও করবে না, তাড়িয়েও দেবে না। এই নগর উদ্ধার করাই ওদের

একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে। কিছুতেই দয়া ভিক্ষা দেবে না।'

আবার ভয় ফিরে এলো হেলটদের মাঝে, রুদ্রদেব এমন কথা কেন বলছে। একজন বলে উঠলো, 'আমাদের বিপক্ষে যে দাঁড়িয়েছে সে একজন দেবতা। দেবতারা মানুষকে অবশ্যই দয়া করবে।'

রুদ্রদেব মাথা নাড়ল, 'বোধহয় করবে, তবে এবারে নয়। আমাদেরকে তাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলে ওরা নগর আক্রমণ করতো এক দিক দিয়ে। ওরা যেভাবে নগরে ঢুকেছে তাতে বোঝাই যায় তারা চেয়েছিল, কোনো দিক দিয়েই যেন কেউ পালাতে না পারে। আমাদের সবাইকে তাড়িয়ে ওরা এই প্রাসাদের ভেতরে ঢুকিয়েছে, এখন কেবল ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো টিপে টিপে মারবে। আমি যদি ভুল না করে থাকি, আমাদের পাঠানো গুপ্তচর ওদের হাতেই ধরা পড়েছে, এজন্যই আমরা কোনো খবর পাইনি। ওরা আমাদেরকে সতর্ক হবার কোনো সুযোগই দিতে চায়নি। তার মানে ওরা আমাদেরকে পালিয়ে যেতে দিতে চায় না।'

'কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে মেরে ফেলবে। বন্দিও তো করতে পারে।'

রুদ্রদেব হাসল, 'পৃথিবীর সব জায়গায় নিয়মটা মনে হয় এক। এখানে বন্দি করার কোনো প্রশ্নই উঠবে না। বন্দি করা হয় যোদ্ধাদের। কিন্তু তোমরা তো যোদ্ধা নও। এই সমাজের চোখে, রাজ্যের চোখে তোমরা হচ্ছও এক দল বিদ্রোহী, মানে এক দল বেঈমান। আর যে বিশ্বাস রক্ষা করে না, রাজদণ্ডে তার শাস্তি একটাই। মৃত্যু। তোমরা হয়তো ভাবছ, তোমাদেরকে তারা বন্দি করবে, এত হেলট তো আর স্পার্টার কোনো কাজে আসবে না, তাই তারা তোমাদের বিক্রি করে দেবে অন্য রাজ্যে। খুবই ভুল একটা চিন্তা করেছ তোমরা। তোমাদেরকে তারা স্পার্টার কোনো কাজে লাগাবে না, তোমাদেরকে তারা আর কারো কাছেই বিক্রি করবে না। কেউই তোমাদের কিনবে না। যে একবার স্বাধীনতার খোঁজ পেয়েছে, যে একবার মুক্ত বাতাসে মুক্ত মানুষ হয়ে ছুটে বেড়াবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে, তাকে দিয়ে আর বেঁধে ধরে কাজ করানো যাবে না। তারা তোমাদেরকে ক্ষমা করবে না, কোনো সুযোগ দেবে না। রাজদণ্ড টিকিয়ে রাখার বিরুদ্ধে তোমরা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড়ো বাঁধা। আর কিছুতেই তারা তোমাদের বাঁচিয়ে রাখবে না। কথাটা আমি বুঝেই বলেছি, এবার মানা না মানা তোমাদের হাতে।'

নিজের কথা শেষ করে একটু পিছিয়ে এলো রুদ্রদেব। অসিত তার একটু পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কীভাবে এত নিশ্চিত হলেন? ওদেরকে কি আসলেই মেরে ফেলবে?'

রুদ্রদেব গলা নামিয়ে ফেললো, 'হ্যাঁ, আমি যদি স্পার্টার রাজা হতাম, আমি তাহলে ঠিক এই কাজটাই করতাম। এখানে ওদেরকে মেরে ফেললে নীতিগত কোনো অন্যায় হবে না। ওরা একে বিদ্রোহী, দুইয়ে ডাকাত।'

অসিত রীতিমতো অবাক হয়ে তাকালো রুদ্রদেবের দিকে, 'আপনি এসব কী বলছেন। নিজের স্বাধীনতা চাওয়াতে আপনি ওদেরকে মেরে ফেলতেন?'

'হ্যাঁ, কারণ ওরা শুধু নিজের স্বাধীনতা চায়নি। ওরা সেই সাথে আমার স্বাধীনতা হরণ করতে চেয়েছে। আমার রাজ্য দখল করেছে। ওদেরকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতাম না।'

'তাহলে আমরা এখন কী করবো?' প্রশ্নটা কোনো হেলট নেতাগোছের কারো মুখ থেকে এলো না। সাধারণ জিজ্ঞাসাটা একজন সাধারণ হেলটের।

কলিন এবার আর কিছুই বলছে না। তার দেওয়া সিদ্ধান্ত কাজ করেনি। এগিয়ে এলেন শেইরন, 'ওরা আমাদের পালাবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু গোপন রাস্তাগুলোর সবগুলো কি বন্ধ করতে পেরেছে? আমার মনে হয় পারেনি। সেগুলোর একটা খুঁজে বের করতে পারলে আমার মনে হয় এই যাত্রা বেঁচে যাবো আমরা।' শেইরনের মনেও এই যুদ্ধ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

কিন্তু রুদ্রদেব জানে, এই বুদ্ধি করে লাভ হবে না। বিপক্ষে যারা আছে তারা এই প্রাসাদেরই মালিক। তারা এসব গোপন জায়গাগুলো সম্পর্কে সবই জানে। সেগুলোর সামনে নিশ্চয়ই পাহারা বসানো আছে। তবে কাউকে সেই সম্পর্কে বলতে পারলো না সে। তার আগেই হেলটেরা বিভিন্ন গোপন দরজার অনুসন্ধানে গেল।

তবে ফিরে আসতে বাধ্য হলো সবগুলো দলই। ধীরে ধীরে। বিফল মনোরথে। বেশির ভাগ রাস্তাই বেরোনোর জায়গায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিছু কিছুর সামনে আমাজনেরা অস্ত্র আর আলো নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। সেগুলোর ফাঁক গলে কিছুতেই পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সবাই এসে বসে পড়লো সিঁড়ির ওপর, মাটির ওপরে, প্রাসাদের সামনের ঘাসে। কারো মেরুদণ্ডেই এখন আর বিদ্রোহ আর প্রতিবাদের জোর অবশিষ্ট নেই।

আচমকা ওরিয়ন এগিয়ে এলো, এতক্ষণ এসব বিষয়ে একটাও কথা বলেনি সে, 'তোমরা সবচেয়ে ভালো উপায়টার কথাই ভাবছ না।'

সবাই মাথা তুলে তার দিকে তাকাতে বাধ্য হলো। ওরিয়ন সবার দিকেই ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে, কোন দুশ্চিন্তার চিহ্ন নেই তার মুখে, সেখানে নিশ্চিত দৃঢ়তা, 'আমরা এতকিছু কেন চিন্তা করছি। ওদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ কেন করতে পারবো না। আমাদের কাছে এই প্রাসাদ আছে। আমরা এই মুহূর্তে এই প্রাসাদকে কারাগার হিসেবে চিন্তা করছি। সেই চিন্তাটা একটু বদলে আমরা তো এই প্রাসাদকে

দুর্গ হিসেবেও কল্পনা করতে পারি। এই দুর্গের আশ্রয়ে থেকে শত্রুদের পরাস্ত করতে পারি।'

রুদ্রদেব মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, এটাই এখন আমাদের সামনে খোলা থাকা একমাত্র পথ। সবকিছু বাদ দিয়ে আমরা কাল সকালে কীভাবে যুদ্ধ করবো সেই চিন্তা করা উচিত। আমাদের শক্তি কম, তা ঠিক আছে, কিন্তু পৃথিবীর এমন কোনো যুদ্ধের কথা আমার জানা নেই, যেখানে একেবারে সমান সমান শক্তি পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু এমন অনেক যুদ্ধের কথা জানা আছে, যেখানে স্বল্প শক্তি জিতে গেছে প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে।'

রুদ্রদেব আর ওরিয়নের কথাগুলো যেন নতুন করে আশার আগুন জ্বালিয়ে দিতে লাগলো হেলটদের বুকে। এতদিন ধরে তারা যে যে শস্ত্রের শিক্ষা করেছে, সেগুলো এখন তাদের হাতের থাবাতেই আছে। কারো কারোটা পড়ে আছে পাশে। সেগুলো সবাই হাতে তুলে ধরল। অনুভব করলো শস্ত্রের সাথে নিজেদের অস্তিত্বের সম্পর্ক। পরিণতি যা হবে দেখা যাবে, কিন্তু এখন ভয় ত্যাগ করে শস্ত্র ধরার সময় চলে এসেছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেই বুক চিতিয়ে ধরার সময় চলে আসে।

ইভান এবার এগিয়ে এসেছে। এই বাহিনীকে নানা শিক্ষা দিয়েছে সে। এখন ওদের সাথে তাকেই কাল সকালের নানা কৌশল নিয়ে কথা বলতে হবে। এই প্রাসাদের অধিবাসী কখনো কোনো আক্রমণের আশঙ্কা না করলেও যারা এই প্রাসাদ তৈরি করেছে তারা সাধারণ নিয়মের খাতিরে প্রাসাদের ভেতর থেকে শত্রুর ওপর আক্রমণ করার উপায় করে রেখেছে। সেগুলোর কিছু কিছু সে এরই মধ্যে আবিষ্কার করে রেখেছে, বাকিগুলো খুঁজে বের করতে হবে।

হেলটেরা সবাই চলে গেল ওরিয়ন আর ইভানের সাথে। একা বসে রইলো রুদ্রদেব, শেইরন আর অসিত। ওদের এখানে কোনো ভূমিকা নেই।

রুদ্রদেব উঠে দাঁড়ালো, 'চলো, সবাই মিলে দেওয়ালের ওপর যাই।'

'কেন?' অসিত প্রশ্ন করলো সন্দিগ্ধ গলায়।

'কালকে ওরা যুদ্ধ করবে প্রাসাদের বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে। আমরা তো আর প্রাসাদের অন্দরের নরম শয্যায় শুয়ে থাকতে পারবো না। ওরা হেরে গেলে যে গণহত্যা হবে, তার ছোবল আমাদেরকেও খেতে হবে। তাই কালকের যুদ্ধে আমরাও অংশ নেবো। আর অংশ নেবার আগে শত্রু সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় ততই ভালো।'

আর কেউই আপত্তি করলো না। ওরা উঠে এলো দেওয়ালের ওপর। ওদের কষ্ট হলেও অঙ্গদ উঠে গেছে অনায়াসে। সামনে বেশ কিছুটা দূরে শত্রু শিবির স্থাপন করেছে। সেখানে আলো জ্বলছে পর্যাপ্ত। নিজেদের আড়াল করার চেষ্টা করছে না বিপক্ষের কেউ। ঘুরে বেড়াচ্ছে আর কেউ কেউ নিজেদের কাজ করছে।

বাহিনীর আদ্যপান্ত ঘুরে এলো রুদ্রদেবের দৃষ্টি। স্বীকার করতে বাধ্য হলো এই জীবনে অনেক অদ্ভুত বাহিনী দেখলেও অদ্ভুত বাহিনীর তালিকায় এই বাহিনী অপরের দিকেই থাকবে। বিশেষ করে এমন নারী দিয়ে তৈরি বাহিনী কখনোই দেখেনি সে। তাদের ওদিকে নারী যুদ্ধে নেমেছে সেই উদাহরণ কেবল আদিশক্তির ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবে নারী যুদ্ধে না নামলেও নারীর কারণে অনেক পুরুষ যুদ্ধে নেমেছে। সীতা আর দ্রৌপদী লংকা আর কুরুবংশ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

শেইরনও কম অবাক চোখে তাকিয়ে নেই। রুদ্রদেব জানতে চাইলো, 'আপনাদের এদিকে এমন অদ্ভুত বাহিনী আছে, তা তো আপনি আগে বলেননি। এতদিন শুনেছি কিন্তু এখন চোখের সামনে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

'আমারও' শেইরন উত্তর দিলেন অকপটে, 'তোমাদেরকে কী জানাবো। আমি তো নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না।'

'তার মানে আপনার কাছেও দৃশ্যটা নতুন?'

'অবশ্যই। এই বয়সে এমন কোনো কিছু দেখিনি।'

'কিন্তু এরা তো আকাশ থেকে পড়েনি। কিছু না কিছু তো উৎস তো আছে। এই পৃথিবীতে সবারই থাকে।'

'তা আছে। কিন্তু সেসব তো রূপকথা। ছোটোবেলা থেকে শুনেছি কিছু কিছু। কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করিনি। এখন তো দেখছি যা শুনেছি তার অনেক কিছুই চোখের সামনে আছে।'

'তাই নাকি' রুদ্রদেব এবার একটু আগ্রহী হলো, 'তার মানে আমি সামনে যাদেরকে দেখছি, তারা আসলে রূপকথা থেকে উঠে এসেছে?'

'হ্যাঁ, এগুলোর কিছুই বাস্তব নয়।'

'চোখের সামনে যা দেখছি তা তো অবশ্যই বাস্তব। এখন আপনি এই দেবতা সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'ওরা যেই দেবতার কথা বলছে তার নাম এরিস। ছোটোবেলায় পুরোহিতের কাছে পাঠ নেবার সময় শুনেছিলাম। এরিস প্রধান দেবতাদের একজন। তার প্রচণ্ড ক্ষমতা। আসলে প্রধান বারো জন দেবতার সবারই ক্ষমতার কোনো সীমা নেই। তবে তাদের মধ্যে এরিস এক কাঠি এগিয়ে। সে হচ্ছে যুদ্ধ বিগ্রহের দেবতা। তার মনে কোনো দয়ামায়া নেই।'

'আর এই নারী সেনাবাহিনী?' অসিত নিজেও বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনছে।

'ওরা রূপকথা অনুযায়ী এরিসের মেয়ে হবার কথা। আমাজন ওদের নাম। অসম্ভব দক্ষ যোদ্ধা। মেয়ে হলেও পেশীতে হাতির বল তাদের।' পরিচয় দিতে দিতে নিজের জ্ঞান ঝালিয়ে নেবার নেশায় পেয়েছে যেন শেইরনকে, 'আর ঐ দানবেরা হচ্ছে রূপকথার সাইক্লপস। ওদের মাত্র একটা চোখ থাকে কপালে। ওরা

যুদ্ধও করে, আবার খুব ভালো কামারের কাজও করে। মূলত ওরাই এরিস আর তার বাহিনীর জন্য অস্ত্র তৈরি করে।'

'বাহ' প্রশংসা করলো রুদ্রদেব, 'চমৎকার বাহিনী। তবে একটা প্রশ্ন না করে পারছি না। এরিস যুদ্ধের দেবতা হয়ে মেয়েদের নিয়ে বাহিনী কেন তৈরি করেছে? ছেলেদের দিয়ে তৈরি করলো না কেন? এই লিঙ্গ বৈষম্য কেন?'

'মনে হয় জিদ থেকে।'

'মানে?'

'প্রথম অবস্থায় এরিস যুদ্ধে দেবী এথেনার কাছে কেবল হেরে যেত। আর তাই থেকেই তার মনে হয়েছে মেয়েরা আসলে যুদ্ধ কলায় ছেলেদের চেয়ে বেশি পারদর্শী।'

কথা আর এগোল না। সামনের বাহিনীকে ভালো করে মাপতে লাগলো রুদ্রদেব। ওদিকে ওরিয়ন তার তীরন্দাজ বাহিনীকে নিয়ে চলে এসেছে। তাদেরকে দেওয়ালের ওপর তুলে জায়গা বাছতে শুরু করলো। উঁচু জায়গা থেকে ঠিকমতো তীর ছুঁড়তে পারলে কেউ এগোতে পারবে না।

রুদ্রদেব একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সামনের অদ্ভুত বাহিনীর দিকে। এখানে কেউ জানে না, সে নিজেও কম অদ্ভুত না। এমনকি শিষ্য অসিতও রুদ্রদেবের পূর্ণ ক্ষমতার কথা জানে না।

মনে হচ্ছে দীর্ঘ তিন হাজার বছর পর আবার একটা সমানে সমানে লড়াই করতে পারবে সে।

ভোরের প্রথম আলোতে আলোকিত হয়ে উঠলো স্পার্টা। গতকাল নগরের লোকজন এই দুর্বিনীত, বেয়াদব হেলটদের দলকে তাড়া খেতে দেখে বড়োই আনন্দ লাভ করেছিল। রাতে এরিসের এই বাহিনী দেখে একটু ভয়ও পেয়েছিল তারা। তবে সকালের আলো তাদেরকে কিছু সাহস ফিরিয়ে দিয়েছে। অভিজাতদের বাড়িতে আজ সকালে হেলটদের হামবড়া ভাব নেই। হেলট সেনারা সবাই গিয়ে জড়ো হয়েছে প্রাসাদে। নিজেদের বাড়িতে এতদিন স্পার্টার লোকদের বন্দি হয়ে থাকতে হয়েছিল। সকাল হতেই এক দুজন করে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল তারা। আর এটাও বুঝতে পেরেছিল নাটকের শেষ অংকের মঞ্চায়ন হবে প্রাসাদে। সাহস সঞ্চয় করে একজন দুজন গিয়ে হাজির হয়েছে সেখানে। অনেকটা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তারা দেখছে এরিসের সেনাদের।

সকাল হতেই এরিসের সেনা সাজতে শুরু করেছে। হেলটদের কাল রাত থেকেই ঘুম নেই। কেউ কেউ হয়তো শেষ রাতের দিকে নিজের জায়গায় বসে একটু ঝিমিয়ে নিয়েছিল, এখন সেই ভাবটাও আলো ফোঁটার সাথে সাথে বিদায় নিয়েছে। এরিস এবার আক্রমণের মানসিকতা নিয়ে তাকাচ্ছে প্রাসাদের দিকে। এমনিতে দেবতা হিসেবে তার ঘুমের কোনো দরকার নেই, তবু একটু আরামদায়ক অনুভূতির জন্য কাল রাতে সেও চোখ বুজেছিল।

স্পার্টার এক বয়স্ক সৈনিক এগিয়ে এলো এরিসের দিকে, 'মহামান্য। আজকে সকালেই কি আমরা যুদ্ধ শুরু করবো? তাহলে তো ওদের প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠাতে হয়। তার সাথে যুদ্ধের আলোচনা করে যুদ্ধ শুরু করতে হবে রীতি অনুযায়ী।'

এরিস একটু বিরক্ত হয়েছে, 'কাল বিকালে কি আমার কথা তোমরা মন দিয়ে শোনোনি? এটা কোনো যুদ্ধ নয়। ওদেরকে আমরা আক্রমণ করবো। ঠিক যেমন কোনো ন্যায়বান রাজা আক্রমণ করে ডাকাত দলকে।'

'আমাদের প্রতি তাহলে কী আদেশ?'

'তোমরা এখন পর্যন্ত তো অস্ত্র চালাবার অবসর পাওনি। এবারেও মনে হচ্ছে লাগবে না। তোমরা গেলে শুধু শুধু জটিলতা বাড়বে। তার চেয়ে আমার মেয়েরাই ওদেরকে শাস্তি দিক।'

সৈনিক কুর্নিশ করে পিছিয়ে গেলা। সেনাপতি যদি তাদেরকে যুদ্ধে না দেখতে চান, তাহলে তাদের আর কী করার আছে।

প্রাসাদের দেওয়ালের ওপর তীরন্দাজদের অবস্থান এরিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। দৃশ্যটা বহু পুরানো একটা স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে তাকে। সেই ভীষণ যুদ্ধেও মাঝখানে এমন একটা দেওয়াল ছিল। দেবতা থেকে মানুষ সবাইকেই

নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল সেই দেওয়ালের সামনে। শেষ পর্যন্ত বলে ভাঙা যায়নি, ছলেই অতিক্রম করতে হয়েছিল সেই দেওয়াল।

আমাজনদের একজন এসে দাঁড়িয়েছে এরিসের পাশে, এই সকালেও তার পরনে সম্পূর্ণ যুদ্ধসাজ। এরিস হালকা চালে জানতে চাইলো, 'দেওয়ালটা দেখে কিছু মনে পড়ছে তোমার?'

'হ্যাঁ পিতা, মনে পড়ছে। আপনার আহ্বানে সেই যুদ্ধে আমরাও তো গিয়েছিলাম। তখনকার আমাজনেরা কতই না সাহসিকতার সাথে সেখানে লড়াই করেছিল। সেই গল্প তো অনেকবার শুনেছি। তবে এই দেওয়াল কি সেই দেওয়ালের মতো?'

'না, সেই দেওয়ালের মতো দেওয়াল আর তৈরি হয়নি। ট্রয়ের গর্ব ছিল তা। গর্ব আর ট্রয়ের পতন হয়েছিল একইসাথে।'

'আমরা এখন কী করবো পিতা? এখানে শত্রু তো খোলা মাঠে নেমে আসবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'তস্কর আর সৈন্যের মধ্যে এটাই তো পার্থক্য। তস্কর কখনো খোলা মাঠে নামে না। তবে তাদেরকে যেভাবে শিক্ষা দিতে হয় সেভাবেই দেবো আমরা। গর্তে হাত ঢুকিয়ে টিপে মারবো একেকটাকে।'

আমাজনদের দিকে রওনা দিলো এরিস। ওদেরকে প্রথমে পাঠানোর পরিকল্পনা নেই তার। এই দেওয়াল অনতিক্রম্য তাদের জন্য। সাইক্লপসদের শক্তি দিয়ে করতে হবে প্রথম চেষ্টা।

ওদিকে দেওয়ালের ওপর হেলটদের সেনাদলের নেতারা সবাই এক সাথে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু ওরিয়ন সেখানে উপস্থিত নেই, সে তীরন্দাজদের শেষ মুহূর্তের অবস্থান আর পরিকল্পনায় ব্যস্ত।

এরিসকে সেনার নানা অংশে হাঁটিতে দেখছে তারা। রুদ্রদেব এরিসের মতলব বুঝতে পেরেছে, এখনই আক্রমণ করা হবে। কলিনের দিকে তাকালো সে, 'কাল যদি আত্মসমর্পণের চিন্তা করে রাখতে তবে সেই প্রস্তাব দেবার সুযোগ পেতে বলে মনে হচ্ছে না। মনে হয় না ওরা আমাদের থেকে কিছু শুনতে পাবার মানসিকতা রাখে।'

কলিন খোঁচাটা গায়ে মাখল না। সাইক্লপসদের সাথে ওদিকে কথা বলছে এরিস। নিশ্চয়ই যুদ্ধের কৌশল বুঝিয়ে দিচ্ছে। সাইক্লপসদের শরীরে কয়েক হাতির জোর। ওদের এই দেওয়াল ভাঙতে খুব বেশি সময় লাগার কথা না। সামনের দেওয়ালই ভাঙতে হবে। পেছনে পাহাড় আর দুই দিকে কঠিন পাথরের দেওয়াল দাঁড় করানো হয়েছে। ওদিক দিয়ে আসতে পারবে না সাইক্লপসরা।

রুদ্রদেব ইভানের সাথে আলোচনা করছে, 'আমার মনে হয় না ঐ দানবগুলোর শরীরে তীর তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারবে। এরিস কিন্তু

আমাদের তীরন্দাজদের ভালো করে লক্ষ্য করেছিল। আর তারপরেই আর কাউকে না পাঠিয়ে পাঠাচ্ছে দানবগুলোকে। তার মানে তীরের বিরুদ্ধে ওরা অবধ্য। দূর থেকে দেখেও ওদের চামড়াকে গণ্ডারের চেয়েও শক্ত বলেই মনে হচ্ছে।'

ইভান মাথা নাড়ল, 'কথাটা তাড়াতাড়ি ওরিয়নকে জানাতে হবে। ওদের দিকে তীর ছুঁড়ে অস্ত্র নষ্ট করা যাবে না।'

'সে না হয় ছুঁড়লাম না। কিন্তু এই দানবদের আটকাতে তো হবে। সেই উপায় তো খুঁজে বের করা উচিত। তুমি না-কি কাল এই প্রাসাদ দুর্গের নানা আত্মরক্ষা আর আক্রমণ থেকে প্রতিরোধের কৌশল খুঁজে দেখেছিলে। কিছু পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, বেশ কিছু কৌশল করে রাখা আছে।'

'তার ভেতরে কোনোটা কি ব্যবহার করা যায় না?'

'মানুষের বিপক্ষে হলে সবগুলোই করা যেত। কিন্তু এই দানবদের বিরুদ্ধে কী করতে পারি' ভাবতে ভাবতে আচমকা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ইভানের চোখমুখ, 'একটা কৌশল আছে, তাতে মনে হয় এই দানবদের বিপক্ষে ভালোই কাজ করা যাবে।'

রুদ্রদেব এবার একটু আগ্রহী হলো, ততক্ষণে ইভান দেওয়ালের ওপর থেকে নেমে যাচ্ছে। রুদ্রদেব অনুসরণ করছে তাকে।

ইভান সোজা হেঁটে ঢুকে পড়লো নব্য আবিষ্কৃত এক কক্ষের ভেতর। কক্ষটা যথেষ্ট বড়ো। ভেতরে বেশ কয়েকটা বড়ো নল আছে। সেই নল শুইয়ে রাখার আর নলের মুখ নানা দিকে ঘোরানোর যন্ত্রকৌশলও আছে সেখানে। ঘোরের একেকবারে শেষের দিকে আছে বেশ বড়ো বড়ো কয়েকটা জালা। সেগুলোর ভেতরে কি থাকতে পারে তা নিয়ে রুদ্রদেবের কোন ধারণাই নেই। ইভানই ভালো করে বুঝিয়ে দিলো, 'এগুলোকে বলা হয় গ্রীক ফায়ার। এটার কথা আমরা শুনেছিলাম প্রশিক্ষণ অবস্থায় থাকতে, তবে এখানে এসেই প্রথম দেখতে পাই। প্রথমে চিনতে পারিনি, পরে অনেক ভাবতে মনে পড়ে এই বস্তুর কথা। বেশ শক্তিশালী এই অস্ত্র।'

'বিশেষত্ব কী?'

'এই অস্ত্র আগুন ছুঁড়তে পারে।' কথাটা বলেই আর দাঁড়ালো না ইভান, জীবনের এই প্রথম সামনাসামনি যুদ্ধে ভালোই মজা পেতে শুরু করেছে সে। বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। চেঁচিয়ে উঠলো, 'শক্তিশালী কয়েকজন এদিকে আসো।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে সেনাপতির আদেশ পালন করতে এগিয়ে এলো কয়েকজন। নলগুলো অনেক ভারী। নল বসানোর কলগুলোও কম ভারী না। একেকটাকে দেওয়ালের ওপর এনে তুলতে মোটামুটি বারো জন গলদঘর্ম হলো। জালাগুলোও এনে তোলা হলো দেওয়ালের ওপর। তারপর একটু একটু করে দূরত্ব বজায় রেখে বসানো হলো দেওয়ালের ওপর।

ইভান সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে দিয়েছে। সত্যিকার আগুন নিয়ে খেলা একেই বলে। জীবনে কখনো দেখেনি, কিন্তু শোনা বিদ্যার ওপর ভর দিয়েই আজকে কাজ করতে হবে, সফল হতে হবে।

আগুন নিয়ে খেলার ব্যাপারটা রুদ্রদেবের মাথায়ও এসেছে। ইভানের সব সাজানো শেষ হতেই সে আবার এগিয়ে এলো ইভানের কাছে, 'তোমার শোনা জ্ঞান কী বলছে? এগুলো সব ঠিক আছে তো?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ইভান, 'বুঝতে পারছি না। আর এতো বুঝে কাজও নেই। একটু পরে সবকিছু এমনিতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

ওরা এখন পুরোপুরি প্রস্তুত। ওদিকে এরিস নিশ্চয়ই ওদের সব পদক্ষেপের দিকে কড়া নজর রেখে চলেছে। দেখা যাক, ওরা কিছুই করবে না। প্রথম চাল মানে আক্রমণ এরিসের বাহিনীকেই করতে হবে।

এরিস ওদিকে হেলটদের কাজ কারবার দেখছে। ওরা বেশ কিছু নলের মতো জিনিস এনে তুলেছে। জিনিসগুলো চিনতে পারলো না সে। অনেকদিন ঘুমিয়ে থাকার পরিণাম। কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নিকোলাসকে ইশারায় ডাকলো সে।

নিকোলাস নিজেও অনেক চেষ্টার পর নলগুলোকে চিনতে পারলো। সেও প্রশিক্ষণের সময় কেবল সেগুলোর কথা শুনেছিল, 'এগুলো আমি কখনো ব্যবহার করিনি। শুধু শুনেছিলাম। এগুলো থেকে আগুন বেরোনোর কথা।'

এরিস এই কথা শুনে একটু চিন্তিত হলো। আগুন বেরোবে! একজন স্পার্টার রোমান সৈনিককে ডাকলো সে, 'তুমি জানো এগুলোর ব্যাপারে?'

'না, এমন অনেক কিছুই প্রাসাদে আছে। কিন্তু এগুলো কখনো ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়েনি। কেউ কখনো আক্রমণ করেনি এই প্রাসাদ।'

এরিস আর দেরি করতে চাইলো না। তাড়াতাড়ি নির্দেশ দিলো সাইক্লপসদের, 'তোমরা সবাই এক সাথে এগিয়ে যাও। তোমাদের কাজ সবচেয়ে সরল। তোমরের আঘাত করবে সবাই মিলে, যাতে এই দেওয়াল ঝুরঝুর করে ভেঙ্গে পড়ে। তোমাদের হাতে অবশ্যই সেই শক্তি আছে।'

সাইক্লপসরা এগিয়ে গেল। তাদের বাহুর অসীম শক্তি কেবল ভাঙা গড়ার জন্যই। তাদের হাতের বিশাল গদা দেখে আত্মা কেঁপে উঠলো দেওয়ালের ভেতরে আর ওপরে থাকা হেলটদের। সব দানবেরা যদি একত্রে আঘাত করতে শুরু করে তাহএল এই বিশাল দেওয়াল কতক্ষণ টিকে থাকবে?

শুধু দুজন এই কথা ভাবছে না। ইভান ওরিয়নকে আগেই বলে দিয়েছে তীর নষ্ট না করার জন্য। সে এখন প্রাণপণে শিখে আসা আগুন ছোঁড়ার নলের ব্যবহার মনে করার চেষ্টা করছে। আরেক দিকে আছে রুদ্রদেব। সে চেষ্টা করছে সাইক্লপসদের কোনো দুর্বল জায়গা খুঁজে বের করার। একটু নজর বোলাতেই সেটা

পাওয়া গেল। নিজের ধনুক তুলে নিলো সে। তূনটা কোমরে একটু আঁটসাঁট করে নিলো।

অসিতের হাতেও ধনুক, তবে সেটা এক পাশে পড়ে আছে আলতো ভঙ্গিতে, 'আপনি না বলেছিলেন, এই দানবদের কাছে তীর ধনুক কোনো কাজের কথা না। এখন দেখি নিজেই ধনুক হাতে নিচ্ছেন?'

রুদ্রদেব ধনুক আরও দৃঢ় ভঙ্গিতে আঁকড়ে ধরল, 'আমি তো হেলট সৈন্যদের কথা বলেছি। ওরা ছুঁড়লে শুধু শুধু তীর নষ্ট হবে। তবে তুমি কি ওদের সাথে আমাকে মিলিয়ে ফেললে না-কি? আমার তীর নিশ্চয়ই বিঁধবে।'

সাইক্লপসরা আর বেশি দূরে নেই। এবার রুদ্রদেব নিজের ধনুকে তীর জুড়ে দিলো। ইভান আর ওরিয়ন তাকিয়ে আছে তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে। রুদ্রদেবের নজর কেবল একজন সাইক্লপসের দুর্বল জায়গায়। জ্যা টান করে তীরটা ছুঁড়ে দিলো সে। দানব তীরটা আসতে ঠিকমতো দেখতে পেলো না। রুদ্রদেব এরই মধ্যে বুঝে গিয়েছিল, সাইক্লপসদের শরীরে এই একটা জায়গাই আছে, যেখানে অস্ত্র আঘাত করতে পারে।

নিজের কপালের মাঝের একমাত্র চোখ চেপে ধরে চরম চিৎকার করে উঠলো সেই সাইক্লপস। তার চোখের একেবারে মণিতে বিঁধেছে রুদ্রদেবের ছোঁড়া তীর। দানবের অস্বাভাবিক জান্তব চিৎকারে কেঁপে উঠলো প্রাসাদ আর প্রান্তর। এমনকি অনেক দূরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখতে থাকা নগরের লোকেরাও রীতিমতো কেঁপে উঠলো।

সাইক্লপস আহত হয়ে নিহত হবার উপক্রম হয়েছে, হেলটের দলের উদযাপন করার কথা, কিন্তু সেই ভয়ানক চিৎকার যেন তাদের উদযাপন করার কথা ভুলিয়ে দিলো। শুধু রুদ্রদেব তার ধনুকে জুড়ে নিলো আরেকটা তীর, 'বুঝলে অসিত। যেই জন্তু যেমন ভয়ানকই হোক আর দুর্ভেদ্য হোক মনে রাখবে সবার চোখই সবচেয়ে নরম আর দুর্বল জায়গা।'

আরেকটা তীরও জ্যা আকর্ষণ করেই ছেড়ে দিলো রুদ্রদেব। তবে এবারে আর তার বুদ্ধি কাজ করলো না। যেই সাইক্লপসের দিকে তাক করে ছুঁড়েছিল সে এবার চোখ নামিয়ে ফেলেছে, তার মাথার তালুতে আঘাত করলো তীর। আর সাথে সাথে রুদ্রদেব বুঝল তার ধারণা সম্পূর্ণ সত্যি। এই দানবদের একমাত্র চোখ ছাড়া অন্য কোথাও তীর দিয়ে কোনো কাজ হবে না। তীরটা তিন টুকরা হয়ে ভেঙ্গে ভূমিতে পড়লো।

পেছন থেকে এরিস ক্রোধে হতবিহবল হয়ে এক সাইক্লপসের পরিণতি দেখেছে, সাথে সাথে আরেকটা তীরের ব্যর্থ হওয়াও দেখেছে। এবার চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'মাথা নিচু করে দৌড়ে যাও। খবরদার, চোখ থাকবে নিচের দিকে।'

এই কথা বলে না দিলেও চলতো। নিচের দিকে তাকিয়ে থেকে সবগুলো সাইক্লপস একযোগে দেওয়ালের দিকে দৌড়াতে শুরু করলো। ধনুক নামিয়ে রাখল রুদ্রদেব। তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল ইভানের কাছে, 'আমার খেল শেষ। ওদের ওপর আর অস্ত্র কাজ করবে না। তোমার অস্ত্র কাজ করবে তো?'

ইভানের দাঁতে দাঁত চেপে এসেছে। স্মৃতির থেকে তথ্য নিয়ে সবাইকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে সে। রুদ্রদেবের কথার উত্তর না দিয়ে সে এবার তাকিয়ে আছে সাইক্লপসদের দিকে, আরেকটু কাছে আসতে হবে।

ইভানের ঠিক করে রাখা দেওয়াল আর নিজেদের মাঝখানের ব্যবধান পেরিয়ে এলো সাইক্লপসরা। একটু পরেই দেওয়ালের গায়ে আছড়ে পড়বে। ঠিক তখনই তীব্র গলায় নির্দেশ দিলো ইভান, 'এখুনি, সবগুলো নলে একসাথে আগুন দাও।'

সবাই নলের ভেতরে জলন্ত সলতে ঢুকিয়ে দিলো। তারপর ঘোরাতে লাগলো হাতল। এক যোগে সবগুলো নল থেকে আগুনের স্তম্ভ বেরিয়ে এলো। ভয়াল কমলা রঙের সে আগুন যেন ঝলসে দেবে পৃথিবী। সাইক্লপসদের দফা একেবারে রফা করে দিয়েছে আগুন।

কয়েকজন সাইক্লপসকে একেবারে জ্বালিয়ে দিয়েছে আগুন। তাদের তীব্র চিৎকারে ভারী হয়ে এসেছে আকাশ বাতাস। এবার আর এরিসের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করলো না সাইক্লপসরা। নিজেদের হাতের তোমর ফেলে ফেলে আসা পথ ধরে উল্টো ছুটতে লাগলো তারা। রুদ্রদেবের তীরে আগেই একজন মরেছে, আরও তিনটে বিশাল শরীর পেছনে ফেলে রেখে পালাল তারা। বাকিরা এই যাত্রা বেঁচে গেলেও কেউই অক্ষত অবস্থায় নেই।

নিজের দলের এই অবস্থা দেখে ক্রোধে একেবারে ফেটে পড়লো এরিস। রোমানদের সেই বিশাল বাহিনী কোনো সুযোগই পায়নি তার সামনে। আর এই সামান্য দাসদের কাছে তাকে হেরে যেতে হবে? ক্রোধে তার শরীর ফুলতে লাগলো, মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো।

আমাজনদের একজন পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, তড়িৎ গতিতে সে বলল, 'আমাদেরকে আজ্ঞা দিন পিতা, ঐ দেওয়াল আমরা গুঁড়িয়ে দেবো।'

'না।' এরিসের মাথায় তখন অন্য চিন্তা চলছে, 'তোমরা যাবে না। ঐ দেওয়ালের সামনে ওরা আগুন ছুঁড়বে। এই কৌশলের বিরুদ্ধে তোমরা কিছুই করতে পারবে না।'

'তাহলে এখন উপায়?'

'উপায় তো একটা অবশ্যই আছে। দেখি আমি কী করতে পারি।'

নিজের দৈব শক্তির ব্যবহার এখন পর্যন্ত করতে হয়নি তাকে। কেবল রোমানদের সাথে নিজের দৈহিক ক্ষমতার অতুলতার একটা উদাহরণ দিয়েছিল মাত্র। তবে এবার সে নিজের আয়ত্তে থাকা প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করবে।

দৃঢ় পায়ে একটু এগিয়ে খালি জায়গায় দাঁড়ালো এরিস, নিজের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলো না সে। সজ্ঞানে বাড়তে দিলো। দুই হাত ছড়িয়ে দিলো অপরের দিকে। সাথে সাথে করে উঠলো জান্তব চিৎকার।

রুদ্রদেব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এরিসের দিকে। এরিস দুই হাত ওপরে তোলা মাত্র প্রকৃতিতে একটা পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। রুদ্রদেব এই পরিবর্তনের লক্ষণ চেনে। জানে, এরিস এখন কী করতে যাচ্ছে।

এরিসের দুই হাত থেকেই বিজলির চমকের মতো শক্তি বেরিয়ে এলো। ওপরে উঠে গেল সেই শক্তি স্তম্ভ তীব্র গতিতে, যেন আকাশকে আঘাত করবে। আকাশের মর্মে গিয়ে মিলিয়ে গেল সে শক্তি। ঠিক তারপরেই নিমেষে আকাশ কালো হয়ে গেল। এরিসের দিকে তাকালে এখন যে কেউই ভয় পাবে। এতক্ষণের শান্ত সুপুরুষ মুখটা এখন যেন হেডিসের রাজ্য থেকে উঠে আসা সারবেরাসের মতো কোনো প্রাণীর মুখ। ক্রমাগত চিৎকারের মাত্রা বাড়াচ্ছে এরিস।

হেলট সৈন্যরা ভয়ার্ত অবাক দৃষ্টিতে দেখল, আকাশের বুকে আগুনের গোলক শূন্য থেকে তৈরি হচ্ছে। সেই আগুনের গোলকগুলো একটু পরেই তাদের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। ওরা একটু আগে আগুন ছুঁড়েছিল। বিনিময়ে এরিসও আগুন ছুঁড়ছে। এরিসের ছোঁড়া আগুন নিমেষে এই প্রাসাদ ধ্বংস করে দেবে, সাথে ধ্বংস করে দেবে তাদেরকেও। অধীর ক্রোধে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে এরিস।

রুদ্রদেব শক্তিটা চিনতে পারলো। শক্তির রূপ সব জায়গাতেই এক। এরিস তার দৈব ক্ষমতা ব্যবহার করেছে।

তাদের দিকে ছুটে আসছে মহা ভয়ানক সর্বগ্রাসী আগ্নেয়াস্ত্র।

আকাশ কালো হয়ে যেতেই চারিদিকে একটা ভয়ের আবহ ছড়িয়ে পড়লো। শুধু হেলটেরা নয়, স্পার্টার সৈনিকেরা আর জনগণও বিচলিত হয়ে উঠলো সেই সাথে। নিকোলাস এরিসের কাছে এগিয়ে গেল, সে বুঝতে পেরেছে সর্বনাশ ঘটতে চলেছে, আগেও এরিস বজ্রপাতের ঘটনা ঘটিয়েছিল, তবে সেটা ওদেরকে বোঝানোর জন্য, 'মহামান্য এরিস, আপনি তো স্পার্টার প্রাসাদ ধ্বংস করে দেবেন। এই বজ্র শক্তি ব্যবহার করবেন না।'

কথাটা শেষ হতেই এরিস ঝট করে ঘুরে গেল নিকোলাসের দিকে, তার দুই চোখ অঙ্গারের মতো জ্বলছে, মানুষ সুলভ কোনো লক্ষণ এখন আর সেই মুখে নেই, এরিসের চিৎকারে কয়েক পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো নিকোলাস, 'আর কখনো আমার কোনো কাজে বাঁধা দেওয়া তো দূরে থাক, আমার বিরুদ্ধে কোনো চিন্তাও করবে না।'

নিকোলাস আবার পিছিয়ে আগের জায়গায় চলে এলো। এমনিতেই যতটুকু সাহস দেখিয়েছে যথেষ্ট।

আকাশের হঠাৎ কালো হয়ে যাওয়া দেখে হেলটেরা প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। সেই সাথে ওদের সামনে এরিসের ক্রোধান্বিত ভাবও এড়িয়ে যাচ্ছে না। দেবতার ক্রোধ জাগ্রত হবার সম্ভাবনা আগেও ছিল, কিন্তু সেই ক্রোধ এই ভয়াল আকাশের সামনে যেভাবে দগ্ধ করছে তাতে পিলে চমকে যাওয়া দোষের কিছু না। হেলট সেনারা সবাই একযোগে ইভানের দিকে তাকালো, কাল রাতের পর থেকে সবাই কলিনকে নেতার পদ থেকে বিশ্রাম দিয়েছে। এখন ইভানই ওদেরকে মরা-বাঁচার সিদ্ধান্ত দেবে।

ইভান নিজেও প্রকৃতির এমন রূপ কখনো দেখেনি। সমস্ত হেলটের মতো সে নিজেও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সেই কালো হয়ে যাওয়া আকাশের দিকে। পৃথিবীর সমস্ত বিভীষিকা এসে জমা হয়েছে আকাশের সেই জায়গায়। সাধারণ বৃষ্টির দিনের আকাশ নয়। এই অন্ধকার আরও ঘন, এমন কালো মেঘ তার আগে কেউ কখনো দেখেনি।

এরিস নিজের ক্রোধকে সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে গেল। পুনর্জীবিত হবার পর এই প্রথম সে সত্যিকারের ক্রোধ অনুভব করছে। কোথাকার কোনো রোমান রাজা তার বশ্যতা স্বীকার করেছে, তার উপাসনা করতে সম্মত হয়েছে, আর সে যেই জাতির রক্ষক, যেই জাতির দেবতা, সেই জাতির লোক তাকে অগ্রাহ্য করে, তার অসম্মান করে। দেবরোষ কী জিনিস তা আজকে তারা বুঝবে। যুদ্ধের দেবতার সাথে ঘৃণ্য অপ-কৌশলে যুদ্ধ করার খেসারত এদেরকে আজ দিতেই হবে। এমনিতেও ওদের মৃত্যুই হতো, কিন্তু এখন সেই মৃত্যু হবে অত্যন্ত ভয়ংকর।

নিজের ক্রোধ সর্বোচ্চ সীমায় চলে যেতেই সীমারেখা টানলো এরিস। সৃষ্টি ধ্বংস করা তার উদ্দেশ্য নয়, এই প্রাসাদকে আপাতত তার বাসিন্দা সমেত ধ্বংস

করে দিলেই চলবে। নিজের দুই হাত ওপরের দিকে তুলল সে। তখনই কালো মেঘের ঠিক কেন্দ্রে ঘূর্ণি উঠলো। প্রবল বেগে ঘুরতে লাগলো মেঘেরা সেই ঘূর্ণিতে। ঠিক যেন মর্ত্যের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আকাশে সৃষ্টি হয়েছে।

আকাশের কালো হওয়া তার আগে মোটামুটি সবাই দেখলেও আকাশের বুকে এমন ঘূর্ণি উঠতে কেউ দেখেনি। সবাই হাঁ করে নিজেদের বিপদ আপদ ভুলে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। একটু পরেই যে তাদের মাঝে আসতে চলেছে এক ভয়ানক আঘাত তা বোঝার মতো কারো মনের অবস্থা নেই। তারা হাঁ করে সম্মোহিতের মতো সেই কালো মেঘের ঘূর্ণি দেখতে লাগলো।

শুধু একজন হেলটের দলে এই দৃশ্য হাঁ করে দেখছে না, তবে রুদ্রদেবের চোখ অবশ্যই তীক্ষ্ণ হয়ে আছে। এই দৃশ্য তার পরিচিত। শক্তির আহ্বান করা হচ্ছে। এখন সঞ্চয় হচ্ছে শক্তি। একটু পরেই ছুঁড়ে দেবার মতো অবস্থায় পৌঁছে যাবে তা, এমন করে আহ্বান সে কখনো দেখেনি, তবে প্রকৃতির পরিবর্তনের লক্ষণ তার অবশ্যই পরিচিত। আরেকটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো সে। প্রত্যেকটা পরিবর্তন এখন সিদ্ধান্তে অনেক বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে।

এরিস নিজের দুই হাত ওপর থেকে নামাল না। অদ্ভুত ভঙ্গিতে সঞ্চালন করছে। শক্তি জড়ো করে এবার প্রকট করার চেষ্টা করলো সে। সে অলিম্পাসের বারো জন প্রধান দেবতার একজন। হতে পারে অনেক দিনের অনভ্যাস, কিন্তু অবশেষে শক্তি তা কথা শুনতে বাধ্য হলো। কালো মেঘের ঘূর্ণির মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠলো।

এবার লোকজনেরা অবাক বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠলো। সেই চমকে যাওয়া বিদ্যুতের ঝলক সাধারণ বিদ্যুতের মতো সাদা রঙের হলো না। সোনালি আলো যেন ঠিক চিরে দিলো রাতের আকাশ। এই সোনালি আলোর সাথে শুধু একটা জিনিসেরই মিল খুঁজে পেলো তারা। তপ্ত আগুনের শিখা।

এরিসের মুখ থেকে ক্রোধ ঝরে গেল ক্ষণিকের জন্য। সোনালি আলো পুরো কালো মেঘ মালা থেকে আস্তে আস্তে জড়ো হতে লাগলো ঘূর্ণির কেন্দ্রে। জড়ো হতে হতে আগুন ভাগ হয়ে গেল অনেক ভাগে। প্রত্যেক ভাগের আলো এক জায়গায় জড়ো হয়ে জলন্ত আগুনের গোলক তৈরি করলো। সেই আগুনের গোলকগুলো ঘূর্ণির কেন্দ্রে এসে ঘুরতে লাগলো প্রবলভাবে।

এরিস বুঝতে পারলো শক্তি আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবার প্রয়োগের জন্য তৈরি। ওদিকে রুদ্রদেবও আগ্নেয়াস্ত্রের স্বরূপ এতক্ষণে ধরে ফেলেছে। এরিস এবার তাকালও নিজের দলের কয়েকজনের দিকে। সবার চোখে বিস্ময়, শুধু হেফাস্টাস আর আমাজনেরা নির্বিকার। তাদের জন্য এসব লক্ষণ নতুন কিছু না।

নিজের দুই হাত এবার প্রবল বেগে স্পার্টার প্রাসাদের দিকে তাক করলো এরিস। সাথে সাথে সোনালি আগুনের গোলকগুলোর মধ্যে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো। তীব্র বেগে ঘূর্ণির কেন্দ্র থেকে সেই গোলকগুলো ছুটে গেল প্রাসাদ লক্ষ্য

করে। অসংখ্য লেলিহান শিখা যুক্ত আগুনের গোলক প্রবল ধ্বংস তৃষ্ণা নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। নিজেদের বিজয়ের কথা ভুলে স্পার্টার দর্শক অভিজাতরা আর সেনারা তাকিয়ে আছে এই বিভীষিকার দিকে। স্পার্টার প্রাসাদকে ধ্বংস হওয়া থেকে আজ আর কেউই বাঁচাতে পারবে না।

বিপক্ষের শত্রু হেলটদের মাথায় এখন এই চিন্তা নেই। নিশ্চিত মৃত্যুকে চোখের সামনে আসতে দেখছে তারা। এই প্রাসাদ যে ধ্বংস হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা এখন কী করবে।

ইভান পুরোপুরি হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। তার জীবনে শেখা যুদ্ধবিদ্যার কোথাও এমন কোনো অস্ত্রের ব্যবহার অথবা প্রতিকারের কথা শেখানো হয়নি। এখন চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার রইলো না। একটা উপায় অবশ্য আছে, আর তারই তোড়জোড় করছে কয়েকজন মিলে। যে দেওয়ালকে তারা কাল রাত থেকে নিজেদের রক্ষার সবচেয়ে বড়ো উপায় বলে ভাবছিল, সেই দেওয়ালই এখন হয়ে গেছে তাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো বাঁধা। সদর দরজা নানা ভাবে অপ্রতিরোধ্য করেছিল কাল ইভান। যাতে সহজে শত্রুপক্ষ ঢুকে পড়তে না পারে। এখন সেটাই বুমেরাং হয়েছে। তাদের লোকও এখন সদর দরজা খালি করতে পারছে না। বেরিয়ে গিয়ে শত্রুর হতে পড়লেও তো অন্তত এই পুড়ে কাবাব হয়ে মরা থেকে বাঁচা যেতো।

আগুনের গোলক তীব্র গতিতে ছুটে আসছে প্রাসাদের দিকে। এরিসের হাত এখনো তাক করা প্রাসাদের দিকে। টানটান হয়ে আছে তার শরীর। রুদ্রদেব স্পষ্ট বুঝতে পারছে, দেবতা শক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে কোন শস্ত্র দিয়ে নয়, নিজের শরীর দিয়ে। এই ক্ষমতা কোনো সাধারণের থাকতে পারে না।

ওরিয়ন নিজে তার তীরন্দাজ বাহিনীর সাথে শস্ত্র ত্যাগ করে বসে আছে। আগুনের গোলকগুলোর দিকে তাকিয়ে বিস্ময় অনুভব করছে সে, কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি কোনো রকমের ভয় অনুভব করছে না সে। একবারের জন্য ডোরার কথা মনে পড়লো তার। হয়তো এই জীবনে শেষ বারের মতো।

শুধু ওরিয়ন নয়, সবাই সবার প্রিয় স্মৃতি আর মানুষের কথা মনে করতে শুরু করেছে। অসিত অঙ্গদকে জড়িয়ে ধরে আছে, ভীষণ ভয় পেয়েছে অঙ্গদ। তার মনে পড়ছে রাধার কথা। মৃত্যু এই যাত্রায় অনেক বার তাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল, অনেক বার সে বেঁচে গেছে। এই প্রত্যেক বারই অঙ্গদ আর রাধার কথা মনে পড়েছে তার। যাক, শেষ সময়ে অন্তত একজনকে বুকে তো পাওয়া গেল। ইভানের মনে পড়ছে ইনোনকে। এই বিপদের মধ্যেও নিজেকে ধন্যবাদ দিলো সে, ইনোনকে এই প্রাসাদে নিয়ে না আসার পরামর্শটা নিজেকেই নিজে দেবার জন্য।

এগিয়ে আসছে আগুনের গোলক। আর বেশি দেরি নেই। ভূমির সাথে ব্যবধান যতই কমছে ততই তীব্র হচ্ছে গোলকের গতি।

রুদ্রদেব একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেগুলোর দিকে। শরীর অনড় হলেও মাথায় ঘুরছে চিন্তার চাকা। দিব্যাস্ত্রের নিয়মটা যুদ্ধের ক্ষেত্রে খুবই সহজ।

দিব্যাসস্ত্রের জ্ঞানহীন কারো দিকে চালানো যাবে না। এই নিয়ম দেবতা, দানব, মানব সবার জন্য একই। কিন্তু সামনে দাঁড়ানো দেবতা যোদ্ধা এই কথাটা মেনেছে বলে মনে হচ্ছে না। তার সামনে দিব্যাশাস্ত্রের কেউ নেই জেনেও সে এই শক্তির, এই মহাস্ত্রের আহ্বান করেছে। শক্তি কারো নিজস্ব সম্পত্তি নয়, কেউ ইচ্ছে করলেই শক্তির নিয়ম পাল্টাতে পারবে না।

নিজেকে বাঁচাবার অধিকার সবারই আছে। আর সেটা এখানে নিয়মসঙ্গত। তবে তার এই ক্ষমতা প্রকাশ পেলে খুব একটা ভালো কিছু হবে না। মানুষ নিশ্চয়ই তখন তাকে আলাদা চোখে দেখবে। আর মানুষের প্রবল কৌতূহল যে কারো জন্যই অনেক বিপজ্জনক। এসব জ্ঞান তাই কখনো মানুষের সামনে আনার চিন্তাও করেনি রুদ্রদেব। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। তার জীবনের সাথে সাথে এখানে উপস্থিত সকল মানুষের জীবন এখন তার ওপরই নির্ভর করছে।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যেতেই এক বিন্দু সময় নষ্ট করলো না রুদ্রদেব। তড়িৎ গতিতে তুলে ফেললো ধনুক। ইভান তার দিকে তাকিয়েছে অবাক হয়ে। এই অবস্থায় ধনুক দিয়ে কী হবে।

ধনুক তুলতে তুলতেই বরুনাস্ত্রের মন্ত্র উচ্চারণ করে ফেলেছে রুদ্রদেব। ধনুককে তীর ছোঁড়ার অবস্থানে নিয়ে আসা মাত্রই বরুনাস্ত্র আলোর রূপ ধরে দেখা দিলো তার ধনুকে। ওপাশ থেকে সেই আলো নজর এড়ালো না এরিসের। অবাক হয়ে সে তাকিয়ে রইলো রুদ্রদেবের দিকে।

হেলটদের দলের অনেকেই এখন তাকিয়ে আছে রুদ্রদেবের হাতের দিকে। আজকের দিন মনে হয় চমক দিবস। একের পর এক চমকের ধাক্কা আসছে। রুদ্রদেব হাত থেকে বরুণ শক্তি উন্মুক্ত করলো। সাথে সাথে শক্তি তীরের গতিতে ছুটে গেল আসতে থাকা আগুনের দিকে। সৃষ্টি হলো একটা সরোবর। ঠিক যেন শূন্যে ভাসছে এক দীঘি। সেই জলের আঁধার ঢেকে ফেললো পুরো প্রাসাদ। এখন প্রাসাদ আর ছুটে আসা আগুনের গোলকগুলোর মধ্যে শূন্যে ভাসছে বরুনাস্ত্র হতে তৈরি সরোবর।

নিজের সর্বশক্তি দিয়ে বরুনাস্ত্র প্রয়োগ করেছে রুদ্রদেব। সবাই অবাক হয়ে দেখল, সেই শূন্য থেকে সৃষ্টি হওয়া দীঘি শূন্যে এখন শুধু ভেসেই নেই বরং সেও গতিতে ছুটে চলেছে ছুটন্ত আগুনগুলোর দিকে।

এরিস তাকিয়ে আছে তার আগুনের গোলকগুলোর দিকে। এখন আর পতন রোধ করার উপায় নেই। থাকলেও সে করতো না। একটা বাঁধা দিয়েছে হেলটের দলের ঐ মানব। নিজের হাতের বাহুর শক্তিকে একেবারে সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে গেল এরিস। আগুনের গোলক ছুটতে লাগলো আরও তীব্র গতিতে।

প্রচণ্ড বেগে পরস্পরকে আঘাত করলো আগুন আর জল। রুদ্রদেবের বরুনাস্ত্র নিজের কাজ করেছে। প্রত্যেক গোলকের আগুন নিভে গেছে জলের সাথে সংঘর্ষে। তবে আগুনের শক্তি শুষে নিতে কম কষ্ট হয়নি শূন্যে ভাসা জলের সরোবরের।

জমাট শক্তি হারিয়ে বৃষ্টির তীব্র ধারার মতো ঝরে পড়েছে প্রাসাদের ওপর। প্রত্যেকটা মানুষ ভিজে যেন চুপচুপে হয়ে গেল।

চোখে তীব্র অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে এরিস। সে ভাবতেও পারছে না তার আগুন অস্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। আবার দূরদৃষ্টি ক্ষমতা ব্যবহার করে সে তাকালো রুদ্রদেবের দিকে। তার আগুনকে থামানোর জন্য জল সেই ছুঁড়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। নিশ্চিতভাবেই এই ক্ষমতা কোনো দেবতা ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই লোকের বাহ্যিক গঠন অথবা বেশ কোনো দেবতার সাথে মেলে না। এই কথার একটাই উত্তর আছে, আর সেটাই এলো এরিসের মাথায়।

নিশ্চয়ই কোনো দেবতা ছদ্মবেশে আছে। সে অনেকদিন পরে জেগে উঠেছে, সে যদি জেগে উঠতে পারে, তাহলে অন্য দেবতাও অবশ্যই জেগে উঠতে পারবে। সে নিজে হেফাস্টাসকে জাগিয়েছে। যেই রহস্য এতদিন পরে তাকে জাগিয়েছে, সেই রহস্যই তো অন্য দেবতাকেও জাগিয়ে তুলতে পারে।

সাথে সাথে নিজের দৈব ক্ষমতার ব্যবহার করতে সচেষ্ট হলো সে। দূরদৃষ্টির সাথে সাথে কোনো ছদ্মবেশধারী মানুষ অথবা দেবতার আসল রূপ দেখার জন্য মনকে একত্রিত করে প্রয়োগ করলো সে দৃষ্টিভেদের ক্ষমতা। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল, সামনের লোকটার যে রূপ আছে সেটাই আসল রূপ, পেছনে লুকানো কিছুই নেই। চিন্তার গাঢ় ভাজ পড়লো এরিসের মুখে। যদি সামনে প্রতিপক্ষ হিসেবে কোনো দেবতা থাকে তাহলে মহাবিপদ। সেই দেবতা এতক্ষণে তার পরিচয় জেনে গেছে, কিন্তু সে কিছুতেই প্রতিপক্ষের পরিচয় জানতে পারছে না।

ওদিকে হেলটেরা বরুনাস্ত্র থেকে হওয়া বৃষ্টির জলে ভিজে পুরো দাঁড়কাক হয়ে গিয়েছিল। সবাই সম্বিত ফিরে পেতেই রুদ্রদেবের দিকে তাকালো। নিজেদের শরীর তাদের জলে ভেজা, মাথার চুল বেয়ে জল পড়ছে টপটপ করে পড়ছে, সেসব মুছতে ভুলে গেল, ঝরিয়ে নিতে ভুলে গেল, সবাই শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রুদ্রদেবের দিকে।

রুদ্রদেব জানতো, এই কাজটা করলে মানুষের এই দৃষ্টির সামনে পড়তেই হবে তাকে। তেমন একটা অপ্রস্তুত বোধ করলো না সে। অসিত শুধু অবাক হয়নি, রুদ্রদেবের এই ক্ষমতার কথা তার জানা ছিল, তবে প্রয়োগ যে এভাবে করবেন গুরু তা সে জানতো না। ইভান এগিয়ে এলো রুদ্রদেবের দিকে,

'এতদিন তাহলে তোমার আসল পরিচয় আমরা জানতে পারিনি। আজকে জীবন বাঁচিয়ে নিজের আসল পরিচয় তুমি আমাদের জানিয়ে দিলে।'

রুদ্রদেব একটু হাসল, 'আমার পরিচয় যা বলেছি তাই। আমি ভারতের এক সাধারণ মানুষ। আজকে আমার বিশেষ ক্ষমতার ব্যাপারটা জানতে পারলে আর কি।'

আগুনের লেলিহান বিপদ থেকে বেঁচে যাওয়া এখনো মেনে নিতে পারছে না হেলটরা। ভয়ও তাদের কাটেনি। তবে আশার একটা স্ফুলিঙ্গ তো দেখা যাচ্ছে।

ওপাশে দেবতা থাকলে তাদের দিকেও রুদ্রদেব আছে, যাকে এতদিন সাধারণ মানুষ মনে হলেও আসলে তা নয়। আবার তারা সোজা হয়ে শস্ত্র হাতে দাঁড়ালো।

শুধু হেলটদের দিকের একজন রুদ্রদেবের এই ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তেমন একটা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। শেইরন এসে রুদ্রদেবের সামনে দাঁড়িয়েছেন, সরু চোখে দেখছেন তাকে, 'সেই ঝড় রহস্যের সমাধান তাহলে আজকে হলো। এখন বুঝতে পারছি, মাঝ সমুদ্রে সেদিন ঝড় কীভাবে থেমেছিল। দুই বার তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। ধন্যবাদ।'

'ওভাবে চিন্তা না করলেও চলবে। আমি আসলে কারো উপকার করিনি। দুই পরিস্থিতিতেই শক্তি ঠিকমতো ব্যবহার না করলে আমাকেও শিষ্য সমেত মরতে হতো। তবে আপনি আমাদের স্বার্থহীন হয়ে যেটুকু সাহায্য করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ।'

শেইরন এই কথার উত্তরে তেমন কিছু বললেন না, সরে কেবল একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। যার কাছে এতদিন থেকেও এত বড়ো রহস্য জানতে পারা যায়নি, তাকে একটু সন্দেহের চোখে দেখা স্বাভাবিক। তবে তিনি এটুকু বুঝতে পারছেন, ছোটোবেলা থেকে যেসব শক্তি, দেবতা, অলিম্পাসের গল্প তিনি রূপকথা মনে করে মনোরঞ্জনের জন্য শুনেছেন সেগুলো আসলে রূপকথা নয়, সেগুলোই আসল কথা। নিজের স্মৃতিতে হাতড়াতে লাগলেন তিনি। ক্রমাগত চেষ্টা করছেন আরও কিছু তথ্য খুঁজে বের করার জন্য।

ওদিকে এরিস মাথা তন্নতন্ন করে পরিস্থিতির সমাধান খুঁজছে। তবে প্রথমে দেবতার পরিচয় জানতে হবে। একেবারে সঠিক পরিচয় জানতে না পারলেও একটা ধারণা তো পেতে হবে। একটা বড়োসড়ো শক্তি ব্যবহার করলেই দেবতাকে সেটা কাটাতে আরও বড়ো কোনো শক্তি ব্যবহার করতে হবে। তখন ছদ্মবেশে না থেকে হয়তো ফিরে আসতেই হবে নিজের পরিচয়ে। হতে পারে, এই লোকটা কোনো দেবতা নয়, হয়তো কোনো উঁচু মাপের পুরোহিত। এসব শক্তির সামান্য সন্ধান পেয়েছে সাধনা করে। এমন মানুষ আগে অনেক ছিল। এখন একেবারেই হাওয়া হয়ে গেছে সেই ধারণা করলে ভুল করা হবে।

বাজিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিলো এরিস। একটা বড়ো শক্তি প্রয়োগ করবে সে। যদি এটাও ফিরিয়ে দেয় তাহলে বুঝতে হবে সামনের জন অবশ্যই বেশ বদলানো কোনো না কোনো দেবতা।

এরিস আবার নিজের মনকে দেহের সাথে সংযোগ করলো। দেহের ভেতরে একটা অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি হলো তার। দুটো হাতকে এবার ভূমির সাথে সমান্তরালে রেখে তাক করলো প্রাসাদের দিকে।

প্রথমে তেমন কিছু বোঝা গেল না। তারপর, একটু সময় অতিবাহিত হতেই দেওয়ালের ওপরের লোকজন টের পেতে শুরু করলো ভূমি একটু একটু কাঁপছে।

ব্যাপারটা যে সাধারণ কোনো ভূমিকম্প নয়, তা একটুতেই বোঝা গেল। যে সময়ে আকাশ থেকে আগুনের গোলা ছুটে আসে সেই সময়ে প্রকৃতির অন্যান্য ঘটনাগুলোর সাথে যে প্রকৃতির যোগ থাকবেই সেটা কল্পনা করার কোনো কারণ নেই। হেলটেরা আবার স্বস্তির জায়গা থেকে প্রবেশ করলো আতংকের রাজ্যে। অদৃশ্যের ভয় বড়ো মারাত্মক। এতক্ষণ যদিও নিজের দিকে আসা বিপদ দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু এখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু ভূমি কাঁপছে, আর ধীরে ধীরে সেই কাঁপুনি বেড়েই চলেছে।

নিজের কাজে শতভাগ সফল হতে যাচ্ছে এরিস। পাঁচটা প্রধান শক্তির মধ্যে ভূমিও আছে। আর সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে ভূমি নিয়ন্ত্রণ করা। এই শক্তি এতদিন পরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা নিয়ে সন্দেহ ছিল এরিসের। কিন্তু, এখন আর সেই সন্দেহ নেই। সে একবার যখন জেগে উঠেছে তখন দৈবিক সকল ক্ষমতা নিয়েই জেগে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বসলো তার। দুই হাতের পেশি যেন চামড়ার বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। তীব্রতা বাড়তে লাগলো আস্তে আস্তে।

ওদিকে ভূমির কাঁপুনি বাড়তে লাগলো। এতক্ষণ দেওয়ালের ওপরে দাঁড়ানো হেলটেরাই বুঝতে পারছিল এই কাঁপুনি, এখন মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা সবাইও বুঝতে পারছে। পুরো প্রাসাদ দুলছে, আর বেশিক্ষণ এমন অবস্থায় থাকা যাবে না। দেওয়াল, প্রাসাদ সবই ভেঙ্গে পড়বে। এমন সময় দেওয়ালের ওপর থেকে নেমে যাওয়াই শ্রেয়। খোলা স্থানে দাঁড়ালে ক্ষতি একটু কম হবে।

ইভান ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে সাথে সাথে। সবার উদ্দেশ্যে চিৎকার করলো সে, ' সবাই দেওয়াল থেকে নেমে যাও। দেওয়ালের কাছে কেউ দাঁড়াবে না। সবাই খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও।' কথাটা বলেই ইভান আর দেরি করলো না। বেয়ে নামার সময় নেই, তার দরকারও নেই। এক লাফে দেওয়াল থেকে মাটিতে নেমে পড়লো সে। পায়ের জোরালো পেশীতে একটুও আঘাত লাগলো না। ওরিয়ন ঠিক তার পিছু পিছু নেমে পড়েছে। একই উপায়ে।

ইভানের ডাকে হেলটেরা সবাই নেমে পড়তে লাগলো, তাদেরকে মই বেয়েই নামতে হচ্ছে। দেওয়ালের সাথে সাথে মইও ভীষণ ভাবে কাঁপছে, তার ওপর ভিড়ের তাড়াহুড়ায় আর চাপে দুয়েকজন মই থেকে নিচের মাটিতে পড়ে আহত হচ্ছে। সব মিলিয়ে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা।

দেখতে দেখতে সবাই নেমে পড়লো দেওয়াল থেকে। শুধু দুজন এখনো ঐ দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অবশ্য বানরকে ধরলে তিনজন। অসিত রুদ্রদেবকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি নামবেন না?'

রুদ্রদেব কথার জবাব দিলো না। তার মাথায় প্রতিরোধের চিন্তা চলছে। নিশ্চিত ভাবেই ভূমি শক্তি ব্যবহার করছে ঐ এরিস। তার মানে এই হেলটেরা জানে না।

তারা জানে না এটা কোনো সাধারণ ভূকম্প নয়। এখানে দেওয়াল আর প্রাসাদ ধ্বসে পড়বে না, বরং এই পুরো জায়গাটাই একটা বড়ো গর্ত হয়ে মাটির অতলে দেবে যাবে। যারা খোলা জায়গায় মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে বেঁচে যাবে ভাবছে, তারা ভুল।

কিন্তু সে সত্যটা জানে, আর জানে বলেই দেওয়াল থেকে সবার মতো নেমে যায়নি। ভূমি অস্ত্রকে বাঁধা দেওয়া, বসুন্ধরার ভাঙন রোধ করা অনেক শক্ত। অগ্নির উত্তরে যেমন জল আছে, বায়ুর উত্তরে যেমন উল্টো বায়বাস্ত্র প্রহার করা যায়, সেরূপ ভূমি অস্ত্র থেকে বাঁচার সরাসরি কোনো উপায় নেই।

সরাসরি উপায় না থাকলেও এই অস্ত্র তো আর অমোঘ নয়। এই পৃথিবীতে ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মশির, পাশুপাত সব অস্ত্রেরই নিদান আছে। ওসব মহাজাগতিক অস্ত্রের কাছে এই ভূমি অস্ত্র কিছুই না। তবে এখানে একটাই উপায়, অস্ত্রকে বাঁধা দিয়ে লাভ নেই, যে শক্তিকে প্রয়োগ করছে তাকে বাঁধা দিতে হবে, তাহলেই এই দফা বাঁচা যাবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রুদ্রদেব। এই দেবতার ক্ষমতার পরিচয় সে এরই মধ্যে পেয়ে গেছে। পুরো দেওয়াল আর প্রাসাদ এখন থরথর করে কাঁপছে। এত বড়ো একটা জায়গা ঘিরে নিজের শক্তি দিয়ে ভূমি ধ্বস নামানো যেনতেন কথা নয়। লড়াইটা এখানে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো হবে। কোনোমতে সবাইকে নিয়ে পালিয়ে যাবার একটা সুযোগ পেলেই হবে। চিন্তা করতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো সে।

অসিত আবার জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি নামবেন না? এবার তো দেওয়ালের ওপর থেকে আমাদেরকে ফেলে দেবে এই কাঁপুনি।'

এবারও জবাব দিলো না রুদ্রদেব, ঝট করে তুলে ফেলেছে নিজের ধনুক। মন্ত্রে ঠোঁট নড়তেই ধনুকে প্রকাশ পেলো নতুন অস্ত্র। এই অস্ত্র সম্পর্কে অসিত জানে না। সে পঞ্চ শক্তি দেখেছে। এই শক্তি তার চেয়ে আলাদা, তার মানে এটা তার জন্য অচেনা।

তীর ছুঁড়ে দিলো রুদ্রদেব। প্রায় আলোকের গতিতে ছুটে গেল সেই শক্তি, এরিসের একবারে সামনে গিয়ে তার গতি রোধ হলো।

এরিস চেয়ে আছে এই আলোক অস্ত্রের দিকে। বুঝতে পারছে না অস্ত্রের বৈশিষ্ট্য। অস্ত্র কাউকে আঘাত না করে থেমে গেল কেন?

জবাব পাওয়া গেল একটু পরেই। আলোক সেখানেই ঘুরতে লাগলো শূন্যে স্থির হয়ে। আর ঘূর্ণনের বেগ যতই বাড়তে লাগলো ততই সেই অস্ত্র থেকে এক বিচিত্র শব্দ তরঙ্গ বের হতে লাগলো। বিচিত্র সেই শব্দ অচিরেই প্রবেশ করলো এরিসের কানে, সাথে আমাজনদের আর স্পার্টার সৈনিকদের কানেও প্রবেশ করলো।

ঘূর্ণনের গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে শব্দের তীব্রতাও বাড়তে লাগলো। ঠিক যেন মাথার ভেতরে আঘাত করছে। এরিস অবাক হয়ে দেখল, যেই ঘুম সে দেবতা হবার সুবাদে মানুষের মতো তাকে কাবু করতে পারে না, সেই ঘুমই এখন তার দুই চোখ যেন ভেঙে ফেলছে। তার দেহ শিথিল হতে লাগলো। আস্তে আস্তে ওদিকে কমতে লাগলো প্রাসাদ আর দেওয়ালের কাঁপুনি। দেখতে দেখতে এরিস মাটিতে পড়ে গেল

উপুড় হয়ে, সাথে সাথে ভূমির সকল কাঁপুনি থেমে গেল। রুদ্রদেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এই যাত্রাও বাঁচা গেছে। দেবতাকে ভালো রকম ধোঁকা দেওয়া গেছে।

ইভান উঠে এসেছে আবার তার পাশে। সাথে হেলটেরাও আসছে। ইভান সামনের দিকে তাকিয়ে বেশ অবাক হলো। অদ্ভুত দৃশ্য সেখানে, 'এসব কী?'

রুদ্রদেব নিজের ধনুক সামলেছে, 'কিছু না। সম্মোহন অস্ত্রের অনেক ভাগের মধ্যে একটা হচ্ছে নিদ্রা বান। সেই বান একটা বিশেষ শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। আর মস্তিষ্কে সেই শব্দ তরঙ্গ একটা বিশেষ জায়গায় আঘাত করে, তখন মানুষ অথবা কোনো প্রাণী আর না ঘুমিয়ে পারে না। এখানে আমি সেই নিদ্রা বাণের প্রয়োগ করেছি।'

সেই বাণের প্রয়োগে সামনে কেবল এরিসই ঘুমিয়ে নেই। পুরো আমাজন বাহিনী আর হেলট সৈন্যরা অচেতন হয়ে পড়ে আছে, এমনকি ঘোড়া আর বলদগুলোও জেগে নেই।

ওরিয়ন আনন্দিত হয়ে উঠলো, 'বাহ, তাহলে তো জিতেই গেলাম। ওদেরকে এখন বন্দি করতে পারি, অথবা মেরে ফেলতেও পারি।' যুদ্ধ করা ছাড়াই জিতে যাবার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে ওরিয়ন।

ইভান তার মত দিলো, 'নাহ, ওদেরকে এমন অসহায় অবস্থায় মারা যাবে না। তবে বন্দি তো অবশ্যই করা যাবে।'

রুদ্রদেব অস্ত্রসস্ত্র সামলে দেওয়ালের নিচে নেমে এলো, 'নাহ, ওদেরকে মারাও যাবে না, বন্দিও করা যাবে না। আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত হচ্ছে ওরা অচেতন থাকতে থাকতে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া।'

কলিন এই পালানোর কথাটা শুনতে চাইলো না, প্রতিপক্ষকে বাগে পাওয়ার এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়ে ছাড়ে কোন বোকায়, 'ওদেরকে কেন মারা যাবে না, কেন বন্দি করা যাবে না?' প্রতিপক্ষ দুর্বল হওয়াতে আবার নেতা সুলভ কণ্ঠভঙ্গি ফিরে এসেছে কলিনের গলায়।

রুদ্রদেব জানে হাতে সময় নেই, তবু সে অল্প কোথায় বোঝাতে লাগলো, 'কারণ, এই অস্ত্রের একটা প্রভাব বলয় আছে। ভালো করে খেয়াল করো, আমি এই অস্ত্র ছুঁড়ে শুধু ওদেরকে অজ্ঞান করেছি। কিন্তু আমাদের কারো ওপর এই অস্ত্র কাজ করেনি। আমরা এই অস্ত্রের প্রভাব বলয়ের বাইরে আছি দেখেই করেনি। এখন আমাদের মধ্যে কেউ যদি সেই বলয়ের ভেতর প্রবেশ করে তাহলে সেই বলয় কেটে যাবে, সাথে সাথে ওরা সবাই আবার জেগে উঠবে। যে-কোনো ভাবে কোনো পশুও যদি বাইরে থেকে প্রবেশ করে তাহলে এই বলয় কেটে যাবে।'

'কেটে গেলে আবার প্রয়োগ করলেই চলবে।' কলিন একগুয়ে স্বরে কথা বলে।

'এক কৌশলে বার বার কাজ হয় না। তখন নিজেদের জন্য সুরক্ষা বলয় তৈরি করে ফেলবে দেবতা এরিস।'

ইভানের দিকে ফিরল রুদ্রদেব, 'দেখো, আমি তোমাকে দেওয়া আমার কথা রেখেছি। আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু এই যুদ্ধ তোমাদের জন্য অসম।

আমার জন্যও অসম। আমি একজন সাধারণ মানুষ, কেবল কিছু দৈব শক্তি অর্জন করেছি, আর এই লোক নিজেই দেবতা। আমাদের জন্য এই প্রাসাদ ছেড়ে পালানোই সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত।'

এবার আরও কয়েকজন হেলটদের নেতারা এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা রুদ্রদেবের পক্ষে সায় দিলো, কলিনের আর এবার গলার জোর তেমন থাকলো না। নিজের বাহিনীকে সদর দরজা থেকে বাঁধা সরিয়ে বেরিয়ে যেতে বলল ইভান।

হেলটের দল প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলো সদর দরজা দিয়ে। দলটা চলছে বেশ জোরে। এখনো ঘুমে অচেতন এরিসের বাহিনীর থেকে অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে যাতে সম্মোহন বলয় কিছুতেই নষ্ট না হয়।

হেলটেরা নগর ছাড়তে খুব বেশি দেরি করলো না। তাড়াতাড়ি তারা জঙ্গলের ভেতর চলে গেল। একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলতে শুরু করেছে তারা। বুদ্ধিটা দিয়েছে কলিন, নগর ছেড়ে এসেছে সে, ক্ষমতা ছেড়ে এসেছে, এখন আর কোনো কিছুর জন্যই বিপদের কাছে থাকা যাবে না, 'আমাদেরকে বন্দরের দিকে চলতে হবে। কোনোমতে জাহাজ চেপে চলে যেতে পারলে আর কোনো ঝামেলা হবে বলে মনে হয় না। ডাঙ্গায় চললে ওরা হয়তো আমাদের পিছু নিয়ে ধরে ফেলতে পারে।'

এই যুক্তি নির্ভুল। ইভান ওদিকে ওরিয়নকে নিয়ে গিয়ে এক ফাঁকে ইনোনকেও নিয়ে এসেছে প্রাসাদ থেকে। ইনোন এখন ওদের সাথে পথ চলছে। জঙ্গলের একটু ভেতরে এসে ইনোন ইভানকে জড়িয়ে ধরলো, ' ঐবাড়িতে আমাকে একা রেখে চলে গেছো তুমি। আমি বারবার বাবাকে দেখতে পেয়েছি, ডোরাকে দেখতে পেয়েছি। আর কখনো আমাকে একা রেখে যাবে না?'

ইভান ইনোনের পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলো কিছুক্ষণ, তারপর সবার সাথে যাত্রা করলো সমুদ্রের দিকে। বন্দরে পৌঁছে জাহাজে করে এই অভিশপ্ত জায়গা ছাড়তে হবে। হেলটদের মনেও এখন আর স্বরাজের আশা নেই। কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেই হলো।

ওদিকে স্পার্টার যেসব অভিজাত লোকজন দূরে দাঁড়িয়ে দেবতার সেনা আর হেলটদের মাঝে এই যুদ্ধ দেখছিল, তারা সবাই এই অবাক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে। একটা অবোধ্য উপায়ে দেবতা এরিসের পুরো সেনাবাহিনী অচেতন হয়ে পড়েছে। বাহিনীর কেউ একটু নড়ছেও না। ঠিক তার একটু পরেই প্রাসাদ পুরো খালি করে হেলট বাহিনী চলে গেছে। যতক্ষণ হেলটেরা দৃষ্টিসীমায় ছিল ততক্ষণ তারা নড়তে সাহস পেলো না। এই কয়েকদিনে হেলটদের নানা অত্যাচার সহ্য করতে করতে তাদের প্রতি অভিজাতদের মনে ভয় ঢুকেছে।

তবে এই এরিসের বাহিনী ওদের জন্য আশার প্রদীপ ছিল। তারা সবাই দূর থেকে এই আশাতেই যুদ্ধ দেখছিল: এরিস তার বাহিনী নিয়ে এই দুর্বিনীত হেলটদের শিক্ষা দেবে। কিন্তু তার বদলে বাহিনী এখন অচেতন হয়ে পড়ে আছে।

আচমকা এমন কেন হলো কেউই বুঝতে পারলো না। কারো কারো ভেতর জন্ম নিলো ভয়, কারো কারো ভেতর জন্ম নিয়েছে কৌতূহল। একসময় কয়েকজনের ক্ষেত্রে ভয়কে জয় করলো কৌতূহল। পায়ে পায়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে এলো তারা।

প্রথম জনের পা যখনই সম্মোহন অস্ত্রের অদৃশ্য বলয় পার করলো, ঠিক তখনই ঘুম ভেঙ্গে গেল এরিসের। অস্ত্রের প্রভাব সাথে সাথে কেটে গেল তার শরীর থেকে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। সামনের দিকে তাকাল শত্রুর সন্ধানে। কিন্তু সবই ভোঁ ভা। সামনের প্রাসাদে যে এখন কোনো জনপ্রাণী নেই তা তাকে বলে দিতে হলো না। একটু আগেও হেলটেরা দেওয়ালের ওপরে আর নিচের মাটিতে ছিল। কিন্তু এখন কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এরিসের মনে ভর করলো চরম ক্রোধ।

এরিসের মতো সাথে সাথে জ্ঞান ফিরে না এলেও আমাজনদের আর বাকিদের জ্ঞানও ফিরে এলো একটু পরে। পুরো বাহিনীই দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওদের কাছাকাছি চলে আসা স্পার্টার অভিজাতদের ধরেছে আমাজনেরা। ওদের থেকেই পুরো ঘটনা জানতে পারলো এরিস, দাঁতে দাঁত চেপে বসলো তার, 'পালিয়েছে। কিন্তু ওদেরকে তো আমি পালাতে দেবো না। কোন দেবতা আমার সাথে ছলনা করছে ছদ্মবেশে? আমি তার শেষ দেখে ছাড়বো। এবার আমি কিছুতেই অলিম্পাসের ক্ষমতায় অন্য কাউকে যেতে দেবো না। কোনো দেবতা থাকবে না অলিম্পাসে। একমাত্র আমিই হবো অলিম্পাসের প্রভু। আমি।'

কথাটা বলেই সামনে পরিকল্পনা নিয়েও মাথা ঘামাতে হবে। হেলটেরা পালিয়েছে। ওদেরকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় খুঁজে বের করতে হবে। আমাজনদের দিকে তাকাল এরিস, 'তোমরা তাড়াতাড়ি শিবির গুছিয়ে নাও। আমাদের সাথে ছলনা করে শত্রু পালিয়ে গেছে। আমাদেরকে ওদের পিছু নিতে হবে। ওদেরকে ধ্বংস করার পর অন্য কাজ।'

আমাজনেরা এরিসের নির্দেশ পেয়ে বিনা বাক্য ব্যয়ে কাজ করতে শুরু করলো। এরিস এবার অস্ত্রটার সম্পর্কে ভাবতে বসলো। মোহাস্ত্র ছুঁড়েছে নিশ্চয়ই ব্যাটা। কিন্তু এমন ধরনের ঘুম পাড়ানি অস্ত্র তো কোনো দেবতার আছে বলে তার জানা নেই। মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে পারে বাক্কাস, কিন্তু সেটা তো মদের নেশার ব্যবহার করে। আফ্রোদিতি পারে প্রেম দিয়ে মানুষকে ভোলাতে, কিউপিড কাম দিয়ে। কিন্তু এভাবে অস্ত্র ব্যবহার করে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে কে? ভূমি অস্ত্র সে ব্যবহার করেছিল সামনের দেবতার সত্যিকারের পরিচয় জানার জন্য। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

আরেকটা বিষয় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। দেবতা পালিয়ে গেল কেন? হেলটেরাও এক সাথে পালিয়েছে। ওদেরকে অচেতন করে তো ওরা ওদেরকে মেরে ফেলতে পারতো, কিন্তু পালিয়ে গেল কেন? হিসেব মিলছে না। আরেকটু ভালো করে

চিন্তা করতে হবে। সেই চিন্তা বসে থেকে করলে চলবে না। সবার আগে পলাতকদের খুঁজে বের করতে হবে।

আমাজনেরা ঝড়ের বেগে কাজ করছে। স্পার্টার সৈনিকরাও নিজেদের জ্ঞান ফিরে পেয়ে সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছে। সবকিছু ওদিকে তদারক করছে মরিস আর নিকোলাস। এমন সময় নিজের জন্য তৈরি তাবু থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন পায়াস। তার চেহারা এই কদিনে যেন কম করে হলেও বিশ বছর বেড়েছে। টলমল পায়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন এরিসের সামনে। তাকে দেখে এরিস একটু হাসলো, 'বাহ, তোমার শরীর দেখি এখন একটু ভালো হয়েছে। শয্যাশায়ী থেকে এখন তুমি একটু ভালো অবস্থায় এসে পৌঁছেছ। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছো। এখন তুমি নিজের প্রাসাদে যেতে পারো। এখন আর এখানে কোনো বাঁধা নেই।'

এরিসের প্রতি কোনোরূপ সম্মান প্রদর্শন করলেন না পায়াস, তার কণ্ঠে ক্রোধ, তবে দুর্বল কণ্ঠের কারণে সেই ক্রোধের প্রকাশ ঠিকমতো হলো না, 'আপনি কেন আমার প্রাসাদ ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন? একবার আগুন ছুঁড়েছেন, আবার মাটি নাড়িয়ে আমার প্রাসাদ ভেঙ্গে দিতে চেয়েছেন। আপনার হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে মেয়েকে হারিয়েছি। এখনো আমার স্ত্রী ঐ প্রাসাদে আছে। আপনি তো ঐ হেলটদের সাথে তাকেও মেরে ফেলার চেষ্টা করেছেন।'

অভিযুক্ত হয়ে একটু বিব্রত বোধ করলো এরিস। ক্রোধ তো আগে থেকেই ছিল, 'শোনো পায়াস, মানুষের মৃত্যু দেবতাদের জন্য তেমন কোনো ব্যাপার না। মৃত্যুর পর তোমরা যাবে হেডিসের রাজ্যে। আর একবার অলিম্পাসের প্রভু হতে পারলে ঐ হেডিসের রাজ্যও আমার কাছে কোনো ব্যাপার না। তখন আমি যা ইচ্ছে হবে তাই করতে পারবো, যাকে ইচ্ছে তাকে মেরে ফেলবো, আবার যাকে ইচ্ছে তাকে প্রাণ দান করবো। তুমি শোকে এখনো অধীর হয়ে আছো। যাও, প্রাসাদে স্ত্রীর কাছে ফিরে যাও।'

এরিস দুজনকে ডেকে পায়াসকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে বলল। তারপর সবাই তৈরি হয়ে যেতেই শত্রুদের তাড়া করার জন্য যাত্রা শুরু করলো।

হেফাস্টাস তার পাশেই হাঁটছে, 'মিথ্যে কথা বললে কেন তুমি?'

এরিস তাকালো তার দিকে, 'কোনটা মিথ্যে কথা?'

'এটা তো তুমিও জানো, আমিও জানি, একবার হেডিসের রাজ্যে যে চলে যায়, তার ওপর আর কারো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তুমি অলিম্পাসের সর্বময় প্রভু হলেও তাতে হেডিসের কিছুই যায় আসে না।'

এরিস এই কথার উত্তর দিলো না।

কলিন ভেবেছিল ওরা রাতেই পৌঁছে যাবে, কিন্তু হিসেবটা ঠিক সেখানে মেলেনি। হিসেব ভুল হবার পেছনে লোকজনের ক্লান্তিও দায়ী। শেষ রাতের দিকে দলকে বিশ্রাম দিতেই হলো। যে যেখানে পেরেছে শুয়ে অথবা বসে পড়েছে। ইনোনের পা আর কোনভাবেই চলছিল না, ইভান ওর জন্য বেশ সুন্দর একটা বিছানা সাজিয়ে দিয়েছে।

আলো ফুটতে বেশি দেরি হলো না। ভোর পর্যন্তই ছিল বিশ্রামের সময়। পেছন থেকে শত্রু যে-কোনো সময় চলে আসতে পারে। রুদ্রদেব কলিনকে তাড়া দিলো, 'সবাইকে উঠে পড়তে বলো। এখন আর সময় নষ্ট করা যাবে না।'

একটু বিশ্রাম নিয়ে সবার ক্লান্তি একটু আধটু দূর হয়েছে। আবার বন্দরের পথে হাঁটতে শুরু করলো তারা। কলিনের অনুমান মোটামুটি ঠিক প্রমাণ করে নির্ধারিত সময়েই ওরা পৌঁছে গেল বন্দরে।

কিন্তু বিধি বাম। কলিনের সব অনুমান সত্যি প্রমাণিত হলো না। ভেবেছিল বন্দরে এসে সব হেলটদের নিয়ে স্পার্টা ছেড়ে চলে যাবে, বন্দরের কোনো জাহাজ বাঁধা দেবার সাহস পাবে না। কিন্তু এখন বন্দরের সামনে এসে দেখা যাচ্ছে, কোথাও একটা জাহাজ তো দূরে থাক, কোনো জনমানুষও নেই। বন্দরের অবস্থা পুরোপুরি ভুতুড়ে।

এহেন অবস্থা দেখে স্বগত উক্তি বেরিয়ে এলো কলিনের গলা থেকে, 'এই কী অবস্থা? জাহাজ সব গেল কোথায়?'

রুদ্রদেবের এখনো বারিগাজার সেই ঘটনা মনে আছে। যুদ্ধ শুরুর হবার আভাস পেয়ে সব জাহাজ ত্যাগ করেছিল বারিগাজা। এখানেও ঠিক তাই হয়েছে। এগিয়ে গেল সে কলিনের দিকে, 'তোমার হিসেবে ভুল হয়েছে। এই বন্দরের জাহাজের লোকেরা বোকা নয়। তারা দেবতার আগমনের কথা শুনেছে, সেই দেবতার সেনা নিয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার কথাও শুনেছে, হেলটদের নগর দখলের গল্পও তাদের কানে এসেছে। এতকিছুর পরেও তারা এখানে জাহাজ নিয়ে বসে থাকবে এই চিন্তা করাই তো বোকামি।'

কলিন বিহ্বল চিত্তে বলল, 'এখন তাহলে আমরা কী করবো?'

শেইরন মত দেন, 'অবশ্যই আমাদেরকে এখন আত্মগোপনে যেতে হবে। এত মানুষ এক সাথে আত্মগোপনে যাওয়া যাবে না, ধরা পড়ে যাবার ব্যাপক সম্ভাবনা থাকবে। প্রথমে যেই আঠারো দল আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল, ওদেরকে আলাদা করে একেক জনকে একেক দিকে পাঠিয়ে দাও। আর আমরা আমাদের লোক নিয়ে এই জঙ্গলে পালিয়ে থাকবো। আগের জীবনে ফিরে যাবো সবাই। এটাই এখন একমাত্র সমাধান।'

কথাটা না মেনে নিয়ে উপায় নেই। রুদ্রদেবও এখন সামনে কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছে না। মিশরে ফিরে যাওয়াই এখন তার আর অসিতের জন্য একমাত্র সমাধান। সেদিক দিয়ে চলে যাবে ভারতে। এখানে থাকুক দেবতা তার ক্ষমতা আর অলিম্পাস নিয়ে।

কিন্তু তার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। সবকিছু স্বাভাবিক হবার জন্য। কিন্তু সবকিছু কি আদৌ স্বাভাবিক হবে?

কলিন ওদিকে এগিয়ে গেছে হেলটদের দলপতিদের সাথে কথা বলার জন্য। শেইরনের পরিকল্পনা তাদেরকে বোঝাতে হবে। নিজেদের মতো করে ওদেরকে চলে যেতে হবে এই নগরের আশপাশ থেকে। একবার নিজেদের চেনা এলাকায় যেতে পারলে নিজেদের দায়িত্ব ওরা নিজেরাই নিতে পারবে।

দলপতিরা সবকিছু বুঝিয়ে দিতে মেনে নিলো। এখানে জাহাজ তো পাওয়া গেল না, এখন নিজেদের পা দুটোতেই ভরসা করতে হবে। কোন পথে গেলে স্পার্টাকে যথা সম্ভব দূরে রেখে পেরিয়ে যাওয়া যাবে সেই আলোচনায় বসলো এবার কলিন। সাথে মানচিত্রে অভিজ্ঞ কিছু লোকজন আছে।

যার যার দল গোছাতে শুরু করলো দলপতিরা। কাজ প্রায় মধ্যম জায়গায় হয়ে এসেছে, এমন সময় একজন চেঁচিয়ে উঠলো জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে। সবাই তার চিৎকার আর ইশারা অনুসরণ করে জঙ্গলের দিকে তাকালো। সাথে সাথে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল ওদের। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে একটা সেনাবাহিনী। সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এরিস।

ধীরে ধীরে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো এরিসের বাহিনী। কাল সারারাত নিজের দৈব ক্ষমতা ব্যবহার করে অন্ধকারের মধ্যেও পলাতকদের চিহ্ন খুঁজে খুঁজে পিছু নিয়েছিল এরিস। তার বাহিনী এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম করেনি। এই সকালবেলা এসে পলাতকদের দেখা পাওয়া গেল। হাসি ফুটে উঠলো এরিসের মুখে। ওদেরকে শাস্তি দিতেই হবে। নয়তো তার প্রভাব সৃষ্টি হবে না। শুরুতেই ব্যর্থ দেবতা হিসেবে তাকে গণ্য করবে মানুষ। আগেও সে অনেক ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু এই নতুন জীবনে তার কোনো ব্যর্থতা থাকবে না।

আঠারো দল আলাদা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আচমকা শত্রুর আগমনে আবার একত্র হয়ে গেল তারা। ফাঁদে পড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পেছনের দিকে এখন তাদের সমুদ্র, সেদিকে পালানোর কোনো উপায় নেই। আর সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে শত্রু। কোনোভাবেই এখন আর পালানোর উপায় নেই।

এরিস আরেকটু সামনে এগিয়ে এলো। ইভান তাড়াতাড়ি এলো রুদ্রদেবের কাছে, 'কালকের ঐ অস্ত্রটা আরেক বার প্রয়োগ করো। ওদেরকে আবার ঘুম পাড়িয়ে আমরা পালিয়ে যাবো।'

রুদ্রদেব এখন আর নিজের সম্মোহন অস্ত্র সম্পর্কে নিশ্চিত না। সামনের যোদ্ধা যদি সম্মোহন অস্ত্রের প্রতিকার জানে, তাহলে তো আর অস্ত্র কাজ করবে না। তবু

একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। ধনুক তুলে ধরল সে। তারপর কালকের মতো ছুঁড়ে দিলো নিদ্রা অস্ত্র আলোর রূপে।

এবার এরিস আর ঘাবড়ে গেল না। অস্ত্রের এগিয়ে আসা দেখেই সে বুঝেছে এটা মায়া অস্ত্র। কালকেও দেখেছে সে এই অস্ত্র। তড়িৎ সে নিজের দুই হাত দুপাশে নিয়ে ঘোরাতে লাগলো। সাধারণ কোনো মানুষের ক্ষেত্রে এভাবে হাত সঞ্চালন করা অসম্ভব। আর সবাই দেখতে পেলো, পাতলা চামড়ার মতো একটা বলয় সৃষ্টি হলো, হালকা গোলাপি রঙের। সেই পাতলা পর্দা এখন অবস্থান করছে হেলটদের বাহিনী আর এরিসের বাহিনীর মাঝে।

রুদ্রদেব চিনতে পারলো এই পর্দা। সকল মায়া অস্ত্র কেটে দিতে সক্ষম এই পর্দা। সামনে এই দেবতা যোদ্ধা অনেক শক্তিশালী, সব ধরনের অস্ত্রের প্রতিকারই তার কাছে আছে। রুদ্রদেবের ধারণা সত্যি প্রমাণিত হলো। তার ছোঁড়া নিদ্রা অস্ত্র সেই পাতলা পর্দায় গিয়ে আছড়ে পড়লো। নিষ্ক্রিয় হতেও খুব বেশি সময় নিলো না।

রুদ্রদেবের অস্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করে এরিস সরিয়ে নিলো পর্দা, হেসে উঠলো ভয়ানক শব্দে, 'এসব খেলনা দিয়ে খেলে আর লাভ নেই। আজকে তোদের শেষ দিন। নরকের কীটের দল। শ্রদ্ধা ভক্তি সব বিসর্জন দিয়ে তোরা এখানে দেবতার বিরোধিতা করিস। আজকে আর তোদেরকে কোনো সুযোগ দেব না। একেবারে পিষে মারবো।'

এরিসের হুংকার দিয়ে বলা কথাগুলো এপাশ থেকে ঠিকমতো বোঝা না গেলেও তর্জন গর্জনে এটুকু বোঝা গেল, এখন এরিসের বাহিনী আক্রমণ করবে। কী সেই আক্রমণ সেটাই এখন দেখার বিষয়। পালানোর সিদ্ধান্ত নেয়াটা বুমেরাং হয়েছে। এখন ওরা দুই দলই সমান সমান অবস্থায় আছে। হেলটেরা হারিয়েছে প্রাসাদ দুর্গের আশ্রয়।

ইভানকে ইশারা করলো রুদ্রদেব। নিজে দাঁড়িয়ে আছে ধনুক হাতে সতর্ক অবস্থায়। দৈব শক্তিতে সামনের দেবতা অনেক বলীয়ান। কখন আবার কোন শক্তির প্রয়োগ করে, সতর্ক না থেকে উপায় নেই। সতর্ক থাকলেও ভয় পাচ্ছে না সে। তার জানা আছে, এই পৃথিবীর অনেক মানুষ যোদ্ধাই দেবতাদের সাহায্য করেছে, কেউ কেউ তো যুদ্ধে দেবতাদের পরাজিতও করেছে।

ইভান রুদ্রদেবের সংকেত পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে। তাড়াতাড়ি হেলট সেনাদের একত্রে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলো সে। মাত্র সাতদিনের শিক্ষার যতটুকু হেলটেরা আত্মস্থ করতে পেরেছে তার ওপর ভর দিয়েই সারি বেঁধে দাঁড়ালো তারা। অস্ত্র বাগিয়ে ধরেছে।

এরিস হেলটদের যুদ্ধংদেহী ভঙ্গি দেখে না হেসে পারলো না। সে হাত তুলল স্পার্টার সৈনিকদের দিকে, আজকে আর সে আমাজন অথবা দানবদের আগে পাঠাবে না। আর দানবেরা এমনিতেও কালকের আগুনের ছ্যাকা এখনো ঠিকমতো

সামলে উঠতে পারেনি, 'আজ তোমরা যাবে। প্রথম থেকেই দলের সাথে ঘুরছ, কিন্তু যুদ্ধ করতে পারছ না। আজকে সেই সুযোগ দেওয়া হলো তোমাদের।'

নিকোলাস এই কথার অপেক্ষাতেই ছিল। সামনের ওরা রোমান সেনা নয়, কোন প্রশিক্ষিত সেনাও নয়। ওদেরকে কচুকাটা করতে কোনো সমস্যাই হবে না। তবে একজন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি আছে। সেটা নিয়েই ভয়। এরিস সেই ভয়ও ভেঙ্গে দিলো, 'ঐ লোককে নিয়ে চিন্তা কোরো না। তার শক্তিকে আমি সামলে নেবো।'

এরিস স্পার্টার বাহিনী নিয়ে সামনে এগোলো, আস্তে আস্তে গতি বাড়তে লাগলো বাহিনীর। ঘোরসওয়াররা আছে সবার সামনে। ওদিকে হেলটদের মধ্যে কোনো ঘোড়া নেই। জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে মরতে হবে। নিজের দলের লম্বা বর্শার বাহিনীকে সামনে এগোনোর নির্দেশ দিলো ইভান। নিজেও একটা লম্বা বর্শা হাতে রইলো সেই দলের অগ্রভাগে। স্পার্টার প্রশিক্ষিত সেনাদের মতো না পারলেও মোটামুটি ভালো গতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো হেলটদের বাহিনী।

দুই বাহিনীর সংঘর্ষের সময় দেখা গেল হেলটদের বর্শা ভালোই কাজ করেছে। বেশ কয়েকজন স্পার্টার ঘোড়সওয়ার ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেল বর্শার গুঁতো খেয়ে। ঠিক তারপরেই পদাতিক মুখোমুখি হলো পদাতিকের।

নিজের বর্শা ফেলে দিয়ে দুই হাতে তলোয়ার তুলে নিয়েছে নিকোলাস। হেলট সেনারা তার সামনে কিছুই না। একের পর এক হেলটদের মাথা ধড় থেকে আলাদা করে দিতে লাগলো সে। মরিস একটু দূরেই যুদ্ধ করছে। সেও একের পর এক বধ করছে হেলটদের।

এমনিতে হেলট বাহিনীর কোণঠাসা হবারই কথা। তবে দুটো কারণে তারাও সমানে সমান যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। একে তো তাদের সংখ্যা বেশি, তার ওপর ইভান যেন যুদ্ধের ময়দানে আজকে নিজের সম্পূর্ণ প্রতিভা বিলিয়ে দিতেই নেমেছে। প্রশিক্ষিত সুসজ্জিত স্পার্টান আর রোমান সেনারা তার সামনে দাঁড়াতেই পারছে না। শরীরের নানা অভেদ্য, দুর্লঙ্ঘ্য ফাঁকফোকরে তারা গ্রহণ করছে ইভানের অস্ত্রের আঘাত। লুটিয়ে পড়ছে সাথে সাথে। নিজের শরীরকে নানা ভাবে বাঁকিয়ে ভীষণ ভঙ্গিতে যুদ্ধ করে চলেছে ইভান। তার সাথে কারো তুলনা করা যাচ্ছে না।

আস্তে আস্তে ইভানকে ভয় পেতে শুরু করেছে এই পক্ষ। আর ভয় পেলে যা হয়, মনের অজান্তেই এরিসের পাঠানো স্পার্টান বাহিনী একটু একটু করে পিছু হটছে। ইভানের যুদ্ধের তীব্রতা যেন বাড়ছে প্রতি আঘাতের পর। ক্লান্তি যেন আজকে তাকে ছোঁবে না বলে কথা দিয়েছে।

নিজেদের বিপদটা বুঝতে পারলো নিকোলাস। এখন পেছন থেকে এরিসকে সাহায্য হিসেবে আমাজনদের পাঠাতে বলতে পারে সে। কিন্তু তাহলে বীরত্বের বদলে তার কাপুরুষতা প্রতিষ্ঠা পাবে। চেঁচিয়ে উঠলো সে, তার সেনার মধ্যে কিছু

দ্বিতীয় শ্রেণির অভিজাতও আছে, তাদের উদ্দেশ্যেই চেঁচাল সে, 'তোমরা সবাই এক সাথে ইভানকে আক্রমণ করো। এখনই।'

আদেশ পালিত হলো। সবাই বুঝতে পারছে, একা তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং দুই চারজনেও ইভানের চুল ছেঁড়া যাবে না। এক ডজন বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ক্রিস্টেয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিজাত সৈনিক আক্রমণ করলো এবার ইভানকে। একেবারে চারিদিক থেকে।

এতক্ষণ ইভানের যুদ্ধ দুই পাশ থেকেই লোকেরা বেশ আগ্রহ নিয়ে দেখছিল। এবার বারো জন ঘিরে আক্রমণ করাতে আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। স্বয়ং এরিস আর রুদ্রদেবও এবার নিজেদের চোখ রাখল ইভানের ওপর।

ইভান উত্তেজিত হয়েছে, কিন্তু উন্মত্ত হয়ে যায়নি। তাকে ঘিরে ফেলার কৌশল সে ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে। সাথে সাথে বর্শা মাটিতে ফেলে কোমরে হাত দিলো সে। দুই হাতে বেরিয়ে এলো দুটো ধারালো তলোয়ার। পূর্ণচন্দ্র যেমন একই সাথে চারিদিকে আলো দিতে পারে তেমনি এই দুই তলোয়ারে সে চারিদিকে একসাথে আক্রমণ করতে আর আক্রমণ সামলাতে সক্ষম।

বারো জন একত্র হয়ে আক্রমণ করলো এবার ইভানকে। যোগ্য জবাব দিলো ইভান। বারো জনের আঘাত এড়িয়ে সবার মোক্ষম জায়গায় চালাতে লাগলো তলোয়ারের ধারালো ফলা। বারো জন অভিজাত সৈন্যের দেহ লুটিয়ে পড়লো দেখতে দেখতে, তবে ইভানের দেহও অক্ষত রইলো না। পিঠে আর বাহুতে রক্ত বইছে তার। তবে তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ করলো না সে। আবার মন দিলো শত্রু নিধনে।

ইভানের যুদ্ধ দেখে চমকিত হলো এরিস। একজনের ছায়া বেশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এই যুবকের মধ্যে। বীর একিলিস। ওদিকে রুদ্রদেবও বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে। একটু আফসোস হচ্ছে এখন। এই যুবকের সাথে একটু যুদ্ধের চর্চা করা গেলে মন্দ হতো না।

এখনো তুমুল যুদ্ধ চলছে। হেলটেরাও মরছে যথেষ্ট সংখ্যায়। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত একজনের এই যুদ্ধে, ইভানের বীরত্বে আর নিজের দিকে ধেয়ে আসা বিপদের দিকে একটুও খেয়াল নেই। তার নজর আবদ্ধ হয়ে আছে শুধু একদিকে।

ওরিয়ন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মরিসের দিকে। চোখ স্থির হয়ে আছে তার। পলক পড়েনি অনেকক্ষণ। সাদা অংশ পুরো লাল হয়ে আছে। একটু একটু করে সে এগিয়ে যাচ্ছে মরিসের দিকে। সামনে যেই তাকে বাঁধা দিতে আসছে তাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছে যমের দ্বারে। মরিসের আরেকটু কাছে আসতেই মরিস এবার তাকে দেখতে পেলো, একজন হেলটের বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে হাসল সে, 'আরে পুরানো বন্ধু। কি দুর্ভাগ্য, এখন আমরা একে অপরের বিপক্ষে লড়ছি।'

আরেকটু এগিয়ে এলো ওরিয়ন, 'আসলেও তোমার দুর্ভাগ্য মরিস। আজকে আমরা পালিয়ে যেতে সফল হইনি। আমাদের দলের সবাই এতে খুব দুঃখ পেয়েছে। শুধু আমি ছাড়া। তোমাকে এখানে রেখে আমি পালাই কী করে। তোর

মতো কীটকে বাঁচিয়ে রাখার শাস্তি আমি এরই মধ্যে পেয়ে গেছি। আজকে প্রায়শ্চিত্তের সময়।'

ওরিয়ন এক লাফ দিয়ে তলোয়ার চালালও মরিসের বুক লক্ষ্য করে। মরিস লম্পট হলেও যুদ্ধ বিদ্যা একেবারেই যে শেখেনি তা নয়, সেই আঘাত এড়িয়ে সেও পাল্টা আঘাত করলো। কিন্তু মরিস জানে না, তাকে মারার জন্যই এখনো নিজেকে স্বাভাবিক রেখেছে ওরিয়ন, দিনরাত শুধু তার রক্তের রঙের কথাই চিন্তা করেছে। সেই প্রবল সংকল্প আজকে ওরিয়নের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র।

মরিসের হাতের তলোয়ার ওরিয়নের তলোয়ারের এক প্রবল আঘাতে হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। সাথে সাথে বুকে প্রচণ্ড এক লাথি খেয়ে মাটিতে চিত হয়ে পড়লো মরিস। নিজের হাতের তলোয়ার একদিকে ছুঁড়ে ফেললো ওরিয়ন। এগিয়ে এসে সর্বশক্তি দিয়ে এক প্রকাণ্ড লাথি বসালো মরিসের গোপনাঙ্গে। মোক্ষম সেই আঘাত, এক আঘাতেই অঙ্গ একেবারে থেঁতলে গেছে। মরিসের গলা চিরে বেরিয়ে এলো প্রকাণ্ড আর্তনাদ। এতই জোরে হলো সেই শব্দ, সবাই যুদ্ধক্ষেত্রের যুদ্ধ ভুলে দুজনের দিকে তাকাতে বাধ্য হলো। বেশ কিছুক্ষণ দ্বন্দ্ব থামিয়ে লোকজন তাকিয়ে রইলো মরিস আর ওরিয়নের দিকে।

মরিসের বুকের ওপর চেপে বসলো ওরিয়ন, 'ডোরাকে কীভাবে মেরেছিলি মনে পড়ে? তোর মনে পড়বে না এটাই স্বাভাবিক। কত মেয়েকেই তো এভাবে মেরেছিস। আমিই তোকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। এভাবেই নিশ্চয়ই ওর শরীরের ওপর তোর এই অপবিত্র শরীর চেপে বসেছিল। তোকে আমি কোনো অস্ত্র দিয়ে মারবো না, তাহলে তুই কষ্ট কম পাবি।'

ওদিকে বন্ধুর অবস্থা দেখে নিকোলাস সাহায্য করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু দূরত্ব অনেক, আর হেলট সেনারা যুদ্ধও করছে বীর বিক্রমে। এখন চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার নেই।

মরিসের ওপর মল্লের সব ভয়ংকর কৌশল খাটালো ওরিয়ন। প্রথমেই দুই হাত একেবারে কাঁধ থেকে আলগা করে নিলো। দুই উরু থেঁতলে দিলো হাতের মুষ্টির প্রবল আঘাতে। সেই সাথে মরিসের শরীরের আরও কয়েকটা প্রধান হাড় ভাঙলো। শেষে যখন মরিসের আর ব্যথা সহ্য করে আর্তনাদ করার অবস্থা রইলো না, তখন ওরিয়ন করলো মোক্ষম আঘাত। মরিসের হেলে পড়া ঘাড়ে লাগলো সেই আঘাত। ঘাড় ভাঙার শব্দ শোনা গেল স্পষ্ট।

মরিসের বুক থেকে উঠে দাঁড়ালো ওরিয়ন। আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে হেসে উঠলো। একটা নরকীটকে আজ ধ্বংস করেছে সে।

মরিসের পরিণতি দেখে ভয়ের একটা তীব্র অনুভূতি হলো নিকোলাসের। একজন প্রথম শ্রেণির যোদ্ধার এমন পরিণতি, ওরিয়নের পাগলের মতো যুদ্ধ আর ইভানের ধ্বংস ক্ষমতা স্পার্টান বাহিনীর যুদ্ধ করার মানসিকতা দুর্বল করে দিচ্ছিল

আস্তে আস্তে, তাই নিকোলাস যখন নিজের ঘোড়া নিয়ে পিছিয়ে পড়লো তখন অধিকাংশ স্পার্টান সৈন্যই তাকে অনুসরণ করলো। কয়েকজন হেলট সৈন্য আবার উৎসাহের বশে তাদেরকে তাড়া করতে লাগলো পেছন থেকে।

এরিস বুঝতে পারলো তার পাঠানো স্পার্টার সেনারা হেরে গেছে। এই হারে তার তেমন গ্লানি অনুভূত হলো না, এরা তো আর তার বাহিনী নয়। তবে এভাবে হেরে তো আর যাওয়া যাবে না। আমাজনদের দিকে তাকালো এরিস।

সাথে সাথে আমাজনদের তিন ভাগের এক ভাগ আলাদা হয়ে তীব্র গতিতে ছুটে গেল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। ওদের গতির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো রুদ্রদেব। কোনো সাধারণ মানুষীর এমন গতি থাকতে পারে না। তার মানে তারা দৈব ক্ষমতা ব্যবহার করছে। হেলট সৈন্যদের সামনে ঘনিয়ে আসছে মহাবিপদ।

যেসব হেলটেরা স্পার্টার পলায়নপর সৈন্যদের তাড়া করেছিল তারাই প্রথমে পড়লো আমাজনদের সামনে। এক নিমেষে তাদেরকে মেরে ফেললো আমাজনেরা, এই কাজ করার জন্য তাদেরকে থামতেও হলো না, একই গতিতে হেলটদের মেরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবশিষ্ট হেলটদের দিকে ছুটতে লাগলো তারা।

ইভান আমাজনদের গতি দেখে একটু ভড়কে গেছে। বাকি হেলটেরা ভয় পেয়েছে প্রচণ্ড। শুধু ওরিয়নের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সে এখনো উন্মাদ আনন্দ উদযাপন করছে।

দুজন শুধু পরিস্থিতির ব্যাপকতা বুঝতে পারছে। রুদ্রদেব ধনুক শক্ত করে চেপে ধরলো। ওদিকে ইভান একটু পিছিয়ে পা শক্ত করে দাঁড়ালো।

সমুদ্রের বাঁধ ভাঙা ঢেউয়ের মতো আমাজনেরা এসে চড়াও হলো হেলটদের ওপর। অস্ত্র ঘোরাবারও সুযোগ পেলো না হেলটেরা। ওখানে এখন যুদ্ধ হচ্ছে না, হচ্ছে নির্বিচার গণহত্যা। আর অবশ্যই দৈব শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে সাধারণ লোকের বিরুদ্ধে।

কিছু আমাজন এগিয়ে গেল ওরিয়নের দিকে। তাদেরকে এগিয়ে আসতে দেখে ওরিয়ন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদিকে কয়েকজন আমাজন এগিয়ে গেছে ইভানের দিকেও। ইভান যুঝতে লাগলো কিন্তু সুবিধা করতে পারলো না। সবগুলো আঘাত এড়াতে সফল হলো না সে। ওদিকে ওরিয়ন ক্রমশ আক্রমণের তোড়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। হেলট সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে আর অল্প কিছুই বাকি আছে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো রুদ্রদেব। এই অসম লড়াই আর চলতে দেওয়া যাবে না। নিজের ধনুক থেকে এক মহাস্ত্র ছুঁড়ল সে। এই অস্ত্র যখন তাদেরকে গুরু শিখিয়েছিলেন, তখন তারা এই অস্ত্র দিয়ে একজন আরেকজনের সাথে মজা করতো, কিন্তু একই সাথে এই অস্ত্র মায়া যুদ্ধে দারুণ কার্যকর।

আমাজনদের মধ্যে গতি থামিয়ে দেবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তারা জানে, যেই শত্রুর বিরুদ্ধে তারা লড়ছে তাদের ন্যূনতম যোগ্যতা নেই তাদের সাথে যুদ্ধ করার। তবে গণহত্যায় তাদের তেমন আপত্তি আছে বলে মনে হলো না। হেলটরা ঝড়ো বাতাসের পাতার মতো উড়ে যেতে লাগলো আমাজনদের তোড়ে। ঠিক তখনই রুদ্রদেব ছুঁড়ে দিয়েছে তার সেই মায়া অস্ত্র।

অস্ত্রটাকে আসতে দেখল এরিস। কিন্তু, তার বলয়ের ভেতরে ঘুম পাড়ানো অস্ত্র তো আর কাজ করবে না। তাহলে এটা আবার কীসের অস্ত্র। অবাক হয়ে সে দেখল, তার দেওয়া শক্তি বলয় অস্ত্রটা সহজেই ভেদ করে ফেলেছে আর ঠিক তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেছে আমাজনদের মাঝে।

এতগুলো যোদ্ধার মধ্যে মাত্র দুজন যোদ্ধাই আমাজনদের সাথে লড়ছে। মরিসকে মেরে ফেলার আনন্দ পুরোপুরি মিটে গেছে ওরিয়নের। আক্রমণে আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে সে কেবল এক আমাজনের আক্রমণ ঠেকিয়ে যাচ্ছে এখন। ওদিকে ইভানের অবস্থা ততটা খারাপ না হলেও অতোটা ভালোও নয়। মাঝে মাঝে তাকে আক্রমণ করা আমাজনকে সেও কিছু আঘাত ফিরিয়ে দিচ্ছে বটে, তবে আঘাতের তীব্রতা তার দিকেই বেশি।

ইভানের দিকে নজর দিতে বাধ্য হলো আমাজনেরা। এই দুর্বল মানুষগুলোকে একের বেশি আমাজন আক্রমণ করছে না। তাদের যোদ্ধা গরিমা নষ্ট হবে তাতে। তবে হেলটের সংখ্যা কমে আসায় বেশ কিছু আমাজন ক্ষণিকের জন্য বেকার হয়ে পড়েছে। ওদিকে ইভানকে কোনোভাবেই কাবু করা যাচ্ছে না। এবার তিনজন আমাজন একত্র হয়ে আক্রমণ করলো ইভানকে।

এবার একটু ভয় না পেয়ে পারলো না ইভান। এদের একজনের সাথেই যুদ্ধে পারা যাচ্ছিল না। এমন গতি আর যুদ্ধ কৌশল সে আগে কখনো দেখেনি। তাদেরকে যা শেখানো হয় তা এসবের কাছে কিছুই না। কিন্তু তবু একজনের সাথে মোটামুটি লড়ে যাচ্ছিল সে। এখন তিনজন এসে তো লড়াইটা সম্পূর্ণ অসম করে দিলো।

তিনজন আমাজনের নিজেদের মধ্যে একটুও বোঝাপড়া করার দরকার পড়লো না। ছোটোবেলা থেকেই তারা আর কিছুই করে না, যুদ্ধই তাদের ধ্যান জ্ঞান। কখন কাকে কীভাবে দলগত ভাবে না-কি একা একা আক্রমণ করতে হবে এসব তাদের একবারে হাতের নাগালে আছে। তিনজনে তিন কোণায় গিয়ে প্রায় ঘিরে ফেললো ইভানকে। ইভান এখন চারিদিকে সমান সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারছে না। বার বার শরীর ঘুরিয়ে নিতে হচ্ছে তাকে।

বিচিত্র ভঙ্গি করে তিনজন একত্রে ইভানের দিকে শস্ত্র প্রহার করলো। অব্যর্থ সেই আঘাত। এক লাফ দিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করলো ইভান, কিন্তু দুজনের শস্ত্রকে এড়িয়ে যেতে পারলেও তৃতীয় জনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো না। একেবারে বর্মের সরু ফাঁকা দিয়ে ইভানের পেট চিরে দিয়েছে তৃতীয় জনের হাতের ধারালো ফলা।

হাঁটতে গিয়েও হুমড়ি খেয়ে পড়লো ইভান। মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে তার। আবার একবার ওঠার চেষ্টা করলো। কিন্তু আবারও ব্যর্থ হলো চলতে, শেষবারের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রাণ হারালো ইভান।

তৃতীয় আমাজন, যার হাতে হেলটদের সবচেয়ে দক্ষ যোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছে, তার মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো, এতক্ষণ গণহত্যা করলেও শেষে একটা যোদ্ধাকে হারিয়ে বিজয়ের খানিক অনুভূতি পাওয়া গেছে। হাতের উদ্যত শস্ত্রটাকে একটু বিশ্রাম দিলো সে। মাটির দিকে তাক করে রেখেছে শস্ত্র।

কিন্তু এভাবে পাশ ফিরতেই সেই আমাজন সেনার চোখ কপালে উঠে গেল। তার পাশে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে ইভান। ইভানের চোখে অবাক দৃষ্টি। সে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তড়িঘড়ি করে একটু আগে ইভানের মৃতদেহ যেখানে পড়ে ছিল সেদিকে তাকালো আমাজন। নাহ, সেখানে এখন আর ইভানের মৃতদেহ পড়ে নেই। বরং তারই এক আমাজন সাথির দেহ পড়ে আছে। আর সে মৃত্যুবরণ করেছে তারই হাতে। শেষ পর্যন্ত স্বজাতির রক্ত তার হাতে লেগেছে।

ভয়ানক চিৎকার করে উঠলো আমাজন সেনা। ভয়ানক ক্রোধের সেই চিৎকার যেন তার কণ্ঠনালী চিরে দেবে। কিছুই বুজতে পারলো না সে, কিছু বুঝতে চাইলোও না, শুধু জানল তাকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে, আর খুব সম্ভব এই ইভানই তাকে মায়া দিয়ে ভুলিয়েছে। আবার ইভানকে আক্রমণ করলো আমাজন। এবার আর ইভানকে এত সহজে পরাজিত করতে পারলো না। বরং দেখা গেল ইভানের আঘাতে এবার তার প্রাণই গেছে।

ওদিকে ইভান যুদ্ধ করছে না কিছুক্ষণ ধরে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সে দেখছে এক আজব দৃশ্য। আচমকা যেন আমাজনদের মতিভ্রম হয়েছে। একে অন্যকে মেরে ফেলছে তারা। এমনকি যেই তিনজন ইভানকে মারতে একত্রে এগিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে দুজন মারা গেল একে অপরকে আক্রমণ করে। রহস্য কিছুই বোঝা গেল না।

কেউই বুঝতে পারলো না। এই রহস্য একমাত্র জানে রুদ্রদেব। সে এখন এসব দেখে মুচকি হাসছে। অস্ত্রটা কাজ করেছে। এই মহাস্ত্রের নাম তাষ্ট্র। এই অস্ত্র শত্রুকে বিবেচনাহীন করে দেয়। সরাসরি আঘাত করে না, কিন্তু এই অস্ত্রের প্রহারে শত্রু নিজের দলের লোককেই এক বিচিত্র কারণে নিজের বিপক্ষ দল বলে মনে করে এবং তাকে হত্যা করার জন্য মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে এই

অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছিল। কৃষ্ণের নারায়ণী সেনার সাথে যখন অর্জুনের যুদ্ধ হয়েছিল তখন অর্জুন বেশ সফলভাবে নারায়ণী সেনার বিরুদ্ধে এই অস্ত্রের প্রয়োগ করেছিল। আর নিজে অর্জুনের রথের সারথী হয়ে নিজের বাহিনীর নাকাল হওয়া দেখেছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণ। রুদ্রদেব এই অস্ত্রের জ্ঞান বেশ ভালো করেই জানে।

দেখতে দেখতে যুদ্ধক্ষেত্রে তন্ত্র বেশ তীব্রভাবে নিজের কাজ করতে আরম্ভ করলো। আমজনেরা অবাক হয়ে দেখল, যেই হেলটদের মেরে তারা প্রায় নিকেশ করে এনেছিল, তাদের আশেপাশে সেই হেলটের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। বিরাম দেওয়া অস্ত্র আবার তুলে নিলো তারা। শুরু হলো আবার যুদ্ধ। এবার আর বিনা প্রতিরোধে হেলটেরা মারা পড়ছে না। দুই পক্ষই সমানে সমানে যুদ্ধ করছে।

দূর থেকে পুরো ব্যাপারটা দুই পক্ষের শিবিরই দেখছে বেশ আগ্রহ নিয়ে। এরিস দেখতে পাচ্ছে, কোনো এক কারণে আমাজনেরা এক অন্যের সাথেই লড়ছে। হেফাস্টাস নিজেও দেখছে এই অভূতপূর্ব ঘটনা। এরিস জিজ্ঞেস করে, 'ওরা এমন করছে কেন?'

'এই প্রশ্নের তো একটাই উত্তর হতে পারে এরিস। ঐ পক্ষের যোদ্ধা মায়া যুদ্ধে বেশ পটু। সেই এখানে এমন কোন অস্ত্র ছুঁড়েছে, যা আমাদের আমাজনদের চিন্তা করার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, হয়তো তারা নিজেদেরকেই শত্রু মনে করছে, অথবা তাদের চোখ আমাজনদেরকেই দেখছে হেলট রূপে।

এরিস আবার তাকালো সেই বিশ্বাসের অযোগ্য দৃশ্যের দিকে। এই অস্ত্রের প্রতিকার তার জানা নেই। তবে আমাজনদের চিন্তাকে সে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তারা তার মেয়ে। তার সাথে দৈব ক্ষমতায় ওদের আত্মিক যোগাযোগ আছে। চোখ বন্ধ করলো এরিস, মনঃসংযোগ করলো পুরোপুরি। সব আমাজনদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংযোগ ক্ষমতা ব্যবহার করলো সে। হেফাস্টাসের কথা সত্যি, প্রান্তরের পাঠানো আমাজনদের মন কীসে যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সাবধানে সেই প্রভাব সরিয়ে দিলো সে। আমাজনদের নির্দেশ দিলো ফিরে আসতে।

সাথে সাথে আমাজনদের ঘোর কেটে গেল। তারা এতক্ষণ হেলট হিসেবে আসলে আমজন মেয়েদেরকেই দেখছিল। নিজেরাই নিজেদের হত্যা করছিল। এরিসের আহবানে এবার তারা ফিরে চলল নিজেদের শিবিরের দিকে। তীব্র গতিতে সেখানে পৌঁছে সারি দিয়ে দাঁড়ালো। এতক্ষণে বুঝতে পারছে শত্রুর মায়ার খেলায় তারা নিজেরাই নিজেদের কী ক্ষতি করেছে।

এরিস এবার তাকালো যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। সেখানে পড়ে আছে অসংখ্য হেলটদের সাথে অসংখ্য আমাজনদের শরীরও। হেফাস্টাস সত্যি কথাই বলেছিল, যে একবার হেডিসের রাজ্যে চলে যায়, তাকে ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় থাকে না। একজন মেয়ে আহত হয়েছিল দেখে এরিস পুরো রোমান বাহিনীকেই ধ্বংস

করে দিতে উদ্যত হয়েছিল। আজকে তার সামনে এতগুলো মেয়ের মৃতদেহ পড়ে আছে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেল সে, চোখ থেকে বেরিয়ে এলো উত্তপ্ত অশ্রু। চিৎকার করে উঠলো সে ভীষণ গলায়, 'সবাই মিলে এক সাথে ঐ বাহিনীকে আক্রমণ করো। একজন প্রাণীও যাতে ঐ পক্ষে জীবিত না থাকে। আহত, দুর্বল কিছুই বিচার করবে না, এক সাথে সবাইকে হত্যা করবে।'

আমাজনেরা এবার সবাই এক সাথে যুদ্ধে যাত্রা করলো। সাইক্লপসেরা কালকের আগুনের জ্বালা সামলে নিয়েছে, এখানে আর আগুনের ভয় নেই। তারাও যাত্রা করলো আমাজনদের সাথে। এরিস আমাজনদের মনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে, কেউ তাদের মনকে এখন আর মায়া দিয়ে আচ্ছন্ন করতে পারবে না।

আমাজনদের ফিরে যাওয়া আর নতুন করে আবার আক্রমণ করার দৃশ্য পুরোপুরি দেখতে পেলো রুদ্রদেব। সে বুঝতে পেরেছে ঐ দেবতা নিজের সম্মোহন ক্ষমতার প্রয়োগ করেছে। আর তাষ্ট্র অস্ত্রের প্রভাব কেটে গেছে। এবার ঐ দেবতা সব আমাজনদের এক সাথে পাঠিয়েছে। আর এবার তাষ্ট্র অস্ত্রও ব্যবহার করা যাবে না। এবার আসলেই চিন্তায় পড়লো রুদ্রদেব।

রুদ্রদেবের চিন্তাকে আরও বাড়িয়ে দিলো এরিসের ক্রোধ আর সেই ক্রোধের প্রয়োগ। মেয়ের শোকে প্রতিশোধ নিতে এরিস একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক শক্তির আহ্বান করেছে সে সাথে সাথে। আকাশ থেকে আগুনের গোলা ছুটে যেতে লাগলো হেলটদের দিকে। বেশ কিছু হেলট মারা গেল সেই আগুনের আঘাতে, সেই সাথে ভূমিও কাঁপছে, আবারও ভূমি অস্ত্রও ব্যবহার করেছে এরিস।

নিজের শক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ করছে শত্রু, তা বুঝে ফেলেছে রুদ্রদেব। একই সাথে আমাজনেরা ধ্বংসের প্রবৃত্তি নিয়ে এগিয়ে আসছে দুর্বার গতিতে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে। নিশ্চয়ই তাকেও এই শক্তিকে প্রতিরোধ করতে হলে মহা শক্তিধর এক অস্ত্রই ব্যবহার করতে হবে। এই মুহূর্তে সবাইকে এক সাথে থামিয়ে দিতে একটা অস্ত্রই আছে। যা এক সাথে পুরো বাহিনীর ওপর ব্যবহার করা যাবে।

পায়ের নিচের ভূমির কাঁপনেও রুদ্রদেব আশ্চর্য রকম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধনুক তুলে আড়াআড়ি করে বুকের সামনে রাখল সে। শক্তিশালী দিব্যাস্ত্র এভাবেই আহ্বান করতে হয়। মন্ত্র পড়তেই অনেক দিন পরে অস্ত্রটা দেখা দিলো তার ধনুকে। এই অস্ত্র আগেও একবার ব্যবহার করেছিল সে। কিন্তু সেবার সফল হতে পারেনি। তখন এই অস্ত্রের প্রতিরোধ জানা থাকা লোক বিপক্ষ দলে ছিল। কিন্তু এখন তো আর তা নেই।

অস্ত্র ধনুকে সম্পূর্ণ রূপ ধারণ করতেই ছুঁড়ে দিলো রুদ্রদেব। এই অস্ত্রে লক্ষ্য স্থির করার তেমন কোনো ব্যাপার নেই। অস্ত্র জ্যা মুক্ত হতেই ছুটে গেল তীব্র শব্দ করে। আমাজনদের তীব্র গতি একটু হলেও থামতে বাধ্য হলো। এরিসের

ক্রোধন্মত্ত চিৎকার থেমে গেল সেই ভয়ানক শব্দে। রুদ্রদেবের হাত থেকে ছুটে যাওয়া অস্ত্র এক বিশাল গোলাকার ঘূর্ণায়মান বস্তুর আকার নিলো। বেশ কিছু ওপরে শূন্যে ভেসে থেকে ক্রমাগত ঘুরছে সেই অস্ত্র। প্রতি ঘূর্ণনে ঘূর্ণন গতি বাড়ছে তার।

ভয়ংকর নারায়ণ অস্ত্র ছুঁড়েছে রুদ্রদেব। সেই অস্ত্র অতি দ্রুত নিজের কাজ করতে শুরু করলো। ঘুরতে ঘুরতে তীব্র বেগে শূন্য থেকে নানা অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়তে শুরু করলো শত্রুদের ওপর। আমাজনেরা যতই সেই ছুটে আসা অস্ত্রকে প্রতিরোধ করতে লাগলো ততই যেন বাড়তে লাগলো সেই অস্ত্রের ঘূর্ণন, আর সেই ঘূর্ণায়মান গোলক থেকে ছুটে আসতে লাগলো আরও ভয়ানক সব শক্তি অস্ত্র। বেশ কিছু আমাজন আহত হলো। বাকিরা বর্ম দিয়ে নিজেদের আর আহত আমাজনদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো নিজেদের শিবিরে। একটু পিছিয়ে যেতে শুরু করতেই ঘূর্ণায়মান গোলক থেকে অস্ত্র ছুটে আসা একটু কমে এলো।

আমাজনদের আবার আরেকটা ভয়ানক অস্ত্রের সম্মুখীন হতে দেখে রাগ আরও বেড়ে গেল এরিসের। নিজের হাতে প্রকাণ্ড এক শক্তি আগুনের গোলক সৃষ্টি করলো সে। ভীম বেগে সেই গোলক সে ছুঁড়ে দিলো ঐ ঘূর্ণায়মান গোলকের দিকে। এতক্ষণ একটু আসতে ঘুরলেও যেই এরিস সেই আগুনের গোলক ছুঁড়েছে, গোলকের ঘূর্ণন আবার বেড়ে গেল। নিজের দিকে ধেয়ে আসতে থাকা এরিসের আগুনের গোলককে একটা পাল্টা গোলক ছুঁড়ে ধ্বংস করলো নারায়ণ অস্ত্র, তারপর এরিসের দিকে ছুঁড়ে দিলো এক পশলা অস্ত্র। অস্ত্র বৃষ্টিতে অস্থির হয়ে পড়লো এরিস। বেশ কিছু অস্ত্র এড়িয়ে যেতে পারলেও একটা ভীষণ বর্শা কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারলো না সে। ঠিক তার বুকে এসে বর্শা বিধল।

নিজেদের অসহায় অবস্থার মধ্যেও হায় হায় করে উঠলো আমাজনেরা। এরিসের বুকে আঘাত লেগেছে বর্শার। তবে এরিসকে খুব একটা কাবু করতে পারলো না সেই বর্শা। নিজের হাতে টেনেই সেই ফলা বের করে আনলো সে। তারপর আবার ছুঁড়ে দিলো আরেকটা আগুনের গোলা নারায়ণ অস্ত্রের দিকে। এবার আগের চেয়েও বড়ো হলো গোলার আকৃতি।

কিন্তু কোনো লাভ হলো না। এবারও সেই গোলক ধ্বংস করে দিলো নারায়ণ অস্ত্র। সেই সাথে নানা রকমের বেশ কিছু অস্ত্র ভীষণ গতিতে ছুঁড়ে দিলো এরিসের দিকে। এবারও এরিস সব অস্ত্র এড়িয়ে যেতে পারলো না। তার উরু আর বুকে এসে বিধল তিনটে তীর।

ওদিকে আমাজনেরাও চলে এসেছে শিবিরে। এরিসকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের ঢাল দিয়ে সাহায্য করছে তারা। এবার শুধুই প্রতিরক্ষা, আক্রমণের কোনো চেষ্টা নেই আমাজন আর এরিসের মধ্যে। নিজেদেরকে রক্ষা করতেই তারা

ব্যস্ত। মাঝে মাঝে কয়েকজন আক্রমণের অথবা একটু সক্রিয় হবার চেষ্টা করলেই নারায়ণ অস্ত্র থেকে ছুটে আসে ভয়ানক সব অস্ত্র।

এমন অস্ত্রের অথবা শক্তির বিপক্ষে লড়া সবসময়ই কঠিন। হেফাস্টাস নিজেও অস্ত্র থেকে বাঁচার জন্য একটা প্রকাণ্ড ঢাল হাতে তুলে নিয়েছিলেন। সেই ঢালের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে এবার সে এগিয়ে এলো এরিসের দিকে, 'তোমার এখন কী অবস্থা?'

এরিসের গলা ক্লান্ত, 'ভালোই আছি। তবে উরুতে আর বুকে ব্যথা আছে এখনো।'

'তা একটু থাকবেই। শক্ত আঘাত লেগেছে। দেবতা হিসেবে তোমার নিরাময় ক্ষমতা অনেক ভালো কিন্তু এই আঘাতের ব্যথা সারতে একটু সময় লাগবে।'

সেই প্রসঙ্গ বদলে ফেললো এরিস, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আমি সব অস্ত্র সম্পর্কে জানি। যুদ্ধের সব শক্তি সম্পর্কেও জানি। আমাদের মধ্যের কোনো দেবতা তো এমন শক্তি ব্যবহার করতে পারার কথা না। এটা কী শক্তি।'

'যেই শক্তিই হোক, এই শক্তি যে আমাদের দেবতাদের না সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এই শক্তি অনন্য। পৃথিবীর কোনোরকম মানুষিক অথবা দৈবিক ক্ষমতা দিয়ে তুমি এই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না।'

'তাহলে এখন উপায় কী? যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবো, না-কি এভাবে চুপ করে বসে থাকবো?'

হেফাস্টাস সাবধানে নিজের শরীরকে ঢালের আড়ালে আরও লুকিয়ে নিলেন, 'সেই কথা বলতেই তো তোমার কাছে এলাম। আমি একটা ব্যাপার খেয়াল করেছি। এই অস্ত্র একমাত্র কেউ প্রতিরোধ করলে অথবা আক্রমণ করলেই তাকে আক্রমণ করে। দেখেছ, এখন সে কিছুই করছে না, কেবল ঘুরছে।'

'হ্যাঁ, তাই তো।' এরিসও হয়তো একটু একটু বুঝতে পারে ব্যাপারটা, 'তাহলে তুমি কী বলতে চাচ্ছো?'

'কিছু কিছু শক্তি বলে বশ হয় না, ধ্বংস হয় না। তাদেরকে শ্রদ্ধা দিয়ে, তোষামোদ দিয়ে বশ করতে হয়। ক্রোনাসের কথা চিন্তা করো। আমাদের পিতা নিজের তোষামোদ দিয়েই কিন্তু সেই ক্রোনাসের ক্ষমতার মালিক হয়েছিলেন।'

'তার মানে?'

হেফাস্টাস এবার সমাধানের কথা বলে, 'আমার মনে হয়, সবাই মিলে এই অস্ত্রের শক্তির কাছে কুর্নিশ করলেই এই অস্ত্র আমাদের পিছু নেয়া ছেড়ে দেবে।'

এরিস বুঝতে পারলো কথাটা সাথে সাথে। সমর্পণ চায় এই শক্তি। নিজের হাতের বর্ম ফেলে দিলো এরিস। উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলো, 'সবাই নিজ নিজ হাতের অস্ত্র আর বর্ম ফেলে দাও।'

আদেশ পালিত হলো সাথে সাথে। সবাই অস্ত্র আর বর্ম ত্যাগ করে ভয়ে ভয়ে তাকালো ঘূর্ণায়মান গোলকের দিকে। এবার সেখান থেকে অস্ত্রের বৃষ্টি হলে সবাইকেই মরতে হবে। কিন্তু না, কোন অস্ত্র ছুটে এলো না।

এরিস হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো, সবার উদ্দেশ্যে চিৎকার করলো, 'সবাই হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ো। সামনের এই মহান অস্ত্রের শক্তির কাছে মাথা নত করো সবাই।'

সবাই হাঁটু গেঁড়ে কুর্নিশ করতেই নারায়ণ অস্ত্রের ঘূর্ণন কমতে লাগলো। দেখতে দেখতে ঘূর্ণন কমে শূন্যে মিলিয়ে গেল সেই অস্ত্র।

রুদ্রদেব অবাক হয়েছে বেশ। নারায়ণ অস্ত্র দিয়ে প্রাথমিক সংকট কাটানো গেছে, কিন্তু এই অস্ত্র রোধ করার বুদ্ধি এত তাড়াতাড়ি ওদের মাথায় এলো কী করে। নারায়ণ অস্ত্রের শক্তি আবার তার কাছে ফিরে এসেছে।

আর রুদ্রদেব একটা কথা ভালো করেই জানে, নারায়ণ অস্ত্র এক যুদ্ধে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায়।

নারায়ণ অস্ত্র ফেরত যেতেই স্বস্তির একটা সুবাতাস বয়ে গেল এরিসের সৈন্য শিবিরে। এখন আর শূন্য থেকে ভয়ানক গতিতে ভয়ংকর অস্ত্র ছুটে আসার সম্ভাবনা নেই। এতক্ষণে বাইরের আতঙ্ক থেকে সবাই নিজের নিজের দেহের দিকে নজর দেবার অবসর পেলো। সেই কাজটা করতে গিয়ে দূর হওয়া আতঙ্ক আবার ফিরে আসতে শুরু করলো। এমনিতে আমাজনেরা ঢালের আড়ালে নিজেদেরকে যথেষ্ট আড়াল করে রেখেছিল, কিন্তু এলোপাথাড়ি হওয়া অস্ত্রের বৃষ্টির ধারালো কিছু স্পর্শ তাদের দেহের অনাবৃত কিছু অংশ স্পর্শ করতে পেরেছে দুয়েকবার। তাতেই অবস্থা তথৈবচ।

এরিসের অবস্থাও খারাপ। শরীরে বিধে যাওয়া অস্ত্র সে বের করে ফেলেছে, ক্ষতও সারতে শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু যন্ত্রণা কমছে না। সাধারণ কোনো অস্ত্র হলে তা হতো না, কিন্তু এই দৈব অস্ত্র তাকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে। সারতে সময় লাগবে। আমাজনদের শরীরেও দৈবিক প্রভাব আছে, তবু তাদেরকে যথাসম্ভব হতোদ্যম আর হতশক্তি করে দিয়েছে এই ভয়ানক শক্তি। আমাজনদের বেশির ভাগ বসে পড়েছে নিজের নিজের জায়গায়। আর এই প্রথমবারের মতো তাদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধের ময়দানে গমনে অনুৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এরিস নিজের তাবুতে ফিরে এসেছে। একজন আমাজন চিকিৎসক এসেছে তার পেছন পেছন, তাকে বাঁধা দিলো এরিস, 'তুমি আমার ক্ষতের কিছুই করতে পারবে না। তোমার বোনদের কাছে যাও। ওরা অনেকে অসুস্থ অবস্থায় আছে। ওদের সেবা করো।'

নিজের জন্য তৈরি বিছানায় শুয়ে পড়েছে এরিস। যদিও কোনো নিশান ওড়েনি, ঘোষণা সূচক কোনো বাদ্য বাজেনি, তবু এই মুহূর্তে এই যুদ্ধের বিরতি চলছে। এমনিতে সে কখনোই নিজের বাহিনীকে আটকাত না। আর নিজের শরীর হতবল, আমাজনদের অবস্থাও বেশ খারাপ, কিন্তু তবুও সে ঐ বিপক্ষ শিবিরকে তছনছ করে দিতো, কিন্তু তাহলে কেন বসে আছে সে? কেন সে পুনর্জীবিত হবার পর এই প্রথম ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো?

না, তা কেবল দৈহিক অক্ষমতায় নয়। অনেক দিন পরে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে এরিস। জীবনে অনেক শক্তিশালী অস্ত্র সে দেখেছে। জিউসের বজ্র ছিল, পসিডনের ত্রিশূলও কম ভয়ংকর অস্ত্র নয়। কিন্তু এমন অস্ত্র কে কবে দেখেছে? যার কাছে কোনো শক্তিই কাজ করে না। সামনের দেবতা কী করে এমন অস্ত্র তৈরি করলো কে জানে। দেখতে কিছুতেই এদিকের কোনো দেবতার মতো সে না, নিশ্চয়ই ছদ্মবেশ ধরেছে।

হেফাস্টাসের সাথে এক আমাজন প্রবেশ করলো এরিসের তাবুতে। ওদেরকে দেখে মুখমণ্ডলে একটা কঠিন ভাব ফুটিয়ে তুলল এরিস। নিজের ভেতরের ভয়টা কিছুতেই এখন বাইরে বের করে আনা যাবে না।

হেফাস্টাস বসলো তার পাশে, 'এখন তোমার কী অবস্থা? আঘাতের প্রভাব কমেছে?'

নিজের মনের দুর্বলতা প্রকাশ করলো না এরিস, 'না, এখনো ব্যথা আছে। আমি মনের শক্তি ব্যবহার করছি ব্যথাটা কমিয়ে রাখার জন্য। সারতে সময় লাগবে।'

'এখন কি আমরা যুদ্ধে যাবো?' আমাজন মেয়েটা প্রশ্ন করে। তার গলায় যুদ্ধে না যাবার আকুতি প্রথমবারের মতো শুনতে পেলো এরিস। তার মানে আমাজনেরাও ভয় পেয়েছে।

নিজের সিদ্ধান্ত জানালো সে, 'তার আগে জানতে হবে আমাদের বাহিনীর আঘাতের অবস্থা কেমন?'

মেয়েটা জানালো, 'আমাদের অনেকেই সেই গোলক থেকে ছুটে আসা অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়েছে। আর আশ্চর্য সেই আঘাতগুলো। এরচেয়েও বড়ো বড়ো আঘাত শরীরে নিয়ে আমরা আগেও যুদ্ধ করেছি। কিন্তু এবার ছোটো আঘাতেই কাহিল হয়ে পড়েছে সবাই।'

'সবাই আহত হয়েছে?'

'কমবেশি।' এরিসের প্রশ্নের জবাবে মেয়েটা অনুমান করে উত্তর দিলো।

' শোনো' এরিসের গলায় একটু ক্লান্তি, 'এখন আর যুদ্ধে যেতে হবে না। আমরা এখন আমাদের শিবিরেই থাকবো।'

হেফাস্টাস এবার জানতে চাইলো, 'তাহলে আমরা নগরের দিকেই ফিরে যাই। ঐ হেলেটের দল নিজেদের মতো করে থাকুক জঙ্গলে। এমনিতেই তো ওরা পালিয়ে এসেছিল।'

এবার জ্বলে উঠলো এরিসের চোখ, 'না, ওদেরকে কিছুতেই আমি ছেড়ে দেবো না। সামনের ঐ দলের প্রত্যেকটা প্রাণীর শ্বাস বন্ধ না করে আমরা কোথাও যাবো না। এখানেই থাকবো।' মেয়েটার দিকে তাকালো এরিস, 'তুমি বাইরে যাও। যেসব আমাজনেরা আঘাত পেয়েছে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করো। আর যারা অক্ষত অবস্থায় আছে, তাদেরকে বলো, আমাদের শিবির আর বিপক্ষ দলের ওপর নজর রাখতে। কিছুতেই যাতে ওরা পালাতে না পারে।'

মেয়েটা বেরিয়ে যেতেই এবার হেফাস্টাস আসল প্রসঙ্গে ফিরে এলো, 'এরিস, আমাদেরকে সামনের দলের শক্তির কথাটা আরেকবার বিবেচনা করে দেখতে হবে। বিশেষ করে বললে ঐ একজনের শক্তির কথা।'

'হ্যাঁ, সেটাই ভাবছি আমি। কিন্তু সে যে কোন দেবতা তাই তো ধরতে পারছি না। সাধারণ কোনো মানুষ যে সে না, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই।'

একটু সন্দেহ যে হেফাস্টাসের নেই তা নয়, তবে হালে পানি পাচ্ছে না সে, 'না, সাধারণ কোনো মানুষ সে নয়, নিঃসন্দেহে। কিন্তু আসলে সে কোন দেবতা? চিন্তা করো, আমি না হয় একজন নিচু স্তরের দেবতা, কিন্তু তুমি তো সর্বোচ্চ বারো জন অলিম্পিয়ানের মধ্যে একজন। আমি হয়তো জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বুঝতে পারছি না, কিন্তু তুমিই বলো, এমন ক্ষমতা কি আগে আমরা কখনো দেখেছি না শুনেছি? কোন দেবতার এমন অস্ত্র ছিল?'

এই ভয়টাই অনেকক্ষণ ধরে এরিসের মন তোলপাড় করে দিচ্ছে, 'না, এমন অস্ত্র তো কোনো দেবতার নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সাধারণ মায়া অস্ত্র ছাড়াও একটু আগে ছোঁড়া এই বিশেষ অস্ত্র ঐ দেবতার কাছে আছে। আর নিত্য নতুন এমন অস্ত্র তো প্রধান তিন দেবতা ছাড়া আর কেউ বানাতে পারবে না।'

হেফাস্টাসের গলায় স্পষ্ট চিন্তা, 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, জিউস-পসিডন-হেডিসের যে-কোনো একজন আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন? তার মানে তো অবস্থা বড়োই খারাপ।'

'তারচেয়েও খারাপ অবস্থা হতে পারে। হতে পারে ওল্ড টাইটানরা আবার জীবিত হতে শুরু করে দিয়েছে। যেই রহস্যময় কারণে আমি জীবিত হয়েছি, তার পরে তোমাকে জীবিত করেছি, সেটা তো এখনো বুঝতে পারিনি। সেই রহস্যময় শক্তি কি ওদেরকে জীবিত করতে পারে না?'

নতুন নতুন চিন্তা চলে আসে দুজনের মধ্যে, নতুন নতুন কথা হয়। আমাজনেরা পাহারা দেয়, নিজেদের শুশ্রুষা করে। বিকেল গড়িয়ে সময় এগিয়ে যায় রাতের দিকে।

ওদিকে রুদ্রদেবকে নিয়ে সবাই সভায় বসেছে। এখন পর্যন্ত রুদ্রদেবের যুদ্ধ ক্ষমতার যেই পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে রুদ্রদেবকে সভার মাঝে বসাতে আর কোনো আপত্তি নেই। ইভান বাইরের সবকিছু তদারক করেছে। সেই ভয়ংকর অস্ত্র অদৃশ্য হবার পরে এরিস আর কাউকে আক্রমণ করতে পাঠায়নি। তবে আমাজন মেয়েরা সতর্ক অবস্থায় ওদের ওপর নজর রেখে চলেছে। ওদিকে ইভানও নিজেদের লোকদের পাহারা দেবার কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। যদিও সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে কেউই শত্রুর ওপর আক্রমণ করবে না, তবে এখান তো আর কেউ সাধারণ যুদ্ধের ভদ্র নিয়মগুলো মানছে না।

কলিনের মুখ ভার, যুদ্ধে তারা এখনো টিকে আছে রুদ্রদেবের কারণে, কিন্তু প্রচুর হেলট মারা গেছে আজকে। এতদিন সে জানতো স্বাধীনতা পেতে হলে বলিদান দিতে হবে, কিন্তু এখন যেভাবে চলছে তাতে তো সব ঝেড়েমুছে সাফ হয়ে যাবে।

শেইরন জিজ্ঞেস করেন, একটু ইতস্তত ভঙ্গিতে, 'তুমি এত বিচিত্র সব শক্তি পেলে কোথেকে?'

কাকে প্রশ্নটা করা হয়েছে সবাই বুঝতে পেরেছে। রুদ্রদেব মুচকি হাসে, 'সেটা বড়ো কথা নয়। আমি আমার শক্তি ব্যবহার করছি। কিন্তু কথা হচ্ছে শক্র তো দেবতা। তার কাছে কী ক্ষমতা আছে সেটাও তো আমাদের জানা প্রয়োজন। শক্রর শক্তি সম্পর্কে না জানলে আমার শক্তিতে খুব বেশি কুলাবে না।'

শেইরন মাথা নাড়লেন, 'কিন্তু তুমি যেভাবে শক্তির ব্যবহার দেখাচ্ছ, তাতে তো দেবতা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তেমন করা সম্ভব নয়। আচ্ছা, তুমিও কি কোনো দেবতা?'

সবাই তাকিয়ে আছে রুদ্রদেবের দিকে, প্রশ্নটা শেইরনের হলেও জিজ্ঞাসাটা যেন সকলেরই। রুদ্রদেব হাসি মুছে ফেলে ঠোঁট থেকে, 'আমি দেবতা নই। আমি সাধারণ একজন মানুষ। খুব চেষ্টা চরিত্র করে কিছু বিশেষ শক্তি আমি লাভ করেছি মাত্র।'

শেইরন চিন্তিত মুখে এগোলেন রুদ্রদেবের দিকে, 'কিন্তু শুধু তোমার মুখের কথায় তো আমাদের মনের সন্দেহ মিটবে না। কোনো সাধারণ মানুষ তো এমনভাবে শক্তির অধিকারী হতে পারে না। কোনো দেবতার সাথেও সে এভাবে লড়তে পারে না।'

রুদ্রদেব শেইরনের দিকে তাকাল। না, শেইরন মজা করছেন না, তাকে ঘিরে থাকা লোকজন কেউই মজা করছে না, তারা আসলেই তার মানুষ হবার প্রমাণ চাইছে। অনিশ্চয়তা নিয়ে মানুষ বাঁচতে চায় না, তারা তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়, 'ঠিক আছে। আমাকে তাহলে বলে দাও, কীভাবে প্রমাণ করবো।'

'একটু স্থির হয়ে বসলেই চলবে শুধু।' শেইরন এগিয়ে আসেন, তার হাতের পাঞ্জায় মোটা করে কাপড় বাঁধা, কিছু পাতা তিনি সেই হাতে পিষে এনেছেন। তার হাত রসে ভেজা থেকে বাঁচাতে জরিয়েছেন মোটা কাপড়। সেই পাতার রস তিনি মাখিয়ে দিলেন রুদ্রদেবের হাতের অনাবৃত জায়গায়, কনুইয়ের একটু নিচে।

রসটা শরীরে লাগতেই একটা জ্বলুনির অনুভূতি ছড়িয়ে গেল ঐ জায়গা থেকে রুদ্রদেবের পুরো শরীর জুড়ে। রুদ্রদেব বুঝতে পারলো বিছুটি পাতার মতো কিছু একটা ওর শরীরে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তার চেনা বিছুটির চেয়ে এই পাতার রসের ক্ষমতা কয়েকগুণ বেশি। জানে এখন সেই জায়গায় চুলকানোর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে, তবু না চুলকে থাকতে পারলো না সে। আস্তে আস্তে জায়গাটা বেশ লাল হয়ে ফুলে উঠলো। ফলা অংশটা বেশ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেন শেইরন, 'যাক, এবার নিশ্চিন্ত হলাম। ছোটোবেলায় এক পুরোহিতের কাছে শুনেছিলাম, দেবতাদের গায়ে না-কি পৃথিবীর কোনো বিষ কাজ করে না। কিন্তু তোমার শরীরে করেছে। তার মানে, তুমি মানুষ।'

রুদ্রদেবের হাত তখনো জ্বলছে, 'ছোটোবেলায় শোনা আর কোন সহজ উপায়ের কথা মাথায় আসেনি আপনার?'

এই কথার জবাব দিলেন না শেইরন, তাবু থেকে বেরিয়ে গেলেন। রুদ্রদেবের পরিচয় পেয়ে তার মুখের চিন্তা পুরোপুরি দূর হয়নি।

এবার রুদ্রদেব হাতের ব্যথাকে অগ্রাহ্য করে এরিসের ব্যাপারে ফিরে গেল, 'এই দেবতা এরিস সম্পর্কে আমাদের তথ্য জোগাড় করতে হবে। তোমাদের এদিকের দেবতা। তোমরা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু জানবে। সে এভাবে পৃথিবীতে নেমে এসে উৎপাত শুরু করেছে কেন?'

এবার একেকজন একেকজনের দিকে তাকাচ্ছে, কেউ দেবতা সম্পর্কে কিছুই জানে না। কলিন শুধু বলল, 'দেবতা সম্পর্কে কেউই কিছু জানে না। প্রাচীনকালে এই দেবতাদের নিয়ে লোকজন আদিখ্যেতা করতো, তখন না-কি দেবতারা বিভিন্ন রাজ্যের পক্ষে যুদ্ধও করতেন, কিন্তু এখন আর সেসব নেই। কোত্থেকে ইনি এসেছেন তা কেউ জানে না।'

'কেউ না কেউ তো অবশ্যই জানে। পুরোপুরি না জানলেও কেউ তো অন্তত কিছু হলেও আভাস দিতে পারবে।' ধৈর্য প্রায় হারিয়ে যাবার উপক্রম হয় রুদ্রদেবের।

তখন একজন বলে উঠলো, 'আমাদের মধ্যে একজন হেলট আছে, সে জানতে পারে। পুরোহিতের বাড়িতে কাজ করতো সে।'

সময় নষ্ট না করে সেই হেলটকে ডেকে পাঠানো হলো। অসিত হেলটকে চিনতে পারলো। সেই প্রথম কলিনের কাছে দেবতার খবর নিয়ে এসেছিল। ওরা যেদিন কলিনের আস্তানায় প্রথম এসেছিল তার দুদিন পরে।

পুরোহিতের বাড়ির হেলটকে জেরা করলো রুদ্রদেব, জেনে নিলো যতটুকু জানা সম্ভব, 'পুরোহিতের কাছ থেকে এসব শুনেছি আমি। এই স্পার্টায় না-কি অনেক দিন আগে এই দেবতা এরিসকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল মন্ত্রবলে। যুদ্ধের দেবতা যেই নগরে থাকবেন যুদ্ধের ক্ষমতা সেখানেই সবচেয়ে বেশি থাকবে, এই আশায়। তারপরে এরিস বন্দিই ছিলেন।'

কলিন মন্তব্য করলো, 'এখন আর বন্দি নেই।'

'হ্যাঁ', হেলট একটু ভাবল, 'পুরোহিতকে এটাও আলোচনা করতে শুনেছি। তিনিও কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলেন না, কীভাবে এরিস মুক্তি পেলো। কিছুদিন আগে না-কি বিদ্রোহী অভিজাতেরা এরিসকে জাগাবার চেষ্টা করেছিল, যাতে এরিস তাদের পক্ষে যুদ্ধ করে রোমানদের হারিয়ে দেন। কিন্তু তারা সফল হতে পারেননি।'

এই কথাগুলো নতুন রুদ্রদেবের কাছে। হেলটের কথা তখনো শেষ হয়নি, 'আমি পুরোহিতকে এটাও বলতে শুনেছি, অভিজাতেরা যে এরিসকে জাগাতে সফল হবে না, সেটা তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। শুধু সঠিক মন্ত্র দিয়েই এরিসকে জাগানো সম্ভব ছিল না। কোনো প্রধান দেবতা নিজের শক্তি ঐ পাথরে

সঙ্কার করলেই কেবল জেগে উঠবেন এরিস। কিন্তু এখানে তো আর কোনো দেবতা আসেননি। আর একটা উপায়ই ছিল। টিয়ার অব এপোলো।'

সবাই এবার কান খাড়া করে ফেললো। কয়েকজনের গলা থেকে এক সাথে বেরিয়ে এলো, ' টিয়ার অব এপোলো!'

'হ্যাঁ' চমৎকার বর্ণনা দেওয়ার সময় চোখ চকচক করে উঠলো হেলটের, 'এপোলোর অশ্রু। সেই পাথরে অনেক শক্তি। সূর্য দেবতার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল একবার পৃথিবীতে। সেই অশ্রু এক মণির রূপ নেয়। সেই রত্ন স্পার্টার বাইরে আছে। সেটা স্পার্টায় আনতে পারলেই তার শক্তিতে জেগে উঠত এরিস। কিন্তু সেটাও তো কেউ আনতে পারেনি। কীভাবে এরিস জেগেছে সেটাও একটা রহস্য।'

রুদ্রদেব কাঙ্ক্ষিত তথ্য পায়নি, 'আর কিছু জানো তুমি? এরিসের মূল শক্তি কোথায়? অথবা তার দুর্বলতা। কী করে তাকে আবার পরাজিত করা যায়? অথবা আবার আগের মতো নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায়? এছাড়া আমাদের বাঁচার কোনো উপায় নেই।'

কেউই তেমন কিছু জানে না। কলিন কেবল বলে উঠলো, 'তুমি তোমার শক্তিগুলো ব্যবহার করবে। তুমি কি দেবতার চেয়ে কোন অংশে কম নাকি?'

রুদ্রদেব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও ফেলে না। কেউ তাকে এরিসকে পরাজিত করার উপায় বলতে পারেনি। রামচন্দ্রকে রাবণের হত্যা উপায় বলে দিয়েছিল বিভীষণ। এখানে কোনো বিভীষণ নেই।

ওদিকে এরিসের শিবিরেও রাত নেমে এসেছে। এতক্ষণে একবারও নিজের তাবু থেকে বেরোয়নি এরিস। একটা সমাধানের পথ খুঁজতে লাগলো সে। এমন জটিল মুহূর্তে তার মাথা এমনিতেই একটু কম কাজ করে। তার শরীরে শক্তি কম ছিল না, দক্ষতাও বেশি ছিল, কিন্তু বারবার এথেনার কাছে হারতে হতো তাকে। শুধু এথেনার বুদ্ধির কাছেই হারতো সে।

তার তাবুর দরজায় একটা নড়াচড়ার আওয়াজ হলো। নিশ্চয়ই হেফাস্টাস আসছে, আর কারো সাহস হবে না। হেফাস্টাসের সাথে আরেকজনকে ঢুকতে দেখে চোখটা সরু করে তাকালো সে। লোকটাকে চেনা যাচ্ছে না।

হেফাস্টাস ব্যাপারটা খোলাসা করলো, ' আমাদের শিবিরের কাছে একজন আমাজনের হাতে ধরা পড়েছে।'

ফুঁসে উঠলো এরিস, ' নিশ্চয়ই বিপক্ষ দলের গুপ্তচর। দেখে তো মনে হচ্ছে গ্রীক। একজন গ্রীক দেবতার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করতে সাহস হয় কি করে?'

এরিসের ধমক শুনে হাত জোড় করে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়েন শেইরন, কাঁদো কাঁদো তার গলা, ' আমাকে ক্ষমা করবেন মহামান্য এরিস। আমার আরও আগেই

আপনার কাছে আসা উচিত ছিল। যে সর্বনাশ ঐ পক্ষের হেলটেরা না বুঝে করতে যাচ্ছে তা একমাত্র আপনিই থামাতে পারেন।'

সন্ধ্যার সময় রুদ্রদেবের বলা এরিসকে থামানোর কথাগুলো শেইরন তাবুর বাইরে থেকে শুনেছেন। তিনি একজন গ্রীক। আর দেবতারা সবসময় গ্রীকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন, গ্রীকদের ক্ষমতা দেবেন। আর কোথাকার কোন রুদ্রদেব এরিসকে থামানোর উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

রুদ্রদেবের শক্তির পরিচয় পাওয়ার পর থেকেই সন্দেহ হয়েছিল শেইরনের। একটা বানরের জন্য কেউ কি এতো পথ ছুটে আসে। অসিতকেও ব্যবহার করেছে রুদ্রদেব। ওর ভালো ব্যবহার আসলে একটা মুখোশ। তার আড়ালে গ্রীকদের সর্বনাশ করাই তার লক্ষ্য। দেবতার পক্ষ নেয়াই ঠিক করেছেন শেইরন শেষ পর্যন্ত।

এরিস শেইরনের দিকে তাকালো সন্দেহ নিয়ে, বুঝতে পারলো ধোঁকা দিচ্ছে না লোকটা। প্রশ্ন করলো, ' তোমাদের ঐ পক্ষে একজন দৈব ক্ষমতা ব্যবহার করছে। কে সে?'

' লোকটার পরিচয় আমি ঠিকমতো জানি বলে মনে হচ্ছে না মহামান্য। আমার সাথে অনেক দূরের দেশ ভারতে তার পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু তখন আমি জানতাম না তার এই ক্ষমতার কথা। গতকালই জানতে পেরেছি।'

'সে কোনো দেবতা তা কি জানতে পেরেছ? বারো জন অলিম্পিয়ানের মধ্যে সে কোন জন?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো শেইরনের চেহারা, ' না, সে কোনো দেবতা নয়। আমারও এই সন্দেহ হয়েছিল। আর সেই সন্দেহ দূর করার জন্য আমি তার শরীরে বিছুটি পাতার রস লাগিয়ে দিয়েছিলাম। সেই রসের প্রভাবে তার চামড়া লাল হয়ে গিয়েছিল, ফুলে উঠেছিল চরমভাবে।

এরিসের চোখমুখ সাথে সাথে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, ' করেছ কি তুমি। তাহলে সে কোনো দেবতা নয়? হেফাস্টাস, সে কোনো দেবতা নয়। বরং একটু উৎকৃষ্ট মাত্রার জাদুকর।'

এরিস শেইরনকে জড়িয়ে ধরল। শেইরন কুঁকড়ে গেলেন দেবতার শক্তিশালী স্পর্শে, আস্তে করে বললেন, 'একটাই অনুরোধ মহামান্য। আমাদের পক্ষের হেলটদের তেমন কোনো অপরাধ নেই। তারা পথভ্রষ্ট। তাদেরকে আপনি ক্ষমা করে দেবেন। চলে যেতে দেবেন দয়া করে।'

এরিস এই কথার উত্তরে কিছুই বলল না। কেবল তার দুই হাতের উষ্ণতার চাপ যেন একটু আলগা হলো শেইরনের শরীরে। হেফাস্টাসের দিকে তাকালো সে, দুই চোখের অনিশ্চিত দৃষ্টি সরে গিয়ে ফিরে এসেছে চিরাচরিত গভীর নিষ্ঠুরতা।

ঘুমের চিন্তাই মাথায় আসেনি গতরাতে রুদ্রদেবের। এক মনে বাহিনীর সামনে একটা জায়গায় বসে লক্ষ্য রেখেছে বিপক্ষের ওপর। রাতের বেলায় হামলা হবার আশংকা উড়িয়ে দিতে পারেনি সে, এদিকে ভোরের আলো যেন রাতের বিভীষিকা অনেকটাই কাটিয়ে দিয়েছে।

অসিতও ঘুমায়নি। রুদ্রদেবের কাছ থেকে একটু দূরে বসে ছিল সেও। একটু দূরে অঙ্গদকে একটা কাপড় বিছিয়ে দিয়েছে। অঙ্গদ এখনো সেখানেই ঘুমাচ্ছে। শুধু ঘুমের ঘোরে শরীরের নিচে বিছানো কাপড় নিজের সাড়া শরীরে চাদরের মতো পেঁচিয়ে নিয়েছে সে।

রুদ্রদেব উঠে দাঁড়িয়ে শরীরটা একটু নেড়ে নিলো। অসিতকে জাগ্রত দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো, 'ঘুম কেমন হলো বাইরে?'

' আমি ঘুমাইনি' অসিতের স্পষ্ট জবাব।

' এমন পরিস্থিতিতে না ঘুমানোই ভালো। কাল রাতে খাবারের পর থেকে শেইরনকে দেখেছ?'

অসিত হাত নাড়ল, 'না দেখিনি। তার তো আবার ঘুমে তেমন কোনো সমস্যা নেই। কোথাও হয়তো শয্যা নিয়েছেন।'

রুদ্রদেব বিশেষ মাথা ঘামায় না শেইরনের ব্যাপারে। ইভানের সাথে কিছু পরামর্শ করতে হবে। কাল সে নারায়ণ অস্ত্র ব্যবহার করে ফেলেছে। এখন তার হাতে খুব বেশি অস্ত্র বেঁচে নেই। মহা-মহাস্ত্র যা আছে সেগুলো ব্যবহার করার বিপদ আছে। এই দেবতার কাছে যদি তেমন কোনো শক্তি থেকে থাকে তাহলে মহা বিপদ। সে যদি এখন ব্রহ্মাস্ত্র অথবা পাশুপত প্রহার করে, তাহলে দেবতাও হয়তো তার কাছে রক্ষিত সমমানের শক্তি প্রয়োগ করবে। তখন যে বিস্ফোরণ হবে শক্তির, তাতে অনেকটা বড়ো এলাকা জুড়ে ক্ষয়ক্ষতি হবে তা নিশ্চিত। তবে বিপদে পড়লে সেরকম কোনো অস্ত্রই ব্যবহার করতে হবে, কিছু করার নেই।

ইভানও ওদিকে ঘুমায়নি। সে আবার এক কাঠি বাড়া। ভোরের আগ থেকেই সে সৈন্য সাজাতে শুরু করেছে। কাল আমাজন মেয়েদের সাথে লড়ে মেয়েদের যুদ্ধ কৌশলের কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার বুঝতে পেরেছিল সে। সেগুলোই এখন সেনাদের কাছে যথাসম্ভব বর্ণনা করছে। এসব বুঝে নিতে পারলে আমাজনদের সাথে যুদ্ধ করার ঝামেলা অনেকটাই কমে যাবে। তবে দক্ষতায় ওরা যে আমাজনদের সাথে কিছুতেই পারবে না সেটাও সহজেই বোঝা যাচ্ছে। যাক, শেষ পর্যন্ত লড়তে তো হবে।

এই সকালেই বিপক্ষ শিবিরে উল্লেখযোগ্য নড়াচড়া নজরে পড়ছে রুদ্রদেবের। তার মানে ওরা এখনই আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কাল সে নারায়ণ অস্ত্র প্রহার করেছিল ওদের ওপর। সেই ভয় তাড়াতাড়িই কাটিয়ে উঠেছে প্রতিপক্ষ। এখন নিজেদেরকেও প্রস্তুত হতে হবে।

ইভান নিজের সেনা নিয়ে নড়াচড়া শুরু করেছে। কালকের যুদ্ধে হেলটদের একটা বড়ো অংশ হতাহত হয়েছে। আজকে সৈন্য সংখ্যা অনেক কম। এখন আর আমাজনদের সংখ্যার সাথে হেলটদের সংখ্যার পার্থক্যটা খুব বেশি বিশাল মনে হচ্ছে না। তার ওপর স্পার্টার সাধারণ সেনারা তো আছেই।

ইভান তৈরি হয়ে রুদ্রদেবের পাশে এসে দাঁড়ালো, 'ওরাই কি প্রথম আক্রমণ করবে? কী মনে হয়?'

রুদ্রদেব হালকা চালে বলল, 'তুমি কি আক্রমণ করতে চাচ্ছ না-কি?'

'অতোটা বোকা অথবা সাহসী আমি নই।'

আমাজনেরা এই ভোরের ম্লান আলোতেও যেন দৃপ্ত ভঙ্গিতে জ্বলছে। কাল ওদেরও বেশ কিছু হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। সেই প্রতিশোধ নিতে মুখিয়ে আছে ওরা।

এরিস এগিয়ে এলো বাহিনীর একটু সামনে। তার আশে পাশে কেউ নেই। এরিসের কাছ থেকে একটু দূরে আছে নিকোলাস। ঘোড়ার ওপর বসে আছে সে। তার ঠিক পাশেই আছে শেইরন।

রুদ্রদেব দূর থেকে প্রথমে শেইরনকে চিনতে পারেনি। একটু ঠাহর করতে বোঝা গেল। সাথে সাথে বুঝতে পারলো, তার ধারণা ভুল ছিল। এই যুদ্ধেও বিভীষণ আছে। বিপক্ষ দলে নয়, তার দলেই। নিজেকে হয়তো রামচন্দ্র ভেবেছিল সে, কিন্তু পরিস্থিতি তাকে রাবণ বানিয়ে দিয়েছে। কাল রাত থেকে এজন্যই শেইরনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। শেইরনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওকে সন্দেহ করার পূর্ণ অধিকার তার আছে।

এরিস শেইরনের দিকে তাকিয়ে আরেকটু এগিয়ে এলো। আজকে প্রথম আঘাতেই বিপক্ষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে হবে। নিজের দুই হাত প্রসারিত করে ফেললো এরিস। দুই চোখ বন্ধ করে তাকালো আকাশের দিকে। সেই বন্ধ চোখের পাতা গণগণে কয়লার মতো লাল হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির শক্তি তার ডাকে সাড়া দিলো সাথে সাথে। প্রকৃতিতে যেন বান ডেকে উঠলো। প্রচণ্ড বেগে কাঁপতে শুরু করেছে পায়ের নিচের মাটি। স্পষ্ট টের পাচ্ছে রুদ্রদেব। একই সাথে সে দেখতে পেলো আকাশে অগ্নিবর্ণ মেঘ কালো হয়ে উঠেছে, বাতাসে উঠেছে উদগ্র ঘূর্ণি, সাথে একটু দূরের সমুদ্রে জলরাশি প্রবল বেগে ফুঁসে উঠতে শুরু করেছে।

আতঙ্কিত হলো এবার রুদ্রদেব। না, কোনো ভান নয়, আসলেই এবার আতঙ্ক অনুভব করলো সে। সামনে যে দেবতা আছে সেই এই ভূখণ্ডের পঞ্চভূতের

অধিকর্তা। সে তাদের বিরুদ্ধে একই সাথে পঞ্চভূতের পুরো পাঁচ শক্তিকেই আহ্বান জানিয়েছে। এই শক্তির বিরুদ্ধে কিছু করার সামর্থ্য তার নেই, কোনো মানুষেরই নেই। এই অমোঘ ধ্বংস শক্তি ওদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েই থামবে।

এরিস প্রাণপণে জড়ো করতে শুরু করেছে পাঁচ শক্তিকে। এক বিন্দুতে নিয়ে আসতে চাইছে সে। দাঁতে দাঁত চেপে বসলো তার। মাটি আরও ভয়াল ভাবে কাঁপতে লাগলো। জায়গায় জায়গায় সৃষ্টি হতে লাগলো ভূ গহ্বর। অনেক হেলট সেনা সেই গর্তে পড়ে মরতে লাগলো। ওদের এই অবস্থা দেখে শেইরন এগিয়ে এলেন, হাঁটু গেঁড়ে বসলেন এরিসের পাশে, 'মহামান্য, আপনি বলেছিলেন হেলটদেরকে ছেড়ে দেবেন। আপনার শক্তির প্রভাবে ওরা মারা যাচ্ছে। এই শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করুন।'

আচমকা বাঁধা আসাতে এরিসের ক্রোধ চরমে উঠলো, লাল চোখে সে তাকালো শেইরনের দিকে, 'কখনো আমার কাজে বাঁধা দিতে আসবে না। যে আমার বিরুদ্ধে যাবে তাকেই মরতে হবে। বিপক্ষের একটা লোককেও জীবিত রাখবো না আমি।'

এরিসের কথার তোড়ের সাথে একটা বাতাসের ঝাপটাও ধাক্কা দিলো শেইরনকে। অনেকটা দূরে উড়ে গিয়ে পড়লেন তিনি। বৃদ্ধ শরীরে প্রবল আঘাত করলো মাটি। সাথে সাথে শেইরন বুঝতে পারলেন, তিনি ভুল পক্ষ বেছে নিয়েছেন। দেবতা হলেই যে তার মধ্যে দৈবিক গুণাবলী থাকবে তা নয়। শক্তি হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু চরিত্র? তিনিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, বোকামি করেছেন। এই বোধে আর শরীরের যন্ত্রণা একত্রে আঘাত করলো তাকে। নীরব আর্তনাদে মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন শেইরন।

এরিস শেইরনের ওপর থেকে নজর আবার রুদ্রদেবের ওপর ফেরালো। এতক্ষণে এক বিন্দুতে পঞ্চশক্তি জড়ো করতে পেরেছে সে। দেরি করার কোনো কারণ নেই। সবেগে রুদ্রদেবকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলো সেই অমোঘ শক্তি।

ভীষণ গর্জন করে সৃষ্টি শক্তি ছুটে গেল রুদ্রদেবকে আঘাত করতে। রুদ্রদেব জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চ শক্তির প্রভাবে সবার অবস্থাই কাহিল। এই শক্তি থেকে পালানো যাবে না। নিজের অবস্থান থেকে একটু এগিয়ে এসে দাঁড়ালো রুদ্রদেব। শরীর টানটান করে দাঁড়ালো পঞ্চভূতের আঘাতের সামনে।

প্রবল বেগে রুদ্রদেবের ঠিক বুকে এসে আঘাত করলো পঞ্চশক্তি। রুদ্রদেব টলে উঠলো ভীষণভাবে। মাটিতে চিত হয়ে পড়তে গিয়েও পড়লো না। যুদ্ধ বিদ্যায় শেখানো আঘাত সহ্য করার শারীরিক কৌশল প্রয়োগ করলো সে। কিন্তু তাতে কি পঞ্চশক্তির বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে?

রুদ্রদেব এই বিপদে তার আসল বরদানের কথাই ভুলে গিয়েছিল। যতক্ষণ ঐ মণি তার কপালে থাকবে ততক্ষণ তার মৃত্যু হবে না, তাকে জরা স্পর্শ করবে না। এরিস দূর থেকে নিজের দূরদৃষ্টি ক্ষমতা প্রয়োগ করে স্পষ্ট দেখতে পেলো, রুদ্রদেবের কপাল থেকে বেরিয়ে আসছে এক অদ্ভুত রঙের আলো, সেই আলো তার ছুঁড়ে দেওয়া পঞ্চশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে।

নিজের ছোঁড়া মৃত্যুবাণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে এরিস তাকালো হেফাস্টাসের দিকে, হতাশা ঝেড়ে ফেললো সে, 'এটা কেমন মানুষ। পঞ্চশক্তির মৃত্যুবাণেও তার মৃত্যু হয় না। তাহলে তাকে কীভাবে মারবো?'

হেফাস্টাস নিজেও দেখেছে পুরো ঘটনা, সাথে সাথে বুঝতেও পেরেছে কী হয়েছে, 'আমার মনে হচ্ছে কোনো ধরণের আশীর্বাদ পেয়েছে সে। অমর হবার। আর সেই আশীর্বাদের কারণেই পঞ্চশক্তি তার ওপর কাজ করেনি।'

এরিস কথাটা মেনে নিতে বাধ্য হলো। কোনো বর অথবা আশীর্বাদ না পেলে এতো শক্তির অধিকারী একজন সাধারণ মানুষ হতে পারে না। কিন্তু এখন কী উপায় হতে পারে?

সমাধানটা মাথায় আসতে খুব বেশি সময় লাগলো না। সরল সমাধান। যখন কাউকে মেরে ফেলা যাবে না, তখন তাকে অনন্তকালের জন্য বন্দি করে ফেলতে হবে। তাকেও এই স্পার্টার লোকজন বন্দি করে ফেলেছিল। ঠিক সেইভাবে।

হেফাস্টাসের কাছে নিজের পরিকল্পনা খুলে বলল এরিস। এই বন্দি করার ব্যাপারে হেফাস্টাসের সাহায্য খুবই দরকার তার।

এবারে আর দূর থেকে যুদ্ধ হবে না। এরিস আমাজনদের দিকে তাকিয়ে ভীষণ জোরে যুদ্ধ হুংকার দিয়ে উঠলো। আমাজনেরা সকাল থেকেই যুদ্ধের জন্য মুখিয়ে আছে। কালকের বিভীষিকা তাদের মন থেকে কেটে গেছে।

আজ কাউকে শিবিরে থাকার আদেশ দেয়নি এরিস। আজকে শত্রুকে একেবারে মরণ কামড় দেবে এরিস। সবাই এগিয়ে চলল শত্রুর উদ্দেশ্যে। আমাজনদের তীব্র গতির সাথে পাল্লা দিতে পারলো না স্পার্টার সেনারা। তারা একটু পিছিয়ে পড়েছে, তবু এগিয়ে যেতে লাগলো নিজেদের সর্বোচ্চ গতিতে। নিকোলাস তাদেরকে চালনা করছে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে মরতে হবে এটা ইভান বেশ ভালো করেই জানে। নিজের বাহিনীকেও এগোনোর নির্দেশ দিলো সে। অসিত আর ওরিয়ন তার সাথে আছে। রুদ্রদেব একটু তফাতে এগোচ্ছে।

এরিস ভীষণ বেগে ছুটে আসছে, তার একমাত্র লক্ষ্য রুদ্রদেব। রুদ্রদেব এটা ভালো করেই জানে। আর নিজের পক্ষের সবচেয়ে সামর্থ্যবান যোদ্ধা হিসেবে এরিসের আক্রমণ তাকেই সামাল দিতে হবে। দেবতার সাথে এবার করতে হবে হাতাহাতি লড়াই। প্রস্তুত হয়ে নিলো সে।

সংঘর্ষ শুরু হতে খুব বেশি সময় লাগলো না। রুদ্রদেব এরিসের প্রচণ্ড আঘাত নিজের বাহুর রক্ষণে সামলে নিয়েছে, কিন্তু বেগটা সামলাতে পারেনি। প্রায় দশ হাতের মতো পিছিয়ে গেল সে। সাথে সাথে বুঝতে পারলো দেবতা কি প্রচণ্ড শক্তি ধরে নিজের বাহুতে। নিজেকে সামলে নেবার আগেই এরিস তীব্র বেগে তাকে আবার আঘাত করলো। এবার সে আরও দূরে ছিটকে পড়লো। নাহ, অস্ত্র ছাড়াই এরিস আজকে তার দফারফা করে দেবে মনে হচ্ছে।

পরবর্তী কিছুক্ষণ এরিস যেন ছেলেখেলা করলো রুদ্রদেবকে নিয়ে। আঘাত এড়াতে পারলো রুদ্রদেব, কিন্তু সামলে নিতে পারলো না কিছুতেই নিজেকে, পাল্টা আঘাত করার তো প্রশ্নই ওঠে না। একটু দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছে এখন সে।

ওদিকে হেলটেরা কাতারে কাতারে মরছে আমাজনদের আক্রমণে। ইভান আগের দিন আমাজনদের যুদ্ধের কৌশল কিছুটা ধরতে পেরেছিল, নিজেকে কিছুটা প্রস্তুত করে নিয়েছিল সেই হিসেবে। তাকে আমাজনেরা তেমন কাবু করতে পারলো না। উল্টো একজন আমাজন তার হাতে নিহত হলো, আরেক জন না মরলেও ভালো রকমের আঘাত পেয়েছে। ইভান যুদ্ধ করছে নিজের সর্বোচ্চ ক্ষমতায়। ওরিয়নও কম যায় না। সেও আজকে আমাজনদের আক্রমণের ভালোই জবাব দিচ্ছে।

অসিত ওদিকে একটু সহজ প্রতিপক্ষ পেয়েছিল। আমাজনেরা তার দিকে আসেনি। তাকে আক্রমণ করেছে স্পার্টার সেনা। নিকোলাস অন্যদিকে হেলটদের আক্রমণ করেছে। কয়েকজন স্পার্টার সেনাকে পরপারে পাঠাতে বেশি সময় লাগলো না অসিতের। এতদিনের শেখা অসি যুদ্ধের সকল বিদ্যা ঢেলে দিচ্ছে আজকে সে।

এরিস ওদিকে রুদ্রদেবের পালিয়ে বেড়ানো বুঝতে পেরেছে। কিন্তু পালিয়ে আর কতক্ষণ বেড়াবে। নিজের গতি অসম্ভব বাড়িয়ে এবার আক্রমণ করলো এরিস। কোনো মোক্ষম আঘাত নয়। গণ্ডার যেমন শত্রুর কোনো কিছু লক্ষ্য না করে শুধু নিজের গতি দিয়ে শত্রুকে কাবু করে ফেলে তেমনি এরিসও প্রবল গতিতে ধাক্কা দিলো রুদ্রদেবকে। প্রমাদ গুনল রুদ্রদেব। এই আঘাত থেকে পালানো যাবে না, বুঝে ফেলেছে সে।

তারপর কী হলো ঠিক বোঝা গেল না, রুদ্রদেব সংঘর্ষের পর ঠিকই দাঁড়িয়ে রইলো, কিন্তু এরিস পিছিয়ে এলো পাঁচ হাত। অবাক হয়ে গেল যুদ্ধের দেবতা। তাকে পেছনে ঠেলে দিলো এক সাধারণ মানুষ। সামনে তাকিয়ে দেখল একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সেই মানুষ।

রুদ্রদেব এই ধাক্কা থেকে বাঁচার জন্য শিবের নটরাজ ভঙ্গি ধারণ করেছে। এই ভঙ্গিতে শিব একবার ব্রহ্মাস্ত্রের শক্তিও হজম করে ফেলেছিলেন। এরিসের ধাক্কা

তো অবশ্যই সামলানো যাবে। এবার নিজের তলোয়ার বের করলো রুদ্রদেব। শিবের বারো ভঙ্গির ব্যবহার করতে হবে।

পরের কিছুক্ষণ এরিসকে ব্যাতিব্যস্ত করে তুলল রুদ্রদেব। নাগেন্দ্র রূপে একবার এরিসের হাতে তলোয়ারের একটা হালকা ছোঁয়াও লাগলো। এরিস কিছুতেই পেরে উঠলো না রুদ্রদেবের সাথে। এতক্ষণে রুদ্রদেব শিবের ভঙ্গিতে রক্ষণ চিন্তা বাদ দিয়ে আক্রমণে উদ্যত হয়েছে। পর্যুদস্ত হয়ে এরিস পিছিয়ে যেতে লাগলো। এথেনার সাথে লড়ার স্মৃতি অনেক দিন পড়ে যেন ফিরে আসছে তার মাঝে।

ওদিকে অসিতের সুখের সময় শেষ হয়েছে। এখন আর স্পার্টার সাধারণ সেনাদের বিরুদ্ধে নয়, আমাজনেরা আক্রমণ করেছে তাকে। সাধারণ কৌশলে এখন আর কাজ হচ্ছে না। এই সুন্দর গঠনের তন্বী শরীরে এত শক্তি কোথেকে এসেছে কে জানে।

রুদ্রদেব একবার শিষ্যের দিকে নজর দিলো, রণক্ষেত্রে হেলটেরা মরছে দেদারসে। তাদেরকে কোনো উপদেশ দেবার নেই। অসিতের উদ্দেশ্যে চিৎকার করলো, 'শিবের ভঙ্গিগুলো ব্যবহার করো।'

অসিতের কানে পৌঁছেছে উপদেশ। সে পালন করতে শুরু করলো। এবার তাকে আক্রমণ করা আমাজনেরা একটু কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। শিবের ভঙ্গিতে গুরু-শিষ্য নিজেদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলো।

ইভান-সহ বাকি সবাই যুদ্ধের পাশাপাশি এরিস আর রুদ্রদেবের যুদ্ধের ওপরেও খেয়াল রাখছে। দুজনের একজন হারলেই অন্য পক্ষের হার সিদ্ধ হয়ে যাবে। আমাজনেরাও সেদিকে লক্ষ্য রাখছে।

এরিস বুঝতে পারলো সামনের যোদ্ধার এসব অদ্ভুত ভঙ্গির আক্রমণের কোনো যোগ্য উত্তর তার কাছে নেই। শুধু শুধু এই যুদ্ধকে আর এগিয়ে নিতে চাইলো না সে। হেফাস্টাসের সাথে আলোচনা করে যে সমাধানটা পঞ্চ শক্তির ব্যর্থতার পড়ে ঠিক করেছিল সেটাই এবার ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

নিজের হাতের ভেতরে একটা পাশযুক্ত সোনালি বর্ণের অলৌকিক জাল মুহূর্তের মধ্যে প্রকট করলো এরিস। সাথে সাথে সেটা ছুঁড়ে মারলো রুদ্রদেবের দিকে। মুহূর্তে এই বিশেষ জাল তার কাজ করলো। রুদ্রদেবের সারা শরীর জড়িয়ে ধরল প্রবল ভাবে। রুদ্রদেব প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো নিজেকে ছাড়ানোর, কিন্তু জালটা শরীর থেকে এক চুলের জন্যও ছাড়াতে পারলো না।

এই জালের মালিক কিন্তু এরিস নয়, হেফাস্টাস। এটা এই দেবতা কারিগরের তৈরি বিশেষ জাল। একটা বিশেষ কারণে তৈরি করা হয়েছিল। ঘটনাটা অনেক আগের। আফ্রোদিতির সাথে বিয়ে হয়েছিল হেফাস্টাসের, কিন্তু তাতে আফ্রোদিতি বিয়ের আগের প্রেমিক এরিসকে ভুলতে পারেনি। এরিসের সাথে বিয়ের পরেও

অনৈতিক সম্পর্ক চলতো প্রেমের দেবীর। ব্যাপারটা হেফাস্টাসের কাছে গোপন ছিল না। দুজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে সে। শুধু ধরে ফেলাই নয়, দুজনকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় বন্দি করে অলিম্পাসে দেবতাদের কাছে নিয়ে যায় হেফাস্টাস। কিন্তু এরিস তো যুদ্ধের দেবতা, সে এমনিতে নগ্ন অবস্থায় যে যেতে চাইবে না, এমনকি বন্দিও হতে চাইবে না, এটা হেফাস্টাস আগে থেকেই জানতো। এজন্যই সে তৈরি করেছিল এই বিশেষ অলৌকিক জাল। আর এই জাল এরিস কিছুতেই ছিঁড়তে পারেনি।

শেষে দেবতাদের সামনে হেনস্থা হয়েছিল এরিস আর আফ্রোদিতি। কিন্তু দেবতাদের মাথায়ও একটা চিন্তা আসে। এই অলৌকিক জাল কেটে এরিস বেরোতে পারেনি, তার মানে কোনো দেবতাই বেরোতে পারবে না। তখন সবাই মিলে হেফাস্টাসের কাছ থেকে জোর করে এই জাল ছিন্ন করার উপায় শিখে নিয়েছিল। কাল যখন শেইরন এরিসকে বলল রুদ্রদেব কোনো দেবতা না, তখনই এই জাল প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এরিস। তবে প্রথমে পঞ্চশক্তি ব্যবহার করেছিল সে। মেরে ফেলতে পারলে তো আর বন্দি করে লাভ নেই। তবে সেই শক্তি কাজ করেনি দেখে এবার এই জালের ব্যবহার।

রুদ্রদেব ছটফট করা বন্ধ করে দিলো। নিজের কোনো অঙ্গই নাড়াতে পারছে না সে। এমনকি শ্বাস নেবার সময় বুকের ওঠানামা করাতেও খুব কষ্ট হচ্ছে। নাগ পাশের মতো এই পাশ সময়ের সাথে সাথে তাকে আঁকড়ে ধরছে। ক্রমশ শরীর শিথিল হয়ে আসছে তার।

রুদ্রদেব শেষ চেষ্টা করলো। শুধু মন্ত্রের সাহায্যেও শক্তি প্রয়োগ করা যায়। কোনো উপায় না পেয়ে ব্রহ্মাস্ত্রের মন্ত্র পড়তে শুরু করলো সে। কিন্তু প্রবল চাপে তার দেহের চেতনা হারাবার উপক্রম হয়েছে। পুরো মন্ত্র পড়ে শেষ করতে পারলো না সে। তার আগেই অচৈতন্য হয়ে হেলে পড়লো রুদ্রদেবের শরীর।

হেলটদের সবাই তাকিয়ে আছে এরিস আর রুদ্রদেবের দিকে। এমনকি নিজের মৃত্যুর নিশ্চিত সম্ভাবনা ভুলেও এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখছে তারা। ইভান তার সাথে যুদ্ধ করতে থাকা আমাজনকে ফাঁকি দিয়ে দৌড়ে চলে এলো অসিতের কাছে, 'আমাদের ওকে সাহায্য করতে হবে। দেবতার শক্তির সাথে সে পেরে উঠছে না। একবার যদি এরিস তাকে কাবু করতে পারে তাহলে আমাদের আর কোনো আশাই নেই।'

ইভানের চেয়েও বেশি চিন্তা হচ্ছে অসিতের। রুদ্রদেব তার সরাসরি গুরু। তবে শুধু গুরুভক্তি নয়, তার সাথে এখন তাদের জীবনের সবচেয়ে বড়ো আশাও, 'ওদিকে তো মেয়ে যোদ্ধারা ভিড় করেছে। তাদের পেরিয়ে ওদের কাছে পৌঁছবো কী করে?'

'চেষ্টা আমাদেরকে করতেই হবে। আর এখনই, হাতে একটুও সময় নেই। তুমি আমাজনদের একটু ব্যস্ত রাখো, আমি আঘাত করে জাল কেটে ফেলার চেষ্টা করবো।'

ওরিয়নও এসে যোগ দিয়েছে, 'আমিও থাকবো অসিতের সাথে।'

মরণপণ হলে অনেক কিছুই সম্ভব হয়ে ওঠে। তিনজন একত্র হয়ে রুদ্রদেবকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো যুদ্ধক্ষেত্রে। অসিতের শরীরে যেন বিজলি চমক দিচ্ছে। আদিদেবের আবিষ্কৃত যুদ্ধ কৌশলের সবগুলো সে প্রয়োগ করতে লাগলো সুচারুরূপে। তার সামনে আমাজনদের বাঁধা টিকতে পারলো না। ইভানও নিজের কৌশল প্রয়োগ করে আস্তে আস্তে এরিস আর রুদ্রদেবের নিকটবর্তী হতে লাগলো।

আর বেশি সময় নেই। রুদ্রদেবের মাথা নিচু হয়ে পড়েছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে সংজ্ঞা হারিয়েছে সে।

এরিস রুদ্রদেবের দিকে মেলে রেখেছে তার প্রখর দৃষ্টি। রুদ্রদেব প্রথমে একটু নড়াচড়া করার চেষ্টা করেছিল। না পেরে একটা মন্ত্র না কি যেন আউড়ানোর চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু সফল হয়নি। তার হাতের চাপে এই অমোঘ জাল রুদ্রদেবকে জড়িয়ে রেখেছিল। ক্রমশ বেড়ে গেছে চাপ। এখন অচেতন রুদ্রদেবকেও সুযোগ দিতে নারাজ এরিস। তার হাতের চাপ না বাড়ালেও একটুও শিথিল করেনি সে।

ঠিক তখনই দুজন আমাজনের বাঁধা টপকে এক অস্বাভাবিক উচ্চ লাফে রুদ্রদেবের একেবারে কাছে চলে এলো ইভান। এতক্ষণ ইভানকে খেয়াল না করলেও এবার এরিসের চোখে ধরা পড়ে গেল সে। কিন্তু কিছু করতে পারলো না। দুই হাতেই তার অলৌকিক জাল ধরা আছে।

এই জালে কোনো দড়ি অথবা সুতা নেই। পুরোটাই আলো দিয়ে তৈরি মনে হলো ইভানের কাছে। এতকিছু ভাবতে গেল না সে। হাতের তলোয়ার দিয়ে শরীরের সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে আঘাত করলো সে জালে।

এরিস মুচকি হেসেছে ইভানকে আঘাত করতে দেখে, আঘাতটা করার সাথে সাথে অলৌকিক জাল থেকে একটা শক্তির রশ্মি বেরিয়ে ইভানের শরীরে আঘাত করলো। অনেকটা দূরে গিয়ে পড়লো ইভান, জালের আলোর কিছুই হলো না।

এরিস চেঁচিয়ে উঠলো সাথে সাথে, 'আমাজনেরা, ওদেরকে আর বেশিক্ষণ জীবিত রাখা যাবে না। তোমরা নিজেদের সর্বোচ্চ নিষ্ঠুর রূপের পরিচয় দাও।'

আমাজনদের এই কথা না বললেও চলতো। তারা এমনিতেই নিষ্ঠুর হাতে হেলটদের হত্যা করে যাচ্ছিল। ইভান মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় তাকে আক্রমণ করলো এক আমাজন, কিন্তু কোনোমতে গড়িয়ে বাঁচলো সে।

ওদিকে ইভানের আঘাতে জালের রশ্মি সুতোর কোনো ক্ষতি না হলেও একটা ধাক্কা লেগেছিল। সেই ধাক্কায় রুদ্রদেবের চেতনা আবার ফিরে এলো। নিজের অসহায়ত্ব টের পেলো সে প্রবলভাবে। কোনোমতে নটরাজ ভঙ্গিতে দাঁড়াতে পারলে হতো, কিন্তু পুরো শরীরের কোনো অঙ্গ এক চুলও নড়াতে পারছে না। তীব্র ক্রোধে চিৎকার করে উঠলো সে।

এরিস জয়ীর অট্টহাসি হাসছে, 'এবার তোমাকে বাগে পেয়েছি। জাদু বিদ্যা তো ভালোই শিখেছিলে। কিন্তু এই বাঁধন তোমার থেকেও বড়ো জাদুকর বানিয়েছে। তার থেকে নিস্তার নেই। কোনোমতেই না।'

অসিত রুদ্রদেবের চিৎকার শুনতে পেয়েছে। চিত্ত অস্থির হয়ে উঠলো তার গুরুর চিৎকার শুনে। তার কণ্ঠের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে দিয়েছে তার অক্ষমতা। এখন আর রুদ্রদেবের কিছুই করার নেই। তারই কি কিছু করার আছে? একটু আগেও তো ইভান চেষ্টা করলো ঐ জাল কেটে ফেলার। ফলাফলে সে এখন ধুলায় গড়াচ্ছে।

নাহ, মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। কাজ কতটা কঠিন, কতটা ঝামেলা পার হতে হবে এসব চিন্তা করাই ব্যর্থতার মূল কারণ হয়। সফল হোক না না হোক, নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যবহার করাই বড়ো কথা।

আজ গুরুকে বাঁচাতে গুরুর শিক্ষাই কাজে লাগাতে হবে। রুদ্রদেবের বলা কথাগুলো মনে পড়লো তার- মনের অতলে মহাবিশ্বের সব জ্ঞান লুকায়িত আছে। কেবল খুঁজে বের করতে পারলেই হলো।

মনের গভীরে তল্লাস করতে হবে। কিন্তু আমাজনদের ক্রমাগত আক্রমণ সামলে এই কাজটা করা অনেক কঠিন। তবু চেষ্টা করতে ব্রতী হলো অসিত। যুদ্ধ করতে করতে একটু ফাঁকা জায়গায় চলে এলো সে। হাতের তলোয়ার ধরে বসে পড়লো আদিযোগী আসনে। কোনোদিক যদি কোনো আক্রমণ আসে তাহলে সেটা সামলানোর জন্য শরীরের প্রতিটা স্নায়ু প্রস্তুত। তার মধ্যেই সে ডুব দিলো মনের অতলে। ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাইতে হয় মানুষকে, সেও এবার একটু চাইলো।

একটু পরেই তার মনের ভেতরে বাজতে লাগলো কাল রাতে শোনা সেই পুরোহিতের বাড়ির হেলটের কথাগুলো। টিয়ার অব এপোলো নামে এক রত্নই পারতো এরিসকে জাগাতে। কিন্তু সেই রত্ন তো স্পার্টায় আসেনি।

আসলেই কি আসেনি? এই প্রশ্নই প্রথমে এলো অসিতের মাথায়। তাহলে এরিস জেগে উঠলো কী করে?

তখনই তাকে দুজন আমাজন আক্রমণ করলো। এতক্ষণের অভ্যাসে অর্ধচন্দ্র ভঙ্গিতে দুই আমাজনের বুকেই মরণ আঘাত করলো অসিত তলোয়ারের এক ঘূর্ণনে। তারপর আবার ফিরে গেল চিন্তায়।

তার বুদ্ধি বলছে, এসেছে, সেই টিয়ার অব এপোলো এসেছে এই স্পার্টায়। নইলে হঠাৎ করে এরিসের জেগে ওঠার তো কোনো কারণ নেই। তাহলে কোথেকে এসেছে সেই রত্ন? কে এনেছে? যারা এরিসকে জাগাতে চেয়েছিল তারা তো সফল হয়নি সেই রত্নের সন্ধানে।

রত্ন! রত্ন! আচমকা মনে পড়ে গেল অসিতের। তাকে গুরুই এই কথা শিখিয়েছিল। কিন্তু রুদ্রদেব নয়। তার ছোটোবেলার গুরু। রাধামাধব শাস্ত্রী।

সব মনে পড়ে গেল তার। মাথায় সব চিন্তা যেন এক সাথে ঘুরছে। এরই মধ্যে আরও চার জন আমাজনকে বধ করেছে সে, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল মাত্র নেই। তার মাথায় ঘুরছে রাধামাধব শাস্ত্রী গল্পের ছলে বলা মহাভারতের কাহিনি-

'উত্তরার গর্ভ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ধ্বংস করার ফল হাতে হাতে পেলো অশ্বত্থামা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাকে শাপ দিলেন, সময়ের অন্ত পর্যন্ত তার দেহ জরা মুক্ত হবে না। তার সৌভাগ্যের প্রতিক সেই কপালের মণি খুলে নিয়ে নিলেন তিনি। তারপর থেকে অশ্বত্থামা দুর্ভাগা চিরঞ্জীবী হয়ে ঘুরতে লাগলো এই আর্যাবর্তের বুকে।'

অসিত তাকাল আবার রুদ্রদেবের দিকে। তার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো যেন আবার ভেসে আসতে লাগলো এক এক করে। রুদ্রদেবের সবসময় কপালে কাপড় বেঁধে রাখা। নাহাপনার রত্নভাণ্ডারে প্রবেশ করে তারপর সেই কাপড় খুলে ফেলা, বারিগাজায় সেই অদ্ভুত রত্ন মহারাজ সাতকর্ণীর খুঁজে না পাওয়া- সবই এক সুতোয় মিলে যেতে লাগলো। বুদ্ধি ঠিকমতো কাজ করালে অনেক আগেই সে বুঝতে পারতো, তেমন কোনো লোক না হলে কেউ মহাভারতের সময়ের এসব অস্ত্র চালাতে পারে না। তার মানে তার গুরু রুদ্রদেবের নাম রুদ্রদেব নয়।

তিনি সেই কিংবদন্তীর সাত চিরঞ্জীবীর একজন।

অশ্বত্থামা!

হেলটের বলা কথাগুলো মিলে যাচ্ছে। যুদ্ধ করতে করতে এবার ভাবছে অসিত। সব হিসেব মিলিয়ে দেখা যায় ওরা স্পার্টায় পা দেবার দুদিন পরে এরিসের খবর পেয়েছে হেলট। তার মানে, ওরা যেদিন স্পার্টায় এসেছে সেদিনই এরিস তার বন্দি দশা থেকে জেগে উঠেছে। আর তার কারণ হতে পারে একটাই। টিয়ার অব এপোলো নয়, বরং রুদ্রদেবের মাথার মণির শক্তিতেই জেগে উঠেছে এরিস। হয়তো টিয়ার অব এপোলো যেই শক্তি ধারণ করে প্রকৃতির ঠিক একই শক্তি বিন্যাস ধারণ করে অশ্বত্থামার মাথার মণি। হায় রে, রুদ্রদেব নিজেও জানে না, তার কপালের মণির শক্তি দিয়ে সে যাকে বাঁচিয়ে তুলেছে এখন সেই এরিসের হাতেই তাকে এখন মরতে হচ্ছে।

হ্যাঁ, ঠিক। সেদিন স্পার্টার বন্দরে নামতে গিয়ে রুদ্রদেব অদ্ভুত ভাবে একটু পিছিয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতি একটু অদ্ভুত আচরণ করছিল। দৃশ্যগুলো যেন অসিতের চোখের সামনে ভেসে আসছে বারবার।

তবে রহস্যের সমাধান হলেও সমস্যার সমাধান করতে পারলো না অসিত। ওদিকে রুদ্রদেবের নড়াচড়া আবার বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। আরেকটু হলেই দ্বিতীয়বারের মতো জ্ঞান হারাবে সে। হেলটেরাও মরছে দেদারসে। কিছুক্ষণ পরে আমাজনেরা রক্ত পিপাসা মেটানোর জন্য নিশ্চয়ই আর কোনো শরীর অবশিষ্ট পাবে না।

একটাই উপায় আছে। জানে অসিত। কখনো সফল হয়নি সেই ঐ কাজে, কিন্তু আজকে আর ব্যর্থ হওয়া চলবে না।

তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে পিছিয়ে গেল সে। ইচ্ছে করেই। তার অস্ত্রের ঝোলার কাছে বসে আছে অঙ্গদ। অসিত ডাক দিলো তাকে, কান খাড়া করে অঙ্গদ তাকালো তার দিকে। অসিত ইশারা করলো।

আত্মার সম্পর্কে ভাষার প্রয়োজন হলো না। অসিতের ইশারা বুঝতে পারলো অঙ্গদ। অসিতের ঝোলার পাশে ফেলে রাখা ভারী ধনুকটা কষ্ট হলেও একটু তুলে নিলো অঙ্গদ। তারপর ছেঁচড়ে নিয়ে এলো তার দিকে। আমাজনদের কাছ থেকে পিছিয়ে অঙ্গদের হাত থেকে ধনুকটা নিলো অসিত। এক হাতে ধনুক আর অন্য হাতে তলোয়ার দিয়ে কাজটা করা সম্ভব নয়, চেঁচিয়ে উঠলো সে, ' ইভান, আমাকে আড়াল দিন।'

ইভান বুঝতে পেরেছে কিছু একটা করতে চাচ্ছে অসিত। নিজের শরীরের আঘাত ততক্ষণে সামলে নিয়েছে সে। ক্রিস্টেয়ারের শিবিরে শেখা যত কৌশল আছে সে ঢেলে দিতে লাগলো। ওরিয়নও যোগ দিয়েছে তার সাথে। আমাজনদের কাছ থেকে আড়াল পেলো অসিত।

সময় আর বেশি অবশিষ্ট নেই। আমাজনেরা ওদেরকে মেরে ফেললেই অসিতের আর কিছুই করা হবে না। অসিত তলোয়ার ফেলে দিলো হাত থেকে। মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলো। মনঃসংযোগ করতে লাগলো মন্ত্রের ধ্বনির সাথে।

রুদ্রদেব অবসন্ন দৃষ্টিতে নিচু মাথায় আর চোখে তাকাল এদিকে। তার ঝাপসা দৃষ্টি পড়লো অসিতের ওপর। যেই দৃশ্য সে দেখল তাতে এই তীব্র শারীরিক কষ্ট ভুলে গেল তার শরীর। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সে অসিতের দিকে।

অসিতের ধনুকে ফুটে উঠেছে শক্তির রশ্মি। তবে একটা নয়, দুটো। অসিত একই সাথে প্রকৃতির দুটো শক্তিকে নিজের ধনুকে আহ্বান করেছে। অসম্ভব এই কাজ, অনেক রথী, মহারথীরাও পারে না।

একাধিক শত্রুকে আঘাত করতে দুটো শক্তি একত্রে ব্যবহার করে যোদ্ধারা। রুদ্রদেব এটা জানে। সে নিজেও যুদ্ধের সময় এমনটা করেছে আগে। কিন্তু

অসিতের এখানে দুটো শত্রু কে। আপাতত এরিসকে আঘাত করে তাকে এই জাল থেকে মুক্ত করতে পারলেই তো হলো।

অসিত জ্যা টেনে ধরল প্রবল শক্তিতে। দুটো শক্তি তার ধনুকে দুটো তীরের রূপ নিলো। অসিত ভয় আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে তার হাতের ধনুকে তৈরি শক্তির দিকে। জীবনে কখনো সফল হয়নি সে এই কাজে। তার কেবলই মনে হচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে রশ্মি দুটো। মনের সংযোগ ধরে রাখার তীব্র চেষ্টা করতে হচ্ছে তাকে।

এবার লক্ষ্য স্থির করলো সে। নাহ, এবার শক্তি থিতু হয়েছে, এবার আর মিলিয়ে যাবে না। যুদ্ধ হুংকার করে উঠলো অসিত। তার হাতের ধনুক থেকে ছুটে গেল দুটো শক্তি অস্ত্র। একই সাথে অগ্নি অস্ত্র আর বায়বাস্ত্রের প্রয়োগ করেছে সে। অস্ত্রের প্রবল প্রত্যাঘাতে সেও অনেকটা ছিটকে গেল।

অসিতের ধনুক থেকে বেরোনো শক্তি নিজের খুব কাছে আসার আগে দেখতে পায়নি এরিস। সে দুই হাতেই ধরে রেখেছিল রুদ্রদেবের জাল, তাই তার দিকে ছুটে আসা অগ্নি অস্ত্রকে বাঁধা দিতে পারলো না। তাকে প্রবল আঘাত করলো অগ্নির শক্তি। দুই হাত থেকে জালের রশি ছুটে গেল। অগ্নি অস্ত্র এরিসকে প্রবল বেগে পেছনের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তীব্র জান্তব আর্তনাদ করে উঠলো এরিস। জ্বলুনি সহ্য করতে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে তার। যেই অগ্নির এই শক্তি ছুঁড়েছে তার শক্তি হিসেব করার ক্ষমতা নেই। সাপের বাচ্চা যেমন হিসেব ছাড়া বেশি বিষ ঢেলে দেয়, সেভাবেই এই অপটু যোদ্ধা অতিরিক্ত অগ্নির ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফেলেছে। আগুনের তাপ আর শিখা নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলো এরিস। আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগলো অস্ত্রের ক্ষমতা।

এদিকে অসিত দুটো শক্তি ছুঁড়তেই আরেকটা অতিরিক্ত শক্তির লক্ষ্য সম্পর্কে বুঝতে পারলো রুদ্রদেব। তাকে অবাক করে দিয়ে বায়বাস্ত্র ছুটে এলো তার দিকে। অগ্নি অস্ত্র এরিসকে আঘাত করতেই জাল ছেড়ে দিয়েছিল দেবতা, সেও একটু ঢিল পেয়েছিল চামড়ায়। কিন্তু এক পলের বেশি সেই অনুভূতি স্থায়ী হলো না। বায়বাস্ত্র তাকে আঘাত করলো ভীষণভাবে। অসিত তাকে কেন আঘাত করেছে সেটা কিছুতেই বুঝতে পারলো না রুদ্রদেব। তার হাতে এখন ধনুক নেই। কোনোমতেই বায়বাস্ত্র থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। বায়ু তাকে যেখানে উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে, সেখানে কপাল ভালো থাকলে প্রাণ বাঁচবে, নয়তো শেষ।

বায়বাস্ত্র রুদ্রদেবকে উড়িয়ে নিয়ে সাগরে ফেললো। নোনা জলের স্পর্শে দেহ চাঙ্গা হয়ে উঠলো তার। একটু আগের এরিসের সেই পাশের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তি অনুভব করছে সে। অসিতের বায়বাস্ত্র ছোঁড়ার কারণ যদিও এখনো বোঝা যাচ্ছে না। সেও কি শেইরনের মতো তাকে শত্রু মনে করেছে না-কি? তীর এখান থেকে অনেকটা দূরে। বেশ দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে সাঁতার কেটে। একটা

বড়ো দম নিয়ে দুর্বল শরীরে শরীরে আস্তে আস্তে তীরের দিকে এগোতে লাগলো রুদ্রদেব।

এরিস আহ্বান করে ফেলেছে জলের শক্তি। আকাশ থেকে কয়েকটা জলের গোলা ছুটে এসে নিমেষে এরিসের শরীরে আঘাত করা অগ্নি অস্ত্রের প্রভাব কাটিয়ে দিয়েছে। এরিস রেগে উঠে দাঁড়ালো। রুদ্রদেবের খোঁজ করছে তার চোখ, কিন্তু তাকে কোথাও দেখা গেল না। কিন্তু বিপক্ষ দলে তো এমন শক্তির ব্যবহার আরও একজন পারে। সেই অগ্নি অস্ত্র ছুঁড়েছে তার দিকে। কে সে?

বিপক্ষ দলের ওপর নজর দিলো এবার এরিস। সেখানেই তার চোখ পড়লো অসিতের ওপর। তার হাতের ধনুকে এখনো শক্তির ছিটে রয়ে গেছে। শক্তি সেখান থেকেই প্রয়োগ করা হয়েছিল। নিজের দিব্য দৃষ্টিতে স্পষ্ট তা দেখতে পেয়েছে এরিস। তার মানে ঐ তরুণই ছুঁড়েছে এই শক্তি। আগে ওকে হত্যা করতে হবে।

প্রবল বেগে অসিতের উদ্দেশ্যে দৌড়াতে শুরু করলো সে। অসিত তখনো শক্তির প্রত্যাঘাত সামলে উঠতে পারেনি। সে ঠিকমতো সোজা হবার আগেই এরিস তার কাছে চলে এলো। তারপর কোনো সুযোগ না দিয়ে অসিতকে আঘাত করতে উদ্যত হলো।

অসিত সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আছে এরিসের দিকে। সে একটা পরিকল্পনা করেই দুটো শক্তি ছুঁড়েছিল। বায়বাস্ত্র ছুঁড়েছিল রুদ্রদেবকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তার বের করা উপায় কি শেষ পর্যন্ত কাজ করেনি?

প্রশ্নের উত্তর মিলল পরের পলেই। এরিসের আঘাত করার জন্য উদ্যত শরীর আচমকা পিছিয়ে গেল খানিকটা। কি একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে আঘাত করেছে। অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে নিজের শরীরের দিকে তাকাল এরিস। তাকে ক্রমশ আঘাত করছে অদৃশ্য কোনো শক্তি। এরিস প্রাণপণে চেষ্টা করছে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে, কিন্তু পারছে না। সে ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে।

মাটিতে উপুড় হয়ে বসে পড়লো এরিস। খামচে ধরতে চেষ্টা করলো মাটির বুক, প্রান্তরের ঘাস। কিন্তু সেই অদৃশ্য শক্তির কাছে কিছুই খাটলো না। তাকে পেছনের দিকে ছুটতে বাধ্য করলো সেই শক্তি।

একটা সময় পর এরিস আর্তনাদ করে উঠলো। তার পুরো শরীরের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ লোপ পেয়েছে। অসিত এরিসের পিছিয়ে যাওয়ার গতি দেখে বুঝতে পারলো, তার উপায় কাজ করেছে। মনের অতলে অনুসন্ধান করে সে যেই কারণ আর সমাধান খুঁজে পেয়েছিল একটু আগে, সেগুলো সম্পূর্ণ সঠিক।

এরিসের পশ্চাতে যাবার গতি কমছে না। আতঙ্ক জায়গা করে নিয়েছে এরিসের চোখেমুখে। হঠাৎ তার স্মৃতিতে নাড়া পড়লো। এই পরিস্থিতি তার চেনা।

অনেক আগে স্পার্টার লোকজন যখন তাকে বন্দি করেছিল, তখন ঠিক এই শক্তিহীনতাই অনুভব করেছিল সে।

এরিস কিছুতেই নিজের দেহের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। আমাজনেরা বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে এরিসের দিকে। তাদের গতি এই পৃথিবী বিখ্যাত, কিন্তু যেই গতিতে এরিস পেছনের দিকে ছুটছে তাকে ধরা কোনোমতেই সম্ভব না। দেখতে দেখতে এরিস দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল। তবে সব আমাজন মেয়েরাই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। কেউ কেউ এরিসের দিকে যথাসাধ্য গতিতে ছুটছে।

এরিসের পিছন দিকে ছোটার গতি ক্রমশ বাড়ছে। নিজের গতির ওপর আর একটুও নিয়ন্ত্রণ নেই তার। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলার সময় সে মাঝে মাঝে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে গাছের ডাল, শক্ত অথবা অশক্ত লতা, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। কোনোকিছুই তার পশ্চাৎ গতি কমিয়ে রাখতে পারছে না। জঙ্গলের পথের মাঝামাঝি সে পার করে ফেললো দেখতে দেখতে। এক সময় সেই প্রবল টান তাকে মাটিতে রাখল না, শূন্যে উঠিয়ে ফেললো। এখন এরিস শূন্যে প্রবল গতিতে উড়ে যাচ্ছে।

এই অদ্ভুত আর অমোঘ শক্তি তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এরিসের আতঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে। একটা গাছের ডাল বাগে পেয়ে তড়িৎ গতিতে সে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিল, কিন্তু সেই পিছুটান সেই ডাল ভেঙ্গে তাকে সেই ডাল সমেতই উড়িয়ে নিয়ে যেতে শুরু করলো।

জঙ্গল পার হয়ে গেল নিমেষে। যেটুকু পথ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সেই এই পর্যন্ত এসেছে সেটা সাধারণ কোনো পথিকের এক দিনের পথ। জঙ্গল পার হয়ে বার এই পিছুটান তাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাটা চিনতে পারলো এরিস। এদিক দিয়েই কিছুদিন আগে সে চেতনা ফিরে পেয়ে প্রথম নেমে এসেছিল পাহাড় থেকে। আরেকটু এগোতেই পেয়েছিল প্রথম মানুষের দেখা।

এবার তাকে টেনে তুলে ফেলা হতে লাগলো সেই পাহাড়ের ওপর। পাহাড়ের চূড়ায় মন্দিরের দরজার সামনে এক প্রবল শক্তি তাকে ছুঁড়ে ফেললো মাটিতে। আর্তনাদ করে উঠলো এরিস, কিন্তু সেই অদৃশ্য শক্তি তাকে সামলে ওঠার সময় দিলো না। টেনে প্রবেশ করালো মন্দিরের ভেতর। প্রথম দিন যেই কম্পন অনুভব করেছিল এরিস, সেই কম্পন আবার সৃষ্টি হলো সম্পূর্ণ মন্দিরের মেঝে আর দেওয়ালে। এরিসকে কে যেন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো আগের সেই জায়গাটায়। ছিঁড়ে পড়ে যাওয়া শেকলটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নিজে থেকেই শেকলের জায়গায় জায়গায় জোড়া লেগে গেল। এরিসের শরীরটা ফিরে গেল আদি অবস্থানে। এভাবেই পাথর হয়ে ছিল সে গত এক হাজার বছর। দুই হাত দুদিকে প্রসারিত হয়ে গেল এরিসের। শেকল আপনা থেকেই তাকে জড়িয়ে ধরে বেঁধে

ফেললো। তারপরেই যেন নিমেষে জাদু বলে এরিসের রক্ত মাংসের দেহটা বদলে গেল পাথরের মূর্তিতে।

এরিস পাথরে পরিণত হতেই ঘরের কম্পন থেমে গেল। আবার এরিস ফিরে এসেছে বন্দি অবস্থায়।

যেসব আমাজনেরা ছুটছিল তারা হঠাৎ নিজেদের মধ্যে দমের ঘাটতি অনুভব করলো। দাঁড়িয়ে পড়লো তারা। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা আমাজনেরাও টের পেয়েছে এই পরিবর্তন। পৃথিবীর বাতাসের সাথে তাদের সম্পর্ক যে ছিন্ন হচ্ছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হতে শুরু করলো আমাজনেরা। এক সময় আর কোনো আমাজনকেই দেখা গেল না। স্পার্টান আর হেলট যোদ্ধাদের চোখের সামনে তারা একে একে মিলিয়ে যেতে লাগলো। এমনকি আহত হয়ে যেসব আমাজন পড়েছিল, আর যারা নিহত হয়েছিল, তারাও অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের অস্ত্র, পোশাক, সাজ, শিবির কোনো কিছুই বাকি রইলো না। তারা যে এখানে ছিল, দুর্ধর্ষ যুদ্ধ করেছে, তা বিশ্বাস করাবার মতো কোনো প্রমাণ বাকি রইলো না স্পার্টার ভূখণ্ডে।

সাইক্লপসদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটলো। তাদের দেহ শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে তাদের ভয়াল দর্শন মুগরও মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যে।

চারদিকের এসব মিলিয়ে যাওয়া দেখছে হেফাস্টাস। তার মনে কোনো ধরনের ভয় উৎপন্ন হলো না। জানে, এরিসের ভাগ্যে কী হয়েছে। নিশ্চয়ই আবার বন্দী হয়েছে সে। কারণটা জানা নেই, তবে ফল এটাই হয়েছে। আর এরিস যেসব অলৌকিক শক্তি নিজের শক্তি দিয়ে পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছিল, তার নিষ্ক্রিয় হবার সাথে সাথে সেসব শক্তিও মিলিয়ে যাবে এই পৃথিবী থেকে। তার মানে তাকেও মিলিয়ে যেতে হবে।

নিজের শরীরের দিকে তাকাল হেফাস্টাস। একটু একটু করে পরিবর্তন হচ্ছে। প্রথমে চামড়ার ওপরে থাকা রোমগুলো অদৃশ্য হতে লাগলো। তারপর বাতাসে মিলিয়ে যেতে লাগলো পোশাক, চামড়া, রক্ত, মাংস সব। একটু পরে হেফাস্টাসেরও আর কোনো চিহ্ন রইলো না।

সবাই অবাক হয়ে দেখল পুরো ঘটনা। প্রত্যেকটা হেলটের যদিও খুশি হওয়া উচিত, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে তারা, অদৃশ্য হয়ে গেছে তাদের সব শত্রুরা। শুধু স্পার্টার সৈন্যরা আছে, নিকোলাসের নেতৃত্বে। তবে এখন দুই পক্ষের কারোই যুদ্ধ করার মানসিকতা নেই। অস্ত্র নামিয়ে রেখে সবাই তাদের চার পাশে তাকাতে লাগলো বিস্মিত দৃষ্টিতে।

শুধু এই যুদ্ধক্ষেত্রের এতজনের মধ্যে একজন এভাবে অবাক হলো না। সে আগে থেকেই জানতো কী হবে। এরিসের শক্তি হারিয়ে যাবে এটা বুঝতে

পেরেছিল অসিত, কিন্তু সেই সাথে যে সবাই অদৃশ্য হয়ে যাবে তা বোঝা যায়নি। যাক, কষ্ট কমে গেল।

কিন্তু নিশ্চিত হয়ে বসে থাকার উপায় নেই। অসিত জেনেবুঝেই বায়বাস্ত্র ছুঁড়েছিল রুদ্রদেবের উদ্দেশ্যে। তাকে উড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলাই ছিল উদ্দেশ্য। রুদ্রদেব সমুদ্রে পড়ার মানে হচ্ছে, তার সাথে সাথে ঐ দৈব মণিও গিয়ে পড়বে সমুদ্রে। আর সেটাই একমাত্র উপায় ছিল দৈব মণির প্রভাব কাটানোর। সহজ হিসেব। ভূখণ্ডে মণি এসেছিল, তাই এরিস জেগেছে, মণি চলে গেলে এরিসের শক্তিও চলে যাবে। হিসেব মিলে গিয়ে তাই হয়েছে।

তবে এখন তাকে বসে থাকলে চলবে না। রুদ্রদেব সমুদ্রে পড়ে নিশ্চয়ই মরে যায়নি। সে নিশ্চয়ই ফিরে আসার চেষ্টা করবে ডাঙ্গায়, আর একবার ফিরে আসতে পারলে হিসেব অনুযায়ী এরিস আবার জেগে উঠবে। আর এবার জেগে উঠলে এরিস নিশ্চয়ই ওদের সাথে আর খেলবে না, বরং এক নিমেষে সবাইকে ধ্বংস করে দেবে। সেই ঝুঁকি আর নেয়া যায় না। রুদ্রদেবকে সমুদ্রেই রাখতে হবে।

যেই ঘোড়াটা হাতের কাছে পাওয়া গেল তাতেই চড়ে বসলো অসিত। লাগাম ধরে এক পলও দেরি করলো না। টগবগিয়ে ছুটিয়ে দিলো যেদিকে রুদ্রদেব উড়ে গিয়েছিল সেদিকে। রুদ্রদেব সাঁতরে পারে আসার আগেই তাকে পৌঁছাতে হবে।

ওদিকে রুদ্রদেব তীর থেকে নিজের দূরত্ব আর শরীরের ক্লান্তি বিচার করে শুরুর কিছু পথ আস্তে আস্তে সাঁতরে এসেছিল। দূরত্ব কমার সাথে সাথে শরীরও সাঁতারের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে। এখন অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে সে। তীর আরেকটু নিকটে আসতেই সাঁতারের গতি বাড়িয়ে দিলো সে।

অসিত ওদিকে প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। ঐ তো, দেখা যাচ্ছে সমুদ্র সৈকত। ঢেউ থাকলেও তেমন উঁচু নয়। সৈকতে নামার পথটা পাথুরে, আর একটু উঁচুনিচু। ঘোড়ার একটু সামলে নামা উচিত। তবে সেসবের সময় এখন নেই হাতে। ঘোড়াকে দাবড়ে দ্রুত নামতে বাধ্য করলো সে। তিন চার লাফে ঘোড়া নেমে পড়লো সৈকতে। একবার ঘোড়ার পা হড়কালে আর দেখতে হতো না। বাহন আর সওয়ারী দুজনেরই শরীর থেঁতলে যেতো পাহাড়ে।

রুদ্রদেব ওদিকে পাড়ের কাছে চলে এসেছে। নিজের পায়ের নিচে মাটির স্পর্শ পেতে পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো সে। একটা বড়ো করে দম নিলো। এবার আর সাঁতরানোর প্রয়োজন নেই। হেঁটেই উঠতে লাগলো সে তীরের দিকে।

ওদিকে অসিত রুদ্রদেবকে দেখতে পেয়েছে। ঘোড়া ছোটানোর বিরাম নেই। সমুদ্রের জলের কাছে গিয়ে এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো সে। গতির টানে থামার আগে ঘোড়া বিনা সওয়ারে ছুটে গেল খানিকটা।

অসিত লাফিয়ে পানিতে নেমে পড়েছে। রুদ্রদেব আর কয়েক কদম দূরে ছিল তীর থেকে। ঠিক তখনই অসিত তাকে পানিতে নেমে জড়িয়ে ধরল, 'আপনাকে পানিতেই থাকতে হবে। উঠতে পারবেন না।'

যথেষ্ট অবাক হয়েছে রুদ্রদেব, 'যুদ্ধ করার সময় কি মাথায় জোরালো কোনো আঘাত পেয়েছ না-কি? প্রথমে আমার দিকে বায়বাস্ত্র ছুঁড়লে। উড়ে এসে আমি সমুদ্রে পড়লাম, পানিতে না পড়ে কোনো শক্ত মাটি অথবা পাথরের ওপর পড়লে কি হতো ভেবে দেখেছ?'

'দেখেছি। তাতেও আপনার কিছুই হতো না। তবে আপনি কিছুতেই পানি থেকে উঠতে পারবেন না।'

রুদ্রদেব অবাক হলো, 'পাথরের ওপর পড়লে আমার কিছুই হতো না এটা তুমি কীভাবে বললে?'

অসিত এখন আর লুকোচুরি খেলতে চাইলো না, 'কারণ আপনি মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের শাস্ত্রে যে সাত চিরঞ্জীবীর কথা উল্লেখ আছে আপনি তাদের একজন। আপনার বয়স তিন হাজার বছরের ওপরে। আপনি মহাভারতের যুদ্ধ শুধু যে দেখেছেন তাই নয়, সেই যুদ্ধে আপনি অংশও নিয়েছিলেন। আপনার নাম রুদ্রদেব নয়, আপনার আসল নাম অশ্বত্থামা।'

অসিতের এক নিঃশ্বাসে বলা কথাগুলো মোটামুটি হাঁ হয়েই শুনল রুদ্রদেব। কিন্তু তেমন একটা অবাক হলো না। সে প্রথম থেকেই জানতো, যখনই অসিত তার দিব্যাস্ত্র ব্যবহার করার ক্ষমতার সন্ধান পেয়েছে, তখনই অসিতের মনে সন্দেহের বীজ বপন সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। এখন কেবল সেই বীজ থেকে গাছ হয়ে ফল ধরেছে।

রুদ্রদেব কোনো ধরনের প্রতিবাদ করলো না, অস্বীকার করলো না নিজের পরিচয়, শুধু প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল, 'কিন্তু তুমি আমাকে জল থেকে ডাঙ্গায় উঠতে বারণ করছ কেন?'

'আপনি ভালো করেই জানেন, আপনার মাথায় একটা মণি আছে। অলৌকিক মণি। আর এখানেও এরিসকে জাগাতেও একটা রত্নই লাগতো।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছো, আমার মাথার মণির শক্তির প্রভাবে এরিস জেগে উঠেছে। কিন্তু এই মণি তো আর যাই হোক, এপোলোর অশ্রু নয়।'

'সেটা আমি জানি। কিন্তু, আপনিই তো বললেন, পৃথিবীতে অঞ্চল ভেদে নানা রকমের নিয়ম গড়ে উঠেছে। আর এই সময়ে এসে সেই নিয়মগুলো একে অপরের মুখোমুখি হবে। তেমনি শক্তিও তো মুখোমুখি হতে পারে। কে জানে, হয়তো আপনার মাথার মণি আর ঐ টিয়ার অব এপোলো একই মাত্রার শক্তি ধারণ করে যা

এরিসকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম। আপনি এখন পানিতেই থাকুন। আমি পরিস্থিতি সামলে আসছি।'

কোমর পানিতে বসে পড়লো রুদ্রদেব। অসিত আবার উঠে পড়লো ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া ছোটাল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

ওদিকে হেলট আর স্পার্টার সেনারা বুঝতে পেরেছে, তাদের মাঝ থেকে অলৌকিক আপদ বিদায় নিয়েছে। স্পার্টান সেনারা এরিসের পক্ষে থাকলেও এসব অলৌকিক ব্যাপারে যে তাদের খুব একটা সায় ছিল তা নয়। হেলটেরা আর তারা এক সাথে হর্ষধ্বনি করে উঠলো। রহস্য জানা না গেলেও স্বস্তি ফিরে এসেছে।

হেলটেরা অনেক সাথি হারিয়েছে, তবু যুদ্ধ শেষ হওয়াতে এখন তারা স্বস্তি নিয়ে আহতদের উদ্ধার করতে লাগলো। নিহতদের সৎকার পরে করা যাবে।

কলিনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ইভান, ওরিয়ন আছে তার পাশে, 'এখন তো দেবতাও নেই, দেবতার শক্তিও নেই। কী করবে? আবার স্পার্টা আক্রমণ করে দখল করার চেষ্টা করবে না-কি?'

কলিন আঁতকে উঠলো, দুই হাত বাড়িয়ে নাড়তে শুরু করলো, 'আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আমার জন্য জঙ্গলই ভালো। ঐ রাজপ্রাসাদে আমার এক রাতের জন্যও ভালো করে ঘুম হয়নি। আমি আমার লোক নিয়ে জঙ্গলে ফিরে যাবো। আর বাকি হেলটেরা নিজেদের রাজ্যে ফিরে যাবে। ওসব নগর দখলে আমি আর নেই।'

'ভালো সিদ্ধান্ত' ওরিয়ন মত দিলো, 'এমনিতে আমিও জঙ্গলেই ফিরে যেতাম।'

'হ্যাঁ' ইভানও একমত, 'জঙ্গলে থাকাই ভালো হবে। রোমানরা অবশ্যই স্পার্টায় আসবে। আর আমাদেরকে তারা নিশ্চয়ই ভালো চোখে দেখবে না। তবে আমার একটা কাজ বাকি আছে এখনো।'

ওদিকে স্পার্টার সৈন্যদের নিয়ে নিকোলাস ফিরতি পথ ধরার পায়তারা কষছে। যারা আহত নিহত হয়ে পরে আছে তাদের চিন্তা করে লাভ নেই। এখন বিপক্ষের হেলটদের যে সংখ্যা সেই তুলনায় তাদের সৈন্য সংখ্যা খুব কম। লড়াই হলে তারা টিকতে পারবে না। পালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

ইভান জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে লাগলো স্পার্টার সেনাদের দিকে। ইভানকে আসতে দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল। এই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা আমাজনদের মতো যোদ্ধার বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকে গেছে, শুধু টেকেইনি, সাথে অনেক আমাজন সেনা হত্যাও করেছে।

ইভান ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালো তাদের সামনে, 'তোমরা তোমাদের আহত সাথিদের সেবা না করে, নিহতদের সৎকার না করে যাবার আয়োজন করছো কেন?'

কেউ কোনো উত্তর দিলো না। ইভান আবারও বলল, 'তোমরা ভয় পাচ্ছ জানি, কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমাদের ওপরে হেলটেরা আর আক্রমণ

করবে না। তোমরা আহতদের নিয়ে ফিরে যেতে পারো, আর নিহতদের সৎকার করতে পারো। কোনো ভয় নেই। শুধু একজনের জন্য এই কথা প্রযোজ্য নয়।

ইভান সরাসরি তাকালো নিকোলাসের দিকে। নিকোলাসের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ইভানের কথার মানে বুঝতে পারছে সে। ইভান তাকে ক্ষমা করেনি।

নিকোলাস চোখ নামিয়ে নিলো। ইভান ধমকে উঠলো, 'চোখ ওঠাও কাপুরুষ। আমার দিকে তাকাও। তোমার কলজেটা আজ আমি চিরে দেখবো। আমার তো মনে হয়, তোমার মতো মানুষের রক্তের রং লাল হতে পারে না। নিশ্চয়ই সেই রং পোড়া তেলের মতো কালো।'

নিকোলাস মাথা তুলে তার সেনাদের দিকে তাকালো, সবাই ইভানের দিকে নয়, বরং তার দিকেই তাকিয়ে আছে। সে আদেশ দিলো, 'এখন আমরা যুদ্ধ করবো। ওদেরকে আক্রমণ করো।'

সেনারা এক চুলও নড়লো না। একজন সেনা এগিয়ে এলো নিকোলাসের দিকে, 'এই যুদ্ধ এখন আর আমাদের যুদ্ধ নয়। আমাদের সাথে ওদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এখন শুধু আপনাকে একাই লড়তে হবে। তবে ওরা যদি একের অধিক লোক আপনাকে আক্রমণ করে তাহলে আমরা অবশ্যই বাঁধা দেবো।'

প্রমাদ গুণে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো নিকোলাস, তার কর্মের ফল পাবার দিন আজ। ইভানের আর কারো সাহায্য লাগবে না। সে একাই তাকে নিকেশ করতে পারবে।

এগিয়ে এলো ইভান। পায়ে কোনো জোর পাচ্ছে না নিকোলাস। নিজের কর্মের ভার তার সারা শরীর গুরুভার করে দিয়েছে। প্রথম আঘাত যদিও সেই করলো। ইভান হালকা সরে গিয়ে এড়িয়ে গেল। পরপর কয়েকটা আঘাত করলো নিকোলাস। ইভানকে সেগুলো বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারলো না।

আরেকটু অপেক্ষা করলো ইভান। নিকোলাসের মনোবল পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ার অপেক্ষা করছে সে। তারপর সুযোগ বুঝে মোক্ষম এক আঘাত করলো নিকোলাসের বুকে। মুখ দিয়ে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে এলো নিকোলাসের। মাটিতে পড়ে গেল নিকোলাস। নিজের হাঁটু দিয়ে নিকোলাসের বুকে চাপ দিলো ইভান, সেই সাথে হাত দুটো চেপে ধরল শক্ত করে।

নিকোলাস বিন্দুমাত্র নড়তে পারছে না, হাঁসফাঁস করতে হচ্ছে তাকে দম নেবার জন্য। ওরিয়নের দিকে তাকালো ইভান, 'যাও, ইনোনকে নিয়ে এসো।'

কারণটা ওরিয়ন বুঝতে পেরেছে। তড়িৎ নিজেদের শিবিরে গেল সে, ইনোন বাইরের যুদ্ধের আতঙ্কে তখনো শংকিত অবস্থায় আছে। ওরিয়নকে তার তাবুতে প্রবেশ করতে দেখে তার দেহের কাঁপুনি আরও বাড়লো।

ওরিয়ন অভয় দিলো তাকে, 'ইভান তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে ডাকছে। প্রতিশোধ নেবার সময় হয়েছে।'

ইনোন দাঁতে দাঁত চেপে এগোলো যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। ইভান তখনো চেপে ধরে আছে নিকোলাসকে। প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়েছে নিকোলাস। ইনোনের দিকে তাকালো ইভান, প্রতিশোধ আর ন্যায় দুটো একই সাথে করার সুযোগ তোমার সামনে এসেছে ইনোন। দেরি কোরো না। নিকোলাস যে-কোনো সময় মরে যেতে পারে। পরে নিজের হাতে নিকোলাসকে মারতে না পারার জন্য তোমাকে যাতে পস্তাতে না হয়।'

ইনোন স্থির চোখে নিকোলাসের দিকে তাকালো। যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকা ছড়িয়ে আছে চারপাশে। তবু একটুও ভয় পেলো না সে। আশেপাশে তাকালো একটা অস্ত্রের খোঁজে। এক নিহত স্পার্টান সৈন্যের কোমর থেকে একটা ছুরি খুলে নিলো সে। এগিয়ে গেল দৃপ্ত পায়ে।

ইনোনের মুখ ঝুঁকে এলো নিকোলাসের মুখের ওপর। ঝাপসা দৃষ্টিতে সেই অনিন্দ্য সুন্দর মুখে যেন যমদূত দেখতে পেলো নিকোলাস। পর মুহূর্তেই নিকোলাসের গলায় ইনোন চালিয়ে দিলো ধারালো ছুরি। আর্তনাদ করার শক্তি অবশিষ্ট নেই নিকোলাসের শরীরে। এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এলো মুখ থেকে শুধু। তারপরেই ঝাপসা দৃষ্টি চিরতরে বুজে গেল।

যুদ্ধক্ষেত্রের মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো ইনোন। এবার একটু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে। ইভান জড়িয়ে ধরল তাকে শক্ত করে। শান্ত ধীর গলায় বলল, 'আমাদের কাজ শেষ হয়েছে প্রিয়। আমরা আবার বাঁচতে পারবো।'

অসিত যখন এসে পৌঁছেছে, ততক্ষণে নিকোলাসের গলার কাছে বেশ খানিকটা রক্ত জমেছে।

একটা জাহাজের দরকার ভালো করে বুঝিয়ে বলল অসিত ইভানকে। ইভানের স্বরে কৃতজ্ঞতা, 'তোমাদের দুজনের জন্যই এই যাত্রা বেঁচে গেলাম। তোমরা আমাদের এখানে আরও কিছুদিন থেকে যাও। এতদিন ছিলে ঝামেলার মাঝে। এখন একটু সুখ ভোগ করবে।'

ইভান এখনো রুদ্রদেবের আর তার মাথার মণির সাথে টিয়ার অব এপোলোর সম্পর্ক ধরতে পারেনি। সে ভেবেছে অনভিজ্ঞ অসিত ভুল করে রুদ্রদেবকে আঘাত করে জলে ফেলেছে। অসিত বিনীত স্বরে বলল, 'আমাদেরকে যেতেই হবে। পরে দেখা যাবে এখানে ঝামেলা শেষে সুখ ভোগ করতে গিয়ে আবার আমার দেশে ঝামেলা শুরু হয়ে গেল।' এখানেও মিথ্যে বলেনি অসিত। রাধার মাকে দিয়ে আসা তিন বছরের সময় শেষ হবার আগেই যে তাকে ফিরতে হবে।

ইভান আর জোর করে না। কিন্তু জাহাজের ব্যবস্থা কী করে হবে। বন্দরের সব জাহাজ তো ঝামেলার গন্ধ পেয়ে হাওয়া হয়ে গেছে।

উপায় না-কি মাঝে মাঝে মানুষের ভাগ্যের ওপরেও নির্ভর করে। আঠারোটা হেলট বিদ্রোহী দলের মধ্যে একটা দল ডাঙ্গায় বাস করে না। তারা জাহাজ চালানোর কৌশল শিখে পুরোপুরি নাবিক দল হয়ে গেছে। বেশ কিছু হতাহত হয়েছে তাদের মধ্যে আমাজনদের সাথে যুদ্ধে। তবু বাকি যারা বেঁচে আছে তারা মাঝারি আকারের জাহাজ চালাতে পারবে। স্পার্টায় ঢোকার আগে জাহাজটা ওরা লুকিয়ে রেখেছিল। সেই সর্দারই রাজি হল ওদের সাথে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত যেতে। তবে রোমানদের ধারেকাছে যাওয়া যাবে না। আসল বন্দর থেকে একটু দূরে ওদেরকে নামিয়ে দেবে।

লুকানো জায়গা থেকে জাহাজ আনতে চলে গেল নাবিক হেলটেরা। বেশি দূরে ছিল না জাহাজ। দুপুর গড়ানোর আগেই সেই জাহাজ এনে বন্দরে ভেড়ানো হলো। রুদ্রদেব একবারের জন্য উঠলো না জল থেকে। সেখান দিয়েই ধীরে ধীরে জলের মধ্যে এগিয়ে বন্দর পর্যন্ত এসেছে সে। তারপর জাহাজের পাশের ঝোলানো দড়ি বেয়ে উঠে পড়েছে জাহাজে।

তাদের বিদায়ে খুব বেশি আবেগঘন সময়ের সৃষ্টি হলো তা বলা যাবে না, তবে সবাই অসিত আর রুদ্রদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা বর্ষণ করতে কার্পণ্য করলো না। জাহাজ ছাড়ার একটু আগে ওদেরকে বিদায় জানানোর ভিড়ের মধ্যে একটা মুখ নজরে পড়লো রুদ্রদেবের।

শেইরন শরীরের ধাক্কা সামলে ওদের সাথে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি যে বিশ্বাসঘাতক এটা রুদ্রদেব ছাড়া তেমন কেউ বুঝতে পারেনি। রুদ্রদেব গলা

চড়ালো, 'শেইরন, উঠে আসুন আপনি। এখানে বাকি জীবন নিরুদ্বিগ্ন আরামে থাকা আপনার ধাতে সইবে না। উঠে আসুন আমাদের সাথে।'

চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো শেইরনের। তিনি দুজন হেলটের সাহায্যে জাহাজে চড়লেন। রুদ্রদেব তাকে আলিঙ্গন করে কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল, 'আপনি কী করেছেন আমি জানি, কেন করেছেন তাও জানি। আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি আপনি অবশেষে আপনার ভুল বুঝতে পেরেছেন। এই ব্যাপারটা এখানেই শেষ। আগামীতে আমরা কেউই এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো না। আপনি পুরো বিষয়টা ভুলে যাবেন, সঙ্কুচিত হবার কোনো কারণ নেই।'

মাথা নেড়ে অসিতকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন শেইরন। ওদেরকে বিদায় জানিয়ে এবার বাকিরা ফিরতে লাগলো। ওদের জাহাজ একটু পরেই ছাড়বে। খাবার আর পানির জোগাড় করার জন্য নাবিকেরা নেমেছে।

স্পার্টার সৈনিকরা ফিরে গেছে নগরে। সব সংবাদ দেওয়া হয়েছে পায়াসকে। পায়াসের মনে এখন আর কোনো কিছু গ্রহণ করার মতো শক্তি অবশিষ্ট নেই। নিকোলাসের মৃত্যু সংবাদ তিনি মুখ পাথর করেই শুনলেন। শুয়ে শুয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার চেয়ে বেশি কিছুই তিনি করতে পারলেন না। রানী টায়রারও একই অবস্থা। মেয়ের মৃত্যুতে আর স্বামীর অসুস্থতায় তিনি পর্যুদস্ত। কতদিন সাজঘরে যাওয়া হয়নি তার, কোনো পরিচারিকা কতদিন তার সেবা করেনি। তাকে দেখলে এখন তার সঠিক বয়স আঁচ করা যায়। কে জানে, হয়তো একটু আসলের চেয়ে এখন বয়সটা একটু বেশিই মনে হয়।

রাহু কারাগারে ছিল। স্পার্টার সৈন্যরা ধীরে ধীরে গুছিয়ে নিচ্ছে প্রাসাদ তাদের মতো করে। রাহুকে কারাগারে রেখে খোরপোষ দেবার কোনো কারণ খুঁজে পায়নি তারা। ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে।

পায়ের আঘাতটা সারা জীবনের মতো পঙ্গু করে দিয়েছে রাহুকে। প্রাসাদ থেকে লেংচে লেংচে বেরিয়ে এলো সে। অনেকটা কষ্ট করে বাজারের রাস্তার ধার পর্যন্ত এসে পৌঁছলো। ওর ছিন্ন বস্ত্র আর দেহের অক্ষম অবস্থা দেখে এক দয়ালু অভিজাত ছুঁড়ে মারলো একটা রুটি। স্পার্টায় আবার অভিজাতদের ক্ষমতা ফিরে এসেছে।

রুটিটার দিকে একবার তাকায় রাহু। এই রুটি তার সামনে যেন আয়না হয়ে ওঠে। নিজের সারা জীবনের কাজের চিত্রগুলো যেন এতে দেখতে পায় সে। তারপর ক্ষুধার তাড়নায় সেই ধুলোমাখা রুটিতে একটা বড়ো কামড় বসায় সে। বুঝতে পারে এই থেকে আজ থেকে আমৃত্যু তার নিয়তি।

জঙ্গলে গিয়ে নিজেদের মতো করে সব গুছিয়ে নেয় ইভান। ইনোন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ইভানের সাথে নানা খুনসুটি আর আদরে কেটে যাবে

দিন। কখনো ঝড়ের ঘূর্ণি উঠবে দুজনের মধ্যে আবার কখনো ছড়িয়ে যাবে পূর্ণ চন্দ্ররাতের স্নিগ্ধতা।

ওরিয়নও ভালোই থাকবে। থাকবে সে ডোরার সাথে, ঐ ঘরেই। সারাদিন নিজের প্রিয় কাজ শিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। রাতে ডোরার সাথে নানা কথা বলবে, গল্প শোনাবে। মাঝে মাঝে অনেকটা সময় ইনোনের কাছে গিয়ে ডোরার ছোটোবেলার গল্প শুনে আসবে। সেগুলোই আবার রাতের বেলা ডোরাকে শোনাবে। মাঝে মাঝে নিজে নিজেই গল্পের ছলে হেসে উঠবে। দিন খারাপ কাটবে না।

কলিনও আবার ফিরে গেছে নিজের সর্দারিতে। রাজা হবার চিন্তা বাদ দিয়েছে সে। স্বাধীনতার চেয়ে বড়ো কিছু নেই, আর এই জঙ্গলের চেয়ে স্বাধীন জায়গা আর নেই- এই কথাটা সে বুঝতে পেরেছে।

সেদিন বিকেলে রসদ জোগাড় করার পর ছেড়ে দিয়েছিল অসিতদের জাহাজ। অসিত, রুদ্রদেব আর শেইরন বসেছিল পাশাপাশি। সমুদ্রের হাওয়া গায়ে লাগতেই অসিত যেন নিজের বাড়ির ডাক শুনতে পেলো। কাঁধে বসা অঙ্গদের পিঠে একবার হাত বুলিয়ে নিলো সে। যে কাজে এসেছিল সেই কাজ সমাধা হয়েছে।

রাধা কি এখনো তার জন্য অপেক্ষায় আছে?

ট্রাজান বসে আছেন নিজের কক্ষে। অত্যন্ত গোপনে হলেও বেশ জোরালো ভাবেই চলছে এরিসের পূজার আয়োজন। এখনই নাগরিকদের তিনি কিছু জানতে দিতে চান না। তখনই স্পার্টা থেকে এসে পৌঁছেছে দূত।

' সম্রাট, দেবতা এরিস আর সেই দেবতার পুরো বাহিনী হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কীভাবে কী হয়েছে তা আমার জানা নেই, কিন্তু এখন তাদের কোনো চিহ্নও বাকি নেই।'

চিন্তিত মুখে দূতের দেওয়া খবর শুনলেন ট্রাজান। ভেতরে ভেতরে যে একটু স্বস্তি পাচ্ছেন না তা নয়। দূতকে বিদায় করে দিলেন তিনি। পূজার কাজের প্রধান সমন্বয়ককে ডেকে পাঠালেন।

'শোনো, দেবতা আবার হারিয়ে গেছেন। পূজার আয়োজন কতদূর।'

'মাঝপথ পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে। এখন কি তবে কাজ বন্ধ করে দেবো?'

'নাহ, কাজ চালিয়ে যাও। আমাদের দেবতার পূজা হবে। অনেকদিন রোমবাসী আনন্দ করে না। এবার ভালো করেই করবে।'

সমন্বয়ক বিদায় হতেই ভাবতে বসেন ট্রাজান। এসব দেবতারা অনেক ভয়ংকর। সরাসরি মানুষের জীবনে নিজেরা হস্তক্ষেপ করে। এদের উপাসনা করাও বিপদের কারণ হতে পারে।

ট্রাজান বুঝতে পারেন, রোমান সাম্রাজ্যকে নিজেদের সাম্রাজ্যের জন্য ধর্ম বেছে নিতে হবে। তবে সেই পথে এগোতে হবে খুব সাবধানে। ইহুদি ধর্ম বাছাই করা যাবে না। তাহলে মিশরের দিকের লোকজন তাদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে শুরু করবে ধর্মের দোহাই দিয়ে। পৌত্তলিক ধর্ম বেছে নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এটা গ্রীকদের ধর্ম, আর গ্রীকেরা যে-কোনো সময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে এই ধর্ম ব্যবহার করে।

ট্রাজান বুঝতে পারেন, রোমান সাম্রাজ্য চালাতে হলে এমন একটা ধর্ম দরকার যা একান্ত তাদেরই ধর্ম হবে। সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা চেতনা। শক্তিশালী যার দর্শন, কিন্তু খুব বেশি অনুসারী নেই। স্বকীয় সেই ধর্ম রোমানরা প্রতিষ্ঠা করবে তাদের রাজ্যে।

তেমন একটা ধর্ম গড়ে তোলা সহজ কথা নয়। তবে লোকজন আর গুপ্তচরেরা এরই মধ্যে অনেক খবর এনেছে। জেরুজালেমে একজন ধর্ম প্রচারককে একশো বছর আগে ক্রুশে ঝুলিয়ে মারা হয়েছিল। নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলেছিল নাকি সেই প্রচারক।

তবে সেই প্রচারক মারা গেলেও তার নানা অলৌকিক কাজের বর্ণনা এখনো জীবন্ত। তার দেওয়া শিক্ষাগুলো এখনো তার পথের গোপন অনুসারীদের কাছে আছে। গত একশো বছরে এমন দর্শন আর কেউই দিতে পারেনি। ট্রাজানের মন্ত্রণাদাতারা এই ধর্মকেই বেছে নিতে বলেছেন।

সেই কাজও শুরু হয়েছিল। মাঝখান থেকে এই এরিস এসে সব গোল পাকিয়ে দিতে চেয়েছিল। এখন আবার সেই কাজ শুরু করতে হবে। এরই মধ্যে তারা নকশাও কেটে ফেলেছে।

সেই নতুন ধর্মের জন্য রোমের বুকেই একটা নগরী স্থাপন করা হবে। সেই নগরী হবে সেই ধর্মের প্রধান কেন্দ্র। এখনো লিখিত আকারে না থাকলেও সেই ধর্মের পুস্তক লেখা হবে। সময় এখনো আসেনি, কিন্তু আসবে।

ট্রাজান যেন অস্পষ্ট হলেও ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন। আগামীর পৃথিবীতে ঐ ধর্মই মানুষকে চালনা করবে।

পেশাগত কারণে যন্ত্রের সাথে সখ্যতা রাখতে হলেও মন থেকে চেষ্টা করেন গল্পের সাথে সখ্যতা রাখতে। গল্পের মধ্যেই মানুষের সাথে আড্ডা দিতে চান, একসাথে সহস্র মানুষের সাথে আড্ডা দেবার ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন।

লেখালেখি করার সময় পেরিয়ে গেছে দশ বছর। কিন্তু এখনো প্রতিটি শব্দ তার কাছে নতুনত্ব নিয়ে ধরা দেয়। প্রেয়সীর প্রথম স্পর্শের অনুভূতি দেয় একেকটা সমাপ্তি বাক্য। মানুষের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থেকেই আগামীতে লেখালেখি করার ইচ্ছে।

মহাকাল বইটা প্রকাশ পাবার পর পাঠকদের ভালোবাসা লেখককে আপ্লুত করেছে। মহাযাত্রা তারই যোগ্য সঙ্গত করবে বলে লেখক দারুণ আশাবাদী। সামনের কাজ হিসেবে নিজের গোয়েন্দা চরিত্র ঈশান রায়কে নিয়ে ফিরবেন লেখক, তন্ত্র সমৃদ্ধ একটা চরিত্র নির্মাণের কাজও এগিয়ে চলছে। সাথে আরও কিছু ইতিহাস নির্ভর উপন্যাস লেখার কাজও এগিয়ে চলেছে সমান তালে।



Designed by

